চায়। তাই কর বার্বা, ও পথের শত্রু পথেই থাক ঘরে পুরে শেষে কি সর্ব্বস্বান্ত হবে।

অজয় বলিল, সে আর বলতে হবে না, কালই ও আপদ বিদায় করে তবে আমার অন্য কাজ। বাবা গেল ও কালসাপটাকে শুধু রেখে গেল আমার বুকে ছোবল দিতে।

মাসী ভাবিয়াছিলেন রাত্রে গর্জ্জন বহুদিনের অভ্যাস মত পরদি আবার কোথায় মিলাইয়া যাইবে কিন্তু উঠিয়া দেখিলেন—সে আশঙ্কা অমূলক। অজয় সবার আগে উঠিয়া সনতের কাপড় জামার একটা পুঁটলি বাঁধিয়াই শুধু ক্ষান্ত হয় নাই, গোয়াল ঘরের একপার্শ্বে সনৎ সকলের অজ্ঞাতে আসিয়া কখন শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহাকে টানিয়া তুলিয়াছে।

মাসী কোন কথা কহিলেন না, চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলেন।

অজয় সনৎকে লইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, এরে বিদায় করে এসে তবে জলগ্রহণ করব, এবেলা আর আমার জন্যে রান্নাবাড়া কর না ও বেলা তখন—

মাসী হাই তুলিয়া বলিলেন, তা রাখবে'খন কিন্তু এই চোত মাসে—

বাধা দিয়া একেবারে বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়া অজয় বলিল, চোত মাস ত হয়েছি কি, পায়ের কাঁটা তুলতে গেলে যত শীগ্গীর হয় ততই ভাল, জান ত বাবণরাজা বলেছিল ভাল কাজ। সে আর কোন কথা না বলিয়াই সনতের হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল।

তাহাদের চলিয়া যাওয়া পথটার দিকে খানিক চাহিয়া থাকিয়া মাসী আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, আঃ, বাঁচলুম! অনামুখো ছোড়ার তেজ দেখেছ মুখে রাটী নেই একেবারে হাড়ি পানা করে চলেছে, রকম দেখে বাঁচি না যেন রাজত্বি করতে চলেছেন।

সন্ধ্যার খানিকটা পরেই অজয় ফিরে আসিল। হাতে একটা কই মাছ, বলিল, এটা ভাল করে রেঁধে ফেল মাসি, ওঃ সারা দিন কিছু খাই নি আজ প্র ভরে মাছটা খেয়ে নি।

মাসী ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিলেন, ও মা, মা এনেছিস ত রে, কত নিলে, এক-পাঁচশিকের নিশ্চয় এত অবেলায় পেলি বল ত?

বায়েদের পুকুরে জাল ফেলেছিল আসবার মুখে পড়ল তা একটা নিয়ে এলুম।

বেশ করেছিস, না পেলে খাটতে পারবি কেন? যাই উনুনে আগুনটা দিয়ে দিগে। পোড়া কপাল আমার কানাকর কাণ্ডই ত এই নিবে। দুপুর বেলা কোত্থেকে এক মাছ ছ এনে বাবুর হুকুম হ'ল বেঁধে দিতে হবে আবে নিজের রক্তের টানের কথা আলাদা তোর বেয়াড়া ফাইফরমাস খেটে মরতে গেলুম আর কি। বিনা মাইনের দাসী পেয়েছিস কিনা তাই যা বলবি তাই করতে হবে।

অজয় একেবারে হোহো শব্দে হাসিয়া উঠিল, ওঃ, হতভাগা আবার কাল এমনই মাছ এনেছিল না কি। বেশ করেছ, মাসী বেশ করেছ, ও সব বাবনাক্কা এখানে চলবে না। তুমি রেঁধে ফেল এ একরকম মন্দ হ'ল না। পাপ বিদেয় করার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত করে নেওয়া গেল।

রাত্রে খাইতে বসিয়া কিন্তু সে একখানি মাছ ও মুখে দিতে পারিল না। খানিক ভাত নাড়া-চাড়া করিয়া উঠিয়া পড়িল। মাসী বলিলেন, ওকি রে অত করে রাঁধলুম, দাঁতেও কাটলি না?

গলার স্বরটা গাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল, অজয় বলিল, সারাদিনের ঘোরাঘুরিতে গা কেমন গুলিয়ে উঠছে মাসীমা।

তা বটে, বলিয়া মাসিমা থালা লইয়া উঠানে রাখিয়া দিলেন।

সমস্ত শরীর যেন নিস্তেজ হইয়া আসিতেছিল অজয় তাড়াতাড়ি গিয়া শয্যা আশ্রয় করিল।

দিন দুই কাটিয়া গেল। মাসী আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন,—অজয় একবারও ভাইয়ের নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিল না। বরং তাহার কথা উঠিলে মুখ ঘুরাইয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল।

সেদিন খাইতে বসিয়া হঠাৎ অজয় বলিল, আচ্ছা মাসি, মামার বাড়ী লোকে খুব আদর পায় না?

তা পায় বই কি। কিন্তু মা না থাক্‌লে কেউ খোঁজও করে না! কেন বল ত?

না এমনই জিজ্ঞেস করছি! তা হ'লে এখান থেকে গিয়ে—বাছাধনকে রীতিমতই জব্দ হ'তে হয়েছে, কি বল?

তা আর বল্‌তে? ওসব বাহাচাল্লি আর সেখানে চল্‌ছে না; চুপ করে খাও খেলে না খাও খোঁজও কর্‌বে না কেউ?

বল কি মাসি তাও কি পারে? অতটুকু ছেলে যদি অভিমানই করে, কেউ খোঁজও নেবে না? না না তুমি ভুল বুঝেছ মাসি, মানুষে কি তা পারে!

খুব পারে কত গণ্ডা দেখেছি! আমার সতীন পোর কথা ধর না; পান থেকে চুণ খসেছে ত আর রক্ষে নেই! কত সওয়া যায়, অভিমান করে তিনদিন পড়ে রইল খোঁজও নিলুম না শেষটা উঠে আস্‌তে পথও পেলে না!

তা বটে! বলিয়া অজয় খাইতে সুরু করিল কিন্তু ভাত আর তাহার মুখে উঠিতেছিল না।

মাসী অতশত লক্ষ্য করিলেন না, অজয়ের পাতের নিকট বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, দেখ অজয় ক'দিন থেকে একটা কথা বল্‌ব বল্‌ব করছি কিন্তু মুখ ফুটে তোকে বল্‌তে পারছি না বাবা?

অজয় বিস্ময় ভরে বলিল, বল্‌তে পারছ না সে কি? কি বল ত? তোমার কোন—

বাধা দিয়া হাসিতে হাসিতে মাসী বলিলেন, আমার কোন কিছু চাই না বাবা, সে এক শেষ সময়ে পারিস ত গঙ্গায় নিয়ে যাস্, তোরই কথা ভেবে ভেবে রাতে দিনে আমার ঘুম নেই, পর ত আর নস, আমার আশার ছেলে, নিজের বোন-পো, হাঁ বল্‌ছিলুম, সাম্‌নে ত হাল-খাতা আস্‌ছে, এবার থেকে দোকানের হিসেবপত্রগুলো অন্য নামেই করিয়ে নিস্।

চমকিয়া উঠিয়া অজয় মাসীর মুখের দিকে চাহিল! মাসী একবার তাহার পানে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, অমনি চম্‌কে উঠ্‌লি! তা উঠ্‌বি জানা কথা। তোরা ত আর একালের মত হয়ে জন্মাস্‌নি, অতশত বুঝবি কেমন করে! কিন্তু তোর দেখাও ত উচিৎ প্রাণপাত করে দোকানটার উন্নতি কর্‌ছিস্ এ কার জন্যে? আজ না হয় ছোট ছেলে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিতে পারলি পরে যখন এসে ও সব জিনিষের দাবী করে বস্‌বে তখন কি হবে বল ত? আখের ভেবে কাজ করাই বুদ্ধিমানের কাজ বুঝেছিস্!

এক গ্রাস ভাত এতক্ষণ মুখে আট্‌কাইয়া গিয়াছিল। বহুকষ্টে তাহা নামাইয়া দিয়া অজয় বলিল হুঁ—তারপর?

মাসী বলিলেন, তারপর আর কি, এখন থেকে যদি দোকান অন্য নামে চলে, পরে ও এসে ধরলে বেশী কিছু হবে না, বলবি বাবার দেনায় সব বিক্রি হয়ে গেছে! এসব বিষয় বরং আমার সইয়ের ছেলে উকিল তাকেই একদিন ডাকিয়ে আনাই তারপর যা হয় করা যাবে। কি বলিস্?

অজয় ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। মাসী একগাল হাসিয়া বলিলেন, এত অল্পে যে তোর সুবুদ্ধি হবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নি, ভাগ্যিস্ ও আপদ বিদেয় হ'ল! সেদিন বলি নি তবে আজ বলি, ওর সাদ্ধি কি যে আমার হাতে কোপ মারে—বঁটী নিয়ে মর্দ্দারাম মাছ কুট্‌তে ছুটেছিলেন, টানাটানি কর্‌তে গিয়ে হঠাৎ ক্যাঁচ করে হাতখানা দু'ফাঁক হয়ে গেল।

অজয় কথা বলিতে পারিল না, মাসীর মুখের দিকে বিস্ময়-উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মাসী বলিলেন, চাচ্ছিস্ কি, শাস্ত্রে আছে জানিস্ ত শত্রু ক্ষয় করতে গেলে ছলে বলে কলে কৌশলে জয় করতে হয় এতে পাপ নেই।

অজয় যেন অন্য জগতে আসিয়া পড়িল। মাসীর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিন্তু ইহা ধরা পড়িতে বিলম্ব হইল না; তিনি বলিলেন, তোর কি শরীর খারাপ হয়েছে অজু?

অজয় কহিল, কই না ত!

তবে অমন মন-মরা হয়ে থাকিস কেন অষ্টপ্রহর?

অজয় হাসিয়া বলিল, তোমার নরম প্রাণ, অল্পেই অধৈর্য্য হয়ে পড়, কি হবে আবার আগের চেয়ে বরং ভালই আছি!

মাসী খানিকটা নিশ্বাস একদমে ছাড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, ভাল থাক্লেই বাঁচি।

পহেলা বৈশাখ।

সকলের প্রাণে যেন আনন্দের বাণ বহিয়া চলিয়াছে। সে স্পন্দন মাসীর প্রাণে সাড়া জাগাইতে পারে নাই, তিনি একস্থানে বড় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না, শুধু ঘর বাহির করিতেছিলেন! আজ দুইদিন হইল অজয় সহরে গিয়াছে অবশ্য মাসীরই যত্ন চেষ্টায়। তাহার সইয়ের ছেলের নিকট সমস্ত পাকাপাকি করিয়া তবে ঘরে ফিরিবে। যতক্ষণ না কার্য্য শেষ হয় ততক্ষণ কি কাজের লোক কখনও স্থির থাকিতে পারে! সইয়ের ছেলেকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, রান্নাবাড়ারও কোন ত্রুটী হয় নাই, সমস্ত ঠিকঠাক আসিয়া পড়িলেই হয়।

হঠাৎ বাহির হইতে কে ডাকিল, সইমা, সইমা, কই গো।

মাসী একেবারে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, এতক্ষণ শুধু তোরই কথা ভাবছিলুম অভিলাষ, আয় বাবা আয়। সব ভালয় ভালয় চুকে গেছে ত, অজয় কোথা?

অভিলাষ হাসিতে হাসিতে বলিল, তোমার আশীর্ব্বাদে কত বড় বড় মামলা সাফ করে দিলুম এটা আর পারব না। এমন কায়দা করে লিখিয়ে দিয়েছি যে আর কোন বাছাধনকে টুঁ শব্দটি করতে হবে না। উঁরা দোকানটা ঘুরে আসছেন, আমাকে এগুতে বললেন ভাবলাম সেই ভাল যাই সইমার পেসাদটা আগে থেকেই খেয়ে নেওয়া যাক গে!

মাসীর সারা অন্তরে যেন উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, তিনি বলিলেন, আঃ বাঁচা গেল! চ বাবা চ, খেতে দিই গে। তা কার নামে লেখাপড়া হল?—

অভিলাষ বলিল, কেন সনৎকুমার মিত্রের, দোকানের যা-কিছু সত্ব পয়লা বোশেখ থেকে ওঁরই থাকবে, আর কারও দন্তস্ফুট করবার যোটী থাক্‌বে না।

সইমার দিকে চাহিতেই কিন্তু অভিলাষ একেবারে ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল! সে চীৎকার করিয়া ডাকিল, সইমা সইমা অমন করছ কেন, মৃগী রোগটোগ আছে না কি, ভাল মুস্কিলে পড়া গেল দেখছি!

সইমা কিন্তু মূর্চ্ছা গেলেন না, বহু কষ্টে আপনাকে দমন করিয়া লইয়া বলিলেন, কিছু না, কাল সকালে একখানা গাড়ী ডাকিয়ে আমার সানগরে পৌঁছে দিয়ে তবে যাস বাবা! শরীর গতিক ত বলা যায় না যামীর ভিটেই ভাল।

—



বিধাতার আল্‌পনা

(উপন্যাস)



শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এক

গোরা সৈন্যের হস্তে নিপীড়িত খ্রীষ্টান যুবতী অপর্ণাকে উদ্ধার করিয়া কল্যাণেন্দু যেদিন গৃহে আনিয়া স্থান দিল, সে দিন কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই যে, এই সরলা, বিপন্না ভিন্ন জাতীয়ার সংস্পর্শ তাহার জীবনের খাতার পাতায় পাতায় একটা গভীর কলঙ্কের কালো আঁচড় টানিয়া দিয়া যাইতে পারে! তাই অপর্ণার সংশয়পূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে বেশ জোর করিয়াই সে শুনাইতে পারিয়াছিল, কল্‌কাতার এ বাসা বাড়ীতে যত দিন ইচ্ছে থাকবেন; বাধা ত কেউ দেবেই না বরং বাবা শুনলে এ অবস্থায় আপনাকে আশ্রয় দেবার জন্যে আনন্দিতই হবেন।

অপর্ণা ভাল মন্দ কোন কথাই বলিল না!

তাহাদের একত্র গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আপাত অভিভাবক রঘুনাথ শিরোমণি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,এ আবার কাকে জোটালে কল্যাণ?

সংক্ষেপে তাহার ইতিহাসটা শোনাইয়া দিয়া কল্যাণ বলিল, এরা দুই ভাই বোন নূতন এখানে বেড়াতে এসে গুণ্ডার হাতে পড়েছিলেন, মান ইজ্জত বজায় রাখতে গিয়ে এঁর দাদা বেচারা আজ পুলিসে আটক পড়েছেন! একা অসহায়া যান কোথায়, চোখে দেখে ত আর ফেলে আসতে পারি না, তাই সঙ্গে নিয়ে এসেছি!

রঘুনাথ কিন্তু এ উত্তরে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন বলিয়া বোঝা গেল না।

গোঁড়া হিন্দু রঘুনাথের আশঙ্কার কারণটা বেশ স্পষ্টভাবেই কল্যাণের চোখের উপর ফুটিয়া উঠিল। হাসি গোপন করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে সে বলিল, ভয় নেই আপনার! এ ক'দিন আমার শোবার ঘরটা ওঁকে ছেড়ে দিয়ে কেবল পড়বার ঘর খানাতেই আমি বেশ কাটিয়ে দিতে পারব! আপনাদের বল্‌তে যা-কিছু তা ওঁর বড় একটা প্রয়োজন ত হবেই না পছন্দ হবে বলেও বোধ হয় না। কাজেই ছোঁয়া-ছুঁয়ির ভয়ে অনর্থক শিউরে না উঠে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তই থাকতে পারেন। কথাটা বলিয়াই কল্যাণ স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

বৃদ্ধ রঘুনাথ তাহার এ সরল স্পষ্ট জবাবটাকে টিটকারী হিসাবে ধরিয়া লইয়া মনে মনে বেশ একটু তাতিয়া উঠিতে লাগিলেন। খানিক পরেই কিন্তু চায়ের সরঞ্জাম লইয়া চাকর রামফলকে কল্যাণের ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া একটা খোঁচা দিবার সুযোগ তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, বলিয়া উঠিলেন, দেখ রামফল, এখন যাচ্ছ যাও, ফিরে আসবার সময় ওগুলো আর রান্নাঘরে এনে ঢুকিও না। আর তোমার দাদাবাবুকে বলে দিও, ও খৃষ্টানীর জন্যে থালা বাসন আমাদের ঘর থেকে কিছুই যাবে না। তা শালপাতা কলাপাতাই হ'ক আর কাঁচের রেকাব কিনেই হ'ক ওকে খাওয়ান সে আমার আপত্তি নেই।

চাকরকে আর বলিতে হইল না; কল্যাণই দ্রুতপদে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, ওঁর খাবার

দাবারের ভাবনা আপনাদের বিশেষ কিছু ভাবতে হবে না। আমি হোটেলে খবর পাঠিয়েছি, তাদের লোক এসে দিয়ে যাবে।

কথাটা শেষ করিয়াই সে যেমন আসিয়াছিল ঠিক তেমনই করিয়াই ফিরিয়া গেল। অকস্মাৎ তাহার এ বিদ্রোহ-উত্তেজনায় চিরদিনের কর্তৃত্বা-ভিমানী বৃদ্ধের মুখ চোখের যে কি অবস্থা হইল তাহা আর ফিরিয়াও দেখিল না।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই কিন্তু অপর্ণা লজ্জারক্তিম গণ্ডে বলিল, আমায় নিয়ে আপনি রীতিমত একটা বিপদেই পড়লেন দেখছি।

কল্যাণ অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া বলিল, কিছু না, বরং এতদিনের কুসংস্কারের বোঝাটা ঘাড় থেকে ফেলে দিয়ে মুক্তির আনন্দে গা ভাসাতে পারব, এ শুভ চিন্তাই আমাকে মাতাল করে তুলেছে।

অপর্ণা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, উনিই কি আপনার—

বাধা দিয়া কল্যাণ বলিয়া উঠিল, বাবা!— না না, তিনি দেশে আছেন। অবশ্য জিজ্ঞেস করলে উনি বলবেন এখানকার অভিভাবক! আমি কিন্তু জানি বাবার অন্ধ স্নেহ-মমতার দুর্ব্বলতা প্রতিনিধি হয়ে আমাকে আগলে বেড়াতে এসেছে, তারই কদর্য্যরূপ হচ্ছেন উনি।

অপর্ণা মৃদু হাসিয়া বলিল, মাপ করবেন এমনই সম্মান নিত্য পেয়েও যখন উনি আপনার মায়া কাটাতে পারছেন না তখন ওঁর ধৈর্য্যের প্রশংসা না করে আমি থাকতে পারলুম না।

কল্যাণ মৃদু হাসিল, কথা বলিল না। অল্প কতক্ষণ পরেই মাথা তুলিয়া বলিল, এখানকার আপনার প্রয়োজনের খুঁটি-নাটি যা-কিছু আপ-নাকে নিজেই গুছিয়ে নিতে হবে, কারণ, এ বাসা বাড়ীটা একপ্রকার নারী-বর্জ্জিত বললেও চলে। আপাততঃ কাপড় চোপড়—

বাধা দিয়া অপর্ণা বলিল, ও সব কিছু ভাবতে হবে না আপনাকে, এককাপড়ে চলা-ফেরা করা অভ্যাস আমার অনেকদিন আগে থেকে হয়ে এসেছে। তাছাড়া দয়া করে একজন লোককে যদি—ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন সবই এসে পড়তে পারে। আমি কিন্তু বলি সব চেয়ে ভাল পরামর্শ হ'ল আমাকে সেখানেই রেখে আসা, কারণ বাবা ম সেখানকার খপর নিয়েই আমাদের পাঠিয়েছেন, তাছাড়া দাদা যদি ফিরে আসেন এখানকার খোঁজ কেমন করে পাবেন, হন্যে হয়ে বাচারা হয় ত সারা সহরটাই তোলপাড় করে তুলবেন!

কল্যাণ বলিল, অতটার দরকার হবে না, কারণ পুলিশের হাতে ধরা পড়বার পর আমার ঠিকানাটা তিনি নিজেই জেনে গিয়েছেন। আর আপনার বাবার কথা যে বলছেন সে ভাবনাও বড় করবার নেই, এসেই আমি ফোন করে দিয়েছি যদি কেউ খোঁজ করেন বা চিঠিপত্তর কিছু আসে এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে!

অপর্ণার চোখে মুখে বিদ্যুতের একটা লহর খেলিয়া গেল! সে বলিল ওঃ, আপনার সঙ্গে পারা ভার, শোনবার অপেক্ষা আপনি মোটেই রাখতে চান না দেখছি!

অনেকক্ষণ হইল সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ শিরোমণি হাতের মালাটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ঠাকুর দেবতার নামের পরিবর্তে কল্যাণেন্দুর কথাই ভাবিতেছিলেন হয় ত! হঠাৎ বাহিরের দ্বারে শব্দ শোনা গেল, কল্যাণেন্দু অপর্ণাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার সম্মুখ দিয়া উপরের ঘরে উঠিয়া গেল। তিনি খানিক হতভম্বভাবে বসিয়া রহিলেন; তারপর ধীরে ধীরে কল্যাণেন্দুর ঘরের নিকট উপস্থিত হইয়া দ্বারের পার্শ্ব হইতে গলা বাড়াইয়া বলিলেন, ব্যাপার কি বল ত কল্যাণ, চারদিন বাদে যে তোমার পরীক্ষা সে কথাটাও কি আমাকেই মনে করিয়ে দিতে হবে?

তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া কল্যাণ গলাটা

রুক্ষে সম্ভব খাট করিয়া বলিল, ওসব পরে হবে' এখন জ্যেঠামশাই, আপনি এখন যান!

পূর্ণ উত্তেজনা-ভরা কণ্ঠে বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, কেন কেন বল ত, চোখের ওপর যে যা-তা করবে আর আমি বসে বসে তাই দেখব, সহ্য করব, এ বিশ্বাস যদি তুমি করে থাক মহাভুল করেছ জেনো! জান, পয়সার লোভে আমি এখানে পড়ে নেই। পরের হিত করি বলেই নাম আমাদের পুরোহিত।

কথাটা শোনাইয়া দিয়া বেশ একটু আত্ম-গরিমাপূর্ণ দৃষ্টিতে পুরোহিত কুলতিলক একবার যজমানের মুখের দিকে চাহিলেন! কল্যাণ কিন্তু এ উপদেশে অবহিত না হইয়া অধীর হইয়া পড়িতেছিল, একবার বক্রদৃষ্টিতে ভিতরের দিকে চাহিল, দেখিল অপর্ণা সেখানে নাই, বাহিরের বারান্দার দিকেই বোধ হয় উঠিয়া গিয়াছে! বিরক্তি ভরে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আপনার মতলব কি বলুন ত, আমার মাথাটা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে না দিলে কি আপনার মনস্কামনা সিদ্ধি হবে না?

বৃদ্ধ গম্ভীর ভাবে জবাব দিলেন, সেটা তুমি নিজে নিজেই লোটাচ্ছ বাবাজী, আমার সাহায্যের অপেক্ষা বড় একটা করও নি; দরকারও হবে না! এখন স্পষ্ট জবাব একটা আমি চাই,—এবার কার পরীক্ষাটা কি ঘরে বসে দেবার মতলব এঁটেছ?

বুঝে যদি থাকেন তবে তাই!

আমি তোমার মুখ থেকে স্পষ্ট কথা শুনতে চাই, দেবে কি না?

গম্ভীর ভাবেই কল্যাণ উত্তর দিল, না!

বেশ, তবে তোমার বাবাকে তাহ'লে একথা জানাব?

জানাবেন, বলিয়া কল্যাণ সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। দূরে বারান্দার রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া অপর্ণা শূন্যের পানে চাহিয়া কি চিন্তা করিতেছিল। কল্যাণকে দেখিয়াই সে মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, আপনাকে আচ্ছা বিপদে ফেলেছি যা হ'ক! হাঁ কল্যাণবাবু, উনি আমাকে কি ভেবেছেন বলুন ত? নিশ্চয় একটা মিসি বাবাটাবা গোছের ধরে নিয়েছেন, না?

বলিবার একটা কথা পাইয়া কল্যাণ যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়া গেল। বলিল, আপনার বেশ দেখ্‌লে কি মনে হয় জানি না, কিন্তু আপনার নামের কথা মনে হলে ত আর সন্দেহই থাকে না যে আপনি আমাদের ছাড়া আর কেউ হতে পারেন!

আচম্বিতে অপর্ণার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল, সে নখের কোণ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, অনুমানটা আপনার একেবারে অসঙ্গত হয় নি কল্যাণবাবু তবে—বলিয়া সে থামিয়া গেল।

কল্যাণ আগ্রহভরে অপর্ণার মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে বলিল, তবে! তবে, বলে থাম্‌লে চল্‌বে না, যদি বল্‌লেনই তখন সবটুকু বল্‌তেই হবে আপনাকে।

কল্যাণের আগ্রহের প্রত্যুত্তরে কিন্তু অপর্ণা আর একটী কথাও বলিল না। ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল! খানিক পরে মুখ তুলিতেই কল্যাণের সহিত চোখো-চোখি হইয়া গেল। সে অপ্রতিভ কণ্ঠে বলিল, মাপ করবেন, মনের ভুলে যা-তা বলে ফেলেছি আমি!

কল্যাণ একবার কি ভাবিয়া অপর্ণার মুখের পানে চাহিল, পরক্ষণে অন্য কথা পাড়িয়া সে যেন ইচ্ছা করিয়াই তাহার মধ্যে ডুবিয়া গিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের অবস্থাটা যেন স্বপ্নেরই মত উড়াইয়া দিল!

দুই

আদালতের সূক্ষ্ম বিচারে অপর্ণার ভাই কিন্তু মুক্তি পাইল না! এই সামান্য মারপিটের পিছনে নাকি বল্‌শেভিক প্রচুর পরিমাণে লুকান রহিয়াছে বলিয়া দুই মাস কারাদণ্ড দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট রায়

দিলেন—যদিও ঘটনা তত জটিল নহে তথাপি প্রভাতের সূচনা দেখিয়াই দিনের অবস্থা কল্পনা করা কর্ত্তব্য, অতএব অদূর ভবিষ্যতে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং সভ্যমানবের সম্ভ্রম বজায় রাখিবার উদ্দেশে আমি ইঁহাকে কারাদণ্ডাদেশই দিলাম। ইত্যাদি!

কল্যাণ আদালত হইতে ফিরিয়া বাহিরের ঘরেই বসিয়াছিল অপর্ণার সম্মুখে যাইতে সাহস পায় নাই। রামফল আসিয়া একখানি পত্র দিয়া গেল। কল্যাণ শিরোনামা দেখিয়াই বুঝিতে পারিল ইহা তাহার পিতার পত্র! সে তাড়াতাড়ি সেখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। স্তব্ধ বিস্ময়ে সে শুধু চিঠিখানির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল! অনেকক্ষণ পরে যখন সে বারবার চেষ্টার পর পত্রখানি শেষ করিল তখন একটা অসহনীয় ক্রোধে তাহার সারা দেহ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

সে পত্রখানি পকেটের মধ্যে পুরিয়া টেবিলের উপর হইতে একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া পত্রের উত্তর লিখিতে বসিয়া গেল। সে লিখিল :—

দেখলাম, পরের প্ররোচনায় আপনার ন্যায় ধীর-ব্যক্তিকেও টলিয়েছে। ব্রাহ্মণ কুলের গুরু হতে পারেন কিন্তু সাংসারিক ভাত ডালের মধ্যে যদি তিনি মাথা ঢোকাতে আসেন ফল তার ভাল ত হয়ই না বরং পাওনা মানের কিছু বাদ সাদ যাওয়াই স্বাভাবিক!

চক্ষুলজ্জা জিনিষটা চিরকালই আমার কম। তাই অসঙ্কোচে আজও জানাতে কিন্তু বোধ করছি না যে, আশ্রয় সে আমার শোবার ঘরেই পেয়েছে। এটা যদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চোখে অশোভন বলে ঠেকে থাকে এবং তার বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করে আমায় পুত্র বলে স্বীকার করতে আপনি লজ্জাই যদি পান, তা হ'লে না হয় তাই করবেন। আর একটা কথাও আপনাকে জানিয়ে রাখছি,—আজ বিপন্ন জেনে যাকে আশ্রয় দিয়েছি দরকার যদি হয়, সে আশ্রয় চিরস্থায়ী করে তুলতেও আমি পেছ-পা হব না! কারণ মানুষ হয়ে জন্মাবার এটা একটা সবচেয়ে বড় গৌরব।

আপনার স্নেহের, শ্রীকল্যাণেন্দু।

পত্রখানি বারবার সে পড়িল। শেষের কয়েকটা লাইন পড়িতে গিয়া অকারণ তাহার কাণ দুইটা লাল হইয়া উঠিতেছিল। একবার কলম তুলিয়া সে কয়টা লাইন কাটিয়া দিতে গেল পরক্ষণে কি ভাবিয়া পত্রখানি খামের ভিতর পুরিয়া নিজেই ডাক-বাক্সে ফেলিয়া দিতে অটল চরণে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

তিন

পিতা পুত্রের এ নিদারুণ বৈষম্যের সংবাদ দেওয়ান রামরতন পান নাই! লাটের কিস্তি পরিশোধ মানসে তিনি মফঃস্বলে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। কাজেই প্রথমে যেদিন ফিরিয়া আসিয়া জগৎ বাবুর নূতন ইচ্ছা-পত্রের খসড়াখানি দেখিলেন সেদিন মুখ তাঁহার একেবারে ভাষা হারাইয়া ফেলিল!

জগৎবাবু এ বিষয় তাঁহার কোনও মতামত জিজ্ঞাসা মাত্র না করিয়া একেবারে স্পষ্ট ভাষায় আদেশ করিলেন, আচ্ছা আমি তোমাকেই করেছি তা দেখেছ? তাছাড়া প্রধান সাক্ষী তোমাকেই হতে হবে!

রামরতন ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, আজ্ঞে তা ত হবেই; তবে সামান্ত যদি কোন দোষই করে ফেলে থাকে হাজার হ'ক ছেলেমানুষ ত, ক্ষমা করাই ভাল!

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জগৎবাবু বলিলেন, সলা পরামর্শের সময় অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। কুলের বাইরে গিয়ে যে ছেলে দাঁড়িয়েছে সে ছেলেকে নিয়ে ঘর করা এ শর্ম্মার কাজ নয়।

রামরতন বেশ সম্ভ্রমের সহিত বলিলেন,

জীবনের চোদ্দআনা ভাগ বন্ধুর মত যার পরামর্শ নিতে লজ্জাবোধ করেন নি আজ হঠাৎ চোখ রাঙালেই বা সে তা শুনবে কেন হুজুর! স্পষ্ট প্রমাণ এর কিছু পেয়েছেন? নিজের চোখে দেখে—

তীব্রকণ্ঠে জগৎবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, প্রমাণ! প্রমাণ যথেষ্ট হয়ে গেছে দেওয়ান, শিরোমণিমশাই নিজের চোখে দেখে যা লিখেছেন—

বাধা দিয়া বেশ একটু জোরে আরামের একটা একটানা নিশ্বাস ছাড়িয়া রামরতন বলিলেন, আঃ, বাঁচালেন! তাই ত বলি আমার হাতে-গড়া কল্যাণ সে কি এমন কাজ করতে পারে!

উদাস দৃষ্টিতে দেওয়ানজির মুখের প্রতি চাহিয়া জগৎবাবু বলিলেন, শিরোমণি তাহ'লে তোমার মতে মিথ্যাবাদী?

না, অতটা আমি বলতে চাই না, তবে এটা ঠিক, তুচ্ছ জিনিষটাকে খুব বড় করে দেখতে তার জোড়া পাওয়া দুর্ঘট।

আর এ চিঠিখানা?

হাত পাতিয়া কল্যাণের পত্র মনিবের নিকট হইতে লইয়া রামরতন বেশ সুস্থির ভাবেই তাহা পাঠ করিলেন, তারপর প্রশান্ত-কণ্ঠে বলিলেন, এতে এমন কি প্রমাণ পেলেন?

জগৎবাবু মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, কিছু না!

দেওয়ানজি বলিলেন, আপনি ভুল বুঝবেন না হুজুর, এ পত্রে এমন কিছু নেই যা থেকে অত বড় একটা বিরাট পর্ব্বের প্রয়োজন হয়ে ওঠে। এ ত নিছক একটা অভিমান! এ আমি প্রমাণ করে দেবই।

সন্ধ্যাতারার মত জগৎবাবুর চোখ দুটী ছলছল করিতে লাগিল; খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, বেশ ভাল, কিন্তু একটা কথা স্বীকার কর, যদি তা না হয় আমার বন্দোবস্তের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না?

মৃদু হাসিয়া দেওয়ানজি বলিলেন, আপনার আদেশ কবে এ অধম না মাথা পেতে নিয়েছে, হুজুর, যদি তাই হয়— আপনার কথাই থাকবে!

দেওয়ানজি ঘরের বাহিরে আসিতেই কোথা হইতে সলিলা আসিয়া বলিল, বাবা মিছিমিছি মাথা গরম করে বসে আছেন কাকাবাবু, আমি জানি আমার ভাই কখনও অত ছোট হতে পারে না, সে নির্দ্দোষ!

মৃদু হাসিয়া দেওয়ানজি বলিলেন, আমি ও তা জানি মা, আর সেইটেই সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তাদের নাক-নাড়াটা বন্ধ করে দিতে আজিই কলকাতায় যাচ্ছি!

যত জোরের সহিত উচ্চারণ করিয়া তিনি যাত্রাপথে পা বাড়াইলেন, ফিরিবার মুখে কিন্তু ঠিক ততটা জোর আর তাঁহার রহিল না! কলিকাতায় আসিয়া তিনি দেখিলেন, শিরোমণি মহাশয়েরই সেখানে একাধিপত্য! চাকর লোকজন কতক নিজের কথায় কতক শিরোমণির উপদেশে যাহা বলিল তাহা কল্যাণের পক্ষে আদৌ মঙ্গলজনক নহে! দেওয়ানজি বুঝিলেন তাহাকে প্রতারিত করিবার কল্পনা বহু পূর্ব্ব হইতেই এস্থানে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। বুঝিলেও বিরুদ্ধে মুখ ফুটিয়া বলিবার মত তিনি কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না। এ ক্ষেত্রে নিজের নির্দ্দোষিতার প্রমাণ যে দিতে পারিত একমাত্র সেই কল্যাণ নিজের ভবিষ্যতের পথে যেন ইচ্ছা করিয়াই কাঁটা দিতে অপর্ণাকে লইয়া তাহার পিতার নিকট চলিয়া গিয়াছে।

তাহার এই কার্য্যটীতেই বেশ একটু রসান চড়াইয়া দিয়া শিরোমণি বলিলেন, দেখলে তো ছোঁড়ার মাথাটা কতদূর বিগড়েছে, অসুখ গেলাস মত চোখ কান বুজে পরীক্ষাটা দিয়েই ছুঁড়ীটাকে নিয়ে একেবারে উধাও, জানে একজন না একজন

কেউ দেশ থেকে আসবেই হাতে হাতে ধরা পড়ার চেয়ে—

দেওয়ানজি কিন্তু ইহাতে ঠিক সায় দিতে পারিতেছিলেন না, বাধা দিয়া বলিলেন, কিন্তু ঠাকুরমশাই, থাকার চেয়ে যাওয়াটাই যে তাকে বেশী অপরাধী করে তুলতে পারে একথাটাও ত সে ভাবতে পারত ?

এক টীপ নস্য নাকে গুঁজিয়া রঘুনাথ শিরোমণি বলিলেন, আরে তা কি হয়, হাজার হ'ক কচি মাথার অপক্ক বুদ্ধি ত, তোমার আমার মত আগা-পাছা ভেবে কি কাজ করতে পারে ?

উত্তরে দেওয়ান বিশেষ কিছুই বলিলেন না। দেশে ফিরিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বে প্রভুপুত্রের ভবিষ্যৎ জীবন নিজের হাতেই হত্যা করিবার উদ্যোগে তিনি রত হইলেন।

সলিলার নামে দলিল রেজেষ্টি হইয়া গেল। সলিলা কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল, বাবা, কাকাবাবু এ কি করলেন আপনারা ?

দেওয়ানজি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। জগৎবাবুর কণ্ঠটাও বুঝি ধরিয়া আসিয়াছিল, কোন রকমে জোর করিয়াই তিনি তাহাতে সাড়া আনিয়া বলিলেন, ভুল কিছুই করি নি মা, আমি আমার মেয়েকে চিনি।

সলিলা মেঘভাঙা হাসি হাসিয়া বলিল তার আগে ছেলেকে চিনে ফেলা কিন্তু উচিৎ ছিল বাবা! জগৎবাবু কথা কহিলেন না। সলিলা পুনরায় বলিল, আমার একটা কথা রাখবেন বাবা ?

জগৎবাবু মুখ তুলিয়া কন্যার দিকে চাহিলেন ! সলিলা বলিতে লাগিল, উইলের এ কাণ্ড কারখানার কথা এইখানেই শেষ হয়ে যাক। তাতে লাভ ?

লাভ লোকসান জানি না বাবা, জানতে চাইও না, কিন্তু মেয়ের কথা আপনাকে রাখতেই হবে। যে মেয়েকে বিশ্বাস করে ছেলের পাওনা বিষয় ছেড়ে দিতে পেরেছেন তাকে এইটুকু হুকুম দেওয়াই কি এত ভার বোঝা হবে ?

জগৎবাবু হাসিতে চাহিয়া বলিলেন, তাই হবে মা, তোমার যা ইচ্ছে হবে তাতে কি আমি বাধা দিতে পারি !

ইহারই অল্প কয়েক দিন পরেই কিন্তু একদিন নিয়তির আহ্বানে জগৎবাবুকে সাড়া দিতে হইল ! কল্যাণ তখনও ফিরে নাই।

নিভৃতে পিতার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া সলিলা বলিল, এ সময় আর তার ওপর রাগ নিয়ে যাবেন না বাবা ?

মধুর স্বর্গীয় হাসিতে অধর রঞ্জিত করিয়া জগৎবাবু বলিলেন, পাগল হয়েছিস্ মা, বাপ হয়ে কি সন্তানের ওপর রাগ রাখতে পারে ?

উৎসাহিত কণ্ঠে সলিলা বলিল, তবে, তবে বাবা ও ছাইয়ের উইল ছিঁড়ে ফেলে দি !

জগৎবাবু আবার হাসিলেন, বলিলেন, না মা, সমাজের মুখ চেয়ে ওটা আমায় রেখে যেতেই হবে! বুক ছিঁড়ে পড়ছে কিন্তু উপায় নেই।

সলিলা খানিক চুপ করিয়া বসিয়া জগৎবাবুর পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল, তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিল, তবে তাই হ'ক বাবা, বাইরের উইলের অর্থ আমি জেনে নিয়েছি, আশীর্ব্বাদ করুন আপনার অন্তরের উইলের কাজ যেন আমি করতে পারি !

জগৎবাবু কথা বলিলেন না, বড় বড় কয়েক ফোঁটা অশ্রু তাহার চোখের কোণ হইতে গড়াইয়া আসিয়া শয্যাতল সিক্ত করিয়া তুলিল !

(ক্রমশঃ)

সুষমা

শ্রীমতী বিদ্যুৎলতা দেবী

(১)



অনাদি রেল-কোম্পানীর সামান্য একজন কর্ম্মচারী। একটি ছোট ষ্টেশনে সম্প্রতি বদলি হইয়াছে। যেদিন সুষমাকে সঙ্গে লইয়া নূতন কর্ম্মস্থলে আসিয়া সে পৌঁছিল, সেদিন ছোট ষ্টেশনটীতে রীতিমত একটা সাড়া পড়িয়া গেল। এই ত সামান্য চাকুরী করে, তাহার স্ত্রীর আবার এই সাজসজ্জা, এই চালচলন! কিন্তু অন্তর যদি তাহাদের নিম্নগামী না হইত তাহা হইলে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই ছিল না। সুষমার পরণে ছিল মোটা খদ্দরের একখানি সাড়ী, এবং খদ্দরেরই একটী সেমিজ ও ব্লাউস। দুই হাতে পাঁচগাছি করিয়া সরু সোনার চুড়ি, আর শাঁখা ও নোয়া; গলায় সরু একগাছি বিছা হার। এবং সিঁথায় সিঁদুরের মোটা রেখা। সবল পুষ্ট সুগঠিত ঋজু দেহে এই জামা কাপড়, যৎকিঞ্চিৎ অলঙ্কার এবং সিন্দুর রেখাটী পর্য্যন্ত অতি সুন্দর মানাইয়াছিল।

মাথায় তাহার অবগুণ্ঠন ছিল, কিন্তু তাহাতে কপাল বা মুখ ঢাকা পড়ে নাই। কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া সে বেশ সপ্রতিভভাবে কুলীর মাথায় জিনিষগুলি সাজাইয়া তুলিয়া দিতেছিল। অনাদির দুইজন সহকর্ম্মী হরেন আর ফটিক সুষমার চরিত্রের উপর কটাক্ষ করিয়া অন্যান্য কর্ম্মচারীদের শুনাইয়া কি যেন বলাবলি করিতে লাগিল।

বাড়ীখানি নিতান্ত ছোট,—ছোট চাকুরের বাড়ী এই রকম ছোটই হইয়া থাকে! দুইখানি শয়নের ঘর,—আয়তন,—যত ছোট হওয়া সম্ভব—তাহাদের একখানিকে প্রয়োজন হইলে বাহিরের ঘরও করিয়া লওয়া যায়। তাহা ছাড়া একটী রান্নাঘর একটী বারান্দাও আছে। অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নাই! অতি অল্পক্ষণের মধ্যে সুষমা পরিপাটি করিয়া সংসার সাজাইয়া বসিল। বাড়ীখানি ছোট হইলেও আলো বাতাসের কোন অভাব ছিল না, চারিদিকেই খোলা। আশে পাশে কোন বাড়ী নাই। অল্প খানিক দূরে অন্যান্য রেল-কর্ম্মচারীদের একই ধরণের ছোট খাট বাড়ী।

সুষমা পরদিনই অন্য বাড়ীর মেয়েদের সহিত দেখা করিতে গেল কিন্তু সেই সব ভগ্নস্বাস্থ্য নষ্টশ্রী ক্ষীণদেহা অপরিচ্ছন্না নারীরা তাহাকে সহ্য করিতে পারিল না, সকলেই তাহাকে কেমন যেন দূরে দূরে রাখিল। সুষমা বুঝিল, তাহারা তাহার সঙ্গ চাহে না। সে দুই একটি কথা বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বগৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহারাও তাহার সম্বন্ধে তাহাদের কদর্য্য রুচি অনুযায়ীই মন্তব্য প্রকাশ করিল।

(২)

তারপর একমাস অতীত হইয়া গিয়াছে। সুষমা এখানে প্রায় একঘরে হইয়াই আছে অন্যান্য বাড়ীর মেয়েরা তাহার সহিত মিশিতে চাহে না, সেও উপযাচিকা হইয়া কাহারও সহিত মিশিতে যায় না। এমনই সময় একদিন অনাদির বাল্যবন্ধু বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। সে

সকালের গাড়ীতে আসিয়া পৌছিল, সেইদিনের বিকালের গাড়ীতেই অনাদিকে কি কাজে দিন পাঁচেকের জন্ম অন্যত্র যাইতে হইল অনাদিকে মাঝে মাঝে এমনই ভাবে বাহিরে যাইতে হইত। একজন ঠিকা ঝি ছিল, সে-কয়দিন সে সুষমার নিকট থাকিত।

বিমানও বিকালের গাড়ীতে ফিরিতে চাহিলে সুষমা কহিল, "না না আপনার কিছুতেই যাওয়া হবে না। দুদিন থাকবেন বলে এসেছেন, দুদিন থেকে যেতে হবে।"

অনাদি কহিল, "তা ত থাকবেই। ওকে যেতে দিচ্ছে কে। তোমার সঙ্গে আলাপ করতেই এসেছে আর চলে যাবে।"

অগত্যা বিমানকে থাকিতে হইল।

ঝি নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, সে মুখ ফিরাইয়া হাসিল। রাত্রে ঝি কহিল, "আজ ত লোক আছে আমি ঘরে যাই মা?"

সুষমা মুহূর্ত্ত কি ভাবিল, তারপর কহিল, "বাড়ী যাবি বই কি। আজ ত একলা থাকতে হবে না উনি ত বাইরের ঘরে রইলেন।"

ঝি হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ, ও ত একঘর বল্‌লেই হয়, তা হলে আমি এখন চল্‌লুম মা। তুমি শুতে যাও।"

কথাটার অনেক শাখা প্রশাখা বাহির হইয়া পড়িল! ছোট ষ্টেশনটীতে আবার একটা বড় রকমের সাড়া পড়িয়া গেল।

হরেন আস্ফালন করিয়া বলিল, "দেখলে আমার কথা ঠিক কিনা। প্রথম দিন দেখেই আমি বলেছি ও বিয়ে-করা স্ত্রী নয়, মোটা করে সিঁদুর পর যাই কর, ও কি লুকোবার জো!"

ফটিক কহিল, "আমিও ঐ রকম আঁচ করে-ছিলাম। চোখ থাকলেই দেখতে পাওয়া যায়। অনাদির পছন্দ আছে স্বীকার করতে হবে কিন্তু ওর সাহসকে বলিহারী যাই!"

হরেন কহিল, "এখন আর এতে বাহাদুরী করবার বড় কিছু নেই, এ ব্যাপারটা এখন চল হয়ে এসেছে। ভদ্রগৃহস্থের মত থাকে, কোন উপদ্রব নেই, মাঝে মাঝে দুই একজন বন্ধুবান্ধব আসে এই পর্য্যন্ত।"

ফটিক চাপা গলায় কহিল "আমরাও ত বন্ধুর দলে, চল একদিন আলাপ পরিচয় করে আসা যাক কি বল হে?"

হরেন উৎসাহ-ভরে কহিল, "তা ত যেতেই হবে। অনেকদিন আগেই যেতুম, পাছে পাঁচজনে কি বলে তাই যাই নি, এখন ত আর কোন বাধা নেই।"

বাড়ী যাইতেই হরেনের স্ত্রী বলিল, "ও ছুঁড়ি টাকে এখান থেকে তাড়াতে হবে।"

হরেন হাসিয়া কহিল, "তোমার কাছেও খবরটা পৌঁছে গেছে দেখছি, কিন্তু অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, আমাদের উৎপাতে ও আপনি পালাতে পথ পাবে না।"

হরেনের স্ত্রী কহিল, "সে আমি অনেকক্ষণ বুঝেছি, ছি ছি এ স্বভাবটা তোমার কিছুতেই গেল না; তোমার জন্তেই ওকে আগে তাড়ান দরকার।"

হরেন কহিল, "আমি মদ খাই, না, তোমার অযত্ন করি যে তুমি আমার দোষ দিচ্ছ?"

কথাটা সত্য, তাই পত্নী এ সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ করিতে পারিল না। অথচ জোর করিয়া বলিতেও পারিল না, তোমাকে এ স্বভাব ছাড়িতেই হইবে।

(৩)

দুই রাত্রি বন্ধুগৃহে কাটাইয়া বিমান চলিয়া গেল। অনাদির ফিরিতে আরও তিন দিন বিলম্ব। সেই দিন রাত্রি আটটার পরই হরেন ও ফটিক অনাদির গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোট পল্লী, তখনই চারিদিক বেশ নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। গৃহদ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, তাহার

উপর মৃদু করাঘাত করিয়া হরেন ডাকিল, "দোরটা একবার খোল।"

সুষমা তাড়াতাড়ি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। হরেন ও ফটিক সানন্দে ভিতরে প্রবেশ করিল।

হরেন হাসিয়া কহিল, "তুমি একলা রয়েছ তাই খোঁজ নিতে এলুম।"

সুষমা তাহাদের দেখিয়াই চিনিল, নমস্কার করিয়া কহিল, "সেটা আপনাদের অনুগ্রহ। সত্যি আমি আজ একাই আছি। ঝির বাড়ীতে কার অসুখ, সে থাকতে পারলে না। তবে একা থাকা আমার অভ্যেস হয়ে গেছে ওতে আমি ভয়টয় পাই না। জানি দরজা না ভেঙ্গে ত আর কেউ ভেতরে ঢুকতে পারবে না, ততক্ষণে আমি নিজের রক্ষার ব্যবস্থা নিজেই করে নিতে পারব।"

হরেন কহিল, "সে সব করবার কোন দরকার হবে না, তুমি হুকুম করলে সারা রাত আমরা এখানে কাটিয়ে দিতে পারি।"

সুষমা কহিল, "আপনাদের মিছিমিছি আমি কষ্ট দিতে চাই না?"

ফটিক হাসিয়া কহিল, "সে কষ্ট সহ্য করবার জন্যই ত আমরা এসেছি।"—বলিয়াই সে সুষমার কাঁধের উপর হাত রাখিল।

সুষমা দুই পা পিছাইয়া গিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "কি চাও তোমরা?"

ফটিক কহিল, "চটছ কেন, আমরা তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এসেছি।"

হরেন অগ্রসর হইয়া গিয়া সহসা তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "এই তোমাকেই চাই। কেন আর ছলনা করছ।"

সুষমা এক ঝট্‌কা মারিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া তাহার গলা ধরিয়া এক ধাক্কা মারিতেই সে দেওয়ালের উপর গিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

"আহা কর কি—কর কি!" বলিয়া ফটিক বাহুবন্ধনীর মধ্যে সুষমাকে আবদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেই সুষমা তাহার নাকের উপর এক ঘুঁসি বসাইয়া দিল। বাপ্‌ বলিয়া ফটিক নাক চাপিয়া ধরিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। তাহার হাতের ফাঁক দিয়া ঝরঝর করিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সুষমার ভিতর কোন উত্তেজনা দেখা গেল না, সে শান্তকণ্ঠে কহিল, "এইবার বাড়ী যাও। এটা তোমাদের আগেই বোঝা উচিৎ ছিল, তোমাদের মত পাঁচ সাতটা জানওয়ারকে পদ-দলিত করবার মত শক্তি না রাখলে আমি একলা এ বাড়ীতে থাকতে পারতুম না। এর পর থেকে পরের স্ত্রীকে সম্মান করতে শিখ! মেয়ে মানুষকে অত দুর্ব্বল অত অসহায় মনে কর না। বাড়ী যাও গিয়ে ভদ্র হবার চেষ্টা কর।"

হরেন ও ফটিক নিঃশব্দে নতমুখে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল এবং সুষমা অগ্রসর হইয়া আসিয়া ভিতর হইতে খিল বন্ধ করিয়া দিল।



আপন-পর

শ্রীবগলারঞ্জন ভট্টাচার্য্য



এক

এমন কিছু দূর নহে—মা'র পেটের বোন, তাহার ছেলে। চাকরও ত একটা রাখিতে হইত। দুইটা বেশী খায়? তাহা খাউক। কাজও ত কম পাওয়া যায় না। বাজার করা হইতে বাসন মাজা—মায় রান্না পর্য্যন্ত। যাহা হউক শিবনাথ ইহা ন্যায্য খরচ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু বিপদ বাধিল গিন্নীকে লইয়া। তাঁহার কেবলই মনে হইত, বুঝি ঠকিতেছি। ইহা অপেক্ষা মাহিনা দিয়া লোক রাখা অনেক ভাল। হুকুমের চাকর—আব্দারের বালাই নাই। তাহার উপর অসুখ ত লাগিয়াই আছে!—পেটজোড়া প্লীহা! 'পারছি না' বলিলেই হইল।

গিন্নীর আগুন বারণ,—অম্বলের ব্যায়রাম। সময় সময় শিবনাথকেই উনুন ঠেলিতে হয়। হারাধন বার বৎসরের ছেলে। জ্বরে ধোঁকে আর মুখ লুকাইয়া কাঁদে। বলে, তুমি যাও মামা,—আমি যা পারি দুটো রেঁধে দিচ্ছি। মামা তাহার অশ্রু-সজল চোখ দেখিয়া, উনুনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি দেখেন আর বলেন, যা যা তুই শুগে যা।

হারাধন ঐ ত অতটুকু ছেলে! বাসন মাজিয়া, বাজার করিয়া, উনুন ধরাইতেই তাহার ১টা বাজিয়া যাইত। তাহার পর সকলকে খাওয়াইয়া নিজে যখন খাইতে বসিত, তখন প্রায় ২টা। তবু কেহ 'আহা' বলিতে নাই! পড়াশুনা তাহার মা মরিবার সঙ্গে সঙ্গেই চুকিয়া গিয়াছে। মামী বলিলেন, লেখাপড়া শিখে হবে কি? বি,এ, এম-এ পাশ করতেও পারবে না, আর সে পড়াবার ক্ষমতাও আমাদের নেই। তার চেয়ে সংসারের কাজকর্ম দেখুক, তোমার কাছ থেকে ব্যবসাটা একটু শিখুক—তোমরাই বা ক'টা পাশ করেছ? তবু ত বলতে নেই—

বলিতে আর হইল না। শিবনাথ সমস্তই বুঝিলেন। শিবনাথের ছিল তেজারতি ব্যবসা। সুদের সুদ কষিয়া বেশ দুই পয়সা করিয়াছেন। লোকের সহিত না, বলিত, 'ব্যাটা চামার।' শিবনাথ বলিতেন, 'যে দিন কাল পড়েছে, লোকের ভাল করতে নেই। বিপদ আপদে আমারই কাছে হাত পাতবে—আবার আমাকেই গালাগাল।' কিন্তু শিবনাথের ভাল করিবার সদিচ্ছা লোকের গালাগালিতে এতটুকু কমিল না! সকাল বেলায় সেই ছোট্ট একখানি আটহাতি কাপড় পরিয়া শিবনাথ বাহিরের ঘরে আসিয়া, বোধ করি

বিপদের ডাক শুনিবার প্রতীক্ষাতেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিতেন।

সুখে দুঃখে দিন এক রকম চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু মুস্কিল হইল, হারাধন আবার জ্বরে পড়িল। শিবনাথকে বাহিরের ঘরেও একবার বসিতে হয়। একলা নহেন—যে দুইটা চিঁড়া-মুড়ি হইলেই চলিবে। একটা ছেলেও আছে। সুতরাং শিবনাথ একবার রান্নাঘর একবার বাহিরের ঘর ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বাসন মাজিবার জন্য একটি ঠিকা ঝি রাখিতে হইল। তাহা হউক,—কতই আর যাইবে? গিন্নী বলিলেন, আর কেন গো, এবার একটা বামুন রাখ। ও ঠাটের জ্বর ত কমবে না,—কেন নিজের শরীর নষ্ট করছ?

'দেখি যা হয়' বলিয়া শিবনাথ জোরে জোরে উনুনে ফুঁ দিতে লাগিলেন।

সাত দিনের দিন হারাধনের জ্বর ছাড়িল। কবিরাজ এক পাঁচন লিখিয়া দিয়া, অন্ন-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। শিবনাথ সেদিন আর বাহিরের ঘরে বসিলেন না। সকাল সকাল হারাধনকে খাওয়াইয়া দিলেন—রোগী মানুষ। তাহার পর তাহার কাণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া বলিলেন, তোর জামা টামা আছে ত রে? খালি গায়ে থাকিস নে—বুঝলি?

রোগ আর রোগী কেহ সহিতে পারে না। অল্প বয়স হইলেও হারাধন একথা জানিত। আর একটা কথা খুব বেশী করিয়া জানিত, তাহার মা নাই। যাহা হউক যথানিয়মে আবার সে কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। আর না করিয়াও উপায় ছিল না। কারণ, পরের দিনই সে দেখিতে পাইল, ঝি আসে নাই। ইহার কারণও তাহার নিকট দিনের আলোর মতই স্পষ্ট।

হারাধনের বুদ্ধি যে এমন বেশী কিছু ছিল তাহা নহে। তবে বুঝিতে না পারিলেও, বুঝাইয়া দিবার লোকের অভাব ছিল না। ক্রমে মামীমা, মামাবাবু,—এই বাড়ীর ছোটখাট জীবটি পর্য্যন্ত তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

দুই

"হারাদা ভাত দাও।"

"দাঁড়া ভাই আর একটু।—দশটা ত বাজে নি।"

"হাঁ, বাজে নি? তুমি ভারী জান! জান ঘড়ি দেখতে?"

গিন্নী নিকটেই ছিলেন। বলিলেন, কি হয়েছে মণি?

ছেলের নাম নীলমণি। মণি তাহার আদরের ডাক।

মণি বলিল, এখনও ভাত হয় নি মা! ইস্কুল গিয়ে আর কাজ নেই।

"তা হবে কেন, বেলা ৮টা পর্য্যন্ত বাবুর ঘুম ভাঙ্গে না! ঐ জন্যেই ত আমি আনতে চাই নি। বলে মান থাকবে না! মামার বাড়ীতে আর কেউ থাকে না কিনা।"

হারাধন অপ্রতিভ হইয়া বলিল, আর ত দেরী নেই মামীমা।

মামীমা আর কিছু না বলিয়া, উনুনের ধারে যাইয়া বসিলেন। হারাধন অপরাধীর মত দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু ব্যাপারটার ঐখানেই পরিসমাপ্তি হইল না। সেই দিনই বৈকালে গিন্নীর মাথা ধরিয়া কাঠ-বমি সুরু হইল। ডাক্তার কবিরাজে বাড়ী সরগরম করিয়া তুলিলেন। হারাধন চোরের মত শিবনাথের পাশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইল; শিবনাথ কোন কথা বলিলেন না। নিশ্বাস ফেলিয়া হারাধন রান্নাঘরে আসিয়া বসিল।

যাহা হউক গিন্নী সারিয়াও উঠিলেন,—কিন্তু হারাধন শিবনাথের পূর্ব্বস্নেহ আর ফিরিয়া পাইল না।

ঠিক এমনি একদিন রবিবারে—ইস্কুলের তাড়া নাই দেখিয়া, হারাধন তাহার তেলচিটা কাপড়-

খানি তাড়াতাড়ি সাবান দিয়া লইতেছিল। নীলমণি এক নজর দেখিয়া লইয়া তাহার নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। দেখিল, তাহারই সাবানের শ্রাদ্ধ হইতেছে! নীলমণির গলা ছিল খুব তীক্ষ্ণ। এই তীক্ষ্ণতা বিষয়ে সে তাহার মাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল। শিবনাথ বলিতেন, মায়ের দুধ খেয়েছে বটে।

নীলমণি গর্জ্জন করিয়া উঠিল—আজ রান্না হবে না হারাদা?

হারাধন এই শিশু গর্জ্জনকেও ভয় করিত। কারণ বয়সে শিশু হইলেও নীলমণি এই বাড়ীরই একজন। তাই নীলমণি যাহা বলে, হারাধন তাহা আদেশ মনে করিয়াই প্রতিপালন করে। কিন্তু আজ সে আর সহিতে পারিল না। মনে করিল, এ না তাহার ছোট ভাই! ফস্ করিয়া—আজ সে প্রথম, এই শিশুর কাছেই মুখ খুলিল, বলিল, আমাকে দাদা বল কেন মণি?

মণি এই রকম উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তবু মাথা তুলিয়াই বলিল, তবে কি বলতে হবে?

"সে তুমিই ঠিক ক'রো। দাদা বলে দাদা নামটার আপমান নাই করলে।"

বাড়ীময় একটা হৈ হৈ পড়িয়া গেল। হারাধনের মুখ খুলিয়াছে! গিন্নী বলিলেন, হবে না?—কর্ত্তার আদরে আরও কত হবে! শিবনাথ সমস্তই শুনিলেন এবং বেশী করিয়া শুনিলেন। বলিলেন, হুঁ।

নীলমণি হারাধনের উপর কোন দিনই সন্তুষ্ট ছিল না। তাহার প্রথম কারণ হারাধন তাহার অপেক্ষা এক বৎসরের বড়। সকল প্রকারে বড় হইয়াও, মাত্র এই পরাজয়ের গ্লানি তাহার বুকে কাঁটার মত খচখচ করিয়া বিঁধিত। তাহার পর বড় হইয়া একদিন বুঝিতে পারিল, না-পরে জন্মানটাই গ্লানির নহে।—ইস্কুলের চাকরটা তাহার অনেক পূর্ব্বে জন্মিয়াছে। আরও বুঝিতে পারিল, হারাধন এ বাড়ীর অন্নদাস মাত্র। সুতরাং—

এই সুতরাং এর মীমাংসা একদিন সে নিজেই করিয়া লইল। হারাধনকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, বন্ধুবান্ধব কেউ এলে, তাদের সামনে চেঁচামেচি করে তার নাম ধরে যেন সে না ডাকে।

হারাধন বলিল, কেন?

'সে তুমি বুঝবে না' বলিয়াই নীলমণি চটি পায়ে দিয়া চট্‌চট্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু হারাধন সত্য সত্যই একদিন সকলকে বিস্মিত করিয়া দিল—এক বাড়ী লোকের সম্মুখে নীলমণিকে 'বাবু' বলিয়া ডাকিয়া! নীলমণি খুব একটা প্রতিশোধ লইয়াছে মনে করিয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইতে লাগিল। চটিলেন শুধু শিবনাথ। বলিলেন, কি বল্লি হারামজাদা?

হারামজাদার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। এমন সাহস হইল না, তাহার মামার সম্মুখে আর একবার সে ঐ কথার পুনরুক্তি করে। অত্যাচারকে অত্যাচার বলিয়াই সে প্রতিবাদ করিতে চায়, কিন্তু—ঐ কিন্তুর সঙ্কোচ হারাধনের কোনদিন আর গেল না।

শিবনাথ দুঃখ করিয়া বলিলেন, বিন্দুর ছেলে যে এমন হবে তা জান্‌তাম না।

গিন্নী আসিয়া শিবনাথের পা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, কি ক'রে জানবে বল,—সে ছিল মাটীর মানুষ। মুখ্যু হ'য়ে থাক্‌লো—দেখ না, চেহারার ছিরি দেখ না!—কে বল্‌বে ভদ্রলোকের ছেলে। ঐ ত আমার নীলমণিও রয়েছে।

শিবনাথ কথা বলেন খুব অল্প। আজও বলিলেন না। উত্তরে শুধু একটা 'হুঁ' বলিয়া ধীরে ধীরে বাহিরের ঘরে গিয়া বসিলেন।

তিন

হঠাৎ বাড়ীতে একটা হলুস্থুল পড়িয়া গেল

শিবনাথের ক্যাশবাক্সে কুড়িটা টাকা ছিল—তাহা না কি আর পাওয়া যাইতেছে না!

শিবনাথ বলিলেন, কুড়িটা টাকা এমন কিছু নয়। কিন্তু টাকা লক্ষ্মী,—এ যে অকল্যাণ!

নীলমণি ছিল পড়ার ঘরে। তখন সে জোরে জোরে পাঠ সুরু করিয়াছিল—

"নাহি চায় রাজ্যপদ নাহি চায় ধন।
স্বর্গের সমান দেখে বন উপবন॥"

শিবনাথ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, রাখ তোর পড়া—আজ পিঠের ছাল তুলব।

গিন্নী ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, কি! অমন্ প্রবৃত্তি হবে আমার ছেলের? কত পয়সা আমার এখানে সেখানে প'ড়ে থাকে। চোখের মাথা খেয়েছ? ঘরে যে চোর পুষে রেখেছ, দেখ্‌তে পাও না?

শিবনাথ সুদের সুদ্ বাহির করিতেন। একটি পয়সা তাঁহার রাজত্ব!

ডাকিলেন, হারা!

হারাধন কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

'নীলু'!—ডাক্ ত নহে, যেন হুঙ্কার! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে আর একটা ডাক আসিল, নীলু!

নীলমণি চেঁচাইয়া বাড়ী মাৎ করিল,—মামাবাবু এসেছেন, মামাবাবু এসেছেন।

এমন কেহ নহে—মামা। কিন্তু এই একটি লোকের নাম শুনিবামাত্র, বাড়ীখানা যেন মন্ত্রের মত স্তব্ধ হইয়া গেল। মাতঙ্গিনী—শিবনাথের স্ত্রী, কাহাকেও কিছু না বলিয়া তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। তাঁহার পরণে ছিল আধ্-ময়লা একখানি কাপড় সেইটা পাল্টাইয়া আসিয়া, বড়লোক ভায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন।

সুধা ত হাসিয়াই অস্থির। বলিল, পিসীমা—তুমি ব'সো, নইলে প'ড়ে যাবে।

মুস্কিল হইল সুধার মায়ের। তিনি হাসিতেও পারেন না, পলাইতেও পারেন না।

মোটা এমন বেশী কিছু নহে। তবে ছোট-খাট আড়াই হাতের মানুষ বলিয়া, ওসারটাই প্রথম নজরে পড়ে।

মাতঙ্গিনী কিছু বলিবার পূর্ব্বেই অনুকূলবাবু বলিলেন, এলাম একবার তোকে দেখ্‌তে—অসুখ অসুখ শুন্‌ছি।

আবার হাসি। হাসিতে হাসিতে সুধা নীলমণির পড়ার ঘরে গিয়া ঢুকিল।

অনুকূলবাবু যাহাই বলুন, শিবনাথ এই ম্যালেরিয়াভীরু লোকটিকে ভাল করিয়া জানিতেন। বলিলেন, দার্জ্জিলিং যাবার কি এই পথ?

অনুকূলবাবু প্রবল হাসিতে কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, মাতু, এবার চায়ের চেষ্টা কর্ দেখি। চা আমার সঙ্গেই আছে।

"হারা!"

অনুকূলবাবু বলিলেন, বামুন-ঠাকুর বুঝি? বাঃ বেশ ছোট্টখাট্ট ফুট্ ফুটে ছেলে ত!

শিবনাথ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, না না—ও আমার বোনের ছেলে। তোমার ভগ্নীর আবার আগুন সয় না,—তাই, ঐ সব কর্‌ছে।

'যাও ত বাবা, তোমার মামাবাবুর জন্যে একটু চা তৈরি ক'রে আন ত' বলিয়া মাতঙ্গিনী চায়ের কেট্‌লিটা তাহার হাতে তুলিয়া দিলেন।

অনুকূলবাবু একদৃষ্টে ছেলেটির কাতর-মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন।

হারাধন চলিয়া যাইতেই মাতঙ্গিনী নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। বলিলেন, পোড়াদেশে একটা লোক পাবার উপায় নেই! ছেলেমানুষ,—আমারও পোড়া কপাল!

অনুকূলবাবু কিছু না বলিয়া, জিনিসপত্র একটি একটি করিয়া ঘরে তুলিতে লাগিলেন। শিবনাথবাবু হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন। বলিলেন,

তুমি কেন, তুমি কেন! মনে মনে বিরক্তও হইয়াছিলেন। চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, হারা।

অনুকূলবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তোমার হারা ত আর চতুর্ভুজ নয়। সে যে চা তৈরি করছে।

শিবনাথবাবুও চেষ্টা করিয়া জোরে জোরে হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, তাই ত বটে!—আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। বেশ ত তাড়া কেন?—হবে এখন।

তাতে আর হয়েছে কি? কি এমন শক্ত কাজ! এসো না, দুজনেই না হয় হাতে হাতে তুলে ফেলি।' বলিয়া অনুকূলবাবু শিবনাথকে কথা বলিবার অবসর না দিয়াই তাঁহাকে কাজে লাগাইয়া লইলেন।

সুধা ইহার মধ্যেই সমস্ত বাড়ীখানার কোথায় কি আছে একবার দেখিয়া লইয়া আসিয়া, সোজা রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল। দেখিল, কোথাও কেহ নাই!—একটা ফুটফুটে ছেলে উনুনের ধারে বসিয়া!—তাহার বুকটা অপেক্ষা পেটটা মোটা! বলিল, তুমি বুঝি বামুনঠাকুর? অমন করে বসে কেন? ও,—চা তৈরি করতে জান না বুঝি? ও—মা! মা! দেখে যাও!

মাও আসিলেন, সঙ্গে পিসীও। সুধার হাসি থামে না! বলিল, পিসীমার বামুন-ঠাকুরটি বেশ!—চা তৈরি করতে জানে না!

মাতঙ্গিনী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন;—হারাম- ! কেট্‌লি হাতে ক'রে নেবার সময় সে কথা মনে ছিল না, চা তৈরি করতে জান না?

সুধার হাসি কোথায় মিলাইয়া গেল!—যেন জল-ভরা মেঘ। ছি, ছি—সেই ত ডাকিয়া আনিয়া এমনটা করিল! বলিল, ওঠো ঠাকুর! আমি চা করে নিচ্ছি।

হারাধন উনুনের ধারে তেমনই মুখ গুঁ বসিয়া রহিল।

'ঠাকুর কি লো! ও যে নীলুর পিসীর ছেলে' বলিয়া সুধার মা হাসিলেন।

সুধা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তাই না কি!—তা হোক, আমি তোমাকে ঠাকুরই বল্‌ব—কেমন?

হারাধনের চোখ ছলছল্ করিয়া উঠিল। সে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিল

চার

গ্রীষ্মের সময় অনুকূলবাবু প্রতিবারই একবার করিয়া সপরিবারে দার্জ্জিলিং হইতে ঘুরিয়া আসিতেন। এবারও তাহাই মনে করিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু বাহির হইয়াই তাঁহার খেয়াল হইল, দিন পাঁচ ছয় মাতুর এই খানেই কাটাইয়া যাইবেন। সেই কবে একবার আসিয়াছিলেন—নীলুর অন্নপ্রাশনের সময়। তাহার পর এই। সেবারও আসিয়া ম্যালেরিয়ার ভয়ে তিন দিনের বেশী থাকেন নাই। কিন্তু এবার উঠি-উঠি করিয়াও পনের দিন কাটাইয়া দিলেন! আশ্চর্য্য এমন কিছুই নহে। বয়স হইলেই গতি মন্থর হইয়া আসে।

সুধার মা আসিয়া বলিলেন, আর দার্জ্জিলিং গিয়ে কায নেই— কি বল? তোমারও ত বয়স হচ্ছে, একবার এখানে একবার সেখানে,— পেরে উঠবে কেন?

অনুকূলবাবু খুসী হইলেন। বলিলেন, এই যা বলেছ আসল কথা। আর এখানে মন্দই বা আছি কি; মাতু বেশ যত্ন করছে।

"নামের বেলায় মাতু! যত্ন করছে বল—হারাধন?"

'তা সত্যি।' বলিয়া অনুকূলবাবু বড় রকমের একটি নিশ্বাস ফেলিলেন। সুধা কোথা হইতে হারাধনকে টানিতে টানিতে লইয়া আসিল বলিল, বাবা! হারাদা আমার চুল খুলে দিয়েছে।

ভয়ে হারাধনের মুখ শুকাইয়া গেল।

সুধা চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া বলিল, বল না—তোমার কি বল্‌বার আছে।

হারাধন মাথা নীচু করিয়া বলিল, আমি ইচ্ছে ক'রে দিইনি। কিছুতেই আমাকে বাসন মাজ্‌তে দেবে না—জোর ক'রে হাত ছাড়িয়ে নিতেই—

অনুকূলবাবু বিস্ময়ে একরূপ চীৎকারই করিয়া উঠিয়া বলিলেন, তুমি কি বাসনও মাজ?

'চুপ্‌ চুপ' বলিয়া সুধার মা একবার ভাল করিয়া চারিদিক দেখিয়া লইলেন। তাহার পর হারাধনকে তিনি বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, হাঁ বাবা হারাধন—তোমার মাকে মনে পড়ে?

মার কথায় হারাধন হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সে কান্না আর থামিতে চাহে না। মা হারানর যে দুঃখ তাহার মত আর কেই বা জানে? পৃথিবী তাহার নিকট মরুভূমি! স্নেহ সে কখনও কাহারও নিকট পায় নাই। তাই বুঝি-আজিকার এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে তাহার কান্নার সমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে।

'এ বেলায় আমি রাঁধব—তুমি খেলগে।' বলিয়া সুধার মা তাহার পিঠে, মাথায়, মুখে হাত বুলাইয়া দিলেন!

হারাধনের কান্না হঠাৎ শুকাইয়া গেল! বলিল, না—না—না। সেদিন আপনি রেঁধে-ছিলেন বলে মামীমা—

অনুকূলবাবু লাফাইয়া উঠিলেন। বলিলেন, কি! মেরেছিল?

হারাধন মাথা নীচু করিয়া রহিল। তাহার পর ভূত দেখিলে যেরূপ চমকাইয়া উঠে, হারাধন সেইরূপ দুই পা পিছাইয়া গেল।

মাতঙ্গিনী ঝড়ের মত আসিয়া বলিলেন, এখানে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে শুনি? ওদিকে যে কয়লা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

সুধার মা তাড়াতাড়ি বলিলেন, না—না ওর দোষ নেই, আমিই ওকে ডেকেছিলাম।

হারাধন অতি সন্তর্পণে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এমনি করিয়া আরও কিছুদিন গেল। অকস্মাৎ একদিন—অনুকূলবাবুর সোনার হাত-ঘড়িটা চুরি গেল। প্রথমটা তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। মনে করিয়াছিলেন, হয় ত কোথাও আছে। কিন্তু সত্যই যখন আর পাওয়া গেল না, ত'ন মাতঙ্গিনী তাঁহার তীক্ষ্ণ-কণ্ঠ লইয়া আসিয়া শুনাইয়া দিলেন—না দাদা অমন চক্ষুলজ্জা করলে ত' চলবে না—ঘড়ি আমি বের করবই। লেখা-পড়া না শিখে, এখন এই চুরি ডাকাতি করেই খাবে আর কি! যে দিন অম্নি কুড়িটা টাকা—এমন ক'রে ত আর পারা যায় না!

অনুকূলবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, থাক্‌ থাক্—ঘড়ির দামই বা কত।

ঘড়ির দাম যতই হউক, মাতঙ্গিনী সে দিনের সেই কুড়ি টাকার শোক ভুলিতে পারেন নাই।

খাইবার সময় অনুকূলবাবু সবিস্ময়ে দেখিলেন, মাতঙ্গিনী নিজে পরিবেশন করিতেছেন! তিনি সমস্তই বুঝিলেন। কিন্তু একটি কথাও বলিলেন না।

শিবনাথ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, কেন—হারা-ধনের কি হ'লো?

মাতঙ্গিনী মুখখানাকে যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া বলিলেন, হবে আর কি—রাগ হয়েছে। দোষ করবে, শাসন করতে পারব না! ঘর থেকে একবার বেরুলোও না! উল্টে আমাকেই শাস্তি দেওয়া।—কিন্তু কি ছেলে বাপু, এত করেও একটা 'হাঁ' বলাতে পারলাম না! ওর পেটে পেটে বজ্জাতি!

অনুকূলবাবু নীরবে খাইতে লাগিলেন। হঠাৎ সুধা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, বাবা! নীলুদা তোমার ঘড়ি বিক্রী ক'রেছে।

'কে বললে,—নীলু বলেছে?' বলিয়া অনুকূলবাবু সুধার মুখের দিকে চাহিলেন।

'না, নীলুদার একখানা বইয়ের মধ্যে এই রসিদখানা পেলাম।' বলিয়া সুধা একখানি কাগজ অনুকূলবাবুর হাতে দিল।

অনুকূল দেখিলেন, হাঁ—তাহাই বটে! কে একজন সুরেনের নিকট মাত্র ত্রিশ টাকায় নীলু ঘড়িটি বিক্রয় করিয়াছে! শিবনাথ মাতঙ্গিনী উভয়েই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন!

'মাতু রাগ করিস্‌নে—একটা কথা। ছেলের মাথাটা তুইই খেলি।' বলিয়া অনুকূলবাবু আহার সমাধা করিলেন।

শিবনাথের গলা দিয়া আর ভাত নামিল না।

আর হারাধন? তাহার ঘরে একখানি ছেঁড়া মাদুরের উপর সেই যে শুইয়াছে আর উঠে নাই। সারাদিন তাহার পেটে এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত পড়ে নাই, অথচ আশ্চর্য্য এই—শিবনাথ, মাতঙ্গিনীর কাহারও তাহার কথা একবার মনেও পড়িল না! হায়রে মাতৃ পিতৃ-হারা হতভাগ্য!

সুধা অনেকক্ষণ হইতে এই সংবাদটি তাহার হারাদাকে দিবার জন্ত ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। সুযোগ বুঝিয়া এবং কেহ কোথাও নাই দেখিয়া সে ছুটিয়া হারাধনের ঘরে গেল। দেখিল, হারাধন তখনও বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে। সুধা ধীরে ধীরে তাহার মাথাটি তুলিয়া ধরিয়া ডাকিল, হারাদা!

এই একটিমাত্র ছোট্টমেয়ে, যাহার নিকট হারাধন বিশেষ করিয়া ধরা দিয়াছিল।

সুধা আবার ডাকিল, হারাদা!

হারাধন চকিতে একবার তাহার দিকে চাহিয়া ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল, খাব না আমি—যাও!

সুধা হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হারাধন একবার এদিক্‌ ওদিক্‌ চাহিয়া লইয়া বলিল, তুমি অত হাস কেন?

'হাস্‌ব না? বেশ ত। তোমার মত মুখ চুম্‌রো ক'রে থাক্‌ব না কি? নাও খাবে এস,—তোমার জন্তে মা খাবার রেখেছে।' বলিয়া সুধা হারাধনের হাত ধরিয়া টান্‌ দিল।

তাহার পর নীলুদার ঘড়ি বিক্রয়ের কথা,—তাহার পলায়নের কথা একে একে শেষ করিয়া সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। নীলু পালাইয়াছে—হারাধনের কেমন লাগিল। বলিল, নীলু কোথায় গেল?

"কোথায় আবার যাবে? সুরেনদের বাড়ী তাস পিট্‌ছে আমি দেখে এসেছি। এখন খাবে চল।"

"আমি খাব না।"

"হাঁ, খাবে না বৈকি! আমি কত কষ্ট ক'রে খাবার এনে রেখেছি।"

"আমি যাব না এখান থেকে,—মামীমা দেখ্‌তে পাবে।"

"আচ্ছা, তুমি ব'সো—আমি এইখানেই নিয়ে আসচি।"

তোমাকেও কিন্তু খেতে হবে' বলিয়া হারাধন হাসিল।

'একটা খাব কিন্তু। আমি ত খেয়েছি—তুমি যে খাও নি।' বলিয়া সুধা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

পাঁচ

ইহার পর আরও দিন কয়েক কাটিয়া গেল। মাতঙ্গিনী সেই যে সেইদিন হইতে তাঁহার দাদার সহিত কথা বন্ধ করিয়াছেন, আজও মুখ খোলেন নাই! কিন্তু মুখ খুলিতে হইল। অনুকূলবাবু আসিয়া বলিলেন, মাতু! আমরা কাল যাচ্ছি। হাঁ, আর এক কথা।—আমি হারাধনের সঙ্গে সুধার বিয়ে দেব ঠিক করেছি।

মাতঙ্গিনী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, সে কি দাদা! ঐ মুখ্যুর সঙ্গে?—অমন্‌ মেয়ে সুধা?

"মূর্খ ত তোমরাই ক'রে রেখেছিস্‌ মাতু! আমি ওকে মানুষ করব।—আমার হাতেই যে।"

'তা আমাকে কেন? আমি ওর কে?—ওর মামা রয়েছে' বলিয়া মাতঙ্গিনী থপ্ থপ্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

শিবনাথ সমস্ত শুনিয়া, অনেকক্ষণ হাঁ করিয়াই অমুকূলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন! তাহার পর—সহসা প্রবলবেগে অমুকূলবাবুকে জড়াইয়া ধরিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, সুধার বিয়ের সময় দয়া ক'রে একটা খবর দিও - আমি তাদের আশীর্বাদ ক'রে আসব।

সুধার মা সুধাকে ডাকিয়া বলিলেন, হারাধন আমাদের সঙ্গে যাবে না বল্‌ছে রে সুধা।

'হাঁ, যাবে না বল্লেই হ'লো কিনা' বলিয়া সুধা দম্ দম্ করিয়া চলিয়া গেল। সুধার মা হাসিলেন।

হারাধন ইহার কিছুই জানিত না। শুধু জানিত, সুধারা কাল চলিয়া যাইবে। এই চলিয়া যাইবে কথাটাকে সে কিছুতেই সহিতে পারিতেছিল না। সারাদিন অসুখের ভাণ করিয়া যখন সে কিছুই খাইল না, তখন অমুকূলবাবু খুব চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।

সুধার মা হাসিয়া বলিলেন, ওগো—অসুখ নয় গো, অসুখ নয়। সুধা চ'লে যাবে শুনেছে—তাই।

'তোমার যেমন কথা' বলিয়া অমুকূলবাবু হাসিলেন।

"কেন, আজ বুঝি এসবগুলো অসম্ভব ব'লে মনে হ'চ্ছে। সেই প্রথম যখন, আমাকে আমার দাদা নিতে এলো—"

"তোমার এখনও সে কথা মনে আছে!"

'মেয়েমানুষের ঐগুলোই ত সব চেয়ে বেশী মনে থাকে। আর থাকে ব'লেই, আমার সুধা-হারাকে পৃথক্ করতে পারলাম না।' বলিয়া সুধার মা হাসিলেন।

সুধা যখন একবাটী বার্লি লইয়া হারাধনের নিকট দাঁড়াইল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

হারাধন বলিল, তুমি যাও—তুমি যাও। নইলে ঐ বার্লি তোমার মাথায় ঢেলে দেব।

"খাও লক্ষ্মী, তোমার যে আজ অসুখ। কাল গাড়ীতে তোমাকে সন্দেশ কিনে দেব।"

কথাটা হয় ত হারাধন বুঝিতে পারে নাই তাই প্রবলবেগে সুধার মাথাটা সে নাড়া দিয়া বলিল, সন্দেশ, সন্দেশ, আমাকে সন্দেশের লোভ দেখাতে এসেছে!

সুধা কাঁদিয়া ফেলিল। হারাধন একদৃষ্টে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঐ একবাটী বার্লির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর সুধার মুখের দিকে চাহিয়া—হঠাৎ এক নিশ্বাসে বাটীটা খালি করিয়া, ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।





শান্তিপদর অভিজ্ঞতা

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি-এ,

শান্তিপদর বাহিরের দিকের ছোট ঘরখানিতে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর একটী ছোট রকমের মজলিস্ বসিত। ঘর জুড়িয়া একখানি তক্তপোষ পাতা ছিল, তাহারই উপর চারি পাঁচ জনে গায়ে গায়ে বসিয়া সিগারেট ধ্বংস করিত এবং রাজনীতি হইতে আরম্ভ করিয়া এমন কোন বিষয় ছিল না, যাহার চর্চ্চা তাহারা করিত না। এক এক দিন তর্ক করিতে করিতে বন্ধুগণ এমনই উত্তেজিত হইয়া উঠিত যে, তাহাদের প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে প্রাণহীন তক্তপোষখানিও কাতর আর্ত্তনাদ করিয়া ভূমিশয্যা গ্রহণের উদ্যোগ করিত।

সেদিন চারি বন্ধু বসিয়া কি একটা বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিল এমন সময় প্রভাস কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "এবার আর শোনা কথা নয়, নিজের চোখে দেখে এসেছি।"

শান্তি হাসিয়া কহিল, "কি দেখে এলে হে?"

প্রভাস কহিল, "গাদা গাদা ইঁট, বড় ছোট মাজারি কত রকমের।"

সকলে অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গাদা গাদা ইঁট দেখার ভিতর এমন কি নূতনত্ব, এমন কি বিশেষত্ব আছে তাহা কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

জ্যোতিষ গম্ভীর হইয়া কহিল, "কোথাকার ইঁট হে, হলগুলু না কাম্‌স্‌কাট্‌কার?"

প্রভাস উত্তেজিত হইয়া কহিল, "চোখে দেখলে বুঝতে পারতে, এ ঠাট্টার কথা নয়। সব কথা অমন ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিলেই হয় না।"

শান্তিপদ ঝুঁকিয়া তাহার একখানি হাত ধরিয়া কহিল, "বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে নাও, তারপর তোমার ইঁটের ইতিহাস শোনা যাবে।"

প্রভাস বসিল না, তেমনইভাবে দাঁড়াইয়া কহিল, "দেখ ঠাট্টারও সীমা আছে। বলছি আমি পরের চোখে দেখি নি, নিজের চোখে দেখে এসেছি, তবুও তোমরা সবাই মিলে ঠাট্টা করতে আরম্ভ করেছ, এ ভারি অন্যায়।"

শান্তিপদ তখনও তাহার হাত ছাড়ে নাই, হাসি চাপিয়া কহিল, "বেশ ভাই তার জন্যে মাপ চাইছি। এইবার বসে তোমার গল্প বল।"

প্রভাস ক্রোধভরে কহিল, "আবার গল্প! নিজের চোখে দেখা ব্যাপারও গল্প হয়ে যাবে? তোমাদের কাছে বলতে আসাই আমার ঝকমারি হয়েছে।"

কমল হাসিয়া কহিল, "প্রভাস তোর স্বভাব কিছুতেই বদলাল না, একটুতে অমন ক্ষেপে উঠিস্ কেন?"

বিনোদ কহিল, "নিজের চোখে দেখেছি—গাদা গাদা ইঁট, ছোট বড় মাঝারি,—এই রকমের কতকগুলো কথা আওড়ে গেলে আমরা কি বুঝব বল ত?"

প্রভাস এতক্ষণে বুঝিল, কথা বলিবার ধরণটা তাহার একেবারেই বেখাপ হইয়াছে। সে অপ্রতিভ হইয়া তক্তোপোষের একধারে বসিয়া পড়িল।

শান্তিপদ একটী সিগারেট তাহার হাতে গুঁজিয়া দিল। সে বিনা বাক্যব্যয়ে তক্তপোষের

উপর হইতে দিয়াশলাইটী তুলিয়া লইয়া সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া ঘন ঘন টানিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরে জ্যোতিষ কহিল, "এইবার তোমার চোখে দেখা ব্যাপারটিকে আমাদের কানে শোনবার ব্যবস্থা কর ত।"

বার দুই জোরে জোরে সিগারেট ফুঁকিয়া প্রভাস কহিল, "সেই যে হে কম্বলিটোলার বাড়ীটার কথা তোমাদের একদিন বলেছিলুম,—সেই যে বাড়ীতে রোজ রাত্রে ভূতে ইঁট ফেলে সেই বাড়ী আজ দেখে এলুম—বাড়ীর ভেতর ঢুকে গাদা গাদা ইঁট পর্য্যন্ত দেখে এলুম।"

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

প্রভাস ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "আমার কথা বিশ্বাস হল না? মনে করছ আমি মিথ্যা কথা বলছি?"

শান্তিপদ কহিল, "তা মনে করি নি। ইঁট দেখে এসেছ ঠিক, আর সে বাড়ীতে যে ইঁট পড়ে এটাও ঠিক, কিন্তু সে ইঁট ভূতে ফেলে না, কেননা ভূত বলে কোন কিছু নেই।"

এইবার ভৌতিক কাণ্ড সম্বন্ধে সকলে মিলিয়া তুমুল তর্ক জুড়িয়া দিল। দুইটী বিভিন্ন দলও হইয়া গেল,—একটা দলে শান্তিপদ, জ্যোতিষ আর বিনোদ, অন্য দলে প্রভাস ও কমল।

প্রভাস কহিল, "তুমি যদি চোখে দেখে আসতে তা হ'লে কখনও এমন কথা বলতে পারতে না। মাসাবধি ধরে যে ইঁট পড়েছে তা জড় করলে একখানা বড় বাড়ী তৈরী হয়ে যায়।"

শান্তিপদ তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "চমৎকার! তা হ'লে যার বাড়ী ইঁট পড়ছে, দেখতে দেখতে সে ক্রোড়পতি হয়ে যাবে দেখছি!"

জ্যোতিষ কহিল, তুমি কি যে বলছ শান্তিদা তার ঠিক নেই,—সে ইঁট কি আর মানুষের ভোগে লাগে—প্রভাসের মত পাঁচজনে দেখে আসবার পর আবার সেগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়।"

প্রভাস গম্ভীর হইয়া কহিল, "সত্যিই তাই, এ ঠাট্টার কথা নয়! ইঁটগুলো জড় করে একটা ঘরে রেখে দেখা গেছে সেগুলো থাকে না,—ইঁটগুলোর কাছে রীতিমত পাহারা রেখেও পরখ করে দেখা গেছে,—তাদের চোখের সামনেই কমতে কমতে সেগুলো ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যায়।"

শান্তিপদ কহিল, "তা হ'লে ইঁটগুলোর পাখা বেরোয় বল?"

কমল কহিল, "এ তোমাদের অন্যায় কথা শান্তিদা,—ও নিজের চোখে দেখে এসে বলছে, আর তোমরা না দেখে এখানে বসে কথায় তোড়ে সত্যিকে মিথ্যে করে দিতে চাইচ।"

শান্তিপদ হাসিয়া কহিল, "ও সব দেখার কোন মানে নেই, ওকে দেখিয়েছে ও দেখে এসেছে। ওই বলুক না, ও কি নিজে কোন খোঁজ নিয়েছে, এ রকম ইঁট ফেলবার কত রকম কারণ থাকতে পারে; সব কারণগুলোই ও কি অনুসন্ধান করে দেখেছে।"

কমল এসব প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না। প্রভাসই তাহার হইয়া উত্তর দিল, "দেখবার কোন দরকার মনে করি নি তাই দেখি নি। সে যে মানুষের শক্তির বাইরে, তা আমি জোর করে বলতে পারি।"

কমল বলিল, "তোমরা নিজেরা গিয়ে দেখে এসে কারণ খুঁজে বার কর না, তা হ'লেই ত এ তর্কের মীমাংসা হয়ে যায়।"

শান্তিপদ কহিল, "ওরকম অনেক ইঁট পড়া আমি দেখেছি, এবং এই রকমের ইঁট-পড়া বাড়ীতে আমি সস্ত্রীক বাস করেও এসেছি, কাজেই এর ভেতর নূতনত্ব কিছু নেই। শোনই না ব্যাপারটা, বছর খানেক ধরে সে বাড়ীতে ইঁট পড়ছিল,—কোন ভাড়াটে টিকতে পারে না,—বাড়ীতে আমি যাবার পরেও ইঁট পড়তে লাগল, অনেক চেষ্টা করেও কাউকে ধরতে পারলুম না। শেষে পাড়ার দু তিনটে বদমাইস ছোঁড়াকে ধরে

আচ্ছা করে মার দিলুম তারপর থেকে ইঁট পড়াও থেমে গেল। কে বা কারা ইঁট ফেলে, অনেক সময় তা ধরা যায় না বটে, কিন্তু তাই বলে ভূত আখ্যাধারী কোন কাল্পনিক পদার্থ যে ইঁট ফেলে বেড়ায় এই হাস্যজনক কথাটাও আমাদের বিশ্বাস করে নিতে হবে? দেখ প্রভাস তুমি শুধু চোখে দেখেই একেবারে ভৌতিক ব্যাপার বলে ধরে নিয়েছ, কেননা ভূত বলে যা হক একটা কিছু আছে এইটাই তোমার অন্তরের বিশ্বাস, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভূত শব্দটারই কোন মানে নেই, কাজেই ভৌতিক ব্যাপার বলেও কিছুই নেই—তাই লোকে সেটাকে ভৌতিক ব্যাপার বলে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেছে বা ভয় পেয়েছে সে রকম ব্যাপার দেখে আমি ভয়ও পাই নি, একেবারে হাঁ হয়েও যাই নি,—তাই ঐ ইঁট-পড়া ব্যাপারটি আমার কাছে ধরা পড়েও গেছে।"

কমল কহিল, "তোমার একথা মানতে রাজি নই শান্তিদা,—আমিও তোমায় এমন একটা বাড়ী দেখিয়ে দিতে পারি যেখানে ঘণ্টাকয়েক কাটিয়ে এলে তোমারও বিশ্বাস হবে ভূত আছে।"

শান্তিপদ কহিল, "বেশ সে বাড়ী না হয় একদিন দেখে আসা যাবে। হয়ত কিছু ঘটতেও পারে,—কিন্তু তা যে তোমাদের ভূতেরা করে যায় তা প্রমাণ হবে কি করে? এ ত তোমাদের মনের বিকার মাত্র,—আমার সে মনের বিকার নেই, কোন দিন হবেও না।"

প্রভাস কহিল, "এই যে মানুষকে ভূতে পায়, এবং সে ভূত রোজা এসে ছাড়িয়ে দেয় এটাও তাহ'লে তুমি উড়িয়ে দিতে চাও?"

শান্তিপদ হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "ভূত শব্দটারই কোন অর্থ নেই যখন তখন ভূতে পায় কি করে। তুমি যাদের ভূতে পাওয়া বলছ, আমি বলব তাদের বজ্জাতিতে পায়, বা পাগলামি ব্যাধিতে পায়। আর তাকেই ভূতে পাওয়ার নাম দিয়ে এক শ্রেণীর লোক নিজেদের রোজা বলে জাহির করে ফাঁকি দিয়ে কিছু রোজগার করে নেয়। তোমায় এই ভূতে পাওয়ার এবং ভূত তাড়ানর একটা গল্প শুনিয়ে দিচ্ছি—গল্প মানে তৈরী গল্প নয়, সত্যিকার গল্প তোমার ইঁট দেখার মত নিজের চোখে দেখা, পরে যা দেখাতে চেয়েছিল তা নির্ব্বিকার বা বিকারগ্রস্ত চোখে দেখে আসি নি—তাই ভূতে পাওয়ার আসল রূপটাই দেখে এসেছি, নকল কিছু দেখি নি। যাক্, আমি তখন ইছেপুরে কাজ করতুম। সেখানে একটা বটগাছ ছিল, সে গাছটা ভূত ছাড়াতে একেবারে সিদ্ধহস্ত—ভূতে পাওয়া মেয়েদের সেখানে নিয়ে এসে ফেলতে পারলেই ভূত তাদের ছেড়ে পালাতে পথ পেত না।"

প্রভাস এইবার মহাখুসী হইয়া বলিয়া উঠিল, "এই ত নিজের কথায় ধরা পড়ে গেছ তুমি শান্তিদা। তা হ'লে ভূত তুমি মান?"

শান্তিপদ তেমনই ভাবে হাসিয়া কহিল, "কথাটা আমায় শেষ করতেই দাও। সেই বটগাছটির ভূত ছাড়াবার শক্তি যে মহাপ্রভুটী আবিষ্কার করেছিলেন,—তিনি এক দিনেই সব ভূত ছাড়িয়ে দিতেন না,—তিনি মাঝে মাঝে বলতেন, ভূতদের মধ্যে দু'পাঁচটা খুব দুর্দ্দান্ত ভূতও থাকে ত, তারা কি সহজে ছাড়তে চায়। এমনই এক দুর্দ্দান্ত ভূতে পাওয়া একটি মেয়েকে জোর করে ধরে বেঁধে সেই গাছতলায় এনে ফেলা হয়েছিল। আমরা খবর পেয়ে দেখতে গেলুম, আমাদের কারখানার সাহেবও আমাদের সঙ্গে মজা দেখতে এলেন। গিয়ে দেখলুম মেয়েটা চুল ছিঁড়ছে, লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কত কি বলছে—আর গাছটার যে মালিক, সে মন্ত্র আওড়াচ্ছে আর মাঝে মাঝে বলছে—'এ বড় সোজা ভূত নয়, একদিনে এর কিছু করতে পারা যাবে না দেখছি।' আমাদের সাহেবের হাতে এক বন্দুক ছিল, তিনি সেই মেয়েটার মুখের সামনে বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে বললেন,

"আমি এক দুই তিন বলবার মধ্যে যদি এখান থেকে না পালাও, তোমায় ঠিক গুলী করব।' মেয়েটা তখন চুল টেনে টেনে ছিঁড়ছিল, সাহেবের কথা শুনে সে চুপ করে বসল। তারপর সাহেব এক দুই বলে একটু থেমে যেমন তিন বলতে যাবে, অমনই মেয়েটা সেখান থেকে উঠে দিল এক ছুট। আমরা সব হেসে উঠলুম। পরে খবর নিয়ে শুনলুম মেয়েটাকে আর কোনদিন ভুগতে পায় নি। মাঝের "হঠাৎ সে থামিয়া গেল এবং আত্মগতভাবে বলিয়া উঠিল, "ঐ আবার আরম্ভ হয়েছে!" তখন পাশের বাড়ীর সিঁড়ির উপর মলের ঝমঝম্ শব্দ হইতেছিল।

জ্যোতিষ কহিল, "কি শান্তিদা, কি হয়েছে ?"

শান্তিপদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আর বল কেন— ঐ যে মলের শব্দ পাচ্ছ না, ও বাড়ীর একটী বৌ সিঁড়ি দিয়ে উঠছে— মিনিট পনর বসলেই বুঝতে পারবে মেয়েটী কতবার ঐ সিঁড়ি দিয়ে ওঠে-নামে। আজ দুদিন থেকে দেখছি তার ওপর এই শাস্তির বিধান হয়েছে। আহা বেচারী!"

বিনোদ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "ব্যাপার কি ?"

শান্তি কহিল, "ও বাড়ীর গিন্নীর খুব মাথা আছে—বৌটীর উপর অত্যাচার করবার কত নতুন নতুন ফন্দী যে মাথা থেকে বের করে তা তোমাদের কি বলব! আজ দুদিন থেকে বৌটীর উপর হুকুম জারি করেছে - একখানা বড় থালায় ভাত তরকারি সাজিয়ে নিয়ে বৌটীকে একতলা থেকে তেতলায় ক্রমাগত উঠতে হবে আর নামতে হবে। মা আর ছেলে অর্থাৎ ঐ বৌটীর স্বামী তাই বসে দেখবে আর হাসবে আর মাঝে মাঝে ফোড়ন দেবে। বৌটী যে একটু জিরুবে তার উপায় নেই, অমনই তার রাক্ষুসী শাশুড়ী গিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।"

কমল উত্তেজিত হ'য়া কহিল, "বল কি হে! এ রকম অত্যাচারও মানুষ মানুষের ওপর করে! তোমরা কড়া কড়া করে শুনিয়ে দিতে পার না ?"

শান্তিপদ কহিল, "তাতে কোন ফল হবে না। বরং অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়বে। ওরা সে রকমের লোক মিথ্যে করে একটা ফ্যাসাদ বাধিয়ে দেবে। বাড়ীটী পেয়েছি ভাল হয় ত শেষে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে।"

জ্যোতিষ কহিল, "আমার ইচ্ছে হচ্ছে এখনই পুলিশে খবর দি।"

শান্তিপদ হাসিয়া কহিল, "তাতেই বা কি হবে। পুলিশ যদি না আসে, বৌটীর মুখ থেকে একটী কথাও বের করতে পারবে না।"

প্রভাস কহিল, "এই ত আমাদের মেয়েদের দোষ। তার যদি মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য না করে, তা হ'লে এর প্রতিকার নিশ্চয়ই হয়।"

শান্তিপদ কহিল, "তা হয়, কিন্তু তারা কি তা করবে। ঐ শোন নামছে—হাত-পা তার যতক্ষণ না একেবারে ভেঙ্গে পড়বে, ততক্ষণ আর নিস্তার নেই। এখন মলের শব্দ বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, ক্রমে দেখবে শব্দটা ক্ষীণ হয়ে আসবে, ঠিক বুঝতে পারা যাবে, যেন সে আর চলতে পারছে না তবুও ভয়ে পা দুটোকে তার টানতে হচ্ছে।"

বিনোদ কহিল, "তুমি থাম শান্তি,—এ সব কথা না শোনাই ভাল। যার প্রতিকারের কোন উপায় করতে পারা যাবে না মিছে তার উল্লেখ করে কি ফল। তার চেয়ে ভূতের গল্প শোনা ভাল।"

কমল কহিল, "সেই ভাল, আচ্ছা শান্তিদা তুমি ত ভূত উড়িয়ে দিচ্ছ,—কিন্তু বড় বড় সাহেবেরা পর্য্যন্ত ভূত মানে তা জান, বিলেতে ভূত নিয়ে কত আলোচনা হচ্ছে।"

শান্তিপদ কহিল, "তা হচ্ছে সে খবর আমি রাখি। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভূত মানে



মন্দির পথে

বল্লেই যে ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়ে গেল এমন কোন কথা নেই। সাহেবরাও ত আমাদের মত মানুষ,—দুর্ব্বলতা তাদের মধ্যেও আছে। তুমি হয়ত শুধু শুনেছ সাহেবেরা ভূত মানে কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখেছি একজন সাহেবের ভূত দেখে কি রকম অবস্থা হয়েছিল।"

প্রভাস হাসিয়া কহিল, "শান্তিদা তুমি পদে পদে নিজের কথাতেই নিজে ধরা পড়ে যাচ্ছ। ভূত কথার কোন মানে হয় না বলছ আবার ভূত দেখে সাহেবের কি অবস্থা হয়েছিল তাও বলছ। ভূত না মেনে কি উপায় আছে।"

শান্তিপদ কহিল, "তোমাদের জন্যেই ভূত শব্দটা আমার ব্যবহার করতে হচ্ছে, না হ'লে তোমরা ত বুঝবে না। সাহেবদের ভূত দেখার গল্পটাই আগে শোন। আমি তখন বারাকপুরে থাকি,—রোজ ভোর চারটের গাড়ীতে আমায় কলকাতায় আসতে হত। ষ্টেশনের কাছে একটা ভাঙ্গা বাড়ী ছিল—তোমাদের মত পাঁচজনে বলত সেটা ভূতের বাড়ী, রাত্রে কেউ সে বাড়ীর সামনে দিয়ে ত যেতই না, এমন কি অনেকে দিনের বেলা একা সেখান দিয়ে যেত না। আমি কিন্তু রোজ ভোর রাত্রে অর্থাৎ অন্ধকার থাকতেই সেই বাড়ীর সামনে দিয়ে ষ্টেশনে যেতুম। অনেকে মানা করত, তা আমি কানেই তুলতুম না। তখন বর্ষাকাল,—রাত চারটার সময় বেরিয়ে ষ্টেশনের দিকে আসছি। যদিও তখন বৃষ্টি পড়েনি, ছাতি খুলেই চলেছিলুম। বেশ অন্ধকার, সেই ভাঙ্গা বাড়ীর সামনে যেমন এসেছি, অমনই পেছনে কিসের শব্দ শুনতে পেলুম মনে হ'ল হুড়মুড় করে কি একটা পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে একটা গোঙানির শব্দ, সত্যি তখন আমার বুকটা একবার ধড়াস করে উঠেছিল—"

প্রভাস হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তবে না। কি তুমি ভয় পাও না?"

শান্তিপদ কহিল, "বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল সত্য, কিন্তু ভূতের ভয়ে নয়। তারপর শোনই না,—পেছন ফিরে দেখলুম, কি যেন একটা রাস্তার ওপর পড়ে আছে, আমি এগিয়ে গেলুম, গিয়ে দেখি এক সাহেব অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তায় পড়ে আছে আর একখানা সাইকেল রয়েছে তার ঘাড়ের ওপর। কাছেই একটা দোকান ছিল, সেখানে গিয়ে একটা আলো আর দু তিন-জন লোককে ডেকে এনে সাহেবকে ধরাধরি করে দোকানে নিয়ে গেলুম। খানিক পরে তার জ্ঞান ফিরে এল, তার মুখে ভূতের চেহারার কথা শুনে আমার আর হাসি ধরে না। সাহেব বল্লে, 'আমি যখন বাড়ীর ঠিক সামনে এসেছি, দেখলুম কি একটা কালো জিনিস আমার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে আমি অজ্ঞান হয়ে সাইকেল থেকে পড়ে গেলুম।' এখন বুঝতে পারছ সে কালো জিনিষটি কি? যদি না বুঝে থাক, তা হ'লে বলে দিচ্ছি সেটী আমার সেই খোলা ছাতিটি। যারা ভূত দেখে তারা এমনই ধরণের কিছু দেখে একেবারে ভূত বলে সিদ্ধান্ত করে নেয়।"

এমন সময় পাশের বাড়ী হইতে রমণী কণ্ঠের তীব্র ঝঙ্কার সেই কক্ষমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল,—"এর মধ্যে বসে পড়লি যে বড়। ওঠ্ ওঠ্ বলছি নবাবের বেটী। আরও পাঁচবার তোর ওঠানামা করতে হবে। না ত মিন্ত নবাবের বেটীকে চিঁচড়ে টেনে তুলে দে ত।"

শান্তিপদ কহিল, "ঐ মিন্তুটী হচ্ছেন, বৌটীর গুণধর স্বামী মাতৃভক্ত সন্তান।"

জ্যোতিষ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "এ অসহ্য আমরা চল্লুম,—রাতও অনেক হয়ে গেছে।"

সকলে উঠিয়া পড়িল। অন্যদিন তাহারা অনেক আগেই চলিয়া যায়। সেদিন একে প্রভাস রাত করিয়া আসিয়াছিল তাহার উপর ভূতের গল্প আরম্ভ হওয়ার রাতও কাহারও ঠাওর হয় নাই।

শান্তিপদ শুধু যে তর্কের খাতিরে তর্ক করিত, তাহা নহে। ভূত শব্দটা যে অর্থহীন ইহাই তাহার অন্তরের বিশ্বাস। ভূতের কীর্ত্তি সে অনেক দেখিয়াছে এবং অনেক পড়িয়াছে। সে তথাকথিত দু তিনটী ভূতের বাড়ীতে সস্ত্রীক বাসও করিয়া আসিয়াছে কিন্তু ভূত তাহাদের নিকট প্রকট হয় নাই। তাহার স্ত্রীও ভূত বলিয়া কিছু মানিত না।

* * * * *

* * * *

একমাস পরের কথা। শান্তিপদ একদিন আপিস হইতে গৃহে ফিরিয়া শুনিল, পাশের বাড়ীর সেই বৌটী অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়া স্বামী শ্বশুর অমানুষিক অত্যাচারের হাত হইতে চিরমুক্তি লাভ করিয়াছে।

শান্তিপদ ব্যথিতকণ্ঠে কহিল, "আহা বেচারী মরে বাঁচল।"

কল্যাণী চাপা গলায় কহিল, "এর পুলিস হাঙ্গামাও হয়েছে, লাস হাঁসপাতালে নিয়ে গেছে, ওরা পুড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা করেছিল,—কিছুতেই পারলে না। বৌয়ের বাপ পুলিশকে জানিয়েছে ওরা মায়ে ছেলেতে পুড়িয়ে মেরেছে—তার মেয়ে নিজে পুড়ে মরেনি। কে যেন তোমায় ডাকছে।"

বাহিরে গিয়া শান্তিপদ দেখিল, তাহার বাড়ীওয়ালা তারিণীবাবু আর সেই বৌটার স্বামী মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইয়া আছে।

তারিণী কহিল, "আপনার সঙ্গে বিশেষ দরকারী কথা আছে। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে বলবার ত সুবিধে হবে না।"

শান্তিপদ কহিল, "ঘরের ভিতর বসবেন আসুন।"

তারিণী ও মৃত্যুঞ্জয় তাহার সহিত বাহিরের সেই ছোট ঘরখানির মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। তারিণী দরজাটি অর্গলবদ্ধ করিয়া দিয়া বলিল, "কথাটা খুব গোপনে হওয়া দরকার।"

শান্তিপদ বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "বলুন।"

তারিণী কহিল, "আপনি এঁদের বিপদের কথা শুনেছেন নিশ্চয়, এ সময় একটু উপকার আপনাকে করতে হবে।"

শান্তিপদ কহিল, "আমার দ্বারা কি উপকার হতে পারে বলুন।"

তারিণী কহিল, "এঁর শ্বশুর এক গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছে—বলে এরা পুড়িয়ে মেরেছে। এও কি একটা কথা! ও কথা কেউ বিশ্বাস করবে না, তবে আর কিছু না হক, একটা হাঙ্গামা ত হবে। পুলিশ হয় ত রাত্রে আবার আসবে, পাড়াপড়শীর কাছে খোঁজ নেবে। আপনি আর আমি, আমরাই ত দু পাশে থাকি। আপনাকে আর আপনার স্ত্রীকে হয়ত জিজ্ঞেস করতে পারে, বৌটির উপর এঁরা কোন অত্যাচার করতেন কিনা। আপনাদের দয়া করে বলতে হবে, সে রকম কিছু এঁরা করতেন না। এমনই যথেষ্ঠ লাঞ্ছনা এঁদের ভোগ করতে হচ্ছে, তার ওপর বাড়ীর মেয়েদের যদি পুলিশ এসে মিথ্যামিথ্যি টানাটানি করে তা হলে এঁদের কি রকম অবস্থা হবে তা ত বুঝতেই পারচেন।"

শান্তিপদর একবার ইচ্ছা হইল বলিয়া ফেলে, এদের শাস্তি হওয়াই দরকার, তাহাতে আর পাঁচজনের শিক্ষা হইতে পারে। কিন্তু তারিণী বাবু নিজে আসিয়াছেন, তাঁহাকে ত সে খাতির না করিয়া পারে না। তিন মাস বাড়ী ভাড়া বাকি পড়িয়াছে, আরও দুই মাস হয়ত সে ভাড়া দিতে পারিবে না, লোকটি নিতান্ত ভদ্রলোক বাকি ভাড়ার জন্য কোন দিন তাগিদ করেন নাই, এমন কি বলিয়া দিয়াছেন, তার জন্য ব্যস্ত হইবার কোন কারণ নাই, সুবিধা মত পরে দিবেন। এ অবস্থায় তাঁহার কথা ত অমান্য করা চলে না। সে তাহার নিজের বিবেককে, সেই সঙ্গে এই বলিয়া প্রবোধ দিল যে বৌটি ত মরিয়াছে, তাহাকে

ত আর ফিরিয়া পাইবার কোন উপায় নাই, তখন অনর্থক একজন ভদ্রমহিলাকে আর বিপন্ন করিয়া ত কোন লাভ নাই। সে প্রকাশ্যে কহিল, "আপনি যখন বলছেন, তখন তার ওপর ত কোন কথা চলে না, যদি আমাদের জিজ্ঞেস করে, আমরা তাই বলব।"

মৃত্যুঞ্জয় জোড়হাত করিয়া কহিল, "আমাদের দয়া করবেন।"

তারিণী কহিল, "ওঁকে আর বেশী করে কিছু বলতে হবে না। উনি যখন কথা দিয়েছেন, তখন আর নড়চড় করবেন না। শান্তিবাবু অতিশয় ভদ্রলোক তা ত তুমি জান, এই ত পাড়ায় এত দিন রয়েছেন, কারু সঙ্গে একটি দিনের জন্যও কোন গোলমাল হয় নি। তা হ'লে এখন আসি শান্তিবাবু,—পুলিশ কখন আসে তার ঠিক নেই।"

কল্যাণী দ্বারের আড়ালেই দাঁড়াইয়াছিল। ভিতরে গিয়া শান্তিপদ তাহাকে বলিল, "কি আর করি বল, সামান্য মিথ্যে বললে যদি পুলিশ হাঙ্গামা থেকে ওঁরা রক্ষা পান, তা বলতে আর দোষ কি? ভদ্রলোকের মেয়েছেলেকে পুলিশ ধরে টানাটানি করবে, এটা বড় বিশ্রী ব্যাপার! আগেই যখন অত্যাচারের কোন প্রতিকার করতে পারলুম না, এখন আর সে কথা তুলে লাভ কি?"

কল্যাণী কহিল, "তা ঠিক। বুঝতুম যদি বৌটার কোন উপকার হবে তা হ'লে আলাদা কথা ছিল। সে ত আর ফিরবে না। তা ছাড়া অত্যাচার করত এটা ঠিক, কিন্তু পুড়িয়ে মেরেছে এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না।"

শান্তিপদ কহিল, "মানুষ কি সত্যি এত নিষ্ঠুর হতে পারে যে একটা জ্যান্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারবে। যদি পুলিশ কিছু জিজ্ঞেস করে তুমি বলে দেবে কোন অত্যাচার করতে আমরা দেখি নি।"

সে রাত্রে পুলিশ আসিয়া তাহাদের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিল না। উভয়ে আহার করিয়া যথাসময় শয়ন করিল।

তখন রাত্রি প্রায় একটা হইবে। ক্ষুদ্র গলিতে লোক চলাচল বন্ধ হইয়াছে, সহরের কোলাহলও থামিয়া গিয়াছে। এমন সময় হঠাৎ যেন কিসের শব্দে শান্তিপদর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। পাশের দিকে চাহিতেই দেখিল কল্যাণীও জাগিয়াছে।

শান্তিপদ কহিল, "ঘুমোবার আগে অবধি, সেই বৌটার সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, তাই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেন তার মলের শব্দ শুনতে পেলুম।"

কল্যাণী কহিল, "আমিও পেয়েছি—এবং এখনও পাচ্ছি, মনে হচ্ছে পাশের বাড়ীর ছাদে বৌটা যেন মল পায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

শান্তিপদ কহিল, "ঘুমের ঘোরে যে শব্দটা শুনতে পেয়েছিলুম তার রেশটা এখনও কানের মধ্যে লেগে আছে কিনা তাই মনে হচ্ছে যেন এখনও সেই মলের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।"

এমন সময় তাহাদের মাথার উপর মল বাজিয়া উঠিল,—ঝম্ ঝম্ ঝম্! একজন আর এক জনের মুখের দিকে চাহিল। তাহাদের স্পষ্ট বোধ হইল সেই বৌটা যেন ঝম্ ঝম্ শব্দ করিয়া ছাদের উপর পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছে।

শান্তিপদ হাসিয়া কহিল, "দেখছ মজা, বৌটার কথা ভাবতে ভাবতে তার পায়ের মলের শব্দ আমাদের মাথার ভেতর কোন্ এক জায়গায় আটকে গিয়েছে, তাই কাছে দূরে কেবলই যেন সেই শব্দ শুনতে পাচ্ছি।"

কল্যাণী কহিল, "তা ছাড়া আর কি। সত্যিই কি আর সেই বৌটা মল পায়ে দিয়ে ছাদের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে ত এখন হাঁসপাতালে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পড়ে আছে। আত্মঘাতী হওয়া কি মহাপাপ দেখেছ—সেই দুপুরে মরেছে এখনও পর্য্যন্ত তার সৎকার হল না, শুধু তাই নয়

মুদ্দফরাসেরা সে তার দেহ নিয়ে টানাটানি করছে।"

শান্তিপদ কহিল, "আত্মহত্যা মহাপাপই ত।"

ঠিক তাহাদের ঘরের পাশেই ছাদে উঠিবার সিঁড়ি। ছাদের উপরের সেই ঝমঝম্‌ শব্দ ক্রমে যেন সিঁড়ির ধাপের উপর দিয়া নামিয়া আসিতে আরম্ভ করিল।

কল্যাণী তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, "শব্দটা কি রকম চলে বেড়াচ্ছে দেখেছ। শুধু মলের শব্দ নয়, পায়ের শব্দও যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি,—যেন সিঁড়ি দিয়ে সত্যি কে নেমে আসছে।"

শান্তিপদ কহিল, "মাথার মধ্যে শব্দটা ঘুরছে কিনা, তাই ঐ রকম মনে হচ্ছে। বৌটা ত মরে গেছে, সে বেঁচে থাকলেও কোন্‌ এই রাত্রে আমাদের সিঁড়ির উপর মল বাজিয়ে বেড়াত।"

তাহার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সহসা কক্ষের রুদ্ধ কপাট সশব্দে উন্মুক্ত হইয়া গেল এবং একটা দমকা হাওয়া কক্ষমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

উভয়ে তাড়াতাড়ি শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। তাহারা দেখিল—ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ করিয়া মৃদু চরণ ফেলিতে ফেলিতে সেই অগ্নিদগ্ধা বধূটি যেন তাহাদের খাটের সম্মুখে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। মলের শব্দও আর শুনিতে পাওয়া গেল না।

কল্যাণীর দেহটা যেন কেমন ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল। কিন্তু বিশেষ ভয় পাইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। সে কহিল, "মলের শব্দ শুনতে শুনতে তাকে যে সশরীরে দেখতে পাচ্ছি।" হঠাৎ একটু থামিয়া শিহরিয়া উঠিয়া আবার সে কহিল, "দেখ দেখ আগুনে পুড়ে মুখখানার কি অবস্থা হয়েছে।"

শান্তিপদ একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়াছিল। অনবগুণ্ঠিতা বধূটির বিকৃত মুখখানি তাহার চোখের উপর জল্‌জল্‌ করিয়া ভাসিতেছিল। সে এমনই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল যে কল্যাণীর কথাগুলো তাহার কানে গেল না।

কল্যাণীর অন্তর মধ্যে ক্রমে যেন ভয়ের সঞ্চার হইল। সে কহিল, "তাই ত এ যে চোখের সামনে থেকে কিছুতেই সরে যাচ্ছে না। ভারি মুস্কিল করলে দেখছি। সে কি ফিরে আসতে পারে? অ্যাঁ!"

শান্তিপদ হঠাৎ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "ও কিছু না দৃষ্টিভ্রম, হাওয়ায় দরজাটা খুলে গেছে সেদিকে হুঁসই নেই, যাই বন্ধ করে দিয়ে আসি।" এই বলিয়া সে খাট হইতে নামিল, কিন্তু দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে পারিল না, সে চমকিয়া উঠিয়া দেখিল সেই বধূটি তাহার দুই মৃণাল বাহু বিস্তার করিয়া তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে স্পষ্ট লক্ষ্য করিল, মুখখানি পুড়িয়া বিকৃত হইয়া গেলেও সেই শুভ্র কোমল হাত দুখানির কোথাও এতটুকু ক্ষতচিহ্ন নাই। 'ও কিছু না কিছু না'—বিচলিত মনকে এই বলিয়া সংযত করিয়া লইয়া সে পাশ কাটাইয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ করিয়া বধূটিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়া গিয়া তাহার পথরোধ করিতে লাগিল।

ব্যাপার দেখিয়া কল্যাণী অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল, তাহার গলার স্বরও কাঁপিয়া উঠিল। কম্পিত কণ্ঠে সে কহিল, "তাই ত তোমায় যে কোনমতে যেতে দিচ্ছে না। ব্যাপার ত বড় সুবিধে নয়! আত্মঘাতী হয়ে সে আবার ফিরে এসেছে, তুমি খাটের ওপর এসে বস।"

শান্তিপদ তাহার কথায় কান দিল না, সে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য কেবল এদিক ওদিক করিতে লাগিল, এবং তাহাকে ঘেরিয়া চরণ-ফেলার তালে তালে মল ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া বাজিতে লাগিল। অবশেষে শান্তিপদ অবসন্নভাবে দেওয়ালে পিট দিয়া একস্থানে দাঁড়াইয়া পড়িল।

সেই বধূ বিকৃত মুখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কল্যাণী অন্তরে সাহস সঞ্চার করিয়া খাট হইতে নামিয়া তাহার স্বামীর দিকে অগ্রসর হইতে গেল, সেই বধূটি একখানি হাত বাড়াইয়া তাহাকে বাধা দিল। সঙ্গে সঙ্গে অপর হাতের ইঙ্গিত করিয়া শান্তিপদকে ডাকিতে লাগিল। শান্তিপদ এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল, বধূটি মল ঝম্‌ঝম্ করিয়া তাহার আগে আগে চলিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা দ্বার পার হইয়া সিঁড়ির দিকে চলিয়া গেল। কল্যাণী পাষাণ মূর্ত্তির মত সেই স্থানে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার কানের মধ্যে মলের ঝম্‌ঝম্ শব্দ সুস্পষ্ট হইয়া বাজিতে বাজিতে ক্রমে যেন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া দূরে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে তাহার মনে হইল পাশের বাড়ীর দোতলার বারান্দার উপর গিয়া সেই মলের শব্দ হঠাৎ থামিয়া গেল। কল্যাণী বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, শয্যা শূন্য,ঘর শূন্য, তাহার স্বামীও নাই, সেই বধূটিও নাই। তাহার অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল। সে উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল এবং সহসা চৌকাটে হোঁচট খাইয়া সশব্দে মেঝের উপর পড়িয়া গিয়া জ্ঞান হারাইল।

বধূর অনুসরণ করিয়া শান্তিপদ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া তাহার সদর দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। মলের ঝমঝম শব্দের কি তীব্র আকর্ষণ! শান্তিপদকে যেন টানিয়া লইয়া চলিতে লাগিল। সদর দরজাটা আপনি মুক্ত হইয়া গেল এবং বধূ রাস্তার উপর দিয়া তাহার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। শান্তিপদ মন্ত্র-চালিতের মত তাহার অনুসরণ করিল। কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে সেদিকে তাহার এতটুকু হুঁস ছিল না। সে চলিতেছিল, হঠাৎ একস্থানে আসিয়া মলের শব্দ থামিয়া গেল এবং বধূটিকেও আর সে দেখিতে পাইল না। সঙ্গে সঙ্গে তাহার আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গেল। সে গভীর বিস্ময়ে দেখিল সে এক নূতন স্থানে দাঁড়াইয়া আছে। চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া সে একেবারে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। এ কি! সে যে মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহের দোতলার বারান্দার উপর দাঁড়াইয়া আছে! আর তাহার ঠিক সামনে মেজের উপর মৃত্যুঞ্জয়ের জননী পড়িয়া আছে! সহসা মৃত্যুঞ্জয়ের জননী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। শান্তিপদ মনে করিল, তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে ত তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। এ কাহার দিকে সে অমন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে? এমন সময় আবার শব্দ হইল, ঝম্ ঝম্ ঝম্। তাহার সারাদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, চমকিয়া উঠিয়া চাহিতেই সে দেখিল সেই অগ্নিদগ্ধা বধূটি পলকহীন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শ্বশ্রূর মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মলের শব্দও থামিয়া গিয়াছে। মৃত্যুঞ্জয়ের জননী বুক চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "আমিই ত তোমায় পুড়িয়ে মেরেছি মা, আমি বলব, পুলিশের কাছে বলব। আর যন্ত্রণা দিও না মা। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সে কথাও বলব আমার ছেলেও সঙ্গে ছিল।"

শান্তিপদর বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে সেই বধূটি আবার মলের ঝমঝম শব্দ করিয়া বারান্দা ত্যাগ করিয়া পাশের একটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মলের শব্দও আর শোনা গেল না।

এমন সময় পাশের ঘর হইতে মৃত্যুঞ্জয়ের পিতা যজ্ঞেশ্বর ধমক দিয়া উঠিল,—"এখনই হাতে দড়ি পড়বে যে দুজনের, আর চেঁচিয়ে অনুতাপ করতে হবে না। অনেক টাকা দিয়ে দারোগার মুখ বন্ধ করেছি।" বলিতে বলিতে সে বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া শান্তিপদকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "কে কে তুমি?

শান্তিপদ মহা ফাঁপরে পড়িয়া গেল। কি উত্তর দিবে সে? এই গভীর রাত্রে সে একজনের অন্দরমহলে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে, অথচ কেমন করিয়া এখানে আসিয়াছে তাহাও ত সে জানে না।

যজ্ঞেশ্বর রুদ্ধস্বরে কহিল, "কে, কে দাঁড়িয়ে?"

শান্তিপদ অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, "আজ্ঞে আমি শান্তি।"

যজ্ঞেশ্বর ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "এত রাত্রে আমার বাড়ী ঢুকেছ কি করতে, কে তোমার দরজা খুলে দিলে। কেমন করে ঢুকলে? এখনই পুলিশে দেব।"

শান্তিপদ দেখিল মহা বিপদ! কে দরজা খুলিয়া দিয়াছে তাহা সে কিছুই জানে না, কি ভাবে সে এখানে আসিয়াছে সেকথা বলিলেও কেহ বিশ্বাস করিবে না। কি করিবে সে?

সহসা পাশের কক্ষ হইতে একটা গোঙানির শব্দ উত্থিত হইল। যজ্ঞেশ্বর শিরে করাঘাত করিয়া বলিল, "ও ঘরে ছেলে, এখানে তার মা, কি করি কাকে ঠেকাই। নিস্তার নেই, নিস্তার নেই।" সেই কক্ষমধ্য হইতে আবার মলের শব্দ উত্থিত হইল ঝম্ ঝম্ ঝম্। যজ্ঞেশ্বর উন্মাদের ন্যায় সেই কক্ষাভিমুখে ধাবিত হইল।

শান্তিপদ দেখিল এই সুযোগ। সে দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল। প্রবেশ দ্বার উন্মুক্তই ছিল, সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়া রাস্তার উপর দাঁড়াইল এবং কোন দিকে না চাহিয়া সোজা নিজের বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। এতক্ষণ পরে সে যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। একটু দম লইয়া সে উপরে উঠিল। তখনও কল্যাণী চৌকাটের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। পত্নীকে তদবস্থায় দেখিয়া শান্তিপদ ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং জলের কুঁজাটা আনিয়া তাহার মাথাটি কোলের উপর তুলিয়া লইয়া মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে কল্যাণী চোখ মেলিয়া চাহিল। তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া শান্তিপদ কহিল, "আমি আমি কল্যাণী।"

কল্যাণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া কহিল, "আঃ বাঁচলুম,—তোমার কোন বিপদ হয় নি ত? আমার বড্ড ভয় হয়েছিল।"

শান্তিপদ আসল ব্যাপারটি গোপন করিয়া কহিল, "ভয় কিসের, বাইরে থেকে একটু ঘুরে এলুম। বিপদ হতে যাবে কেন। তোমার কাপড়চোপড় ভিজে গেছে, কাপড়টা আগে ছেড়ে ফেল।"

কল্যাণী আর কোন কথা বলিল না। ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। তখনও তাহার সারাদেহ কাঁপিতেছিল। শান্তিপদ তাহাকে ধরিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে কল্যাণী যখন কাপড় ছাড়িয়া শয্যার উপর আসিয়া বসিল, তখন ভোরের আলো জানালার ফাঁক দিয়া কক্ষমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। কল্যাণীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে কহিল, "আমি মনে করেছিলুম বুঝি অনেক রাত আছে, যাক্ বাঁচা গেল। হ্যাঁ গা কি হ'ল বল দিকি? তোমায় কোথায় নিয়ে গেল?"

শান্তিপদ কহিল, "আমি ত ভেবে কিছু ঠিক করতে পারছি না,—আমি কানে যা শুনলুম, চোখে যা দেখলুম, তুমিও ত তাই শুনলে, দেখলে। দুজনের মনের বিকার একরকম হওয়া কি সম্ভব? তারপর আমি ত তার পেছন পেছন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম,—বেশ মনে হচ্ছে আমি একেবারে ওদের বাড়ীর দোতলার বারান্দার ওপর গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। ওখানে ত আমি আগে কোনদিন যাই নি। এত ভুলও কি মানুষের হয়?"

কল্যাণী কহিল, "ভাবতে গেলে এখনও গাটা

শিউরে ওঠে, শুনেছি অপঘাতে মৃত্যু হলে কিম্বা আত্মঘাতী হ'লে, তার আত্মার গতি হয় না— সে এমনই করে ঘুরে বেড়ায়। এতদিন এসব কথা বিশ্বাস করি নি।"

শান্তিপদ কহিল, "তাই ত! এখনও ঠিক বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে না, অথচ অত রাত্রে রাস্তাই বা খোলা পেলুম কি করে, একেবারে সোজা সেই অজানা জায়গায় গিয়েই বা উঠলুম কি করে! দেখ মলের শব্দ হয় ত শোনা যেতে পারে, বৌটিকেও হয় ত দেখা যেতে পারে, কিন্তু দুপুর রাত্রে পরের অন্তঃপুরে গিয়ে ওঠা, এ কিছুতেই হতে পারে না। ও বিকারগ্রস্ত মনের একটা খেয়াল।"

এমন সময় বাহিরে তারিণীবাবুর গলা শোনা গেল।

শান্তিপদ কহিল, "যাই শুনে আসি কিজন্যে আবার ডাকছে—হয় ত এখনই পুলিশ আসবে। বড় হাঙ্গামায় পড়ে গেলুম দেখছি।"

বাহিরে যাইতেই শান্তিপদ দেখিল, তারিণী বাবু আর যজ্ঞেশ্বর বাবু দাঁড়াইয়া আছে।

তারিণীবাবু কহিল, "আপনাকে ত ভাল লোক বলেই ত জানতুম, আপনি কি বলে অত রাত্রে এঁদের বাড়ীর একেবারে দোতলায় গিয়ে উঠেছিলেন?"

শান্তিপদ চমকিয়া উঠিল! তাই ত, সত্যই ত সে যজ্ঞেশ্বরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিল! কিন্তু কি বলিবে সে! একটু ভাবিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত-ভাবে সে কহিল, "আজ্ঞে আমি ইচ্ছে করে এ কাজ করি নি। ওঁরাও ত তাকে দেখেছেন, মলের শব্দও শুনেছেন, এর বেশী কি আর আপনাকে বলব।"

তারিণী রুষ্ট হইয়া কহিল, "আমি একথা বিশ্বাস করতে পারি না। ছি ছি ভদ্রলোকের ছেলে আপনি, আর আপনার এই কাজ।"

এমন সময় মৃত্যুঞ্জয় সেখানে ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, "ইন্‌স্‌পেক্টারবাবু খবর দিয়ে পাঠিয়েছেন, সাহেব নিজে তদারকের ভার নিয়েছেন, এখনই আসবেন।"

যজ্ঞেশ্বরের মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল, তারিণীর দিকে চাহিয়া শুষ্ক কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "সর্ব্বনাশ!"

তারিণী কহিল, "ভয় পাচ্ছেন কেন, শান্তিপদ বাবুর আর আমার মুখ থেকে ত অত্যাচারের কথা ত বের করতে পারবে না, তখন সাহেব আর করবে কি।"

যজ্ঞেশ্বর সহসা শান্তিপদর হাত চাপিয়া ধরিয়া করুণস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি বড় বিপন্ন, আমার মাথার ঠিক নেই, দয়া করে কিছু মনে করবেন না। আমি বুঝতে পেরেছি আপনাকে সে-ই নিয়ে গেছল।"

শান্তিপদ শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, চোখের সম্মুখে সে যেন বধূটির ছায়া মূর্ত্তি দেখিতে পাইল,—ভ্রূকুটি-কুটিল কটাক্ষে সে যেন তাহার দিকে চাহিয়া আছে। শান্তিপদ চীৎকার করিয়া কহিল, "আমি যা জানি সব সত্যি বলব, আপনারা বৌটির ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার করেছেন সব প্রকাশ করে দেব। কারু কোন কথা শুনব না। কাল মিথ্যে কথা বলতে স্বীকার করে যে অন্যায় করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করব।"



দোদুল্যমান শবদেহ

(গোয়েন্দা কাহিনী)

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ

(১)

সহর হইতে বহুদূরে অবস্থিত একটা জনবিরল স্থানে একটি সুসজ্জিত বাড়ীর মধ্যে সদ্য নিদ্রাভঙ্গে ঠিক আপনার সম্মুখস্থ বাতায়ন পার্শ্বেই যদি একটী প্রাণহীন দেহকে দোদুল্যমান অবস্থায় দেখিতে পান, তখন আপনার মনভাব কিরূপ হয় অনুমান করিতে পারেন কি? ভীত হন,—হাঁ একথা আমি জোর করিয়াই বলিতে পারি। যে ভয়াবহ দৃশ্য স্মরণে উদিত হইলেই আজিও আমি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি, তাহা সত্যই শঙ্কাজনক, অতি সাহসীর অন্তরেও তাহা ভীতির সঞ্চার করে। সে কি অসম্ভব ভীষণ চিত্র!

বেশী দিনের কথা নহে। আমি তখন সবেমাত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া আমাদের একমাত্র জাতীয় অবলম্বন কেরাণীর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছি, তবে উচ্চাকাঙ্ক্ষার নেশা তখনও মন হইতে বিদূরিত হইয়া অন্তরটীকে ঠিক কার্য্যের সহিত মিশাইয়া দিতে পারে নাই। অবাধ্য হৃদয় তখনও উন্মনাভাবে বাহিরের দিকেই ছুটিতে চাহিত; কষ্টে তাহাকে সংযত করিতাম। সেই সময় হঠাৎ এক দিন বাল্যবন্ধু সত্যেনের নিকট হইতে কিছুদিন তাহার গৃহে থাকিবার জন্য বহু অনুরোধপূর্ণ একখানা পত্র আমার নিকটে আসিল। কর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া আমিও যেন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলাম। সম্মুখেই ছিল বড়দিনের ছুটী, তাহার সহিত আর কয়েকদিন একত্র করিয়া অবকাশের পরিমাণ কিছু বাড়াইয়া লইয়াই আমি বন্ধুর আদেশ পালনার্থ যাত্রা করিলাম। আমার ক্লিষ্ট চিত্ত বহু দিবস পরে আবার যেন সুস্থ সরস হইয়া উঠিল।

সত্যেন ধনী সন্তান। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুনীল ভিন্ন সংসারে আপন জন তাহার বড় কেহ ছিল না। চিরকুমার থাকাই ছিল তাহার সঙ্কল্প। পিতার মৃত্যুর পরই সে কলিকাতার বাস উঠাইয়া দিয়া পশ্চিমের একটী ছোট সহরের একান্তে একটী সুদৃশ্য বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিল। সুনীল তাহাদের কলিকাতার বাটীতেই থাকিত।

আমি যেদিন আসি তাহার দিন দুই পূর্ব্বেই সুনীলও সেখানে বেড়াইতে আসিয়াছিল। আর আসিয়াছিল আমার ও সত্যেনের সতীর্থ নলিন। বহুদিন পরে আমাকে ও নলিনকে পাইয়া সত্যেন অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। দিনগুলা আমাদের অবাধ আনন্দের মধ্য দিয়াই কাটিয়া চলিতেছিল। অফুরন্ত হাসি গল্প ভ্রমণে আবার যেন সেই উজ্জ্বল হর্ষময় বাল্যজীবন ফিরিয়া পাইলাম।

(২)

বহুদূর পর্য্যটনে ক্লান্ত দেহে শয্যা লইয়াই সে দিন গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। সমস্ত রজনী কোথা দিয়া অতিবাহিত হইল তাহা অনুভবও করিতে পারি নাই। আবদ্ধ সার্সির মধ্য দিয়া উষার স্নিগ্ধ জ্যোতি-লেখার সহিত বিহঙ্গের প্রভাত বন্দনা-গীতি কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমার সেই গম্ভীর সুপ্তি ভাঙ্গিয়া দিয়া যে দৃশ্য আমার চোখের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিল তাহা যেমনই অভাবনীয় তেমনই ভয়াবহ! নেত্র উন্মীলন করিয়া সম্মুখের দিকে চাহিয়াই আমি সাতঙ্কে শিহরিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিলাম। একি দেখিতেছি! আমার সম্মুখস্থ বাতায়ন সমীপে ওটা কি দুলিতেছে? বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে সেদিকে চাহিলাম। না, এ ত দৃষ্টিভ্রম নহে! সত্যই এ যে একটা নরদেহ, উপর হইতে লম্বিত রজ্জুর অগ্রভাগ তাহার কণ্ঠের সহিত আবদ্ধ! এও কি সম্ভব? আমি সত্যই জাগ্রত, না স্বপ্ন দেখিতেছি? উভয় হস্তে নিদ্রাজড়িত নয়ন মার্জ্জনা করিয়া চাহিলাম। কিন্তু সেই ভীষণ অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য তেমনই ভাবে আমার সম্মুখে আমার শয্যা হইতে মাত্র কয় হস্ত দূরে তেমনই পরিস্ফুট রহিল। একটা অস্ফুট শব্দমাত্র আমার স্পন্দিত ওষ্ঠ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিল। জীবিত ব্যক্তি কখনও এভাবে গলদেশে রজ্জু বাঁধিয়া এভাবে দুলিতে পারে না। নিশ্চয় এ কাহারও জীবনহীন দেহ। হা ভগবান, একি দেখিলাম! তখনও যেন আমি সম্মুখের দৃশ্যটাকে ঠিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। স্তব্ধ অপলক নেত্রে সেইদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। দেহটা তেমনই ভাবে আমার চোখের সম্মুখে দুলিতে লাগিল। হঠাৎ এক সময় তাহার অনাবৃত পদপ্রান্ত আমার বদ্ধ সার্সির উপর আসিয়া পড়িয়া একটা মৃদু ধ্বনি উত্থিত করিল! সেই শব্দে আমি যেন লুপ্ত সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া ত্রস্তে শয্যাত্যাগ করিয়া অপর পার্শ্বস্থ বাতায়নটা উন্মুক্ত করিয়া দিলাম প্রভাতের আলোকশিখা পূর্ণভাবে কক্ষ মধ্যে নিপতিত হইয়া সেই বীভৎস দৃশ্যটাকে আরও সুস্পষ্ট করিয়া তুলিল! আর একবার সেইদিকে চাহিয়াই আর্ত্তকণ্ঠে আমি বলিয়া উঠিলাম, সত্যেন!

যদিও সে শবদেহের সম্মুখভাগ আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না, তথাপি তাহাকে চিনিবার পক্ষে কোন বাধা হইল না,—এ সত্যেনেরই দেহ। ঐ তো গাত্রে তাহার সেই কচি কলাপাতা রংএর শালের লম্বা কোট। এই রঙের এবং এই ধরণের শালের গরম জামা বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না! এই জামাটা দেখিয়াই সহস্র লোকের মধ্য হইতে তাহাকে নির্ণয় করা দুষ্কর হইত না। অবশ নিস্পন্দ দেহে আমি সেইদিকে চাহিয়া রহিলাম। কি ভয়াবহ সে দৃশ্য! তাহার বিশৃঙ্খল কেশ প্রভাত পবনে আন্দোলিত হইতেছিল, বেশভূষা অবিন্যস্ত। কণ্ঠের রজ্জু উর্দ্ধদিকে উঠিয়া গিয়াছে। বোধ হয় দ্বিতলের কোন বাতায়নের সহিত তাহা আবদ্ধ।

সত্যেনের পদপ্রান্ত দুলিতে দুলিতে আবার সার্সিতে আঘাত করিল। আমি চমকিয়া উঠিলাম। একবার সেইদিকে চাহিয়া ক্ষিপ্র হস্তে দ্বার উন্মোচন করিয়া ডাকিলাম, নলিন নলিন শীগ্‌গির এস।

আমার কক্ষের পার্শ্বস্থ কক্ষেই নলিন থাকিত। সে তখন গাঢ় সুপ্তি মগ্ন। আমার আহ্বানে উত্তর দিল না। আমি সজোরে তাহার রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া অসহিষ্ণু কণ্ঠে পুনরায় ডাকিলাম, নলিন, নলিন!

নলিন বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কি, কি হিরণ!

আমি ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলাম, শীগ্‌গির বেরিয়ে এস।

সে আর কিছু না বলিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিয়া

বাহিরে আসিতেই আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় আপন কক্ষে প্রবেশ করিলাম।

এ কি, সত্যেন সত্যেন! নলিন বিবর্ণ নিস্পন্দ দেহে পলকহীন দৃষ্টিতে সেই দোদুল্যমান শবদেহের দিকে চাহিয়া রহিল। দারুণ আতঙ্কে তাহার স্বাভাবিক চৈতন্য পর্য্যন্ত যেন হ্রাস হইয়া আসিল!

আমি তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলাম, শীগ্‌গির ওপরে চল কি হয়েছে দেখি।

সকচিতে আমার দিকে চাহিয়া সে বলিল, চল চল, ওঃ কি ভয়ানক। এ কি কাণ্ড!

আমি বলিলাম, সুনীল বোধ হয় এখনও কিছুই জানে না, তাকেও ডেকে নিয়ে যাই,— না থাক দেরী হয়ে যাবে।

কোনমতে সোপানগুলা অতিক্রম করিয়া আমরা সত্যেনের কক্ষের সম্মুখে আসিলাম। চতুর্দ্দিকে খোলা ছাদ, উপরে একটী মাত্রই কক্ষ। সজোরে আমি দ্বারে আঘাত করিলাম। আমরা যাহা অনুমান করিয়াছিলাম তাহাই হইল। দ্বার বদ্ধই ছিল। সে আঘাতে ভিতর হইতে আবদ্ধ দ্বার মুক্ত হইল না! নলিন আমাকে সরাইয়া দিয়া অত্যন্ত জোরে বার বার দ্বারে পদাঘাত করিতেই সশব্দে দরজা খুলিয়া গেল। ত্রস্তে আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম দ্বার খুলিতেই সম্মুখস্থ মুক্ত বাতায়ন দিয়া হিমশীতল প্রভাত সমীর সবেগে বহিয়া গেল। কিন্তু যে দৃশ্য তখন আমাদের দৃষ্টি পথে পতিত হইল তাহাতে কিছু উপলব্ধি করিবার শক্তি পর্য্যন্ত তখন আমাদের অন্তর্হিত হইয়াছিল। নির্ণিমেষ নেত্রে আমরা শুধু গৃহতলে চাহিয়া রহিলাম। দ্বার হইতে স্বল্প দূরেই ভূমিতলে সত্যেনের প্রাণহীন দেহ পড়িয়া আছে! গাত্রে সেই কচি কলাপাতা রঙের শালের লম্বা কোট, একটা সুদীর্ঘ রজ্জু তাহার বক্ষের উপর জড়িত রহিয়াছে, তাহার একাংশ অদূরস্থ পর্য্যাঙ্কের সহিত আবদ্ধ। কি আশ্চর্য্য। কয় সেকেণ্ড পূর্ব্বে যাহাকে বাতায়ন সম্মুখে দেখিলাম কিরূপে সে এখানে আসিল? কিছুক্ষণ অভিভূত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমি ধীরে ধীরে সত্যেনের পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। ব্যগ্র ভাবে একবার তাহার দেহ পরীক্ষা করিলাম। দারুণ ব্যথায় আমার সমস্ত অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল। বাল্য বন্ধু, আমার প্রিয় সুহৃৎ, তাহার এই শোচনীয় মৃত্যু আমাকে ব্যাকুল ব্যথিত করিয়া তুলিল! আমার নেত্র-প্রান্ত সিক্ত করিয়া কয় বিন্দু অশ্রু তাহার বক্ষের উপর ঝরিয়া পড়িল!

নলিন তেমনই স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। সহসা সে বলিয়া উঠিল, হত্যাকারী নিশ্চয়ই এই ঘরে কোথাও লুকিয়ে আছে, সেই সত্যেনকে আবার উপরে তুলে নিয়েছে!

ত্রস্তে আমিও উঠিয়া দাঁড়াইলাম। নলিন কক্ষ-দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া অনুসন্ধিৎসু ভাবে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। আমি মুক্ত বাতায়ন সমীপে আসিয়া দাঁড়াইলাম। গবাক্ষ গরাদে-বেষ্টিত নহে। আমি তাহার মধ্য দিয়া নিম্ন দিকে ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিলাম। ঠিক নীচেই আমার কক্ষ, যে বাতায়নে ক্ষণ পূর্ব্বে সত্যেনের দেহ ঝুলিতে দেখিয়াছিলাম তাহা এখন শূন্য! চতুঃপার্শ্বের কোথাও জনমানবের চিহ্ন মাত্র নাই। আমার কক্ষের নিম্নেই মনোরম উদ্যান। পুষ্পভারাবনত ক্ষুদ্র তরুগুলি শীত-সমীর স্পর্শে যেন শিহরিয়া উঠিতেছিল। পূর্ব্বাকাশে তখন রবিচ্ছবি সবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি কক্ষ মধ্যে আসিয়া নলিনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, কৈ কিছুই তো দেখছি না!

নলিন তখন উন্মাদের মত সমস্ত কক্ষ অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। প্রত্যেক 'সেলফ' 'আলমারি' টেবিল চেয়ার সে টানিয়া দেখিতেছিল। আমার কথায় সে বলিল, নিশ্চয় সে এই ঘরে আছে। কোন্ পথ দিয়ে সে পালাবে? এই একটা দোর ভিন্ন আর তো পথ নাই।

সত্যই আমিও অত্যন্ত বিস্ময় অনুভব করিতেছিলাম! মাত্র এই কয় মুহূর্তের মধ্যে মৃত দেহ নিম্ন হইতে নিঃশব্দে উত্তোলিত হইলই বা কিরূপে, আর তাহাকে ভূমিতে ফেলিয়া রাখিয়া হত্যাকারী অন্তর্হিত হইলই বা কোন্ পথ দিয়া? এ যে দারুণ প্রহেলিকা!

বাহির হইতে দ্বারে সজোরে কে আঘাত করিয়া বলিল, কি হয়েছে,—এত গোলমাল কিসের? দাদা দাদা।

এ যে সুনীলের কণ্ঠস্বর। আমি উঠিয়া দ্বার খুলিলাম।

কি হয়েছে হিরণ দা, কি হয়েছে? এ কি এ কি দেখছি! দাদা দাদা। শুষ্ক পাণ্ডুর আননে ভীতিবিহ্বল নেত্রে চাহিয়া সুনীল কাঁপিতে কাঁপিতে গতপ্রাণ জ্যেষ্ঠের পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। আমি ও নলিন উভয়েই করুণ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

ক্ষণ পরে নলিন কহিল, হত্যাকারী নিশ্চয়ই এই ঘরে কোথাও লুকিয়ে আছে দরজার উপর দৃষ্টি রাখ।

সুনীল আতঙ্কে শিহরিয়া বলিল, কি, হত্যা! হত্যা! দাদাকে খুন করেছে?

আমি ধীর স্বরে কহিলাম, হাঁ হত্যাই। কয় মিনিট পূর্ব্বে আমি সত্যেনের দেহ এই দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় আমার ঘরের জানলার সামনে ঝুলতে দেখেছি, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে ওপরে এসে দেখি সত্যেনের দেহ ঐ অবস্থায় মেঝের ওপর পড়ে আছে!

কি বলছেন? এ্যাঁ? সে কি তাহলে নিজেই ওঠে এসেছে? ভীতস্খলিত কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করিয়াই সুনীল কিছু দূরে সরিয়া আসিল। তাহার সমস্ত দেহ সেই দারুণ শীতেও যেন স্বেদ-সিক্তিত হইয়া উঠিল। আমার মনে হইল তাহার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়াও অসম্ভব নহে।

সস্নেহে তাহার পৃষ্ঠে হস্ত রাখিয়া আমি কহিলাম, না, সে নিজে ওঠেনি নিশ্চয়ই। যে তাকে হত্যা করেছে সেই তাকে এখানে ফেলে রেখে গেছে, কিন্তু সে কোথা দিয়ে কেমন করে পালাল তা ত বুঝতে পারছি না, আমরা এসে দেখলুম দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, বেরুবারও ত আর কোন পথ নেই। দেহ ঝুলতে পারে কিন্তু উঠে আসে কি করে! তাই ত!

সুনীল তখন কতকটা সুস্থ হইয়াছিল। ভীত নেত্রে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া সে কহিল জানালা ভিন্ন তার যাবার আর তো কোনও পথ নাই।

কিন্তু তারও ত সময় ছিল না। এক মিনিট পূর্ব্বে যে আমি আর নলিন নীচের জানালায় সামনে এ দেহ ঝুলতে দেখেছি। এর মধ্যে নিঃশব্দে একে তুলে এখানে রেখে আবার জানালা দিয়ে নেমে যাওয়া এ পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান ব্যক্তিও যে পারে না! এ অসম্ভব।

আঁখি-প্রান্ত হইতে কয় বিন্দু অশ্রু মুছিয়া সুনীল বলিল, দাদার তো কারো সঙ্গে শত্রুতা ছিল না, কে তাঁকে এ ভাবে হত্যা করবে? জানালা দিয়ে ঝুলিয়ে রেখে আবার এমন নিষ্ঠুর ভাবে মেঝের ওপর ফেলে রেখে যাবেই বা কেন?

চিন্তিত ভাবে নলিন বলিল, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না! অদ্ভুত অসম্ভব ব্যাপার! এত শীঘ্র তুলে ফেলে রেখে পালিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু মৃতদেহের নিজে উঠে আসাও কি সম্ভব?

সুনীলের নেত্রে ভীতির চিহ্ন আবার সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল। কম্পিত কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল, আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না এখনও। একি হল, দাদাকে এ ভাবে কে হত্যা কর্লে?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আমি বলিলাম, ভগবানই জানেন। যা হবার তা হয়েছে,—এখন কি ব্যবস্থা করা যায়? এখনই ত পুলিশে খবর দেওয়া দরকার।

সুনীল কহিল, তা ত দিতেই হবে। এর কিনারা করতেই হবে। কে দাদার এমন শত্রু ছিল, যেমন ক'রে হ'ক তার সন্ধান করতেই হবে।

নলিনের দিকে চাহিয়া আমি বলিলাম, তুমি তা হ'লে সুনীলের কাছে থাক, আমি থানায় খবর দিয়ে আসি। সত্যেনের সাইকেল নিয়ে আমি যাচ্ছি, শীগ্‌গির ফিরে আসব।

আর কিছু না বলিয়া ত্রস্ত পাদক্ষেপে আমি নিম্নতলে আসিয়া কোন মতে একটা মোটা কোট গাত্রের উপর চাপাইয়া লইয়া চটি পায়েই সাইকেল লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। ভৃত্যবর্গ তখনও সুখসুপ্ত, তাহাদের আর জাগাইলাম না।

পথপার্শ্বস্থ সুউচ্চ বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়া নব রবির স্বর্ণ কিরণ তখন সবেমাত্র বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিল দিবসের প্রস্ফুট আলোকে ক্ষণপূর্বে দৃষ্ট ভীষণ দৃশ্যটা যেন স্বপ্নের মতই বোধ হইতেছিল। সমস্ত অন্তর জুড়িয়া দারুণ বিষণ্ণতা বিরাজ করিতেছিল। পথ তখনও প্রায় জনমানবশূন্য। দুই একজন পথিক সবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া থানার পথটা জানিয়া লইলাম। তারপর সেই পথ ধরিয়া আমি পূর্ণবেগে সাইকেল চালাইলাম। চারি মাইল পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। কোন দিকে আমার হুঁস ছিল না, কোনরূপ সতর্কতা অবলম্বন না করিয়াই আমি ছুটিয়া চলিয়াছিলাম। সহসা একটা মোড় ঘুরিবার মুখেই একটা বাঁধের সহিত সজোরে ধাক্কা খাইয়া আমি ছিটকাইয়া পড়িলাম। সৌভাগ্যক্রমে আঘাতটা বিশেষ গুরুতর হয় নাই, আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাইকেলখানা তুলিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলাম।

এ রাস্তা দিয়ে কখনও এত জোরে চলে, যাক আপনি বিশেষ আঘাত পান নি ত? অঙ্গের ওপর দিয়ে গেছে বোধ হয়।

নরকণ্ঠ স্বরে সচকিতে চাহিতেই দেখিলাম, সম্মুখেই একটী সুদৃশ্য উদ্যান-বাটিকা। তাহারই ফটকে এক বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া আছেন। সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে এইরূপ বিপন্নাবস্থায় একজন স্বদেশবাসীকে দেখিয়া বিক্ষুব্ধ মনের মধ্যে কতকটা স্বস্তি অনুভব করিলাম। বিনীতভাবে আমি বলিলাম, আমার মাথার ঠিক ছিল না,—আমি যে বাড়ীতে আছি সেখানে এক ভয়ানক কাণ্ড হয়েছে, আমি পুলিশে খবর দিতে যাচ্ছিলুম।

বৃদ্ধ আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, ভয়ানক কাণ্ড! আপনি বাঙ্গালী, আপনি এখানে নিশ্চয়ই নতুন এসেছেন। আপনি কি 'রায় কুটীরে' অর্থাৎ সত্যেন রায়ের বাড়ীতে এসে উঠেছেন?

আমি বলিলাম, আপনার অনুমানই ঠিক।

আচ্ছা চল, দেখি কি ব্যাপার, বলিতে বলিতে তিনি উদ্যানের বাহিরে পথের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার এই অযাচিত আগ্রহ আর এই সখের গোয়েন্দাগিরি করিতে চাওয়ায় আমি ঈষৎ বিরক্তির সহিত কহিলাম, পুলিশ আসবার আগে আমি সেখানে আপনাকে কি করে নিয়ে যাই।

তিনি মৃদু হাসিয়া কহিলেন, সেজন্যে আপনার কোন চিন্তা নেই। এখানকার থানার দারোগা আমায় ভাল করেই জানেন। আমার নাম প্রকাশ বসু। আমিও সত্যেনের মত এখানে ছোট একখানি বাড়ী করে বসবাস করবার ব্যবস্থা করেছি, সত্যেন আমাকে খুব চেনে।

ব্যথিত কণ্ঠে আমি বলিলাম, আজ্ঞে, সত্যেনই খুন হয়েছে। সে আমার বিশেষ বন্ধু ছিল।

প্রকাশ বাবু একটা আক্ষেপসূচক শব্দ উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, আহা! সত্যেন মারা গেছে! বল কি হে! সে যে খুব ভাল লোক ছিল। আমায়ও বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করত। তা হ'লে ত আর দেরী করা চলে না। তারপর তাঁহার ভৃত্যের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, হ্যাঁ দেখ রঘু তুই কাজ এখন বন্ধ রেখে থানায় গিয়ে

খবর দে, যে সত্যেন বাবুর বাড়ীতে খুন হয়েছে। দারোগা সাহেব যেন এখনি আসেন।

আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বে তিনি অগ্রসর হইলেন। আমি নীরবে তাহার অনুগমন করিলাম। এই লোকটীর লোকের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এক একজন লোকের সকলকার উপর প্রভাব বিস্তার করিবার মত ঈশ্বরদত্ত শক্তি থাকে দেখিয়াছি, এই ভদ্রলোকটীও সেই শ্রেণীর। তিনি যেন আমাকেও ক্ষণমধ্যে তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী করিয়া তুলিলেন।

পথে আমি সমস্ত ঘটনাটা সংক্ষেপে তাহাকে জানাইয়া বলিলাম, আচ্ছা আপনি কি কোন মৃতদেহকে এভাবে জানলা দিয়ে উঠে ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখেছেন?

না, তা কখনও দেখিনি; তবে মৃতদেহ অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছি,—তাদের আবার বেঁচে উঠতেও দেখেছি, কিন্তু একতলার জানলার সামনে ঝুলতে ঝুলতে দোতলার ঘরে দিয়ে পড়ে থাকতে কোন মৃতদেহকে কখনও আমি দেখিনি, আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে!

আমরা তখন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম; উপরে উঠিতে উঠিতে বলিলাম, সত্যই আশ্চর্য্য, কিন্তু নিজের চোখকেও তো অবিশ্বাস করা যায় না! এটা যেমনই মর্ম্মপীড়ক তেমনি আশ্চর্য্য ঘটনা।

গম্ভীর ভাবে শির সঞ্চালন করিয়া প্রকাশ বাবু কহিলেন, হাঁ ব্যাপারটা বড় রহস্যময়। সেইজন্য মনে হচ্ছে, এ রহস্য ভেদ সহজেই হয়ে যাবে। যে ব্যাপারটা বাইরে থেকে যত জটিল দেখায় কার্য্যক্ষেত্রে নামলে দেখা যায় সেটা তত সরল।

(৩)

আমরা কক্ষদ্বারে আসিলাম। দ্বার উন্মুক্তই ছিল। বিষণ্ণ শোকাকুলভাবে সুনীল ভ্রাতার মৃতদেহের পার্শ্বেই বসিয়াছিল [illegible] বার [illegible] ত্যেনের একখানা চেয়ারে বসিয়া বাহিরের [illegible] ছিল। আমার সহিত প্রকা[illegible]বু[illegible] [illegible]ব? পুলিশ উভয়েই বিস্মিত হইল। পথের সাইবে [illegible]। দেখুন কথা সংক্ষেপে জানাইয়া বলিলাম, [illegible] মিথ্যে সত্যেনেরই একজন বন্ধু। তাহারা কি[illegible] না। তবে এরূপ স্থলে একজন বাহিরের [illegible] লইয়া আসায় উভয়েই বিরক্ত হইয়াছে বলি[illegible] যে [illegible]হ বোধ হইল।

প্রকাশবাবু অনর্থক বাক্য ব্যয় না করিয়া অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত মৃতদেহটীর পরীক্ষায় ব্যাপৃত হইলেন। কিছুক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে দেখিয়া তাহার পর আমাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার অনুমান ঠিক, ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে এঁর মৃত্যু হয়েছে।

আমি কহিলাম, হাঁ, অনেকক্ষণ আগে তার মৃত্যু হয়েছে সেটা আমি অনুমান করেছিলাম,—কিন্তু ঘণ্টার আন্দাজ আমার ছিল না।

প্রকাশ বাবু নলিনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, আপনিও কি এই দেহটা দড়ি বাঁধা অবস্থায় ঝুলতে দেখেছিলেন? ঠিক দেখেছিলেন মনে পড়ছে?

একবার ভূলুণ্ঠিত সত্যেনের দিকে চাহিয়া সে বলিল, চোখের ওপর এখনও সে ভয়ানক দৃশ্য উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে মশাই। তাকে এই জানলায় নীচে ঐ ভাবে দেখে আমরা এক রকম লাফিয়ে এই সিঁড়ি ক'টা উঠে এসেই দেখলুম সত্যেনের দেহ ঠিক এই ভাবে পড়ে আছে। অদ্ভুত প্রহেলিকা।

হাঁ খুবই অদ্ভুত বটে। আচ্ছা দেখি।

প্রকাশ বাবু সত্যেনের কণ্ঠস্থিত সেই রজ্জুটা তুলিয়া একবার দেখিয়া পুনরায় রাখিয়া দিলেন। তাহার পর উঠিয়া জানালাটা বহুক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, হিরণ বাবু এই ঘরের নীচেই কি তোমার ঘর?

হইল ? আমরা যে তাহাকে কণ্ঠে রজ্জু বদ্ধাবস্থায় দেখিয়াছি। অথচ কণ্ঠে বন্ধনচিহ্ন মাত্র নাই, ইহা কিরূপে সম্ভব হইল ? ক্রমে যে রহস্য জটিল হইয়া আসিতেছে দেখিতেছি। বিস্মিত ভাবে কহিলাম, একি আশ্চর্য্য ! আমরা তুজনেই দেখলুম তার গলায় দড়ি বাঁধা রয়েছে, অথচ এখন দেখছি গলায় কোন দাগ পড়েনি, এ কি করে সম্ভব হ'ল ? এ ত ভারি অদ্ভুত ব্যাপার ! মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখলেই বা কি করে আর তুললেই বা কি করে ?

গম্ভীরভাবে প্রকাশ বাবু কহিলেন, মৃতদেহ কেউ ওপরে তোলে নি।

তোলেনি সে আবার কিরকম ? আমি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া এই প্রশ্ন করিলাম।

বিদ্রূপের ভঙ্গীতে নলিন পুনরায় বলিল, তাহলে মৃতদেহটা নিজেই একতলা হতে জানলা দিয়ে দোতলার ঘরে উঠে এসেছে এই কি আপনি বলতে চান ?

প্রকাশ বাবু সে কথার উত্তর না দিয়া স্থির উজ্জ্বল নেত্রে আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমরা তিনজনে ঐ খাটের উপর গিয়ে একবার বস, পা থেকে জুতোগুলো একবার খুলে ফেল।

সুনীল ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, তাতে কি হবে ? আপনি দেখছি ভারি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছেন।

আদেশব্যঞ্জক স্বরে প্রকাশ বাবু উত্তর দিলেন, আমার কিছু দেখবার আছে। তোমাদের বসতে হবে দয়া করে।

আমরা বৃথা বাকবিতণ্ডা না করিয়া তাহার নির্দ্দেশমত খাটের উপর বসিয়া চটীগুলা পা হইতে খুলিয়া রাখিলাম। নলিন অস্ফুট বিরক্ত স্বরে বলিল, কোথা হতে এ আপদ এনে জোটালে হিরণ, জালিয়ে খেলে !

সুনীল অল্প হাসিল, কিছু বলিল না।

প্রকাশ বাবু খুব তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু নয়নে নলিনের পা ধরিয়া তাহার পদতল পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। আমরা তাচ্ছিল্যভরে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। নলিনের পা অল্পক্ষণ দেখিয়াই তিনি ছাড়িয়া দিয়া আমার পদতলে মনোনিবেশ করিলেন।

এই সময় বাহিরে কয়েক ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। সুনীল বলিল, পুলিশ এল বোধ হয়।

তাহার বাক্য শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশবাবুর সেই উদ্যানরক্ষক রঘুয়ার সহিত খাকি-পরিচ্ছদধারী দারোগা সাহেব সদলবলে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাটীস্থ ভৃত্যবর্গও ভীত কৌতূহলী চিত্তে সেখানে সমবেত হইয়াছিল।

(৪)

প্রকাশবাবু তখন আমাকে মুক্তি দিয়া সুনীলের পদপ্রান্তে দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়াছিলেন। দারোগা বিস্মিতভাবে সেইদিকে চাহিয়া কি বলিবার উপক্রম করিতেই সুনীলের পা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রকাশবাবু তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া স্থির দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, দারোগা সাহেব তোমার কাজ আমি শেষ করেছি ! একে তুমি গ্রেপ্তার কর। শ্রীযুক্ত সত্যেন রায়ের হত্যাকারী এই যুবক। তিনি সুনীলের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলেন। রোষে বিস্ময়ে আমরা তিনজনই লাফাইয়া উঠিলাম। সকলের আগেই ক্রুদ্ধকণ্ঠে নলিন বলিল, পাগলের মত কি বলছেন আপনি ?

আমাদের দিকে না চাহিয়াই গম্ভীর স্বরে তিনি কহিলেন, দারোগা সাহেব হত্যাকারী পালাবার চেষ্টা করছে আগে তাকে ধর, প্রমাণ আমি দিচ্ছি।

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সুনীল একলম্ফে দ্বার সম্মুখে উপনীত হইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেই একজন পুলিশ কর্ম্মচারী ও রঘুয়া দৃঢ়ভাবে তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। আমরা স্তম্ভিত ভীত নেত্রে দেখিলাম সুনীলের

সমস্ত মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে! সমীরা-ন্দোলিত তরুপত্রের মত তাহার সর্ব্বদেহ সঘনে কাঁপিতেছিল! প্রকাশবাবুর আদেশে দারোগা সাহেব তাহার হস্তে লৌহবন্ধনী পরাইয়া দিলেন। তিনি যেন অত্যন্ত বাধ্য বিনীত বালকের মতই প্রকাশবাবুর প্রত্যেক আজ্ঞাটী বিনা প্রতিবাদে পালন করিতেছিলেন। আমরা একেবারে স্তব্ধ নির্ব্বাক হইয়া পড়িয়াছিলাম। সুনীল হত্যাকারী! এও কি সম্ভব? কিন্তু সেই বা ওরূপ হইয়া গেল কেন? কই সে ত আপনাকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে না? অপরাধীর মতই শুষ্ক পাণ্ডুর মুখে ভীতভাবে নতশিরে দাঁড়াইয়া আছে। তবে কি সত্যই তাই? কিন্তু তাও কি সম্ভব?

নলিন কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই আমাদের দিকে চাহিয়া প্রকাশবাবু কহিলেন, তোমরা হয় ত ভাবছ আমি ভুল করেছি কিন্তু আমার যে ভুল হয়নি তার প্রমাণ এখনই আমি দেব। আগে এই খুনের সমস্ত বিবরণ দারোগা সাহেবকে বলে দিই।

আমরা নীরবে শুধু চাহিয়া রহিলাম। আমরা যেন কেমন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম।

সমস্ত বৃত্তান্তই যথাযথভাবে দারোগা সাহেবকে জানাইয়া পরিশেষে প্রকাশবাবু বলিলেন, এখানে এসে আমি দেখলুম হত্যাকারীর যখন জানলা দিয়ে যাওয়া ভিন্ন পথ নাই অথচ এক মিনিটের মধ্যে নিঃশব্দে এই দেহটা উপরে তুলে জানালা দিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়, তখন বুঝলুম এর মধ্যে কোথাও একটা সূত্র ছিন্ন হয়ে আছে। তারপর জানলার নীচের ঘাসগুলো পরীক্ষা করে দেখলুম হত্যাকারী জানলা দিয়ে নেমে বাড়ীর বাইরে যায় নি, সে ভিতরেই আছে, তখন আমার সন্ধানের পথটা আরও সহজ হয়ে এল। এই সময় লক্ষ্য করলুম যে জানলায় এঁরা একটা নরদেহ ঝুলতে দেখেছিলেন, তারই নীচের কার্ণিশটায় কয়দিন পূর্ব্বেই বোধ হয় একটু চূণ বালির কাজ করা হয়েছিল।

আমি আশ্চর্য্যভাবে বলিলাম, হাঁ, আমি আসার পরই ওখানে চূণ বালির কাজ হয়েছে, কার্ণিশের খানিকটা ভেঙ্গে গেছল, সত্যেন সেটা সারিয়ে নিয়েছিল।

প্রকাশবাবু একটু জোরের সহিত বলিলেন হাঁ সেই জন্যই ত এত সহজে এই জটিল ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে গেল। আমি পরীক্ষা করে দেখলুম কার্ণিশটা স্পর্শ করলেই সেখানে চূণের গুঁড়া লেগে যায়। তাই আমার মনে হল হয় ত হত্যাকারীর পায়ে সে দাগ থাকা সম্ভব। আমার অনুমান যে অসঙ্গত নয় তার প্রমাণ এই দেখ। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে সুনীলের পদতল উচ্চ করিয়া তুলিলেন। আমরা কয়জনে সবিস্ময়ে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দেখিলাম সত্যই তাহার পদতলে একটা অতি ক্ষীণ সাদা দাগ বর্ত্তমান; প্রকাশবাবু সুনীলের চটী জোড়া সরাইয়া আনিয়া বলিলেন, এই দেখ এতেও দাগ রয়েছে তাড়াতাড়িতে পাটা ধুয়ে ফেলবার অবকাশ ইনি পান নি বলেই এই বিভ্রাট,—তখনই আবার তোমাদের কাছে এ ঘরে আসতে হয়েছিল। এঁকে যে কেউ সন্দেহ করতে পারে সেটা ইনি ভাবতেও পারেন নি।

আমি তখনও দ্বিধাযুক্ত স্বরে কহিলাম, কিন্তু অত শীঘ্র মৃতদেহ তুলে রেখে কি করে সে নীচে গেল? এ অসম্ভব।

প্রকাশবাবু অল্প হাসিলেন, অসম্ভব নয় হিরণ বাবু। আসলেই যে তোমরা ভুল করেছ। দেখছ না সত্যেনবাবুর গলায় দড়ির দাগ নেই। উপর থেকে দড়িবাঁধা অবস্থায় কোন লোক যদি ঝোলান থাকে নিশ্চয়ই তার গলায় দাগ থাকবে। তোমরা যাকে দেখেছ সে মৃতদেহ নয়। সে এই জীবিত ব্যক্তি সুনীলবাবু।

আমি ও নলিন সাশ্চর্য্যে কহিলাম, সে কি!

হাঁ তাই! কি হয়েছে ব্যাপারটা আমি এক

রকম অনুমান করেছি। বলে যাচ্ছি, যদি ভুল হয় সুনীলবাবু আপনি তাহলে সংশোধন করে নেবেন। এই সুনীলবাবুর কোনও কারণে ভাইকে খুন করবার প্রয়োজন হয়, কারণটা কি অবশ্য আমি জানি না, তবে অর্থাদি সংক্রান্ত ব্যাপার হওয়াই সম্ভব। হ্যাঁ তারপর যা বলছি,—সত্যেনবাবু দরজা খুলেই শুতেন, সুনীলবাবু অবশ্য তা জানতেন। ইনি গত রাত্রে সেই পথে ঘরে এসে গলা টিপেই তাঁর ভবের লীলা শেষ করে দিয়ে তাঁকে ঐখানে ঐভাবে রেখে একটা দড়ি এই জানালার সঙ্গে হুক দিয়ে আটকে দেন—সেটা নীচে থকে টানলেই সহজে খুলে আসতে পারে, সেই দড়িটার দুটা দিক নীচের দিকে ছিল। একটা দিকে দুটো 'রিং' আটকে সেই দুটী ইনি দুই হাতের নীচে পরে নিয়েছিলেন যাতে এর দেহের ভারটা সেটাতেই ন্যস্ত থাকে। দড়ির আর একটা দিক দিয়ে গলার একটা আলগা ফাঁস দিয়ে নিয়েছিলেন। সেটা শুধু তোমাদের দেখাবার জন্য। দেহের ভারটা হাতের উপর পড়ায় গলায় এর ফাঁস আটকায় নি। তোমরা যে দেখেছিলে হাওয়ায় দেহটা দুলছে সেটা ঠিক নয়। ইনি নিজেই ইচ্ছা করে দুলছিলেন আর পা দিয়ে তোমার সার্সিতে ধাক্কা লাগিয়ে শব্দ করেছিলেন।

আমরা অভিভূতভাবে তাঁহার কথা শুনিতেছিলাম, এই অত্যাশ্চর্য্য অসম্ভব কাহিনী বিশ্বাস করিতেও ইচ্ছা হইতেছিল না!

তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, শব্দ ইনি ইচ্ছা করেই করছিলেন, তোমাকে জাগিয়ে ওঘর থেকে সরানই ছিল ওঁর উদ্দেশ্য। কারণ ওঁর পালাবার একমাত্র পথই ছিল তোমার ঘর দিয়ে। এঁর মুখটা তোমরা দেখতে পাওনি, এ রকম ওভারকোট দেখে আর পিছন থেকে দুই ভায়ের চেহারাও এক রকম দেখতে তাই তোমরা এঁকে দেখে সত্যেন বাবু বলেই স্থির করেছিলে! এঁরও উদ্দেশ্য ছিল সেইটাই তোমাদের উপলব্ধি করিয়ে দেওয়া। তোমরা উপরে উঠতে আরম্ভ করলে, আর উনিও দড়ি খুলে তোমার ঘরের ভিতর দিয়ে ওঁর নিজের ঘরে চলে গেলেন, তারপর উপরে উঠে এলেন। কি সুনীলবাবু আমার একটু ভুল হয়েছে কি?

সুনীল জ্বলন্ত রক্তদৃষ্টি একবার তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিয়াই নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রকাশবাবু কহিলেন, এইবার চল ওঁর ঘরটা দেখে আসি। আমার মনে হচ্ছে ওঁর ঘরেই এই রকম একটা দড়ি আর ঐ কচি কলাপাতা রংয়ের 'ওভারকোট' নিশ্চয় দেখতে পাব। এত শীঘ্র নিশ্চয়ই সেগুলো কোথাও লুকোতে পারেন নি! সত্যেনবাবুকে হত্যা করে ওভারকোটটা ইনিই তাঁর গায়ে পরিয়ে দিয়েছিলেন। ঘটনা গভীর রহস্যময় করবার জন্যেই এগুলো এঁকে করতে হয়েছিল। নয় ত রাত্রে ওভারকোট পরে কেউ ঘুমায় না এটা ঠিক। প্রকাশবাবু আমাদের দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

সত্যই একথাটা এতক্ষণ আমাদের কাহারও মনে হয় নাই।

সুনীলের কক্ষ মধ্যে অল্প অনুসন্ধানেই একটা বন্ধ আলমারির মধ্য হইতে সত্যেনের বক্ষস্থিত রজ্জুর মতই একগাছা লম্বা দড়ি ও একটা কচি কলাপাতা রংয়ের ওভারকোট বাহির হইল।

প্রকাশ বাবু আমাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আর কিছু প্রমাণ চাও কি? ইনি এবার এই সাধুসঙ্কল্প নিয়েই ভাতৃ গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন। ওভারকোটটাও সেইজন্য পূর্ব্ব হতে তৈরী করে আনা হয়েছিল। আচ্ছা আমি চল্লুম। দারোগা সাহেব তোমার কর্ত্তব্য এবার তুমি কর। নমস্কার। আমাদের আর কোনও কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই তাঁহার উদ্যান রক্ষককে সঙ্গে লইয়া তিনি স্থান ত্যাগ করিলেন।

আমরা তখনও বিস্মিতবিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলাম। দারোগা সাহেব আমাদের দুইচারিটা

প্রশ্ন করিবার পর সুনীলকে লইয়া সদল বলে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহারই মুখে শুনিলাম প্রকাশবাবু সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের একজন নামজাদা কর্ম্মচারী ছিলেন, অবসর লইয়া বৎসর দুই হইল এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন।

সকলে চলিয়া গেল। এই ভীষণ ঘটনার স্মৃতি-ভরা শূন্য গৃহখানির নির্জ্জনতা যেন আমাদের অসহ্য অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল।

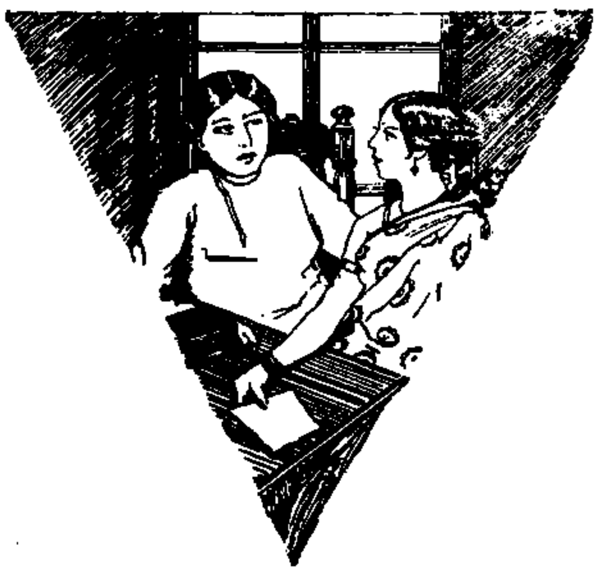
* * *

* *

বিচারে সুনীলের দ্বীপান্তরের আদেশ হইল। সে অপরাধ স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। প্রকাশ বাবুর বর্ণনার সহিত তাহার স্বীকার উক্তি সমস্ত মিলিয়া গেল।

সুনীলের উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের জন্য তাহার পিতা সমস্ত সম্পত্তি সত্যেনের নামে উইল করিয়া গিয়াছিলেন। সুনীল সামান্য কিছু খোর-পোষ পাইত মাত্র। সত্যেনের অবর্ত্তমানে সেই সম্পত্তির অধিকারী হইবে, উইলে এইরূপ একটা সর্ত্ত ছিল। অর্থাভাবে ঋণ-জড়িত হইয়া ইদানীং সে অত্যন্ত কষ্ট পাইলেও স্বভাবের পরিবর্ত্তন তাহার কিছুমাত্র হয় নাই। সত্যেনও তজ্জন্য তাহাকে এক কপর্দ্দকও দিত না। তথাপি সে অনুজকে স্নেহ করিত; বহুবার তাহাকে সুপথে আনিবার চেষ্টাও করিয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। সত্যেনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবার আশাতেই সুনীল তাহাকে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দিয়াছিল। তাহার উপর কেহ দোষারোপ করিবে ইহা সে মনেও করে নাই। বিচারালয়ে সে সমস্ত সত্য কথাই বলিয়াছিল।

(বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত।)





শিকার

শ্রীমতী আভাময়ী মুখোপাধ্যায়

দেবনগরের বিখ্যাত বিচারক কেতন সিংহের পুত্র অজিত সিংহ ভিন্ গাঁয়ে বন্ধুর বাটী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন।

পরদিন বৈকালে সপারিষদ তিনি নগর পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। কিছু দূরে গিয়া চাঁদনিচকের নিকটে বহু লোকের ভীড় দেখিয়া অজিত সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন—একজন দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ লোক একটা প্রকাণ্ড ভালুক লইয়া তামাসা দেখাইতেছে। ভালুকটা যেমন বলশালী, তেমনি তেজী, সকলে সভয়ে তফাতে দাঁড়াইয়া নাচ দেখিতেছিল।

ভালুক-ওয়ালার নাম—দিন্‌শা; তাহাকে স্থানীয় বাসিন্দারা সকলেই বিলক্ষণ চেনে। ভালুক নাচাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করিয়াই সে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

দিন্‌শা ভালুকের দুই থাবা দুই হাতের মধ্যে ধরিয়া তাহাকে দাঁড় করাইয়া তাহার সহিত তালে তালে নাচিতেছিল, এবং চারিধারের জনতা উল্লসিত হইয়া বিচিত্র কলরবে আনন্দ-জ্ঞাপন করিতেছিল।

সহসা অজিতের দৃষ্টি একটি মেয়ের উপর পতিত হইল। রঙীন-ঘাঘরা-পরা মেয়েটি কিছু দূরে পথের উপর বসিয়াছিল; তাহার কোলের উপর ছিল—একটি ছোট্ট ভালুক-ছানা। মেয়েটির বয়স পনর ষোলর বেশী হইবে না; চোখে-মুখে তাহার একটি অনুপম পার্ব্বত্য-শ্রী বিজড়িত। সুন্দরী বালিকা। তাহার সবল সুস্থ ঋজু দেহে এমন একটা সহজ লাবণ্য ব্যপ্ত ছিল যাহা সৌন্দর্য্য-পিপাসু ভোগ-বিলাসী অজিতকে মুগ্ধ অভিভূত করিল; তিনি একপাশে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ-নয়নে বালিকাকে দেখিতে লাগিলেন।

একজন অপরিচিত পুরুষের দীপ্ত দৃষ্টি তাহার

উপর ন্যস্ত দেখিয়া বালিকা ব্রীড়াবনতমুখী হইয়া বসিয়া রহিল।

বড় ভালুকের নাচ শেষ হইল। দিন্‌শা ভালুকটাকে ছাড়িয়া দিয়া—এদিকে চাহিতেই তাহার সহিত অজিত সিংহের চোখাচোখী হইল। সহসা সম্মুখে প্রেতাত্মা দেখিলে মানুষ যেরূপ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যায়, অজিতকে দেখিয়া দিন্‌শার মুখ তেমনি পাংশু রক্তশূন্য হইয়া গেল; হাত-পা কাঁপিতে লাগিল; বুকের মধ্যে রক্তস্রোত হিম হইয়া গেল!

অজিত সিংহও দিন্‌শাকে দেখিবামাত্রই চমকিত হইলেন! স্থির দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার মনে হইল, নিশ্চয় এ মুখ তাঁহার পরিচিত; কিন্তু পূর্ব্বে কোথায় যে ইহাকে দেখিয়াছেন বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা কিছুতে স্মরণ করিতে পারিলেন না।

উৎফুল্ল জনতা এ সকল ব্যাপার কিছুই লক্ষ্য করিল না; তাহারা তখন মেয়েটির নাচ দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। চারিদিক হইতে আবেদন আসিতেছিল।—"রাজিয়া, এইবার তোমার পালা; রাজিয়া, ওঠ।"

রাজিয়া প্রথমে উঠিতে চাহিতেছিল না; পরে, দিন্‌শা এবং জনতার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে সে তাহার ছোট ভালুক ছানাটিকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দর্শকবৃন্দ হর্ষ-ধ্বনি করিল। রাজিয়া চাহিয়া দেখিল, সেই অপরিচিত সুন্দর বিদেশী তখনো তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া বিমুগ্ধ নয়নে তাহার পানে তাকাইয়া আছে। সহসা রাজিয়া অন্তরের মধ্যে বিপুল আনন্দ অনুভব করিল; মনের মধ্যে তাহার নৃত্য করিবার বাসনা উদ্দাম হইয়া উঠিল। সে তাহার ভালুকটার দড়িতে টান দিয়া কহিল—"নাচ, শম্ভু, নাচ"।—সঙ্গে সঙ্গে নিজেও নৃত্য আরম্ভ করিল

অজিত সিংহ নাচ দেখিবার অবসরে ঐ দিন্‌শা লোকটাকে পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছেন তাহাই স্মরণ করিতে লাগিলেন। দিন্‌শা দূরে দাঁড়াইয়া ঢোল বাজাইতেছিল এবং মাঝে মাঝে অজিতের প্রতি তীক্ষ্ন হিংস্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভাবিতেছিল, কেমন করিয়া ঐ লোকটির কবল হইতে নিজেকে রক্ষা করা যায়।

নাচ শেষ হইল। তামাসা উপভোগ-অন্তে দর্শক-বৃন্দ যে যাহার গন্তব্য পথে প্রস্থান করিল। রাজিয়া তাহার ভালুক-ছানাটিকে জল খাওয়াইবার জন্য অদূরবর্ত্তী জলাশয়ের দিকে চলিয়া গেল। অজিত সিংহ তাঁহার পারিষদবর্গকে কতকগুলি উপদেশ দিয়া তাহাদের বিদায় করিলেন; তারপর দিন্‌শার নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

দিন্‌শা এতক্ষণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছিল; এইবার শঙ্কিত বিবর্ণ মুখে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

অজিত মৃদু হাসিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,—"পাঁচ বছর আগে, নরহত্যার অপরাধে আমার পিতার আজ্ঞায় তুমি যাবজ্জীবন কারা-গৃহে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলে; সেখান থেকে তুমি পালিয়ে এসেছ। তোমার আসল নাম—মাহ্‌লু।"

দিন্‌শা রক্তহীন মুখে অপরাধীর মত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল; একটি কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

অনেক চুপ করিয়া থাকিয়া অজিত বলিলেন,—এখন যদি তুমি পুনরায় ধৃত হও, এবং তা তুমি হবেই, তাহলে তোমার কি শাস্তি জান?······ কিন্তু আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারি যদি তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও।"

দিন্‌শা জিজ্ঞাসু মুখে চাহিয়া রহিল।

অজিত তখন নরম সুরে বলিলেন—"রাজিয়াকে আমায় দিতে হবে। তার জন্য তোমায় আমি মুক্তি এবং ইচ্ছামত অর্থ দেবো।"

মাহ্‌লু মনে মনে ঐরূপ প্রস্তাবই আশা করিয়া

ছিল। সহসা কোন উত্তর প্রদান না করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অজিত প্রশ্ন করিলেন—"তুমি ওকে কোথায় পেয়েছ?"

মাৎলু উত্তর দিল—"এক চাষার কাছ থেকে ওকে কিনেছি হুজুর।"

—"বেশ যে দাম দিয়ে ওকে কিনেছ, তার বিশগুণ আমি তোমায় দেব। রাজিয়াকে আমার চাই-ই-।"

তথাপি মাৎলু কোন উত্তর দিল না।

—"আমি ওকে আমার দেশে নিয়ে যাব। রাজিয়াকে তোমায় ছেড়ে দিতেই হবে; তার জন্তে এই নাও আগাম টাকা।"

অজিত তাঁহার টাকার থলির ভিতর হইতে কতকগুলি মোহর বাহির করিয়া মাৎলুর হাতে দিলেন। মাৎলুও বিনা বাক্যে হাত বাড়াইয়া সেগুলি গ্রহণ করিল।

অজিত খুসি হইয়া বলিলেন—"তুমি আমার বন্ধুর বাড়ীর পিছনের সরাই-খানায় থাক, তা আমি জানি। প্রথম দিনই, তোমাকে দেখেই আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হোয়েছিল। সে যাক্। আজ রাত্রি বারোটার পর আমি সরাই-খানায় তোমার কাছে যাব সেই সময়ে তুমি আমার সঙ্গে রাজিয়ার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবে; বুঝেছ? পালাবার মতলব কোরো না; কারণ আমি আমার অনুচরদের এই মাত্র আদেশ দিয়েছি তারা তোমার ওপর নজর রাখবে। কি, কথা বলছ না যে? তুমি কি রাজী নও?"

এতক্ষণে মাৎলু যেন ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিল; আভূমি-প্রণত হইয়া বলিল—"হুজুরের যখন হুকুম।" এই বলিয়া নিজের দক্ষিণ-হস্ত মস্তকে স্থাপিত করিল।

অজিত মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"বেশ, বন্দোবস্ত সব ঠিক করে রাখবে। রাত বারোটার পর।—"

এই বলিয়া তিনি প্রফুল্ল মুখে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া মাৎলু ক্রূর হিংস্র দৃষ্টিতে তাহার প্রতি তাকাইয়া রহিল।

রাত্রি বারোটার অব্যবহিত পরেই অজিত সিংহ যখন সরাই-খানায় পৌঁছিলেন তখন সমস্ত সহর সুষুপ্তির ক্রোড়ে নিমগ্ন।

বন্ধুর গৃহে ভোজনের পর কয়েক পাত্র সুরা সেবন করিয়া তিনি আজিকার রাত্রের স্ফূর্ত্তি অধিকতর মোহনীয় করিয়া তুলিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু মাত্রাধিক্যে তাঁহার পা টলিতেছিল এবং বুদ্ধি-বৃত্তি স্বাভাবিকতা বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল।

তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া মাৎলুর মুখে কুটিল হাসি ফুটিয়া উঠিল।

অজিত প্রশ্ন করিলেন—"সব ঠিক?"

মাৎলু স্বল্প হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া সবিনয়ে বলিল—"হুজুর যখন হুকুম করে গেছেন, তখন তা কি-আর নড়চড় হ'তে পারে। অনেক কষ্টে রাজিয়াকে রাজী করিয়েছি; আসুন।"

অজিত উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিলেন—"চল।"

অন্ধকারে, দুইজনে প্রাঙ্গণ পার হইয়া পিছনের উন্মুক্ত বাগানের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে ইহা বাগানের পর্য্যায়-ভুক্তই ছিল একক্ষণে যত্নের অভাবে পোড়োজমীতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

অজিত চতুর্দ্দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এ কোথায় আনলে?" সুরার প্রভাবে তখনও তাঁহার মাথা ঝিমঝিম করিতেছিল।

মাৎলু বলিল—"ঐ যে হুজুর, ঐঘরে রাজিয়া আছে। আপনারই জন্তে তাকে ওখানে বসিয়ে রেখেছি হুজুর।"

দুই জনে বাগানের প্রান্তবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্রকার

ঘরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বন্ধ-দরজার চাবী খুলিয়া মাৎলু বলিল—"যান, ভিতরে যান।"

উত্তেজিত অজিত বিনা দ্বিধায় ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। নিমেষের মধ্যে দরজার শিকল তুলিয়া দিয়া, মাৎলু অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে কাটিয়া গেল। তারপর সেই নৈশ অন্ধকার মথিত করিয়া ঘরের মধ্য হইতে হিংস্র জন্তুর ক্রুদ্ধ গর্জ্জন এবং আর্ত্ত মনুষ্যের করুণ চিৎকার নিদ্রামগ্ন সরাই-খানাকে মুহূর্ত্তে চকিত জাগরিত করিয়া তুলিল। সকলে লাঠি, লণ্ঠন প্রভৃতি লইয়া বাগানের দিকে ছুটিল। ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, একজন সাহসে ভর করিয়া ঘরের শিকল খুলিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল। তখন সকলে, সভয়ে সবিস্ময়ে দেখিল,—একটা প্রকাণ্ড ভালুকের পায়ের তলায় একটি মানুষের রক্তাপ্লুত দেহ ছিন্ন-বিছিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে! অন্ধকারে হিংস্র জন্তুটার চোখ দুইটা হইতে আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে; রক্তের আস্বাদে সে তখন ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে!

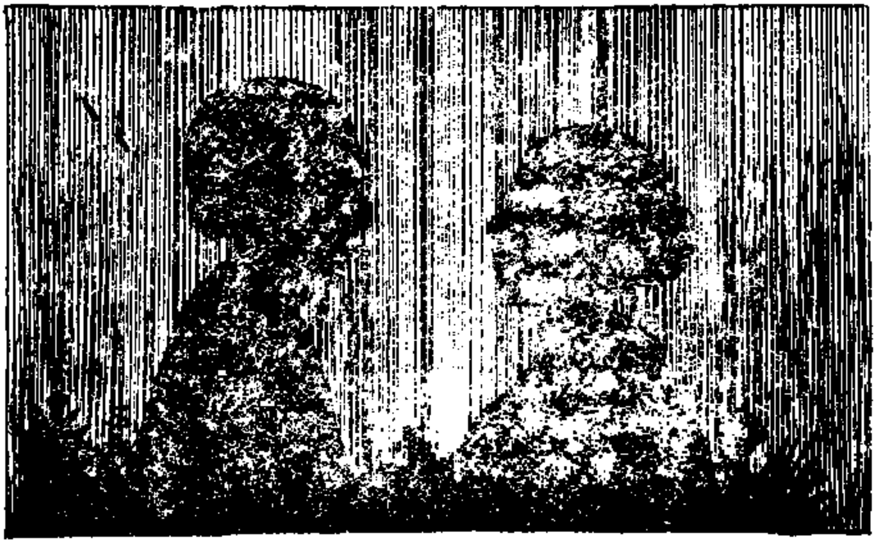
এমন সময়, কোথা হইতে দিন্‌শা ছুটিয়া আসিল; চকিতের মধ্যে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ভালুকটার মুখে লোহার লাগাম লাগাইয়া দিয়া তাহাকে প্রহার করিতে করিতে টানিয়া লইয়া গেল। স্তম্ভিত দর্শকবৃন্দ জানিল, দিন্‌শা সন্ধ্যার পর নদী পারে তামাসা দেখিতে গিয়া ছিল; ইতিমধ্যে ঐ হতভাগ্য লোকটি কেমন করিয়া তাহার ভালুকের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল।

পরদিন প্রত্যূষেই স্থানীয় সংবাদপত্রের স্তম্ভে নগরবাসী পড়িল—

"দেবনগরের বিখ্যাত বিচারক কেতন সিংহের পুত্র অজিত সিংহ কল্য রাত্রে মত্তাবস্থায় জ্ঞান হারাইয়া অসাবধানে এক অতি হিংস্র ভল্লুকের খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করেন; ফলে ভল্লুকের নখ-দন্তের আঘাতে তাঁহার দেহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। উক্ত জানোয়ারটি স্থানীয় কোন ভালুক-নাচ ওয়ালার সম্পত্তি; সে এখনও উহাকে সম্পূর্ণ পোষ মানাইতে পারে নাই। এই শোচনীয় ব্যাপারে কাহাকেও দোষী করা যায় না; মৃত ব্যক্তির অসংযত অবস্থাই দুর্ঘটনার মূল। অতিরিক্ত মদ্যপায়ী হইলে সময়ে সময়ে কিরূপ বিপদ ঘটিতে পারে এই ঘটনা হইতে তাহা সকলেই সম্যক প্রণিধান করিতে সমর্থ হইবেন।"

সেই দিন সন্ধ্যাকালে দেবনগরের বিখ্যাত বিচারক কেতন সিংহের পুত্র অজিত সিংহের ক্ষত-বিক্ষত শব লইয়া বাহকেরা যখন চাঁদনী-চকের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল তখন সেখানে কৌতূহলী জনতার মাঝে দাঁড়াইয়া নগরের চির পরিচিত দিন্‌শা তেমনি নির্ব্বিকার চিত্তে ঢোল বাজাইতে-ছিল এবং রাজিয়া তেমনি উন্মাদ-ভঙ্গীতে নৃত্য করিতে করিতে তাহার প্রিয় ভালুক-ছানাটিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছিল—

—"নাচ, শম্ভু, নাচ।"



আপোষ-নিষ্পত্তি

(ভৌতিক কাহিনী)

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বসু

প্রায় মাসাবধি অনুসন্ধান করিবার পর ডিঙেডাঙ্গা অঞ্চলে একটী ছোট শাখা-গলির ভিতর আমার কারখানার উপযোগী একটী বাড়ী পাইলাম। পাঁচ বৎসরের কড়ারে আমি সেই বাড়ীটি ভাড়া লইলাম। ত্রিতল বাড়ী,—ক্ষুদ্র গলির ভিতর হইলেও আলো বাতাসের কোন অভাব ছিল না। ত্রিতলে মাত্র একটী ঘর, বেশ বড়, চারিদিকে খোলা, সেই ঘরখানিতে আমি শয়নের ব্যবস্থা করিলাম। নীচে বাহিরের দিকে দুইটী ঘর, একটী আমার আপিস ঘর এবং অপরটীতে গন্ধ দ্রব্য তৈয়ারী করিবার উপকরণাদি সজ্জিত হইল। নীচে আরও দুইটী ঘর ছিল। তাহাতে কাটকাটরা এটা ওটা রাখিয়া দিলাম। বাড়ীখানিতে বৈদ্যুতিক আলোরও ব্যবস্থা ছিল। সংসার বলিতে আমার কিছু ছিল না,—আমি অবিবাহিত, বয়স তখন প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি,—প্রথম বিবাহের বয়স পার হইয়াই গিয়াছিলাম। যাক্ সে কথা। দিন দুইয়ের মধ্যে বাড়ীখানি আমি সাজাইয়া ফেলিলাম।

* * * *

বহুদিন হইতে আমার দাদার এক বন্ধুর গৃহে আমার আহারের ব্যবস্থা ছিল। এ বাড়ী ভাড়া লইয়াও সেই ব্যবস্থাই বহাল রাখিলাম। রান্নার হাঙ্গামা কে করে! তাঁহার বাড়ীও বেশী দূর নয়, আমার এই নূতন বাড়ী হইতে মাত্র পাঁচ সাত মিনিটের পথ। প্রথম দুই দিন আমি তাঁহাদেরই গৃহে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। তৃতীয় দিন রাত্রি আটটার মধ্যে আহার শেষ করিয়া নূতন বাড়ীতে আমি শয়ন করিতে গেলাম।

দারওয়ান এবং ভৃত্যেরা যে যাহার আড্ডায় চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের সেখানে থাকিবার তখনও কোন ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারি নাই। বাহিরের দরজা তালাবন্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলাম। কুলুপ খুলিয়া আমি জন-

শূন্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। এবং নীচের বারন্দার আলো জালিয়া আমি ভিতরটা একবার দেখিয়া লইলাম। তারপর সেই আলোটি নিবাইয়া উপরে উঠিয়া গেলাম।

এগারটার পূর্ব্বে আমি কোনদিন শয়ন করিতাম না, কিন্তু এই তিনদিনের পরিশ্রমে শরীরটা একান্ত ক্লান্ত থাকায় নয়টার মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। গভীর রাত্রে কিসের শব্দে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, নীচে যেন দুপদাপ শব্দ হইতেছে, যেন কতকগুলি লোক একত্রে চলাফেরা করিতেছে। একখানি তীক্ষ্ণধার ভোজালি শিয়রে রাখিয়া আমি শয়ন করিতাম, সেইখানি হাতে করিয়া আমি তাড়াতাড়ি কক্ষ হইতে বাহির হইলাম। নীচে গিয়া চারিদিক অনুসন্ধান করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। চার পাঁচটা ইঁদুর সশব্দে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। বুঝিলাম ইহা এই ইঁদুরদেরই কাজ। একটু ভাবিয়া দেখিলে আর মিছামিছি এ কষ্টভোগ করিতে হইত না। আমি উপরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম।

পরদিন যখন শুইতে আসিলাম তখন রাত্রি প্রায় এগারটা। সিঁড়ির মুখেই একটা সুইচ ছিল, সেই সুইচটা টিপিতেই সমস্ত সিঁড়িটি আলোকিত হইয়া উঠিল। আমি একবার সিঁড়িটা দেখিয়া লইয়া আলো নিবাইয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। দুই তিন ধাপ উঠিয়াছি, এমন সময় পিছনে কাহার যেন পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। আমি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইলাম। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। ও কিছু না বুঝিয়া আবার উঠিতে লাগিলাম, আবার সেই পদশব্দ। চক্ষু আপনা-আপনি পিছন দিকে ফিরিল এবারও কিছুই দেখা গেল না। আমি মনে মনে বলিলাম, কিছু থাকিলে ত দেখা যাইবে। আবার উঠিতে আরম্ভ করিলাম। তিন চারি ধাপ উঠিয়াছি, আবার সেই পদশব্দ। আমি আর দাঁড়াইলাম না, পিছনের দিকে চাহিলামও না, সোজা উঠিয়া দ্বিতলের বারান্দার উপর গিয়া দাঁড়াইলাম। সেখানেও একটা সুইচ ছিল, আলো জালিলাম। সেই উজ্জ্বল আলোকে নীচে উপর চারিদিকটা একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। আমাদের ও অঞ্চলটা তখন প্রায় নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। বাড়ীটিও জনশূন্য,—এই অবস্থায় আমারই পদশব্দের প্রতিধ্বনি যে আমার অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে তাহাই স্থির করিয়া আমি ত্রিতলে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। আবার পদশব্দ শুনিতে পাইলাম, কিন্তু এবার পিছনে নহে, নীচের বারান্দার উপর। আমি সিঁড়ির মধ্যস্থলে দাঁড়াইলাম। শব্দও থামিয়া গেল,—আমার কেমন সন্দেহ হইল, হয় ত বা খালি বাড়ী দেখিয়া চোর কোন গৃহকোণে লুকাইয়াছিল, পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। নীচে গিয়া চারিদিকটা দেখিয়া আসিব কি না, সেইখানে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম। কোন শব্দও আর শোনা যাইতেছিল না। অল্পক্ষণ পরে আমি স্থির করিয়া ফেলিলাম,—ও চোরের পদশব্দ নহে, আমার পদশব্দেরই প্রতিধ্বনি,—প্রতিধ্বনি কখনও বা নিকটে কখনও বা দূরে শোনা যায়, না হইলে আমি দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ এমনই অকস্মাৎ থামিয়া যাইত না। আমি আবার উঠিতে আরম্ভ করিলাম। এবার ঠিক পিছনেই পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। আমি তখন নিঃসংশয়ে বুঝিলাম, প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নহে। আমি আর ফিরিয়া দেখিলাম না, পিছনে পদশব্দ শুনিতে শুনিতে আমি সোজা উপরে উঠিয়া গেলাম এবং আলো জালিয়া কুলুপ খুলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম। শয্যা প্রস্তুতই ছিল, বাহিরের পোষাক ছাড়িয়া আমি শুইয়া পড়িলাম। সারাদিন খাটিতে হয় কাজেই ঘুম আসিতে কোন দিন আমার বিলম্ব হয় না, সেদিনও হইল না।

কতক্ষণ পরে ঠিক বলিতে পারি না হঠাৎ কি একটা কড়কড় শব্দে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। স্পষ্ট মনে হইল, কে যেন আমার আপিস ঘরের কুলুপটি মোচড়াইয়া ভাঙিতেছে।

ভোজালিখানি আমার শিয়রেই ছিল। এ নিয়মের ব্যতিক্রম কোনদিন ঘটিত না। আমি সেই ভোজালিখানি তুলিয়া লইয়া শয্যা ত্যাগ করিলাম এবং দরজা খুলিয়া অতি সন্তর্পণে অন্ধকারের মধ্য দিয়া নীচে নামিতে লাগিলাম। তখনও সেই কড়কড় শব্দ স্পষ্ট কানে আসিয়া বাজিতেছিল, পা টিপিয়া টিপিয়া আমি অগ্রসর হইয়া চলিলাম। হঠাৎ এক সময় মনে হইল, শব্দটা যেন থামিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে আমিও দাঁড়াইয়া পড়িলাম। মিনিট দুই আর কোন শব্দ শুনিতে পাইলাম না। ভাবিলাম, বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও চোর হয় ত আমার পায়ের শব্দ পাইয়া সাবধান হইয়া গিয়াছে। এখন কি করা উচিৎ তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। আবার কুলুপ ভাঙ্গার শব্দ কানে আসিয়া প্রবেশ করিল। আমি নিঃসংশয়ে বুঝিলাম, চোর আমার উপস্থিতি টের পায় নাই,—সে আমার মৃদু পদশব্দকে ইঁদুর কিম্বা এমনই কোন কিছুর পদশব্দ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আবার কুলুপ ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আর দুই তিন ধাপ নামিলেই বারান্দায় গিয়া পৌঁছিব, তারপর আর কয়েক পা মাত্র গেলেই সেই ঘর। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আমি ঘরের সম্মুখে গিয়া পৌঁছিলাম। মনে হইল কুলুপ ভাঙ্গিয়া কে যেন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। দরজার পাশেঃ সুইচ ছিল, টিপিয়া দিলাম, উজ্জ্বল আলোকে চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমি সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম, দ্বার তেমনই তালা-বন্ধ রহিয়াছে। এতক্ষণে আমার নিজের ভুল বুঝিতে পারিলাম। এইরূপ শব্দ শুনিবারই বা কারণ কি তাহাও স্থির করিয়া ফেলিলাম। চোরের কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, তাই হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে মনের কানে চোরের কুলুপ ভাঙ্গার শব্দ শুনিতে পাইয়া বিভ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলাম। আমি আলো নিবাইয়া উপরে চলিয়া গেলাম এবং ক্লান্তভাবে শয্যার উপর শুইয়া পড়িলাম। নিদ্রা আসিতে এতটুকু বিলম্ব হইল না। হঠাৎ এক সময় ঘুমটা আবার ভাঙ্গিয়া গেল! একটা হড়হড় শব্দ যেন আমার কানে আসিয়া বাজিল, মনে হইল, নিম্নতলের সেই আপিস-ঘরের সিন্দুকটাকে কে যেন হড়হড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এবার আর শয্যা ত্যাগ করিলাম না মনে মনে বলিলাম, "নিয়ে যাক সিন্দুক আর নীচে নামছি না।" অল্পক্ষণ পরেই আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম এবং বাকি রাতটুকু নিরুপদ্রবেই ঘুমাইলাম।

সকালে উঠিয়া আমি প্রথমেই আপিস-ঘরের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম দরজা তেমনই তালা বন্ধ রহিয়াছে। চাবি খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া সিন্দুকের দিকে চাহিলাম, সিন্দুক যথাস্থানেই রহিয়াছে। মনে মনে ভারি হাসি পাইল। শ্রবণেন্দ্রিয়ের কি ঘোর বিকারই না কাল ঘটিয়াছিল! যাক্, ও কথা মন হইতে দূরে রাখিয়া হাত মুখ ধুইয়া কাজে বসিলাম।

* * * *

তখন বেলা প্রায় তিনটা হইবে। আপিস-ঘরে বসিয়া একটী ভদ্রলোকের সহিত কথা বলিতেছিলাম, হঠাৎ সামনের দিকে চাহিতেই দেখিলাম, আমার কারখানা-ঘরের সব কয়টি আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সে ঘরে আমার গন্ধদ্রব্য তৈয়ারী করার উপকরণাদি থাকিত, অন্য কাহারও সে ঘরে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ছিল এবং আমি যখনই কাজ সারিয়া বাহির হইয়া আসিতাম, তখনই তালা বন্ধ করিয়া রাখিতাম। সে দিনও তালা বন্ধ করিয়াই আপিস ঘরে আসিয়া বসিয়াছিলাম। আমার

আদেশ না লইয়া এ সময় ও ঘরে কে প্রবেশ করিল এবং আলোগুলিই বা সে জ্বালিল কেন? আমি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে হাঁকিলাম, "কে, কে ও ঘরে?"

দরওয়ান ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "ও ঘর ত বন্ধ রয়েছে, কেউ যায় নি ত হুজুর।"

আমি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলাম, "কেউ যায় নি ত আলো জ্বাললে কে?"

দরওয়ান বলিল, "আলো ত এমনই জ্বলে উঠল হুজুর।"

"এমনই জ্বলে উঠল," আপন মনে এই কথা বলিয়া আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেই কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলাম। দরজা তেমনই তালাবন্ধ রহিয়াছে। চাবি খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সুইচ খোলা আলো জ্বলিতেছে। কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইতে পারে, মনে মনে তাহারই কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ ভাবিয়া একটা কারণ অনুমান করিয়া লইলাম,—বন্ধ করিবার সময় অর্দ্ধেক পথে সুইচটা খুব সম্ভব আটকাইয়া গিয়াছিল, এখন কোন রকমে খুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কেমন যেন খটকা লাগিয়া রহিল। একটা নয় তিন তিনটে সুইচ কি এক সঙ্গে অর্দ্ধপথে আটকাইয়া গেল? কি জানি, তাহা ছাড়া আর কি হইতে পারে! ভাবিতে ভাবিতে আলো নিবাইয়া ঘরটা তালাবন্ধ করিয়া আপিস-ঘরে গিয়া বসিলাম।

ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখলেন মশায়?"

আমি বলিলাম, "ঘরে কেউ যায় নি, চাবি বন্ধই ছিল, সুইচগুলো কি রকম খারাপ হয়ে গেছে।" এই বলিয়া আমি কাজের কথা আরম্ভ করিলাম।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, আমি আপিস-ঘর বন্ধ করিতে যাইতেছি, এমন সময় মাণিকদা আসিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার দিকে চাহিয়া সানন্দে বলিয়া উঠিলাম, "এস এস মাণিকদা, কবে এলে?"

মাণিকদা কহিল, "আজই এসেছি ভাই; দিন পাঁচ ছয় আছি, তোমার এখানে এসে শোব তাই বলতে এলাম।"

আমি বলিলাম, "তুমি কি নতুন মানুষ হ'য়ে গেলে নাকি মাণিকদা? শোবে তার আবার বলতে এসেছ।"

মাণিকদা কহিল, "ফিরতে রাত হবে তাই জানিয়ে গেলাম,—তুমি হয় ত সে সময় ঘুমিয়ে পড়বে। জানা থাকলে আর বেশী ডাকাডাকি করতে হবে না। এখনই একবার কালীঘাট যেতে হবে। তা হ'লে চললাম ভাই।"

আমিও আপিস ঘর বন্ধ করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলাম। ঘণ্টা দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া আবার কাজ করিতে বসিলাম। কাজ শেষ করিয়া দাদার সেই বন্ধুর বাড়ী রাত্রের আহার সারিয়া শয়নের জন্য বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

তিন চারি ধাপ সিঁড়ি উঠিয়াছি, পিছনে সেই পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। মনে হইল কে যেন বেশ জোরে জোরে শব্দ করিয়া আমার পিছনে পিছনে উঠিতেছে। আজ আর আমি পিছনের দিকে চাহিলাম না, সোজা উপরে উঠিতে লাগিলাম, পদশব্দও আমার অনুসরণ করিয়া চলিল, এমনিভাবে আমি ত্রিতলে গিয়া উঠিলাম। ঘরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতেই পদ শব্দ থামিয়া গেল, চাবি খুলিয়া আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

কাপড়জামা বদলাইয়া শয্যায় শুইয়া ঘুমাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় শুনিতে পাইলাম নীচে হড়হড় শব্দ করিয়া জল পড়িতেছে। বুঝিলাম ভৃত্য যাইবার সময় কলগুলি বন্ধ করিয়া যায় নাই, তাই তিনটি কল হইতে জল পড়িতে আরম্ভ

হইয়াছে। ভৃত্যের উপর অত্যন্ত রাগ হইল। কোথায় বিশ্রাম করিব, না যাও এখন কল বন্ধ করিতে। বিরক্ত ভাবে শয্যা ত্যাগ করিয়া নীচে নামিয়া গেলাম এবং তিনটি কল আঁটিয়া বন্ধ করিয়া আসিলাম। ভাবিলাম এখন আর ঘুমাইব না, মাণিকদার আসিবার সময় হইয়াছে। আলো জ্বালিয়া একখানা বই লইয়া শয্যার উপর বসিলাম। কয়েক লাইন পড়িয়াছি, এমন সময় মাণিকদার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, "বিজয় ভাই, দরজাটা খুলে দে ভাই।" "যাচ্ছি মাণিকদা" বলিয়া বই বন্ধ করিয়া নীচে নামিয়া গিয়া সদর দরজা খুলিয়া দিয়া বলিলাম, "এস মাণিকদা, তোমার জন্তেই বসে আছি।" কিন্তু কোথায় মাণিকদা! দরজার সম্মুখে ত কেহ নাই। আমি রাস্তার উপর গিয়া দাঁড়াইলাম, এদিক ওদিক দৃষ্টি সঞ্চালন করিলাম। রাস্তা জনশূন্য, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তাই ত মাণিকদা কোথায় চলিয়া গেল? এমন চঞ্চল-প্রকৃতি মানুষ ত কোথায় দেখি নাই! উত্তর দিলাম, যাচ্ছি, তবুও সে দু একমিনিট অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল! এত রাত্রে যাবেই বা কোথায়? ভবঘুরে লোকের কি স্থানের অভাব হয়। আমি কিছুক্ষণ তাহার জন্য পথের উপর পায়চারী করিলাম, তাহার ফিরিবার কোন লক্ষণ নাই দেখিয়া আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া উপরে চলিয়া গেলাম, এবং আলো নিবাইয়া শয়ন করিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

হঠাৎ এক সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম, মনে হইল যেন মাণিকদার কণ্ঠস্বর কানে আসিয়া প্রবেশ করিল। আমি উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলাম। ঐ ত মাণিকদাই ত ডাকিতেছে—"বিজয় ভাই, দরজাটা খুলে দে ভাই।" আহা বেচারী হয় ত কতক্ষণ ধরিয়া ডাকাডাকি করিতেছে। "যাই মাণিকদা" বলিয়া তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিলাম। আলো জ্বালিয়া আমি দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেলাম। দরজা খুলিতে খুলিতে বলিলাম, "বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মাণিকদা।" সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলিয়া দিলাম। কিন্তু মাণিকদা কই? আমি কেমন যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম! ইহাও কি সম্ভব, মাণিকদা আবার ডাকিয়া চলিয়া যাইবে? দুই দুইবার এমনভাবে ডাকিয়া চলিয়া যাইবারই বা কারণ কি, তাহা ভাবিয়া আমি স্থির করিতে পারিলাম না। মাণিকদা চঞ্চল-প্রকৃতি সত্য, কিন্তু কষ্ট দিবার এবং আমার সহিত পরিহাস করিবার লোক ত সে নহে। তবে? আমি পথের দুই ধারে চঞ্চলভাবে চাহিতে লাগিলাম। পথ তেমনই জনশূন্য। তাই ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দরজা বন্ধ করিয়া, ব্যাপার কি ভাবিতে ভাবিতে উপরে উঠিয়া গেলাম। অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, ইহাও শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিকার মাত্র। মাণিকদা এখনই আসিবে, এই কথা কেবলই ভাবিয়াছি তাই মনে হইয়াছে যে মাণিকদা ডাকিতেছে। ও কিছু নয়। আমি নিশ্চিন্ত মনে চক্ষু মুদিলাম এবং দেখিতে দেখিতে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন ঘরের মধ্যে রৌদ্র-কিরণ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া হাত মুখ ধুইবার জন্য নীচে চলিয়া গেলাম।

* * *

বেলা নয়টার সময় মাণিকদা আসিয়া হাজির। আমি হাসিয়া কহিলাম, "কাল অত রাত্রে দু দুবার ডেকে কোথায় গেছলে মাণিকদা?"

মাণিকদা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "আমি রইলাম কালীঘাটে আর তুমি আমার ডাক

...নে? কি করি ভাই, অমিয় কিছুতেই আসতে দিলে না।"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "আসতে ত দিলে না বলছ, কিন্তু আমি তোমার ডাক শুনে দু তলার ওপর থেকে নীচে নেমে এসে দোর খুলেছি।"

মাণিকদাও হাসিয়া কহিল, "যা যা আর চালাকি করতে হবে না।"

আমি কহিলাম, "তা হ'লে আমায় নিশিতে পেয়েছিল কি বল মাণিকদা?"

মাণিকদা কহিল, "এহেন বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতা সহর, এখানে নিশির বাপেরও জারিজুরি করবার ক্ষমতা নেই তার নিশি! অমিয় সকালেই কি আসতে দেয়। অনেক বলে কয়ে ঘণ্টা দু তিনের ছুটী নিয়ে এসেছি। এ বেলা এখানেই খেতে হবে। সন্ধ্যার আগেই আজ ফিরব। কাল সত্যি ভাই তোকে ভারি কষ্ট দিয়েছি।"

আমি কহিলাম, 'তা দিয়েছ মাণিকদা, আজ কথার কিন্তু ঠিক রেখ। সন্ধ্যের আগে আর কোথাও বেরুব না, তোমার জন্যে বসে থাকব।"

মাণিকদা কহিল, "কি করি ভাই, ছাড়াতে যে পারি না। তা হ'লে এখন যাচ্ছি ভাই, একবার সিমলে ঘুরে যেতে হবে।"

মাণিকদা চলিয়া গেল। তাহাকে একবার কাছে পাইলে তাহার বন্ধুবান্ধবেরা যে সহজে ছাড়িতে চাহে না, তাহা আমি জানিতাম। কাজেই তাহার পক্ষে কথা রাখা অনেক সময় সম্ভবপর হইয়া উঠে না এবং সেই কারণেই তাহাকে দোষ দেওয়া চলে না।

সে দিন ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মাণিকদা আসিয়া উপস্থিত হইল; হাসিয়া কহিল, "এই দেখ, ঠিক এসেছি, তোমার মাণিকদা কথা রাখতে পারে কিনা দেখ।"

তাহাকে পাইয়া আমি ভারি খুসী হইলাম। তাহার সহিত গল্পগুজব করিয়া আজ রাতটা কাটিবে ভাল। কাজের চিন্তা হইতে মাথাটা আজ কিছুক্ষণের জন্য অবসর পাইবে। স্থির করিলাম আজ আর সেখানে খাইতে যাইব না, দোকান হইতে যাহা হউক কিছু আনাইয়া খাইব। মাণিকদার সঙ্গ কিছুতেই ছাড়া হইবে না। তখনই একখানি চিঠি লিখিয়া দরওয়ানকে দিয়া দাদার বন্ধুর বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম এবং ফিরিবার পথে কিছু লুচি তরকারি মিষ্টান্ন কিনিয়া আনিবার কথাও বলিয়া দিলাম।

রাত্রি আটটার সময় ভৃত্য কাজ সারিয়া বিদায় লইতে আসিলে হঠাৎ কাল রাত্রের কল খোলার কথা মনে পড়িয়া গেল। বলিলাম, "হ্যাঁরে কল বন্ধ করে যাস নি, কেন? রাত্রে নেমে এসে আমার কল বন্ধ করেত হয়েছে। কাজে এ রকম গাফেলি করলে ত চলবে না।"

ভৃত্য কহিল, "না বাবু, আমি যাবার সময় সব কল বন্ধ করে গেছলুম।"

আমি চটিয়া উঠিয়া কহিলাম, "তা হ'লে আমি মিথ্যে কথা বলছি;—রাত এগারটার পর বন্ধ কল আপনি খুলে গিয়ে জল পড়তে আরম্ভ করল? এ রকম অসাবধান আর হবি নি,—আর মুখের ওপর এ রকম মিথ্যে কথা বল্‌বি নি বুঝলি। যাবার আগে ভাল করে কলগুলো দেখে যাবি!"

ভৃত্য বোধ করি ভয়ে আর কোন প্রতিবাদ করিল না, কহিল, "আজও ত বন্ধ করে এসেছি বাবু, আপনি বলছেন আবার দেখে যাচ্ছি।"

রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা অবধি আমরা আপিস-ঘরে বসিয়া গল্প করিলাম, তারপর উপরে যাইবার জন্য উঠিলাম। চার ধাপ উঠিয়াছি, এমন সময় সেই পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। মাণিকদা আমার পিছনে ছিল, হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "কে, কে?"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "ও কেউ নয় মাণিকদা, চলে এস।"

মাণিকদা আরও দুই ধাপ উঠিয়া কহিল, "কেউ না কি হে! স্পষ্ট পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, আলো কোথায়?"

আমি কহিলাম, "দাঁড়িও না, চলে এস, ওপরের বারান্দায় সুইচ আছে, আলো জ্বাললেও কাউকে দেখতে পাবে না,—কেউ থাকলে ত দেখবে। এ বাড়ীতে নিজের পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি এমনি শুনতে পাওয়া যায়, আমি ত এসে অবধি শুনছি। প্রথম দিন আমারও ভুল হয়েছিল।" দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি আলো জ্বালিয়া বলিলাম, "দেখলে ত শব্দ থেমে গেল, ও কিছু না।"

মাণিকদা কহিল, "একলা হলে আমি ঠিক ভয় পেতাম, ভাবতাম ভূতে পিছু নিয়েছে।"

আমি কহিলাম, "এমনই করেই ত মানুষ ভূতের ভয় পায়, প্রথম দিন চোর বলে আমার সন্দেহ হয়েছিল, ভূতের কথা আমার মনে হয় নি; চল।" আলো নিবাইয়া দিয়া আবার উঠিতে আরম্ভ করিলাম,আবার সেই পদশব্দ আরম্ভ হইল।

মাণিকদা বলিল, "তুই ঠিক বলেছিস বিজয়। সিঁড়িটার গাথনির কোন দোষ আছে। পায়ের শব্দটা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে,—আর কতক্ষণ চলবে শেষ ত হয়ে এল।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা কক্ষের ভিতর গিয়া প্রবেশ করিলাম। ভৃত্যকে দিয়া পূর্ব্বেই মাণিকদার জন্য পৃথক শয্যা পাতাইয়া রাখিয়াছিলাম। আলো নিবাইয়া আমরা দুইজনে শয়ন করিলাম।

মাণিকদা কহিল, "এ ঘরখানা বেশ ত, চারি-দিকে খোলা।"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, অনেক খুঁজে এ বাড়ীখানি পেয়েছি। নীচের ঘরগুলোও ভাল,—মোটেই স্যাঁতস্যাঁতে নয়, আলো বাতাসও বেশ—।"

মধ্য পথে মাণিকদা বলিয়া উঠিল, "ওহে, ভায়া শুনতে পাচ্ছ!"

সম্মুখের বারান্দার উপর মনুষ্য-পদশব্দ তখন সুস্পষ্ট শুনা যাইতেছিল।

মাণিকদা কহিল, "এবার ত আর প্রতিধ্বনি বলে উড়িয়ে দিতে পারবে না। নিশ্চয়ই কোন গোলমাল আছে।"

বুঝিলাম, মাণিকদা ভয় পাইয়াছে। কিন্তু কিসের শব্দ ও? আমাদের গলার আওয়াজ পাইয়াও কোন চোর যে বারান্দার উপর পায়চারী করিয়া বেড়াইবে, ইহা অসম্ভব। তবে? হঠাৎ মনে হইল, ইহা আর কিছুই নয়, পাশের বাড়ী কেহ তাহাদের বারান্দার উপর পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারই পায়ের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। আমি মাণিকদাকে সেই কথা বলিয়া আশ্বস্ত করিতে গেলাম।

মাণিকদা গম্ভীর হইয়া কহিল, "ও কথা আমি তোমার মানতে পারচি না ভাই, একবার আলোটা জ্বাল।"

আমি উঠিয়া আলো জ্বালিলাম। পায়ের শব্দ তখনও তেমনি সুস্পষ্টভাবেই কানে আসিয়া বাজিতেছিল।

মাণিকদা কহিল, "নারে ভাই; বড় গোলমাল।"

আমি সাহস দিয়া তাহাকে বলিলাম, "গোল-মাল আবার কিসের, আমি বারান্দায় গিয়ে দেখে আসছি। সেখানে গেলেই বুঝতে পারা যাবে শব্দটা কোন্ দিক থেকে আসছে। ঘরের ভিতর থেকে মনে হচ্ছে বটে বারান্দায় কে পায়চারী করে বেড়াচ্ছে কিন্তু তা নয়। বেরুলেই ধরা পড়ে যাবে।" আমি ভোজালিখানি তুলিয়া লইয়া দ্বার খুলিয়া কক্ষের বাহির হইয়া গেলাম। মাণিকদাও আমার অনুসরণ করিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। এ দিক ও দিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, এবং সেইপায়ের শব্দ ক্রমে আমাদের পাশ দিয়া চলিতে চলিতে সিঁড়ির উপর গিয়া

...র জল থামিল। তারপর সিঁড়ির উপর ...প শব্দ আরম্ভ হইল। স্পষ্ট মনে হইল কে ...ন তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে।

মাণিকদা শুষ্কমুখে কহিল, "তাই ত বিজয়, ত বড় বিপদে পড়া গেল, এ আর তা না হয়ে -" ...হার কণ্ঠ যেন আপনা-আপনি রুদ্ধ হইয়া গেল।

আমি বলিলাম, "যাই কেন হ'ক না ...তে ভয় পাবার কি আছে। আমি নীচে ...য়ে এখনই দেখে আসচি।" এই বলিয়া আমি ...ড়ির দিকে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া গিয়া ...মিয়া গেলাম। ভাবিলাম নীচে গিয়াই বা কি ...ইবে। এই উজ্জ্বল আলোকের মধ্যে যখন কিছু ...খিতে পাইলাম না, তখন নীচে গিয়া কি আর কিছু দেখিতে পাইব? এইবার সত্যই আমায় ...শঙ্কিত করিয়া তুলিল। ভূতের ভয় আমি ...খি না সত্য কিন্তু ভূতের অস্তিত্ব আমি মানি। ...বে কি ইহা ভূতেরই খেলা? হইতে পারে। ...উক, তাহাতে কি আসে যায়, বরং জানিতে ...রিলেই ত সুবিধা, মিথ্যা চোরের আশঙ্কায় এ ভাবে আর ছুটাছুটি করিতে হইবে না।

মাণিকদা কহিল, "হ্যাঁহে ভায়া, এখানে ...ড়িয়ে থেকে আর কি করবে; চল ঘরের ভেতর ...ই,—দু'জনে বসে গল্প করে কোন রকমে রাতটা কাটিয়ে দিই।—এ না হয়ে যায় না।"

আমি কহিলাম, "সেই ভাল মাণিকদা, গিয়ে শুয়ে পড়া যাক, ও শব্দতে আমাদের কি হবে। চোর যে নয় তা ত দেখে নিলাম।"

আমরা উভয়ে আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মাণিকদা বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আমার দেহে কাঁটা দিয়ে উঠেছে ভাই— রাতটা কোন রকমে কাটাতে পারলে হয়।"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "এত ভয় কিসের মাণিকদা—ধর যদি ভূতই হয়,—আমাদের সে করবে কি? আপনি আপনি ঘুরে বেড়াক না— আমাদের ও দিকে কান না দিলেই হবে।"

এমন সময় নীচে কলখোলার শব্দ পাইলাম। তিনটী কল হইতেই হুড়হুড় করিয়া জল পড়িতেছে। আমি বলিলাম, "চাকর বেটার কাজ দেখলে ত, কলগুলো বন্ধ করে রেখে যেতে বললাম, আর কিনা খুলে রেখে গেল। যাই বন্ধ করে দিয়ে আসি।"

আমি উঠিলাম। মাণিকদাও আমার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "একলা এঘরে থাকচি না ভাই।"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "তা হ'লে নীচে থেকেই ঘুরে আসবে চল।"

নামিতে নামিতে মাণিকদা কহিল, "এত করে সাবধান করে দিলে, তবুও যে চাকরটা কল খুলে রেখে যাবে তা ত আমার মনে হয় না।"

হাসিয়া কহিলাম, "তুমি বোধ হয় মনে করছ ভূতেই খুলে দিয়েছে?"

মাণিকদা কহিল, "সত্যিই আমার তাই বিশ্বাস।"

কহিলাম, "একটু ভেবে দেখলে তোমার আর ও বিশ্বাস থাকবে না,—আগে কলগুলো সে বন্ধই করেছিল, তারপর ধমক খেয়ে বেশী সাবধান হতে গিয়ে কলগুলো উল্টো দিকে ঘুরিয়ে রেখে গেছে। তখন ত আর জল ছিল না, তাই বুঝতে পারে নি।"

অন্যমনস্কভাবে মাণিকদা কহিল, "হয় ত তাই হবে।"

নীচে নামিয়া কলগুলো আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া দুইজনে উপরে চলিয়া গেলাম। বিছানায় গিয়া সবে বসিয়াছি, আবার কল খোলার শব্দ পাইলাম। তিনটী কল হইতেই আবার সবেগে জল পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

মাণিকদা কহিল, "হাঁ হে ভায়া, তুমিও কি কলগুলো উল্টে ঘুরিয়ে ছিলে?"

ইহার কি উত্তর দিব! আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। খোলা কল উল্টা দিকে ঘুরাইলে জলপড়া বন্ধ হইয়াই যাইবে এবং তাহাই হইয়াছিল। এত জোরে আঁটিয়াছিলাম যে, তাহা আপনি খোলা সম্ভব নহে। তাহা হইলে মাণিকদার কথাই কি ঠিক? ভূতে এইরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে? এ ভাবে উপদ্রব করিবারই কারণ কি? বাড়ী ছাড়া করা? কিন্তু বৃথা আশা, ভয় পাইলে ত বাড়ী ছাড়া করিবে। ভ্রূক্ষেপ না করিলেই চলিবে। শেষে হয়রাণ হইয়া সে নিজেই উপদ্রব করা বন্ধ করিবে। তাহারও ত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে হয়। এসব কথা মাণিকদাকে আর বলিলাম না,—কহিলাম, "অনেক রাত হয়ে গেছে মাণিকদা শুয়ে পড় আলো নিবিয়ে দি কি বল? ভয় করবে না ত?"

মাণিকদা কহিল, "তুমি কাছে থাকলে, ভয় কাউকে করি না, দাও আলো নিবিয়ে। দুর্গা বলে ঘুমোবার চেষ্টা করা যাক্।"

আলো নিবাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িলাম এবং অচিরেই নিদ্রাভিভূত হইলাম। কতক্ষণ পরে ঠিক মনে নাই, মাণিকদার ঠেলাঠেলিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, "কি মাণিকদা কি হয়েছে?"

মাণিকদা চাপা গলায় কহিল, "শুনতে পাচ্ছ না, কে কলসি থেকে জল গড়িয়ে খাচ্ছে।"

মাণিকদা মিথ্যা বলে নাই। সত্যই কলসী হইতে কে যেন জল গড়াইয়া খাইতেছে। এ ত ভারি আপদ করিল দেখিতেছি। রুদ্ধদ্বার কক্ষের মধ্যে কাহারও প্রবেশ করা সম্ভব নহে। ইহাও সেই উপদ্রবেরই অঙ্গ-বিশেষ। এমন সময় ধপ্ করিয়া একটা আওয়াজ হইল। মনে হইল জলপূর্ণ কলসীটি কে যেন মেজের উপর সজোরে ফেলিয়া দিল। আছড়াইয়া-ভাঙ্গা কলসী হইতে জল পড়িলে যে রকম শব্দ হয় ঠিক সেই রকম শব্দও শুনিতে পাইলাম।

মাণিকদা বলিয়া উঠিল, "বিছানাপত্র সব ভাসিয়ে দিলে যে।"

"কি জ্বালা!" বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আলো জ্বালিয়া কলসীর দিকে চাহিয়া আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলাম। কলসী ভাঙ্গে নাই, যেভাবে বসান ছিল ঠিক সেই ভাবেই বসান রহিয়াছে। এক ফোঁটা জলও মেজের উপর পড়ে নাই।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাণিকদা কহিল, "আজ আর ঘুমোতে দিলে না দেখছি। নাও হে ভায়া বসে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাক।"

আমার ভারি রাগ হইল। এইভাবে উপদ্রব করিয়া জব্দ করিলে তাহা কিছুতেই হইবে না। বসিয়া রাত্রি অতিবাহিত করা হইবে না। তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, তোমার ও সব উপদ্রবে এতটুকু বিচলিত হই নাই। আমার সত্যই তখন কেমন রোক চাপিয়া গিয়াছিল। আমি বলিলাম, "মাণিকদা, বসে রাত কাটালে চলবে না, ঘুমোতেই হবে। যা কিছু শব্দ শোন তাতে আর কান দিও না। যত ইচ্ছে শব্দ করুক, শুয়ে পড় মাণিকদা।" আলো নিবাইয়া তখনই শুইয়া পড়িলাম। আর ঘুমের কোন ব্যাঘাত হইল না। এক ঘুমে রাত্রি পোহাইয়া গেল।

চোখ চাহিয়া দেখিলাম, মাণিকদা বিছানার উপর বসিয়া বিড়ি টানিতেছে। আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "এমন বাড়ীতে মানুষে থাকে,—আর এ বাড়ীতে থেক না—অন্য বাড়ী খুঁজে নাও ভাই।"

আমি উঠিয়া বসিয়া কহিলাম, "অনেক খোঁজ করে এ বাড়ী পেয়েছি মাণিকদা,—ভাড়াও কম, অথচ আমার বেশ সঙ্কুলান হয়েছে। তা ছাড়া এখন ব্যাপারটা যখন বুঝে নিলাম, তখন আর কোন অসুবিধে হবে না। যা খুসী ওর করুক,—কান আর দেব না।"

মাণিকদা কহিল, 'না হে ভায়া, এ রকম গোয়ারতুমি করা ভাল নয়, কাল সারারাত্রি যে রকম কাণ্ড-কারখানা দেখলাম,—তাতে তার অসাধ্য কিছু নেই, সে সবই করতে পারে।"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "তোমার এত ভয় মাণিকদা? আমি সত্যই বলছি, ভয়টয় আমার কিছু হয়নি, হবেও না! আমার বিশ্বাস ওর বেশী ক্ষমতা ওদের নেই,—মানুষের দেহ স্পর্শ করবার শক্তি ওদের কোথা। একবার দেখা পেলে না হয় তারও পরীক্ষা করে দেখা যেত।"

মাণিকদা কহিল, "তা তুমি পার,—তোমারও অসাধ্য কিছু নেই। তোমাকে ত আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি ওদের চেয়ে দৌরাত্ম্য করতে তুমিও বড় কম যাও না, তবে কথা হচ্ছে এ সব হাঙ্গামা করে লাভ কি। আর কিছু না হোক, খেটে খুটে রাত্রে সুস্থ হয়ে ঘুমোতে পারবে না, ওর দৌরাত্ম্যে হয় ত পাঁচ সাত বার উঠতে হবে।"

আমি কহিলাম, "তুমি দেখ মাণিকদা, আজ থেকে আমি কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোই। করুক না কত দৌরাত্ম্য করতে পারে! তোমাকেও আজ আমার এখানে শুতে হবে।"

মাণিকদা কহিল, "তা শোব। তুমি কাছে থাকলে আমার কোন ভয়ই থাকে না। তবে একলা যদি কেউ এ ঘরে শুতে বলে তা আমি পারব না। যাক কথায় কথায় বেলা হয়ে গেল, এখনই শ্যামবাজার যেতে হবে।"

আমি কহিলাম, "তা যাও,রাত্রে আসছ ত?"

মাণিকদা কহিল, "আসব বৈ কি। এ অবস্থায় তোমায় একলা ফেলে অন্য কোথাও আমি শুতে পারি না।"

সে দিন রাত্রের আহার সারিয়া যখন গৃহে ফিরিলাম, তখন প্রায় নয়টা হইবে। চাবি খুলিতেছি, পাশের বাড়ী রকের উপর হইতে একটী ভদ্রলোক বলিল, "মশায় আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।"

তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলাম, "আজ্ঞে আমায় বলছেন, বেশ ত কি বলবেন বলুন।"

ভদ্রলোকটী বলিল, "আমি এই পাশের বাড়ীতেই থাকি। কদিন আপনি এসেছেন দেখলুম, কিন্তু আলাপ করবার সুযোগ হয় নি।"

আমি কহিলাম, "আমিও গোছগাছ করতে কদিন পর্য্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম, তাই আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারি নি।"

ভদ্রলোকটী কহিল, "দাঁড়িয়ে রইলেন, রকে এসে বসুন না?"

আমি অগ্রসর হইয়া গিয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিলাম।

ভদ্রলোকটি কহিল, "ও বাড়িতে আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে না?"

আমি কহিলাম, "আজ্ঞে না, বরং আমার কাজের সুবিধেই হয়েছে। নীচের ঘরগুলোর বেশ আলো বাতাস আছে কিনা।"

ভদ্রলোকটী কহিল, "তা আছে, সে কথা বলছি না। ও বাড়ীতে তেরাত্রিও কেউ থাকতে পারে না, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম—কত ভাড়াটে এল কত উঠে গেল।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "রাত্রে একটু গোলমাল হয়, সেই কথা বলছিলেন?"

ভদ্রলোকটী বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "তা হ'লে আপনিও দেখেছেন, কিন্তু একটু আধটু বলছেন কি! ভয়ানক উপদ্রব করে শুনেছি। রাত্রে যে ওপরে ওঠে তার পেছন পেছন ঘোরে—এটা টানে, ওটা ফেলে, কতরকম কি শব্দ করে, সারারাত্রি কাউকে ঘুমুতে দেয় না—পরদিন সকালে উঠেই লোক পালিয়ে যায়। কিন্তু আপনি ত চাররাত্রি বেশ কাটালেন, আবার আজও শুতে যাচ্ছেন দেখছি। তারপর আপনি আবার একলা থাকেন।"

আমি কহিলাম, "সেই জন্যেই ত সুবিধে, আমি একলা মানুষ, উপদ্রব করে আমার কিছু

পারতে পারবে না। দেখাই যাক, উপদ্রবের মাত্রাটা কতদূরে যায়। কিন্তু ব্যাপার কি বলুন দেখি মশায় ?"

ভদ্রলোকটী কহিল, "বাড়ী যার তিনি অতি ভদ্রলোক, ঐ হাঙ্গামার পর থেকে তিনি বাড়ী ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। উনি একবার সপরিবারে মধুপুরে বেড়াতে যান, বাড়ীটি খালি পড়ে থাকবে তাই তাঁর দুজন প্রজাকে রেখে যান। দিন পনর পরে দেখলুম বাড়ীতে চাবি লাগান, কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না, মনে করলুম সে দুজন বাড়ী চলে গেছে। এই ভাবে আরও দিন কয়েক গেল তারপর বাড়ীর মধ্যে থেকে পচা গন্ধ বেরুতে লাগ্‌ল—আমাদের কেমন সন্দেহ হ'ল—সবাই পরামর্শ করে পুলিসে খবর পাঠালুম। পুলিশ এল, কুলুপ ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে এক পচা মড়া দেখতে পেলে। মড়ার গলা কাটা, তার সঙ্গী তাকে খুন করে সরে পড়েছে। এখনও সে ধরা পড়ে নি। তারপর থেকে বাড়ীতে ঐ রকম উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে। বাড়ীর মালিক বাড়ী-ছাড়া হল, কোন ভাড়াটেও থাকতে চায় না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তা হ'লে তিনিই ঐ বাড়ীতে অধিষ্ঠান করে আছেন, দেখা যাক আমাকে তিনি তাড়ান কি করে! আচ্ছা মশায় তাকে দেখেছেন কত বয়স কি রকম চেহারা ?"

ভদ্রলোকটী কহিল, "১৭।১৮ বছরের একটা ছোড়া, রোগা হাড়বেরকরা।" তার পর একটু থামিয়া কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কেন বলুন দেখি! দেখেছেন নাকি ?"

আমি হাসিয়া উঠিয়া কহিলাম, "না মশায়, এখনও সে মহাপ্রভুর চেহারা দেখার সৌভাগ্য হয় নি, শুধু তাঁর ক্রিয়াকলাপের সামান্য একটু পরিচয় পেয়েছি। শেষ অবধি হয় ত দেখা দিতেও পারেন। তা হ'লে আজ উঠি মশায়।"

ভদ্রলোকটী কহিল, "ধন্য আপনার সাহস। এ সব কথা শোনবার পরও আপনি একলা ঐ বাড়ীতে শুতে চলেছেন!"

আমি কহিলাম, "শুতে ত হবে, বাড়ী থাকতে আর কোথায় যাব।" এই বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম, এবং চাবি খুলিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলাম, আজ একটা বোঝা পড়া করিতে হইবে। ঐ ত একটা রোগা ছোড়া, হইলই বা ভূত, মারামারি করিয়া কি সে আমার সহিত পারিবে। সত্যই আমার দেহে তখন অসাধারণ শক্তি ছিল, ঐ রকমের চার পাঁচজন ছোড়াকে আমি অনায়াসেই ধরাশায়ী করিতে পারিতাম।

উঠান পার হইয়া বারান্দায় উঠিতে হয়। উঠানে পা দিতেই পিছনে পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। সেই পরিচিত পদশব্দ! বুঝিলাম আজ তিনি এখান হইতে পিছন্‌ লইয়াছেন। আমি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলাম না, যে ভাবে প্রত্যেক দিন উপরে যাই, সেইভাবে আলো জ্বালাইয়া এবং নিবাইয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলাম। তিনিও আমার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। আমি পিছন দিকে চাহিলামও না। দোতলার বারান্দার উপর দাঁড়াইয়া সুইচে হাত দিতে গেলাম, মনে হইল কে সজোরে হাত চাপিয়া ধরিল। বুঝিলাম, তাঁহারই কাজ; দেখা যাক উনি কত শক্তি ধরেন। এক ঝাঁকানি দিতেই উনি হাত ছাড়িয়া দিলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম, "এই শক্তি নিয়ে আমার পিছনে লাগ্‌তে এসেছ। তোমার মত অমন পাঁচ সাত জন তালপাতার সেপাইকে আমি একাই সায়েস্তা করতে পারি।" আমার কথা কি তাঁহার কানে পৌছাইবে? কে জানে। আমি আবার সুইচের দিকে হাত বাড়াইলাম, এবার আর কেহ বাধা দিল না। মনে মনে হাসি পাইল। তা হ'লে কথা কানে গিয়াছে! আমাদের দেশের প্রবাদ বাক্যটিও তাহা হইলে মিথ্যা নহে—"মারের চোটে ভূত পালায়।" আর তিনি আমার

পিছনে লাগিবেন না। কিন্তু পরক্ষণেই আমার ভুল বুঝিতে পারিলাম। তিনি বাধা দিবার পদ্ধতি বদলাইয়াছেন। সুইচটীকে আমার স্পর্শের বাহিরে সরাইয়া লইয়াছেন। বার বার দেওয়ালের এ দিক ও দিক হাত দিয়াও সুইচের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিলাম না। এমন সময় হঠাৎ সামনের ঘরের কুলুপ খোলার শব্দ কানে গেল। পকেট হইতে তাড়াতাড়ি দিয়াশলাইটী বাহির করিয়া জ্বালিয়া ফেলিলাম, দেখিলাম, সুইচটী যথাস্থানেই রহিয়াছে। এক হাতে জ্বলন্ত কাটিটী ধরিয়া অন্য হাতে সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া ফেলিলাম। সবিস্ময়ে দেখিলাম দোতলার দুইটী ঘরেরই দরজা খোলা। এ ঘর দুইটীতে আমার দরকারি কাগজপত্র ও দুষ্প্রাপ্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি থাকিত; দুইটী দরজায় দামি কুলুপ দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিতাম এবং তাহার চাবি সর্ব্বদা আমার কাছে থাকিত। ইহাও তাহা হইলে তাঁহারই কাজ! যাক, আমি দরজা বন্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া গেলাম। এমন সময় আলোটি দপ্‌ করিয়া নিবিয়া গেল; গভীর অন্ধকারে আমি কিছু দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু কানের মধ্যে শব্দ আসিয়া বাজিল, ঝন্‌ ঝন্‌ ঝনাৎ। কি সর্ব্বনাশ! এ যে শিশি ভাঙ্গার শব্দ! আমার সেই সব দুষ্প্রাপ্য রাসায়নিক দ্রব্যের দামি শিশিগুলি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিল। আমি মাথায় হাত দিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার ভাবিবার শক্তি ক্ষণকালের জন্য যেন কেমন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া আবার বারান্দার আলো জ্বালিলাম। দরজার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, দরজা তেমনই বন্ধ রহিয়াছে! না, মিথ্যামিথ্যি এতটা সময় ভুলের পিছনে নষ্ট করিলাম। আমার পূর্ব্বেই বোঝা উচিত ছিল, এ সব তাহারই কাজ। ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উপরে চলিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য ছিল।

যাক্‌, আর দেরী না করিয়া আলো নিবাইয়া আমি ত্রিতলে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। দুই ধাপ উঠিয়াছি, এমন সময় মনে হইল কে যেন আমার পিছনের জামা টানিয়া ধরিয়াছে। আমি দাঁড়াইয়া পড়িলাম। তাই ত, সে কি মনে করিয়াছে এই ভাবে আমায় আটক করিয়া রাখিবে? দেখি কি করিয়া রাখে। আমি সজোরে জামা ধরিয়া এক টান মারিলাম। সঙ্গে সঙ্গে জামা ছিঁড়িয়া যাইবার শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। আমি সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আবার সোজা উপরে উঠিতে লাগিলাম। জামাতে আবার টান পড়িল। কিন্তু তাহাতে গতিরোধ হইল না। একটা ভারি জিনিষ টানিতে টানিতে আমি ধাপের পর ধাপ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। এমনই ভাবে ধীরে ধীরে তেতলার বারান্দার উপর উঠিলাম, আলো জ্বালিয়া হঠাৎ আমি পিছনের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলাম। প্রতিবারের মত কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। আমি তখন সেই অদৃশ্য ছোকরাটীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম, "দেখ বাপু, মিছিমিছি কেন ঘুরে মরছ, কদিন ধরেই ত নানারকম উপদ্রব করছ,—দিনের বেলা আলো জ্বালাচ্ছ, রাত্রে কল খুলে দিচ্ছ, মাণিকদার গলা নকল করে ডাকছ, কলসী ভাঙ্গছ, বারান্দায় বেড়াচ্ছ, সিন্দুক ধরে টানাটানি করছ, কুলুপ মোচড়াচ্ছ,—কিন্তু তাতে আমায় তাড়াতে পারলে কি? তা ছাড়া আজ ত অনেক কিছু করলে, জামা ধরে ঝুলতে ঝুলতে উঠলে, আরও কত কি ত করলে, মনে করেছিলে আমি ছুটে পালাব! শোন, এ সব করে আমার কিছু করতে পারবে না। এ বাড়ী আমি কিছুতেই ছাড়ব না। তার চেয়ে এক কাজ কর,—তুমিও থাক আমিও থাকি। তোমার কোন রকম অসুবিধে আমি করব না। বরং কি করলে তোমার সুবিধে হয় যদি কোন রকমে আমায় তা জানাতে পার তা হ'লে তারও ব্যবস্থা আমি করতে পারি।"

হইল যেন একটা দীর্ঘশ্বাস হাওয়ার সহিত মিশিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে সেই অদৃশ্য ব্যক্তি পদশব্দ করিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে লাগিল। শব্দটা কতদূর গিয়া মিলাইয়া যায়, তাহাই দেখিবার জন্য আমি সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। দেখিলাম পদশব্দ খানিকদূর নামিয়া আবার উপরের দিকে উঠিতে লাগিল এবং ঠিক আমার সম্মুখে আসিয়া শব্দটা হঠাৎ থামিয়া গেল। আমি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অল্পক্ষণ পরে পদশব্দ আবার নামিতে আরম্ভ করিল এবং অল্প খানিকদূর গিয়া আবার উপরের দিকে উঠিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া থামিল। এইভাবে বার পাঁচেক পদশব্দ ওঠা-নামা করিবার পর হঠাৎ আমার মনে হইল, হয় ত সে আমায় অনুসরণ করিতে বলিতেছে। এইবার যখন পদশব্দ নামিতে আরম্ভ করিল, আমি তাহার অনুসরণ করিয়া চলিলাম। পদশব্দ আর থামিল না, নীচে নামিতে লাগিল, আমিও পিছন পিছন চলিলাম। ক্রমে সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া আমি নীচের বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শব্দ তখন বারান্দার উপর দিয়া চলিতে চলিতে ভিতর দিকের একটা রুদ্ধ ঘরের ভিতরে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। আমি ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পড়িলাম। প্রায় মিনিট পনর স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম, আর কোন শব্দ শুনিতে পাইলাম না। তখন আমি ধীরে ধীরে উপরে চলিয়া গেলাম, আর কোন পদশব্দ আমার অনুসরণ করিয়া চলিল না। মনে হইল, সে আমার সহিত সন্ধি করিতেই চাহে। মনের মধ্যে যেন স্বস্তি অনুভব করিলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থির করিয়া ফেলিলাম, নীচের ঐ ঘরটা কালই খালি করিয়া দিব এবং সকাল সন্ধ্যায় ঐ ঘরে ধুনা গঙ্গাজল দিবার ব্যবস্থা করিব।

এমন সময় পথের উপর হইতে মাণিকদার ডাক আসিল, "বিজয় ভাই, দোরটা খুলে দে আমি এসেছি।"

উত্তর দিলাম, "যাচ্ছি মাণিকদা।" সঙ্গে সঙ্গে একবার মনে হইল, মাণিকদাই ডাকিতেছে, না তাহারই কারসাজি? দেখা যাক। আমি নীচে নামিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিলাম। দেখিলাম মাণিকদা দরজার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছে। আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমি ভেবেছিলাম ভূতের ভয়ে তুমি বুঝি আর এলে না মাণিকদা।"

মাণিকদা কহিল, "তোমাকে কি সারারাত এ বাড়ীতে একলা রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারি। আমার যে আসতেই হবে।"

দরজা বন্ধ করিয়া মাণিকদাকে লইয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। এবার আর কোন পদশব্দ আমাদের অনুসরণ করিল না।

মাণিকদা তেতলায় উঠিয়া কহিল, "আজ যে কেউ পিছু নিলে না?"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "আপোষ হয়ে গেছে।"

মাণিকদা কৌতূহলপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "কি রকম?"

শয্যায় বসিয়া মাণিকদাকে সমস্ত কথা বলিলাম।

মাণিকদা হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে লোকটীকে ভাল বলতে হবে। দেখা যাক, রাত্রিটা কি ভাবে কাটে।"

সত্যই সে রাত্রে কোনরূপ উপদ্রব হইল না। আমরা এক ঘুমে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম।

* * * *

তারপর দীর্ঘ সাত বৎসর আমি এই বাড়ীতে আছি, একটী দিনের জন্য কোনও উপদ্রব হয় নাই। নীচের সেই ঘরটি এখনও খালি আছে। প্রত্যহ দুবেলা নিয়মিতভাবে ধুনা গঙ্গাজল দেওয়া হয় একথা বলাই বাহুল্য।





সম্পাদক—শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৬ষ্ঠ বর্ষ	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭	২য় সংখ্যা

প্রহেলিকা

শ্রী হরিপদ গুহ, বিদ্যারত্ন, সাহিত্য-ভারতী

দেহের বেসাতি ছিল অনুরাধার জীবিকা। যেন খেয়ালী মনের টবে ফোটা গোলাপ; কালের শেষে আর স্মরণে আসার প্রয়োজন হয় ।

রূপের ফাঁদ পাতিয়া নিত্য নব অতিথির দৃষ্টি লব করাই ছিল তার জীবনের কামা। আর তারই উন্মাদনায় সে দিনের পর দিন রাত্রির রাধি ক্লান্তিহারা হইয়া বাইরের কলরবে তিয়া থাকিত।

সঙ্গীরা বলিত, ধন্যি বরাং কিন্তু তোর! কামাই নেই! এত জোটেও ত! তাও বলি, অত চেষ্টা আমাদের দ্বারা হবে না।

অধিকাংশ সময়ই অনুরাধা মুখ টিপিয়া হাসিত; কোন উত্তর দিত না। আবার কখন কখন বলিত, পয়সার জন্যই যখন এ পথ বেছে নিয়েছি, তখন ছাড়্‌লে চল্‌বে কেন?

সঙ্গীরা হাসিয়া বলিত, তা বটে!

সেদিন বারুণী!

অজস্র নর-নারীর কলকণ্ঠে নদীতীর মুখরিত। অনুরাধা স্নান সারিয়া শিবের মন্দিরে

প্রত্যা করিতেছিল, অকস্মাৎ পিছনে 'চোর চোর' শব্দে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিল—তাহারই দিকে সকলে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে ; কয়েকজন ছুটিয়া আসিয়া একটী কিশোরকে চাপিয়া ধরিয়াছে ; আর তাহারই হাতে রহিয়াছে তাহার গলার হার ছড়া।

অসহ অপমানের বেদনায় কিশোরের মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল ; মলিন মুখের সকরুণ দৃষ্টি যেন অনুরাধার সাহায্য প্রার্থনায় ঘুরিয়া আসিয়া মাটীর সহিত নিবদ্ধ হইয়া গেল।

কে একজন কিশোরের গলায় হাত দিয়া ধাক্কা মারিয়া বলিল, চল বেটা, চুরীর আর জায়গা পাস্ নি ? ভদ্রলোকের মেয়ের গায়ে হাত দেওয়া ; হাজতে গেলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

আর একজন একটা ঘুসি মারিবার জন্য হাত উঠাইয়াছিল, অনুরাধা বাধা দিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা বিনয়, এ কি ছেলেমানুষী ! ভাল বিপদে ফেলেছিলে যা হোক ! চল, চল, আর একদণ্ড এখানে দাঁড়ায় না।

কিশোর বিস্ময়ভরে একবার অনুরাধার মুখের দিকে চাহিল ; কোন কথাই বলিতে পারিল না। সম্মুখের লোকগুলি একটা কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়া সরিয়া গেল। একজন অপরজনকে বলিল, আরে ছ্যা, বেশ্যার কাণ্ড আর কত ভাল হবে !

অনুরাধা কোন প্রতিবাদ করিল না ; নিঃশব্দে কিশোরের হাতটা ধরিয়া টানিতে টানিতে ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া গেল। তারপর একটা নির্জ্জন স্থানে আসিয়া কিশোরের হাতে হারছড়া গুঁজিয়া দিতে দিতে বলিল, তোমায় খুব আশ্চর্য্য করে দিয়ে দিয়েছিলুম, না ভাই ? কিন্তু সে সময় ও মিথ্যে বলা ছাড়াও ত উপায় কিছু ছিল না !

কিশোরের চোখ দুটী দিয়া রুদ্ধ অশ্রুবেগ যেন সহস্র মুখে ঝরিয়া পড়িল। সে জড়িত কণ্ঠে বলিল, না, না, ও হার আমি নেব না ! আপনার পায়ে পড়ি, আর লজ্জা দেবেন না !

অনুরাধা খানিকটা পিছাইয়া গিয়া বলিল, ছি, ও কথা বল্তে নেই। প্রয়োজনের উপরেই না জিনিষের দর ; সত্যি বলছি ভাই, ক'দিন থেকে এটা আর পছন্দ হচ্ছিল না। পড়েই ত থাকত ; তোমার যদি কাজে লাগে, মন্দ কি ?

কিশোর কথা বলিতে পারিল না ; পরিপূর্ণ-বিস্ময়ে অনুরাধার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অনুরাধাও আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইল।

সঙ্গীদের মধ্যে একজন বলিল, কিলো, সুবিধে হ'ল না বুঝি ? ধন্যি মেয়ে বটে ! ও চোরটাকেও হাত ছাড়া করতে চাস্ না ? মুখে মুড়ো ঝাঁটা না দিয়ে এ কি আদিখ্যেতা তোর ?

অন্যজন বলিল, যাক বাবু, ভালয় ভালয় যে জিনিষটা উদ্ধার হয়ে গেল, এই ঢের ! কোথায় রাখ্‌লি আবার ?

অনুরাধা হাসিতে লাগিল। সঙ্গিনী বলিল, হাসি দেখ্‌লে গা জ্বলে যায় ! খুলেই বল্ না ছাই ?

অনুরাধা গীরকণ্ঠে বলিল, তাকেই সেটা দিয়ে দিলুম। আহা, অভাগা বেচারী !

গালে হাত দিয়া সঙ্গিনী বলিল, সে কি লো !

অপরা মুখ ঘুরাইয়া বলিল, বেশ ভালই। আমাদের মত ত আর পয়সার অভাব নেই; অমন দাতব্য না কর্‌লে বাহাদুরী দেখান হবে কেন ? তবু যদি সৎপাত্রে পড়্‌ত ?

অনুরাধা কথা বলিল না ; বুঝি এ বিদ্রূপ-বাণ তাহার হৃদয়ে আঘাত করিয়া সাড়া জাগাইতে পারিল না। বহুদিনের ঘুমন্ত-প্রায়-স্মৃতি আজ জাগ্রত হইয়া তাহাকে দিশাহারা করিয়া তুলিতে ছিল। মনে পড়িল, সেই দিনের কথা ; যেদিন তাহারই দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় উদ্দেশ্যে ডাক্তার ডাকিতে গিয়া ভাইটীকে তাহার শুধু

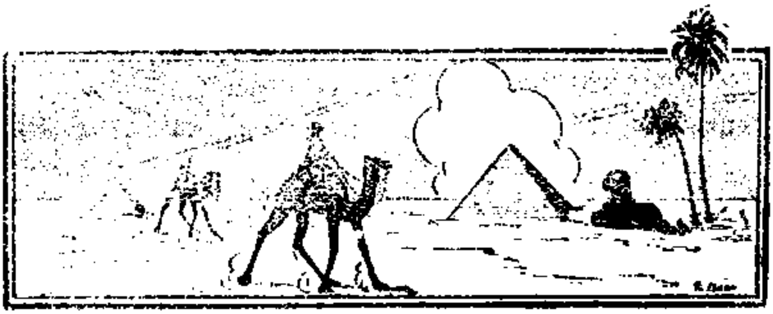
উপহাসের তীব্র বিষটুকু গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছিল! তারপর এমনিতর একটা উত্তেজনা মুহূর্ত্তে কাহার কণ্ঠ হইতে স্বর্ণালঙ্কার অপহরণ করিবার অপরাধে প্রথমত পথিক-বন্ধুর অযাচিত নির্য্যাতন—তারপর রাজদ্বারে কঠোর দণ্ড! উঃ! অনুরাধার চোখের সম্মুখ হইতে যেন সমস্ত বর্ত্তমানটা নিঃশেষে মুছিয়া যাইতেছিল।

একজন সঙ্গী বলিল, কি লো, আবার কি হ'ল?

অন্যজন বলিল, হঠাৎ দামী হারটা ... দমে গেছে বোধ হয়!

অনুরাধার কাণে এ সব কিছুই প্রবেশ করিল না। সে আপন-মনে মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিয়া বেদীর উপর মাথাটা লুটাইয়া দিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সঙ্গিণীরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া বলিল, ছাড়্‌তে ছাড়্‌লে নিজেই; এখন কেঁদে মর্‌লে হবে কেন? ঢং দেখে বাঁচি না!



পরকীয়া-সমিতি

শ্রী শচীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



এক

সহসা প্রেমতোষকে অশোকের এত ভাল লাগিল কেন, তাহা আমরা ভাবিয়া পাইতাম না!

প্রেমতোষের মতামত অশোকের সহিত মেলে না; বরং সে সকল মতামতকে সে অন্তরের সহিত অশ্রদ্ধাই করে। তথাপি প্রেমতোষকে তুষ্ট করিবার জন্য অশোক সদাসর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিত। আমরা তাহার এ ব্যবহারে যারপর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম।

নিরালায় অশোককে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে হাসিয়া উত্তর দিত—"বল্‌ব। আর একদিন!"

প্রেমতোষের সহিত আমাদের পরিচয় মাত্র অল্পদিনের। একদিন সন্ধ্যার পর আমরা অশোকের বৈঠকখানায় বসিয়া আছি, এমন সময় অশোক একজন অপরিচিত যুবককে সঙ্গে করিয়া ঘরে ঢুকিল। দীর্ঘাকৃতি যুবা। চোখদুটী কোটরগত। নাকে চশমা। মাথার রাশীকৃত চুলগুলি সাবধানের সহিত এলোমেলো করিয়া সাজানো।

অশোক বলিল—ইন্দ্র! ইনি হচ্ছেন শ্রীযুত প্রেমতোষ সাহা। নব্য-তান্ত্রিক তরুণ সাহিত্যিক। আজ ট্রামে আলাপ হলো। দেশ-বিদেশ ঘুরে সম্প্রতি কলকাতায় এসেচেন।

নমস্কার করিলাম। পরিচয় হইল। তারপর চায়ের সহিত প্রেমতোষ-বাবুর সাহিত্য-আলোচনা সেবন করিতে লাগিলাম।

ভদ্রলোকের কথা বলিবার বেশ একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে। বড় বড় পুস্তকের নাম করিয়া নজির উত্থাপিত করিতে লাগিলেন। নিজের মতামতগুলি প্রকাশ করিবার সময় হাত-মুখ নাড়িয়া অস্বাভাবিক জোর প্রকাশ করেন বলিয়া মনে হইল।

বলিলেন—প্রেম! বিবাহ!! এ সমস্ত কুসংস্কার। নব্য-তন্ত্রের দল তারই বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেচে।

সভয়ে বলিলাম—তা' হ'লে একনিষ্ঠত্ব বস্তুটা—

সদয়-ভাবে হাসিয়া প্রেমতোষ-বাবু বলিলেন—ও গুলো কথার কথা! দেহের ক্ষুধাটাই হচ্চে সব থেকে বড়ো জিনিষ। দেহের দাবীকে মিটানোই হচ্চে নর-নারীর শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য! আপনারা রামকানাই-বাবুর কবিতা পড়েন না?

বিনীতভাবে নিজেদের অজ্ঞতা স্বীকার করিলাম।

—পড়ে দেখবেন। রবীন্দ্রনাথকে অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছেন 'গাধার ডাক'-এর মতো কবিতা রবীন্দ্রনাথের কলম দিয়ে কোনও দিনই বেরুবে না।

দেখিলাম, বন্ধু জ্যোতিশের দুই চক্ষু কপালে উঠিয়াছে। অশোক পিছনে বসিয়া হাসি চাপিতে অস্থির হইয়া উঠিতেছে। আমি বিপন্নভাবে গম্ভীর হইয়া প্রেমতোষ-বাবুর বাক্য-সুধা পান করিতে লাগিলাম।

দুই

দিনকয়েক পরের কথা।

প্রেমতোষ-বাবুর সহিত আলাপ জমিয়া

উঠিয়াছে। অশোকের বৈঠকখানায় তিনি প্রতিদিনের অতিথি।

সেদিন বাঙলা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের দান সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল।

প্রেমতোষ-বাবু বলিলেন—

—শরৎচন্দ্র! কি লিখেছেন তিনি! আপনাদের ব্যক্তিত্বের মোহ এখনো গেল না! পড়েছেন যদু বসাকের উপন্যাস—'পন?' পড়েন নি! তাই বলছেন! যৌন-তত্ত্বের ও রকম সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শরৎচন্দ্র ধারণাও করতে পারেন না। পঁয়ত্রিশ বছরের নায়িকা, আর পনের বছরের নায়ক! বাঙলা-সাহিত্যে অভিনব অপূর্ব্ব বস্তু! জাতীয় উন্নতি কোন্ পথে তা শরৎচন্দ্র কোথাও ইঙ্গিত করেন নি। কিন্তু যদু-বাবু স্পষ্ট ক'রেই লিখেছেন।—কংগ্রেস, বিপ্লব, মহাত্মা,—এদের দিয়ে জাতের কিছুই হবে না। চাই—নর-নারীর মধ্যে প্রেম করবার অবাধ অধিকার। তাতেই হবে জাতীয় উন্নতি।—

জ্যোতিশ বলিল—কিন্তু তাতে যে দেশে ব্যভিচার অত্যন্ত—

—ব্যভিচার! ব্যভিচার বলেন কাকে? নর-নারীর যৌন-সম্মেলনটাকে আপনি ব্যভিচার বলেন! আশ্চর্য্য! সেইটেই তো স্বাভাবিক।

—অন্যান্য দেশের মতো আমাদের সমাজেও 'স্যাডালটারি' অর্থাৎ ব্যভিচারের প্রচলন হওয়া প্রয়োজন।

বলিলাম—এই কি নব্য-তান্ত্রিক সাহিত্যের আদর্শ?

প্রেমতোষ-বাবু বলিলেন—নিশ্চয়ই! আপনারা জানেন না, কিন্তু আমি জানি, এই সমস্ত লেখক মুখে যা বলে, কাজেও তাই ক'রে থাকে।

এই বলিয়া তিনি নব্য-তান্ত্রিক সাহিত্যিক দলের মুখের কথার অনুরূপ-কার্য্য-কলাপের সুদীর্ঘ ইস্তাহার প্রদান করিতে লাগিলেন।

সভাস্থল নীরব। প্রেমতোষ-বাবু বলিতে লাগিলেন—রামকানাই-বাবু দিবারাত্র মদ এবং মেয়েমানুষে ডুবে আছেন; কিন্তু তাতে কি তাঁর প্রতিভা কিছুমাত্র ম্লান হয়েছে? বরং দিন-দিন উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। তিনি যে মাংস মজ্জার গান গাচ্ছেন, সে-সবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর আছে।

চা আসিল। প্রেমতোষ-বাবুর গলা শুকাইয়া উঠিয়াছিল। তিনি চায়ের বাটিতে চুমুক দিলেন।

অশোক প্রেমতোষ-বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল—তা' হ'লে এদের কাছে কথাটা পাড়ি? প্রেমতোষ-বাবু মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

অশোক বলিল—দেখ ইন্দু, জ্যোতিশ! প্রেমতোষ-বাবুর ইচ্ছা, আমাদের সকলকে নিয়ে উনি একটি সাহিত্যিক সমিতি গঠন করেন। আমরাও ত কিছু কিছু সাহিত্য-চর্চ্চা করি, তার সঙ্গে ওঁর উৎসাহ এবং আদর্শ পেলে আমাদের উন্নতি হবে নিশ্চয়ই!

অশোক পূর্ব্বাহ্ণেই আমাদের শিখাইয়া রাখিয়াছিল। বলিলাম—নিশ্চয়ই! এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হোতে পারে। তা', সমিতির কি নাম হবে?

—পরকীয়া-সমিতি। এর উদ্দেশ্য, কার্য্য-প্রণালী প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয় উদ্বোধনের দিন প্রেমতোষ-বাবু তোমাদের বুঝিয়ে দেবেন উনিই হবেন সভাপতি।

তিন

পরকীয়া-সমিতির উদ্বোধন-সন্ধ্যা।

প্রকাণ্ড ফরাসের একধারে সভাপতি প্রেমতোষ সাহা সগর্ব্বে বিরাজমান! তাঁরই পাশে অশোক সমিতির খাতা-পত্র লইয়া বসিয়া আছে। ফরাসের এ-ধারে জ্যোতিশ এবং আমি।

কিছুক্ষণ পরে অশোক উঠিয়া সভাপতি-বরণ করিল। তারপর সুকণ্ঠ জ্যোতিশ রবীন্দ্রনাথের একখানি গান গাহিল।

গান শেষ হইলে প্রেমতোষ বাবু বক্তৃতা সুরু করিলেন। এই সভার উপযুক্ত এবং আদর্শ সভ্য হইতে হইলে আমাদের কোন্ পথে চলিতে হইবে তাহারই বিশদ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—

—জনসমাজে এই সমিতির আদর্শকে বহুল প্রচার করতে হবে; এবং সে কাজে সফলকাম হতে হলে প্রথমেই আমাদের কতকগুলি খ্যাত-নামা সাহিত্যিক এবং তাদের বড়ো বড়ো বই-এর নাম মুখস্থ করতে হবে; —যথা 'শোপেনহাওয়ার' এর ঈশ্বর তত্ত্ব; 'হাক্‌স্লির' ঘাত প্রতিঘাত ইত্যাদি।

—তারপর আমাদের চেহারাগুলিকে যুগোপযোগী করে তুলতে হবে এবং কথা বলবার একটা বিশিষ্ট কায়দাও সঙ্গে সঙ্গে দোরস্ত করতে হবে; —যাতে করে, জনসমাজে প্রথম পরিচয়েই আমরা একটা প্রতিষ্ঠা এবং মান অর্জ্জন করতে পারি; তাদের মনে একটা গভীর রেখাপাত করতে পারি। আমাদের মতামতগুলিও খুব প্রখর এবং বিপরীত হওয়া চাই: প্রচলিত সমস্ত মতবাদের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ভাষায় কটূক্তি করতে হবে, আর রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রকে ক'সে গালাগাল দিতে হবে। লোকে ভাববে যে, আমরা একটা যে-সে সাধারণ সমিতি নই।

প্রেমতোষ-বাবুর সুদীর্ঘ বক্তৃতা শেষ হইল; আমরা হাঁফ্ ছাড়িলাম।

অশোক বলিল —আমাদের সমিতির উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে যা কিছু জানবার সমস্তই সভাপতি-মশায় আপনাদের সরল ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন; সুতরাং সম্পাদকরূপে আমার আর বেশী কিছু বলবার নেই। আজকের সভায় আমি আপনাদের একটি গল্প পড়ে শোনাবো।

বলিলাম—চমৎকার! এখুনি সুরু হোক্।

অশোক কয়েকখানি 'স্লিপ'-কাগজ একত্র করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।—

"সম্প্রতি রায়-পরিবার হাওয়া বদল করিতে হাজারিবাগ আসিয়াছিল। সেখানে তাহাদের সহিত একটি যুবকের আলাপ হইল। তাহার নামটি ধরুন—রসময়বাবু! রসময় কবি; এবং তাহার চেহারাখানিও তদনুরূপ। প্রবাসে বাঙালীর সহিত বাঙালীর আলাপ অতি সহজেই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে: কিছুদিনের মধ্যে রায়েদের বাড়ী রসময় নিত্যকারের অতিথি হইয়া উঠিল। রসময়ের কবিত্ব, রসময়ের ব্যক্তিত্ব, রসময়ের বাগাড়ম্বর রায়েদের বড়ো ছেলে সুধীরকে সবিশেষ মুগ্ধ করিয়াছিল। সুধীর 'হকি' খেলিত; 'বক্সিং' লড়িত; সাহিত্যের বিশেষ কোন ধার ধারিত না। রসময়কে সে একজন মস্ত সাহিত্যিক বলিয়া ভাবিয়া লইয়াছিল। সুধীরের মাতা বহুদিন পরলোকে; পিতা চির রুগ্ন! কাজেই সংসারে তাহাদের অভিভাবক বলিতে কেহই ছিল না। সুধীরের দুই ভগ্নী। বড়ো—রমা; বিবাহের পর-দিন হইতেই বিধবা। পিতার একান্ত ইচ্ছায় সে আজও পাড়-দেওয়া কাপড় পরে; গায়ে দু-এক-খানা গহনাও রাখে। ছোটর নাম কল্যাণী। ষোড়শী, অনূঢ়া এবং বাগদত্তা।

এই দুই ভগ্নী এবং রুগ্ন পিতাকে লইয়া সুধীর পশ্চিমে হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে আসিয়াছিল। সেখানে রসময়ের মতো একজন বন্ধুলাভ করিয়া সে কৃতার্থ হইয়া গেল। রসময়কে বাড়ীতে আনিয়া দুই ভগ্নীর সহিত আলাপ করাইয়া দিল। শীঘ্রই রায়-পরিবারে রসময় অবাধ গতি প্রাপ্ত হইল।

যাহার সহিত কল্যাণীর বিবাহের ঠিক হইয়াছিল, কথা ছিল, তাহার আইন পরীক্ষার পর সে হাজারিবাগে যাইবে। সম্প্রতি তাহার আসিবার খবর কল্যাণীর নিকট পৌঁছিয়াছে।

ইতিমধ্যে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল...।"

এই সময়ে দ্বিতীয় দফা চা আসিল। অশোক এক-কাপ চা লইয়া তাহাতে চুমুক দিল। জ্যোতিশ আমায় ইসারা করিতেই আমি সভা-পতি মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম; দেখিলাম, তাঁহার সদা-প্রফুল্ল মুখখানা যেন শুষ্ক বিবর্ণ হইয়া গেছে, চোখে একটা সশঙ্কিত ভাব। বলিলাম—চলুক অশোক; বড় দেরী হচ্ছে; কৌতূহল নিভে আসচে।

অশোক পড়িতে আরম্ভ করিল—

"একদিন সকালে রমাকে একলা পাইয়া রসময় গদগদ-কণ্ঠে বলিল—আজ কি তিথি রমা দেবী?

রমা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—পূর্ণিমা! কেন বলুন তো?

রসময় রমার চোখে চোখ রাখিয়া বলিল—আমার অন্তরের একটা কামনা পূর্ণ করবেন রমা দেবী?

রমা মনে মনে শঙ্কিত হইয়া লেও মুখে বলিল—কি?

—আপনাতে-আমাতে আজ রাত্রে আপনা দের এই বাগানে বসে' পূর্ণিমার সৌন্দর্য্য উপভোগ করব! আসবেন আপনি! এ দীন ভক্তের বহুদিনের ইচ্ছা—

রমা অবাক্ হইয়া তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—কি বকছেন?

রসময় তখন উন্মাদের মত রমার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—আমি তোমায় ভালবাসি রমা। রাত্রে আমি আসবো, ১২টার পর; বাগানের দক্ষিণ দিকে; তুমি এসো!

এই কথা বলিয়াই রসময় ঝড়ের মতো বাহির হইয়া গেল। রমা সেইখানে বসিয়া পড়িল; তাহার সারা দেহ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতে-ছিল; তাহার মুখ নীল হইয়া উঠিয়াছিল।

এমন সময় কল্যাণী সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রমাকে দেখিয়া সে সবিস্ময়ে বলিল—কি হয়েছে দিদি!

রমা প্রথমটা কোন কথা বলিতে পারিল না; তাহার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তারপর একটু সুস্থ হইয়া সে সকল কথা কল্যাণীর নিকট খুলিয়া বলিল।

কথা শুনিয়া কল্যাণী জ্বলিয়া উঠিল—দাঁড়াও, এর বিহিত আমি করছি। দাদার যেমন কাণ্ড; জানা নেই, শোনা নেই, একটা ছোটলোককে এনে জোটালে!

তুই এর কি বিহিত করবি কল্যাণী? রমা জিজ্ঞাসা করিল।

কল্যাণী আঙুলে আঁচল জড়াইতে জড়াইতে বলিল—আজকে বিকেলে যে ও আসছে! তুমি দেখনা ওকে দিয়ে এই হাবাতের কি দুর্দ্দশা করাই।

বলা বাহুল্য যে, কল্যাণী তাহার ভাবী স্বামীর উল্লেখ করিল। সেদিন বৈকালে সে হাজারিবাগে পৌছিবে—এই মর্ম্মে কিছুক্ষণ আগে 'তার' আসিয়াছিল।"

গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিলাম—দুষ্টের দমন কারী অনাগত মহাপুরুষটীর নাম?

অশোক থতমত খাইয়া গেল; তারপর বলিল—ধর তার নাম—ধনঞ্জয়।

সহসা প্রেমতোষ-বাবু আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন—আমি যাই; আমার একটু জরুরী কাজ আছে!

তাঁহার এই পলায়নোদ্যোগ আমরা পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করিয়াছিলাম; সুতরাং তিনজনে তাঁহাকে ঘেরিয়া ধরিয়া, "তা কি হয়"; "সভার শেষ পর্য্যন্ত আপনাকে থাকতেই হবে;" "আপনি হলেন সভাপতি" ইত্যাকার অনুরোধ-উপরোধের দ্বারা পুনরায় তাঁহাকে নিজস্থানে উপবেশন করিতে বাধ্য করিলাম; তিনি হতাশ হইয়া বিমর্ষ বদনে আসন গ্রহণ করিলেন।

অশোক পড়িতে লাগিল—

"সন্ধ্যার পূর্ব্বে ধনঞ্জয় আসিল। কল্যাণী

উজ্জ্বল মুখে তাহার আহারাদির আয়োজন করিতে লাগিল। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ধনঞ্জয়কে নিভৃতে ডাকিয়া কল্যাণী প্রাতঃকালের ঘটনা তাহার কাছে খুলিয়া বলিল; কহিল—তোমাকে এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। বদমাইসটাকে বুঝিয়ে দাও যে—

ধনঞ্জয় চিরকালই একটু দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক। উল্লসিত হইয়া বলিল—এর আর কথা কি! বক্সিংটাত প্রায় ভুলেই গিছলাম; রাস্কেলটা যদি রাত্রে আসে, তা হ'লে শেখা বিদ্যেটা একবার ঝালিয়ে নিই।

কল্যাণী বলিল—খুব সম্ভব সে আসবে; কিন্তু দেখো, কোন রকম যেন গোলমাল না হয়।

ধনঞ্জয় বলিল—না, তা হবে না।

চার

কল্যাণীর কথা সত্য হইল। রাত্রি দ্বি-প্রহরের পূর্ব্বেই রসময় আসিল। তাহার ধারণা ছিল—এ সকল ব্যাপারে প্রথমে মেয়েরা যতই আপত্তি তুলুক, শেষ পর্য্যন্ত তাহারা হার মানিয়া পুরুষের ইচ্ছাকেই মাথা পাতিয়া লইবে। তাহার বিশ্বাস ছিল—রমা আসিবে।

ধনঞ্জয় প্রস্তুত হইয়াই ছিল। দক্ষিণের জানলা দিয়া লোকটীকে দেখিবামাত্র সে কল্যাণীর দেওয়া একখানা কস্তা-পাড় শাড়ী গায়ে জড়াইয়া অভি-সারে বাহির হইল।

পরের ব্যাপার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এক কথায়, এই কলিযুগেই আর একবার মহাভারতের সেই ভীম-কীচক পর্ব্ব পুনরাভিনীত হইয়া গেল। ধনঞ্জয়ের বজ্র মুষ্টির একটি-মাত্র অব্যর্থ সন্ধানেই প্রেম-বিহ্বল রসময় ছিন্নমূল তরুর অবস্থা প্রাপ্ত হইল; তাহার পর আরও দুই-চারবার ধনঞ্জয়ের প্রেম-স্পর্শ লাভ করিতেই রসময়ের চক্ষের সম্মুখে সংখ্যাতীত সরিষা-পুষ্প নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ঘাড় ধরিয়া গেটের বাহিরে আনিয়া ধনঞ্জয় রসময়কে বলিল—ফের যদি এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় কোনও দিন দেখতে পাই, তা' হ'লে বাপ-মায়ের দেওয়া পৈতৃক প্রাণটা এই খানেই রেখে যেতে হবে জেনো। রসময় ছিটকাইয়া পড়িয়া প্রাণ-পণে পলাইয়া গেল। খবর লইয়া জানা গিয়াছিল, তাহার পরদিনই সে হাজারিবাগ পরিত্যাগ করিয়াছিল।

পরদিন সকালে রমা ধনঞ্জয়কে পোলাও রাঁধিয়া খাওয়াইল। গল্পেরও শেষ হইল।"

গল্প শুনিয়া জ্যোতিশ হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। প্রেমতোষ-বাবু ফ্যাকাসে শীর্ণ মুখে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আমি অশোককে প্রশ্ন করিলাম—আচ্ছা, যখন ধনঞ্জয় রসময়কে ধনঞ্জয় দিচ্ছিল, তখন কি কেউ কারুর মুখ দেখতে পায় নি।

অশোক বলিল—মোটেই না। ধনঞ্জয় একটু-আধটু দেখতে পেলেও রসময়ের সে অবস্থা ছিল না।

বলিলাম—ভালই হয়েছিল তা' না হ'লে এতখানি রস উপভোগ করতে পারতাম না।

এমন সময় দ্বার ঠেলিয়া অশোকের স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করিল; পশ্চাতে তাহার খাবারের রেকাবি হাতে দুইজন চাকর। অশোকের স্ত্রী কল্যাণীর সহিত আমাদের পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল, সেই জন্য তাহার আগমনে আমরা কেহই বিস্মিত হইলাম না; কিন্তু দেখিলাম, প্রেমতোষ বাবুর দুই চক্ষু কপালে উঠিয়াছে!

অশোক হাসিয়া কহিল—দেখুন ত প্রেমতোষ বাবু, চিনতে পারেন কিনা; হাজারিবাগের জল হাওয়ায় তখনকার চেয়ে হয় ত এঁরা বদলে গেছেন অনেকখানি!

প্রেমতোষ-বাবু নীরবে বসিয়া ঘামিতে লাগিলেন। তাঁহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমরা অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম।





নিরামিষী-স্ত্রী

শ্রী নগেন্দ্ররঞ্জন ভট্টাচার্য্য

আমার নিরামিষী-স্ত্রী।

নারী সমুদ্র মন্থন করিয়া আমার এই অপূর্ব্ব-রত্ন আহরণ করিতে হয় নাই। যে বয়সের প্রতি ধাপটী পর্য্যন্ত বৈচিত্র্যেভরা, সেই বয়সেরই একটী বিচিত্র খেয়ালকে পূর্ণ করিতে গিয়া আজ বৈচিত্র্যহীন শেষজীবনে কেবলই বলিতে ইচ্ছা করিতেছে,—স্ত্রী ভাগ্যং।

সেদিনের কথা—

কলেজে পড়ি, আর মেসে থাকি। বাহির হইতে আমাদের মেসকে মেস বলিয়া চিনিবার উপায় ছিল না—এমনই দলছাড়া অন্ধকারে নির্ব্বাসিত। আলো-বাতাস যে আজও পৃথিবীতে আছে, তা' সেই মেসবাড়ীর গণ্ডী পার না হওয়া পর্য্যন্ত জানিবার উপায় ছিল না। মেস ছাড়িয়া দিবার সঙ্কল্প মনে মনে রোজই একবার করিয়া সকলেই করিত—কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। আমাদের ওই অন্ধকার নীড়টী আমাদেরই এক অপূর্ব্ব আবিষ্কার, অপরের কাছে বিনয় এই কথাটাই জোর দিয়া বলিত। কিন্তু মাঝে মাঝে ছুটীতে নিজেদের মনের জোরকে 'টে'কসই' করিতে, দেশ-বিদেশের আলোর সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িতে হইত। মতের অনৈক্য কোনদিন হয় নাই—হইতেও পারিত না; তাই ত আমরা অন্ধকারের জীব কয়টী একই সঙ্গে সেই আঁধার গৃহটীকে এতখানি ভালবাসিতে পারিয়াছিলাম!

সেই রকম এক কিসের ছুটীতে বিনয় শুধু জানাইয়া দিল—"সব প্রস্তুত হয়ে নাও, পুরী যেতে হবে।" একটা মুখের কথা—যেতে হবে উহার বেশী আমরা জানিতে চাইনাই কোনদিন—প্রয়োজনও হইত না। কিন্তু যে প্রয়োজন সত্যই ছিল না কোনদিন, আজ সংস্কার বিড়ম্বনার বোধ হয় আমাকেই তাহার প্রথম প্রতিবাদ করিতে হইল। বলিলাম—

"পুরী ত আমার যাওয়া চলবে না।"

বিনয় বলিল—"কেন?" "এ কেনর উত্তর আমি দিতে পারব না; কারণ, দেবার মত কিছু নাই। আমরা যাকে বলি কু-সংস্কার, এও অমনি একটা কিছু। পুরী যাওয়া আমাদের বংশে নিষেধ।" সকলে 'হো হো' করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর আমার গল্প বলিবার পালা আসিল।

আমাদের বাড়ীতে একটী গোবিন্দদেবের বিগ্রহ-মূর্ত্তি আছে। ইনি না কি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের। কি করিয়া আসিলেন, কেন আসিলেন, সে অনেক কথা। হয় ত ইহা সত্য হইতে পারে যে,—তিনি নিজের বিপদ বুঝিয়া আগে হইতে এমনি একটা বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন।

'পুরী যাওয়া নিষেধ' এই কথাটা জ্ঞান হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই এ বাড়ীর সকলে শিখিয়া রাখে। গোবিন্দদেবের নিষেধ না শুনিয়া কবে কে পথের মাঝে মারা গিয়াছিলেন, এই লইয়াই প্রাচীন ইতিহাস। এখন সে ইতিহাস নাই, হয় ত গোবিন্দদেবের স্বপ্নাদেশও একদিন লোপ পাইবে, কেবল "যেতে নাই" এই কথাটাই মাদুলীর মত সংস্কার হইয়া থাকিবে।

"কিন্তু বোধ হয় মানব মনেরও সংস্কার হবে ততদিন" বলিয়া বিনয় জোরে হাসিয়া উঠিল।

আমি ত সেই সংস্কারকেরই একজন—"

"পারছ না এও সেই সংস্কার দোষ।" কিন্তু

পারিতে আমার হইল। যাইবার বেলায় বারবার করিয়া এই কথাটাই মনে হইতেছিল যে —নূতন যুগ যখন আসে, তখন প্রতি ঘরেই বোধ হয় এমনি করিয়া এক একটি কালাপাহাড় জন্মগ্রহণ করে।

পুরী আসিয়াও আমার এই কালাপাহাড়ী মনটাকে স্থির করিয়া লইতে পারিলাম না ; আর এই জন্যই বোধ হয় শান্তিও পাইতেছিলাম না। বন্ধুরা ঘুরিয়া বেড়াইতেন,যেন এক একটি মুসাফির ! খাওয়াটা নেহাৎ দরকার, তাই এক একবার হোটেলে আসিতেন। আমি বাছিয়া লইয়াছিলাম, —সমুদ্রতীর। তাহারা বলিত—আমার মধ্যে না কি কবির অংশ আছে—সে সংবাদ সঠিক জানি না,—কিন্তু কী ভালই লাগিত আমার,সেই অসীম পারাবারের নৃত্য-দোদুল ছন্দ !

একদিন এমনি তন্ময় হইয়া বহুরূপীর আর একটা রূপের লীলা দেখিতেছিলাম—অস্তগামী সূর্য্যের সাগরজলে হোরী খেলা ! হঠাৎ নারী-কণ্ঠের সুমধুর ঝঙ্কার কাণে আসিল। চাহিয়া দেখি,—অপূর্ব্ব এক সুন্দরী জলদেবীর মতই সাগর সৈকত অতিক্রম করিতেছে ! তাহারই কণ্ঠের গান সাগর বক্ষে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে,—আর তরঙ্গের পর তরঙ্গ উদ্দাম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে ! আজিকার হোরী খেলা ঐ গান শুনিয়া বুঝি সার্থক হইল ! তখনও বাতাসে ভাসিতেছিল—"অরূপ তোমার রূপের লীলায়।" শুনিতে শুনিতে আমিও যে কখন কি ভাবে বালুচর পার হইয়া আসিয়াছি, তাহা আমি নিজেই জানি না। মেয়েটী একবার আমার দিকে চাহিল। সে চোখে বিস্ময় ছিল না, ভয় ছিল না,—বোধ হয় লজ্জাও ছিল না ! স্বচ্ছ, আয়ত-দৃষ্টি ! আমি পিয়াসীর মত তার রূপ তার ভঙ্গী, তার দৃষ্টি, তার মাধুর্য্য পান করিতে লাগিলাম ! লোকচক্ষে কদর্য্য হইলেও আমার সেই অপলক চোখে ছিল শুধু দৃষ্টির মাদকতা ! অদৃষ্ট বিষম !

তরুণী আমাদেরই হোটেলের সামনের একটা বাড়ীতে প্রবেশ করিল ; —আমি চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম।

সেই আমার প্রথম দেখা, এবং প্রথম দর্শনেই তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিলাম—এ কথা না বলিলেও এটুকু বলিব যে, আমার লোভী চোখ দুইটী প্রতিনিয়তই তাহাকে কামনা করিত। শেষে একদিন আমারও বন্ধুদের মত ঘরের বাস উঠিল। ঠিক পথচারীর মত না হইলেও হোটেলের সম্মুখের রাস্তাটী আমার পক্ষে লোভনীয় হইয়া পড়িল। প্রত্যহই তার সঙ্গে আমার দেখা হইত—তেমনই সুর-সঙ্গিনী—শুচিস্মিতা—অনবগুণ্ঠিতা !

আমাদের হোটেলে যে বৃদ্ধটী বেড়াইতে আসিতেন, শুনিলাম সে মেয়েটী তাঁহারই। আলাপও একদিন হইল। তাঁর সেই কথাটী আজও ভুলিতে পারি নাই—"আমি মানুষ দেখলেই ছুটে আসি।" মেয়ের কথা খুব অল্পই বলিতেন ; তবে বলাইতে জানিলে না বলিতেন এমন কথাও অল্পই ছিল। তাঁরই মুখে প্রথম শুনিলাম,—মেয়েটী কুমারী। তারপর একে একে অনেক কথাই শুনিলাম। কবে কোন্ রাজপুত্রের সহিত বিবাহের কথা হইয়াছিল, কেনই বা তাঁরা শেষে পিছাইয়া গেলেন,এই রকম অনেক কথা। মেয়েটী মাছ খায় না,—আতপ চাল খায়;—একমাত্র এই কারণেই সকলের পরিত্যক্তা হইয়া সতের বছর বয়সে আজও সে অবিবাহিতা। মনে হইল,—এ যেন সেই অতীতের আশ্রম বালিকা—বিধাতার ভুলে স্থান-ভ্রষ্টা ! আশ্রম-পালিতার মতই তার মুখে-চোখে চঞ্চলতা কোথাও এতটুকু সঙ্কোচ নাই—যৌবনোচিত গাম্ভীর্য্য নাই ! যেদিন ওদের বাড়ী গেলাম, সেদিন ঠিক ছোট্টটীর মত আমার পিঠের কাছটীতে আসিয়া বলিল—"আপনি হোটেলে খান্ কেন ? ওদের কি জাত আছে ?" তারপর কত কথা—হোটেলে ত পয়সা লাগে,—ভাত যাহারা বিক্রয় করে, তাহাদের ভাত খাইতে

নাই,—আমাদের বাড়ীতে খাইলেই ত হয়, ইত্যাদি।

"হ্যাঁ, কেন খান্ না, খুবই খাওয়া উচিত।" বলিয়াই বৃদ্ধ হাসিয়া উঠিলেন।

"বা রে! এ বুঝি হাসবার কথা হ'লো—হোটেলে খেলে জাত যাবে যে!" এক শিশু-সরল যুবতীর শিশু-যুক্তির পাশে দাঁড়াইয়া সত্যই সেদিন আমাকে হার মানিতে হইল। বলিলাম—

"তা যায় বটে, কিন্তু কি খেতে পাব এখানে?"

"কেন, গোবিন্দদেবের প্রসাদ।"

গোবিন্দদেব! আমার কালাপাহাড়ী মনটা একবার কাঁপিয়া উঠিল। বৃদ্ধ বলিলেন—"সত্যি আপনি কি মাছ না হ'লে খেতে পারবেন?" সত্য গোপন করিয়া বলিলাম—"আমিও মাছ খাই নে—আমাদের বাড়ীতেও এমনি এক গোবিন্দদেব আছেন।" মেয়েটীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—যেন এই উত্তরটুকুর উপর তাহার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছিল। তারপর একে একে গোবিন্দদেবের সমস্ত ইতিহাসটুকু সংগ্রহ করিয়া লইয়া বৃদ্ধ লাফাইয়া উঠিয়া আমাকে বুকে টানিয়া লইয়া কহিলেন—"এতদিনে পেয়েছি! ও রে রাধা! তুই সত্যিই বলেছিস্, হোটেলে খেলে এর জাত যাবে!"

বিবাহ হইল। বাবা বলিলেন—হিন্দুঘরের কুললক্ষ্মী! আর আমি বলিতাম—স্বর্গের পরিজাত! এইবার "আমার কথাটী ফুরলো" বলিতে পারিলেই বাঁচিতাম, কিন্তু গল্প যে এখনও আরম্ভই হয় নাই। যার শেষ এই খানেই হওয়া উচিত,—আমার যে সেই খানেই সুরু!

এদিনের কথা।

বাবাও নাই, মাও নাই। দেশের বাস ছাড়িতে হইয়াছে নইলে চাকরী ছাড়িতে হয়। কলিকাতাতেই আছি। ছোট্ট সংসার। সংসার আর কি—দু'টী প্রাণী—আমি আর আমার স্ত্রী। শুনিতে দু'টী প্রাণী, কিন্তু আমার থাকা-না-থাকার সহিত সংসারের কোন যোগ ছিল না। অনিচ্ছা থাকিলেও বাধ্য হইয়া বেশী সময় বাহিরে-বাহিরেই কাটাইতে হইত।

স্ত্রী বলিলেন—"হ্যাঁ গা! আর কি কোথাও চাকরী পাওয়া যায় না?" বলিলাম—"কোথাও মানে কি,—পুরীতে?" স্ত্রী ছোট্ট করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ!" আমি বলিলাম—"সেখানে ভিখ মেলে—চাকরী মেলে না।" "তাই বলে এই সাহেবের দেশে থাকতে হবে?" কথাটা এতক্ষণে পরিষ্কার হইল, বলিলাম—"তাই চল নবদ্বীপ কিম্বা বৃন্দাবনে। আমি মন্দিরা বাজাব, তুমি গাইবে।

এই হইল কলিকাতায় নীড় বাঁধিবার সময় প্রথম মতান্তর।

এতদিন ছোট্ট বধূরূপেই দেখিয়া আসিয়াছি। আজ তাহাকে গৃহিণীর আসনে বসাইয়া প্রথম দেখিলাম,—তারও একটা স্বতন্ত্র মত আছে এবং তা' আমার সম্পূর্ণ বিপরীত! এই বিপরীত মতটাকে আমাদের সংসারে চলন করিয়া লইতে যে ভাবে তিনি গৃহ-দুর্গ-রচনা করিলেন,—তাহাতে অন্যের ত বটেই—আমার প্রবেশও বড় সুগম ছিল না। তাই অনিচ্ছা থাকিলেও বাধ্য হইয়া বেশী সময় বাহিরে কাটাইতে হইত। পবিত্র ব্রাহ্মণ ঘরের কন্যা ও বধূ—সুতরাং গর্ব্ব ছিল সুপ্রচুর। ধরণীর ধূলিও তাঁকে স্পর্শ করিবার অধিকারী নয়—এমনই ছিল তাঁর নিষ্ঠা। শিষ্য যেমন গুরুর কাছে পাঠ লয়,—আমাকেও তেমনি সকালে সন্ধ্যায় স্ত্রীর কাছে পাঠ লইতে হইত—"এই করো না—ও'টা কর।"

বাইরের কোন বাতাসই এই দুর্গে প্রবেশাধিকার পাইত না। এই ছোঁয়াচ বাঁচাইতে প্রয়োজন হইলে জানালার গরাদ হইতে কড়ি-বরগা পর্য্যন্ত তিনি জল কাচা করিতেন। সুতরাং আর কিছু না হউক, সংসারে জলের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী হইয়া পড়িল। কলের জলে আপত্তি ছিল, গঙ্গা জল আসিল। কিন্তু এই জল কাচা করিয়া ঘরে তুলিবার আয়োজন যেদিন আমার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হইল, সেদিন 'কা তব

কাজা' বলিয়া হিমালয়ের পথে পা বাড়াইতে গিয়াই দেখি,—গৃহিণী আমার জামার খুঁট ধরিয়া দাঁড়াইয়া !......

বাইরের ঘরখানি আমার কাপড় ছাড়িবার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই ঘরে কাপড় ছাড়িয়া গঙ্গাজল স্পর্শান্তে আমাকে অন্দর মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইত। বিদ্রোহী মন বলিত —'অত্যাচার!' গৃহিনী বলিতেন 'চলবে না ওসব অনাচার!'

জানি ওসব চলিবে না, নহিলে আমিই বা এত শীঘ্র আমার নূতন সংসারে অচল হইয়া পড়িলাম কেন? অথচ সেদিনকার ঋষিকুমারীর কোন পরিবর্তনই ত হয় নাই! কথা তা নয়, সেই কল্পনা-রাণীকে আজ ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিয়া ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছি। ঘরকে সে সহিবে না,—ঘর তাকে সহিবে কেন? এদের লইয়া স্বপ্ন-রচনা চলে — নীড়-রচনা চলে না। আমি সেই স্বপ্নকে বাস্তব করিতে গিয়া আজ দেখিতেছি, এতদিন পরে আমার জীবনের শূন্যতাই কেবল বিস্তৃত করিয়াছি।

আমার ছিল বাতের ব্যারাম। এই পোষা রোগের উৎপাত ছিল অনেক; সে যখন আসিত, তখন সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়াই আসিত এবং অচিরেই আমাকে শয্যাশায়ী হইতে হইত। স্ত্রী তদারক করিতেন, কিন্তু আমার রুগ্ন মন কেবলই কাঁদিয়া উঠিত। মন যে চায়, যাহার হাতে হিমানীর পরশ, যাহার কণ্ঠে সুধা-নির্ঝর,—এমনই কেহ আমার পাশে আসিয়া বসুক! শূন্য শয্যা কেবল ব্যথার ভারে ভারী হইয়া উঠিত! হয় ত তার কাজ অনেক—রোগী লইয়া কেবল 'হায়-হায়' করাটা তার বড় কাজ নয়। কিম্বা,—এই 'কিম্বাটা' ধরা পড়িল সেদিন,—যেদিন তার হাত হইতে জোর করিয়া পানটা মুখে পুরিয়া দিয়াছিলাম। অবেলায় স্নান করিয়া যখন সে আমার ঘরের পাশ দিয়া চলিয়া গেল,—তখন তার সিক্ত বসনের জলের ছিটা বুঝি আমার মুখের উপর কালি ছিটাইয়া গেল।

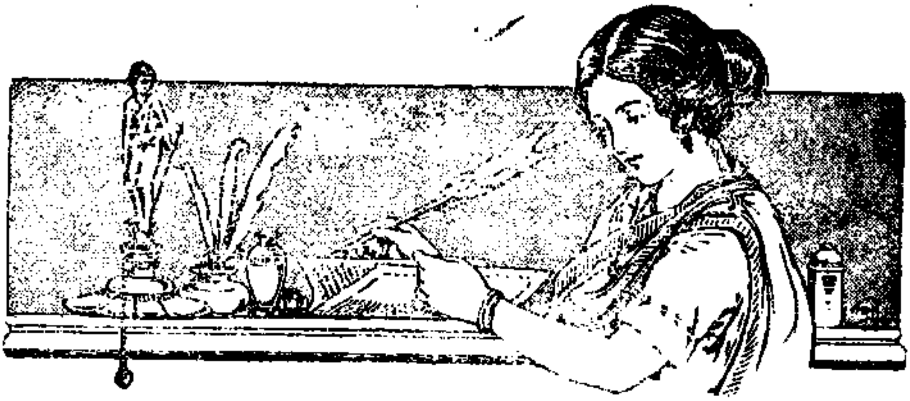
তার কোমল হাতের সেবা কোনদিনই আমি পাই নাই। তাহার চোখ ভরিয়া জল আসিত। জানি,—তার ঐ ব্যথাটাই সব চেয়ে বড়; তার ইচ্ছাকে পর্য্যন্ত নিঃশেষে নিষ্ঠার পায়ে নিবেদন করিয়া আজ যেন সে দেউলিয়া! তাই দুঃখ করিয়া যখন তখনই বলিত—"আমি তোমার কোন কাজেই এলাম না।"

শেষে ঐ ছুঁৎ আর খুঁৎ তাহাকে ভয়ানক-রূপে পাইয়া বসিল। গোবর জলে পাকা আঙিনার পরিচয় চিহ্নটুকু যেদিন লোপ পাইল, সেদিন বাড়ীওয়ালী আসিয়া বলিল "তোমাদের এ বাড়ী ছাড়তে হবে বাছা! তোমাদের জন্যে ওই খোলার বস্তি আছে।" বলিলাম—'আর কেন, যা বয় সয় তাই কর। পেটেও ত আমাদের শুধু জলই যাচ্ছে, গোবরজলও ত নয় কিছু! দেহটাকে যখন মেনে নিতে পারছ,—তখন ইট কাঠের বাড়ীটাই বা কি অপরাধ করলে?" গোবরজল বন্ধ হইল বটে, কিন্তু বাড়ীর জল আর শুকাইল না।

জলে জলে পাথরেও শ্যাওলা পড়ে। রক্ত-মাংসের দেহ ত! আমার সেই পারিজাত রাণীর কোমল আঙুলের হিঙ্গুল আভা বুঝি ঐ জলেই ধৌত হইয়া গেল। এখন হাজা হাতের ছোঁয়া রান্না মুখেও রোচে না, অথচ না খাইলেও নয়।

স্রষ্টার ভুলে সৃষ্টির অপমান এমনি করিয়াই হয়। বিধাতা তাঁহার পাত্র উজাড় করিয়াই দিয়াছিলেন—কিন্তু দান করিয়াছিলেন অপাত্রে। রাগও হইত, দুঃখও হইত! চোখের সম্মুখে সৌন্দর্য্যের এই নিষ্ঠুর আত্মহত্যা, এ যেন আর সহিতে পারিতেছিলাম না! ইচ্ছা হইত,—ঐ রূপ-টুকু ধরিয়া রাখিতে কোন জলহীন মরুদেশে আমার রাণীকে লইয়া পলায়ন করি।

আমার,—সে যে আমারই নয়! ছোটবেলায় যখন পাইলাম, তখনও দেখিয়াছি সে আমার নয়, —এখনও দেখিতেছি আমার নয়,—কিন্তু তবু সে আমারই স্ত্রী!



শশিশেখর

শ্রী গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

১

বৈশাখমাস—বেলা প্রায় পাঁচটা। সুদীর্ঘ দিবানিদ্রা সমাপনান্তে বৈঠকখানা গৃহে বসিয়া অমরনাথ বেশ আরামে তামাকু সেবন করিতেছিলেন। রাশি রাশি ধূম তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইয়া গৃহখানিকে ধূমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছিল। সহসা শশিশেখর সেখানে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—কি করছ হে অমর?

শশিশেখরকে দেখিয়াই অমরনাথ বলিলেন—কে শশি?—এস, বসো। হঠাৎ এ সময় কি মনে করে?

এলাম একটা কাজে—বলিয়া শশিশেখর নিকটবর্ত্তী একটা চৌকীর উপর উপবেশন করিলেন। অমরনাথ তাহার হস্তে হুঁকাটী দিয়া বলিলেন—কাজটা কি হে?

হুঁকায় দুই-একটা টান দিয়া শশিশেখর বলিলেন—বলছিলুম কি, কথাবার্ত্তা যখন স্থির হয়েই আছে,—তখন আর দেরী কেন? শুভ কাজ যত শীগ্‌গির হয়, ততই ভাল। মেয়েটাও খুব বেড়ে উঠেছে—

অমরনাথ কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না; বরং যথাসম্ভব গম্ভীরভাব ধারণ করিলেন। শশিশেখর বেশ একটু বিস্মিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে কি একটা চিন্তা তাঁর হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ পরে অমরনাথ বলিলেন—তাই ত হে শশি! কথাটা তোমায় দিয়েছি বটে, কিন্তু এখন দেখছি রাখতে পারবো না।

শশিশেখরের শিরে সহসা যেন বজ্র খসিয়া পড়িল! কিছুক্ষণ স্তম্ভিতভাবে থাকিয়া তিনি চঞ্চলকণ্ঠে বলিলেন—বল কি অমর?—রহস্য করছ না ত?

অমরনাথ কহিলেন—এমন বিষয় নিয়ে রহস্য করা চলে না। কিরণ আই-এ পরীক্ষা দিয়ে এসেছে। পাশ সে করবেই; খবর বেরুলেই তাকে বি-এ ক্লাসে ভর্ত্তি করতে হবে। কিন্তু ওকে পড়ানো আর আমার অবস্থায় কুলিয়ে উঠবে না। ফরিদপুরের হেমন্ত চাটুয্যে খুব ধ'রেছেন। তিনি কিরণের এম-এ পর্য্যন্ত পড়ার সমস্ত খরচই দিতে রাজী। সবদিক ভেবে চিন্তে আমিও হেমন্তবাবুকে পাকা কথা দিয়েছি। বুঝেই দেখ না ভাই, ছেলের বিয়ে দিলেই শুধু হবে না, তাকে শিক্ষিত করাও ত চাই। যা' হোক্—তুমি অন্যত্র চেষ্টা দেখ।

অন্যত্র চেষ্টা দেখিবার যুক্তি অমরনাথ বেশ পরিষ্কারভাবে প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু সে

বুঝিতে শশিশেখর যেন চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। হায়, তিনি যে বড় আশা করিয়াই এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলেন! তাঁহার আশামূলে এ ভাবে কুঠারাঘাত হইবে, ইহা যে স্বপ্নেরও অগোচর! অবস্থা নিতান্ত অসচ্ছল—কন্যা অরক্ষণীয়া, সহসা পাত্র জোটানোও মুস্কিল! এ ক্ষেত্রে তিনি করেন কি? অনেকক্ষণ মূঢ়ের মত বসিয়া থাকিয়া কাতর-কণ্ঠে বলিলেন—কিন্তু অমর, এতে আমি যে বড়ই বিপদে পড়লুম ভাই! আমার অবস্থার কথা ত তুমি সবই জান? হঠাৎ এমনভাবে জবাব দিলে আমি দাঁড়াই কোথা?

কিন্তু আমার কথাটাও ত ভাবা দরকার; কিরণের মঙ্গলামঙ্গল তোমার ও ত দেখা উচিত? তা বটে! বলিয়া এ৲টা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শশিশেখর সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

২

অর্থ বল থাকিলে দেশে অবশ্য পাত্রের অভাব হয় না। কিন্তু যাহার অর্থ নাই, তাহার পক্ষে একটী পাত্র যোগাড় করা যে কিরূপ দুরূহ, তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলে। যাই হোক, শশিশেখরের প্রাণপাত অনুসন্ধানে একটী পাত্র মিলিল; অবস্থার না হইলেও চরিত্রগুণে উন্নত ছিল, এবং কিছু লেখাপড়াও শিখিয়াছিল। বাড়ীতে তাহার বিধবা মাতা এবং দুইটী কনিষ্ঠভ্রাতা ছাড়া আর কেহ ছিল না। তবে এ পাত্রটীও যে নেহাত সস্তায় জুটিল, তাহা নহে; ইহাকেও জামাতা-রূপে লাভ করিতে শশিশেখরকে অন্ততঃ সাত-আটশত টাকা ব্যয় করিতে হইবে।

যাক্—পাত্র ত মিলিল; এখন কন্যা পাত্রস্থ হয় কিরূপে? টাকা কোথায়? আসলেই যে ফাঁক্! সাত আট শত টাকা যোগাড় করাই যে দরিদ্র শশিশেখরের পক্ষে বামনের চন্দ্রলাভের মতই অসম্ভব!

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া শশিশেখর পত্নীকে কহিলেন,—তা' হ'লে কি করি বল দেখি? টাকা যোগাড় করি কোত্থেকে? গাঁয়ে যে কেউ ধার দেবে, এমন আশাও নাই। অনেক ক'রে সাত-আটশ টাকার মধ্যে এ পাত্রটী পাওয়া গেছে—এটী হাত ছাড়া হ'য়ে গেলে মুস্কিলে প'ড়তে হবে!

স্বামীর কথার উত্তরে চিন্তা-মলিন মুখে প্রভা-ময়ী বলিলেন—তাই ত ভাবছি; কিন্তু কোন উপায়ই দেখতে পাচ্ছি না। আমার গায়ে যে দু'একখানা অলঙ্কার আছে, তা' বেচলে বড়জোর শতখানেক টাকা হ'তে পারে। কিন্তু তা'তে হবে কি? সাত-আটশ টাকার ব্যাপার! তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর শশিশেখর পুনরায় বলিলেন—একটা মাত্র উপায় আছে প্রভা! শেষ পর্য্যন্ত তাই ক'রতে হবে দেখছি। নচেৎ কন্যাদায় হ'তে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব।

প্রভাময়ী বলিলেন—উপায়টা কি?

দুর্গাপুরের সুরেশবাবুর কাছে টাকা নেওয়া।

তিনি ত জমি-যায়গা বাঁধা না রেখে টাকা দেবেন না?

শশিশেখর বলিলেন—তা ত দেবেনই না। কিন্তু উপায় কি? টাকা ত চাই?

চিন্তিতভাবে প্রভাময়ী বলিলেন—ঐ ত ক'বিঘে জমি, তাও যদি আবার বাঁধা রাখবে, তা'হলে সংসার চ'লবে কি করে?

শশিশেখর কহিলেন—সে ভেবে আর ফল কি? পেটে না খেয়ে মরে যাওয়া চলে, কিন্তু মেয়ের বিয়ে না দিয়ে সমাজে বাস করা চলে না। গাঁয়ের সমাজ কেমন নির্ম্মম,—জান ত?

সমাজের নামে প্রভাময়ীর বুকখানা কাঁপিয়া

উঠিল! বয়স্থা অবিবাহিতা কন্যার পিতাদিগকে তাঁহারা যেন পায়ের জুতা অপেক্ষাও হীন মনে করেন। এরূপ ক্ষেত্রে সুধীরাকে আর বেশীদিন অবিবাহিতা রাখিলে, তাঁহাদের উপর যে কিরূপ দারুণ নির্য্যাতন চলিবে, ইহা প্রভাময়ী কল্পনা-চক্ষে যেন স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন। শঙ্কিতকণ্ঠে বলিলেন—তবে আর কি বলবো? যা হয় কর। তারপর ভগবান জোটান, খাব, না হয় উপোস দেব। কি কুক্ষণেই না মেয়ে.........

সে কথার উত্তরে শশিশেখর কিছুই বলিলেন না; চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

৩

অনেক কাকুতি-মিনতির পর সুরেশবাবু শশিশেখরের যথাসর্ব্বস্ব সাত বিঘা নিকর জমি বাঁধা রাখিয়া সাতশত টাকা ঋণ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। গরজ বড় বালাই! শশিশেখর সম্মত হইলেন। তিন-চারিদিনের মধ্যেই পাত্রের মাতুল আসিয়া সুধীরাকে দেখিয়া গেলেন. রূপের কমনীয়তায় এবং অন্যান্য বিষয়ে সুধীরা তাঁহার বেশ মনোমত হওয়ায় তিনি সমস্ত পাকা-পাকি করিয়া একেবারে বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির করিয়া গেলেন।

দিনকয়েক পরের কথা। রাত্রি প্রায় নয়টা। পল্লীর বুকে অন্ধকার বেশ জমাট হইয়া আসিয়াছে। শশিশেখর জমি বাঁধা রাখিয়া সুরেশবাবুর নিকট হইতে টাকা লইয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। সঙ্গে তাঁহার কেহ ছিল না। এত রাত্রে একাকী টাকা লইয়া আসিবার কারণ,—স্থানীয় সহরের রেজিষ্ট্রেশন অফিসে ঋণ গ্রহণের দলীল রেজেষ্ট্রী করিতে গিয়া কোন কারণে তিনি দিবাভাগে বাড়ী ফিরিবার ট্রেণ পান নাই।

হঠাৎ শশিশেখর দেখিলেন, অমরনাথ লণ্ঠন হস্তে অতি ব্যস্তভাবে কোথায় যাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই শশিশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন —কি হে অমর, অত ব্যস্ত কেন, যাচ্ছ কোথায়?

অমরনাথের মুখে-চোখে তখন উদ্বিগ্নতা ও ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। জিজ্ঞাসিত হইয়াই তিনি ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন—কে শশি? আর দেখছ কি ভাই, পড়েছি মহা বিপদে! জান ত আজ উমার বিয়ে। পাত্র পক্ষের কথা ছিল, অলঙ্কার দিতে হবে না; তাঁরাই দেবেন। তার দরুণ আমাকে নগদ দেড় হাজার টাকা ধরে দিলেই চলবে। আজ এক হাজার টাকা দিয়ে অনেক কাকুতি-মিনতি করেছি, কিন্তু বরকর্ত্তা কিছুতেই তাতে রাজী নন; বর নিয়ে চলে যেতে চান। অনেক কষ্টে তাদের থামিয়ে টাকার চেষ্টায় বেরিয়েছি ভাই;কিন্তু কারও কাছেই পাচ্ছি না। তা' ছাড়া, কারই বা গরজ পড়েছে বল। এক-আধ টাকা ত নয়, একেবারে পাঁচ-পাঁচশ-টাকা আমায় বার করে দেবে। ওঃ, আমার জাত-কুল সব গেল!

শশিশেখর মাটীর দিকে চাহিয়া, কিছুক্ষণের জন্য কি যেন চিন্তা করিলেন। পরে সহসা পকেট হইতে একশত টাকার পাঁচখানি নোট বাহির করিয়া অমরনাথের হাতে দিয়া বলিলেন— —নিয়ে যাও অমর! কাজ চালাও গে। বাস্তবিক এমন বিপদ মানুষের আসে না।

মুহূর্ত্তে অমরনাথের বাহ্যজ্ঞান যেন তিরোহিত হইয়া গেল। তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন জাগ্রত অবস্থাতেই স্বপ্ন দেখিতেছেন! কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি বলিলেন—শশি, শশি, আমায় আজ খুব বাঁচালে তুমি! আমার জাত-কুল সব রক্ষা পেলে। তোমার এ উপকার আমি জীবনে ভুলবো না। কিন্তু, কিন্তু, এ টাকা তুমি কেমন করে যোগাড় করলে ভাই?

শশিশেখর বলিলেন সে সব পরে শুনো। এখন আগে কাজ শেষ করে ফেল গে। বলিয়া শশিশেখর একপ্রকার জোর করিয়াই তাহাকে

বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া অন্ধকার পথে অগ্রসর হইল। অমরনাথ যেন স্বপ্নঘোরেই পথ চলিতে লাগিলেন।

৪

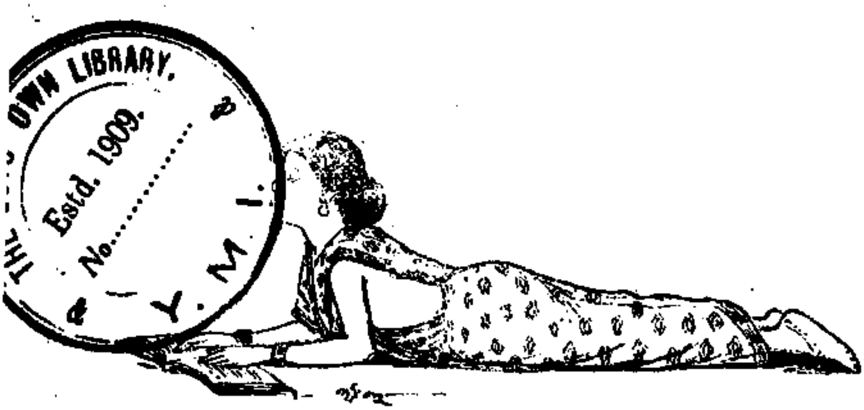
চার-পাঁচদিন পরের কথা। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গৃহ-বারান্দায় একখানি কম্বলাসনে উপবিষ্ট শশিশেখর কি একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন।

সহসা বাহিরের দরজায় ধ্বনিত হইল—শশি, ও শশি! ঘরে আছ? ডাক শুনিয়া শশিশেখর গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অমরনাথকে দেখিয়া কহিলেন—কে অমর? তা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? এস, ভেতরে এস।

অমরনাথ হঠাৎ তাঁহার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—টাকার কথা আমি সব শুনেছি ভাই; আর বুঝেছি, তোমার আর আমার মধ্যে তফাৎ কতখানি! তোমার সঙ্গে আমি যে অন্যায় ব্যবহার করেছি, তার জন্যে আমায় ক্ষমা কর ভাই! সুধীরাকে আমায় দাও, আমি তাকে পুত্রবধূ করে ধন্য হই।

শশিশেখর গম্ভীর মুখে বলিলেন—তোমার ছেলের হাতে মেয়ে দেওয়া সৌভাগ্যের কথা; কিন্তু ভাই, আমি যে কথা দিয়েছি; না, না, আমি তা ভাঙতে পারবো না।

অমরনাথ আর কিছু বলিতে পারিলেন না; অবাক্ বিস্ময়ে শশিশেখরের প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া বুঝি কয়দিন পূর্ব্বেরই মত আবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।





নাগা ডাক্তার

শ্রী সত্যেন্দ্রকুমার বসু বি-এ সাহিত্য-রত্ন

(১)

পত্রের শিরোণামা দেখিয়া আমি বিস্ময়ে খাটিয়ার উপরে উঠিয়া বসিলাম—এও কি সম্ভব? অনিল? অনিল চিঠি লিখিতেছে আমায় এই আসামের কালা জঙ্গলে? এতকাল পরে?

পত্রখানা এই :—

"ভাই প্রভাস,

খুবই আশ্চর্য্য হচ্ছিস, না? সেই ছেলেবেলায় একসঙ্গে স্কুলে পড়া—তারপর এনট্রান্সের পর থেকেই ছাড়াছাড়ি। সে আজ সাত বছরের কথা। তুই যে আসাম-বেঙ্গল লাইনে কন্ট্রাক্‌টারের চাকরী কচ্ছিস, তা' তোর বাড়ীতেই জেনে নিইছি। ভাবছিস, এদ্দিন খোঁজ নিই নি কেন? তার কারণ হচ্ছে, এ মুল্লুকেই ছিলুম না। জানিস ত, যেবার আমরা এনট্রান্স দিই, সেবার আমার নিউমোনিয়া হয়েছিল। সেই যে বাবা আমায় নিয়ে পশ্চিমে বেরুলেন, আর ৫।৬ বচ্ছর দেশে ফেরেন নি—কোন্ দিগ্‌গজ ডাক্তার নাকি তাঁকে বলে দিয়েছিল, আমার টিউবারকিউলোসিসের সম্ভাবনা আছে! যাক্, তারপর দেশে যখন ফিরে এলুম, তখন শুনলুম, তোর দাদা নাকি তোকে আলাদা করে দিয়েছে, তোদের বাড়ী ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছে · তুই বিদেশে চাকরী করতে গিয়েছিস। এদ্দিন তোকে পশ্চিম থেকে কত চিঠিই লিখিছি, তার একখানারও জবাব পাই নি, তাই ভেবেছিলুম, ভুলে গিয়েছিস, আর তাই চিঠি লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলুম।

এখন আসল কথাটা বলি শোন্। আমি আর কারু গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাই নি। তাই একটা কাজের সন্ধানে তোদের ওখানে যাচ্ছি। দিদিমার যৎসামান্ত যা'কিছু পেয়েছিলুম, তাই ভাঙ্গিয়ে পুঁজিপাটা করেছি, বাবার পয়সা ছোঁব না। হয় এই সপ্তাহের মধ্যে, না হয় নিশ্চিত আসছে সপ্তাহে, যখন হোক্, এক সময়ে হুপ করে পড়বো তোর ঘাড়ে—নোটিশ দিয়ে রাখছি

কিন্তু। আমার ভালবাসা জানিস। তোর ষ্টেশনটা লামডিং ত? ইতি,

তোরই একান্ত অভিন্ন অনিল।"

লক্ষীর বরপুত্রের মুড়ি খাইতে সাধ! মনোহরপুরের বিখ্যাত ধনী জয়নারায়ণ ঘোষকে ভবানীপুর কালীঘাট অঞ্চলে কে না চেনে? চারিদিকে খোড়ো ঘর আর পুকুর ডোবার মধ্যে ঘোষেদের প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকা তখনকার কালে একটা দ্রষ্টব্য পদার্থ ছিল। গাড়ী ঘুড়ী, লোকলস্কর, আত্মীয়-কুটুম্ব, দোল-দুর্গোৎসব,—বাড়ীটা সর্ব্বদা যেন জমজম করিত—পাড়ার ছেলেপুলে ঐ বাড়ীতে কত যাত্রা থিয়েটারই না শুনিয়াছে! বৎসরের মধ্যে কদিনন ঐ বাড়ীতেই পাড়াশুদ্ধ লোক লুচি মোণ্ডার নিমন্ত্রণ পাইত। আর আজ সেই অগাধ বিষয় সম্পত্তির মালিক জয়নারায়ণ ঘোষের একমাত্র সন্তান অনিলবরণ কি না আসিতেছে, আসামের কালা জঙ্গলে চাকুরী করিতে? এ একটা মস্ত তামাসা না ত কি? আপন মনে খুব খানিকটা হাসিলাম।

ছেলেবেলা যখন আমরা স্কুলের পোড়ুয়া ছিলাম, তখন হইতেই অনিলটা ঐ রকম খেয়ালী ছিল। বাপমায়ের আদুরে সন্তান—আলালের ঘরের দুলাল—যখন তখন তাহার আবদার ছিল বেয়াড়া রকমের। এও বোধহয় একটা খেয়াল। বিষম চিন্তায় পড়িলাম। কন্‌ষ্ট্রাক্‌সান্‌ লাইনে কাজ করিয়া ঘুণ হইয়া গিয়াছি—আমাদের এই লাইনে চাকুরী করিয়া কষ্ট বিপদ ও অসুবিধার মধ্যে বাস করা গা-সহা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অনিল? আমাদের কোয়ার্টার্স বলিতে যাহা, তাহার মধ্যে বাস করিবে অনিল? মনে মনে হাসিয়া উঠিলাম। মাঠের ঘাস চাঁচিয়া তাহারই উপর দরমার বেড়া দিয়া খড়ের ছাউনি এক একখানা ঘর। রসুইয়ের ঘর বা শৌচের ঘর তাহা হইতে আরও চমৎকার!—দরমার দরজার আগড় ঠেলিয়া মাথা নীচু করিয়া ঘরে ঢুকিতে হয়। আমি একাধিক দিন আমার খাটিয়ার শুইয়া দেখিয়াছি, আড়ার উপর গোখুরা সাপ ঝুলিতেছে—তাহার চক্ষু দুইটা আমার মশারীর দিকে চাহিয়া অনগ্রল করিয়া জ্বলিতেছে, আর তাহার ফোঁস ফোঁস শব্দে আমার বুকের রক্ত জল হইয়া গিয়াছে! দুই একদিন মাথা হেঁট করিয়া শৌচাগারে প্রবেশ করিবার সময়ে দরজার চৌকাঠের উপরে লম্বালম্বিভাবে এই মহাপ্রভুদিগের দুই একটি জ্ঞাতিকুটুম্বকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়াছি। আর চালডালের হাঁড়ীর পার্শ্বে কুণ্ডলী পাকাইয়া কত সর্পকে যে আরামে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি, তাহার কথা আর কি বলিব! বিশেষতঃ কাছেই পাহাড়ের জঙ্গলে নাই এমন হিংস্র জন্তু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শুনিয়াছি, বন্য হস্তীর যূথ মাঝে মাঝে গ্রামজনপদ দলিত মথিত করিয়া চলিয়া যায়। আমি অবশ্য কখনও হাতীর পাল্লায় পড়ি নাই, তবে পড়িতে কতক্ষণ?

এই খাঁচার মত ঘরে তাহাকে বসিতে শুইতে দিব কোথায়? ধনীর সন্তান সে, সে ত জানে না, কত অসুবিধায় পড়িতে হইবে তাহাকে এই জঙ্গলে আসিতে হইলে! প্রথম কথা, সে হয় ত ভাবিতেছে, ষ্টীমার হইতে পদ্মার ঘাটে নামিয়াই বরাবর রেলে চাপিয়া লামডিং আসিবে! কিন্তু এখনও যে যাত্রী বা মালবহার জন্য—গাড়ীচলাচল আরম্ভ হয় নাই তাহা ত আর সে জানে না—সে জন্য ব্যালাষ্ট ট্রেণের গার্ড ড্রাইভারকে আবার কত খোসামোদ করিতে হইবে, তাহাও কি সে জানে!

ভাবনার কথা! কোথায় থাকিতে দিই তাহাকে? কোয়ার্টার্সের সব ঘরই ভর্ত্তি। কি করি?—হঠাৎ লাইনের ওপারে কুলী-লাইনের দিকে নাগা ডাক্তারের কথা মনে পড়িল। ডাক্তার ঘর ভাড়া দেব না?

তখনই লাইনের ওপারে চলিলাম। ওপারেই

বাজার হাট বলিতে যাহা কিছু। কন্‌ট্রাক্টার কুলীরা ঐ দিকেই বসবাস করে। বস্তির কিছু দূরে নাগা ডাক্তারের আস্তানা আর তাহারই পার্শ্বে সারি সারি কয়খানি ঘর। মনে নানা কথার তোলপাড় করিতে করিতে যখন তাহার আস্তানার সমীপবর্ত্তী হইলাম, তখন শুনিলাম একটু উচ্চস্বরে কে বলিতেছে, "আটটা টুকরো দুটো আলুর, তার দুটো দিয়েছিস দিদিকে, আমাকে দিয়েছিস দুটো, তুই নিয়েছিস একটা, তাহ'লে ত আরও তিনটে টুকরো থাকে—কি কল্লি সে টুকরো তিনটে ?"

এ ত নাগা ডাক্তারেরই গলা। সম্ভবতঃ সে সুয্যোকে এই সম্ভাষণ করিতেছিল ; সুয্যো তাহার পুত্র। কেবল পুত্র কেন, চাকর, রাঁধুনী, খানসামা, কম্পাউণ্ডার, বাজার সরকার,—যাহা বল তাই। সুয্যোকে তাহার পিতা ধরমবীর ডাক্তার তামাকের টিকলি ভাগ করিয়া দিত এবং কয় ছিলিম সাজিয়া দিল, টিকলির হিসাব লইয়া দেখিত, একথা আমি শুনিয়াছিলাম। আমি কদাচিৎ কুলী-লাইনের দিকে যাইতাম, সুতরাং ডাক্তারের কথা কাণেই শুনিতাম। বরং তাহাকে আর তাহার পুত্র সুয্যোকে কখনও কখনও আমাদের কোয়ার্টারের দিকে আসিতে দেখিয়াছি কিন্তু তাহার এক কন্যা ছিল বলিয়া শুনিলেও মাত্র দুই একবার দূর হইতে তাহাকে পালক ও কড়ির পোষাকে সাজিয়া তীর ধনু লইয়া জঙ্গলের দিকে শিকারে যাইতে দেখিয়াছি। তাহাদের সহিত আমার এইমাত্র সম্বন্ধ।

আজ হঠাৎ ডাক্তারের কথাগুলা অতর্কিতে শুনিয়া বিস্মিত হইলাম,—নাগা ডাক্তার এত চমৎকার বাঙ্গলা বলিতে পারে! শুনিয়াছিলাম, যে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাঙ্গালা বা আসমিয়া ভাষায় কথা কহিতে পারে, তাহার কারণ, সে বহুদিন তাহার পাহাড়ের বাসা ভাঙ্গিয়া সভ্যতার আস্তানায় আসিয়া বসবাস করিতেছে। সে নাকি নাগা পাহাড়ের মিশনারীদের কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিল, ছেলেমেয়েকেও শিখাইয়াছে। হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী কিছু কিছু শিখিয়াছে, লামডিংয়ে কনষ্ট্রাকসানের হেড আপিস বসার সঙ্গে সঙ্গে যখন হইতে বাজার গঞ্জ বসিয়াছে, তখন হইতেই সে এখানে আসিয়া ডাক্তারী ব্যবসায় খুলিয়াছে, এবং ক্রমে ক্রমে দুই একখানা বাড়ীঘর বানাইয়াছে। ঐ দেশীয় কন্‌ট্রাক্টার মহাজনদের এখানে কাজে আসিতে হয়, তাহাদিগকেই ডাক্তার মাঝে মাঝে বাড়ী ভাড়া দিয়া কিছু কিছু পায়। আমাদের রেলের ডাক্তারের নিকট উহার নাম করিলে তিনি ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চন করিতেন, বলিতেন 'কোয়াক' 'চিট', ইত্যাদি। কিন্তু বাজারের লোকের কাছে শুনিয়াছি, নাগা ডাক্তার চিকিৎসা করিত ভাল।

যাহাই হউক, তাহার নিকট চিকিৎসার আমার প্রয়োজন ছিল না, ছিল একখানা ভাল ঘরের। তাহার বাড়ীগুলি আমাদের 'কোয়ার্টারের' অপেক্ষা কিছু ভাল, তাহার তবু ভিত্তি আছে, সানের মেঝে আছে ; দেয়ালগুলো ছেঁচাবেড়ার হইলেও তাহাতে মাটী লেপা ও চুণকাম করা, ঘরের জানালা আছে। রসুই ও শৌচের ঘরও মানুষের ব্যবহারযোগ্য, আমাদের কোয়ার্টারের মত ছাগল গরুর খোঁয়াড় ঘর নহে তবে এক এক বাসা এক এক জনের বাসের যোগ্য।

আমি ডাক্তারকে ডাকিতে সুয্যো সাড়া দিল, বাহিরের ঘরে বসিতে দিল। সেটাকে বৈঠকখানাও বলা যায়, আবার ডিসপেন্‌সারীও বলা চলে। দুই তিনটা ভাঙ্গা জরাজীর্ণ গ্লাসকেসে কতকগুলা খালি শিশি, বাক্স, বোতল ও কেতাব সাজান মাত্র, দুইটা গ্লাসকেসের মধ্যের স্থানটা পর্দ্দা ঢাকা ; পর্দ্দার আড়ালে 'ডিসপেন্সিং রুম' ; ঘরে একখানা তিনটা কাঠের পায়া ও একটা

বাঁশের পায়ার উপর খাড়া করা টেবল, আর খান দুই ভাঙ্গা চেয়ার ও বেঞ্চ।

আমি আসন গ্রহণ করার পর ডাক্তার তথায় দেখা দিল। লোকটার বয়স হইয়াছে, অথচ মস্তকের কেশ ও গুম্ফশ্মশ্রু কিন্তু শুভ্র নহে, একবারে পিঙ্গলবর্ণ। মিশনারীদের স্কুলের ফেরত নাগারা যেরূপ প্যান্টকোট ও টুপী ব্যবহার করে ডাক্তারের তাহাই বেশ, অধিকন্তু চোখে একটা নীল চশমা। সে ঈষৎ খোঁড়াইয়া চলিত—এখনও ঈষৎ হেলিয়া দুলিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিল। আমার সহিত সে ভাঙ্গা বাঙ্গলাতেই কথা কহিল। আমি যখন প্রস্তাব করিলাম, আমার এক বাঙ্গালী বন্ধুর জন্য তাহার একখানা বাসা ভাড়া চাই, বাঙ্গালী বাবু কলিকাতা হইতে আসিতেছেন, তখন সে জোরে মাথা চালিয়া বলিল, "না, ভাড়া হবে না বাবু।"

এমন সুরে ডাক্তার কথাটা বলিল যে, আমি একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলাম, সে সুরে যেন আতঙ্ক ও ভয়টাই বেশী লক্ষ্য করিলাম। কেন?

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, আপত্তি আছে না কি কিছু?"

সে বলিল, "না, তা না, তবে এ সব বাসা দেশী লোকদের জন্যে হয়েছে আপনাদের বাঙ্গালী বাবুদের জন্যে নয়।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "সে ভয় নেই তোমার। সে আমার দোস্ত আছে ডাক্তার, বুঝেছো—তারও সাদি হয় নি। সে এ ঘরে দেশী লোকদের মত বেশ থাকতে পারবে।"

একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তার বলিল, "একলা থাকবে? তা ঐ পশ্চিমের ঘরটা—এটা হ'তে পারে—পাঁচ টাকা ভাড়া। তবে দু'চার দিন পরে।"

আমি জবাব দিতে যাইব, এমন সময়ে এক আশ্চর্য্য কাণ্ডে চমকিয়া নীরব হইলাম। ভিতরের দিক হইতে ঠিক যেন বীণার ঝঙ্কার দিয়া মধুর কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল,—"মেরেছি, বাবা, মেরেছি,—মস্তটা, ক'দিন পরে আজ আটার হাঁড়ীর পাশে—" ভাঙ্গা ভাঙ্গা আধা-অসমী আধা-বাঙ্গালা—বড় মিষ্ট, বড় শ্রুতিমধুর সেই ভাষা। সঙ্গে সঙ্গে বর্শার ফলকের অগ্রে বিদ্ধ নিহত প্রায় চারিহস্ত দীর্ঘ প্রকাণ্ড গোক্ষুরা সর্পকে ঝুলাইয়া লইয়া একটি তরুণী কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহার পশ্চাতে আকর্ণবিস্তৃত হাস্যে কুচের মত চক্ষু দুইটিকে একেবারে নাসিকার পার্শ্বস্থ বিবরে প্রবেশ করাইয়া দিয়া আসিতেছিল হুয়ো, ডাক্তারের নাগা পুত্র হুয়ো।

আমি সত্যই স্তম্ভিত হইলাম। প্রথম দর্শনেই সেই কড়ির আর পালকের সাজের মধ্যেও কি আমি অনবদ্যাঙ্গী বাঙ্গালী তরুণীর মূর্ত্তি দেখিলাম? তাহার নাগাকুকিদের মতই সাজসজ্জা, ভ্রমরকৃষ্ণ বেণীবদ্ধ ঘন কুঞ্চিত কেশরাশি দুইটি সর্পিনীর আকারে পৃষ্ঠে দোদুল্যমান, ললাটও নানা বর্ণে চিত্রিত, দন্তপাতি কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত; কিন্তু তাহা হইলেও দীর্ঘায়ত নীলোৎপল-দল তুল্য সেই নয়নের বিদ্যুৎদামদীপ্তি ত কোন নাগা কুকি তরুণীর নয়নে দেখি নাই! কৃশাঙ্গীর দেহের বর্ণ নাগা কুকিদেরই মত হরিদ্রা বটে, কিন্তু তথাপি তাহার মধ্য হইতে একটা গোলাপী আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, আর তাহার মৃণালপেলব দেহযষ্টির অঙ্গবিক্ষেপে লাবণ্য ঝরিয়া পড়িতেছিল, তাহা যেন আমার মনে হইল, কেবল বাঙ্গালী কিশোরীতেই সম্ভব হয়।

আমি বিহ্বলনেত্রে তাহার দিকে বদ্ধদৃষ্টি হইয়াছিলাম, হঠাৎ আমার উপর তরুণীর দৃষ্টি নিপতিত হইবামাত্র তাহার দৃষ্টি অসম্ভব কঠোরতা ধারণ করিল, তখন তাহার দৃষ্টিতে সত্যই আমি অসভ্য নাগা রমণীর নৃশংস চাহনি দেখিতে পাইলাম। বিরক্তিভরে আমার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলাম। সেদিন আর সেই বীভৎস দৃশ্যের

মধ্যে বসিয়া থাকিয়া ডাক্তারের সহিত পাকা কথা কিছু হইল না।

(৩)

অনিল আসিয়া বেশ স্বচ্ছন্দে আরামে জঙ্গলে আড্ডা গাড়িয়াছে, পাঁচ সাত দিনের মধ্যে স্থানের প্রায় সকলকেই বন্ধু বানাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার স্বভাবই ছিল ঐরূপ। দশজনের মধ্যে দাঁড়াইলে তাহাকে চিনিয়া লইতে কষ্ট হইত না। আর খেলায়-ধূলায় হাস্যকৌতুকে, দেহের শক্তি-বিকাশে সে আশ্চর্য্যরূপে নিমেষে সকলকে বশ করিয়া ফেলিতে পারিত। আমরা যখন স্কুলে এক ক্লাসে পাঠ করিতাম, তখন তাহার কেনা গোলাম হইয়া গিয়াছিলাম। সকল ছেলেই তাহাকে ভালবাসিত বটে, কিন্তু আমার মত তাহাকে বোধ হয় জগতে কেহ ভালবাসিত না। আমি যে তাহাকে কি দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না, সে যদি তাহার জন্য আমার প্রাণ দিতে বলিত, আমি স্বচ্ছন্দে দিতে পারিতাম. বস্তুতঃ আমার ভালবাসা কোন প্রণয়ীর প্রতি প্রণয়িনীর ভালবাসা হইতেও কম আপনহারা ছিল না।

প্রথম যখন সে ব্যালাষ্ট ট্রেণের গার্ডের গাড়ী হইতে নামিল, তখন আমার বুকটার মধ্যে কিরূপ দুরুদুরু করিয়া উঠিল, তাহা আমিই জানি। কতদিন পরে দেখা! ইহার মধ্যে কতদিন আমি তাহার কথা ভাবিয়া বিনিদ্ররজনী অতিবাহিত করিয়াছি, নয়নাসারে আমার উপাধান আর্দ্র হইয়া গিয়াছে! বস্তুতঃ সংসারে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও তাঁহার স্ত্রী-পুত্র ব্যতীত আপনার বলিতে কেহ ছিল না; কিন্তু সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার ফলে আমার মনের সমস্ত ভালবাসা গিয়া পড়িয়াছিল অনিলটার উপর। জ্যেষ্ঠ পৃথক করিয়া দিবার পর যখন নিজে নিজের কর্ত্তা হইলাম, তখন অনিলরা বিদেশে—কাজেই কলিকাতার কোন আকর্ষণই রহিল না। বিশেষ, পৈত্রিক বাড়ীর ইট খাইয়া ত আর পেট ভরে না, আর মনোহর-পুকুরের জলার মধ্যে কাঠা তিনেক ডোবা নারিকেল গাছে ভর্ত্তি জমির মূল্যই বা কি, লইবেই বা কে? তাই পরিচিত দুই তিনটি বাঙ্গালীর সহিত আমিও সেই অল্প বয়সে আসা-মের রেল-কনষ্ট্রাকসানে চাকুরী লইয়া আসিলাম। হেথা-সেথা ঘুরিয়া আজ বৎসর দুই আমরা লামডিংয়ে আসিয়াছি। আমার জ্যেষ্ঠ আমার প্রতি এইটুকু দয়া করিতেন যে, মাঝে মাঝে আমি বাঁচিয়া আছি কি মরিয়াছি তাহার খবরটা লইতেন। আমার পাপ-বিদ্ধ সন্দিগ্ধ মন বলিত—ভবানীপুরের জমীটার খাতিরে!

অনিলটা ঠিক সেই ছেলেবেলার মত আমার কাঁধে একটা চাপড় দিয়া একগাল হাসিয়া বলিল, "ইস—এত বড়টা হয়েছিস—ঠিক যেন একটা মুরুব্বি-মুরুব্বি গোছের!" হাসিলে তাহাকে কি সুন্দর দেখাইত! আমি প্রভুভক্ত কুকুরের মত তাহার সর্ব্ব অঙ্গের দিকে প্রশংসমান দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম—গর্ব্বে আনন্দে মনটা ভরিয়া উঠিল, হাঁ—আমার কল্পনার আদর্শ সেই অনিলই বটে!

বাসায় যাইতে যাইতে তাহার পলায়নের ইতিহাস শুনিলাম। তাহার পিতা তাহাকে তাঁহার বিপুল কারবারে ঢুকাইবার কথা পাড়িয়া-ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমব্যবসায়ীর কন্যার সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। এ দুটিতেই সে নারাজ ছিল—সে বলিয়াছিল বিলাত যাইবে লেখাপড়া ভাল করিয়া শিখিতে, তৎপূর্ব্বে সে বিবাহই করিবে না, আর ব্যবসায়ে কারবারে সে ত ঢুকিবেই না। ইহাতে পিতাপুত্রে বচসা হয়, পিতা দারুণ ক্রোধের বশে তাহাকে গৃহ হইতে দূর হইয়া যাইতে আদেশ করেন। অভিমানী পুত্রও পিতার অসহনীয় ক্রোধের প্রবৃত্তি

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিল। স্নেহময়ী জননীর নয়নাশ্রুও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। জননী তাঁহার স্বামীকে অত্যন্ত ভয় করিতেন, তাঁহার বিরুদ্ধে কখনও কথা কহিতে সাহস করিতেন না। কাজেই অবাধ্য পুত্র অভিমানভরে আসামের জঙ্গলে চাকুরী বা অন্য কোনরূপ কাজ করিতে আসিয়াছে

সে দিনটা বড় আমোদেই কাটিল। দিনে আফিস—সে সময়টা অনিল আমার খাটিয়ায় পড়িয়া ঘুমাইয়া কাটাইল। রাত্রিটা দুইজনে গল্পগুজবেই কাটাইয়া দিলাম।

দিন সাত আট ভালই কাটিল, কিন্তু তাহার পর হইতেই অনিল কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল জিজ্ঞাসাবাদে জানিলাম, শ' তিনেক টাকা তাহার কাছে আছে, উহা যদি কোন কাজে লাগান যায় তাহারই জন্য যে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমি জানিতাম, এ অবস্থা চিরদিন থাকিবে না, ধনীর সন্তান—একটা খেয়াল হইয়াছে, খেয়ালটা মিটিয়া যাউক, তাহার পর আমি পিতাপুত্রে মিলন ঘটাইয়া দিব। কিন্তু একটা কাজে লাগাইয়া না দিলে অনর্থপাত হইতে কতক্ষণ? অলসতা পাপের জননী।

বড়বাবুকে বলিয়া ছোটুলালের অধীনে সাব-কন্ট্রাক্টারী একটা করিয়া দিলে হয় না? আজ কথাটা পাড়িব। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় নাগা ডাক্তার ধরমবীর আসিয়া উপস্থিত। সে কোনওরূপ ভণিতা না করিয়াই তাহার ঘর ভাড়া দিবে বলিয়া স্বীকার করিল এবং অগ্রিম ৫৲ টাকা লইয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

অনীল নূতন বাসায় চলিয়া গেল, সাব-কন্ট্রাক্টারিতেও লাগিয়া গেল। আমাকেও সঙ্গে যাইবার জন্য টানাটানি করিল। কিন্তু আমাদের কোয়ার্টার ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই, এই কথা বলিয়া বহু কষ্টে তাহাকে নিরস্ত করিলাম। কাজ বুঝিতে তাহার বেশীদিন গেল না—তাহার মত অসাধারণ তীক্ষ্ণধী মেধাবী ছেলে অতি সহজেই মোটামুটি কাজটা বুঝিয়া লইল। একটা মহারাজ মাহিনা করিয়া রাখিয়াছিলাম সে তাহার রসুইয়ের কাজ হইতে জুতা ঝাড়া কাপড় কাচা পর্য্যন্ত সমস্তই করিত। এ লোকটা কুলী-লাইনের কাজ এখন ছাড়িয়া দিয়াছে। গলায় পৈতা আছে বটে, কিন্তু কোনকালে উহারা যে ব্রাহ্মণ ছিল তাহা ত মনে হয় না। অনিল সঙ্গে এক ট্রাঙ্ক কেতাব আনিয়াছিল, প্রায়ই দেখিতাম, কাজের অবসরে সে খাটিয়ার আড় হইয়া পড়িয়া সিগারেট ফুঁকিতেছে আর কেতাবের পাতা উল্টাইতেছে।

একদিন গিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলাম না, শুনিলাম জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছে। মনটা ছ্যাক করিয়া উঠিল—কয়দিন তাহাকে নাগা ডাক্তারের কন্যা সামজাকর সহিত গভীর কথোপকথনে নিযুক্ত দেখিয়াছি। সে যেরূপ রূপবান, তাহার উপর জনপ্রিয়, তাহার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কোন তরুণীর পক্ষে বিচিত্র নহে বলিয়া আমি মনে করিতাম। কিন্তু সে ত ঐ তরুণীর প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই? সর্ব্বনাশ! অসভ্য নাগা! না, না, এও না কি সম্ভব? গালে উল্কী, দাঁতে মিশি, কড়ির মালা গলায়, পালক চুলে,—গায়ে দুর্গন্ধ—দূর দূর; তাও নাকি হয়! হয় ত শিকার ভালবাসে বলিয়া তরুণীর সঙ্গ লইয়াছে।

মাস তিন এইভাবে কাটিয়া গেল। মনের সন্দেহ ক্রমশঃ গাঢ় হইতে লাগিল ডাক্তার কি দেখিয়াও দেখে না? একদিন গিয়া দেখিলাম, সে ঘরে নাই, কিন্তু সুযোগে কি একটা জিনিষ বাহির করিবার জন্য ঘর খুলিয়া প্রবেশ করিয়াছে। আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ধমক দিলাম, কেন সে ঘর খুলিয়াছে,—ঘরের

চাবিই বা পাইল কোথায় ? প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে ঘরটার মধ্যে একবার চাহিয়া বিস্মিত হইলাম— এমন করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া ঘর পরিষ্কার করিল কে ? ছোড়াটা ত জন্তু ! মহারাজেরও চৌদ্দপুরুষের সাধ্য নহে। তবে ? বলিলাম, "বাবু কোথা রে হ্যো ? ঘর খুললি কি ক'রে ?"

হ্যোর কথায় বুঝিলাম, ঘরের চাবী অনিল তাহাদের কাছেই রাখিয়া যায়। সে বলিল, "না হলে দিদি রোজ ঘর সাফ করে কি করে ?" বোকা ! মূলার মত দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

চোখের সম্মুখ হইতে একটা পর্দ্দা সরিয়া গেল ! যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই না কি ? অনিলের আকর্ষণ ত সহজ নহে। ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া গেল ! নারী—যে জাতিরই হউক না কেন—নারীর কোমল হস্তস্পর্শ ব্যতীত জঙ্গলেও লক্ষ্মীশ্রী ফিরাইতে পারে কে ? সামজাক্কর উপর দারুণ ক্রোধ ও হিংসায় মনটা ভরিয়া উঠিল। আমার অনিল—তাহার স্নেহে প্রেমে অংশীদার হইবে সে ?

বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। অনেকক্ষণ খাটিয়ায় শুইয়া পড়িয়া অবস্থার কথা ভাবিলাম। না, আর অধিক অগ্রসর হইতে দিব না। আজই কলিকাতায় পত্র লিখিয়া দিব। আর, আর স্বয়ং সামজাক্কর এই স্পর্দ্ধার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইব। সুযোগও মিলিয়া গেল অসম্ভাবিত রূপে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, তথাপি অনিল আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসে নাই। দুই একদিন সে এমন করিত না তাহা নহে। বিশেষতঃ ইদানী তাহার আমার বাসায় আসা যাওয়াটা কমিয়া গিয়াছিল অনেক। মনটা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া রহিল। তাহার জন্ম অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

হঠাৎ দ্বারে নাগা ডাক্তারের গলার আওয়াজ পাইলাম ঘরে প্রবেশ করিয়াই সে ব্যগ্রভাবে বলিল, "বাবুজী, জরুরী কামে পাহাড়ে যাচ্ছি। তুমি ভাল লোক—সামজাক্কে দেখবে দয়া করে ? দুচার রোজ পরে ফিরে আসছি।"

আমি বলিলাম, "তার মানে ?"

সে আর দাঁড়াইল না, জবাবও দিল না। বাহিরে তাহার টাট্টু ঘোড়া বাঁধা ছিল। ক্ষণপরেই অশ্ব পদধ্বনি নৈশ অন্ধকারের নীরবতা ভেদ করিয়া কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।

এ কিরূপ হইল ? আমার ত কখনও সে এমন ভার দেয় নাই ? কোন কিছু সন্দেহ হইয়াছে না কি ?

(৪)

প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি ভীষণ ! কয়েক দিন পূর্ব্বে যদি কেহ আমায় বলিত যে, আমি এই অসভ্য জঙ্গলী নাগা বালিকাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিব—অনিলের অপেক্ষাও অধিক ভাল-বাসিব তাহা হইলে আমি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিতাম। আর আজ !

এখন জন্ম কেহ হইয়াছেন কি ? ইচ্ছা করিয়া নিজের ফাঁদে নিজে পা দিয়াছি—এখন ঘর সংসার, চাকুরী, পৃথিবী, অনিল,—সব একদিকে, আর অন্য দিকে সব ছাপাইয়া সামজাক্ক ! কুহকিনী কি মন্ত্রই না জানে ! পূর্ব্বে অনিলকে ফাঁদে ফেলিয়াছে, আমি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বন্ধু অনিলকে সেই ফাঁদ হইতে মুক্ত করিবার জন্য ভাণ প্রণয়ী সাজিয়া তাহার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলাম, কিন্তু এমনই অদৃষ্টের পরিহাস আমি নিজেই এই জঙ্গলীর রূপের ফাঁদে ধরা দিলাম ! উঃ সে কি ভীষণ মোহ !

পূর্ব্বে আমি যখন অনিলকে একদিন এই পাহাড়ী জঙ্গলীকে ভালবাসার দরুণ লজ্জা দিয়া ছিলাম, তিরস্কার করিয়াছিলাম, তখন হতভাগা আমায় বলিয়াছিল, সামজাক্কে যে একবার দেখিয়াছে, একবার তাহার সহিত মিশিয়াছে,

কথা কহিয়াছে, সে কি তাহাকে ভাল না বাসিয়া পারে? সে আর ঘরে ফিরিবে না, পাহাড়িয়ার মত জঙ্গলেই থাকিবে যদি সামজারুকে পায়!

এখন মনে হইল, তাহার কথাটা কত সত্য। প্রথমে আমি সামজারুকে অনিলের কথা লইয়া টিট্‌কারী দিতাম, বলিতাম, সে মস্ত ধনীর সন্তান, তাহার আশা করা তাহার মূর্খতা মাত্র। কিন্তু অনুযোগ ও তিরস্কার করিতে গিয়া যতই তাহার সংস্পর্শে আসিতে লাগিলাম, ততই সে আমার গলার ফাঁসীর বাঁধন কসাইতে লাগিল। শেষে আমার মনে হইতে লাগিল, সামজারুকে ছাড়িয়া জীবন মরুভূমিতে বাস করা অসম্ভব। সে আমার নিস্পন্দ জীবন-মরুতে মরূদ্বীপ—শীতল শান্তি-প্রস্রবণ! আরও ভাবিলাম, আমার ত্রিকুলে কেহ নাই, এক দাদা,—তিনিও জন্মের মত বিদায় দিয়াছেন। তবে কি সুখে, কোন্ আশায় সমাজে ফিরিয়া যাইব? আবার জঙ্গলের জীবনও যাহা সমাজের জীবনও তাহা। আমি সামজারুকে বিবাহ করিয়া এই কালা জঙ্গলেই জীবন অতিবাহিত করিব, এমন ত অনেক বাঙ্গালীই করিতেছে। কিন্তু অনিলের পক্ষে তাহা অসম্ভব—সে পিতামাতার আদরের সন্তান, ধনবানের একমাত্র উত্তরাধিকারী—তাহাকে ত আমি জঙ্গলের জঙ্গলী হইয়া সারা জীবনটা ব্যর্থ করিতে দিতে পারি না। মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম—অনিলের মত মানুষকে সমাজের বুকে ফিরাইয়া দিতেছি। কিন্তু এই মনের অন্তরালে একটি সুন্দরী যুবতীর প্রতি আমার যে লোলুপ লালসা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিল, তাহা নিজে নিজের কাছে কিছুতেই স্বীকার করিতাম না।

উঃ কি কুহকিনী এই সামজারু! কি লোহার বাঁধনে আবার হৃদয়টাকে বাঁধিয়াছে সে! একদিন সে অনিলের একটা সরস রসিকতায় হো হো হাসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছিল—অমনই আমার অন্তরের ভিতরে নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, মনে হইয়াছিল, অনিলটাকে তখনই খুন করিয়া ফেলি। কি সর্ব্বনাশ এই রূপের মোহ!—এই ভালবাসা! যে অনিল আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম, তাহাকে যে এই রাক্ষস মোহ ক্রমে শত্রুরূপেই পরিণত করিতেছে! এখন সামজারুর মুখের হাসি দেখিবার লোভে পাগল হইয়া উঠি—ছুতায় নতায় অফিস কামাই করিয়া তাহার সঙ্গলাভের সুযোগ অন্বেষণ করি, দেখা পাইলে অনুগত কুকুরের মত তাহার আশে পাশে ঘুরি; কিন্তু—কিন্তু—সামজারু? সে ত আমার দিকে ফিরিয়াও দেখে না। তাহার ঢুলু ঢুলু নয়ন দুইটি কাহার উদ্দেশে আশে পাশে ঘুরে ফিরে, তাহার মনটা কোথায় পড়িয়া থাকে, কথার জবাব দিতে সে কেন অন্যমনস্ক হয়, কাহার পদশব্দের প্রতীক্ষায় সে উৎকর্ণ হইয়া থাকে,—তাহা কি বুঝিতাম না? প্রাণটা জ্বলিয়া পুড়িয়া উঠিত।

না, অনিলটার আর এখানে স্থান হইতেই পারে না—যেরূপে হউক—ছলে-বলে-কৌশলে যেরূপেই হউক, উহাকে এইস্থান হইতে তাড়াইতেই হইবে। সে কলিকাতার বাবু, এ জঙ্গলের সহিত তাহার সম্পর্ক কি?

কয়দিন হইতে দেখিতেছি সামজারুর প্রস্ফুট শতদলের মত অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি যেন শুকাইয়া যাইতেছে, তাহার সরস অঙ্গযষ্টি শীর্ণ হইতেছে, নয়নের কোণে কালি পড়িয়াছে যেন কত বিনিদ্র রজনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়াছে; নীলোৎপল আয়ত নয়নে দারুণ যাতনা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কেন এমন হইল? তাহার পিতার অনুপস্থিতিই কি ইহার কারণ? না, শুনিয়াছি, তাহার পিতা ত এমন অনেকবার পাহাড়ে গিয়া কাটাইয়া আসিয়াছে। তবে?

শেষ রাত্রি—চাঁদের আলোয় জঙ্গল আলোকিত—হঠাৎ উচ্চ কুক্কুটধ্বনিতে জাগিয়া উঠিলাম। এ কি, রাত্রি প্রভাত হইল না কি? এখনও

ত তাহার এক ঘণ্টা বাকি। শুইয়া পড়িলাম।

আবার সেই কুক্কুটধ্বনি! এবার ঠিক আমার শিয়রের নিকটস্থ ঝাঁপখানার বাহিরে। উঠিয়া বসিয়া লণ্ঠনের আলোক প্রজ্বলিত করিলাম। বাহির হইতে কোমলকণ্ঠে ডাক আসিল, "বাবুজী!"

আমার শরীরের সমস্ত রক্ত চন্ চন্ করিয়া উঠিল,—একি, এত রাতে সামজ্বাক! অসম্ভব।

ঝাঁপ খুলিয়া দেখিলাম, সম্মুখে চন্দ্রকরে স্নাত প্লাবিত হইয়া দাঁড়াইয়া সত্যই সামজ্বাক।

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "একি তুমি? এত রাতে?"

সে রক্তোৎপলতুল্য অধরোষ্ঠে চম্পককলির মত অঙ্গুলি রক্ষা করিয়া আমায় ইঙ্গিতে নীরবে বাহিরে আসিতে বলিল। তখনই আদেশ পালন করিলাম। অপেক্ষাকৃত অন্ধকারময় স্থানে সরিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, "একটা কথা রাখবেন, আমার সঙ্গে যেতে পারবেন?"

আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইলাম। আর একদিন তাহার পিতাকেও এমনই পরিষ্কার বাঙ্গালায় কথা কহিতে শুনিয়াছিলাম।

"কি, ভয় পাচ্ছেন? মাত্র একটা দিন—"

আমি তাহাকে ঘরের মধ্যে লইয়া যাইবার জন্ম অনুরোধ জানাইলাম, সে অসম্মতি প্রকাশ করিল। বলিলাম, "ভয় কিসের? কোথায় যেতে হবে?"

"ঐ ওপারে? ঐ যে পাহাড়ের পর পাহাড় সার বেঁধে ধোঁয়ার মত দূরে মিলিয়ে গেছে—ঐখানে।"

"ও ত নাগার দেশ। তুমি কি তোমার বাবার কাছে যেতে চাইছ? তোমরা—তোমরা কি বাঙ্গালী? তবে—তবে?"

আমার ঈপ্সিত ধন এমন করিয়া সহজে ধরা দিতেছে, সেই সময়ে এ সংশয়ের প্রশ্ন কেন? আমি তাড়াতাড়ি তাহার করপল্লব গ্রহণ করিয়া সমস্ত হৃদয়ের আগ্রহ চোখে আনিয়া বলিলাম, "সত্যই একলা আমার সঙ্গে যেতে চাইছ অত দূরে? তা হলে—"

"হাঁ, যেতে চাইছি—দূরে, যত দূরে হয় তাতে আপত্তি নেই—আজই—এখনই—এ জায়গা ছেড়ে যেতে চাই, এই দেখ, যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়েই বেরিয়েছি। চল, চল, রাত পুইয়ে এল। তুমি না যাও, একলাই যাব।" সে দাঁড়াইল না, হন হন করিয়া পাহাড়ের পথে অগ্রসর হইল।

নক্ষত্র খচিত নীলাকাশ, তন্মধ্যে সুধাংশু অজস্র রজতধারায় জগৎকে স্নান করাইয়া দিতেছে। পথ জনমানবশূন্য—কেবল যাত্রী আমরা দুইটি প্রাণী। তবে ত সে আমাকেই বিশ্বাস করে, অনিল কেহ নহে! বিপুল বিস্ময়ে এবং আনন্দে মনটা ভরিয়া উঠিল।

বলিলাম, "যখন আমায় বিশ্বাস করেছ, তখন আমিও ঘরসংসার ছেড়ে তোমার সঙ্গেই যাব। এই দেখ, এক বস্ত্রেই যাচ্ছি। তুমি ত আমার হবে?" উচ্ছ্বাসভরে আরও কত কি বলিয়া যাইতেছিলাম। হঠাৎ তাহার মুখে দারুণ বিস্ময়ের চিহ্ন দেখিয়া থমকিয়া নীরব হইলাম।

আমার মুখের উপর স্থির ও প্রশান্ত দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "এ কি বলছেন আপনি? ছোট বোন্ দাদার আশ্রয় পাবে, এই ভরসায় ঘরের বার হয়েছি।"

আমি প্রথমটা হিংসা ও ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলাম, বলিলাম, "তাই আমায় দরকার হয়েছে? তা, আর একজনের প্রাণ নিয়ে খেলা কি ভাল হয়েছে?" আমার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া শ্বাস নির্গত হইল।

তরুণী আমার মুখের দিকে ব্যথাহত কাতর দৃষ্টি উত্তোলন করিল, সেই পদ্মনেত্র দুইটি জলে ভাসিতেছে। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা কর,

দাদা, আগে বুঝতে পারি নি একথা। আমি চল্লুম, ফিরে যাও।"

মুহূর্ত্তে সে শ্যামায়মান পাহাড়ের কোলে অদৃশ্য হইয়া গেল—কোন পথে কিরূপে অন্তর্দ্ধান করিল, আমি বুঝিবার বিন্দুমাত্র সুযোগ পাইলাম না।

(৫)

কত ডাকিলাম, কত খুঁজিলাম, সূর্য্যোদয়ের পরেও পাহাড়ের পথে আরও কতকদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, কোথাও ত তাহাকে আর পাইলাম না। এ জীবনে আর কি তাহাকে পাইব?

বাসায় ফিরিয়া নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া রহিলাম। কেবল তাহার কথাই মনে মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিলাম।

কে সে? কে তাহার জনক? কি জন্য উহারা এই গভীর জঙ্গলে বাস করিতেছে? কত কথাই মনে মনে ভাবিলাম, কিন্তু কোন সমস্যারই সমাধান করিতে পারিলাম না। স্নানাহারের কথা মনেই পড়িল না। অপরাহ্নে কোনরূপে উঠিয়া একবার অনিলের সন্ধান লইলাম, সে আহারের পর বাহির হইয়া গিয়াছে, তখনও ঘরে ফিরে নাই। দুই দিন তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না—যখনই তাহার বাসায় যাই, তখনই নাই। তাহার পর একদিন যখন তাহার বাসায় গেলাম, তখন দেখিলাম সে গভীর চিন্তায় মগ্ন, তাহার সম্মুখে একখানা খোলা চিঠি পড়িয়া রহিয়াছে। আমায় দেখিয়াই সে প্রথমে চমকিত হইয়া উঠিল, তাহার পর চিঠিখানা দেখাইয়া বলিল, 'পড়।'

আমি বিস্মিত হইলাম। সে ত সামজারুর কথা একবারও উল্লেখ করিল না। পত্র দেখিয়া বুঝিলাম, ইহা তিন দিন পূর্ব্বে লিখিত।

জ্বলন্ত ল্যাম্পের আলোকে পত্র পাঠ করিলাম—

কাল তুমি আমার যে কথা বলেছ, তারপর আর তোমার কাছে আমার থাকা উচিত নয়. বুঝে আজ ভোরে তোমার বন্ধুর সঙ্গে আমাদের পাহাড়ের দেশে রওনা হলুম। হাসতুম, খেলতুম, বলেই কি মনে করেছিলে তোমায় ভালবাসতুম? ছিঃ ছিঃ, তোমরা আমাদের পাহাড়ীদের বন্ধুত্ব জান না—আমাদের স্ত্রীপুরুষে ভাব হ'লেই সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের কথা উঠে না। তোমার বন্ধুর সঙ্গে অনেক দিন থেকেই আমার বিয়ের কথা ঠিক হয়েছিল। পাছে তুমি বিঘ্ন ঘটাও তাই দুজনে আমরা পাহাড়ের দেশেই চল্লুম, সেখানে আমাদের বিয়ে হবে বাবার কাছে গিয়ে। তুমি কলকাতায় ফিরে যাও, সেখানে তোমার মা বাবা তোমার জন্যে কত কাঁদছেন, মনে কি একটুও দুঃখ হয় না? আমায় যদি একটুও ভালবেসে থাক, তা হলে সেই ভালবাসার দোহাই দিয়ে বলছি, দেশে ফিরে যাও, সুখী হও, এ জঙ্গল তোমার জন্যে নয়।

সামজারু।

আমি স্তম্ভিত হইলাম! এই পত্র কি অসভ্য নিরক্ষর জঙ্গলী বালিকা লিখিতে পারে? কি গভীর, কি অতলস্পর্শ, কি অপরিমেয় প্রেম এই হৃদয়ে লুকাইয়া আছে! কি আত্মদান! তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় অন্তর ভরিয়া উঠিল।

অনিল বলিতেছিল, "তাকে কোথায় রেখে এলি তোরা? তুই ত ঘুণাক্ষরেও জানতে দিস নি যে, সে তোর বাগ্‌দত্তা। তা হলে আমি ত কণ্টক হতুম না তোদের। এই খানিক আগে স্যুয়ো চিঠিখানা দিয়ে গেল। সুখে থাক্ ভাই তোরা।" সে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

আমি অতি কষ্টে এতক্ষণ ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলাম। তিড়বিড় করিয়া ঝড়ের মত বলিয়া গেলাম, "অন্ধ! অন্ধ! ঘটে কি বুদ্ধি আছে তোর? মুখখু! বুঝতে কি এতদিনেও পার নি, সে কাকে ভালবাসে? কার জন্যে সে মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে ঘর ছেড়ে গিয়েছে? কার সুখের জন্য সে আপনাকে বলি দিয়েছে?

যখন তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছিলি,তখন সে বুঝেছিল, তার জন্তে তুই সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে চেয়েছিস—সে কি সে দান নিতে পারে? তার নখের যোগ্যও কি হতে পারিস? বলছিস্, সে আমাকে ভালবাসে? ছিঃ, ছিঃ!"

অনিল দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে। তাহার দীর্ঘ শালতরুনিভ অঙ্গখানি কাঁপিতেছে, চক্ষুতে অপরূপ দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়াছে,—বজ্রমুষ্টিতে আমার হাত দুখানা প্রায় পিষিয়া ফেলিয়া সে ঘনঘন শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিল, "তা হলে—তা হলে তোমাদের বিবাহের সম্বন্ধের কথা মিথ্যা?"

আমি বলিলাম, "সর্ব্বৈব মিথ্যা। আমি তাকে তুই আসবার আগে চিনতুমও না। পাপের কথা স্বীকার করছি, পরে তাকে যতই দেখেছি, ততই সে আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে বসেছে, তাকে দেখলে তার সঙ্গে মিশলে কে ভাল না বেসে থাকতে পারে?"

অনিল বলিল, "বল, বল।"

আমি বলিলাম, "সত্যি—বলবো, তোকে হিংসে করতুম—যাকে আগে প্রাণের চেয়ে ভাল বাসতুম, সেই-তোকে খুন করতেও ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু এখন আর সে ভাব নাই, তার মুখে সব শুনে আমার চোখ খুলে গেছে। সে আমার ভগিনীর স্নেহে বেঁধে ফেলেছে। যখন তাকে আমার প্রাণের কথা নিবেদন করতে গেছি, তখন তার নয়ন দুটি জলে ভেসে উঠেছে, তখনই তার কথার আভাসে বুঝেছি, কাকে সে প্রাণ দিয়ে রেখেছে—ভাই অনিল! তোকে যে একবার ভালবেছে, সে কি আর কাউকে মন দিতে পারে?"

দুই বন্ধু গলা ধরাধরি করিয়া ভাবের আবেগে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলাম। অনিল বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "ভাই, কোথায় গেল সে, তাকে কি আর পাবো না?"

আমি বলিলাম, "কেন পাবি নি? তারা কখনই জঙ্গলী নাগা নয়, একথা আমি হলপ করে বলতে পারি—তারা কখনই পাহাড়ে জঙ্গলীদের সঙ্গে বাস করতে পারবে না—"

"না, তা পারবে না, তাই ত আজই ফিরে এলুম আমরা,"—বলিয়া একজন লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমরা বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম—এ কি নাগা ডাক্তার ধরমবীর না?

নাগা ডাক্তার একটা বাঁশের মোড়া টানিয়া লইয়া বসিল, বলিল, "সব বলছি, বোসো বাবারা। আমি ত নাগা নই, আমার মেয়েও নাগা নয়—যে ভয়ে এতদিন নাগা সেজে ছিলুম, সে ভয় দূর হয়েছে, এখন আমার ইতিহাস বলতে আর কোন বাধা নাই। আমার মেয়ে? বল্‌ছি, সব বল্‌ছি, বাবারা একটু ধৈর্য্য ধরে শোন।"

সেই জুয়েলল্যাম্পের আলোকে বসিয়া আহার নিদ্রা ভুলিয়া আমরা নাগা ডাক্তারের অদ্ভুত ইতিহাস শুনিতে লাগিলাম। কি অদ্ভুত, কি চমকপ্রদ, যেন উপন্যাসের ঘটনার মত! ধরমবীর নহে, ধর্ম্মদাস বসু। কলিকাতা সহরে বহু পূর্ব্বে এক ব্যাঙ্কের ক্যাসে কাজ করিতেন; ক্যাসিয়ার বাবু তাঁহার আত্মীয়, তিনিই তাঁহাকে রুদ্রপুর গ্রাম হইতে কলিকাতায় আনিয়া চাকুরী করিয়া দেন। কোন কোন দিন, ক্যাসিয়ার বা ক্যাসিয়ারের লোককে প্রত্যূষে ব্যাঙ্কে গিয়া ক্যাস হইতে টাকা বাহির করিয়া দিতে হইত, সে জন্ম তাঁহারা ব্যাঙ্ক হইতে উপরি টাকা পাইতেন। ধর্ম্মদাস বাবু, ক্যাসিয়ার বাবুর দেশের লোক বলিয়া মাঝে মাঝে ক্যাসিয়ার বাবু তাঁহাকে সেই ভার দিতেন। সামান্ত ৪০৲ টাকা বেতনের কেরাণী মাসে দুই তিন ক্ষেপ উপরি দুই চার টাকা পাওনা, খুবই লোভের ছিল। একদিন তাঁর পাঁচ শত টাকা ছোট সাহেবকে বাহির করিয়া দিবার জন্ত ক্যাসিয়ার বাবুর তাঁহার উপর হুকুম

হইল। ধর্ম্মদাস বাবু টাকাটা প্রত্যুষে বাহির করিয়া দিয়া আসিয়া চাবী বড় বাবুর হস্তে ফিরাইয়া দিলেন। আফিসে দশটার পর যাইবা মাত্র ক্যাসিয়ার বাবু তাঁহাকে নিভৃতে ডাকাইয়া বলিলেন, সেফের উপরের তাকে যে ১৭ হাজার টাকার খুচরা নোট তৎপূর্ব্বদিনে জমা রাখা হইয়াছিল তাহার মধ্য হইতে ১৫ হাজার টাকা কম পড়িতেছে। সে টাকা কোথায় গেল? ভয়ে ধর্ম্মদাস বাবুর প্রাণ উড়িয়া গেল। ক্যাসিয়ার বাবু বলিলেন, এখনও সাহেবদের কাছে জানান হয় নাই, এখনও ক্যাস ঠিক করিয়া রাখিলে কোন গোলমাল হইবে না, নতুবা পুলিস ডাকা হইবে। ধর্ম্মদাস বাবু বলিলেন, তিনি ত উপরের তাকে হাতই দেন নাই, তিনি যেমন হুকুম দিয়াছিলেন, সেই মত নীচের তাক হইতে মাত্র পাঁচ শত টাকা বাহির করিয়া দিয়াছেন। ক্যাসিয়ার বাবু বলিলেন, একথা কে বিশ্বাস করিবে, ক্যাস হইতে টাকা বাহির করিবার কালে সব টাকা গণিয়া মিলাইয়া রাখা নিয়ম। গতকল্য যে টাকা মজুত ছিল, তাহা ধর্ম্মদাস বাবু জানেন, তবে কেন মিলাইয়া দেখিয়া সেফ বন্ধ করেন নাই; তাহা হইলে ছোট সাহেবের সম্মুখে টাকা তখন কম ছিল কিনা প্রমাণ হইয়া যাইত; তিনিই টাকা লইয়াছেন, তাঁহাকে পুলিসে দেওয়া হইবে।

ধর্ম্মদাস বাবু তাঁহার হাতে পায়ে ধরিয়া কাঁদা কাটা করিলেন, ক্যাসিয়ার বাবু তখন তাঁহাকে এমন একটা কথা বলিলেন, যাহা শুনিয়া তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া তখনই তাঁহাকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ভগবান সে সময়ে তাঁহাকে সুমতি দিলেন, অন্যথা সেই দিনই তাঁহার হাজত হইয়া যাইত; আর তাঁহার অসহায়া পত্নীর হয় ত সর্ব্বনাশ হইয়া যাইত। এই মিথ্যাবাদী ভণ্ড জুয়াচোর লম্পট প্রৌঢ় ক্যাসিয়ারের সহিত তিনিও চাতুরী অবলম্বন করিলেন, বলিলেন, আজ ভাবিয়া চিন্তিয়া পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া কাল জবাব দিবেন, কেবল আজকার দিনটা ক্যাসিয়ার বাবু ব্যাপারটা চাপিয়া যান। তাহাই হইল; ধর্ম্মদাস বাবু ছুটী পাইয়া বাসায় গেলেন। ক্যাসিয়ার বাবু তাঁহার লোকজনকে তাঁহার উপর খর নজর রাখিতে আদেশ দিলেন। স্পষ্টই বলিয়া দিলেন, ধর্ম্মদাস পলায়ন করে করুক, কিন্তু তাহার পত্নীকে যেন সঙ্গে না লইয়া যায়, যাইবার চেষ্টা করিলেও বাধা দিবে ও তাঁকে খবর দিবে।

ধর্ম্মদাস বাবু দরিদ্র হইলেও এক সম্পদে সম্পন্ন ছিলেন, যাহার নিকট রাজার সিংহাসনও তুচ্ছ—সেই সম্পদ, তাঁহার অসামান্যা সুন্দরী ও গুণবতী প্রেমময়ী পত্নী সুলোচনা। তিনি তাঁহারই দেশের ভিন্ন পল্লীর কন্যা। ক্যাসিয়ার তাঁহার রূপে মুগ্ধ ছিলেন, একথা তিনি পরে জানিতে পারিয়াছিলেন। ক্যাসিয়ার, ধর্ম্মদাস বাবুর পত্নীকে নিকটে পাইবার লোভেই ধর্ম্মদাস বাবুকে চাকুরী দিয়া কলিকাতায় আনয়ন করেন এবং তাঁহারই একখানি ছোট ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকিতে দেন। ক্যাসিয়ার ধর্ম্মদাস বাবুকে পত্নীর দেহ বিনিময়ে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার সুযোগ দিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলেন! এমনই নরপিশাচ তিনি!

ধর্ম্মদাস বুঝিলেন টাকা ক্যাসিয়ারই রাখিয়াছেন, ব্যাঙ্কের টাকা মারা যায় না; সাহেব ক্যাসিয়ারের হাত হইতে টাকা আদায় করিয়া লইবেন। মাঝে হইতে ধর্ম্মদাসকে ফাঁদে ফেলিবার ষড়যন্ত্র হইয়াছে মাত্র। বাসায় গিয়া তিনি সকল কথাই পত্নীকে খুলিয়া বলিলেন। পতিপত্নী পরস্পরের বক্ষ নয়নাসারে আর্দ্র করিলেন, কিন্তু উপায় কি? পলায়ন? কিন্তু কড়া পাহারা, বিশেষতঃ, তাঁহার পত্নী সন্তান-সম্ভবা! অনেক চিন্তার পর ধর্ম্মদাস বাবু এক উপায় স্থির করিলেন। একরূপ এক বস্ত্রে মাত্র সামান্য

কিছু অর্থ ও বস্ত্র লইয়া আর সমস্ত ফেলিয়া শৌচাগারের মধ্য দিয়া অন্দরের পশ্চাতের পগারের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া তিনি সন্তান-সম্ভবা পত্নীকে লইয়া গভীর রাত্রিতে বাসা ত্যাগ করিলেন। সারা রাত্রি পদব্রজে পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা নৈহাটীতে উপস্থিত হইলেন; সেখানে এক মুদির দোকানে ঘর ভাড়া লইয়া লুকাইয়া থাকিয়া রাত্রিকালে গোয়ালন্দ যাত্রী গাড়ী ধরিলেন এবং সেখান হইতে জাহাজে চাপিয়া তেজপুরে পৌঁছিলেন। সেখানে তাঁহার এক আত্মীয় চা-বাগানের ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার আশ্রয়ে মাত্র কিছু দিন থাকিয়া পথের দারুণ কষ্টে অভিভূত হইয়া অসময়ে তাঁহার পত্নী এক কন্যাসন্তান প্রসব করিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। সেই কন্যাই তাঁহার সামজাঙ্গ বা শান্তিলতা।

তেজপুরের চাবাগানে তাঁহার আত্মীয় তাঁহাকে একটা চাকুরী করিয়া দেন। তাঁহার কাছে যে কয় বৎসর ছিলেন, সেই কয় বৎসরে তিনি তাঁহার নিকট কিছু ডাক্তারী শিখেন। শান্তি যখন এক বৎসরের, সেই সময়ে তিনি বহুদিনের এক পুরাতন সংবাদপত্রে পাঠ করেন যে, তাঁহার ব্যাঙ্কের মালিকরা সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহাদের পলাতক ক্যাসের ক্লার্ক ধর্ম্মদাস আসামে লুকাইয়া আছে, তাহার সন্ধানে ডিটেকটিভ লাগানো হইয়াছে। তাঁহার আত্মীয় ডাক্তার তখন মারা গিয়াছেন, তাঁহার স্থলে অন্য ডাক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি আর তেজপুরে থাকা নিরাপদ মনে করিলেন না, কন্যাকে লইয়া নাগার দেশে চলিয়া গেলেন। তাঁহার এক ভৃত্য ছিল, সে ও তাহার পত্নী তাঁহাকে ও তাঁহার কন্যাকে নাগা ভাষায় শিক্ষিত করে ও নাগাদের পরিচ্ছদ ও আদব-কায়দা অভ্যস্ত করায়। কে না স্বর্যোর পিতা। তাঁহার নাগা দেশের বাড়ীর পার্শ্বে পত্নী ও অন্যান্য পুত্রকন্যা লইয়া সে বাস করিত ও তাঁহার বাড়ী চৌকী দিত।

এতদিন নাগার মত বসবাস করিবার পর তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, শান্তি বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিয়াছে. এইবার পূর্ব্ববঙ্গের কোথাও গিয়া তাহার বিবাহের চেষ্টা দেখিবেন, ইহাতে যদি তাঁহাকে ধরা পড়িয়া জেলে যাইতে হয়, তাহাও স্বীকার। হঠাৎ সেই সময়ে লামডিংএর রেল ডাক্তারের বাসায় তাহার এক বন্ধু উপস্থিত হয়, সে নাকি কলিকাতার পুলিসের লোক। এই কথা শুনিবামাত্র আতঙ্কে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া যায়। তাঁহার গ্রাম লামডিং হইতে মাত্র এক বেলার পথ। যদি না ফিরিতে পারেন, তাই যাইবার পূর্ব্বে কন্যাকে তাঁহার সমস্ত ইতিহাস খুলিয়া বলিয়া যান। বলা বাহুল্য, সেই দিনের পূর্ব্বে শান্তি জানিত না যে, সে বাঙ্গালী মা-বাপের সন্তান।

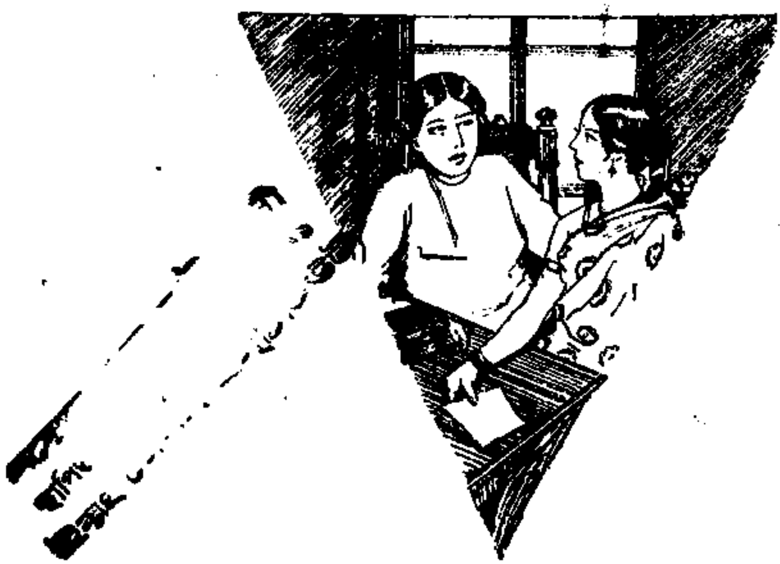
সেখান হইতে দুই দিনের পথ চলিয়া তিনি এক মিশনারীর বাড়ী রোগী দেখিতে গিয়া সেখানে একখানা কলিকাতার দুই সপ্তাহের পুরাতন সংবাদপত্র দেখিতে পান। হঠাৎ পড়িতে পড়িতে দেখেন, তাঁহার ব্যাঙ্কের দরোয়ান এক তহবিল তছরুপাতের মামলায় ধরা পড়িয়া স্বীকার করিয়াছে যে, তাহাদের আফিসের বড়বাবুর সহিত একযোগে সে অনেক মন্দ কাজ করিয়াছে; যে জন্য ধর্ম্মদাস বাবুর চাকুরী গিয়াছে, সে জন্য বড়বাবুই দায়ী, বড়বাবুই সন্ধ্যার পর আসিয়া টাকা লইয়া গিয়াছিল. দরোয়ানের মুখ চাপা দিবার জন্য বড়বাবু তাহাকে এক শত টাকা ঘুষ দিয়াছিল। বড়বাবু গ্রেফতার হইয়াছেন, তাঁহার নামে মামলা চলিতেছে।

সেই দিনই ধর্ম্মদাস বাবু কন্যাকে এই সুখবর দিবার নিমিত্ত তাঁহার গ্রামে ফিরিয়া আসেন। সেখানে অসম্ভাবিতরূপে কন্যার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তখনই তিনি কন্যাকে

লইয়া দার্জিলিংএ চলিয়া আসেন, এই সন্ধ্যার কিছু পরে বাসায় পৌঁছিয়াছেন।

কাহিনী সাঙ্গ করিয়া ধর্ম্মদাস বাবু বলিলেন, "চল বাবারা—আমার বাসায় ; আমি সব জানি। বাবা অনিল! এ দরিদ্রের একমাত্র ধন ঐ মাতৃহীনা কন্যা—একে কি কষ্টে আমি মানুষ করেছি—" কথা শেষ হইল না, তাঁহার চক্ষু জল ভরিয়া উঠিল, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল। অনিল তাঁহার হাত দুইখানা ধরিয়া রহিল, তাহারও রুদ্ধকণ্ঠ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না।

যখন আমরা ডাক্তার ধর্ম্মদাস বাবুর বাসায় পৌঁছিলাম, তখন এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। সামজাকুর আর সে মূর্ত্তি নাই, তাহার ললাট ও গণ্ডের উল্কী, দাঁতের মিশি, পালক কড়ি, কোথায় গিয়াছে, তাহার স্থানে সে "ব্রীড়াবনতমুখী লজ্জাবনতা অপূর্ব্ব সুন্দরী বাঙ্গালী কিশোরী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—সে রূপের তুলনা আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া তো মনে হয় না। যখন সে তাহার আয়ত নীলোৎপল নয়ন দুইটী উত্তোলন করিল - যখন তাহাদের চারিচক্ষুর মিলন হইল—যখন তাহারা দুইজনে জগৎসংসার ভুলিয়া মুহূর্ত্তের জন্য পরস্পর বদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিল, তখন আমি ধর্ম্মদাস বাবুর হাত ধরিয়া নিঃশব্দে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলাম!





পঙ্কান্তরের প্রয়াস

শ্রী তারাপদ মজুমদার

এক

শারদীয়া পূজার সপ্তাহ খানেক পর। বেলা তখন নয়টা কি ঐ রকম। সময়টা বেশ মিষ্ট।

একহাতে একটী ক্যান্‌ভাসের ব্যাগ ও একটী ছাতা, অন্য হাতে একটী মোটা রংকরা লাঠি ও এক যোড়া লাল চটি; পা দুইটীতে হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত ধূলা,—প্রৌঢ় বিশ্বরূপ বাঁড়ুয্যে বিজয়ার প্রণাম সম্ভাষণাদি শেষ করিয়া শ্বশুরবাড়ী হইতে বাড়ী ফিরিলেন।

বাড়ীর মধ্যে মায়ের তাড়া খাইয়া বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের ত্রয়োদশবর্ষীয় পুত্র হরিহর দাওয়ায় বিছান একখানি মাদুরের উপর সবে ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা খুলিয়া গুণ গুণ আরম্ভ করিয়াছে—পিতাকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার মুখখানি কালো হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাহার চোখদুটী নাচিয়া উঠিল,—তিরস্কারের জন্য বোধ হয় মনে মনে মাতার দীর্ঘায়ু কামনা করিল। কারণ এই সকাল বেলায় পিতা আসিয়া তাহাকে অধ্যয়নরত না দেখিলে একটা ভীষণ অনর্থ ঘটাইতেন।

বাঁড়ুয্যে মহাশয় তাঁহার তল্পিতল্পা নামাইয়া হাঁকিলেন, নোতুন বৌ!

হরিহর উত্তর দিল, নোতুন মা ওবাড়ী গেছে, মুড়ির চাব খায় ছিল, তাই দিতে।

বাঁড়ুয্যে মহাশয় বলিলেন, হুঁ..., এ ক'দিন বইটই খুলেছিলি? না, দিন রাত্তির কেবল টৌ টৌ কোম্পানী করেই কাটিয়েছ।

ঘাড় চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে পুত্র প্রত্যুত্তর করিল, গ্রামার খানা ত দুবার রিভাইজ করা হয়ে গেছে,—কিন্তু গ্রামারখানি যে ঘরের কোথায় বিরাজ করিতেছিল, তাহাও বোধ করি শ্রীমান্ হরিহরের জানা ছিল না। পিতা ইংরাজী জানেন না, সুতরাং তাঁহার পক্ষ হইতে পড়াশুনার তাগিদ্ আসিলে দুই একটী ইংরাজী বুলি আওড়াইয়া ধুরন্ধর পুত্র পিতাকে সন্তুষ্ট ও অবাক্ করিয়া দেয়।

কৈফিয়ৎ প্রভৃতি শেষ করিয়া পিতা জিজ্ঞাসা-করিলেন, হ্যাঁ রে হরে! তুই একবার পলাশ গাঁ গিয়েছিলি না? তোর সেই মাসীকে মনে পড়ে?—যে কলকাতায় ইস্কুলে পড়ে রে? হাঁ ক'রে রইলি যে, চিন্‌তে পারলি নে? গর্দ্দভ কোথাকার! একটু মেধা যদি থাকে; এই ত বছর পাঁচ ছয় হ'ল, এর মধ্যেই—

গর্দ্দভটী কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না, নীরবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া পিতার দিকে চাহিয়া তাঁহার এই অতর্কিত আবির্ভাব ও অকারণ তিরস্কারের মর্ম্ম জলিতে লাগিল।

ইত্যবসরে পত্নী সত্যভামা আসিয়া পড়িলেন স্বামীকে দেখিয়া ললাট পর্য্যন্ত ঘোমটাটী টানিয়া দিয়া বলিলেন, ও মা, বাড়ী এসেছ যে, হাত পাও ধোওনি? ছেলেটাকে বক্‌ছ কেন?

বাঁড়ুয্যে মহাশয় পত্নীর কথার কোন উত্তরও দিলেন না, সুরও বদ্লাইলেন না ; তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ওই যে পলাশগাঁয়ের তোমার সেই বোনটা গো, নামটাও ছাই মনে পড়ে না,— কি নামটা বেশ ?—শুভা, প্রভা, না, না, বিভা, বিভা,—সেটা আজকাল আবার কলকাতায় পড়ছে—

পত্নী বাধা দিয়া বলিলেন হ্যাঁ,তা হয়েছে কি ?

অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বাঁড়ুয্যে মহাশয় বলিলেন, না, হয় নি এমন কিছুই, বাড়ীটা আস্বার পথেই পড়্ল, তা' মনে করলাম একবার দেখা করেই যাই। পূজোর সময় তারা সব দেশে এসেছে।—মেয়েটাও দেখলাম দিব্যি বড়সড় হয়েছে, যেমন চালাক তেমনই চটপটে—

পত্নী বুঝিলেন একটা ব্যাপার কিছু হইয়াছেই, নচেৎ বাড়ী ঢুকিয়াই তাঁহার ভগিনীর এত প্রশংসাবাদ কেন ? প্রকাশ্যে বলিলেন, আস্বার সময় তা'হলে বিভাদের বাড়ীতেও পায়ের ধূলো দিয়ে এসেছ ? যাক্, যেখানে গিয়েছিলে সেখানকার খবর বল। বাবা কেমন আছেন ? নেড়া হাঁটতে শিখেছে, আহা, ছেলেটাকে নিয়ে বাবা বড্ড নাকাল হচ্ছেন, তবু আমার কাছে পাঠাবেন না,—পূবদিকের পাঁচিলটা এবারকার বর্ষায় পড়ে গেছে, না আছে ?

সবিস্তারে না হোক্ সংক্ষেপে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়া বাঁড়ুয্যে মহাশয় ওঘরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, হরে, কল্কেটায় একবার আগুন দে বাবা।—কিন্তু কোথায় হরে! সে মাতাপিতার কথোপকথনের ফাঁকে সরিয়া পড়িয়াছে। এতক্ষণ বোধহয় বারোয়ারীতলায় ভোগের ঘরে বিড়ি হস্তে দণ্ডায়মান।

হরিহরের অনুপস্থিতিতে তদীয় মাতা স্বামীকে তামাক দিয়া রন্ধনের উদ্যোগে গেলেন।

দুই

চারি পাঁচ দিন পরে একদিন প্রাতঃকালে সনাতন মুদির দোকানে বসিয়া বিশ্বরূপ বাঁড়ুয্যে তামাক টানিতেছেন এবং আমাহুল্লা কিরূপে কাবুল হইতে লুকাইয়া লুকাইয়া পলায়ন করিয়াছে সেই সম্বন্ধে উপবিষ্ট কয়েকটী নিরক্ষর লোকের নিকট লেক্‌চার দিতেছেন, এমন সময় পিয়ন একখানি পত্র দিয়া গেল।—সবুজরঙের একখানি লেফাফা,—তাহা হইতে আতরের ফুরফুরে গন্ধ বাহির হইতেছে,—উপরে এক কোণে ছাপার অক্ষরে সোনার জলে লেখা, শ্রীমতী বিভা দেবী। পত্রখানি পাইয়া বাড়ুয্যে মহাশয়ের মুখখানি আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ; উপবিষ্ট লোকগুলির দিকে একটু গর্ব্বের সহিত চাহিয়া লইয়া পত্রখানিকে মের্জ্জাইয়ের পকেটে পুরিলেন, বলিলেন, ওঃ, অনেক বেলা হয়েছে যে, বসে বসে গল্পই করছি!—বলিয়া সনাতনকে বলিলেন, সনাতন, ওই বাটীটায় এক পোয়া তেল ভাই।

তেল দেওয়া হইলে বাটীটী হাতে করিয়া বাঁড়ুয্যে মহাশয় বলিলেন, এটাও লিখে রেখো হে ;—ছোট মিয়ে রোজ ঘুরোচ্ছে, টাকা ক'টা দিলেই তোমারটা ভাই আগে মিটিয়ে দেব,—বলিয়াই তিনি গৃহাভিমুখে পাড়ি দিলেন।

সনাতন বিরক্তমুখে বসিয়া রহিল, কোনও উত্তর দিলেন না ; কারণ ছোটমিঞার নিকট তাঁহার টাকাপ্রাপ্তির সংবাদটা সর্ব্বৈব মিথ্যা, সে খোঁজ লইয়াছে।

আহারাদির পর পত্নী সদ্যস্তাতা কমলার মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যাইবে—তাহাই দেখিতে গেলেন। পুত্রও অনেকক্ষণ হইতে সুযোগ খুঁজিতেছিল, পিতাকে শয়নঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বাড়ী হইতে অন্তর্হিত হইল। পুত্রের অন্তর্দ্ধানে অন্যদিন পিতা রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতেন, কিন্তু আজ তিনি দেখিয়াও দেখিলেন না, বরং মনে মনে একটু খুসী হইয়াই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং সন্তর্পণে খাম খানিকে আস্ত রাখিয়া চিঠি খানি খুলিলেন,—মোটা রুল মোলায়েম

কাগজে লেখা চিঠি,—টুপ করিয়া একটী গোলাপ ফুলের পাপড়ি পত্রাভ্যন্তর হইতে নীচে পড়িয়া গেল। বাঁড়ুয্যে মহাশয় সেটীকে সযত্নে তুলিয়া পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন—

প্রিয়তম,

তুমি চলে গেছ, কিন্তু আমার প্রাণটা যে কেড়ে নিয়ে গেছ। এই চা'র পাঁচ দিন যে কি ভাবেই কেটেছে! মিলন আমাদের হবেই হবে, আমরা যে মিলিত হবার জন্যই জন্মেছি! কোন বাধা মানব না। তোমাকে না পেলে যে কি হবে তা' ভগবানই জানেন। কাল কথায় কথায় মা'র মতটাও জেনে নিইছি। প্রথমটায় অবশ্য একটু আপত্তি উঠেছিল, কিন্তু শেষটায় সম্মত হয়েছেন। সুতরাং, সবদিক্ থেকে এক রকম নিশ্চিন্ত আগামী শুভ অগ্রহায়ণে। ওঃ দিন আর কাটে না।

ভাল কথা, পরশু আমরা কলকাতায় এসেছি। একবার এখানে আস্তে পারবে না? কত কথাই যে মনে রয়েছে তোমায় বলব বলে।

চিঠির উত্তর পাব কবে? খুব শীগগির চাই কিন্তু। লক্ষীটি, দিদি যেন এখন থেকেই কিছু জানতে না পারে, তা' হ'লে লজ্জার আর সীমা থাকবে না।

আজকের মত বিদায় বন্ধু, বিদায়। ইতি—

তোমারই বিভা

পত্রখানি পাঠ করিয়া বাঁড়ুয্যে মহাশয় মনে করিলেন যে, একবার খুব স্ফূর্ত্তির সহিত নৃত্য করিয়া লয়, অথবা মনপ্রাণ খুলিয়া একবার হাসিয়া লন। পত্রখানিকে অতি সাবধানে লুকাইয়া রাখিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন, কিন্তু ঘুম কি ছাই আসে? চোখ মুদিলেও সেই ঢলঢলে মুখ খানি, ঠল্‌ঠলে চোখ দুটি,...আঃ...

কিন্তু অদৃষ্ট! সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়া বাহির হইতে পত্নী হাঁকিলেন, ঘুমিয়েছ না কি?—যেন একটী ফুলের বাগানে একটা দুর্দ্দান্ত গোরু ঢুকিয়া সব ফুটন্ত ফুলগুলি ছিঁড়িয়া মাড়াইয়া একেবারে শ্রীহীন করিয়া দিল!

বিরক্তিস্বরে বাঁড়ুয্যে মহাশয় উত্তর দিলেন, না, কেন?

দরজা খোল তবে, একটা কথা আছে।

এখন আবার কি কথা! বাঁড়ুয্যে মহাশয় মুখখানি হাঁড়ি করিয়া দরজা খুলিলেন। পত্নী বলিলেন, তোমায় একবার কল্‌কাতা যেতে হবে।

হাঁড়িকরা মুখ হইতেই প্রত্যুত্তর হইল, ক'লকাতা কেন? এখন আর কোথাও যাওয়া টাওয়া নয়, দুদিন পরে গেলেই চলবে 'খন। কিন্তু পরক্ষণেই বিভার কলিকাতা গমনের কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, তিনি বলিলেন, নেহাতই দরকার না কি?

পত্নী উত্তর করিলেন, কুটুম্বিতে ত রাখতে হবে। ওই যে সেদিন বিভার কথা বলছিলে না? তারই এক বোন্‌পোর অন্নপ্রাশন। কাল নেমতন্ন চিঠি এসেছে, তোমায় দেখাতেই ভুলে গেছি, এই দ্যাখো,—বলিয়া সত্যভামা চিঠিখানি তাঁহার হাতে দিলেন।

কলিকাতা যাইবার প্রসঙ্গে বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের অন্তরে তখন উল্লাসের ঢেউ বহিতেছিল। পত্র খানিতে চোখ বুলাইয়াই বলিলেন, তা' হ'লে ত কালই যেতে হয়। কিন্তু বড় মুস্কিল নোতুন বৌ, হাতে এখন টাকাকড়ি কিছু নেই,—আচ্ছা দেখা যাক্।

বাঁড়ুয্যে মহাশয় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে কলিকাতা গেলেন, ঐ সঙ্গে বিভার সহিত আর একবার সাক্ষাৎও হইবে—মন্দ কি? রাজীব পোদ্দারের কাছে কয়েকটা টাকা ধার করিতে হইল, উপায় নাই!

তিন

স্বামী কলিকাতা গিয়াছেন। পুত্রটীও দুপুর বেলায় বাহির হইয়াছে এখনও দেখা নাই। বিকাল বেলায় কাজকর্ম্মও বিশেষ কিছু নাই,—

সত্যভামা কাহাকে একখানি পত্র লিখিতে বসিয়াছেন। এমন সময় পুত্র রত্নটী একটী বাঁশীতে ফুঁ দিতে দিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সত্য-ভামা পত্রখানির এক পৃষ্ঠা লিখিয়া পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় মাত্র এক লাইন্ লিখিয়াছেন, পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, বাড়ীর কথা এতক্ষণে মনে পড়্‌ল ?

হরিহর এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দিবার প্রয়োজন মনে করিল না। সম্মুখে উন্মুক্ত পত্রের লিখিত লাইনটী চোখে পড়িতেই পড়িয়া ফেলিল, 'দেখিস্ যেন ভাই, বেশী বাড়াবাড়ি না হয়।"

কৌতূহলের সহিত মাতার মুখের দিকে চাহিয়া হরিহর বলিল, এ কি মা, কাকে লিখ্‌ছ এ চিঠি ?

মাতা ঝাঁজের সহিত উত্তর দিলেন, কেন ? তোমার সে খোঁজ কেন ?

অপ্রত্যাশিত রুক্ষতার সৃষ্টি দেখিয়া হরিহর থতমত খাইয়া গেল। পরে আঙ্গিনার এক পাশে পা ছুইটী ধুইয়া আসিয়া মাতার নিকট দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, মা, তোমার পা ধোয়া হয়ে গেছে ?

না, কেন ?—বলিয়া সত্যভামা ঈষৎ হাসিলেন, কারণ এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য তাঁহার সবিশেষ জানা ছিল।

'না'—উত্তর শুনিয়াই হরিহর মাতার কোলের উপর গিয়া বসিয়া পড়িল এবং ছুইটী আঙ্গুল তুলিয়া দেখাইয়া ইঙ্গিতে বুঝাইল, ছুইটী পয়সা চাই।

সপত্নী পুত্র হইলেও সত্যভামা তাহাকে নিজে মানুষ করিয়া আসিতেছেন বলিয়া তাহার মাতৃ-স্নেহ ভাণ্ডার এই মাতৃহীন বালকটীর নিকট একেবারে উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল। ফলে বালকটী ক্রমে শাসনের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল।

সত্যভামা দর্শনাত্যস্ত ইঙ্গিতটীর অর্থ বুঝিতে পারিয়া সস্নেহে তাহাকে একটী চুম্বন করিলেন ও পত্রখানির দিকে চাহিয়া একবার হাসিলেন। পরে তাহাকে বলিলেন, ওইদিক্কার কুলুঙ্গিতে আছে, নিগে যা'।

পয়সা পাইয়া নূতন মাকে একটু খুসী করিবার জন্ত বিশেষ কোনও প্রসঙ্গ না পাইয়া হরিহর বলিল, আচ্ছা মা, বাবা সেদিন বিভার নাম করছিলেন, নয় ?

মাতা ধম্‌কাইয়া বলিলেন, বিভা কি রে ? তুই তার নাড়ি কেটেছিস্, না ? নাম ধরে ডাকা হচ্ছে, হতভাগা বাঁদর ; তোর যে সাতটার বড়। মাসীমা হয়না তোর ?

হরিহর দেখিল কথাটা লাগসই হয় নাই, উপরন্তু তাহার মায়ের মেজাজটাও আজ যেন একটু অদ্ভুত রকমের হইয়া রহিয়াছে,—ক্ষণে করুণ, ক্ষণে রৌদ্র রস। সে বেগতিক বুঝিয়া পলায়ন করিল।

বিশ্বরূপ বাঁড়ুয্যে যখন অন্নপ্রাশনের বাড়ীতে গিয়াই বিভার দেখা পাইলেন, তখন গৃহ হইতে যাত্রাকালীন যে রমণীটীর পূর্ণকুম্ভ দেখিয়াছিলেন, তাহার কথা ভাবিয়া তাহাকে অপরিমেয় আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

দিদির পুত্রের অন্নপ্রাশনে বিভাও আসিয়া-ছিল, সুতরাং সম্পূর্ণ না হৌক্, অপেক্ষাকৃত নিভৃতে তাহাদের উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। কাজের বাড়ীতে লোক-সমাগমের মধ্যে বেশী কিছু কথা-বার্ত্তা হইতে পারে না, সুতরাং দুই-চারি কথাতেই বিভা বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে একেবারে মুগ্ধ করিয়া দিল। বাঁড়ুয্যে মহাশয় মুখব্যাদান করিয়া বিভার কাকলী নিন্দিত কণ্ঠস্বরটী শুনিলেন ও তাহার কথা বলিবার ভঙ্গিটী পর্য্যবেক্ষণ করিলেন মাত্র ; তাঁহার তখন বাক্যস্ফুরণের শক্তি লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

অন্নপ্রাশনের ধুমধাম শেষ হইয়া গেল। আত্মীয় স্বজনগণও একে একে চলিয়া গেলেন। সুতরাং বাঁড়ুয্যে মহাশয়ও আর অধিক দিন অপেক্ষা করিবার যুক্তিযুক্ত কোন

কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া তাঁহার মনটাকে যেন চাবুক মারিতে মারিতে স্বীয় পল্লীভবনের দিকে ছোটাইলেন

চার

অগ্রহায়ণ মাস পড়িতে না পড়িতেই বাঁড়ুয্যে মহাশয় প্রত্যহ গ্রাম্য ডাকঘরে হত্যা দিতে লাগিলেন। পাছে তাঁহার সেই অতিপ্রত্যাশিত, অতি গোপনীয় চিঠিখানি অন্য কাহারও হস্তে গিয়া পড়ে। অবশেষে একদিন সত্যসত্যই তাঁহার সেই দীর্ঘবাঞ্ছিত সৌভাগ্য-লিপিখানি আসিয়া পৌঁছিল। ডাকঘরের অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন বারান্দায় দাঁড়াইয়া পত্রখানি দুই মিনিটেই বাঁড়ুয্যে মহাশয় নিঃশেষ করিলেন। তাঁহার তদানীন্তন মানসিক অবস্থাটার বর্ণনা করা কিছু শক্ত। তিনি একবার আড়চোখে কর্মব্যস্ত পোষ্টমাষ্টারটার দিকে চাহিলেন,—আহা, বেচারী কেবল কলমই পিষিতেছে! এ রকম সৌভাগ্যের আস্বাদ স্বপ্নেও কখনো করিতে পারে নাই। পিয়নটার দিকে চাহিয়া ভাবিলেন, নির্ব্বোধটা চিঠিখানিতে অপরাপর চিঠিগুলির মত "সীল্‌ই" মারিয়াছে, কিন্তু এখানির যে কি বার্ত্তা……! একবার তিনি মনে করিলেন, যাহাই হউক, পিয়নটাকে কিছু বখ্‌শিস্‌ করিয়া দেন, কিন্তু পকেট্‌ শূন্য, তদ্ব্যতীত তাহাতে গোলযোগেরও সম্ভাবনা। ভাবিতে লাগিলেন, এখনই এই সুসংবাদটা একটা ঢেঁড়া পিটাইয়া গ্রামময় রাষ্ট্র করিয়া দেন। অন্তরের উচ্ছ্বাসটা তাঁহার ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল।

বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের অদৃষ্টও খুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কারণ তখন তাঁহার স্ত্রী ও গৃহে ছিলেন না। কোন এক নিকট আত্মীয়ার বিবাহোপলক্ষ্যে পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন হরিহরও মাতার সঙ্গে গিয়াছিল।

বিভার পত্রের নির্দ্দেশমত বাঁড়ুয্যে মহাশয় দুই দিন পূর্ব্বেই কলিকাতায় রওয়ানা হইলেন এবং বিভার এক জ্ঞাতি ভ্রাতার বাসায় উঠিলেন।

বিভার পত্রে লিখিত ছিল যে, বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের পক্ষ হইতে কোনও প্রকার আয়োজন বা আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। শুদ্ধ বিবাহ-রাত্রিতে তিনি একক বিভাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইবেন। পরে সেখানে যথাবিধি সমস্তই করা হইবে। এ প্রস্তাবে বাঁড়ুয্যে মহাশয় ইতস্ততঃ করেন নাই; কারণ, নিয়মাচরণ করিতে হইলে অর্থব্যয়ও হইবে, লোক জানাজানিও হইবে। যেটা প্রধান কাজ, সেইটাই যখন বিভাদের ব্যয়ে হইয়া যাইবে, তখন আর চিন্তা কি?

মাত্র দুইদিন আসিয়াছেন, কিন্তু ইহার মধ্যেই বিভার জ্ঞাতি ভ্রাতার সহিত বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের যথেষ্ট হৃদ্যতা হইয়া গিয়াছে। বিবাহের দিন সন্ধ্যার কিছু পরেই এক খানি মোটর আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইতেই বাঁড়ুয্যে মহাশয় তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়া বিভার ভ্রাতাকে বলিলেন, চারুকৃষ্ণ বাবু, দেখুন ত, একখানা মোটর এসে দাঁড়াল; বোধ হয় ও বাড়ী থেকেই···

চারুকৃষ্ণ বাবু উপর হইতেই একবার দেখিয়া লইয়া বলিলেন,হঁ্যা, ঐ ত, বিভাদের বাড়ী থেকেই এসেছে, আপনিও ত তৈরী, উঠে পড়ুন,—আমার একটু দেরী হবে, তার জন্য আপনি অপেক্ষা করতে যাবেন কেন?

বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের বিলম্ব মোটেই সহ্য হইতেছিল না, কিছু পূর্ব্ব হইতেই তিনি বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছটফট্‌ করিতেছিলেন। সম্ভব হইলে এক লাফ দিয়া বোধ হয় উপর হইতেই মোটরে লাফাইয়া পড়িতেন। চারুকৃষ্ণ বাবুর নিকট অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া তিনি মোটরে গিয়া উঠিলেন।

বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে লইয়া মোটরে ছুটিতে লাগিল। বাঁড়ুয্যে মহাশয় তখন স্বর্গরাজ্যে কি কোথায় অবস্থান করিতেছিলেন, তাহার স্থিরতা

ছিল না। গাড়ীর মধ্যে বসিয়া বসিয়া তিনি কত কি ভাঙ্গিতে গড়িতে ছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিভাকে বিবাহ করিয়া গৃহে গিয়া প্রথমে একটু বেগ পাইতে হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সত্যভামাত তত রুক্ষপ্রকৃতির রমণী নয়, সুতরাং বনিবনাত অবশ্যই হইবে, তাহা ছাড়া, তখন মিলিয়া মিশিয়া না থাকিলে তাঁহার অন্ত উপায়ই বা কি! তাহার পর দিনগুলি কি ভাবেই না কাটিবে…!

বিভাদের বাসা ভবানীপুরে এবং বাঁড়ুয্যে মহাশয় এই দুইদিন পটলডাঙ্গার চারুকৃষ্ণ বাবুর বাসায় ছিলেন। মোটরখানি লোয়ার সার্কুলার রোডে পাড়িয়াই একটা শব্দ করিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। চালক বলিল, মোটার্ বিগড়াইয়াছে, সুতরাং অপেক্ষা করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বাঁড়ুয্যে মহাশয় সেইস্থানে নামিয়া অধীরভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন। চালক গাড়ী ঠিক করিতে লাগিল, রাত্রিও ক্রমশঃ অধিক হইতেছে, লগ্নও সন্নিকট। বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের সহিষ্ণুতা আর অটল রহিল না; চালককে বলিলেন, আর কত দেরী হে? এদিকে লগ্ন ও যে কাছাকাছি।

চালক উত্তর করিল, কি কর্‌ব বলুন প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌ছি, দেখতেই ত পাচ্ছেন।—বলিয়া সে পুনরায় নিজের কাজে মনোনিবেশ করিল। বাঁড়ুয্যে মহাশয় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মনে মনে চালক ও মোটার্ উভয়েরই মুণ্ডপাত করিতে লাগিলেন। অবশেষে একেবারে অধীর হইয়া তিনি বলিলেন, তবে না হয় এক কাজ করা যাক্, একখান্ ট্যাক্সি করে' যাওয়া যাক্, চল।

চালক বলিল, সে কি করে হয় বলুন। আপনি ত বাসা চেনেন না, আর আমিও এই গাড়ী ফেলে রেখে আপনার সঙ্গে যেতে পারি না। নেহাৎ এ লগ্নটী কেটে যায়, আর একটা লগ্নও ত রয়েছে।

শেষোক্ত কথাটীতে বাঁড়ুয্যে মহাশয় তাঁহার ব্যাকুল নিরাশর মধ্যে একটু অবলম্বন পাইলেন।

পরিশেষে গাড়ী যখন চলিবার মত হইল, তখন রাত্রি বারটা। ড্রাইভার পূর্ণবেগে মোটর্ চালাইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভবানীপুরের বাসায় আসিয়া হাজির হইল।

বাঁড়ুয্যে মহাশয় গাড়ী হইতে নামিয়া কম্পিত বক্ষে বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীর মধ্যে তখন লোকের ভীড়। ভিতরে হুলুধ্বনি ও শঙ্খনিনাদ হইতেছে। ধীরে ধীরে অতি সঙ্কোচের সহিত তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, সম্মুখেই চারুকৃষ্ণবাবু। তিনি বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে দেখিয়াই বলিলেন, এই যে, এতক্ষণ ছিলেন কোথায়? চলুন, চলুন, সামনে আর একটা লগ্ন আছে, ওঘরে বসবেন এখন।

কথা কয়টী শুনিয়া বাঁড়ুয্যে মহাশয় যেরূপ খুসী হইলেন, অতর্কিত ভাবে একটা জমিদারী হস্তগত হইলেও বোধ হয় ঐরূপ হইতেন না। তিনি মোটার দুর্ঘটনার কথা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিতে করিতে শ্যালকের অনুগমন করিলেন।

সুসজ্জিত একখানি কক্ষে তাঁহাকে একাকী বসাইয়া রাখিয়া চারুকৃষ্ণ বাবু কি কাজে বাহিরে আসিলেন। কিছুক্ষণ পরেই একটী বালিকা একখানি পাত্রে কিছু খাবার লইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে খাইবার ইঙ্গিত করিল। বাঁড়ুয্যে মহাশয় মনে করিলেন, বালিকা আর কাহারও নিকট লইয়া যাইতে খাবারটী ভুলক্রমে তাঁহার নিকট লইয়া আসিয়াছে। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ খুকী, আমাকে ত খেতে নেই, আর কারুকে দিতে হবে বোধ হয়, নিয়ে যাও।

আর কারুকে নয়, তোমাকেই দিতে এসেছে, খাও—বলিয়া যে স্ত্রীলোকটী ঘরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের চক্ষু দুইটী ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইবার মত হইল। তিনি

অতিকষ্টে বলিলেন, তুমি, নোতুন বৌ, তুমি এখানে ?

হ্যাঁ, আমি এখানেই ; কেন, আসতে নেই ? বোনের বিয়ে, তা' ছাড়া আমার—আমার স্বামীর বিয়ে, আমার এখানে আসতে নেই ! বুড়ো হয়েছ, এখনও বিয়ে করবার সখ গেল না ? একটাকে ত পার করেছ, এখন আমাকে পার না করেই···

সীতাদেবী বসুন্ধরার কন্যা বলিয়া তাঁহার গর্ভে স্থান পাইয়াছিলেন, কিন্তু বাঁড়ুয্যে মহাশয় কোথায় লুকান ? ওদিকে শাঁখগুলিও ঘন ঘন বাজিতেছিল এবং পাশের ঘর খানি হাসির চোটে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। অতি ধীরে ধীরে নত মস্তকটী তুলিয়া বাঁড়ুয্যে মহাশয় চারিদিকে চাহিলেন, ঘরে তাঁহার স্ত্রী ব্যতীত আর কেহই নাই। তাঁহার আর কোনও কথা বলিবার যো ছিল না।

পত্নী স্বর নামাইয়া মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন, নাও ওগুলো এখন খাও, খেলে ত কিছু দোষ হবে না।

তাঁহার হাসি ও কথাগুলি যেন বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের নিকট বিষের মত বোধ হইল। তিনি কিছু উত্তরও দিলেন না, খাদ্যও স্পর্শ করিলেন না। নীরবে করুণ-দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে একবার চাহিলেন মাত্র।

ইত্যবসরে পট্টবস্ত্র পরিহিত একটী নব দম্পতি আসিয়া বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে প্রণাম করিল। বিভা তাঁহার আরও নিকট সরিয়া গিয়া চাপা গলায় বলিল, বাঁড়ুয্যে মহাশয়, আজকের দিনে যেন আমার উপর রাগ-টাগ কিছু রাখ্‌বেন না ; আমাদের আজ আশীর্ব্বাদ করুন।

বাঁড়ুয্যে মহাশয় হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, কি মনে মনে কাঁদিলেন, তিনিই সম্যক জানেন।



দাবী

শ্রীগোপেন্দ্র বসু

(১)

অচলগড় অধিপতি ত্রিবিক্রম দেব পরাজিত।

বিজেতা তোমর রাজ রুদ্রদেবের রুদ্র প্রতাপে নবাধিকৃত অচলগড় কম্পমান। অশীতিবর্ষবয়স্কের বৃদ্ধ ত্রিবিক্রম দেব সপরিবারে নগর উপকণ্ঠে পরিত্যক্ত দূতাবাসে সতর্ক সুশিক্ষিত সৈন্যদ্বারা কারারুদ্ধ—বন্দী। ক্ষণকাল পরে প্রকাশ্য রাজসভায় তাঁহার বিচার হইবে।

কিরূপ সুবিচার হইবে, তাহা শুধু অচলগড় কেন সমগ্র উজ্জয়িনীর অধিবাসীবৃন্দ বুঝিতে পারিয়াছে। হিংস্র পরশ্রীকাতর নরপিশাচ তোমর-রাজ প্রমর বংশের চিরশত্রু; তিনি অচলগড়ের ধন-সম্পদ ও অন্যান্য ঐশ্বর্য্যে প্রলুব্ধ হইয়া বহুদিন যাবৎ ইহার উপর লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, কিন্তু প্রকাশ্য সমরে ইহাকে করায়ত্ব করা সুসাধ্য নহে, সেইহেতু এতকাল আক্রমণে বিরত ছিলেন।

অচলগড়ের প্রায় সর্ব্বপার্শ্বে সুউচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী —দুর্ভেদ্য কারা,প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান, অবশিষ্ট দিকে চম্বলনদীর দুর্জ্জয় স্রোতস্বিনী শাখাএস্তা প্রবাহিতা। প্রাচীর সদৃশ পর্ব্বতগুলির সানুদেশে স্থানে স্থানে প্রয়োজনমত প্রমার রাজ-ইতিহাস-বিখ্যাত মঞ্জুদেব কর্ত্তৃক প্রস্তর নির্ম্মিত সুউচ্চ প্রাচীর দণ্ডায়মান হইয়া বহু শতাব্দী শত্রুর আক্রমণ তাচ্ছিল্য ও ব্যর্থ করিতেছে। অচল-গড়ের সুরক্ষিত নগরদ্বার ব্যতীত পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে মধ্যে কতকগুলি গুপ্তদ্বার ছিল। রাজ্যের প্রধান ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীরা ব্যতীত কেহ উহাদের সন্ধান জ্ঞাত নহে। দুর্দ্ধর্য প্রতাপ তোমররাজ বহু চেষ্টাতেও উহার সন্ধান পান নাই।

(২)

অচলগড়ের রাজলক্ষ্মী চিরশত্রু রুদ্রদেবের গলে



বিজয়মালা পরাইবার সার্দ্ধ দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন রাজনীতিক গগণ মেঘশূন্য ছিল; অধিবাসীরা যুদ্ধব্যবসা ত্যাগ করিয়া শান্তিপ্রিয় উদার প্রজা-বৎসল ত্রিবিক্রম দেবের অধীনে নিরুদ্বেগে কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতেছিল। তৎকালে একটী সুমধুর বসন্ত প্রাতে অচলগড় রাজকুমারী অবন্তী চিত্তাপ্রিয়া, তন্দ্রা প্রভৃতি সখীগণ সহ রাজ্য উপকণ্ঠস্থিত মহাকালদেবের মন্দিরে বাৎসরিক বসন্তোৎসবে যোগদান করিতে গমন করেন।

প্রৌঢ় সৌম্যদর্শন শীলেন্দ্র বেদান্তী, মহাকাল বিগ্রহের পুরোহিত; সদাশয় বিদ্বান্ ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রখ্যাত। মহাকালদেবের উৎসব আরম্ভ হইতে বিলম্ব নাই; ধূপধুনা, গুগ্‌গুল, আতর, কুঙ্কুম ও নানাবিধ সুগন্ধিতে এবং দেব-দাসীদের সুমিষ্ট ভক্তিগীতালাপে মন্দির প্রাঙ্গণ

অমরাবতী হইয়া উঠিয়াছে ; চতুর্দ্দিকে চঞ্চল স্নিগ্ধ ভাব বিরাজমান।

রাজকুমারী মন্দির দ্বারে সখীগণসহ প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটী প্রস্তর বেদিকার উপর বসিয়া প্রধানা দেবদাসী সাগরিকা, মহাকালদেবের জন্ম নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প সংযোগে মাল্য প্রস্তুত করিতেছে।

সাগরিকা রাজকুমারী ও তাঁহার সখীদিগকে সাদরে প্রস্তর বেদিকার উপর উপবিষ্ট করাইয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল। কিঞ্চিৎ বয়োধিকা চিরকুমারী দেবদাসী সাগরিকার সহিত বহুপূর্ব্ব হইতে রাজকুমারী অবন্তীর বিশেষ সখীত্ব ছিল। সাগরিকার সুবৃহৎ পুষ্পপাত্রের মধ্যে একটী বিচিত্র পুষ্পের অপরূপ শোভা দর্শন করিয়া পুষ্প-বিলাসী রাজকুমারী অবন্তী সখী সাগরিককে জিজ্ঞাসা করিলেন "সখী কি সুন্দর পুষ্প, এ কোথা হইতে পাইলে ? এরূপ পুষ্প গত পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুইবৎসর যাবৎ এই বসন্তোৎসবের কালে এই মন্দিরে দেখিতেছি ; কিন্তু কখনও অন্যত্র দেখি না, রাজোদ্যানেও নাই ; মালীরাও এ পুষ্প দেখে নাই এ বিচিত্র পুষ্পের একটী বৃক্ষ আমি পাইতে ইচ্ছা করি ; আমি উহা স্বহস্তে প্রোথিত করিব। কোথা হইতে উহা পাওয়া যায় শীঘ্র বল।

সাগরিকা বলিল "অদূরে, তথাপি সেইস্থানে গমন করা নিরাপদ বা সহজসাধ্য নহে।"

"অন্য রাজ্যের অধীন কি ?"

"তাহা না হইলেও ঐ স্থান রাজ্যপ্রাচীরের বহির্ভাগে ; সেখানে বিজাতীয় ও শত্রুপক্ষীয়দের গমনাগমন সর্ব্বদা সম্ভব। উহা একপ্রকার কুটজ পুষ্প। কুটজপুষ্প মহাকালদেবের অত্যধিক প্রিয় ; সেই নিমিত্ত আমরা উৎসবের সময় বৎসরে একবার মন্দির পার্শ্বস্থিত গুপ্তদ্বার দিয়া অতি সতর্কে প্রচ্ছন্নভাবে গভীর নিশীথে ঐ পুষ্প আহরণ করিতে যাই। গুপ্তদ্বারটী শত্রুপক্ষ জ্ঞাত হইলে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা ; এতদ্ব্যতীত তুমি অচলগড়ের রাজকুমারী, তোমার পক্ষে সেই স্থানে গমন করা উচিৎ নহে।"

কিন্তু রাজকুমারী বিশেষ আগ্রহবতী হইয়া উঠিলেন এবং ঐ স্থানে লইয়া যাইবার জন্য সাগরিকাকে বারংবার কাতর অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবন্তীর কাতর অনুরোধে সাগরিকার প্রাণে করুণার উদ্রেক হইল। স্থির হইল, সান্ধ্য অন্ধকারে অতি প্রচ্ছন্নভাবে গুপ্তদ্বার দিয়া সতর্কতার সহিত ছদ্মবেশে যাওয়া হইবে। সখীরা ব্যতীত অন্য কেহ জ্ঞাত হইবে না।

* * *

(৩)

শুক্লা-চতুর্দ্দশীর বাসন্তী জ্যোৎস্না ; শুভ্রস্নিগ্ধতার ও মাধুর্য্যে চতুর্দ্দিক মোহাচ্ছন্ন করিয়াছে। সিপ্রা নদীতীর হইতে কতিপয় যুবক নানাবিধ কুটজকুসুম চয়ন পূর্ব্বক পার্ব্বত্য অরণ্যের ছায়াবীথির মধ্য দিয়া অচলগড় অভিমুখে অতি সন্তর্পণে আসিতেছে ; সহসা অশ্বপদ শব্দে তাহাদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল ; সকলেই বীথি ত্যাগ করিয়া নিঃশব্দে নিবিড় অরণ্য অভ্যন্তরে গমন করিল। অশ্বারোহী, যুবকদের আনন্দ-হাস্য-কল্লোল বহুদূর হইতে শ্রবণ করিয়া ঐ শব্দ লক্ষ্য করিয়াই আসিতেছিল। কিঞ্চিৎ নিকটে আসিয়া কাহারও দর্শন না পাইয়া অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক উচ্চস্বরে বলিল—"কোথায় কে আছেন অনুগ্রহপূর্ব্বক উত্তর দিন ; আমি পথভ্রান্ত, আমার সখা পানীয় অভাবে মৃতপ্রায় ; আমাকে নদীর সন্ধান বলিয়া দিয়া আমার ও আমার বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করুন।"

কি করুণ স্বর ! কি বেদনা-কাতর বাণী ! কিঞ্চিৎ দূরে নিবিড় পত্রান্তরালে রাজকুমারী অবন্তী, সাগরিকা প্রভৃতি সখীগণসহ ছদ্মবেশে লজ্জায় ও ভয়ে বিমূঢ় ও স্তম্ভিত অবস্থায় চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান। পথিক পুনরায় উচ্চস্বরে বলিল—"এইমাত্র অতি সন্নিকটে

কাহাদের কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহারা দয়া করিয়া নির্ব্বাক থাকিবেন না। ভগবানের নামে শপথ, আমার দ্বারা তাঁহাদের কোন অনিষ্ট হইবে না; আমরা তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ —"

পথভ্রান্ত পথিকের কণ্ঠরোধ হইল; আর বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিল না।

ছদ্মবেশী অবন্তী বলিল "সাগরিকা শ্রবণ করিলে কি? কি বেদনা-কাতর স্বর! বোধ হয় ইহা শ্রবণে পাষাণ গলিত হয়, মরু বালুকাও সরস হয়। সাগরিকা আর থাকিতে পারি না। উহাদের নদীর পথটা দেখাইয়া দিই, আমরা ত ছদ্মবেশে, কেহ আমাদের চিনিতে পারিবে না আর যদি সেইরূপ বুঝি, প্রমরবংশীয় স্ত্রীলোকেরা আত্মরক্ষার্থে পুরুষ অপেক্ষা কোন অংশ নিকৃষ্টা নহে।

প্রমরবংশীয় স্ত্রীলোকদের বীরত্ব ইতিহাস বিশ্রুত; এতদ্ব্যতীত রাজা ত্রিবিক্রমের বহুদিন পুত্রসন্তান না হওয়ায় অবন্তীর অচলগড়ের ভবিষ্যৎ রাজ্ঞী হইবার সম্ভাবনা থাকায় তিনি কন্যাটিকে রাজপুত্রদের ন্যায় সমর ও রাজনীতি বিষয় বিশেষরূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন। বলবীর্য্যে, সাহসে ও জ্ঞানে রাজকুমারী অতি অল্প বয়সেই রাজ্যভার লইবার উপযুক্তা হইয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার নারীসুলভ কোমলতা ও অন্যান্য গুণাবলী কোন অংশে হ্রাস পায় নাই।

অবন্তীর কোমল প্রাণ পথিকের কাতর আবেদনে গলিত হইল; ছায়াবীথি হইতে চন্দ্রালোকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে আপনি?"

পথিক ব্যস্তভাবে বলিল "আমি পথিক, পানীয় অভাবে—"

"আসুন, আমি নদীর পথ জ্ঞাত আছি, আপনাকে দেখাইয়া দিতেছি।"

পথিক বলিল—"আপনার আর সব সঙ্গীরা কোথায়?"

প্রত্যুৎপন্নমতি রাজকুমারী বলিলেন,—"তাহারা আপনাকে দস্যুজ্ঞানে অদূরে লুক্কায়িত আছে; এখনই ডাকিয়া আনিতেছি, অপেক্ষা করুন।"

পথিকের বেশ ও আকৃতি অভিজাত বংশ যোগ্য, দৃষ্টি-প্রশান্ত, সংযত, নির্ভীক—রূপ অতুল্য, দেব-প্রতিম।

অবিলম্বে ছদ্মবেশী সখীগণসহ অবন্তী ফিরিয়া আসিলেন। পথিক দেখিল, চার পাঁচটী যুবা। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে বলিল—"আপনাদের মধ্যে যদি চার ব্যক্তি আমার বন্ধুকে কোনমতে এই স্থানে আনয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে বড়ই কৃতার্থ হইব; ঐ স্থানটী ভাল নহে।" স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া পথিক আবার বলিল—"আর একজন যদি আমাকে নদীর পথটী দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে বড়ই উত্তম হয়, আপনারা সংখ্যায় পাঁচজন আছেন।"

অবন্তী সাগরিকা, ভদ্রা প্রভৃতিকে বলিলেন—"ইনি যাঁহার কথা বলিলেন এবং যে স্থানের কথা উল্লেখ করিলেন সেইস্থানে যাইয়া তাঁহাকে লইয়া আইস; আমি এঁর সঙ্গে নদীতীরে চলিলাম।"

সাগরিকা বলিল—"একা যাইবে! তাহা হইবে না, আমি—

অবন্তী বলিল—"কোন প্রয়োজন নাই; তোমরা চার জনের কম যাইলে তাঁহাকে আনয়ন করা সুসাধ্য হইবে না—তিনি অসুস্থ।"

ক্ষুণ্ণ স্বরে পথিক বলিল—"আপনারা আমাকে কি এখনও দস্যু মনে করেন?" কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া পুনরায় বলিল—"এই দেখুন, তরবারি এখনি ত্যাগ করিতেছি।" পথিক অতি তুচ্ছভাবে তরবারিটী ভূতলে নিক্ষেপ করিল।

(৪)

নিশীথ নিঝুম রাত্রি। সিপ্রাবক্ষে চন্দ্র বহু খণ্ডে বিরাজিত। বিনীত স্বরে পথিক জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয়, আপনাদের সকলকেই দেখিলাম—তরুণ যুবক ; আপনাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় অসন্তুষ্ট হইবেন না। প্রথামত প্রথমে আমার ও বন্ধুর পরিচয় দিতেছি। আমি তোমর-রাজকুমার বসন্তক এবং আমার সঙ্গী মন্ত্রীকুমার কুমারেন্দ্র।"

কুমারের পরিচয়ে অবন্তীর অন্তর অকারণে পুলকিত হইল ; মৃদু হাস্য করিয়া বলিল—"কুমার, আপনি মহামান্য রাজপুত্র। আপনার পরিচয়ে সকলেই চিনিতে পারিবে; কিন্তু আমাদের আর পরিচয় কি বলুন ? বলিলেই কি আপনি চিনিতে পারিবেন ? আমরা সকলেই সামান্য বংশোদ্ভূত। এস্থান হইতে বহুদূরে আমাদের গরীব পল্লী, সেইখানেই আমাদের বাস। জ্যোৎস্না বড় ভালবাসি, সেই হেতু আজ কয় বন্ধুতে সিপ্রা তটে ভ্রমণ করিতেছিলাম। ভাগ্যক্রমে অদ্য আপনার ন্যায় বহু-বিশ্রুত-কীর্ত্তি রাজকুমারের দর্শনলাভ করিয়া ধন্য হইলাম।"

বসন্তক বলিল—"ও সব ধন্য হওয়া প্রভৃতি কথা ত্যাগ করুন। আপনাকে দেখিয়া অবধি মনে হইতেছে, যেন আপনি আমার কতকালের বন্ধু ; আপনার সঙ্গে যেন কত জীবনের পরিচয় !"

অবন্তীর দেহমন একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল ; সে মৃদু কটাক্ষ করিয়া সহাস্যে বলিল—"সত্য ! কত জীবনের পরিচিত ! কিন্তু কুমার ! আমার ঠিক মনে হইতেছে, এই কিছুক্ষণ অগ্রে আপনার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হইল ; পূর্ব্বে কখনও হয় নাই ও ভবিষ্যতে কখনও হইবার আশাও নাই।"

রাজকুমার বসন্তক বলিল—"কেন সখা, দেখা হইবে না ; বলুন, কবে আপনি এদিকে আসিবেন, আমিও ঠিক সেইদিন এইস্থানে আপনার জন্য অপেক্ষা করিব। আপনাকে যে কি ভাল লাগিয়াছে তাহা প্রকাশে অক্ষম।" সরল হাস্য করিয়া অবন্তী বলিল—"সত্য ! আপনার অন্যান্য বন্ধু বা স্ত্রীর অপেক্ষা—"

বসন্তক বলিল—"আমি অবিবাহিত ; যাক্, আপনি বলিতেছিলেন, চন্দ্রিমা-রাতে প্রায় এদিকে আসিয়া থাকেন, যদি আগামী পূর্ণিমায় আমি এইস্থানে আসি, তাহা হইলে কি আপনার পুনরায় দেখা পাইব ?"

অবন্তী বলিল—"খুব সম্ভব। কিন্তু আর বিলম্ব করিব না ; বিলম্বে বন্ধুরা আমার জন্য বিশেষ চিন্তাগ্রস্ত হইবেন—তাহারা আমাকে অত্যধিক ভালবাসে কি না।"

(৫)

রাত্রি দ্বিপ্রহর। মহাকালের আরতি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। সকলের অলক্ষ্যে অবন্তী ও সখীগণ গুপ্তদ্বার দিয়া প্রচ্ছন্নভাবে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অন্তরের ভাব গোপনপূর্ব্বক উৎসবের মধ্যে আপনাদের নিমগ্ন করিল।

উৎসব শেষে সকলেই নির্দ্দিষ্ট শয়ন কক্ষে আসিয়া অবিলম্বে গভীর নিদ্রাবিষ্ট হইল। নিদ্রা আসিল না মাত্র রাজকুমারীর চক্ষে ; ক্ষণদৃষ্ট কুসুমায়ুধ সদৃশ একটী অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় সুন্দর মূর্ত্তির প্রতিচ্ছায়া তাহার মানসচক্ষে ভাসমান হইয়া তাহার ক্ষুদ্র কুমারী বক্ষ আলোড়িত করিতে লাগিল।

(৬)

গজদন্ত আসনে উপবিষ্ট রাজকুমার বসন্তক পার্শ্বস্থিত কুমারেন্দ্রকে বলিল—"সখা, রাত্রের অকস্মাৎ সেই তরুণ যুবকটীকে বড়ই ভালবাসিয়াছি। যুবকটী স্বীয় পরিচয় দেয় নাই ; বলিল, নিকটেই কোন গ্রামে বাস করে, কোন্ রাজার রাজ্যে, কি নাম বা তাহাদের গ্রামের, তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই, তবুও তাহাকে দেখিলে মনে

হয় নিশ্চয় কোন সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত অপূর্ব্ব চঞ্চল যুবক! তাহা না হইলে চন্দ্রিমা রাত্রে গভীর পার্ব্বত্য অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করে! আগামী পূর্ণিমায় উহাদের সহিত ঐ স্থানে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।

কুমারেন্দ্র বিশেষ বিস্মিত হইয়া বলিল—"সে কি কুমার! সেই যুবকটী কি ঐরূপ পরিচয় দিয়াছে? কি আশ্চর্য্য! আমাকে যাহারা শুশ্রূষা করিয়াছিল, তাহারা বলিল সকলেই ভ্রমণকারী; বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে এইস্থানে আসিয়াছে। কচ্ছ সাগরতীরে তাহাদের বাস এবং তাঁহাদের পাঁচজনই একগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ।"

কুমারেন্দ্রের কথায় বসন্তক বিস্মিত ও অকারণ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল—"কি আশ্চর্য্য! তাহাদের এই অহেতুক প্রবঞ্চনায় কি স্বার্থ থাকিতে পারে?"

দুই বন্ধু অন্তরে অন্তরে বিশেষ কৌতূহলের উদ্বেগ লইয়া পূর্ণিমার অপেক্ষা করিতে লাগিল।

(৭)

রাজকুমারী অবন্তীর অক্ষতচিত্তে বসন্তকের একটী গভীর অঙ্কপাত হইয়াছিল; তাহা সকলেরই অলক্ষ্যে, এমন কি অবন্তীরও। গভীর আগ্রহের সহিত পূর্ণিমার অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কালের গতি অতি ধীর হয়, যখন কোন একটী বিশেষ দিনের অপেক্ষায় আগ্রহান্বিত প্রাণ উন্মুখ হইয়া থাকে। পূর্ণিমা নিকটবর্ত্তী। কিন্তু কি উপায়ে সর্ব্বজন অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতে বসন্তকের সহিত দেখা করা সম্ভব হইবে, সেই ভাবনায় অবন্তীর প্রাণ আকুল হইল। রাজকুমারী স্বভাবতঃ অত্যধিক ভাব সংযমী; বক্ষের মধ্যে যে আলোড়ন, যে উদ্দাম নৃত্য চলিতেছিল, সে সংবাদ কাহাকেও ঘুণাক্ষরে জানিতে দিল না। কিন্তু সাগরিকাকে জানাইতেই হইবে; নহিলে পুনরায় বসন্তকের দর্শন পাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। গুপ্তপথ মাত্র একদিনের গমনাগমনে ভালরূপ চিনিতে পারগ হয় নাই, সেই হেতু সাগরিকার সাহায্য একান্ত আবশ্যক।

(৮)

পূর্ণিমার দিন প্রাতে বহুবিধ পূজা-উপচার লইয়া রাজকুমারী সুসজ্জিত শিবিকা করিয়া কতিপয় ক্লীব দেহরক্ষী সমভিব্যাহারে মন্দিরে আগমন করিল। রাজ পুরোহিত ভাবিলেন—রাজকন্যা কেবলমাত্র পূজার্থ আসিয়াছে। ইহাতে তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। অবন্তী অতি গোপনে সাগরিকাকে স্বীয় মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করিল; বলিল—"শুধু প্রতিজ্ঞা পালনার্থ যাইব, অন্য কোন হেতু নাই।"

সাগরিকা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—"এ ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা পালন করিবার বিশেষ কারণ দেখিতে পাইতেছি না!" কিন্তু রাজকুমারীর অশ্রু-করুণ বদন দেখিয়া তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য স্বীকৃত হইতে হইল।

(৯)

বসন্তক পূর্ব্বেই সেইস্থানে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু কুমারেন্দ্র প্রথম হইতেই যুবকদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছিল, সেই হেতু তাহাদের গতিবিধি জ্ঞাত হইবার জন্য প্রচ্ছন্নভাবে অদূরে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল।

বসন্তক অবন্তীকে দেখিয়া বলিল—সখা, আমার অশেষ সৌভাগ্য যে আমার কথা আপনার ঠিক মনে আছে।"

অবন্তী কহিল, "সৌভাগ্য, আপনার না আমার? আপনার কথা আমার আদৌ মনে ছিল না, আমার এই সখাটী আজ আমায় স্মরণ করাইয়া দিল।"

কুমার সাগরিকাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল। বহুক্ষণ মিলনের পর বসন্তক বিদায় লইবার জন্য অবন্তীর হস্ত ধারণ করিল। অবন্তী চমকিয়া উঠিল; তাহার হৃদয়-তন্ত্রীতে

বিপুল আলোড়ন সূচিত হইল। কি এক অভূতপূর্ব্ব ভাবাবেশে সারা অন্তর শিহরিয়া উঠিল; এই ক্ষণিক স্পর্শ তাহার স্নায়ুতে স্নায়ুতে শিরায় শিরায় রোমাঞ্চ সৃষ্টি করিয়া ক্ষুদ্র বক্ষে যেন সপ্ত সমুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিল। বহুকষ্টে সংযত হইয়া অবন্তী বলিলেন,—"কুমার চলিলাম। কবে আবার দেখা হইবে জানি না তবে আজ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে যে কোন একদিন এই বিকসিত কুসুমিত রক্তাশোকতলে শিলাখণ্ডের নিম্নে একটি পত্র পাইবেন। আজ বিদায়।"

কুমার চলিয়া যাইলে অবন্তী সাগরিকাসহ গুপ্তদ্বার দিয়া অচলগড়ের মধ্যে প্রণয়-পীড়িত গুরুহৃদয় লইয়া প্রবেশ করিলেন। অলক্ষ্যে এক ব্যক্তি তাহাদের অনুসরণ করিতেছিল, তাহা কেহ জানিতে পারিল না।

(১০)

চিরশত্রু তোমর-রাজ, মন্ত্রীপুত্রের নিকট গুপ্তদ্বার জ্ঞাত হইয়া যুদ্ধ আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিশোর রাজকুমার এ বিষয় আদৌ জ্ঞাত হইল না।

বসন্তক এই অপূর্ব্ব যুবকটীর বিষয় অধিক জ্ঞাত হইবার জন্ম বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। সপ্তাহকাল পরে নির্দ্দিষ্ট শিলাখণ্ডের নিম্নে একটী রৌপ্যাধারের মধ্যে সুরক্ষিত পত্র পাইয়া বসন্তক চমৎকৃত হইলেন। পত্রটি পড়িতে লাগিলেন:—

"মহাভট্টারক কুমার সমীপেষু—

প্রথম দর্শনে আপনি আমার পরিচয় জানিতে চাহিয়াছিলেন, তখন আপনাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছিলাম। আমার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিলে আপনার চক্ষুকেও বোধ হয় বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। আমি অচলগড় অধিপতি ত্রিবিক্রমদেবের কন্যা; আমার নাম অবন্তী এবং আমার সঙ্গীরা কেহই যুবক নহে, তাহারা আমার সখী। প্রবঞ্চনার জন্ম মিনতিভাবে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; ক্ষমা করিতে পারিবেন কি না যদি এই পত্রের উত্তর দেন, তাহা হইলে তাহাতে লিখিবেন। যদি উত্তর দেন, তাহা হইলে আমার এই পত্র যে স্থানে ছিল, সেই স্থানে তিনদিনের মধ্যে রাখিবেন, তাহা হইলে আমি পাইব। এ বিষয় কাহাকেও জানাইবেন না। ইতি,

রাজকুমারী অবন্তী। অচলনগর।"

(১১)

পত্র পাঠে বসন্তকের সারা-দেহে অমৃতের তরঙ্গ প্রবাহিত হইল; একবার দুইবার করিয়া বহু বার পত্রখানি পাঠ করিলেন। তাহার মনে হইল, যেন একথা তাহার অন্তরাত্মা বহুপূর্ব্বে প্রথম দর্শনেই বুঝিতে পারিয়া ঐ অদৃষ্ট-পূর্ব্বার পদে নিজেকে বিক্রীত করিয়াছে। এমন সৌন্দর্য্য কখন চক্ষে পড়ে নাই; জীবিতেও নহে, চিত্রেও নহে, কল্পনায়ও নহে! এ অনুপম মূর্ত্তি হৃদয়মধ্যে প্রথম দর্শনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে! চক্ষুকে প্রবঞ্চনা করা সহজ, কিন্তু মনের গতি সূক্ষ্ম তাহাকে প্রবঞ্চনা চলে না, তাহা না হইলে প্রথম দর্শনে অকারণ মেঘোদয়ে শিখীর মত আমার মন পুলকে ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া উন্মাদ নৃত্য করিত না। তাহা না হইলে সামান্ত একটী সুশ্রী যুবকের মূর্ত্তি সন্ধ্যা-সমীরণ-কম্পিতা লতার ন্যায় স্মৃতি মধ্যে কম্পিত হইত না, শিরে শিরে শোণিতে শোণিতে এই অনুরাগ বিচরণ করিত না! নিদাঘ সন্তপ্ত পর্ব্বত যেমন বর্ষার বারিধারা পাইয়া শীতল হয়, তেমন আমার প্রাণ সেই প্রথম দর্শনেই শীতল হইত না!

রাজকুমার বসন্তক উন্মাদের ন্যায় শিলাখণ্ডের নিকট ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা অনুভব করিলেন, সূর্য্যদেব বহুক্ষণ অস্ত গিয়া পৃথিবী অন্ধকারাবৃত হইয়াছে। ত্বরিৎ পদে অশ্বপৃষ্ঠে তিনি আরোহণ করিলেন। সহসা স্মরণ হইল দ্বিপ্রহরে তিনি এই স্থানে আসিয়াছিলেন।

(১২)

প্রেম সমুদ্রমুখী নদীর ন্যায়; যত প্রবাহিত হয়, তত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। চতুর্থ দিনে প্রিয় সখী

সাগরিকা আনীত পত্রের উত্তর পাইয়া অবন্তী আনন্দে অধীরা হইয়া হস্ত হইতে সুবর্ণ বলয় উন্মোচন করিয়া উপহার করিতে যাইলেন।

সখী সাগরিকা তাহা গ্রহণ করিল না। বিরহ সন্তপ্তা অবন্তীকে কিঞ্চিৎ সমাশ্বস্ত করিয়া বলিলেন "অবন্তী, এখনও প্রত্যাবর্ত্তন কর, তুমি জান না, তোমর-রাজ তোমাদের বংশের চির-শত্রু; মহারাজ যদি ইহার বিন্দুমাত্র জানিতে পারেন, তাহা হইলে তোমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বা নির্ব্বাসন -"

বাধা দিয়া অবন্তী উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "সখী রাজা যদি আমাকে নির্ব্বাসন দেন, তাহা হইলে যেন সেই রক্তাশোকতলে সিপ্রাতীরেই দেন।"

অবন্তীর সরল হাস্য সাগরিকার গম্ভীর বদনে কোন ভাবান্তর আনিতে পারিল না। সাগরিকা বলিল, "সখি এখনো চেষ্টা কর হয় ত একদিন ভুলিতে পারিবে। যে কাল মাতৃবক্ষ হইতে সন্তান শোক আরোগ্য করে, সেই কালপ্রবাহে এই প্রেম বিলুপ্ত হইতে পারে।"

অবন্তী বলিল "সখী যে মূর্ত্তি ক্ষণদৃষ্টে হৃদয় মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহাকে উন্মূলিত করিতে হইলে মূলাধার হৃদয়ও উন্মূলিত করিতে হইবে।"

সাগরিকা বিশেষ অনুতপ্তস্বরে বলিল— "রাজকুমারী ক্ষণিক সুখ যে স্থানে চির-দুঃখের পূর্ব্বাভাস, ক্ষণিক মিলন যে স্থানে আশু বিয়োগে পরিণত হয়, বিসর্জ্জন যে স্থানে প্রতিষ্ঠার পার্শ্বে অবস্থিত, সেই স্থানে সেই সুখ, সেই মিলন, সেই প্রতিষ্ঠানকে ত্যাগ করাই শ্রেয় নহে কি?"

অবন্তী চিত্রার্পিতের ন্যায় উপবিষ্টা; মুখ হইতে বাক্য স্ফুরিত হইল না। সাগরিকা চলিয়া যাইলে অবন্তী ধীরে ধীরে রৌপ্যাধারটী খুলিয়া পত্রটী বাহির করিয়া কম্পিত বক্ষে পাঠ করিতে লাগিলেন:—

"অচলগড়ের মহিমান্বিতা রাজকুমারী—

তুমি আমার চক্ষুকে প্রবঞ্চিত করিয়াছিলে, কিন্তু আমার অন্তরাত্মা তোমাকে প্রথম দর্শনেই চিনিতে পারিয়া তোমার পদতলে আত্মবিক্রয় করিয়াছিল। অন্তরাত্মার দৃষ্টি বাহ্যিক চক্ষুর দৃষ্টি অপেক্ষা বড় সূক্ষ্ম, হে দেবী! তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার হৃদয়ে সহস্র বাসনার উদয় হইয়াছে! আমার মনে হয়, আমার হৃদয়ের আকুল ক্রন্দন তোমার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, মনে হয় তোমার প্রসন্নানত দৃষ্টিতে তোমার মৌন সম্মতি পাইয়াছি। আমার হৃদয়ে যে প্রবল ঝঞ্ঝা বহিতেছে, তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। ভাব যেখানে পরিপূর্ণ, ভাষা সেখানে মূক। চন্দ্রদর্শন-ব্যগ্র সাগরের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে, হর্ষ ভয়, লজ্জার বিসর্জ্জন দিয়া কম্পিত উন্মুক্ত হৃদয় লইয়া অতি করুণভাবে তোমার কৃপা ভিক্ষা করিতেছি! দেবী আমার! হে দেব নির্ম্মাল্য! তোমার পারিজাত-পল্লব-সদৃশ হস্ত লতাটী কি দীন অযোগ্য ভিখারীর পক্ষে বামনের চন্দ্র প্রাপ্তির তুল্য অসম্ভব? আগামী পূর্ণিমাতিথিতে সিপ্রা নদীতটে এ দীন তোমার অপেক্ষা করিবে; সাক্ষাৎ পাইবে কি?

তোমার কৃপাকণা-প্রার্থী

বসন্তক সেন।

অবন্তী পত্র লইয়া উন্মাদের মত একবার ওষ্ঠে একবার বক্ষে চাপিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ সংযত হইয়া আগামী পূর্ণিমার কত দিন বিলম্ব আছে জানিবার জন্য ব্যগ্রভাবে প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করিলেন।

(৬৩)

পরবর্ত্তী পূর্ণিমার রাত্রে সিপ্রানদীতটে সেই রক্তাশোকতলে দুইটী তরুণ বক্ষের নিবিড় মিলন হইল।

সাগরিকা জানিতে পারিল না। রাজকুমারী

ইতিমধ্যে গুপ্তপথের সন্ধান ভালরূপ জ্ঞাত হইয়া ছিলেন।

অচলগড়ের অধিবাসী নরনারী উৎসবে আত্মহারা। শিশু রাজকুমার ভাস্কর দেবের পঞ্চম জন্মতিথি। প্রতি গৃহ, প্রতি রাজপথ সুমধুর গীতরব ও আনন্দ উল্লাসে ব্যপ্ত। অকস্মাৎ একটী নিদারুণ বার্ত্তায় দেশবাসী ভীত স্তম্ভিত কম্পমান হইল। গুপ্তদ্বার দিয়া প্রায় এক সহস্র শত্রু সৈন্য আসিয়া দুর্গ অবরোধ করিয়াছে—সংহারের ভৈরব নিনাদে অচলগড়ের চতুর্দ্দিক ধ্বনিত হইতে লাগিল।

অকস্মাৎ আক্রমণে অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ রাজা ত্রিবিক্রম অশিক্ষিত সৈন্য লইয়া পরাজিত হইলেন। হীনবল ত্রিবিক্রমের যুদ্ধে স্পর্দ্ধা দেখিয়া ক্রোধান্ধ তোমর-রাজ রুদ্রদেব প্রতিজ্ঞা করিলেন—যদি অবিলম্বে ত্রিবিক্রম সৈন্য ক্ষয় না করিয়া যুদ্ধ স্থগিত এবং পরাজয় স্বীকার না করে তাহা হইলে যুদ্ধ শেষের অবিলম্বে প্রমর-বংশের উচ্ছেদ সাধন করিবেন। অসমসাহসিক রাজা ত্রিবিক্রমের বীর প্রাণ এই ভয় প্রদর্শনে ভীত হইল না; তিনি যথা-সাধ্য যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

(৯৪)

প্রমর-রাজবংশের শেষ বংশধর শিশু ভাস্কর পর্য্যন্ত নরপিশাচ রুদ্রদেবের হস্তে নিহত! অবশিষ্ট বৃদ্ধ রাজার এবং কন্যা অবন্তীর একপক্ষ পরে প্রকাশ্য রাজসভায় বিচার হইবে।

মধ্যরাত্র; গভীর নিস্তব্ধ বিস্তৃত প্রান্তর। প্রান্তর মধ্যস্থিত কারাগৃহের একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় ত্রিবিক্রম জলদস্বরে ডাকিলেন "অবন্তী!"

পার্শ্বস্থিতা রাজকুমারী উত্তর দিল—"পিতা!"

"অবন্তী এর প্রতিশোধ চাই! কাল সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণবায়ু আকাশে মিলিত হইবে; তাহার পূর্ব্বে একটী কঠিন প্রতিজ্ঞা তোমাকে করিতে হইবে, ধীর, স্থির, সংযত হ'য়ে শ্রবণ কর, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা চাই-ই! বহুকাল পর্য্যন্ত আমার পুত্র ছিল না, তোমাকেই পুত্রের মত সর্ব্বতোভাবে শিক্ষা দিয়াছি; রণবিদ্যা, রাজনীতি কিছুই তোমার অজ্ঞাত রাখি নাই, আজ সেই শিক্ষার পরীক্ষার সময় আসিয়াছে। অবিচলিত চিত্তে শ্রবণ কর, তোমর-রাজ ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা উপেন্দ্রদেবের বহু গৌরবা-ন্বিত বংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে, আমার প্রিয় অচলগড় ধ্বংস করিয়াছে! এই স্থানের নাম পূর্ব্বে অচলগড় ছিল না। আবু পর্ব্বতের নিকট হইতে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ উপেন্দ্রদেব এই স্থানে আসিয়া প্রমর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠান করেন। তাঁহার পুত্র এই স্থানকে অচলগড় নামে অভিহিত করেন। সেই পূর্ব্ব গৌরবান্বিত স্মৃতি-জড়িত অচলগড়ের ও সেই ইতিহাস-বিখ্যাত প্রমর বংশের লোপকারীর প্রতিশোধ চাই। সর্ব্বাপেক্ষা নিদারুণ তোমর-রাজ নরপিশাচ রুদ্রদেব আমার শিশুপুত্র হত্যা করিয়াছে, আমি অক্ষম, তোমাকে ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে! তোমার সুযোগ আসিবে, গুপ্তচর মুখে অবগত হইলাম রুদ্রদেব কেবলমাত্র তোমাকে জীবিত রাখিবেন, তাহার পুত্রের ইচ্ছা তোমাকে বিবাহ করা সেই জন্য তোমাকে হত্যা করিবে না। ভালই হইয়াছে; তুমি ইহাতে তোমার কার্য্য-সিদ্ধির অশেষ সুবিধা পাইবে। প্রকাশ্যে বিবাহের অনিচ্ছা জানাইবে না, অন্তরে অন্তরে প্রতি-হিংসাকে জলন্ত রাখিবে, ছলে, বলে বা যে কোন কৌশলে সুযোগ-মুহূর্ত্তে ঐ প্রতিহিংসা সাধন করিতে হইবে—বল কন্যা, প্রতিজ্ঞা কর?"

অবন্তী ধীর শান্তস্বরে বলিল "পিতা কি করিতে হইবে আদেশ করুন, নিশ্চয় করিব।"

"তবে শ্রবণ কর, আমার বংশের উচ্ছেদকারী রুদ্রদেবের ও তাহার একমাত্র পুত্র সন্তান বসন্তকের প্রাণ লইতে হইবে, সে যে কোন উপায়ে হউক না কেন!"

অবন্তীর সম্মুখে যেন সহস্র বজ্রপাত হইল; সে কম্পিতস্বরে বলিল —"পিতা—"

"কোন বাক্য নহে, বল প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিবে কি না ?" 'বসন্তক যে —"

রূঢ়স্বরে ত্রিবিক্রম বলিলেন "কি, বসন্তক কি আবার ? অধিক বাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি না। বল পারিবে কি না। তোমাকে তোমার জন্মাবধি যাহা শিক্ষা দিয়াছি, তাহার প্রতিদান দিতে ইচ্ছা কর কি না ? আমি অন্য বাক্য চাই না আমি প্রতিহিংসা চাই ; বল, "পিতা আমি স্বহস্তে রুদ্রদেব ও তাঁহার পুত্র বসন্তকে হত্যা করিব"-বল, আর সময় নাই, ঐ দেখ পূর্ব্বাকাশ সূর্য্যদেব আলোকিত করিয়াছে, কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আমি চিরদিনের মত এ জগৎ হইতে বিদায় লইব, বল কন্যা আমার, বল—" ত্রিবিক্রমের চক্ষু উন্মাদের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত; স্বর রূঢ়, রুক্ষ ও গম্ভীর।

"পিতা ! বসন্তক নিরপরাধ !"

অত্যধিক মর্ম্মভেদী রূঢ়স্বরে ত্রিবিক্রম বলিলেন "আর ভাস্কর শিশু ভাস্কর আমার, তোমর-রাজসমীপে অশেষ অপরাধ করিয়াছিল, না ? বুঝিয়াছি ! যাও, বংশ উচ্ছেদকারী, স্বাধীনতা-হরণকারী, নরপিশাচ পুত্রের মহিষী হও গে, আমি তোমার মত কুলাঙ্গার কন্যার মুখ দর্শন করিতে চাই না— ভাস্কর আমার, পুত্র আমার ! আজ তুমি যদি জীবিত থাকিতে পিতাকে প্রতিহিংসার হাত হইতে উদ্ধার করতে ! শিশু তুমি,তথাপি প্রতিজ্ঞা করিতে ! উঃ ! বিধাতা,তোমার কি বিচিত্র সৃষ্টি এই নারী—"

"পিতা আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি।" দৃঢ় সংযত অকম্পিত স্বর অবন্তীর কণ্ঠ হইতে অন্ধবেগে বাহির হইল।

আকাশস্পর্শী অগ্নিশিখার উপর কে যেন বারি প্রদান করিল।

ঊষার আলোকে কারাগারের লৌহ কপাট উন্মুক্ত করিয়া দুইটী সুসজ্জিত রাজকর্ম্মচারী প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিল।

(৯৫)

রাজ্য সুশৃঙ্খলতাবেই চলিতেছে। বৃদ্ধ রাজা ত্রিবিক্রমের শূল হইবার পর রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা গিয়াছিল, এখন তাহা রুদ্রদেবের সুশাসনে দমিত হইয়াছে।

আত্মীয়-স্বজনহীনা অবন্তী প্রাসাদে আনীত হইয়াছে এবং বিশেষ সম্মানে ও যত্নে রাজপরিবার মধ্যেই অবস্থান করিতেছে। কুমার বসন্তকের একান্ত ইচ্ছায় শীঘ্রই বিবাহ হইবে; রাজ্যে এ সংবাদটী কাহার অজানিত নাই। উৎসবের সুর অস্পষ্টভাবে ধ্বনিত হইতেছে, অকস্মাৎ রাজ অন্তঃপুরে রাজা রুদ্রদেবের বিষপানে মৃত্যু সংঘটিত, হইল। সতর্ক প্রহরী বেষ্টিত ও বিশস্ত কর্ম্মচারী পূর্ণ রাজঅন্তঃপুরে কে কোন প্রকারে রাজা রুদ্রদেবের পানীয়তে বিষ প্রয়োগ করিতে পারে, তাহা কেহই নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। সন্দেহপূর্ব্বক নবনিযুক্ত প্রহরীদের প্রাণদণ্ড হইল।

(৯৬)

কয়েক মাস অতীত হইয়াছে। অচলগড় পুনরায় উৎসব-সাজে সজ্জিত, আনন্দ-কল্লোলে চারিদিক মুখরিত। আগামী বৈশাখ মাসের প্রারম্ভে রাজকুমার বসন্তকের শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইবে। চিরন্তন প্রথায় এবারও বাসন্তী পূর্ণিমায় মহাকাল-দেবের মন্দিরে উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। রাজ-কুমারী সখীগণসহ মন্দিরে আসিয়াছেন; তরুণ রাজ বসন্তকও আসিয়াছেন।

অবন্তী রাজপ্রাসাদে বাসকালীন বসন্তকের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করিত না, বসন্তকও ইহাতে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইত না। অবিলম্বে যাহাকে লাভ করা সম্ভব, তাহার জন্য কি ব্যস্ততার কারণ থাকিতে পারে !

(৩৭)

নীরব সন্ধ্যা। মন্দির পার্শ্বস্থ উদ্যান মধ্যে একটী শিলাখণ্ডের উপর উপবিষ্ট হইয়া বসন্তক প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন এমন সময় একটী বীর বেশধারী যুবক আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল "মহারাজ! এ গরীব বন্ধুটীকে চিনিতে পারেন?"

বসন্তকের চিনিতে বিলম্ব হইল না; বলিলেন "কে অবন্তী! কি সুন্দর তোমায় মানাইয়াছে, প্রথম দিন তোমাকে—"

অবন্তী ইসারা করিয়া বলিল 'চুপ'! ক্ষণিক পরে অস্ফুটস্বরে বলিল "এস আমার সঙ্গে সেই সিপ্রার তটে, যেখানে আমাদের প্রথম মিলন হইয়াছিল; মনে পড়ে ঠিক এমনি দিনে?"

বসন্তক বলিলেন "খুব—চল, কিন্তু কাহাকেও কি সঙ্গে লইব না?"

অবন্তী "ছি! তা কি হয়, এখনও আমাদের বিবাহ হয় নাই, অন্যে দেখিলে কি ভাবিবে? কাহাকেও লইবার প্রয়োজন নাই; এই দেখিতেছ, আমার হস্তে কি?" বলিয়া অবন্তী হস্তস্থিত তীরধনুক দেখাইল।

* * * *

"বন্ধু! কুমার!"

"প্রিয়তমে—"

"চুপ! আমি একজন বীর যুবা, আমি তোমার প্রিয়তমে হইব কেন? বন্ধু!"

"আদেশ কর।" অবন্তী স্নিগ্ধ সরল হাস্য করিয়া বলিল "আদেশ করিব কি প্রকারে! তুমি, না-না—আপনি প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা, আর আমি একজন সামান্য নগন্য আর কত কি—"

বসন্তক বলিল "না, না, তুমি বনদেবী, তুমি বসন্তের সহচরী, তুমি পুষ্পরাণী!"

যৌবন-পুষ্পিত দেহখানি লীলায়িত করিয়া কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত অবন্তী বলিল "আমি বনদেবী, কেমন! তাহা হইলে এটা আমার রাজ্য, এখানে যে আসিবে, তাহাকে আমার আদেশ মানিতে হইবে।"

"প্রিয়তমে, তোমার আদেশ সর্ব্বসময়েই শিরোধার্য্য।"

"আবার প্রিয়তমে! রাণীর সহিত কথা কহিতে জান না? অশিষ্টতার জন্য তোমার প্রাণদণ্ড।"

"প্রাণ তো নিয়েছ প্রিয়—"

"চুপ, আবার অশিষ্টতা, তোমাকে ক্ষমা করতে পারিলাম না। 'প্রাণদণ্ড' দাঁড়াও সোজা হইয়া—"

একটা কথা—"

"চুপ, আগে প্রাণদণ্ড হোক, তারপর কথা হইবে। এখন চুপ করিয়া সোজা হইয়া শান্ত বালকের ন্যায় আমার দিকে চাহিয়া দাঁড়াও। আচ্ছা, বেশ দাঁড়াইয়াছ, এই দেখ, আমি তোমায় লক্ষ্য করিয়া তীর সন্ধান করি।"

সংযতভাবে দণ্ডায়মান বসন্তক বুঝিল যে, এ কেবল সরল-প্রাণা কিশোরীর প্রেমলীলা—স্বচ্ছ হৃদয়ের অনাবৃত প্রকাশ। অবন্তী চিন্তা করিল, প্রতিজ্ঞা-পালনের এই সুবর্ণ সুযোগ; প্রতিজ্ঞা পালন করিতেই হইবে! তাহাতে যদি স্বীয় হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিতে হয়, তাহা হইলেও। স্বর্গগত পিতাকে মনে মনে স্মরণ করিয়া বসন্তকের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া বিষাক্ত তীর সন্ধান করিল। অব্যর্থ সন্ধান! মুহূর্ত্তমধ্যে বসন্তকের সংজ্ঞাহীন দেহ ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল, মর্ম্মান্তিক দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৃত্যু-কাতর বসন্তক ডাকিল "অবন্তী!"

* * * *

নির্জ্জন নিস্তব্ধ গভীর নিশীথ-রাত্রে, বাসন্তী-পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-প্লাবিত সীপ্রাতটে একটি কুসুমিত রক্তাশোক বৃক্ষতলে, অনুসন্ধানকারী রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক নিবিড় আলিঙ্গন-বদ্ধ দুইটি মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইল।

যোগসূ

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ, বি-এ



রূপ ও স্বাস্থ্য এই দুই বস্তু যদি গুণ হয়, তা'হ'লে দীনেশ গুণী। আর এই দুইটা লইয়া সে অহঙ্কারও করিত প্রচুর। কিন্তু বিদ্যা এবং অনুরূপ কর্ম্মশক্তি তার ছিল না; আর না থাকাতে দীনেশের বিশেষ ভাবনা-চিন্তাও ছিল না। দিব্য আরামে সে তার সুন্দর দেহ এবং পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া এই ষোলটা বৎসর কাটাইয়া দিয়া, কিছুদিন হইতে একটা নূতন ধরণের ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িয়াছে। ব্যাপারটা যে এমন সঙীন অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে, সে ধারণা তাহার মত বালকের থাকিবার কথা নয়; ছিলও না। বিশেষতঃ, ইতিপূর্ব্বে প্রণয়ঘটিত কোন কিছুই সে বোধ করি বুঝিতেও পারিত না। অবশ্য যে দিনকাল, তাহাতে দীনেশের মত ছেলেরা রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি গুরু-গম্ভীর বিষয়ের এককথায় মীমাংসা করিতেও ছাড়ে না। সে হিসাবে নর ও নারীর মধ্যে "চিরন্তন কিছুর" সন্ধান না পাওয়া তাহার অতি-বড় অক্ষমতা। সুতরাং দীনেশ এই দিক দিয়াও গুণহীন। কিন্তু কা'ধর্ম্মবশে অকস্মাৎ বিদ্যুৎকে দেখিয়া তার কিশোর-মনের সবুজ পরদায়, কোথা হইতে কে যেন সোণালী রঙের তুলি টানিয়া নিতান্ত অজ্ঞাত এক মধুর-লোকের ছবি আঁকিয়া দিল। দীনেশ প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝিয়া লইল, এই বিদ্যুৎটাকে তার চাই। মেয়েটির গায়ের রং, মুখের শোভা, অঙ্গ-সৌষ্ঠব এবং সর্ব্বোপরি অপর্য্যাপ্ত যৌবন-শ্রী দীনেশের মনটাকে এমন প্রচণ্ডবলে আক্রমণ করিয়া বসিল যে, বিদ্যুৎকে পাইবার জন্য সে ক্ষেপিয়া গেল।

বিদ্যা সকলের থাকে না—তাই বলিয়া বুদ্ধি যে থাকিবে না, এমন কোন কথা নাই। দীনেশেরও বুদ্ধি জিনিষটার অভাব ছিল না। সে দেখিল, বিদ্যুতের বাবা রায়-সাহেব যে শ্রেণীর লোক, তাহাতে একমাত্র দেহ-সম্পদের জোরে তাহাকে বাগ মানাইতে পারা যাইবে না। তাঁহাকে বাগ মানাইতে হইলে আরও দুইটী জিনিস চাই। একটী বিদ্যা আর একটী অর্থ। এই দুইটীর একটীও তার বর্ত্তমানে প্রচুর নাই। বিদ্যা অবশ্য চেষ্টা করিলে সে অর্জ্জন করিতে পারিবে; কিন্তু অর্থ? দীনেশের মা' আছে, তাহাতে খাওয়া-পরা সচ্ছলে চলিলেও, ওই টাকার কুমীর রায়-সাহেবকে বশ করা চলিবে না। সুতরাং কর্ত্তব্য কি ভাবিতে যাইয়া দেখিল, প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য রায়-পরিবারের সহিত পরিচিত হওয়া. তারপর ক্রমে আর সব। দীনেশ পরিচয়ের চেষ্টায় নিযুক্ত হইল। কিন্তু মাসাবধি নানা উপায় ভাবিয়া কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু পরিচয় না করিতে পারিলেও আর তার চলে না। এমনই সময় একদিন নিতান্ত অভাবনীয় উপায়ে তার আকাঙ্ক্ষিত পরিচয় ঘটিয়া গেল। কি উপলক্ষে যেন সেদিন স্কুল না থাকায় দীনেশ মধ্যাহ্নে নিদ্রার উদ্যোগ করিতেছিল, হঠাৎ রায়-সাহেবের বাড়ী হইতে একটা গোলমাল উঠিল।

দীনেশ ছুটিয়া বাহির হইয়া দেখিল, রায়-সাহেবের বাড়ীর ফটকে দাঁড়াইয়া একটা লোক খুব বীরত্ব প্রকাশ করিতেছে; আর কিছু দূরে সে বাড়ীর ভৃত্যবর্গ দাঁড়াইয়া অযথা চীৎকার করিতেছে। কিন্তু, সাহস করিয়া যে লোকটাকে ধরিবে, এমন শক্তি কাহারও নাই। উপরে জানালায় মুখ বাহির করিয়া রায়-সাহেব হুঙ্কারে বাহুবল প্রকাশ করিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছেন। আর তাহারই পাশের জানালায় যে মুখখানি দেখা গেল, সে খানি দীনেশ প্রতিমুহূর্ত্তে মানস-নেত্রের সম্মুখে বিচিত্র মধুর মূর্ত্তিতে দেখিতে পায়।

শরীর চর্চ্চার ফলে দেহে তার শক্তি ছিল অসাধারণ; আর শক্তির অনুপাতে সাহস এবং কৌশল এই দুইটীও বড় অল্প ছিল না। সুতরাং, অবিলম্বে অবস্থার একটা মোটামুটী ধারণা করিয়া লইয়া সে এক লম্ফে সেই ব্যক্তির নিকটে যাইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। যাহাকে ধরিল, সেও নিতান্ত দুর্ব্বল ছিল না; আর হাতেও তাহার আত্মরক্ষার উপায়-স্বরূপ একখানি প্রকাণ্ড ছোরা ছিল। কিন্তু, দীনেশের কৌশলে তাহাকে জমি লইতে হইল; আত্মরক্ষার আর অবসর হইল না। ইতিমধ্যে রায়-সাহেবের সাহসী অনুচরের দল আসিয়া তাহার উপর বিক্রম প্রকাশ আরম্ভ করিল। অবশ্য চোর বা অনুরূপ কোন ব্যক্তি যদি ধরা পড়ে, তাহা হইলে তাহার উপর বল প্রকাশ করিতে না চাহে, এমন বীরপুরুষের সন্ধান বড় মিলে না; কিন্তু, যাহারা বাস্তবিক সাহসী এবং শক্তিমান তাহারা এই দীনতা পছন্দ করে না। তাই দীনেশ উহাদিগকে বীরত্ব প্রকাশের অবসর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি, এ লোকটা করেছে কি?"

উত্তরে মহা কলরবে সকলে মিলিয়া সমস্বরে বিস্তর বকিয়া যাহা বলিয়া গেল, তাহার মধ্যে অশ্রাব্য কটূক্তি বাদে যাহা থাকে, তাহা এই যে, লোকটা চোর, সাহেবের কামরা হইতে তাঁহার ঘড়ি এবং ব্যাগ লইয়া পলাইতেছিল।

তখন চোরের উপর বামাল প্রাপ্তির আশায় অত্যাচার সুরু হইয়া গেল এবং লোকটাকে আধ-মরা করিবার পর তাহার নিকট হইতে ঘড়ি মিলিল, কিন্তু ব্যাগ মিলিল না। প্রহারের প্রথম উদ্যমেই যখন অর্দ্ধেক মিলিয়াছে, তখন আর একবার ঐ উপায়ে যে দ্বিতীয়ার্দ্ধ মিলিবে, এ বিষয়ে কাহারও মত বিরোধ নাই; সুতরাং তাহারা আবার প্রহারের উদ্যোগ করিতে যাইতেই দীনেশ বাধা দিল; সঙ্গে সঙ্গে রায়-সাহেব স-কন্যা সেখানে উপস্থিত হইয়া বীরপুরুষদের অমন অপূর্ব্ব বীরত্বে বাধা দিয়া বলিলেন—"দূর হ ব্যাটারা; একটা লোককে পঞ্চাশ জনে মিলে মেরে আর বাহাদুরী দেখাতে হবে না।"

দীনেশের দিকে চাহিয়া রায়-সাহেব বলিলেন —"তোমার সাহস দেখে আমি ভারী খুসী হয়েছি, তুমি ভিতরে এস।"

দীনেশ দেখিল, তার বিদ্যুৎ আজ বড় স্নিগ্ধ কিরণে চমকিতেছে; তাহার সেই প্রখর দীপ্তির চাইতেও এই আলো আরও মধুর। সে একবার মৃতপ্রায় চোরের দিকে চাহিয়া বলিল—"এ লোকটা— ?"

"হাঁ, ওকে পুলিশের হাতে······"বাধা দিয়া বিদ্যুৎ বলিল—"ওকে ছেড়ে দিলে হয় না? যে মার ও পেয়েছে, তা'তে চুরি বিদ্যে নিশ্চয় ভুলে যাবে।"

ভৃত্যের দল 'হাঁ হাঁ' করিয়া উঠিল; কিন্তু রায়-সাহেবের ধমকে চুপ করিয়া গেল। তিনি কহিলেন—"বেটাদের আজ আমি দূর করব। খেয়ে খেয়ে ভুঁড়ি বোগাবে, আর চোর দেখলে আঁৎকে উঠবে। যা বেটারা, আমার সুমুখ থেকে।" ভৃত্যের দল ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া গেল। চোর এতক্ষণ মড়ার মত পড়িয়া ছিল; তাহাকে ফেলিয়া সকলে একটু সরিয়া যাইতেই সে

উঠিয়া দৌড় দিল—দীনেশ তাহাকে ধরিতে যাইতেছিল, রায়-সাহেব নিষেধ করিয়া বলিলেন—"থাক, ওর ওপরে আমার আর কোন রাগ নেই। তুমি এস, একবার ভাল করে তোমায় দেখতে চাই।

দীনেশ যাইবে কি না মুখ নামাইয়া ভাবিতেছিল, হঠাৎ রায়-সাহেব হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া ফটকের মধ্যে আনিলেন। দীনেশ একবার তাঁহার মুখের দিকে, আর একবার তাঁহার কন্যার দিকে চাহিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিল। কিন্তু ভবিষ্যতে যে ইহার ফল কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, সে কথা বুঝিবার মত শক্তি ঐ বালকের ছিল না; থাকিলে বোধ করি অমন হাসিভরা মুখ লইয়া সে এই বাড়ীটায় প্রবেশ করিত না। তবে ভবিষ্যতের অন্ধকার পর্দ্দার পিছনে কি আছে, সেই সমস্ত জানিয়াই যদি লোকে কাজ করিত, তাহা হইলে এ সংসারের অনেক উঠা-পড়া, অনেক সুখ-দুঃখ এবং অধিকাংশ জটিল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইত। দীনেশ চা ও জলযোগে আপ্যায়িত হইয়া এবং রায়-সাহেবের গৃহে যথেচ্ছা গমনের অনুরোধে উৎফুল্ল হইয়া গৃহে ফিরিল।

কিন্তু বাড়ী ফিরিয়াই মহা বিপদ। মা মহা রাগিয়া কহিলেন—"ওই খৃষ্টান বাড়ীতে কি জন্তে যাওয়া হয়েছিল শুনি? তোকে পইপই করে বারণ করেছি না যে, ও বেজাত বিধর্ম্মীর ঘরে কোন দিন যাবি নে।"

দীনেশ ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল। সে জানিত, নিতান্ত আচার-পরায়ণা মা, ওই নব্য-সম্প্রদায়ের অনাচার সহ্য করিতে পারেন না; সুতরাং মায়ের কথার জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকাই মঙ্গল। সে কোন কথা না বলিয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু মা ছাড়িলেন না; তিনি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"কেন গিয়েছিলি ওখানে? ওরা যে খৃষ্টান, ওদের যে ছুঁতে নেই, সে কথাও কি তুমি জান না বুড়ো হাতী।"

"কে বল্লে ওরা খৃষ্টান?" বলিয়া দীনেশ মায়ের দিকে ফিরিয়া চাহিল।

"আমি বলছি খৃষ্টান।"

"তুমি ত সবাইকেই খৃষ্টান বল—ওরা খৃষ্টান হ'তে যাবে কেন?"

"না, ওরা ভাটপাড়ার ভট্‌চাযি; তুমি গিয়ে ওদের সঙ্গে মাখামাখি কর। কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি দীনেশ, আর যদি কোন দিন দেখি ও বাড়ীতে গেছিস্ ত তোর সঙ্গে বোঝা-পড়া হবে।" ইহার পরে যাহা ঘটিল, তাহাতে দীনেশের সমস্ত ওলট-পালট হইয়া গেল; কাপড় কাচিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া খৃষ্টান সংস্পর্শের অশুচিতা দূর করিয়া তবে সে সেদিন নিস্তার পাইল; এবং সেই সঙ্গে রায়-সাহেবের বাড়ী হইতে যে তৃপ্তির আনন্দটুকু বহিয়া আনিয়াছিল, সেইটুকু ধুইয়া মুছিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল। দীনেশ সেদিন রাগ করিয়া যে গৃহকোণ আশ্রয় করিল, বহু সাধ্য-সাধনাতেও কেহ তাহাকে সপ্তাহ মধ্যে সেখান হইতে বাহির করিতে পারিল না। মা কিন্তু ছেলের মতি ফিরিয়াছে দেখিয়া অনেকটা সুস্থ বোধ করিলেন।

দীনেশের মা যে শুচিবায়ুগ্রস্ত এরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। তাঁহাকে ঠেকিয়া এরূপ কঠোর হইতে হইয়াছিল। দীনেশের বাবা ধীরেশবাবু চাকরী লইয়া যেদিন সুদূর পশ্চিমে চলিয়া যান, সেদিন গৃহস্থ তিনটী প্রাণীর বিচ্ছেদ দুঃখে বুক ভাঙ্গিয়া গেলেও মোটা মাহিনার কথাটা ভাবিয়াই তাহারা মন বাঁধিয়াছিলেন। কিন্তু সেই মাহিনার মোটা অঙ্কটা বেশী দিন তাঁহাদিগকে খুসী রাখিতে পারে নাই। ধীরেশ প্রবাসে কোন ধর্ম্মত্যাগী বাঙ্গালীর শিক্ষিতা কন্যার সাহচর্য্যে আসিয়া, দেশ, বাপ মা, পত্নী ও শিশু পুত্রের ভার বোধ করি তাহাদেরই অদৃষ্টের উপর অর্পণ করিয়া

পরম নিশ্চিন্তে তাহাকে বিবাহ করিয়া এখন পর্য্যন্তও সুখে সন্তান-সন্ততি লইয়া কালহরণ করিতেছেন। তারপর বুড়াবুড়ী এপারের কাজ চুকাইয়া অনেক দিন ওপারের পথে যাত্রা করিয়াছেন। ধীরেশের পিতা তাঁর অল্পস্বল্প যা কিছু ছিল, দুঃখিনী পুত্রবধূর নামে লিখিয়া দিয়া এবং যে দুর্জ্জন অনায়াসে এমন অধর্ম্ম করিতে পারে, তাহার সহিত সকল সম্বন্ধ বর্জ্জন করিতে বধূকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া পুত্রের নৃশংসতার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। পাছে দীনেশও পিতারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে, সেই ভয়ে মাতাকে নিয়ত সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়। তাই তিনি এই নব্য-সম্প্রদায়ের সংস্রব হইতে পুত্রকে দূরে রাখিতে এমন সতর্ক।

২

সেদিনের পর মাসখানেক বোধ করি মায়ের উপর রাগ করিয়াই দীনেশ বাড়ীর বাহির হয় নাই। কিন্তু তার মন প্রতিনিয়ত বিদ্যুতের কাছে কাছে ঘুরিয়াছে। তার সেই নির্ম্মম যোগাভ্যাস দেখিয়া মা সেদিন বলিলেন—"হ্যাঁ রে, মাসের মাস দুঃখী মানুষ আমি স্কুলের মাইনে গুনছি কি জন্যে বল্ ত ?" দীনেশ নীরব। এই প্রশ্ন তাহার যেন কাণেই গেল না।

মাতা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"শুনতে পাচ্ছিস্ না—না ? পড়তে যাবি কি না আমি জানতে চাই।"

দীনেশ নিতান্ত নির্লিপ্তের মত উত্তর দিল—"আমার ও সব ভাল লাগে না।"

"তা হ'লে কি ভাল লাগে শুনি ? ষোল বছরের বুড়ো মিনসে আজও পাশ দিতে পারলি নি ; তোর লজ্জা করে না হতভাগা বজ্জাত।"

"তুমি সব সময় অমন গালমন্দ কর কেন বল ত মা ? এ রকম করলে আমি নিশ্চয় কোথাও চলে যাব বলে দিচ্ছি।" সে গোঁজ হইয়া বসিল।

মা অত্যন্ত রাগিয়া বলিলেন—"তা যাবি বই কি। এতদিন আমার খেয়ে আমার পরে গায়ে জোর হয়েছে, চোখ ফুটেছে, এখন আর যাবি নে কেন। বংশের ধারাই ওই ! যা তোর যেখানে খুসী যা।"

দীনেশ দেখিল ব্যাপারটা ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া পড়িতেছে। এ ভাবে চলিলে তার অভিমানের কোন মূল্যই থাকিবে না। সে বলিল—"আচ্ছা আমায় না বকলে কি তোমার একদিনও চলে না মা ?"

মায়ের রাগ ইহাতেও পড়িল না। তিনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"না, একদিনও চলে না। মানুষের মত থাকতে পারিস থাক, নইলে যেখানে খুসী চলে যা। চৌদ্দ বছর এই চলে যাওয়ার দুঃখ সয়ে সয়ে বুকের মাঝখানটা অসাড় হয়ে গেছে—আজ তুই এসেছিস আমাকে চলে যাবার ভয় দেখাতে!" শেষের কথা কয়টা বলিতে যাইয়া এই চির-দুঃখিনী মায়ের চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল। তিনি আর সেখানে দাঁড়াইলেন না; বোধ করি নিজের এই দুর্ব্বলতা ধরা পড়িবার ভয়েই সেখান হইতে সরিয়া গেলেন।

দীনেশ মায়ের কাছে অনেক বকুনি খাইয়াছে, কিন্তু এমন বিচলিত হইতে সে তাঁহাকে কোনদিন দেখে নাই। মা বকিলে সে রাগ করিয়া অভিমান করিয়া অথবা ধমকাইয়া মায়ের রাগ দূর করিয়াছে; কিন্তু কোন দিন মায়ের চোখে জল দেখে নাই। দীনেশের মনটা কেমন যেন একটা অস্বস্তিতে ভরিয়া গেল। চুপ করিয়া এই অবস্থায় তাহার কি করা উচিত তাহাই ভাবিতে লাগিল। সে ভাবিয়া দেখিল, মা এত দিন যে কারণে তাহাকে সময় সময় তিরস্কার করিয়াছেন, তাহার হেতু, আর আজিকার তিরস্কারের কারণ এক নয়। তাহার লেখাপড়া সম্বন্ধে জননীর তিরস্কারের রূপটা যেন বিশেষ কোন কারণে বদলাইয়া গিয়া ভিতরের কোন বিশিষ্ট মনোভাব প্রকাশ পাইবার চেষ্টা করিতেছে। সেই মনো-

ভাবটা যে কি, তাহাও বুঝিতে দীনেশের দেরী হইল না। সে দেখিল, বিদ্যুৎদের বাড়ীতে যেদিন সে প্রথম যায়. সেদিন হইতেই মা যেন কি একটা সন্দেহ, কি একটা আশঙ্কা করিতেছেন ; আর সে আশঙ্কাও যে অমূলক নয়, মনে মনে দীনেশ তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। স্থির করিল—আর যাই হোক, কোন কারণে মায়ের দুঃখের বোঝা সে বাড়াইবে না। এ জন্য যদি বিদ্যুতের আশা ছাড়িতে হয়, তাহাতেও সে পিছ-পা হইবে না। মাসাবধি সে যদি বিদ্যুতদের বাড়ী না গিয়া থাকিতে পারে চিরদিনও পারিবে—মায়ের দুঃখ আর সে কিছুতেই বাড়াইবে না।

মনস্থির করিয়া সে যেমন উঠিয়া বাহিরে যাইবে, অমনি যে সুর নিরন্ত তাহার "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিতেছে" তাহারই পড়ার ঘরের দ্বারে বাজিয়া উঠিল। বিস্ময়ে চমকিয়া দীনেশ ফিরিয়া চাহিল এবং কিছুক্ষণের জন্য সেই দিক হইতে চোখ ফিরাইতে পারিল না। তাহার এই মুগ্ধ দৃষ্টির সমক্ষে রাঙা হইয়া বিদ্যুৎ বলিল—"আর আমাদের বাড়ী যান্ না কেন ?" দীনেশ কি উত্তর দিবে ? তার মধ্যে যা কিছু সব ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। নতমুখে সে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিদ্যুৎ পুনরায় প্রশ্ন করিল—"কি হয়েছে বলুন ত, প্রায় একমাস আপনি যান নি ? আমরা কিন্তু রোজই আপনার যাওয়ার অপেক্ষা করেছি।"

এক পা ঘামিয়া দীনেশ বলিল—"নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে—" "ওঃ, ভারী ত কাজ! আপনি ইচ্ছা করেই যান নি। আজ বিকেলে কিন্তু যাওয়া চাই। মনে থাকে যেন, আপনার বাজনা শুনবার জন্যে অনেক লোক অপেক্ষায় থাকবে।"

দীনেশের সমস্ত সঙ্কল্প ভাসিয়া গেল। কিন্তু কথা বলিয়া স্বীকৃতি জ্ঞাপন্ করাও বড় কঠিন বোধ হইল। তাহার অবস্থা দেখিয়া বিদ্যুতের হাসি পাইল। সে বলিল—"আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না, আমি মাকে বলে যাচ্ছি ; আর ঠিক সময়ে লোক এসে আপনার যন্ত্র নিয়ে যাবে।"

দীনেশ এবার কথা কহিল ; সে বলিল—"লোক পাঠাতে হবে না ; এই ত বাড়ী, আমি নিজেই নিয়ে যেতে পারব।"

"আপনাকে নিয়ে যেতে হবে না দীনেশবাবু, আপনি সেজন্যে ভাববেন না। মা কোথায় বলুন দেখি ? তাঁকে বলে যাই, নয় ত আপনি ভুলে বসে থাকবেন।"

মায়ের কথায় দীনেশের মন শঙ্কাকুল হইয়া উঠিল। বিদ্যুৎকে দেখিয়া তিনি যে কি কাণ্ড বাধাইয়া তুলিবেন, সে কথা সে ভাবিতেও পারিল না। সে কহিল—"মা বোধ হয় ওপরে। কিন্তু আমার মনে থাকবে, তাঁকে আর বলতে হবে না।"

বিদ্যুৎ কিন্তু সে কথায় কাণ দিল না। দীনেশের মা উপরে আছেন শুনিয়াই সে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেল। দীনেশ মা ও বিদ্যুতের সাক্ষাতের ফল কল্পনা করিয়া ভয়ে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে কখন ফিরিল, তখন স্কুলের সময় হইয়াছে। চট্‌পট্ স্নান সারিয়া কোন রকমে চারিটী মুখে দিয়া সে স্কুলে চলিয়া গেল। বৈকালে এস্রাজ খুঁজিতে গিয়া সে দেখিল,—যন্ত্রটী যথাস্থানে নাই ; কোথায় যে গিয়াছে, তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। মুখ ফুটিয়া কিন্তু সে কথা মাকে জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। মা না দেখেন এমন ভাবে সরিয়া পড়িবার জন্য জামাটী কাঁধে ফেলিয়া যেমন সে বাহির হইয়াছে, তিনি ডাকিয়া বলিলেন—"কোথায় যাচ্ছিস্ ? তোকে যে নেমন্তন্ন ক'রে গেছে রে।"

দীনেশ যেন কিছুই জানে না এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কে মা, কোথা থেকে ?"

"ঐ যে কি নাম মেয়েটার, ছাই মনেও থাকে

না। সেদিন তুই যাদের বাড়ী চোর ধরে দিয়েছিলি।"

"কে, রায় সাহেবের মেয়ে বিদ্যুৎ ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিদ্যুৎ ; ও ছাই বিদ্‌ঘুটে নাম কি মনে থাকে। হ্যাঁ, সেই এসেছিল ; এসে তোকে যাবার জন্ত বলে গেছে। একবার যা সেখানে।"

দীনেশের প্রাণ উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। তথাপি মায়ের মন ভাল করিয়া বুঝিবার জন্ত সে বলিল "না মা, আমি সেখানে যাব না।"

"কেন রে, যাবিনে কেন, দুঃক্ষু করবে যে।"

"তা করুক ; তুমি যে সেদিন বল্লে—ওরা খৃষ্টান।"

মা ছেলের কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন—"না, না, খৃষ্টান নয় ! তা ছাড়া মেয়েটী ভারী চমৎকার। যেমন দেখতে, তেমনি স্বভাব-চরিত্র। আমাকে যেন পেয়ে বস্‌ল। হ্যাঁ, ভাল কথা, ওদের বাড়ীর চাকর এসে তোর সেই তারের বাজনাটা নিয়ে গেছে। যাস্ কিন্তু।"

দীনেশ ছুটিয়া যাইতে পারিলে যেন বাঁচে। মায়ের কাছে আগ্রহ প্রকাশ হইবার ভয়ে তবু একবার জিজ্ঞাসা করিল—"তা হলে যাব মা ?" "হ্যাঁ, যাবি বই কি। আমাকে বারবার করে বলে গেছে—আমি বলেছি পাঠিয়ে দেব। এখন তুই না গেলে ভারী অন্যায় হবে।" দীনেশের মন বহুকাল পূর্ব্বেই সেখানে গিয়াছিল ; এখন তাহার পা দুইখানি ছুটিয়া চলিল।

বিদ্যুতের পিতা রায়-সাহেব প্রতি মাসেই একমাত্র কন্তার মঙ্গল কামনায় উৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন। আজ সেই উৎসব উপলক্ষে দীনেশের নিমন্ত্রণ। সে বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়াই একঘর অপরিচিত নর-নারীর মধ্যে আপনাকে বিপন্ন মনে করিল। ফিরিয়া আসিবে কি না ভাবিতেছে, এমন সময় বিদ্যুৎ ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"ভারী দেরী করে ফেলেছেন। আমি এক্ষণি যাচ্ছিলাম। এখন আসুন আমার সঙ্গে।" বলিয়া তাহাকে লইয়া আর একটী ঘরে প্রবেশ করিল। সেখানে গুটি-কয়েক ছেলেমেয়ে বসিয়া জটলা করিতেছিল। ইহারা বিদ্যুতের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও বান্ধবী। দীনেশ প্রবেশ করিতেই তাহাদের আলাপ থামিয়া গেল এবং একসঙ্গে সব কয়টী ছেলে ও মেয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। এতগুলি অপরিচিত কিশোর-কিশোরীর একমাত্র লক্ষ্যস্থল হইয়া পড়িয়া সে যে কি করিবে স্থির করিতে পারিল না। লজ্জায় তাহার মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল। বিদ্যুৎ তাহার অবস্থা বুঝিয়া তাহার হাত ধরিয়া একখানি চেয়ারে বসাইয়া দিতে দিতে বলিল—"আপনি না হয় পালোয়ান লোক, সমস্ত দিন দাঁড়িয়ে থাকলেও কষ্ট হবে না, কিন্তু আমাদের পাগুলো ত অত শক্ত নয়।"

দীনেশ নতমুখে কহিল—"না, এই যে আমি বসছি। আপনিও বসুন।"

বিদ্যুৎ দীনেশের হাতে এস্রাজটী দিয়া বলিল—"আপনি ততক্ষণ আরম্ভ করুন, আমি আসছি।"

সকলের প্রশংসা এবং বিদ্যুতের পুনঃ পুনঃ তাহাদের বাড়ী যাইবার অনুরোধ বহন করিয়া দীনেশ যখন গৃহে ফিরিল, তখন তাহার মনের সব গ্লানি এক অপূর্ব্ব আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। সর্ব্বোপরি তাহাকে ও বিদ্যুৎকে উপলক্ষ্য করিয়া বিদ্যুতের কোন বান্ধবী যে একটী মধুর উপহাস করিয়াছিল,—সারারাত্রি সেই কথাটাই তাহার কর্ণে বাঁশীর সুরের মত বাজিয়া ফিরিতে লাগিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের কথা এই যে, মা সেদিন আর তাহাকে কাপড় ছাড়িয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিতে বলিলেন না।

৩

বছর তিনেক যে কোনখান দিয়া কি ভাবে কাটিয়া গেল, দীনেশ তাহা বুঝিতেও পারিল না। এই সময়টার মধ্যে বিদ্যুৎ ও তাহার মধ্যে যে

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা একদিকে যেমন রায়-সাহেব বুঝিতে পারেন নাই, তেমনি দীনেশের মাও বুঝিতে পারেন নাই। পুত্রের মধ্যে যে পড়াশুনার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, দুইটা পাশ দিয়া যে বি-এ পড়িতেছে, মায়ের প্রাণ তাহাতেই উৎফুল্ল। তিনি অন্য কোনদিকে চোখ চাহিয়া দেখিবার অবকাশ পান নাই। কিছুদিন হইতে আর একটা মধুর কল্পনা তাঁহার মনে উঠিতেছে, কিন্তু দুইটী কারণে সেই কল্পনাকে রূপ দিতে তিনি ভয় করিতে-ছিলেন। দীনেশ ও বিদ্যুৎকে পাশাপাশি রাখিয়া দুইটীকে এক করিয়া যখনই দেখিয়াছেন, তখনই তাঁহার চোখ জুড়াইয়া গিয়াছে; কিন্তু রায়-সাহেব তাঁহার মত দুঃখিনীর ঘরে তাঁর আদরিনী কন্যাকে দিবেন কি না, এবং দিলেও এই মিলনের ফলে বড় লোকের কন্যা বিবাহ করিয়া পুত্র তাঁহার পর হইয়া যাইবে কি না, এই দুই আশঙ্কাই তাঁহার প্রবল হইয়া দাঁড়াইত।

ইতিমধ্যে একদিন দীনেশ মুখ কালো করিয়া বাড়ী ফিরিতেই মাতা শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন —"কি হয়েছে রে?"

দীনেশ আগুন হইয়া কহিল—"সে সব তুমি বুঝবে না মা; আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা কোরো না। বড় লোকের সবই ধন।" শেষের কথাটা অবশ্য সে মনে মনে বলিবারই চেষ্টা করিয়া-ছিল, কিন্তু রাগটা খুব বেশী হওয়ায় মুখে প্রকাশ হইয়া পড়িল। মাতা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"কেন, কি করলে বড়লোক?"

"সে তোমার শুনে কাজ নেই—আমি বলতে পারব না; আমায় একটু একলা থাকতে দাও।"

মা আর কিছু বলিলেন না—সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। দীনেশ ব্যাপারটা একবার আলোচনা করিয়া দেখিতে বসিল।

কিছুদিন হইতে রায়-সাহেব যেন আর তাহার প্রতি তেমন স্নেহ-পরায়ণ ছিলেন না। তিনি চিনিতেন টাকা; আর ভালবাসিতেন টাকার মালিককে। তথাপি দীনেশের প্রতি তাঁহার একটা আকর্ষণ ছিল। কিন্তু যেদিন হইতে বিদ্যুৎ ও তাহার মধ্যে একটু অন্তরঙ্গ ভাব তাঁহার চোখে ধরা পড়িল, তিনি সেই দিনই দীনেশের প্রতি বিরূপ হইলেন। কোনক্রমেই যে তাঁহার আদরিণী কন্যা এই নিতান্ত দরিদ্রের প্রতি একমাত্র রূপের খাতিরে আকৃষ্ট হয়, ইহা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। তাই দীনেশের সহিত দেখা হইতেই তিনি গম্ভীরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"বুঝলে দীনেশ, তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ হতে পারে না।"

দীনেশের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; সে কোন কথা বলিতে পারিল না।

তাহাকে মৌন দেখিয়া রায়-সাহেব আবার বলিলেন—"আমার কথাটা বুঝতে পারছ? তোমার হাতে বিদ্যুৎকে দিতে পারি না।"

"কেন পারেন না, জানতে পারি কি?"

"তোমার তেমন কোন সংস্থান নেই।"

"তেমন কথাটার মানে বুঝলাম না।"

"অর্থাৎ, তোমার এমন সম্পদ নেই যে, তুমি বিদ্যুৎকে সুখী করতে পার।"

"আচ্ছা, যদি নাই থাকে, কোনদিন যে হবে না, তাই বা কে বলতে পারে।"

"আমি পারি। তোমার মধ্যে ভবিষ্যৎ উন্নতির কোন লক্ষণই আমি দেখতে পাই না।"

"কারণ কি জানতে পারি?"

"কারণ, তুমি অলস—কোন কর্ম্মে তোমার প্রবৃত্তি নাই।"

"তা' হ'লে এ বিবাহ হতে পারে না?"

"নিশ্চয় না।"

"বেশ ভাল কথা।"

"শুধু এইটুকুই নয়। আরও আছে।"

"আর কি আছে?"

"তুমি বিদ্যুতের সঙ্গে মিশতে পাবে না; যাতে

তার মন আকৃষ্ট হয়, এমন কিছু করতে পারবে না; এক কথায় তার সংস্রব তোমায় ছাড়তে হবে।"

"বেশ, ভাল কথা।

"মনে রেখো, তুমি আর কোনদিন আমার বাড়ীতে আসবে না; অন্য কোথাও বিদ্যুতের সঙ্গে দেখা করবে না।"

"বেশ, তাও হবে।"

"তা হ'লে তুমি এখন যেতে পার।"

দীনেশ আর সেখানে দাঁড়াইল না। তার মনের অবস্থার বর্ণনা চলে না। সে সটান বাড়ী আসিয়া গুম্ হইয়া বসিল। কিছুক্ষণ তাহার কোন বিষয় স্থির হইয়া ভাবিবার মত মনের অবস্থা না থাকায় জগতের যত কিছু ভাবনা একের পর এক আসিয়া তাহার মস্তিষ্কে ভিড় করিতে লাগিল। বিদ্যুৎ হইতে আরম্ভ করিয়া চীন দেশের গৃহবিবাদ এবং রুশিয়ার নূতন শাসন-পদ্ধতি হইতে এদেশের ছেলে-মেয়েদের একান্ত দুর্দ্দশার কথা কোন কিছুই বাদ পড়িল না। তার-পরেই মা আসিয়া তাহার চিন্তাজাল ছিঁড়িয়া তাহাকে বাস্তব জগতে টানিয়া আনিলেন। একা থাকিবার জন্য মাকে বিদায় দিয়া দীনেশ একবার ভাবিয়া দেখিল, ইহার প্রতিকারের উপায় আছে কি না? কিন্তু ভাবিয়া কোন উপায়ই সে স্থির করিতে পারিল না। ঘরে বসিয়া ভাবিতেও আর তার ভাল লাগিল না; সে বাহির হইয়া পড়িল। বিকালের দিকে বিদ্যুৎ কোথায় যায় তাহা সে জানিত; সুতরাং ধীরে ধীরে সে সেই ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে গিয়া বিরাগীর মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বিদ্যুৎ ও তাহার সঙ্গী-সঙ্গিনীরা প্রতিদিন অপরাহ্ণে সেইখানে খেলিতে আসিত। আজও আসিয়াছে। দীনেশও মাঝে মাঝে আসিয়া তাহাদের সহিত খেলিত। কিন্তু আজ তাহাকে অমন বৈরাগ্যযুক্ত দেখিয়া বিদ্যুৎ আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। কিন্তু দীনেশ সেই যে সুদূর আকাশের কোন এক বিশিষ্ট নীলিমায় তাহার দৃষ্টিশক্তির সংযোগ সাধন করিয়াছে, সে দৃষ্টি ফিরাইল না। বিদ্যুৎ কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আজ এমন দেখছি কেন?"

উত্তর নাই।

"ও দীনেশ বাবু?"

দীনেশ মুখ না ফিরাইয়াই উত্তর দিল—"কেন?"

"তুমি বুঝি আমার দিকে তাকাবে না?"

"না।"

"কেন?"

"তোমার বাবার নিষেধ।"

বিদ্যুতের ভারী হাসি পাইতেছিল; কোন রকমে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা আর কি বারণ করেছেন তোমাকে?"

"তোমার সঙ্গে মিশতে।"

"আর?"

"তোমার সঙ্গে কথা বলতে।"

"তার কারণ?"

"তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হতে পারে না।"

"বেশ, কিন্তু আমার দিকে তাকাতে দোষ কি?"

"দোষ কিছু নেই; তবে আমার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে ব্যাঘাত হবে।"

"ওঃ!"

"আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব তোমাকে?"

"কি কথা?"

"কোন ট্যাকশাল বা এমন কিছুর সন্ধান তোমার বাবা পেয়েছেন না কি?"

বোধ হয় পেয়েছেন।"

"কে সে?"

"মল্লিক-সাহেব। বোধ হয় তারই ওপর বাবার ঝোঁক পড়েছে।"

"লোকটার খুব টাকা আছে বুঝি?"

"অনেক টাকা; তা'ছাড়া খুব বড় ব্যবসা করবে শুনছি।"

"তা'হ'লে ত কথাই নেই। ঐ যে মল্লিক-সাহেব আসছেন।" তুমি উঠবে না?

"না—এখন নয়?"

"আমি তা' হ'লে যাই?"

"এস।"

বিদ্যুৎ চলিয়া গেল—দীনেশ সেই ভাবেই আকাশের মহা নীলিমার দিকে চাহিয়া সেই স্থানে বসিয়া রহিল।

৪

মাসকয়েক দীনেশ রায়-সাহেবের বাড়ীতে যায় না। ইতিমধ্যে মল্লিক রায়-সাহেবকে বেশ হাতে আনিয়া ফেলিয়াছে। অর্থ উপার্জ্জনের সম্ভব অসম্ভব অনেক প্রকারের উপায় এবং সেই সকল উপায় অবলম্বন করিলে বিপুল অর্থাগম যে কেহ রোধ করিতে পারিবে না, এই প্রকারের নানা কথা বলিয়া বৃদ্ধের মনে সেই যুবক ভবিষ্যতের এমন একটা উজ্জ্বল চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছে যে, বৃদ্ধ রায়-সাহেব তাহার আর্থিক উন্নতি এই মল্লিকের বাণিজ্যের সাহায্যে, আর কন্যা বিদ্যুৎকে তাহার তরুণ মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার সহকারিণীরূপে নিয়োগ করিতে এক-প্রকার স্থির সঙ্কল্প। তা' ছাড়া কথা প্রসঙ্গে দীনেশের আলোচনা উপস্থিত হইলে মল্লিক তাহার সম্বন্ধে এমন সব কথা বলিয়া বসে যে, বৃদ্ধ দিব্য চক্ষে দীনেশের গৌরোজ্জ্বল আবরণের অন্তরালে নির্জ্জীব অকর্ম্মণ্য আলস্য-পরায়ণ একটা অপদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া ঘৃণায় শিহরিয়া উঠেন।

বিদ্যুতের কোন পরিবর্ত্তনই লক্ষ্য হয় না। সে পূর্ব্বেও যেমন হাসিয়া-খেলিয়া বেড়াইত—এখনও তাহাতে তাহার কোন ব্যতিক্রম নাই। চারি পাঁচ মাস দীনেশ যে আসে না—তাহা যেন বিদ্যুৎ লক্ষ্যও করে না। মল্লিক তাহাকেও ভবিষ্যৎ জীবনে সে যে পৃথিবীর প্রধান অর্থশালী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিবে—সে কথা প্রমাণ দিয়া বুঝাইয়া দিত এবং ভুলক্রমেও সে যে বিদ্যুতের প্রতি অনুরক্ত তাহার আভাষ মাত্র প্রকাশ করিত না। বিদ্যুৎও মল্লিকের কাল্পনিক কোটিপতির বর্ণনা শুনিয়া তাহাতে এমন বিস্ময় প্রকাশ করিত যে, মল্লিক বিদ্যুৎকে তাহার প্রতি অনুরাগিণী বুঝিয়া পুল-কিত হইত!

আর দীনেশ প্রথমটা একটু মুশড়াইয়া পড়িলেও কি যেন একটা স্থির করিয়া এখন পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়াছে। বিশেষতঃ, তাহার পরীক্ষা শেষ হইবার পর তাহাকে যে রকম ব্যস্ত এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ দেখা যাইতেছে, তাহাতে সে যে বর্ত্তমানে প্রণয়-ঘটিত কোন ব্যাপারের ধারও ধারে না, একথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ বোধ করি কেহ খুঁজিয়া পায় না।

সেদিন সন্ধ্যার পর বেড়াইয়া ফিরিয়া রায়-সাহেব কন্যা ও মল্লিক সমভিব্যাহারে বোধ হয় বাণিজ্য-সংক্রান্ত কোন বিষয় আলোচনা করিতে-ছিলেন—ভৃত্য একখানি পত্র আনিয়া উপস্থিত করিল। পত্রখানি পড়িয়া বৃদ্ধ কহিলেন—"ও রে বিদ্যুৎ, ধীরেশ চৌধুরী এখানে এসেছে যে।"

বিদ্যুৎ যেন কিছুই বুঝিতে পারে নাই, এমন ভাবে পিতার মুখের দিকে চাহিল।

মল্লিক জিজ্ঞাসু-নেত্রে রায়-সাহেবের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"লোকটা কে?"

"তুমি চিনবে না; আমি যখন লাহোরে ছিলাম, তখন আলাপ। হ্যাঁ, একটা কর্ম্মী পুরুষ। নিজের বাহুবলে কি করে টাকা করতে হয়, দেখিয়ে দিয়েছে।"

বিদ্যুৎ চিঠিখানা পিতার হাত হইতে লইয়া পড়িয়া কহিল—"এ নিমন্ত্রণ কিসের জন্তে বাবা ?"

"কেন, তুই কি এরই মধ্যে ভুলে গেলি। সে যে লোকের সঙ্গে ভাব করে নিমন্ত্রণ খাইয়ে।"

"ভুলি নি বাবা—কিন্তু এখানে ও যে তাঁর… .."

"হাঁা, সেকথা ঠিক। কিন্তু আমি শুনেছিলাম, —কলকাতায় একটা বড় কারবার সে খুলবে। বোধ হয়, সেই সূত্রেই এখানে আসা।"

মল্লিকের মুখখানি কেমন যেন ম্লান হইয়া পড়িল। সে পিতা ও পুত্রীর আলাপের বিশেষ কিছু বুঝিল না। কিন্তু তার কেমন একটা আশঙ্কা হইতে লাগিল, কি জানি প্রায় বাগাইয়া আনা শীকার যদি হাত ছাড়া হইয়া যায়। সে বিদ্যুৎকে ইঙ্গিত করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলে বিদ্যুৎ তাহার অনুসরণ করিয়া আসিয়া বলিল—"আপনার সঙ্গে এই ধীরেশ কাকার আলাপ হলে দেখবেন, কাজের অনেক বিষয়ে সাহায্য পাবেন এঁর কাছ থেকে।"

কথাটা মল্লিকের ভাল লাগিল না। কিন্তু সে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল—"নিশ্চয় আলাপ কর্ত্তে হবে; উঁরা হলেন করিৎকর্ম্মা লোক। কিন্তু আপনাদের সেই সুন্দর ছেলেটীর কি হলো—তাকে যে দেখতে পাই না আর ?"

"দীনেশবাবু আর আসেন না; বোধ হয়, আমাদের সংস্রব তাঁর ভাল লাগে না। কিন্তু আপনার কাজ ত কই এখনও…।"

"এই বার আরম্ভ হবে। আপনারা ত কাল নিমন্ত্রণে যাচ্ছেন ? আমি তা' হলে…?"

"ইচ্ছে হয় বাড়ীতে এসে আমাদের অপেক্ষা কর্ত্তে পারেন।" মল্লিক—"শুধু একদিন কেন, দিনের পর দিন ত অপেক্ষাই করে আসছি; যদি আশা পাই….

"চাই কি আজন্ম অপেক্ষা করতেও আপনার আটকাবে না কি বলেন ?" বিদ্যুতের চক্ষে একবার আকাশের সমস্ত বিজলী ঝলকিয়া গেল।

মল্লিক—"সত্যিই তোমার জন্ত বোধ হয় আমি জন্ম-জন্মও অপেক্ষা করতে পারি!"

উচ্চহাস্যে তাহাকে সপ্রতিভ করিয়া দিয়া বিদ্যুৎ কহিল—"আপনার দ্বারা কিছু হবে না—কাজের লোকের মুখে এরকম অলসের মত কথা কিন্তু আমি আশা করি নি।"

মল্লিক বিদ্যুতের দুখানি হাত নিজ হস্তে লইয়া আবেগভরে কহিল—"যদি একবার বুঝতে পারি বিদ্যুৎ যে তোমার…"

বিদ্যুৎ তাহাকে কথা শেষ করিতে দিল না—ধীরে ধীরে হাতখানি ছাড়াইয়া লইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"বাবা ডাকছেন আমাকে। আপনি যখন আশায় থাকতে রাজী তখন ব্যস্ত কেন ?" আবার সেই বিজলী বর্ষণ। মল্লিক তাহাকে ধরিবার জন্ত দুই পা বাড়াইয়া দেখিল, বিদ্যুৎ সিঁড়ির মাঝামাঝি যাইয়া দাঁড়াইয়াছে; তার মুখে বিশ্বের সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার যেন আপনাকে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াছে। হাসিভরা মুখে সে কহিল—"কাল খেলার সময় আবার দেখা হবে।"

মুগ্ধ শঙ্কিত মল্লিক ধীরে ধীরে সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

উপরে আসিয়া বিদ্যুৎ পিতার ঘরে একবার উঁকি দিয়া দেখিল, তিনি তাঁহার কাগজ পত্র লইয়া ব্যস্ত। সে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়া কাগজ কলম লইয়া চিঠি লিখিতে বসিল।

সে দীনেশকে লিখিল—

"তুমি যে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, সে কথা আর অস্বীকার করিতে পার না। তোমার আশায় বসিয়া থাকিলে আমাকে বোধ হয় এ যাত্রা তপস্যা করিয়াই কাটাইতে হইবে। মল্লিক আমার আশায় শুধু একজন্ম নয় আরও দুই-চারি জন্ম অপেক্ষা করিতে রাজী আছে। কিন্তু আমি মোটেই রাজী নই। তোমার মতলব কি স্পষ্ট

করিয়া লিখিও ; আর যদি কাজের ক্ষতি না হয়, তবে খেলার সময় একবার আসিও। হাঁ, আর এক কথা ; কাল আমরা, অর্থাৎ বাবা ও আমি এক জায়গায় নিমন্ত্রণ যাইব। তুমি একটু শীঘ্র আসিও।”

চিঠিখানি লিখিয়া চাকরকে দিয়া পাঠাইয়া দিল। তারপর আপন-মনে একবার খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া নূতন কেনা একখানি বই লইয়া পড়িতে বসিল।

চিঠির জবাব লইয়া ভৃত্য ফিরিয়া আসিতেই সে সাগ্রহে চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল—

তোমার চিঠি পাইলাম—কিন্তু যাইবার সময় আমার নাই। তা'ছাড়া কাল ত কোন রকমেই হইয়া উঠিবে না। আর অকর্ম্মণ্য লোক দিয়া কি কাজই বা তোমার হইবে। মল্লিক যে তোমার আশায় আরও দু'চার জন্ম অপেক্ষায় রাজী হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই ; যাহারা ব্যবসাদার, তাহারা আশায় অনেক কিছুই করিয়া থাকে। হ্যাঁ, একটা সুখবর তোমায় দিই—আমার বাবা পশ্চিমে থাকিতেন তোমাকে বলিয়াছি ; তিনি এখানে আসিয়াছেন, আর বোধ হয়, আমার একটা গলগ্রহ জুটাইয়া দিবার জন্য ভারী ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তোমার বাবার যেমন গরীবের প্রতি ঘৃণা, আমার বাবার ঠিক তেমনই উল্টা ;—বড়লোকের নামে তিনি জলিয়া উঠেন। যাক, আজ থেকে কাজের লোক হইবার চেষ্টা করিব। কেন না,—আশায় আশায় বেশীদূর অগ্রসর হইতে আমার এতটুকু ইচ্ছা নাই। কাল কিন্তু দেখা হইবে না। বাবা তাঁর একজন পুরাতন বন্ধুকে আর তাঁর মেয়েকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন ; বোধ হয়, সেই বন্ধু-কন্যাই আমার কাঁধে চাপিবেন। যাক্, দেখি মেয়েটা কি রকম। তুমিও মল্লিকসাহেবকে আর বেশী দিন আশায় রাখিও না।”

চিঠি পড়িয়া দীনেশের পিতার বন্ধু-কন্যার গুষ্টি পাত করিতে করিতে বিদ্যুৎ ভাবিতে লাগিল, এই দীনেশের বাবার এতকাল পশ্চিমে থাকিয়া আজ তাহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য এখানে আসিবার কি প্রয়োজন ছিল ? তাঁহার অভাবে এত কাল যদি দীনেশের চলিয়া থাকে, ইহার পরেও অচল হইয়া থাকিত না। যদি কোন প্রকারে সে দীনেশের গৃহে প্রবেশের অধিকার পায় এই বাবাটাকে সে কোনদিন ভালবাসিতে পারিবে না—কিছুতেই না !

পরের দিন সকালে বিদ্যুৎ অনুসন্ধানে জানিল, দীনেশেরা সে বাড়ী হইতে আজ সকালে কোথায় গিয়াছে। একটা দরওয়ান মাত্র সেখানে রহিয়াছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল, আজ কোথায় না কি ভারি কাজ আছে, বাবু আর মায়ীজী সেইস্থানে গিয়াছেন ; কবে ফিরিবেন তাহার খবর সে জানে না। সারা-রাত্রি ভাবিয়া বিদ্যুৎ যাহা ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, এই সংবাদে সে সমস্ত গোলমাল হইয়া গেল। সে ঠিক করিয়াছিল, সকাল হইলেই সে নিজে গিয়া দীনেশকে পিতার বন্ধু-কন্যার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া আসিবে। কিন্তু প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই যে দীনেশ পলাইয়া যাইবে, একথা সে বুঝিতে পারে নাই। ক্ষোভে-দুঃখে তাহার এমন অবস্থা হইল যে, দেখা পাইলে দীনেশের ওই সুন্দর দেহটাকে সে ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া একেবারে কদাকার করিয়া দেয়। কিন্তু এই বৃথা রোষের কোন ফল নাই যখন বুঝিতে পারিল, তখন তাহার কান্না আসিল। অথচ, নিজের এই দুর্ব্বলতার আভাষ যদি কেহ পায়, তাহা হইলে তাহার লজ্জার সীমা থাকিবে না ; সুতরাং তাহাকে সংযত হইতে হইল।

সমস্ত দিন ভার ভার থাকিয়া বিকালের দিকে সে যখন পিতার সহিত নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য বাহির হইল, তখন তাহার মনটা অনেক হাল্কা হইয়া গিয়াছে। পথে পিতা-পুত্রীতে সামান্য দুই-চারিটা কথা যাহা হইয়াছে, তাহাতে বিদ্যুৎ শুধু

'হাঁ' 'না' করা ছাড়া বিশেষ কিছু বলে নাই। রায়-সাহেব একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— মল্লিক আসিয়াছিল কি না? কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যুৎ এমন নির্লিপ্ততা দেখাইয়াছিল যে, সমস্ত পথ রায়-সাহেব সাহস করিয়া কন্যাকে দ্বিতীয় বার ঐ প্রশ্ন করিতে পারেন নাই। গাড়ী আসিয়া যথাস্থানে পৌঁছিতেই কোথা হইতে কে আসিয়া বিদ্যুকে 'ছোঁ' মারিয়া অন্দরের দিকে লইয়া গেল; অন্ততঃ ভাবনায় ও উৎকণ্ঠায় প্রায় চোখে জল না আসা পর্য্যন্ত সে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। রায়-সাহেব কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল; বাহির হইয়া যখন আসিল, তখন দেখা গেল বিদ্যুৎ অন্দরের পথে অদৃশ্য। কিন্তু অবস্থাটা বুঝিয়া লইবার পূর্ব্বেই ধীরেশ বাবুর কণ্ঠস্বরে তাঁহাকে আশ্বস্ত হইতে হইল। রায়-সাহেব হাসিয়া বলিলেন—"কিন্তু ব্যবস্থাটা এমন যে, আমার মনে হচ্ছিল বুঝি বা।"

"কোন ডাকাতের আস্তানায় এসে উপস্থিত হয়েছেন, কি বলেন?"

"তা একেবারে মিথ্যে বল নি; মেয়েটা ভয় না পায়।"

"প্রথমটা পেলেও পরে ভারী খুসী হবে। ভয় আপনার জনের অভাব নেই সেখানে।"

"আপনার জন?"

"আপনার জন বই কি, এখন না হলেও দু'দিন পরে ত হবেই।"

"শঙ্কিত হইয়া রায় সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন —ব্যাপারটা কি বল দেখি, আমি ত কিছু বুঝে উঠতে পাচ্ছি না?"

ধীরেশ হাসিয়া বলিলেন—"আপনিও চলুন সেখানে, সব নিজেই বুঝতে পারবেন।"

উভয়ে অন্দরের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু রায়-সাহেব ব্যাপারটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া একটু বিমনা হইয়া পড়িলেন।

গাড়ী হইতে নামার সঙ্গে সঙ্গে যে মেয়েটী চিলের মত 'ছোঁ'মারিয়া বিদ্যুৎকে লইয়া গিয়াছিল, সে বিদ্যুতেরই সমবয়সী, এবং তাহার বিশেষ পরিচিতা। কিন্তু এই সংবাদটুকু জানিতে বিদ্যুতের সময় বড় কম লাগে নাই। আর সব চাইতে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে মেয়েটির সঙ্গে সে যেখানে প্রবেশ করিল, সেখানকার কর্ত্রী দীনেশের মাতা। তাঁহাকে সেইখানে দেখিয়া এবং সকালে ভৃত্যের মুখে তাঁহার ও দীনেশের একই স্থানে গমনের যে সংবাদ শুনিয়াছিল, এই দুইটি মিলাইয়া দেখিয়া, যাহাকে দেখিবার আশায় সে উন্মুখ হইয়া উঠিল, তাহার কোন চিহ্নই সেখানে দেখিতে পাইল না; এমন কি কাহারও মুখে তাহার নামও শুনিল না। দীনেশের মা বিদ্যুৎকে কাছে বসাইয়া একে একে এমন ভাবে সমস্ত কথা গুছাইয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, আজিকার এই ঘটনাগুলা বিদ্যুতের নিকট আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর মতই বিচিত্র বোধ হইল। কিন্তু যে কথাটা শুনিবার জন্য তার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিতেছে, সেইটিই নিতান্ত সংক্ষিপ্ত।

"আচ্ছা, এসব কথা কৈ এতদিন ত দীনেশ-বা বলেন নি।" বলিয়া বিদ্যুৎ দীনেশের মায়ের মুখের দিকে চাহিল।

"তখন যে বলবার মত কিছু ছিল না মা। তা' ছাড়া ছেলে আমার যে রকম অভিমানী, কোন দিন হয় ত এ সব মুখে আনত না।"

বিদ্যুৎ আর কোন কথা বলিল না; দীনেশকে কেন দেখা যাইতেছে না, এই কথাটা বারবার ওষ্ঠাগ্রে আসিলেও জোর করিয়া তাহাকে চাপিয়া রাখিতে হইল। একটা নিদারুণ আশঙ্কা কেবলই থাকিয়া থাকিয়া তাহার বুকের মধ্যে মাথা তুলিতেছিল। দীনেশের বাবার বন্ধুর মেয়ে কে এবং কোথায় আবার তাহার সহিত দীনেশ দেখা করিতে গেল।

বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া এবং গৃহকর্ত্তা ও রায়-সাহেবকে সেখানে আসিতে দেখিয়া দীনেশের মা সেখান হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেই ধীরেশবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—"নিমন্ত্রিতের আদর-যত্ন যা কিছু বাড়ীর মেয়েরাই করে থাকেন; আমি মাত্র নিমন্ত্রণ করে থালাস। তা' ছাড়া, বক্তব্য যা কিছু তোমার বল, আমি রায়-সাহেবকে ডেকে এনে দিয়েছি।"

দীনেশের মায়ের আর যাওয়া হইল না। পাশাপাশি দু'খানা দামী আসন পাতিয়া দিয়া তিনি একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। রায়-সাহেব ধীরেশবাবুকে বসিতে বলিয়া তিনি নিজেও বসিলেন

বিদ্যুতের ইচ্ছা হইতেছিল কি কথা হয় শুনে; কিন্তু কোথা হইতে সেই মেয়েটা আসিয়া আবার তাহাকে পাকড়াও করিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। এই মেয়েটি ধীরেশবাবুর কন্যা অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষের। সে নিতান্ত জেদ করিয়া তাহার বড় মা এবং দাদাকে দেখিতে আসিয়াছে। বিদ্যুৎকে লইয়া যাইতে যাইতে সে বলিল—"ওখানে বুড়োদের সঙ্গে বসে থাকা কেন; চল, বাগানে যাই।"

আচ্ছা চারু, তোর সঙ্গে ত অনেক দিন এক জায়গায় কাটিয়েছি, একদিনও ত বলিস নি আমাকে যে, তোর আর এক মা আছেন।"

"আমি কি জানতুম তখন; বাবা কোন কথা ত আমাদের আগে বলেন নি। আজ বছর-খানেক আমরা সব টের পেয়েছি। কিন্তু বড় মা আর দাদা যে এত ভাল, তা ভাই ভাবতেই পারি নি। আমি ত মনে করেছি, এখানেই থেকে যাব।"

"আচ্ছা চারু..."

"কি ভাই?"

"না থাক্।" কথাটা সে কিছুতেই মুখ হইতে বাহির করিতে পারিল না।

চারু জিজ্ঞাসা করিল—"কি বল দেখি—ও দাদাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ তুমি, তাই বল।" চারু উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

"চুপ, চুপ কর রাক্ষসী।" চারুর মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"আমার বয়ে গেছে তোমার দাদাকে খুঁজে বেড়াতে।" তাহারা ততক্ষণ বাগা-নের একটা ঝোপের ধারে আসিয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ থামিয়া পড়িয়া চারু বলিল—"ও, ভারী ভুল হয়ে গেছে ভাই; যে জন্যে তোকে বাগানে নিয়ে এলুম, সেই জিনিষটিই আনতে ভুলে গেছি। তুই একটু বোস, আমি ছুটে গিয়ে নিয়ে আসছি; এক মিনিটের বেশী লাগবে না।"

বিদ্যুৎ বাধা দিতে গিয়া দেখিল, চারু ততক্ষণ অর্দ্ধেক পথ চলিয়া গিয়াছে। সেও ফিরিয়া যাইবে কি না ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার অতি-পরিচিত এস্রাজের মধুর সুর আসিয়া কর্ণে প্রবেশ করিল। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল—অদূরে কামিনী গাছের আড়ালে বসিয়া দীনেশ এস্রাজে ঝঙ্কার তুলিয়াছে। এতক্ষণ যাহার অন্বেষণে তাহার দুই চক্ষু সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, তাহাকে এমন অপ্রত্যাশিত ও অভাবনীয় উপায়ে আবিষ্কার করিয়া কিছুক্ষণ সে স্তব্ধ বিস্ময়ে তাহারই দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে দীনেশের কাছে উপস্থিত হইয়া একটু দূরে দাঁড়াইল।

দীনেশ এস্রাজটী সরাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং জিজ্ঞাসা করিল—"আমার বাবাকে দেখলে?"

"তাঁকে দেখেছি; কিন্তু যাকে দেখবার জন্যে এলুম, তাঁর সেই বন্ধুর মেয়েকে দেখলাম না ত।"

"তাকে দেখতে চাও?"

"কে, দেখাও।" বিদ্যুতের বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল।

"তুমি তাকে দেখবেই, কি বল?" দীনেশ বিদ্যুতের অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিদ্যুৎ অভিভূতের মত শুধু বলিল—'হ্যাঁ।"

বিদ্যুৎ 'হ্যাঁ' বলার সঙ্গে সঙ্গে দীনেশ তাহার কাঁধে এক হাত রাখিয়া অপর হস্তে তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল—"দেখেছ বাবার বন্ধুর মেয়েকে ?"

পিছনে সেই সময়ে চারু বলিয়া উঠিল—"আমার দাদাকে না কি খুঁজে বেড়াস না ?"

বিদ্যুৎ ছুটিয়া গিয়া চারুর বুকে মুখ লুকাইল।





বিধাতার আলপনা

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



(তিন)

চতুর্থীর আগের রাত্রে কল্যাণ বাড়ী ফিরিল। মুখ-চোখের ভাব বেজায় থমথমে! নিদারুণ কথাটা নিশ্চয়ই কেহ তাহার কাণে তুলিয়াছে। কিন্তু, তখনও সে সেটাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারে নাই; কারণ, জগতে যে দুইটী লোকের কথা সে বেদবাক্যেরই মত অভ্রান্ত বলিয়া মানিত, তাহাদের কাহারও সহিত এখন পর্য্যন্ত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই; কাজেই সন্দেহের নিক্তি-দাঁড়িতে মনের কোণে যে ওজনের তারতম্য জাগাইয়া তুলিতেছিল, তাহা স্বাভাবিক।

বাহিরে পদ শব্দ উঠিল। দিদি আসিতেছেন ভাবিয়া কল্যাণ মুখ তুলিয়া চাহিল; কিন্তু সলিলার পরিবর্ত্তে শোক-পরিচ্ছদ হস্তে ভৃত্যকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিরক্তি-ভর-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কি রে?

ভৃত্য স-সম্ভ্রমে বলিয়া উঠিল, দিদিরাণি এইগুলো পাঠিয়ে দিলেন আপনাকে পরতে।

বেশ, ওইখানে রেখে যা।

আধঘণ্টা পরে ভৃত্য হাত-মুখ ধুইবার জল লইয়া আসিয়া পূর্ব্বেরই মত নিশ্চেষ্টভাবে তাহাকে শয্যাশায়ী দেখিয়া ছাড়া ছাড়া কণ্ঠে বলিল, বাবু, উঠুন।

তীব্র-দৃষ্টিতে কল্যাণ তাহার মুখের দিকে একবার চাহিল। ধীরে ধীরে হাতের জলখাবার রেকাবটা একপার্শ্বে নামাইয়া রাখিয়া সে বেচারী ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। খানিক পরে দেওয়ানজী নিজে আসিয়া বলিলেন, কাপড়-চোপড়-গুলো ছেড়ে ফেল কল্যাণ; মুখে-হাতে একটু জল দাও।

কর্কশ-কণ্ঠে হঠাৎ কল্যাণ বলিয়া উঠিল, তাঁর শেষ সময়ে যে থাক্‌তে পারে নি—তা'কে অমন করে অশৌচের ছদ্মবেশ নেওয়াবার মাথা-ব্যথা আপনাদের কেন হ'ল বল্‌তে পারেন? তা' ছাড়া এ মিথ্যা—

দুইজনের অলক্ষ্যে সলিলা একবাটী গরম দুধ হাতে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; এবার জবাবটা সেই দিল, সত্য-মিথ্যার বিচার পরেই না হয় করলে কল্যাণ; এ নিয়ে বাপের শেষ-সম্মান প্রদর্শনে অবহেলা আর যে করে করুক, আমার ভাই যে তা পারে, সে কথা এই প্রথম জানলুম; আর জানলুম, নেড়ের রক্তের টানের চেয়ে বাইরের অভিমানটাই ঢের বড়!

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া কল্যাণ আস্তে-ব্যস্তে শোক-পরিচ্ছদ হাতে তুলিয়া লইতে লইতে বলিল, সত্যি দিদি, তোমার ভাই যে, সে এত বড় অন্যায় কর্‌তেই পারে না!

হাত-মুখ ধোওয়া শেষ হইলে সলিলা দুধের বাটী সম্মুখে ধরিয়া দিয়া বলিল, এ রাত্রে ত আর মালসা পোড়ান চলবে না ভাই, দুধ-মিষ্টি খেয়েই কাটাতে হবে তোকে! রেলগাড়ীর উপোষ-তিরেষের কষ্টটা রীতিমতই হবে; কিন্তু কি কর্‌বে, উপায়ও ত কিছু নেই!

কল্যাণ দুধের বাটীটায় তাড়াতাড়ি একচুমুক দিয়া বলিল, এ গরম দুধের সঙ্গে বুকের যে বেদনার রসটুকু মিশিয়ে দিয়েছ দিদি, তাতেই

দেখো, কল্যাণ কাল নূতন মানুষ হয়ে যদি না ওঠে ত কি বল্‌ছি।

সলিলার চোখে জল আসিয়াছিল; মিষ্টি আনিবার ছল করিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দেওয়ানজী দেওয়ালে লম্বিত জগৎবাবুর ছবিখানির দিকে চাহিয়া একটা নিশ্বাস বহু কষ্টে রোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

প্রভাতে চতুর্থীর কার্য্য-তালিকাখানি ওলট-পালট করিয়া দেখিয়া কল্যাণ বলিল, এ অপব্যয় কেন দিদি? বাবা দেহ রেখেছেন বলেই কি আমাদের উৎসবের শোভা-যাত্রা করতে হবে?

সলিলা ধীরকণ্ঠে বলিল, পুরুত-মশাই ফর্দ্দ দিয়ে বলেছেন ভাই, এগুলো সবই চাই; কিছু কমবেশ হলে চল্‌বে না, কাজেই—

বাধা দিয়া কল্যাণ বলিল, খরচার টাকাটাও কি পুরুত-মশায়ের নিজের ঘর থেকে আস্‌বে দিদি, যে এত বড় তার জুলুম।

ফিকে হাসি হাসিয়া সলিলা বলিল, তাই যদি আসত দাদা, নিতে পার্‌তিস কি হাত তুলে? বাবা আমাদের, না তাঁর?

কল্যাণ ঘাড় নোয়াইয়া বলিল, আমাদের নিশ্চয়; কিন্তু সেই অপরাধে তাঁর এত বড় পক্ষপাত যে কতদূর শোভন হয়েছে, তা তোমরাই বলতে পার? পরের ধন বলেই এ দরাজ হাত তিনি দেখাতে পেরেছেন।

রামরতন ধীরকণ্ঠে বলিল, কোনটার কথা বল্‌ছ বাবাজি?

কল্যাণ হাতের ফর্দ্দখানা সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, এর প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে; এ উৎসবের এত বড়ই প্রয়োজন যদি আপনাদের কাছে হয়ে থাকে, দিনকতক থেমে যান, মণ্টুর নামে যা হয় একটা কাজ করে উৎসবের ফোয়ারা ছোটাব। এখন এ শোক শোকই থাকতে দিন। আপনাতে? মাথের গোটাকতক দিনের জন্মেই

দেওয়ানজী আবার বলিলেন, তবু কথাটা কি নিয়ে বলছ, সেটা ভাল করেই বোঝা দরকার নয় কি বাবা?

চঞ্চল-কণ্ঠে কল্যাণ বলিল, এই যে দান-সাগর, এই যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিমন্ত্রণ, এর প্রয়োজন?

সলিলা বলিল, পয়সা কেবল কি বাক্সয় চাবী দিয়ে রাখবার জন্মে এসেছে ভাই?

অযথা ছড়িয়ে ছিনিমিনি খেলবার জন্মেও আসে নি।

তা আসে নি সত্য, কিন্তু গরীব যারা, এ সব ক্ষেত্রে তারা যদি কিছু না পায় আর পাবে কবে?

তারা পাক, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এ তা হচ্ছে কই? দেখ্‌ছি বেছে বেছে গরীব যারা, তাদেরই এ ফর্দ্দ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রমাণ ধরুন, এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিমন্ত্রণের ফর্দ্দখানা যা দেখ্‌ছি, সবই আমাদের শিরোমণি-মশায়ের শাঁসাল নিকট আত্মীয়; পয়সার অভাব ওদের কারও নেই। কিন্তু সন্তোষ বাঁড়ুয্যে, ছ-সাতটী কুপুষ্যি নিয়ে যাকে মরতে হ'চ্ছে, তার নাম এ ফর্দ্দে ত কই দেখছি না? এটা কি পক্ষপাত নয়?

কিন্তু সে যে একঘরে বাবা।

কল্যাণ উষ্ণ হইয়া কহিল, কেন, কেন সে একঘরে সেটাও বলুন? নিধে মুচি কলেরা হয়ে তার দোরে এসে পড়েছিল; দূর দূর করে তাকে তাড়িয়ে না দিয়ে মানুষের মত তার সেবা-শুশ্রূষা করেছে; কেমন, এই না তার অপরাধ?

কিন্তু সে যে—

থেমে যান; বলবেন ত সে মুচী, কেমন এই ত কৈফিয়ৎ? আচ্ছা বলুন ত জন্মাবার মুখে আপনি তার চেয়ে কতবড় সুপথ দিয়ে নেমে এসেছেন? যে কষ্ট সে পেয়েছে, তার কতটুকু কষ্ট কম হয়েছে আপনার সে সময়? আর মরণের সময় যখন জমি নেবেন, চোদ্দ পোয়ার কতটুকু কমবেশ হবে তাতে কতটা মরে ভূত হয়ে যাবে! পরে একটু ধুম, ব্যস্‌;

মা তাকে কোণঠেসা করে রেখেছেন ? বলি- হারি বিচার !

কিন্তু সমাজ মান্‌তেই হয় বাবা ।

মান্ন, আপত্তি করছি না ; করছি, তার মন্দ দিক্‌টার প্রশ্রয় দেওয়ার চেষ্টা দেখে ।

শিরোমণি সলিলাকে নদীতীরে লইয়া যাইবার জন্ত প্রস্তত হইয়া আসিতেছিলেন। ক্রোধে অগ্নি- শর্ম্মা হইয়া উঠিয়া বলিলেন, কি বলছ কল্যাণ !

কল্যাণ স্নেহভরে বলিল, আপনাদের গুণ বর্ণনা, আর বেশী কিছু নয় ! এঁদেরই মত স্বার্থপর কতকগুলো লোক আছেন, যাঁরা সবার বাড়া ভাত নিজে নেবেন ; পরকে দেবার সঙ্কল্প যদি কানে শোনেন, আঁৎকে উঠে বাধা দিয়ে বলবেন—কর কি, কর কি ওরা অপাত্র ! আর মিথ্যা প্রবঞ্চনা ঠকবাজি হাজারবার করলেও নিজেরা সৎপাত্র ! হৃদয়-হীন চাঁড়ালের ব্যবহার যত ওঁদেরই কাছে তবু ওঁরা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ !

শিরোমণির ব্রহ্মরন্ধ্র উপস্থিত হইল। ঠিক্ কতবড় গালি প্রথম উচ্চারণ করিয়া কথাটা আরম্ভ করা যায় তাহা বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া রাগে কাঁপিতে লাগিলেন। সলিলা স্থিরকণ্ঠে ডাকিল, কল্যাণ ?

দিদি !

বাবার শ্রাদ্ধের দিনে এইটাই বুঝি বিরাট্ পর্ব্ব ?

স্বরে অন্তরে চকিত হইলেও কল্যাণ মৃদু হাসিবার প্রয়াস পাইয়া বলিল, আজকাল তাই হয়ে পড়েছে দিদি ; তবে এটা ঠিক্, তোমার ও মরা মহাভারতের চেয়ে এর—

আমি বারণ করছি কল্যাণ, এসব এখানে চলবে না ! টাকা আমার, আমি যেমন ইচ্ছে খরচ করব !

কিন্তু বোন্‌টী আমার দিদি, তার মন আমি ভাল জানি ; কাজেই বাধা আমি দেবই ।

গম্ভীর মুখে সলিলা বলিল, সে অধিকার তুমি হারিয়েছ কল্যাণ ?

হারিয়েছি !

কথাগুলার উপর বেশ জোর দিয়া সলিলা বলিল, হ্যাঁ, হারিয়েছ । এখন এখানে কেবল অনধিকারের অধিকারী হয়ে তোমায় থাকতে হবে ; কথা কওয়া ত চল্‌বেই না, যদি জোর করে পরামর্শ দিতে আস, পাগলের প্রলাপ ভেবে কেউ সে কথা কাণেও শুনবে না ।

তবে এমন জায়গায় আমি নাই রইলুম—

সেটা তোমার ইচ্ছা ভাই । সবার মত ছেঁটে ফেলে নিজের প্রাধান্য বজায় রাখ্‌বার এতই যদি তোমার আকাঙ্ক্ষা হয়ে থাকে, আমার মতে যাওয়াই ভাল । আমি একটী ছেলে নিয়ে ঘর করি, তার অকল্যাণ যাতে হয় তা' কর্‌তে পার্‌ব না !

সেই ভাল তবে । এতগুলো সৎইচ্ছার চাপ যখন তোমার ধৈর্য্যকেও টলিয়েছে, তখন পালান ছাড়া আর উপায়ই বা কি ? তা' ছাড়া আমায় দিয়ে তোমার ছেলের অকল্যাণই বা হতে দেব কেন ? কিন্তু জেনো দিদি, এ যাওয়াই আমার শেষ যাওয়া ! এরপর অনুগ্রহের প্রত্যাশী হয়ে এখানে মাথা গলান তোমার ভাইকে দিয়ে তা' হবে না । আসি তা' হলে, প্রণাম !

শিরোমণি বাধা দিয়া বলিলেন, অশৌচ অবস্থায় এ কি বিদ্‌ঘুটে অনাচার ! ও সাহেব, সব কর্‌তে পারে সলিলা, কিন্তু তুমি আমাদের ঘরের মেয়ে হয়ে প্রণাম নেবে কেমন করে ?

কল্যাণ একবার দিদির দিকে চাহিয়া দ্রুত পদে গেল। কম্পিত ওষ্ঠাধর জোর করিয়া চাপিয়া সলিলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধ দেওয়ান জলভরা দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, কি কর্‌লি সলিলা ?

আমি ঠিকই করেছি কাকাবাবু। জলজ্যান্ত গোখ্‌রো সাপের মুখ থেকে ভাইটীকে বাঁচাতে পেরেছি, এই ঢের। চলুন, বাবার কাজ করি গে—

ক্রমশঃ



বারিধারার অন্তরালে

এন, সি, দাস



সম্পাদক—শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৬ষ্ঠ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৩৭ { ৩য় সংখ্যা

ছন্দ-পতন

শ্রী বগলারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

(এক)

অবশেষে বিবাহ হইল।

পল্লীগ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ-ঘর কলিকাতার মেয়ে আনিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিল না। অর্দ্ধ-শিক্ষিতার সমস্ত গৌরবটুকু লইয়াই প্রীতি শ্বশুরবাড়ী আসিল।

দীননাথবাবু পুত্রবধূর রূপ দেখিয়া আনন্দিত হইলেন—গুণ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন—এবং তাহার পাঠানুরাগ দেখিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন।

ক্ষুদ্র সংসারের দিন চলিতে লাগিল—নববধূকে গৃহস্থালী কর্ম্মে সুনিপুণ করিয়া তুলিবার চেষ্টায়,—খাশুড়ীর দ্বারা;—আর রাত্রি কাটিতে লাগিল—প্রিয়তমার অন্তরে কাব্য-প্রীতি উদ্বোধিত করিবার অক্লান্ত পরিশ্রমে,—স্বামীর দ্বারা।

খাশুড়ী জন্মিয়াছেন ১২৯০ সালে; আর স্বামী ১৩১০। এই দোটানার মাঝে পড়িয়া প্রীতি রীতিমত ভড়কাইয়া গেল।

কর্ত্তা দীননাথ আরও পূর্ব্বে জন্মিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়,—বাড়ীর পূর্ব্বদিকের আট চালার মধ্যে, হরি নামের ঝুলি লইয়া কিছু বেন কুণ্ঠারই সহিত বৈকুণ্ঠের প্রতি দৃষ্টি দিলেন।

গ্রীষ্মকাল—বেলা প্রায় দেড়টা। গৃহিণী আহার সারিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে ডাকিলেন—"বৌমা, তোমার কাজ সারা হ'ল?"

ভার হইতে চাপা কণ্ঠে উত্তর আসিল—"যাই মা।" অনতিকাল পরেই বধূ আসিয়া উপস্থিত। গৃহিণী বলিলেন—"একটু রামায়ণখানা পড় ত। নিজেও ছাই আর তেমন চোখে দেখ্‌তে পাই না—বুড়ো হওয়া না মরণ হওয়া।"

তাঁহাকে আর অধিক আক্ষেপ প্রকাশের সুযোগ না দিয়া প্রীতি রামায়ণ লইয়া পড়িতে বসিল এবং কিছুক্ষণ পরেই দুইটী নারীর ধর্ম-চর্চার গুঞ্জনে নিস্তব্ধ ঘরখানির শান্তিভঙ্গ হইতে থাকিল।

দোতালায় স্বামী সুধীর ভয়ানক কাশিতেছিল; আর নীচের ঘরে প্রীতি মনে মনে হাসিতেছিল। এই সরব কাশি ও নীরব হাসির লীলার মধ্যে গৃহিণী ঘুমাইয়া পড়িলে, প্রীতি বই বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর ঘরে যাইয়া দেখে যে, সে বিছানায় শুইয়া অনবরত ছটফট করিতেছে,—আর মাঝে মাঝে কাশিতেছে।

প্রীতি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কাশ্‌ছ কেন অত?" সুধীরের আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া গেল—"লজ্জা করে না জিজ্ঞেস কর্‌তে? একটা মানুষ এদিকে মরে যায়,—তা সেদিকে খেয়ালই নেই;—বেন—"

"তা কি কর্‌তে বল?"

"কিছু না—কিছু না—তুমি যাও এখান থেকে।"

"তা আমি যাচ্ছি—তুমি কিন্তু আর কেশো না অমন করে।" বলিয়া প্রীতি একটু হাসিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুধীর খানিকক্ষণ অবাক্ হইয়া সেদিকে চাহিয়া রহিল—তারপর নিজের মনেই গজগজ করিতে করিতে বেলা আড়াইটার সময় বৈকালিক ভ্রমণ সমাধা করিতে চলিল।

(দুই)

গৃহিণী মানুষটী ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ পর্য্যায়ের। জগতে তাঁহার একমাত্র বুঝিবার বস্তু ছিল সংসার। তাঁহাকে হাসিতে খুব কম লোকেই দেখিয়াছে—কিন্তু তাই বলিয়া যে তিনি সব সময়েই রাগিয়া থাকেন,—ইহাও মিথ্যা। তবুও এই সত্য-মিথ্যার মাঝখানে যে জিনিষটীকে তিনি ধ্রুব বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন,—সেটী রামায়ণ। তাই গণ্ডগোল বাধিলেও রামায়ণ লইয়াই।

আহারাদির পর প্রীতি তাহার স্বভাব-সিদ্ধ নাকিসুরে পয়ার ভাঁজিতে সুরু করিয়াছে, এমন সময় সুধীর গট্‌গট্‌ করিয়া নীচে আসিয়া বলিল—"মা,—আমার মাথা ধরেছে ভয়ানক।"

মা পুত্রের কথার ভিতরকার ইঙ্গিতটুকু বুঝিয়া মনে মনে চটিলেন,—বলিলেন—"কি কর্‌তে হবে?"

"কর্‌তে কিছুই হবে না;—মাথা ধরেছে জানিয়ে গেলুম।" বলিয়া যেমন আসিয়াছিল, তেমনি দ্রুতপদে উপরে চলিয়া গেল।

রামায়ণ চলিতে লাগিল।

সেইদিন রাত্রে প্রীতি শুইতে আসিয়া দেখিতে পাইল,—সুধীর কি একখানা উপন্যাস বিছানায় শুইয়া খুবই মনোযোগের সহিত পড়িতেছে। সম্মুখের একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া প্রীতি মৃদু মৃদু হাসিতে আরম্ভ করিল। এই নিঃশব্দ হাসির অন্তর্নিহিত লজ্জাটুকু সুধীরকে স্পর্শ করিল। সে হঠাৎ পাশ ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হাস্‌ছ যে?" মৃদুকণ্ঠে জবাব আসিল—"এমনি।" "এমনি! এমনি মানে কি? দিন দিন আস্পর্দ্ধা যে বেড়ে উঠ্‌ছে দেখ্‌ছি। দু'দিন একটু আদর দেওয়া হয়েছে কি না;—কিন্তু তুমি এইটুকু জেনে রেখো যে, দরকার হ'লে ঐ হাসি বন্ধ কর্‌বার শক্তি আমার আছে।" মধ্যাহ্নের মাথা ধরার সমস্ত জ্বালাই সুধীর এই ভাবে উদ্গীরণ করিয়া বাঁচিল।

প্রীতি আহত হইল খুবই; কিন্তু তবুও প্রাণ-পণে মুখের ভাবটা স্বাভাবিক রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সুধীর নিজের মনেই বকিয়া চলিল—"মরণ!

রূপ নিয়ে কি আমি ধুয়ে জল খাব? আচ্ছা, এক অকর্মার ঢেঁকিকে বিয়ে করে জীবনটা ব্যর্থ কর্লুম দেখ্তে পাচ্ছি।" অনেকক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিল—"ছত্রিশ দিন বলেছি যে, রবীন্দ্র-নাথের কবিতা কয়েকটা অন্ততঃ,—বুঝ্তে না পার,—মুখস্থ কোরো। তা' সেদিকে কাণই নেই। রামায়ণ আর রামায়ণ! যেন ঐ রামায়ণ আমার গুষ্টির পিণ্ডি দেবে।" এইরূপে আরও কিছুক্ষণ কাটিল। তারপর হঠাৎ এক সময় সে পাশ ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বলি শুতে কি হবে না? যদি না হয়, তবে আর ঝামেলা বাড়িয়ে কাজ নেই; আলোটা নিবিয়ে দিয়ে সরে পড়।" কোন কথা না বলিয়া প্রীতি গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

তিন

প্রীতির মাসতুত বোন্ লীলা বেড়াইতে আসিয়াছিল। লম্বা দোহারা চেহারা। সমস্ত শরীর ঘিরিয়া একটী সৌকুমার্য্য অপরূপ হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক কথাতেই কারণে অকারণে হাসে। সমস্ত সংসারের সুখ-দুঃখের ঊর্দ্ধে মেয়েটী যেন উড়িয়া বেড়ায়। গৃহে সাজাইয়া রাখিবারও জিনিষ নয়, অথচ গৃহস্থালীর ভিতরেও উহাকে মানায় না।

আসিয়াই সে সুধীরের বইয়ের আলমারী ওলট-পালট করিয়া ক্ষণে ক্ষণে অকারণ উচ্চহাস্যে ঘরখানিকে সচকিত করিয়া তুলিল। "এটা কি বই —'বলাকা?' 'চয়নিকা'—'বিস্মরণী'—'দীপান্বিতা' —এ কি সবই যে কবিতার বই দেখ্ছি—আপনি বুঝি কবি?" সুধীর এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া এই তরুণীটীর চপল কার্য্যাবলী মুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছিল। উত্তরে একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি বলাকা পড়েছ?" "আমি? হ্যাঁ। 'পর্ব্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।' আমার সব চেয়ে ভাল লাগে।"

সুধীর ভাবিতে লাগিল—"সংসারের সেই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যশালী পুরুষকে আমি নমস্কার করি, —যে ইহাকে জীবন-সঙ্গিনীরূপে পাইবে।" নিজের জীবনের সহিত তুলনা করিতে যাইয়া ভগবানের অবিবেচনার দিক্টাই তাহার বেশী করিয়া নজরে পড়িল—তাহার সমস্ত মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। ...প্রীতি এতক্ষণ ঘরের এক কোণে দাঁড়াইয়া প্রসন্নমুখে ভগ্নীর দিকে চাহিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়াই সুধীর যেন অকস্মাৎ মরিয়া হইয়া উঠিল—"এখানে 'হাঁ' করে দাঁড়িয়ে কি দেখা হচ্ছে শুনি? সকালবেলায় আর কোন কাজ নেই? বোন্টী ত আর আজকেই পালিয়ে যাচ্ছে না যাও, নীচে যাও।"

লীলা হঠাৎ চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল; তারপর একবার প্রীতির দিকে চাহিয়া বিবর্ণমুখে সুধীরকে কহিল—"আমিই—" "না, না, সকাল-বেলায় ওর নষ্ট কর্বার মত সময় একটুও নেই। তবুও দাঁড়িয়ে রইলে—যাও।" প্রীতির চোখ ছলছল করিয়া উঠিল - সে কোনও দিকে না চাহিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু এই কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে তাহার অসহায়তার যে ছাপখানি লীলার বুকে অঙ্কিত করিয়া দিল,—তাহাতে লীলার আর একদণ্ডও সে বাড়ীতে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। সে বুঝিল যে, তাহার দিদি অপাত্রে পড়িয়াছে— তাহার নারী-জীবনের সবটুকু আশা-ভরসাই এই একটী মাত্র লোকের স্বেচ্ছাচারী অনুগ্রহ-দৃষ্টির সম্মুখে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। ইহাকে সে সমর্থন করিতে পারিল না—বিবাহের উপরই তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল।

সুধীর লঘুহাস্যে সেই ব্যাপারটাকে তরল করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া দেখিল,—আসন্ন-বর্ষণের ঘনায়মান ছায়া লীলার দৃষ্টির মাঝখানে টলমল করিতেছে!

চার

এক মুহূর্ত্তের বুঝিবার ভুলে দুইটী জীবন যে

হি করিয়া নষ্ট হইয়া যায়,—সুধীর ও প্রীতি তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। প্রীতির রূপ-গুণের অভাব ছিল না; কিন্তু তবুও তাহার মধ্যে কাব্য-প্রীতির একান্ত অভাব দেখিয়া,—সুধীর প্রাণপণ বলে তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল। সে এইটুকু নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল যে, যে নারীর ভিতর রস-বোধ নাই,তাহার সমস্ত অন্তরটাই একেবারে বাজে জিনিষে ভরা। দীনতার সমস্ত লজ্জাটুকু গায়ে মাখিয়া প্রীতি শাশুড়ীকে সাহায্য করিতে লাগিল —আর গৃহিণীও বধূ যে ছেলের আওতায় পড়িয়া খৃষ্টান হইয়া যায় নাই, এই ভাবিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

সেদিন লীলার হঠাৎ প্রস্থানের পর হইতে সুধীর প্রীতির সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াছে। গৃহিণীও এক রকম করিয়া ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া ছিলেন। কিন্তু কর্ত্তা দীননাথই বোধ হয় বুঝিয়া ছিলেন ঠিক্। তিনি অনেকদিন হইতেই পুত্র-বধুকে লইয়া মাতা-পুত্রের নীরব দ্বন্দ লক্ষ্য করিতে ছিলেন এবং প্রীতি যে নীরবে তাহার সকল কামনাকে সেই দ্বন্দের যূপকাষ্ঠে বলি দিতেছে,—ইহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। তাই আজ খাইতে বসিয়া যখন তিনি বৌমার অনুসন্ধান করিলেন,—তখন গৃহিণী বাস্তবিকই অবাক্ হইয়া গেলেন। প্রীতি আসিয়া দাঁড়াইতেই কর্ত্তা স্নিগ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে,—নয় মা?" বধূকে নত মস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন—"তা'ত করবারই কথা; ছেলেমানুষ! কতদিন বাড়ী ছাড়া রয়েছে। আচ্ছা, বেশ আমি শীগ্‌গিরই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি; দু'দিন ঘুরে এস—কেমন?" প্রীতির চোখে যে জল আসিতেছিল,—তাহা কর্ত্তার দৃষ্টি এড়াইল না। "সংসারটা বড় কঠিন জায়গা মা! তোমার আমার মত লোক সেখানে একটু অসাবধান হলেই,—দুঃখের ,আর অন্ত থাকে না! একটু সাবধান হয়ে থেকো,—আর সকলকেই খুসী রাখ্‌বার চেষ্টা কোরো। ন'লে তুমি এটা মনে করো না মা, যে তোমার এই বুড়ো ছেলেটী একেবারে কিছুই বোঝে না। তবে এই আমার মস্ত দুঃখ যে,বুঝেও কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারি নে।" বলিয়া তিনি পুত্রবধূর দিকে চাহিলেন—আর গৃহিণীও কর্ত্তার এই অহেতুক সহানুভূতি প্রকাশের কোন অর্থ আবিষ্কার করিতে না পারিয়া—'হাঁ' করিয়া চাহিয়া রহিলেন। তারপর মনে মনে কর্ত্তার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন—কিন্তু তাঁহার অসন্তোষের ফল ভোগ করিতে হইল প্রীতিকে।

* * *

বর্ষাকাল। সারারাত্রি ধরিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি হইয়াছে। সকালের দিকে বৃষ্টিটা একটু ধরিয়া আসিয়াছে—তবে আকাশের অবস্থা মোটেই ভাল নয়—যে কোন মুহূর্ত্তে আবার আরম্ভ হইতে পারে।

সুধীর কেমন যেন অন্যমনস্কের মত তাহার নিজের ঘরে বসিয়া রহিয়াছে। আষাঢ়ের বর্ষাবারি ধৌত প্রকৃতির দিকে চাহিয়া তাহার কেবলই মনে হইতেছিল। "নারী নাই বা পারিল কবিতা আবৃত্তি করিতে, সে নিজেই ত মূর্ত্তিমতী কবিতা! আজিকার দিনে ঘরের বাদল অন্ধকারে মুখোমুখী বসিয়া পুরুষ কবিতা আবৃত্তি করিবে,—আর নারী তাহার দুইটী চক্ষুর স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়া তাহাকে অভিষিক্ত করিবে। ইহার নামই ত জীবন উপভোগ। দুইটী ডাগর আঁখির নির্ব্বাক্ চাহনি এই বাদল প্রাতে যাহাকে ঘিরিয়া রহিবে,—সেই ত জগতের সমস্ত কবিতার মর্ম্মস্থলে বসিয়া আছে।"

এমন সময় প্রীতি চা লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল—সুধীর ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বাহুবেষ্টনে বন্দী করিয়া কহিল "প্রীতি!—আমার অনাদৃতা অভিমানিনী! এস আজ আমার কাছে থাক।

আমি এতক্ষণ [illegible] তোমাকেই চাচ্ছিলাম।

প্রীতি [illegible] গেল। ইহা তাহার কাছে সম্পূর্ণ নূতন—সংশয়ের অন্ধকারে তাহার চিত্ত দুলিয়া উঠিল। তবুও সে,—আপত্তি মাত্র না করিয়া তাহার এই হঠাৎ পাওয়া অনুভূতিকে বুকের রিক্ত মণিকোঠায় সঞ্চয় করিতে লাগিল। সুধীর তাহার গালে আঙুল দিয়া টোকা মারিয়া কহিল—"একটা যা' হোক কিছু আবৃত্তি কর ত মণি—আমি শুনি।" আজ সকালেই পাঠশালায় মুখস্থ করা বর্ষার একটা পদ্য প্রীতির কেবলই মনে পড়িতেছিল। লজ্জায় লাল হইয়া সে তাহাই আবৃত্তি করিতে লাগিল। "মেঘেতে আকাশ ছাওয়া, বহে বাদলের হাওয়া বৃষ্টি পড়িতেছে থাকি থাকি—"

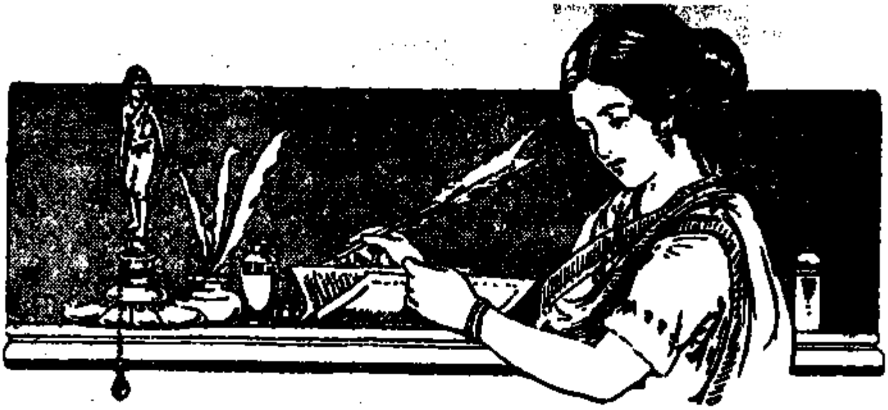
সুধীর হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল - তাহার মুখের উপর হইতে ভাবাবেশটুকু সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া গেল—এবং প্রীতিকে সজোরে বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রীতি সুধীরের এই আকস্মিক প্রস্থানের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া,—বিছানা হইতে যেমন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে,—অমনই গৃহিণী ঝড়ের বেগে সেই ঘরে উপস্থিত হইয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ও! তাই ত বলি বিবি গেলেন কোথায়? এখানে বসে বসে ইয়ারকী দেওয়া হচ্ছিল। তা বেশ! কিন্তু কাল রাত্রের ভাজা মাছগুলো কি ঢেকে রাখা হয়েছিল?"

প্রীতি নীরবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, সে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। গৃহিণী জ্বলিয়া উঠিলেন—"কিন্তু সবগুলো মাছ বেড়ালে খেয়ে গেছে। রাতদিন মন থাকে কোথায়? এসব ন্যাকাপনা আমার সংসারে চলবে না। আহ্লাদের চোটে চোখে-মুখে পথ দেখতে পাওনা—না? ঘাড় ধরে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেব জন্মের মত—ছোট লোকের মেয়ে কোথাকার।" বলিয়া তিনি ঠিক অনুরূপ বেগেই প্রস্থান করিলেন।

প্রীতি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া,—একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া দোতালার বারান্দায় গিয়া যখন দাঁড়াইল—দূরে আম বাগানের মাথায় তখন বৃষ্টি নামিয়াছে!





মালা

কুমারী সুতপা বসু

দুই দিন পূর্ব্বেকার বর্ষার জলে সঞ্জীবিতা একটী ঝরণার পার্শ্বে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শিলা-রাশির মধ্যে একটী ক্ষুদ্র তৃণাচ্ছাদিত ভূমির উপর অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় দুই বন্ধু কথা কহিতেছিল—

বিমল—"বাস্তবিক, তোর পছন্দ আছে। কি সুন্দর এই জায়গাটা! এখানে বস্‌লে আর উঠ্‌তে ইচ্ছে করে না।"

বিজন বন্ধুর কথার উত্তর দিল না; নিজের উদ্গত অশ্রু গোপন করিবার জন্য অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। বিমল আজীবন যে বিজনের অন্তঃ পরিচয় পাইয়া আসিয়াছে; অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া সে প্রশ্ন করিল—"বিজন, তোর চোখেও জল আছে? এতদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়েও ত বুঝ্‌তে পারি নি যে,—তোর মধ্যে এত অশ্রু জমে উঠ্‌ছিল! কি তোর ব্যথা, আমায় বলবি না ভাই?"

আপনাকে একটু সামলাইয়া লইয়া বিজন উত্তর করিল—"কারও কাছে সে কথা আমি বলি নি; বল্‌তে পারি নি! আমার ব্যথা, আমার আনন্দ আমি একলা উপভোগ করিছি; কাউকে তার ভাগ দিতে আমি চাই না!"

বিমল—"আমি তোর বন্ধু, তোর ব্যথার ভাগ আমায় দে?"

বিজন—"আমার ব্যথা, আনন্দ এমনি মিশে আছে যে, ওদের আলাদা কর্‌বার যো নেই। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে—বলি তোকে আমার সমস্ত কথা। এই জায়গাটার স্মৃতি আজ আমায় এতটা দুর্ব্বল করে ফেলেছে যে,—আমার মনে হচ্ছে, আর বুঝি একা আমি এ বইতে পারব না।"

বিমল বিজনের কাছে সরিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"তুই বল।"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া যেন আপনার মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া বিজন বলিতে আরম্ভ করিল—"প্রায় বছর দেড়েক আগে একদিন ঠিক্ এই জায়গাটাতেই শুয়ে তোরই মত মুগ্ধ হয়ে আমি এখানকার শোভা দেখ্‌ছিলাম। এলোমেলো কত কি চিন্তা আমার মনের মধ্যে বয়ে যাচ্ছিল। আমি অন্যমনস্কভাবে এই ঘাসের উপর ছড়ান নানা রঙের ফুল একটার পর একটা ছিঁড়্‌ছিলাম, হঠাৎ পিঠে চাবুকের মত আঘাত খেয়ে লাফিয়ে উঠে দেখ্‌লাম,—একটী মেয়ে একটা গাছের শুক্‌নো ডাল দিয়ে আমায় মার্‌ছে। আমি দাঁড়িয়ে উঠ্‌তেও সে মার বন্ধ কর্‌লে না দেখে আমি তার হাত চেপে ধরে বল্‌লাম—'ব্যাপার কি, আমায় মারছ কেন?' মেয়েটী

সারা দেহ আমার স্পর্শে কেঁপে উঠ্‌ল ; রুদ্ধ কণ্ঠে সে বল্‌লে—'কেন তুমি আমার ফুল ছিঁড়্‌লে, কেন আমার জায়গায়—?' আর সে বল্‌তে পার্‌লে না, ফোঁপাতে ফোঁপাতে ঐ পাহাড়ের বাঁক দিয়ে চলে গেল। প্রথমটা আমি অবাক্ হয়ে আমার অপরাধটা কি ভাব্‌তে চেষ্টা কর্‌ছিলাম, কিন্তু তারপরেই আমি 'হোহো' করে হেসে উঠ্‌লাম। আমার মনে হলো, পাগল, মেয়েটা নিশ্চয় পাগল!"

বিমল—"কত বড় মেয়ে ?"

বিমলের প্রশ্নে বিজন সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল ; বলিল—"বড়—কত বড় ? হ্যাঁ তা কুড়ি-বাইশ বছরের হবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য বিমল! ঐ মার খাবার পর চার মাস প্রতিদিন তার সঙ্গে আমার এইখানে দেখা হয়েছে, সে বড় কি ছোট, এ কথা একবারও আমার মনে ওঠে নি। আজ যদি তুই জিজ্ঞাসা করিস, সে দেখ্‌তে কেমন? তাও হয় ত তোকে ঠিক করে বল্‌তে পার্‌ব না।"

বিজন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। বিমল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"তারপর ?"

বিজন পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল—"পর-দিন বিকালে আমি কতকগুলি ভাল গোলাপ-ফুল এনে এই জায়গাটায় ছড়িয়ে দিয়ে ঐ পাথ-রের উপর বস্‌লাম। আমার কেন মনে হচ্ছিল জানি না, ওই মেয়েটি আজও আবার আস্‌বে। কিছুক্ষণ বসে থাক্‌বার পর দেখ্‌লাম, সেই মেয়েটী কতকগুলি পাহাড়ে ফুল নিয়ে এইখানে এল ; তার সঙ্গে একজন বৃদ্ধ। মেয়েটী গোলাপফুলগুলো দেখে একটু আশ্চর্য্য হয়ে চারিদিকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। আমার উপর তার চোখ পড়্‌তেই মনে হলো, যেন সে লজ্জায় একটু জড়সড় ; তার সঙ্গী সেই বৃদ্ধের কাছে গিয়ে কি বল্‌লে। বৃদ্ধটিকে আমার দিকে আস্‌তে দেখে আমি উঠে দাঁড়ালাম। বৃদ্ধটী আমার কাছে এসে আমাকে নমস্কার করে বল্‌লেন—'কাল আমার পাগল মেয়েটী আপনার কাছে অপরাধ করে গিয়ে আজ আমাকে সঙ্গে করে এনেছে,—মাপ চাইবার জন্য। আপনি মাপ কর্‌লেন ত ?' শেষের কথাগুলো বল্‌বার সময় বৃদ্ধের গলা একটু কেঁপে গেল। আমি তাড়াতাড়ি তাঁর হাত ধরে বল্‌লাম—'না, না, আমি কিছু মনে করি নি। আমি নিশ্চয়ই অজা-নত কিছু অন্যায় করেছিলাম, তাই উনি—' বৃদ্ধ তাঁর কন্যাকে কাছে ডেকে বল্‌লেন—'বুনো, তুই বাড়ী যা মা, আমি একটু পরে যাচ্ছি।' বুনো—'তুমি ত একলা যেতে পার্‌বে না বাবা।' বৃ—'পার্‌ব, তুই যা ;—না হয় এই বাবুটী আমায় একটু এগিয়ে দেবেন।' মেয়েটী চলে গেল। তারপর সেই বৃদ্ধের মুখ থেকে শুন্‌লাম, আমার অপরাধের কথা। ছ' বৎসর আগে বৃদ্ধ তাঁর এই মেয়ে আর জামাই নিয়ে এখানে বেড়াতে এসেছিলেন। জামাইটী হঠাৎ এইখানে মারা যায় ও তাকে এই জায়গাটিতে পোড়ান হয়। তার মেয়ে স্বামীর শোকে প্রায় উন্মাদ হয়ে ওঠে। সে কিছুতেই আর এ জায়গা ছেড়ে দেশে ফির্‌তে চায় না। বাধ্য হয়ে বৃদ্ধকে এই খানেই থাক্‌তে হয়। মেয়েটী প্রতিদিন বিকালে তার স্বামীর চিতার উপর কতগুলি করে ফুল রেখে যায়। আমাকে সেই ফুল ছিঁড়্‌তে দেখে সে প্রায় উন্মাদ হয়ে ওঠে।"

বিমল—"মানুষ অজানত কি ভীষণ অন্যাই না কর্‌তে পারে!"

বিজন—"তারপর দিন আবার কতগুলি ফুল নিয়ে আমি এখানে এসেছিলুম। বুনোও তার প্রাত্যহিক ফুল নিয়ে এখানে এসে আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি তার হাতের ফুলগুলো এখানে ছড়িয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। তার সেই ব্যস্ত পলায়ন-পরতা আমাকে চাবুকের মত আঘাত কর্‌লে! এক-জনের গোপন-পূজার কত না বিঘ্ন আমি দিচ্ছি!

আমি তাকে ডাক্‌লাম। সে থম্‌কে দাঁড়াল। আমি তার কাছে গিয়ে বল্‌লাম — না জেনে আপনার কাছে যে কত বড় অন্যায় করেছি, তার সীমা নেই! মাপ চাইতে পর্য্যন্ত ভরসা হচ্ছে না! আপনি আমার মাপ কর্‌তে পার্‌বেন কি?' মেয়েটী চোখ নীচু করে বল্‌লে —'আপনার ত দোষ নেই, আপনি ত জান্তেন না, আমারই অন্যায় হয়েছে। আমার মাপ করুন।' আমি বল্‌লাম—'বেশ অন্যায় যখন দুজনেরই হয়েছে, তখন আপনিও আমায় মাপ করুন।' মেয়েটীর ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌ল। সে বাড়ী যাবার জন্যে পা বাড়ালে। আমি বল্‌লাম—'আপনি ত কই আমায় মাপ কর্‌লেন না? আপনার পূজা আজ অসমাপ্ত রেখেই চলে যাচ্ছেন? আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার জন্যই আজ আমি এসেছিলাম; এখনি চলে যাচ্ছি।' 'না, না, আপনি থাকুন না; আমি ত এখানে বেশীক্ষণ থাকি না; বাবা আবার একলা থাকতে পারেন না। আমি যাই।' 'আপনার কাছে একটী ভিক্ষা যদি চাই, দেবেন কি? মাঝে মাঝে আমিও যদি দু'-চারটী ফুল এখানে রেখে যাই, আপনার তা'তে আপত্তি আছে?' মেয়েটীর চোখ-মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ল; সে ঘাড় নেড়ে তার আপত্তি নেই জানিয়ে চলে গেল।"

বিমল—"ওঃ, কি নিষ্ঠুর ভিক্ষাই তুই চেয়েছিলি!"

বিমলের কথা বিজন শুনিতেই পাইল না। সে আপন-মনে বলিয়া যাইতে লাগিল—"তার পর চার মাস যেন আমার স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কেটে গেল। প্রতিদিন আমি ফুল নিয়ে এখানে আস্‌তাম; প্রতিদিন তার সঙ্গে আমার দেখা হতো। দিনে দিনে তিল তিল করে সে তার মনের সঞ্চিত সমস্ত বেদনা আমার কাছে উজাড় করে দিলে। তাদের স্বামী-স্ত্রীর তিন বৎসরের দাম্পত্য-জীবনের ঘটনা আমার কাছে সে কত বিচিত্র মধুর করেই না বল্‌ত! আমি শুধু তার কথা শুন্‌তাম। বহুবার শোনা কথাও যখন ফের শুন্‌তাম, আমার মনে হতো, যেন সে কথা এই প্রথম শুন্‌লাম! তার কাছ থেকে বাড়ী ফিরে এসে রোজই ভাব্‌তাম, কাল তাকে এই কথাগুলো বল্‌ব। কিন্তু তার কাছে গেলে তার সে, আত্মহারা ভাবের কাছে আমার সমস্ত কথা ভেসে যেত। কোন দিনও তাকে আমার কি বল্‌বার বল্‌তে পারি নি। একদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে— 'কাল আস্‌বেন ত?' চার মাসের মধ্যে প্রশ্ন সেদিন সে আমাকে সেই প্রথম কর্‌লে। আমারও মুখ দিয়ে কেন জানি না, বেরিয়ে গেল— 'কাল ত আস্‌তে পারব না।' নিমেষে ব্যথায় তার মুখ ম্লান হয়ে গেল; সে মাথা নীচু করে বল্‌লে—'আস্‌তে পার্‌বেন না? কাল যে বছরের আমার সেই স্মরণীয় দিন! আপনাকে কাল একটু বেশী ফুল আন্‌বার কথা বল্‌ব ভাবছিলাম।' তার সেই বেদনা-কাতর মুখ আমার বুকটা ভরিয়ে দিলে। অপূর্ব্ব আনন্দের সঙ্গে মনে হলো, আমার না আসা একে ব্যথিত করে;— নিমেষে কত আশা, আশঙ্কা, ভয়, আনন্দ আমার বুকটা তোলপাড় করে দিয়ে গেল! আমার মনের সমস্ত উন্মাদ চিন্তা থেমে গেল তার দ্বিতীয় করুণ প্রশ্নে—'কাল তা' হলে আপনি একেবারেই আস্‌বেন না?' আমি বল্‌লাম—'নিশ্চয়ই আস্‌ব। আমি তোমায় ঠাট্টা করে বলেছিলাম। তুমি ব্যথা পাবে জান্‌লে কখনও ও কথা বল্‌তাম না।' সেদিন তার কাছ থেকে বাড়ী ফিরে গিয়ে আমার নৈশ-চিন্তায় প্রথম উপলব্ধি কর্‌লাম,— ব্যথাও কত সুন্দর হতে পারে;—একজনের ব্যথাও অপরকে কতখানি আনন্দ দিতে পারে।"

বিজন চুপ করিল। বিমল অস্ফুট চন্দ্রালোকিত ঝরণার দিকে শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া

রহিল। আরও কতক্ষণ হয় ত উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া থাকিত, কিন্তু অদূরে শিবাদলের চিৎকারে বিজনের চমক ভাঙিয়া গেল। সে বলিল—"হাঁা, কি বলছিলাম,—হাঁা, তারপর দিন ঠিক এইখানে ফুলগুলো গোছাতে গোছাতে কখন আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ চমকে উঠে দেখি,—বুনো আমার গলায় এক ছড়া মালা ফেলে দিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে হাসছে। সমস্ত রক্ত আমার নেচে উঠল। আমি দাঁড়িয়ে উঠে তার হাত দু'খানা আমার হাতের মধ্যে নিয়ে বললাম—'সত্যিই কি মালা দিলে?' তার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। আমি তাকে আস্তে আস্তে এইখানে বসিয়ে দিলাম। তারপর তার সে কি কান্না! আমি পাথরের মূর্ত্তির মত তার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ পরে তার কান্নার বেগ একটু কমে এলে আমি ডাকলাম—'বন্যা, বন্য!' সে আর্ত্ত-কণ্ঠে বলে উঠল—'না,—না,—আপনি যান্ এখান থেকে! কেন আমার এ সর্ব্বনাশ করলেন? আমি ত কোন অপরাধ কারও কাছে করি নি! কেন এ শাস্তি আমায় দিলেন?' 'আমিও ত তোমার কাছ থেকে এ মালা চাই নি?' আমার বাধা দিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে বলতে লাগল— আমার ভেতরে-বাইরে যে স্বামী দেবতাকে সব সময় দেখতে পাচ্ছি, মালা যে আমি তাকেই দিয়েছি! সে ভুল ভেঙে দিয়ে কেন আপনার ওপর আমার এতবড় বিশ্বাস নষ্ট করে দিলেন? আমার প্রাণঢালা পূজা ব্যর্থ করে আপনার কি লাভ হলো? যান্, যান্, আপনি দয়া করে এখান থেকে' আর সে বলতে পারলে না; মুখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি আমার গলা থেকে মালা খুলে তার পাশে রেখে অপরাধীর মত ধীরে ধীরে এখান থেকে চলে গেলুম।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিমল জিজ্ঞাসা করিল—"আজ তবে আবার কেন তুই এখানে ফিরে এসেছিস্?"

বিজন—"না এসে কিছুতেই থাকতে পারলাম না! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে আমায় জোর করে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে! বিমল, কালই তুই দেশে ফিরে যা। আমায় এইখানেই থাকতে হবে।"

বিমল—"কি নিষ্ঠুর তুই বিজন! তাকে এত শাস্তি দিয়েও তোর মন উঠে নি! আবার তুই তাকে—"

বিজন—"না রে, সে ভয় আর নেই! আমার যে ভুল এতদিন ধরে তার কাছে ক্ষমা চাইবার জন্য অন্তরের দ্বারে মাথা কোটাকুটি করছিল, তাকে কিছুতেই উপেক্ষা করতে না পেরেই ত এখানে এসেছি ভাই! কিন্তু কই সে? একটা ফুলও কি তুই আশে-পাশে ছড়ান দেখতে পাচ্ছিস্? বিমল,—বিমল,—ওই, ওই বুঝি সে আসছে!" বলিতে বলিতে সে পার্শ্বস্থ একটা কুটীরের দিকে ছুটিয়া চলিল। বিমল তাড়াতাড়ি তাহাকে পশ্চাৎ দিক হইতে ধরিয়া ফেলিয়া ডাকিল—"বিজন, বিজন!"

নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় বিজন উত্তর করিল—"অ্যাঁ!"

বিমল—"অনেক রাত হয়ে গেছে ভাই; চল, বাড়ী ফেরা যাক্।"

বিজন—"চলো।"



দমকা বাতাস

শ্রী নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

এক

বেলা তখন অনেকটা বাড়ার পথে চলিয়াছে।

জমিদার-বাবুর একমাত্র পুত্র কান্তিভূষণ তখন বাহিরের ঘরে বসিয়া কোনও একখানা প্রাচীন ইতিহাসের একটা পাতায় তাহার সমস্ত সত্বাকে ডুবাইয়া দিয়াছিল।

হঠাৎ একটী যুবক দ্রুতপদে আসিয়া তাহার পদপ্রান্তে মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করিয়া সহাস্যমুখে বলিল—আপনিই দাদা?—আমি শান্তি! ওঃ, কি পাহারাই রেখেছেন, ব্যাটারা কি সহজে ঢুকতে দেয়!

শান্তির মুখের দিকে আশ্চর্য্য দৃষ্টি ফেলিয়া কান্তি বলিল—কে আপনি—কি চান?

হাস্য-মধুরকণ্ঠে শান্তি বলিল—"আপনি নয়—আপনি নয়—তুমি? আমি আপনার ছোট ভাই।

আশ্চর্য্যের মাত্রা কান্তির বাড়িয়া উঠিল। দ্বারবান আসিয়া বলিল—হুজুর এ মারা হ্যায়।

এক লহমায় কান্তির সমস্ত ভাবের ওলট-পালট হইয়া গেল। ক্রুদ্ধকণ্ঠে শান্তিকে বলিল—কেন মেরেছ; একে মেরে কাকে অপমান করেছ জান?

ধীর সংযতকণ্ঠে শান্তি বলিল—দরিদ্রের আত্ম-সম্মানকে যারা এতখানি অবজ্ঞার চোখে দেখে, এর চেয়ে বেশী শাস্তি তাদের দেওয়া দরকার। কিন্তু আমি ওকে মারি নি সেদিক দিয়ে; আমি মেরেছি, আমার দাদার চাকরকে তার অবাধ্যতার জন্যে।

কান্তিভূষণ পুনরায় নিজেকে হারাইয়া ফেলিল—তাহাকে একটা কথাও বলিতে পারিল না; দ্বার-বানকে কেবল বলিল—যাও।

সে চলিয়া গেলে সম্মুখের চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িয়া শান্তি বলিতে লাগিল—বসতে যখন বললেন না দাদা তখন নিজেই বসি। অনুমতির চেয়ে ছোট ভাইয়ের দাবী নিয়ে বসে পড়াই ভাল; কি বলেন, এঁ্যা!

কান্তিভূষণের মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। এতদিন ধরিয়া সে এতলোকের সহিত মিশিয়াছে, কিন্তু ইহার কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একজন অতি সাধারণ মানুষ যে নিতান্ত আপনার মত তাহার সহিত কথা বলিতে পারে, সে ধারণা তাহার ছিল না। সে কেবল এই নবাগতের মুখের দিকে চাহিয়া হতভম্বের মত বসিয়া রহিল।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া আর্দ্রকণ্ঠে শান্তি বলিতে লাগিল—আপনার একটু পায়ের ধূলো পাবার আকুল আগ্রহ নিয়ে কতদিন ঘুরে ঘুরে ফিরে গিয়েছি দাদা, আজ যদি সেই সৌভাগ্যই হ'ল,—ছোট ভাই বলে আশীর্ব্বাদ করুন; দুটো কথা বলুন।

ঘুমের দেশ হইতে কান্তি যেন ফিরিয়া আসিল; বলিল—সবই যে হেঁয়ালির মত মনে হচ্ছে!

শান্তি বলিল—তাত হবেই,…আমি—

তাহার আর বলা হইল না; গণেশ রায় সেই-স্থানে দেখা দিয়া রোষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—দরোয়ান, নিকাল দেও ইস্কো।

শান্তির সমস্ত শরীরে যেন তড়িৎ খেলিয়া গেল। কিন্তু মুহূর্তেই নিজেকে সম্বরণ করিয়া তাহার পদধূলি লইয়া বলিল—ও! আপনি? অতটা করতে হবে না, আমি যাচ্ছি। এর পর কিন্তু কোন ভদ্রলোক বাড়ীতে এলে একটু বুঝে-সুঝে অপমান করবেন। কি জানি, উল্‌টে যদি সে অপমান আপনাকেই লাগে।

একটা দমকা বাতাসের মত শান্তি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গণেশ রায় বলিলেন—এই ধরণের লোককে বাড়ীতে ঢুকতে দেবে না একেবারে। এ সব জুয়া-চোরের দল, বুঝলে?

বিমূঢ়ের মত কান্তি সেইখানেই বসিয়া রহিল।

দুই

কান্তিভূষণের সদাপ্রফুল্ল অন্তরে নবাগত একটা উৎকণ্ঠার ছাপ দিয়া গেল। কে এই শান্তি; স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া অনুজের দাবী প্রার্থনা করে? কি অসঙ্কোচ ব্যবহার! কি সুন্দর কুণ্ঠাহীন আলাপ! —যেন কত জন্ম-জন্মান্তর হইতে আপনার হইতেও আপনার সে; অথচ, পিতা তাহাকে জুয়াচোর বলিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিলেন না;—সত্যই কি সে তাই?

সমস্যার সমাধান হইল না; বারবার শান্তির হাস্যোদ্দীপ্ত মুখখানি তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে আত্মহারা করিয়া দিতে লাগিল।...দাদা, আপনার ঐ পায়ের একটু ধুলো পাবার সৌভাগ্যই যদি আজ হ'ল, ছোট ভাই বলে দুটো কথা কন।

সে যেন কেমন এক রকম হইয়া উঠিল। প্রাণের মধ্যে কিসের একটা শিহরণ খেলিয়া যাইতেই সে উঠিয়া ঘরখানার মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিল।...হঠাৎ গণেশ রায়কে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া ডাকিল—বাবা!

উত্তরে গণেশ-বাবু বলিলেন—কি কান্তি, কিছু বলবার আছে?

কান্তি জিজ্ঞাসা করিল—শান্তি কে?

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গণেশ-বাবু বলিলেন—কেন, তোমায় ত বলেছি—জোচ্চোর; আজকাল কোলকাতায় এই রকম লোক বিস্তর। বিলাসের কথা জান ত?

হঠাৎ যেন কান্তির চমক ভাঙিয়া গেল। সত্যই ত ইডেন উদ্যানে বেড়াইতে গিয়া বিলাস-বাবু কি দুর্দ্দশাতেই না পড়িয়াছিলেন! কি শুভ-ক্ষণেই কথাটা পিতার নিকট তুলিয়াছিল সে; তাহা না হইলে হয় ত জুয়াচোর শান্তির হাতে পড়িয়া কতখানি লাঞ্ছনাই না তাহাকে ভোগ করিতে হইত!

অন্তরের মধ্যে যে অশান্তির দাপাদাপি সুরু হইয়াছিল, গণেশ রায়ের এই সামান্য কথায় সেটা কোথায় উড়িয়া গিয়া পুনরায় সে পূর্ব্বের কান্তিভূষণই হইয়া দাঁড়াইল।

তিন

তবুও তাহার অনুসন্ধিৎসু চক্ষু দু'টী কান্তি জানালার ফাঁক দিয়া পথের মাঝে ফেলিয়া রাখে; ...যদি কোনও দিন শান্তির মুখখানা সে দেখিতে পায়! জুয়াচোর হইলেও অমন সুন্দর মুখখানি দূর হইতে একবার দেখিতে দোষ কি?

দোষ না থাকিলেও আকাঙ্ক্ষিতের সাক্ষাৎ তাহার আর মিলিল না; আপন-মনেই এক-এক-দিন সে বলিয়া উঠিত—দূর হোক, এমন ভাবে সে আর চাহিয়া থাকিবে না।

সেদিন অপরাহ্নে কান্তি যখন ম্যানেজারের সহিত জমিদারীর সম্বন্ধেই কথা বলিতেছিল, দার-বান কতকগুলো পত্র সেইখানে দিয়া গেল। কথা বলা বন্ধ করিয়া পত্রগুলির এক একখানি করিয়া সে পাঠ করিতে করিতে একখানা খাম ছিঁড়িয়া পত্রখানার নিম্নদেশে প্রেরকের নাম দেখিতে গিয়া দেখিতে পাইল,—দস্তখত করিয়াছে শান্তিভূষণ সরকার।

তাহার সমস্ত দেহের মধ্যে তড়িৎ খেলিয়া

গেল। এই কি সেই দিনের সেই জুয়াচোর শান্তি? পত্রখানা পড়িবার জন্য তাহার চিত্তের সবটুকু আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেই এক নিঃশ্বাসে লেখাটা সে শেষ করিয়া ফেলিল।

খামে আঁটা হইলেও পত্রখানা খুবই ছোট, দুর্বোধ্য; তাহাতে লেখা ছিল—

শ্রীচরণেষু—

দাদা!

কাক কাকের মাংস না খাইলেও মানুষ যে মানুষের মাংস খাইবার জন্য সব সময়েই ব্যগ্র, সেটা যখন বুঝিতে পারিলাম, তখন সেই নর-খাদকের চেতনাটুকুকে জাগ্রত করিয়া দিবার জন্য আকুল আগ্রহ লইয়া অনেকবার তার দ্বারে গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি; কড়া প্রহরী ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারি নাই। যতটুকু সময়ের জন্য তোমাকে পাইয়াছিলাম, তাহাতেই দু'টা কথার মধ্য দিয়া তোমাকে সবই বলিয়া আসিয়াছি। অপমানিত হইবার ভয়ে যাইতে আর সাহস হয় না; তবে ভরসা আছে, কাকের স্নেহযত্নে কোকিল পরিপুষ্ট হইলেও যখন সে বুঝিতে পারে যে, সে ভিন্নজাতীয়, তখনই সে সে আশ্রয় ত্যাগ করে।… আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। ইতি—

শ্রী শান্তিভূষণ সরকার

কান্তিভূষণের অন্তরে সমুদ্র মন্থন শুরু হইল।… সেটাকে সে কোনরূপে সামলাইয়া লইয়া পত্রখানাকে পকেটের মধ্যে রাখিয়া ম্যানেজারকে বলিল—আজ আপনি যান।

তিনি চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই কিন্তু কান্তি ডাকিল—ম্যানেজারবাবু! তাহার মুখের দিকে ফিরিয়া তাকাইতেই কান্তি বলিল—আমার জীবনের ইতিহাস কিছু আছে বলে আপনি জানেন?

বিস্মিতভাবে ম্যানেজার বলিলেন—কি বলছেন?

ও, আপনি তা হলে জানেন না!—বলিয়া কান্তি বলিল—আচ্ছা, আপনি যান।

ম্যানেজার চলিয়া গেলেন। সেইখানে বসিয়াই কান্তি চিন্তার কাঁটাবনে বেড়াইতে লাগিল।

এই পত্রখানা তাহাকে এমনই অভিভূত করিয়া দিল যে, সে কোনও কাজে বেশ ভাল করিয়া মন দিতে পারিল না; যখন কাজে মন দিতে যায়, তখনই শান্তির পত্রের প্রত্যেক অক্ষরগুলা জলজল করিয়া দেখা দিয়া কাজকর্মের সমস্ত স্পৃহা যেন লোপ করিয়া দেয়।…সে পুনরায় পত্রখানা পড়িয়া বসে;—অথচ, মাথা-মুণ্ড তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না।

সেদিন পত্রখানা পড়িতে পড়িতে তাহার সমস্ত চাঞ্চল্যকে দূরে সরাইয়া দিয়া সে স্থির করিল,—শান্তির নিকট গিয়া সে সমস্ত সমস্যার সমাধান করিয়া আসিবে। মনে হইতেই কোথা হইতে বিলাস-বাবুর কথাটা মনে পড়িয়া গেল। এই ধরণের সজ্জন ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তিনি কি ভদ্রানকতারই না প্রতারিত হইয়াছিলেন! ইডেন উদ্যানে ভ্রমণ শেষ করিয়া যখন তিনি তাঁহার মোটরে উঠিবেন, ঠিক সেই সময়েই একটী স্ত্রীলোকের কথায় দয়া দেখাইতে গিয়া অবশেষে একখানা গামছা পরিয়া তাঁহাকে বাড়ী আসিতে হইয়াছিল।

শান্তির সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা অদূরাগত আশঙ্কার মাঝে মিলাইয়া গেল।

চার

একদিন ইলা ধরিয়া বসিল—অনেক দিন বায়স্কোপ দেখা হয় নি, আজ যাবে? চল না।

কান্তিরও আজ কয়দিন হইতে সেই ইচ্ছাই হইতেছিল; বলিল—বেশ ত, চল না।

পথে গাড়ীতে বসিয়া কান্তি ইলাকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা ইলা, আমার অতীত জীবন

বলে কিছু আছে কি না বাবা বা মার কাছে কিছু শুনেছ ?

একটু তিরস্কারের ছলে ইলা বলিল—আচ্ছা, তুমি আজকাল কি হয়ে পড়েছ বল ত ? কেন তুমি এমন সব ঘোলাটে ব্যাপার নিয়ে দিনরাত মাথা ঘামাচ্ছ—যাচ্ছি বায়স্কোপে—"

ঈষৎহাস্যে কান্তি বলিল—কেন ঘামাই ? আপনা হতেই যে মনের মধ্যে এসব প্রশ্ন জেগে ওঠে ইলা ! সেদিন তোমাকে শান্তির কথা বলেছিলুম না ? তারপর আবার এই দেখ বলিয়া কান্তি পকেট হইতে শান্তির লিখিত পত্রখানা বাহির করিয়া স্ত্রীর হাতে দিল।

পত্রখানা পড়িতে পড়িতে ইলা গম্ভীর হইয়া গেল ; বলিল—বুঝ্‌তে ত পার্‌ছি না কিছু। এ শান্তি কে ?

সস্মিতমুখে কান্তি বলিল—সেই যে সেই জুয়াচোর,—সেই শান্তি। পত্রখানা পাবার পর অনেক বার মনে হয়েছে, ঐ ঠিকানায় গিয়ে একবার তার সঙ্গে দেখা করে আসি ; কিন্তু সাহস করি নি—সত্যই যদি জুয়াচোরের আড্ডা হয়। তবুও ইলা, আমার মনের মধ্যে কে যেন বারবার এই কথাটাই বলে দিচ্ছে,—আমার জীবনের কিছু যেন একটা ইতিহাস আছেই ; তা' না হলে কে এই জুয়াচোর শান্তি, যার মুখখানা দেখে অবধি তার ওপর কেমন একটা স্নেহে বুক ভরে উঠেছে ! তার মুখখানা আর একটীবার দেখ্‌বার জন্যে মনের ভেতর কি যে আকুল আবেগ দেখা দিচ্ছে,...অথচ সাহস কর্‌তে পার্‌ছি নি !

স্নিগ্ধকণ্ঠে ইলা বলিল—কই, এ চিঠি ত তুমি আমাকে পূর্ব্বে দেখাও নি ?

—না ইলা, দেখাই নি। এই জুয়াচোরের হাত হতে আমাকে রক্ষা কর্‌বার জন্যে তোমরা সবাই মিলে যে রকম চেষ্টা কর্‌ছ, তা'তে এই চিঠিখানা দেখালে—

তাহার পর আর বলা হইল না, হঠাৎ কাণে আসিল—দাদা—দাদা !

মুখ ফিরাইয়া কান্তি দেখিল—শান্তি। বলিল—এই সেই শান্তি ইলা !

সোফারকে ইলা বলিল—গাড়ি ফেরাও।

মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিয়া কান্তি বলিল—না—চালাও।

স্মিতমুখে ইলা বলিল—কেন ভয় হ'ল না কি ? চল না জুয়াচোরের আড্ডাটা একবার দেখেই আসা যাক্—দু'জন যখন রয়েছি—

—আজ থাক্, আর একদিন আসা যাবে।—

ইলার মুখখানা মেঘ-মেদুর আকাশের মত থমথমে হইয়া গেল।

সিনেমা-ঘরে বসিয়া কান্তি বলিল—খুব দুঃখ হয়েছে, না ইলা ? আমারও কি সেটা কম হয়েছে ? কিন্তু আমার সন্দেহটা যদি সত্যই হয়, নিজেদের ড্রাইভার, ওখানে যাবার কথা যদি বাবার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে ? তার চেয়ে ট্যাক্সিতে আর একদিন আসা যাবে।

কণ্ঠে ঔৎসুক্য আনিয়া ইলা বলিল—কালই কিন্তু।

কান্তি বলিল—বেশ ত।

সেদিন তাহারা ছবি দেখিল বটে, কিন্তু তৃপ্তি কিছুতেই পাইল না।

পাঁচ

কান্তি ও ইলা তাহাদের ইচ্ছামত কখনও বাড়ীর মটর, কখনও ট্যাক্সি ব্যবহার করিত, তাহাতে গণেশ রায় কখনও কোনও আপত্তিই করেন নাই। বিপুল আয়ের অতুল সম্পত্তি দু'-পাঁচশো টাকা তাহারা বাজে খরচ করিলেও তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতেন না।

কথামত পরদিন দ্বিপ্রহরেই কান্তি ও ইলা বাহির হইয়া পড়িল।

রৌদ্র তখন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে।

যখন তাহারা নির্দিষ্ট পথের উপর আসিয়া পড়িল, তখন সেখানটা জনমানবশূন্য। কান্তি ট্যাক্সির উপরে বসিয়াই ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ইলা নামিয়াই বলিল—নেমে এস।

কান্তি বলিল—কোথায় খুঁজব?

—এসে যখন পড়া গেছে—আবিষ্কার করতেই হবে—

আবিষ্কার করিতে তাহাদের বড় বেশী বিলম্ব হইল না। পথের ধারে একটা সরুগলি; গলির প্রথম ভাগটাতে খান দুই পাকা ঘর, তারপর লম্বা সারি সারি খোলার ও টিনের বস্তি।

গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইলা দেখিতে পাইল, একটী বৃদ্ধা একখানি বাড়ী হইতে আর একখানি বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন। জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ মা শান্তিভূষণ কোন্ বাড়ীতে থাকে বলতে পারেন? বেশ সুন্দর টুকটুকে ছেলেটী মাথায় কোঁকড়া চুল।

বৃদ্ধা একটা টিনের বাড়ী দেখাইয়া দিলেন।

উভয়ে কতকটা পথ অগ্রসর হইতেই দেখিতে পাইল,—একটা জানালার ভিতর দিয়া শান্তি তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া হাস্যোজ্জ্বল-মুখে বলিতেছে—এই যে দাদা!…ও মা! দাদা এসেছেন!

এক লহমায় শান্তি সেই স্থান হইতে সরিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া ইলাকে বলিল—আপনি বুঝি বৌদি'?

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে উভয়ের পায়ে মাথা নত করিল। মাথা তুলিয়াই দেখিতে পাইল,—তাহার মা সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন—মলিন বেশ, রুক্ষ অলক দাম।

তেমনই ভাবেই শান্তি বলিল—দাদা আর বৌদি' গো মা!

ক্ষেমঙ্করীর চক্ষু দিয়া তখন জল গড়াইয়া পড়িতেছিল।…কবে কোন্ অতীত দিনের হারানধনকে আজ অকস্মাৎ তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া তাঁহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।

ইলা তাহাকে প্রণাম করিতেই তিনি তাহাকে দুই বাহুর মধ্যে জড়াইয়া আনন্দের ধাক্কাটাকে সামলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তারপর কান্তিকে বলিলেন—তোরা যে এমন করে আসবি কান্তি, সেটা কিছুতেই ধারণা করতে পারি নি; আয় বাবা, আয়!

তাহার হাতখানা ধরিতেই সে ঠিক মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহার নিকট সরিয়া আসিয়া প্রণাম করিতেই মা তাহাকে বুকের মাঝে জড়াইয়া ধরিয়া সজল চোখে স্নেহ চুম্বনে তাহার মুখখানাকে ভরাইয়া দিলেন।…তাঁহার মনে হইল, এই পরিপূর্ণ যৌবনে সেই কান্তি! একবৎসরের হারান শিশুটা!

ইলা জিজ্ঞাসা করিল—বাবা কোথা মা?

শান্তি বলিল—এই যে আসুন না বৌদি'।

একখানা টিনের ঘরের ভিতর তাহারা যখন প্রবেশ করিল, শান্তির বৃদ্ধ পিতা মোহনলাল তখন একখানা সিক্ত গামছা মাথার উপর রাখিয়া হাত-পাখা লইয়া হাওয়া খাইতেছিলেন।

ইলা ও কান্তি তাহাকে প্রণাম করিলেও তাহার মুখ দিয়া একটা আশীর্ব্বচনও বাহির হইল না, গাঢ়স্বরে কেবল বলিলেন এসেছিস তোরা!

সূর্য্যের তাপ টিনের ছাদ ভেদ করিয়া ঘরখানাকে তখন অগ্নিময় করিয়া তুলিতেছিল। ইলা তাঁহার নিকটে ঠিক ছোট মেয়েটীর মত বসিয়া রহিল।…কথা কহিবার জন্য তাহার অন্তর ব্যগ্র হইয়া উঠিলেও হঠাৎ মুখ দিয়া কোনও কথাই বাহির হইল না; নিথর নিস্তব্ধ ঘরখানার মধ্যে সকলেরই জিহ্বা যেন দাঁতের সঙ্গে স্ক্রু দিয়া আঁটা। বাহিরে কেবল বায়স কুলের 'কা-কা' শব্দ।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেলে মোহনলাল শান্তিকে বলিলেন—তোর দাদা আর বৌদি'কে

জল-টল কিছু খেতে দে ; এই গরমে ওদের প্রাণ যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

কথা বলিবার একটা সূত্র পাইয়া সস্মিত মুখে ইলা বলিল—তার চেয়ে বেশী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি বাবা,—আপনাকে কোনও কথা বল্‌তে না দেখে।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে মোহনলাল বলিলেন—বল্‌বার অধিকার যে নিজেদের হাতে ঘুচিয়ে দিয়েছি মা! তবে এই কথাটা বল্‌তেই তোরা আজ আমার স্পর্দ্ধা জাগিয়ে দিয়েছিস যে, আজ যেমন এসেছিস মা, এমনই ভাবে এসে তোর গরীব শ্বশুরের,—না, না মা, অন্ততঃ একটা গরীব লোকের খোঁজ-খবর যদি রাখিস, তবে সে হয় ত আরও কিছুদিন বাঁচ্‌তে পারে।

মোহনলাল সেখান হইতে হঠাৎ উঠিয়া বাহিরে গেলেন।

যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন সজলচক্ষে ক্ষেমঙ্করী বলিতে শুরু করিয়াছেন—গণেশ রায় আর আমরা তখন এক বাসাতেই থাকতুম। অবস্থা তাদের তখন ভাল ছিল না; গণেশের স্ত্রীর "হবে না, হবে না" করে একটী ছেলে ভগবান তাদের কোলে পাঠিয়ে দেন ;—তখন কী তাদের আনন্দ! কিন্তু চার মাসের শিশুটীকে মৃত্যু যখন কোল হতে ছিনিয়ে নিলে, তখন তাদের বুক চাপড়ে সে কী কান্না!···কান্তিকে মাঝে মাঝে গণেশের স্ত্রীর কোলে দিতুম ;—তাকে নিয়ে যদি সে অন্যমনস্ক থাকে। সেও তাকে নিয়ে স্তন পান করাত ; মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বল্‌ত—দিদি, কান্তি আমার, ওকে আর ছাড়্‌ব না।

তারপর হঠাৎ একদিন গণেশ রায় লটারিতে না কিসে অনেক টাকা পেয়ে আমাদের না জানিয়ে এক রাত্তিরে কান্তিকে নিয়ে চলে গেল—ছেলে তখন একবছরের।

তার পরদিন হতে কেঁদে-কেটে চারধার খোঁজাখুঁজি করলুম—কিন্তু সন্ধান মিল্‌ল না—যখন মিল্‌ল,—তখন তাদের বাড়ীর দরজা আমাদের জন্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

—ছয়—

সেইদিন হইতে কান্তি অসম্ভব রকমের গম্ভীর হইয়া পড়িল। কাহারও সহিত ভাল ভাবে কথা বলিতে পারে না—প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারে না—আহার্য্যের প্রত্যেক জিনিষটা যেন গলায় বিঁধিয়া যায়—অন্তরের মধ্যে তাহার প্রলয়ের ঝড়! এই কথাটাই তাহাকে দিনরাত বর্শার মত খোঁচা দিত,—রাজ-অট্টালিকায় বাস করিয়া মান-সম্ভ্রমের মণিময় সিংহাসনে উপবেশন করিলেও সে তাহার নিজের অধিকার হইতে বঞ্চিত!

দুঃখ-দারিদ্র্য অশান্তিকে বরণ করিয়াও শান্তি যে পরিপূর্ণ তৃপ্তির অধিকারী, সে সেটা হইতে বঞ্চিত!—এতখানি বঞ্চিত করিবার মূল যাঁহারা তাঁহাদের সহিত কি সম্পর্ক তার?

মনের যখন এই অবস্থা, তখন একদিন ইলা ধরিয়া বসিল—চল, আজ বাবাকে আর মাকে দেখে আসি।

গম্ভীরভাবে কান্তি বলিল—বাবা মা কে? যাঁরা নিজের সন্তানকে হাসিমুখে বলি দিতে পারেন, কোনও সম্পর্ক নেই তাঁদের সঙ্গে।

যে আনন্দের দোলায় চাপিয়া ইলা আজ স্বামীর নিকট ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহার কথায় বিস্ময়ের ধাক্কা আসিয়া সেটাকে বহুদূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল ; বলিল—এইটাই বুঝি তুমি ঠিক্ করলে?

হাঁ, তাই করেছি।

কেন?

কান্তি বলিল—বলেছি ত যাঁরা নিজের সন্তানকে—

বাধা দিয়া সান্ত্বনার সুরে ইলা বলিল—দরিদ্র হলেও রাক্ষস ত নয়ই, মানুষের চেয়েও অনেক উঁচু!

উঁচু ?

—নয় ? বলিয়া ইলা বলিতে লাগিল—যাঁরা অন্যের পুত্রশোক তোলাবার জন্যে নিজের নাড়ি-ছেঁড়া ধনকে অম্লান-চিত্তে তাঁদের কোলে তুলে দিতে পারেন—

অতিষ্ঠভাবে কান্তি বলিল—দেন কেন তাঁরা ? এই দেওয়ায় মহাপাপ—

তিরস্কারের সুরে ইলা বলিয়া উঠিল—ছি ! ছি ! কি বল্‌ছ ? যখন তাঁরা দিয়েছিলেন, তখন কি কোনও স্বার্থের পিছনে ছুটে গিয়েছিলেন ? ভুলে যাচ্ছ কেন,—তখন তাঁরা একই বাসায় থাক্‌তেন ; একজন পুত্রশোকে বুক চাপড়ে হাহাকার করে কাঁদ্‌ছেন তাঁর সেই শোকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই না তাঁরা তোমাকে এঁদের কোলে সঁপে দিয়েছিলেন ?—সেটা তোমার ওপর অবিচারের নীচতা নয়,—মহত্ত্ব ! কিন্তু তাঁদের সেই মহত্ত্বের পুরস্কার এঁরা যে ভাবে দিয়েছেন, তার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে আমাকেই করতে হবে।

নিজের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা শুনিয়া কান্তি গম্ভীর হইয়া গেল। ইলা বলিল—চল না আজ যাই।

"হাঁ" কি "না" কান্তি কোন কথাই বলিল না ; সেইরূপই গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

সাত

দিন সাতেক পরে।

অপরাহ্নে গণেশ রায় যখন বৈকালিক জলযোগ করিতেছিলেন, শান্তির হাত ধরিয়া কান্তিভূষণ তাহার নিকটে আসিয়া সহোদরকে বলিল—বাবা আর মাকে প্রণাম কর শান্তি !

শান্তি আজ্ঞা পালন করিতে যাইতে গণেশ রায় আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—এই সব জুয়াচোরের —"

বাধা দিয়া ব্যাকুলভাবে কান্তি বলিল—ওকে অপমান কর্‌বেন না বাবা ! জুয়াচোর ও নয়, ও যে আমার ভাই !—যা শান্তি, ও ঘরে তোর বৌদি'কে প্রণাম করে আয়।

শান্তি হাসিমুখে দাদার দেখান ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

কান্তি বলিল—আমাদের জমিদারী দেখা-শুনা কর্‌বার জন্যে আমি একেই নিযুক্ত করতে চাই বাবা। লোকের সুখ-দুঃখ অন্তর্চক্ষু দিয়ে দেখ্‌বার আমার মতে এই-ই যোগ্য লোক।

গণেশ রায় উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন—ও সব আমার বাড়ী চলবে না কান্তি ; —দূর করে দাও, তা না হলে—

হঠাৎ দেবরের হাত ধরিয়া ইলা গৃহমধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া সহাস্যমুখে বলিল —আপনাদের কাজের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের এ ভাবে যদি করতে না দেন, তা হ'লে ওর সঙ্গে আমাদেরও বেরিয়ে যেতে হবে বাবা। একটা পাপকে গোপন কর্‌বার জন্যে অনন্তকোটী পাপকে ডেকে আন্‌তে আমরা কিছুতেই দেব না।

গণেশ রায়ের জিহ্বার বল্গা কে যেন ভিতর হইতে টানিয়া রাখিল।

শান্তিকে ইলা বলিল—বাবাকে এইবার প্রণাম কর ঠাকুরপো !

বৎসরের প্রথম দিন

শ্রী ফণীন্দ্র পাল



১

সহর হইতে বারো মাইল দূরে একটি গ্রাম। গ্রামের সীমানায় প্রতিরাত্রে বহুক্ষণ আলো জ্বলিতে থাকে। অর্থহীন চীৎকার, অবিরাম হাসি, অশ্রাব্য কথাবার্ত্তার স্রোত নিরন্তর বহিয়াই চলে। গভীর রাত্রে সে পথ দিয়া মানুষের যাতায়াত করিতে ভয় হয়। লোকে জানে সেই বাড়ীটি রহিম সর্দ্দারের আস্তানা।

রহিম সর্দ্দারের জীবনযাপন-পদ্ধতি সম্বন্ধে জনরব অনেক কিছুই শোনা যায়। প্রায় সকলেই জানে রহিমের তাঁবে বিভিন্ন জাতির পঁচিশ-ত্রিশ-জন লোক সর্ব্বদা কি এক লুকোচুরীর ভিতর জীবন অতিবাহিত করে।

তারা মাতাল, সমাজের ঘৃণ্য তারা। আশ-পাশের সমস্ত চুরি-ডাকাতির মূল তাহারাই।

২

বাহিরে অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকার আর কালো মেঘের ঘনঘটা। ঘরের ভিতরে প্রদীপের অস্পষ্ট আলোর সম্মুখে একুশটি প্রাণী; প্রত্যেকের সামনে এক ভাঁড় করিয়া তাড়ি।

প্রতিদিন যেখানে সুরার স্রোতের সঙ্গে কোলাহলের তুমুল ঝড় বহিতে থাকে, আজ সেখানে সকলে নীরব। প্রত্যেকের মুখে বিষণ্ণতার ম্লানিমা। অত্যাচারে, কুটিলতায় বীভৎস মুখগুলি অপরিসীম ক্লান্তিতে আরো ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। আজ তিনদিন আহার জোটে নাই। সহরে প্রচার হইয়াছে জীবিত বা মৃত অবস্থায় রহিম সর্দ্দার বা তাহার দলের কাহাকেও ধরিয়া আনিতে পারিলে প্রচুর পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেইজন্য একমাস হইতে চলিল কেহ আস্তানার বাহিরে যাইতে সাহস করে নাই।

কিন্তু না, দুঃসাহসের তাহাদের অভাব কি? দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেমের মিথ্যা আহ্বান যাহারা শুনিল না, মানুষের রক্তে যাহাদের নিষ্ঠুর হৃদয় বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না, নারী যাহাদের শুধু ভোগের বস্তু, তাহাদের নিকট ভয় লজ্জায় মুখ ফিরিয়া চলিয়া যায়।

জীবনের পথ তাহাদের রুক্ষ, আকাশ বর্ণহীন, উৎসব তাহাদের উন্মত্ত আত্মবিস্মৃতি। তাই প্রতিরাত্রে সুরার বন্যায় মনুষ্যত্বকে ডুবাইয়া বিদ্রো-হের মত জগতকে জানাইয়া দেয়, অভিশপ্ত আত্মাকে ঘিরিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে ধ্বংসের নৃত্যে তাহারা মাদল বাজাইয়া চলিবে। আসুক বন্যা, আসুক বিপদ।

রামলালের একটি চোখ নাই। প্রথম যেদিন সে দলে আসে, তখন সে আপনার নিষ্ঠুরতার বিবরণ দিল—ছিলাম যুদ্ধে। কামানের গোলায় একটা চোখ জন্মের মত গেল, তা' যাক্, এখন দুটো চোখের দৃষ্টি একটাতে এসে জমা হয়েছে। যুদ্ধে কত যে খুন করলাম, কত মার সামনে ছেলের টুঁটি টিপে সাবাড় করা গেল। ছেলের সামনে মার ওপর অত্যাচার করলাম আর সেই আমি কি না তোমাদের ছিঁচ্কে চুরীর কাজে পিছ্‌পাও হবো! ছোঃ! বুঝ্‌লে, এমন দিন গেছে, যুদ্ধ করতে করতে এক ফোঁটা জল পেলাম না, অমনি আহত সৈন্যকে খুন করে খেলাম রক্ত

—রক্ত খেয়ে হলাম তাজা। ইস্, কি চেষ্টাই সেদিন পেয়েছিল!

একপাশে ভজন বাবাজী গাঁজার সেবা করিতেছিল। আগুনে পুড়িয়া যাওয়ায় মুখখানি নীচের ঠোঁটটি অসম্ভব রকম ঝুলিয়া পড়িয়াছে। গাঁজার কল্‌কেটি মিরজা শেখের হাতে চালান দিয়া বলিয়াছিল—জীতা রহো!

তারপর বাবাজী প্রচুর উৎসাহে নিজের নৃশংসতার ইতিহাস শুনায়—পাণ্ডা ছিলাম। কত বিধবার সম্পত্তি আর সতীত্ব আমি জোরসে ছিনিয়ে নিলাম। তারপর হুলিয়ার জন্তে এখানে অজ্ঞাতবাস।

কিন্তু বাবাজীর বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বে রুস্তম আলি পাশের লোকটিকে ঠেলিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—আরে বলো না চাচা আমার কীর্ত্তির কথা। মুস্কিল আসান সেজে কি কাণ্ডটাই না করেছি। সেই যে উপরোউপরি চার-চারটে খুন করলাম, আর দুটো মেয়ে চুরী—তুমি তো সবই জানো, বল না এদের।

পাশের লোকটির একটি পা নাই। উত্তেজিত-ভাবে রুস্তম আলির কাঁধে ভর দিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে বলে—আমিই বা কি কম করেছি। এগাণ্ডোবার জেল খেটেছি এগারো মাস করে, তিনবার জেলের গরাদ ভেঙ্গে পালিয়েছি, পুলিস মারলাম পাঁচটা, দারোগা খুন করলাম দুটো—ধরতে পেরেছে? শুধু একবার অন্ধকারে বেটারা গুলি চালিয়ে দিলে পায়ের ভেতর। সেই জন্তেই তো পা-টাকে বাদ দিয়ে দিলাম।

সকলেই নিজের নিজের কাহিনী শুনাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। আসল কথা, কেহই না কি কাহারও চেয়ে কম যায় না। রহিম সর্দ্দার দেখা দিলে কোলাহল নীরব হয়। মদের ঝোঁকে তারা আপনাদের বক্তব্য ভুলিয়া যায়। এমনি তারা। সাহসের অভাব তাহাদের কোথায়?

কিন্তু মৃত্যুর নিকট অতি বড় দুঃসাহসও সঙ্কুচিত হইয়া যায়।

সেদিন সেইজন্ত সকলে নীরব। রহিম সর্দ্দারের আদেশ অমান্যের অর্থ মৃত্যু।

তেওয়ারী ফিস্‌ফিস্ করিয়া গিরিধরকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল—দলের তিনজনকে দেখ্‌ছি না কেন? কোথায় গেল?

এপাশ হইতে অর্জ্জুন চুপে চুপে বলিয়া উঠিল—চুপ! সর্দ্দার এখনি শুনতে পাবে, তা' হলে আর রক্ষে নেই। তাদের দুজন গেছ্‌ল খাবারের যোগাড়ে, আর একজন পুলিশের কাছে আমাদের ধরিয়ে দেবার মতলবে। সর্দ্দার এইমাত্র তাদের কাবার করে দিয়ে এসেছে—আমি নিশ্চয় জানি।

কাণে কাণে সকলের নিকট এই সংবাদটি পৌঁছাইতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু সর্দ্দারের চেয়ে নৃশংস সেখানে কেহ ছিল না। পৃথিবীর সকল রকম পাপে সে অভিজ্ঞ। সকলে ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

বলিষ্ঠ চেহারা। শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা সব সময়েই যেন স্ফীত হইয়া আছে। ছোট ছোট দুটি হিংস্র চোখ। কর্কশ-কণ্ঠে হঠাৎ রহিম শেখ বলিয়া ওঠে—চুপ! স্ফূর্ত্তিসে মদ চালাও।

আজ তিনদিন কাহারও ভাগ্যে এক কুচো খাদ্য জোটে নাই। রহিমও উপবাসী। রহিমের আদেশে সকলে পাত্রের পর পাত্র মদ উজাড় করিতে লাগিল। শুধু সে নিজে ঘরের একটি পাশে নীরবে বসিয়া রহিল। রেখাঙ্কিত কপালে চিন্তার চিহ্ন। কঠোর মুখের ভাবে মনে হয়, সে শোধ লইবে একদিন না একদিন যদি বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু এখনকার দুর্দ্দৈব হইতে উদ্ধার কোথায়?

রহিমের পূর্ব্ব ইতিহাস শুনিলে একচক্ষু রাম-লাল, খোঁড়া আব্বাস খাঁর মত হৃদয়হীনেরাও শিহরিয়া ওঠে। আপনার কুটিল স্বার্থের জন্ত সে একদিন গভীর রাত্রে নিজের পিতা-মাতা ও বড়

ভাইটিকে হত্যা করিয়াছিল। তারপর ধরা পড়িবার ভয়ে সুন্দরী স্ত্রীকে বিক্রয় করিয়া ফেরার। পশুর চেয়ে তাহার প্রবৃত্তি জঘন্য।

মোহনদাস চাপাকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—কাল যে নতুন বছরের প্রথম দিন।

সকলের ভিতরে চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া যায়। তাই তো সে কথা তো তাদের খেয়াল নাই। এই দিনটি যে তাহাদের শ্রেষ্ঠ উৎসবের দিন। কিছুক্ষণ পরে একজন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বছরের প্রথমদিন তো কি হয়েছে? দিন, রাত্রি, আলো, অন্ধকার সবই আমাদের কাছে সমান, কি বল হে বকুলাল?

বকুলাল বলিল—যা বলেছো একেবারে সমান। কিন্তু বাঁচা আর মরার মধ্যে যে খানিকটা উঁচু-নীচু আছে, সেইটেই যা এখনও বুঝি। কাল থেকে আর আমরা চুপ থাকব না—ধরা পড়্‌লে মরতে হবে বটে, কিন্তু ঘরের ভেতর উপোস করে পচাও মরা। আমরা মরব, লড়ে মরব।

কে একজন তেমনি মৃদুস্বরে বলে—থামো, সর্দার এখনি শুনতে পাবে।

আর একধারে তিনটি মাতাল তাহাদের লাঞ্ছিত জীবনের গোপন দুর্ব্বলতাগুলিকে সতর্কভাবে পরস্পরের সহানুভূতি কামনায় ব্যক্ত করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন বহু বৎসর স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই তাহারই বিরহে কাতর; আর একজন আপনার সন্তানের চিন্তায় ব্যাকুল। তৃতীয়জন সেদিন মাত্র সংবাদ পাইয়াছে যে, বানে তাহার কুঁড়েটিকে ভাসাইয়া লইয়া গেছে, আর সেই সঙ্গে তাহার নিদ্রিতা স্ত্রী ও কন্যাকে। গভীর রাত্রের অন্ধকারের আড়ালে অন্য সকলের পরিহাসের ভয়ে লুকাইয়া লুকাইয়া এই তিনটি মানুষ আজও নিজেদের পারিবারিক সুখ-দুঃখের আলাপে বিভোর হইয়া যায়। শুষ্ক রুক্ষ মরুভূমির মাঝে এ যেন এক পশলা বৃষ্টি—উদাসের চোখে জল—মরণোন্মুখের মাঝে বেঁচে ওঠার ক্ষীণ স্পন্দন!

গোবিন্দ বলিতেছিল—চার বছর কোন সংবাদ পাই নি ভাই। জীবনে হয় তো আর দেখা হবে না। মনে আছে, একদিন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে লক্ষ্মী বলেছিল—কেন তুমি এত নিষ্ঠুর? এ সব খারাপ কাজ কেন কর তুমি? আরো বলেছিল—আমি তোমায় ভালবাসি; আমার ভালবাসাকে ছাড়িয়ে কোথায় তোমার সুখ? একজন অন্ততঃ আমায় ভাবে, প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, আমার চিন্তায় রাতে যার ঘুম আসে না, কান্নায় যার মনটি সব সময়ে ভিজে!—পৃথিবীতে বেঁচে থাকার ভেতর এর চেয়ে আর বড় কি সান্ত্বনা আছে বলতে পার সাহেব?

সাহেব অর্থাৎ মীর মহম্মদের নিকট হইতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সে পেশোয়ারের অধিবাসী; একদিন বাদাম-পেস্তার ঝুলিটি লইয়া বাংলা-দেশে আসিয়াছিল। তাহার পর নানা দুর্বিপাকে পড়িয়া আর ফিরিয়া যাইতে পারে নাই। বহুদিন থাকার ফলে ভাঙা ভাঙা বাংলা বলিতে পারে। সুস্থ সবল চেহারাটিতে বার্দ্ধক্যের অভিশাপ লাগিয়াছে।

হয় তো তখন পাহাড়ে ঘেরা ছোট একটি গ্রামের ছোট কুঁড়ের ভিতর জীর্ণ শয্যায় সুপ্ত একটি কচি মুখ তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছিল;—সেই দামাল পাহাড়ী ছেলেটির দুরন্তপনার স্মৃতি! কিছুক্ষণ পরে ক্লান্তকণ্ঠে বলে—ঠিক বাত ভাইয়া। পাঞ্জাব মুল্লুক থেকে ফেরৎ গিয়ে দেখ্‌লাম, হামার আওরৎ একঠো আদমীকো সাথ ভেগে গেছে। হামার বুবু ছিল তার চাচীর কাছে। সাত বরষ্‌কা ছেলিয়া। বাংলা মুল্লুকে আসবার সময় কেঁদে বল্‌ল—বব্‌বা, কখন তুমি ফিরবে? প্রতি সাঁঝে সে আমার অপেক্ষায় বাড়ীর সামনে পথের কাছে দাঁড়িয়ে থাকত। কতদিন মেওয়া বিক্রী করে ফিরে আসতে রাত

হয়ে যেত। অন্ধকার একলা দাঁড়িয়ে থাকত হামার বুবু! তার ভয়ডর কুছু নেই। তেমনি সেদিন হয় তো মনে করেছিল, প্রতিদিনের মত সাঁঝবেলার ফিরব। বুঝলে ভাইয়া, হামি দেখ্‌তে পাচ্ছি, বুবু একা শুয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হামাকে স্বপন্ দেখছে!

আজ প্রায় পনেরো বছর মীর মহম্মদ বাংলা দেশে আছে। কিন্তু পাগলের মত তাহার বিশ্বাস যে, তাহার সাত বরষের বুবু এখনও তেমনি সাত বছরের আছে। পনেরো বৎসরের ব্যবধান বুবুর বয়স কি করিয়া বাড়াইতে পারে? কিন্তু কে জানে, হয় তো তাহার শাশ্বত সাত বছরের বুবু এখন আর বাঁচিয়া নাই। যদিই বা বাঁচিয়া থাকে, হয় তো সে এখন বাইশ বছরের বলিষ্ঠ যুবক হইয়া সংসার পাতিয়া বসিয়াছে; হয় তো তাহারই মত মেওয়ার ঝুলিটি কাঁধে করিয়া কোন্ বিদেশের পথে পথে সে এখন ফিরিওয়ালা; —এই বাংলা দেশের কোন অখ্যাত পল্লী পথের পথিক কি না কে জানে? এতদিন পরে তার নিরুদ্দিষ্ট পিতাকে দেখিলে হয় তো সে চিনিতেই পারিবে না। মীর মহম্মদই বা কি করিয়া তাহার চিরন্তন সাত বছরের বুবুকে যুবক হিসাবে চিনিবে?

পুত্রের শাশ্বত সাত বছরের স্বপ্নটি লইয়া মীর মহম্মদকে সকলে তামাসা করে; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহার স্বপ্নটিকে সত্যের সন্ধান দিয়া ভাঙিয়া দেয় নাই। পাঠক-পাঠিকার নিকট আমার নিবেদন—এই নির্ব্বাসিত স্নেহময় পাপী পিতাটিকে ঘৃণার পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদ করুন যে, তাহার এ স্বপ্ন মৃত্যুর শেষমুহূর্ত্তের ভিতর কোনদিন যেন না ভাঙে! এই অভিশপ্ত হতভাগ্যের অপরিসীম সান্ত্বনা যেন কোনদিন জ্ঞানের আলো লাগিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত না হয়!

মীর মহম্মদ নীরব হইতেই ছক্কু সিং ধীরে ধীরে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—দেশ থেকে খবর এসেছে রাত্তিরবেলা চুপে চুপে বান এসে আমার যমুনা আর ঝুমরীকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। বল তো ভাই, ঈশ্বরের এ কি অবিচার! তারা কি অপরাধ করেছিল ভগবানের কাছে যে এমনি শাস্তি দিল? পরশুদিন একটা মেয়েকে দেখ্‌লাম, তার মুখে ঠিক আমার ঝুমরীর আদল; তাকে আমার শেষ পয়সাটি দিয়ে মিঠাই কিনে দিলাম, আর সে আমার একটি চুমু দিলে! কচি কচি হাতদুটি দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বল্‌ল—চল এখনি আমাদের বাড়ী। তারপর জিজ্ঞেস করল—আমি তার কে হই? বল্‌ল—তার বাবা নেই, আগুনের রথে করে স্বর্গে চলে গেছে; তাই তার মা রোজ রোজ কাঁদে। আমি যে কিছুতেই ভাবতে পারছি না,—যমুনা আমার বেঁচে নেই—ঝুমরী আমার মরে গেছে—তাদের কোনদিন আর দেখ্‌তে পাব না!

দুর্দ্দান্ত, অসংখ্য মানুষ-হত্যাকারী দুর্বৃত্তের চোখে নিঃশব্দে অশ্রুর বন্যা নামিয়া আসে। অন্ধকারে কেহ তাহা দেখিতে পাইল না। এমনি চিরকাল তাহাদের অশ্রু গোপন রহিয়া গেছে—এই বিশাল পৃথিবীর সংখ্যাহীন অবমানিত, ঘৃণ্য পাপীদের মুমূর্ষু অন্তর দেবতার চোখে! হৃদয়-হীনতার অন্তরালে সুন্দরের শাশ্বত-প্রতিষ্ঠার সংবাদ কে রাখে!

চিরকালের অশ্রু চিরদিনের অশান্তিতে তাহারা উন্মাদ! কে এই ব্যথিত-বার্ত্তা সকলের সহানুভূতির রুদ্ধ দুয়ারের ওপাশে পৌঁছাইয়া দিবে?

ওদিকে তখন রামলাল জড়িতকণ্ঠে বলিতেছে—বছর আসে যায়, আর মানুষের বয়স বাড়ে, কিন্তু ভগবান বেটা যে ছেলেমানুষ, সেই ছেলেমানুষই রয়ে গেল, ভদ্দরলোকের এককথার মত। বুঝ্‌লে হে, কাল আমি তেত্রিশে পড়্‌ব।

এমনি হৈচৈ করিতে করিতে সকলে এক সময়ে মদের নেশায় অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িল।

রহিম নিঃশব্দে আসিয়া উন্মুখ বাতায়নের নিকট দাঁড়াইল। জানালার বাহিরে আকাশ হইতে পৃথিবী অবধি অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার—সুদূর সুগভীর; থাকিয়া থাকিয়া মেঘের আর্তনাদ শুনা যাইতেছে—পুরাতন বৎসরের মৃত্যুর অসহ্য যন্ত্রণার চীৎকারের মত।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল। নীরব বনানী মর্ম্মর শব্দে কাঁদিয়া ওঠে। আকুল ঝড়ের আগমন-বার্ত্তা আসিয়াছে—পৃথিবীর নিকট হইতে পুরাতন বৎসরটিকে ছিনাইয়া লইয়া যাইবার জন্য যেন এই আয়োজন।

ভীরুর মত রহিম এতদিন বাহিরে যায় নাই। কিন্তু এতগুলি লোক শুধু শুধু নিঃশব্দে মরিতে চাহিবে কেন? অনাহারে, দুশ্চিন্তায় রহিমের উচ্ছৃঙ্খল মনটি যেন মাথা নীচু করিয়া আছে। বাহিরের অন্ধকারের ভিতর তাহার দ্বারা নিহত যত নরনারীর প্রেতাত্মা যেন তাহার দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গের বিকট বিকৃত হাসিতে লুটোপুটি খাইতেছে! সে মুখ ফিরাইয়া ঘরের ভিতর তাহার মাতাল সুপ্ত সঙ্গীগুলির দিকে চাহিয়া রহিল। সেখানে অপরিসীম অবসন্নতা! তাহাদের প্রগাঢ় নিদ্রা যেন মৃত্যুর মত স্থির! কাল বৎসরের প্রথম দিন। এই দিনটি ব্যর্থ গেলে সম্বৎসর দুঃখভোগের অন্ত থাকে না, এ কুসংস্কার রহিমের মনেও বদ্ধমূল।

রহিম ঝাঁকুনি দিয়া তাহার বিশ্বস্ত পার্শ্বচরকে ডাকিল—আলি, রুস্তম আলি?

রুস্তম ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিল—সরাব দেব?

—না। এরা কি বল্‌ছিল আজ, মরতে চায়?

রুস্তম জবাব দেয়—এরকম ঘরের কোণে বসে উপোস করে মরার চেয়ে বাইরে গিয়ে আহার যোগাড়ের চেষ্টায় মরা ভাল। এরা তাই বলছিল—তোমার কী মত রুস্তম?

রুস্তমের নিকট হইতে কোন উত্তর আসিল না।

গম্ভীরভাবে রহিম বলিল—ও বুঝেচি; তুমিও ওদের পক্ষে। কিন্তু জানো কি, আমার হুকুম না শুনে যে তিন হতভাগা খাবারের খোঁজে গেছ্‌ল, তাদের দুপুরে নিজের হাতে খুন করলাম। দেখ্‌বে ছুরিখানা; এখনও রক্তের দাগ মুছি নি?

রুস্তম মৃদু বিনীতকণ্ঠে বলিল—কিন্তু সর্দ্দার খিদের চোটে মানুষ যখন মানুষের মাংস খেতে চায়, তখন তারা মরার ভয় রাখে না।

রহিম নীরব। এ শেষ কথার প্রতিবাদ নাই। কিছুক্ষণ পরে রহিম দুয়ারের দিকে যাইতে যাইতে বলিল—আমি চল্‌লাম। কাল সকালের মধ্যে যে করে হোক্ আমাদের দুর্ভিক্ষ ঘুচোব।

কোথায় যাবেন? রুস্তম প্রশ্ন করে।

—সাধ্যমত সব জায়গায় চেষ্টা করে যদি না পারি, তা' হলে ধরা দিয়ে বল্‌ব রহিম শেখ নিজেই নিজেকে ধরা দিয়েছে। তার প্রাপ্য পুরস্কার আগে দাও। তারপর তোমাদের চেষ্টায় জেল থেকে পালাতে কতক্ষণ!

আমাদের কাউকে সঙ্গে যেতে হবে কি? রুস্তম জিজ্ঞাসা করে।

—না, এখন নয়। ভোর পাঁচটায় সময় জেলখানার কাছে ঝোপের মাঝখানে লুকিয়ে দেখা কোরো!

কিন্তু বাইরে যে ভয়ঙ্কর ঝড় হচ্ছে! ওই বুঝি বৃষ্টি এল!

রুস্তমের কথা কে শোনে—শুনিবার যে, সে তখন পথ ধরিয়া চলিয়াছে। আকাশে তখন ধারালো ঝকঝকে ছুরির মতন বিদ্যুতের রেশারেশি, বাতাসে উন্মত্ত অভিযানের রুদ্র-নৃত্য, আর বৃষ্টিতে ও আঁধারে নিবিড় মাতামাতি!

রুস্তম খোলা দুয়ারের বাহিরে রহিমের পথের দিকে দৃষ্টি মেলিয়া দিল। কিছুই চোখে পড়ে

না; শুধু অনন্ত অন্ধকার আর হাওয়ার অত্যাচারে অদৃশ্য বনানীর পল্লবে পল্লবে ব্যথিত ব্যাকুলতার সকাতর দীর্ঘনিশ্বাস ও বৃষ্টির মুখরতার শব্দ শোনা যায়।

বিস্ময়ে স্থির হইয়া রুস্তম দাঁড়াইয়া রহিল। আশ্চর্য্য!—এ কি! সর্দ্দারের ভিতর সেই রুক্ষ-কঠোর স্বার্থপর মানুষটি কোথায়? এ অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের সাড়া কে জাগাইয়াছে?

রহিম সেই ঝড়-বাদলের ভিতরে সহরের দিকে চলিতে লাগিল। কিন্তু আজ বুঝি প্রলয় রাত্রি! আকাশে-বাতাসে কি গভীর উন্মত্ততা! অনাহারে দুর্ব্বল শরীর লইয়া রহিম সেই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ প্রকৃতির সহিত যুঝিয়া পথ চলিতে পারিতেছে না। চার মাইল আসার পর এমন হয় যে, কোথাও কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় না লইলে বুঝি তাহার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে।

পথের ধারে একটি পোড়ো বাড়ীর নীচে রহিম আশ্রয় লইল। সে বাড়ীর ছাদ বা দেওয়াল না থাকার মধ্যে। মাঝে মাঝে জলের ঝাপ্টা আর হাওয়ার বেগ তাহার ভাঙা শরীরটাকে শীতার্ত্ত শীর্ণ বৃক্ষের মত থরথর করিয়া কাঁপাইয়া দিতেছে।

রহিম ছাড়া সেখানে আর কাহারও অস্তিত্বের অস্পষ্ট সাড়া পাওয়া গেল। বিদ্যুতের চকিত আলোয় রহিম দেখে, যথাসম্ভব বৃষ্টির ছাট্ বাঁচাইয়া একটি ভিখারী মেয়ে ও তাহার বছর দশেকের ছেলেটি কোনরকমে শুইয়া কথা বলিতেছে। রহিম একটু গোপনে থাকিয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল।

ছেলেটী বলিতেছিল—বুঝ্‌লে মা আজ টিপু বল্‌ছিল, ভিক্ষে করার চেয়ে চুরী করা ভাল। ধরা পড়ে জেলে গেলে ঘরের ভেতর থাকতে পাওয়া যায়, খাবারও মেলে দুবেলা। কিন্তু ভিক্ষে করে দেখ আমাদের ঘর নেই, দিনে দুমুঠো খেতেও পাই না। কাল থেকে আমি টিপুর সঙ্গে চুরি কর্‌তে যাব, কি বল?

মা বলিল—ছিঃ! যেওনা। চোরকে কেউ ভালবাসে না।

—তুমিও ভালবাস না?

না! এখন ঘুমোও; কাল সকাল সকাল ভিক্ষেয় বেরুব।

ছেলেটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর বলিল—পিঠে একটু হাত বুলিয়ে দাও না মা, বাবা আজ যা লাথি মেরেছে। বাবা হয় তো কোন দিন আমায় মেরেই ফেলবে।

এই ব্যাপার নূতন নয়, প্রায় প্রতিদিন একটা লোক আসিয়া এই ভিক্ষুক মাতা পুত্রের সমস্ত দিনের সঞ্চয় কাড়িয়া লইয়া যায়। সেও ভিক্ষাজীবি; তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের উত্তর আসে প্রহারে।

নিঃশব্দে ভিখারী মাতাটি ছেলের পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল। আর হয় তো তেমনি নীরবে অলক্ষ্য ঈশ্বরের নিকট সজল চোখে প্রার্থনা জানায়—তাহার ছেলেটি যেন বাঁচিয়া থাকে; যেন সে না জানিতে পারে যে, ঐ লোকটি ধর্ম্মত তাহার পিতা নয় শুধু মাতার যৌবনের সঙ্গী—মন্ত্র পড়িয়া তাহাদের মিলন হয় নাই, দেবতাকে সাক্ষী রাখিয়াও নয়!

ছেলেটি ক্ষীণকণ্ঠে আবার বলিল—মা ঘুমোলে? ঘুমোও নি! বৃষ্টির যা শব্দ হচ্ছে, তাতে কি আর ঘুম আসে! যে হাওয়া, আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাতে পারে বোধ হয়। কাল রাস্তায় জল জমে থাকবে, আর আমি তাতে কাগজের নৌকো ভাসিয়ে দেব। আচ্ছা, কাল বছরের পয়লা দিন, না মা?

মা উত্তর দিল—হ্যাঁ। তোর গায়ে ছাট্ লাগছে যে, আমার কোলের দিকে আরও সরে আয়।

মার নিকটে সরিয়া আসিয়া ছেলেটি বলে—বছরের প্রথম দিন কতলোক কত লোককে উপহার দেয়, ছোট ছেলেরা পায় কত রকমের

খেলনা। আমরা গরীব বলে কেউ কিছু দেবে না—কেন দেবে না, গরীব হওয়া কি আমাদের দোষ?

ছেলেটি ছোটবেলা থেকে এই রকম আপনার মনে অশ্রান্ত কথা বলে। মা বলিল—চুপ করে ঘুমো লক্ষীটি।

একটু পরেই ছেলেটি বলিল—কেউ যদি আমায় ছোট একটি বাজনা দিত বোষ্টমদের একতারার মত, তা' হলে দেখ্‌তে মা, কেমন বেশী বেশী ভিক্ষে পেতাম। হলদে গোলাপী রঙের কাপড় পরে একতারা বাজিয়ে গান ধর্‌তাম—লোকে খুসী হয়ে ভিক্ষে দিত। কিন্তু কাল আমি ভিক্ষের বেরোব না মা, খেলা কর্‌ব সমস্ত-দিন—রাজা-রাজা খেলা।

মা কিছুই বলিল না। কি করিয়া বছরের প্রথম দিন ছেলের এই আনন্দটিকে আঘাত দিবে? কোন্ প্রাণে? অথচ আজ তাহারা একেবারে নিঃসম্বল। কাল ভিক্ষা না করিয়া উপায় নাই।

মাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ছেলেটি বলে—আমি খালি খালি কথা বল্‌ছি বলে তোমার রাগ হয়েছে, না মা? আচ্ছা, এই চুপ কর্‌লাম। ইস্, বাজপড়ার কি বিচ্ছিরি শব্দ হচ্ছে! আমার ভারি ভয় করছে যে, সেই জন্তেই তো বেশী কথা বলে ভয়কে ভুলে যাচ্ছি।

তারপর শীর্ণ হাতটি দিয়া মাকে জড়াইয়া ছেলেটি কখন ঘুমাইয়া পড়িল। বিদ্যুতের চম-কানিতে রহিম দেখিতে পাইল, ভিখারী মেয়েটিও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দুটি নিরাশ্রয়, নিঃসহায় প্রাণের গতি নিদ্রার ভিতর সকল ভয়-ভাবনা হারাইয়া ফেলিয়াছে। ছেলেটির সুপ্ত মুখে মৃদু একটু হাসি;—হয় তো সে স্বপ্ন দেখিতেছে—একতারা বাজানোর স্বপ্ন রাজা-রাজা খেলার স্বপ্ন!

রহিম তাহাদের সমস্ত কথাবার্তা শুনিয়াছে। আজ তাহার এ কি হইল! দুর্যোগের মত এ কি অনাস্বাদিত হেতুহীন বেদনায় তাহার মনের আকাশ আচ্ছন্ন! চোখে তার অকারণে জল আসে কেন? যে মানুষের মমতা ছিল না, কোমলতা ছিল না, যে কতবার খুনের রক্ত দেখিয়া আনন্দে শিহরিয়া উঠিয়াছে, আজ সেই রুক্ষ ধূসর আকাশ জলভারানত, সন্ধ্যার মত ম্লান, বৈরাগীর মত উদাস!

দূরে কোথা হইতে পেটা ঘড়িতে দ্বিপ্রহরের ক্ষীণ শব্দটি ভাসিয়া আসে। সেই জল, ঝড়, ক্রুদ্ধ মেঘের চীৎকারের ভিতর রহিম আবার পথ চলিতেছে, উর্দ্ধশ্বাসে। আরো চারমাইল পরে একটি ছোট নদীতে বর্ষার জোয়ার—তটের সীমানা ছাড়াইয়া প্রমত্ত ঢেউগুলি ছুটিয়া চলিয়াছে।

রহিম বিনা দ্বিধায় সেই ফেনিল নদী সাঁতার দিয়া পার হইল। আজ যেন উৎসব—নূতন দিনের সঙ্গে নূতন জীবনের আগমনী উৎসব—অন্ধকারে পথহারা পথিকের কাছে সূর্য্যের আলো আসার আশা! নদী পার হইয়া রহিম সহরের দিকে ব্যগ্রভাবে চলিয়াছে। রাত না শেষ হইতেই তাহাকে ফিরিতে হইবে।

সহরে তখন দোকানপাট সব বন্ধ। জনবিরল পথ আর আলোহীন আকাশের নীচে সুষুপ্ত বাড়ীগুলির ভীতিপ্রদ স্তব্ধতা। রহিম দোকান-ঘরের মত একটি বাড়ীর কপাট অত্যন্ত সন্তর্পণে ভাঙিবার চেষ্টা করিল। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর এই সকল কাজে সুদক্ষ রহিম ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। প্রকাণ্ড দোকান—খেলনার। আলমারীর ভিতর ছুই খোকার মূর্ত্তিতে ডলী পুতুলগুলি যেন তাহার দিকে চাহিয়া ভয়ে, বিস্ময়ে বোবা। মোমবাতি জ্বালিয়া সে নানাধরণের অনেকগুলি খেলনা তুলিয়া লইল; আর নিল বোষ্টমদের একতারার মত দেখিতে একটি বাজনা। হঠাৎ তাহার মনে

পড়িয়া গেল বাক্সে মাইল দূরের একটি অরণ্যে অনাহার-ক্লিষ্ট নিদ্রিত কয়েকটি মাতালের মুখ, আর রুস্তমের নিকট তাহার প্রতিজ্ঞা। ঘরের একপাশে একটি বিশাল আয়রণ চেষ্ট। রহিম মানারকমের যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাহার তালা খুলিয়া সমস্ত টাকাগুলি তুলিয়া লইয়াছে, এমন সময় ঘরের ভিতর কাহাদের পদশব্দ শোনা যায়। সে ফুঁ দিয়া মোমবাতিটি নিবাইয়া দিল। ঘরে জমাট অন্ধকার।

কে এরা! অন্ত কোন তস্কর না কি? অন্ত চোর হইলে রহিম শেখের নাম শুনিবামাত্র সেলাম জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিবে। সে গম্ভীরকণ্ঠে বলিল—আমি রহিম শেখ।

কিন্তু এ কি! হঠাৎ একটা গুলি তাহার পাশ দিয়া একটি কাঁচের আলমারীতে গিয়া লাগিল। ঝন্‌ঝন্ শব্দে কাঁচ ভাঙিয়া পড়িল; সেই সঙ্গে একটি আলোর রশ্মি আসিয়া তাহার উপর নিবদ্ধ হইল; কিকা অন্ধকারে দেখা গেল, পুলিশের পরিচ্ছদে দুইজন মানুষ, হাতে রিভলবার ও টর্চ।

এবার বুঝি রক্ষা নাই! রহিম আহতের কৃত্রিম ভঙ্গীতে মাটির উপর লুটাইয়া পড়িল। পুলিশের লোক দুইটি রহিম শেখকে ধরিতে পারার আনন্দে ব্যস্তভাবে তাহার নিকট আগাইয়া আসিল। হঠাৎ রহিম এক লাফে উঠিয়া অসতর্ক তাহাদের ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। তারপর সে দরজার অভিমুখে ছুটিয়া চলিল। একবার ঘরের বাহিরে যাইতে পারিলে তাহাকে ধরে কে?

রহিম দুয়ারের নিকট আসিয়াছে, এমন সময় চোর পালায় দেখিয়া পুলিশের একজন আবার রিভলবার ছুঁড়িল। এবার রিভলবারধারী একেবারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। গুলি আসিয়া রহিমের বামহস্তে আঘাত করিল। কিন্তু রহিমের এখন এসব তুচ্ছ আঘাতে কাতর হইলে চলিবে কেন? সে তখন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাহিরে তখনও ঝড়-বৃষ্টির বিরাম নাই। তাহার পিছনে পুলিশের সঙ্কেতকারী বাঁশীর তীব্র শব্দ আর গুলিছোড়ার বিকট গম্ভীর আওয়াজ।

৫

আহত হাতটি হইতে রক্তের বন্যা বহিতেছে। রহিমের ভ্রূক্ষেপ নাই। ক্লান্ত দামাল ছেলের মত ঝড়-বাদলের গতি ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসিতেছিল। রহিমের তবু বিশ্রাম করিবার অবসর নাই। ছোট নদীটী সে অতিকষ্টে সাঁতার দিয়া পার হইল। একটি হাত যে তাহার একেবারে শক্তিহীন।

চলিতে চলিতে রহিম পোড়ো বাড়ীটির নিকট উপস্থিত হইল। ভিখারিণী ও তাহার ছেলেটি তখনও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। সে মৃদুপদক্ষেপে ছেলেটির মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ছেলেটির মুখে তেমনি প্রসন্ন মৃদু হাসি—সে হয় তো সমস্ত রাত স্বপ্ন দেখিতেছে, একতারার স্বপ্ন, রাজা রাজা খেলার স্বপ্ন!

অত্যন্ত সন্তর্পণে সে ছেলেটির পাশে খেলনা-গুলি গুছাইয়া রাখিল আর একতারাটি। ঘুম ভাঙিলেই তাহার তন্দ্রাতুর চোখের সামনে বছরের প্রথম দিনের সমস্ত কাম্যগুলি যেন প্রগাঢ় বিস্ময়ের চেতনায় জাগ্রত স্বপ্নের রাজ্যে তাহাকে লইয়া যাইবে। আর মাতাটির নিকটে রাখিল কয়েকটি টাকা—কাল যেন তাহাদের ভিক্ষায় না বাহির হইতে হয়।

দূরে পেটা ঘড়িটিতে তিনটা বাজিল। বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে। বিস্তীর্ণ মেঘহীন সুনীল আকাশে সংখ্যাহীন তারার উঁকি; আধখানা পাণ্ডুর চাঁদ। রহিম ফিরিয়া চলিয়াছে, নির্দ্ধারিত সময়ে রুস্তমের সহিত তাহাকে দেখা করিতে হইবে।

পরিশ্রান্ত উপবাসখিন্ন শরীর অবশ হইয়া আসে, ক্লান্ত পা দুইটি চলিতে চায় না। আহত

স্থানটিতে অসহ্য যন্ত্রণা; কিন্তু রহিমের মনের কাণায় কাণায় নবজাত আনন্দের এ কি উল্লাস! এ বুঝি নূতন দিনের আহ্বান নূতন জীবনে!

* * *

রাত্রি শেষ। পরিশ্রান্ত রহিম জেলখানার পাশের ঝোপে একটি পাথরের উপর বসিয়া। রুস্তম আসিয়া পৌঁছিল; ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল—

যোগাড় হ'ল সর্দার?

রহিম ধীরে ধীরে টাকাগুলি রুস্তমের হাতে তুলিয়া দিল। তাহার আহত রক্তাক্ত হাতটি দেখিতে পাইয়া উৎকণ্ঠার সঙ্গে রুস্তম বলিল—ইস্, ভয়ঙ্কর জখম করেছে দেখ্‌ছি! শালাদের একটুও যদি কাণ্ডজ্ঞান আছে। আড্ডায় তাড়াতাড়ি গিয়ে বেঁধে ফেল্‌তে হবে জায়গাটা। তারপর সরাব; বছরের পয়লা দিনে আমাদের সমস্ত দিনভোর ফূর্ত্তির হুকুম চাই সর্দার?

স্নিগ্ধকণ্ঠে রহিম বলিল—আমি আর ফিরব না রুস্তম। বছরের পয়লা দিনে বুঝ্‌লাম কত বড় ঝুটা জীবন আমাদের। কতলোকের সব চুরি করলাম, তাদের কেউ হয় তো উপোস দিচ্ছে, তাদের ভেতর কতলোক হয় তো না খেতে পেয়ে মরে গেছে! খুন করেছি কত, কিন্তু তাদের মেয়াদ কেড়ে নিয়ে কি লাভ হয়েছে আমাদের? পরের সুখ-শান্তি টাকা নিয়ে আমাদের শুধু অশান্তি বেড়ে গেছে। আমি ফূর্ত্তির হুকুম দিলাম রুস্তম; শুধু একদিনের জন্তে নয়, চিরকালের জন্তে—যতদিন বেঁচে থাক্‌বে তত দিনের! যাও সব যে যার সংসারে ফিরে; সেখানে ছেলেমেয়ে, পরিবার, ভাই নিয়ে ঘর বাঁধো।

রুস্তম বিস্ময়ে নির্ব্বাক্! তাহাদের সর্দার কি পাগল হইয়া গেল, না এ অন্য লোক! অনেক ক্ষণ পরে সে বলিল—আর সর্দার?

—আমি এখনি ধরা দেব। হয় তো আমাকে আন্দামান চালান দেবে। সেখান হ'তে আর ফিরব না রুস্তম!

হঠাৎ রহিম যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। আজীবন যে কামনা মনের ভিতর রুদ্ধ বেদনার মত আকুলি-বিকুলি করিয়া হঠাৎ উচ্ছ্বাসে ঝরিয়া পড়ে, তেমনি রহিম উৎসাহের সঙ্গে বলিতে লাগিল—সেখানে সমুদ্দুরের ধারে ছোট একটি কুঁড়ে বাঁধব, সামনে থাক্‌বে একটু ফুলের বাগান। বিয়ে করব কোন মেয়ে আসামীকে। দুজনে চাষবাস করে খাব। দুটো টিয়া, একটা ময়না, আর একটা কাকাতুয়া পুষতে হবে। সন্ধেবেলা তাদের গান শেখাব। অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে তোমাদের কথা মনে পড়্‌বে; সমুদ্দুরের দিকে চাইলেই দেশের জন্তে মন কেমন করবে—একটানা শান্তির ভেতর মনের এটুকু অস্বস্তি বেশ লাগে!

দুজনেই নীরব। রুস্তম ভাবিল, কথাগুলি নূতন; কিন্তু এই মধুর জীবনটির সেও বুঝি এতদিন নীরবে গোপনে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে! শুধু সে নয়, প্রতি ছন্নছাড়া মানুষের মনে বুঝি ইহার চেয়ে বড় আশা, বড় সুখ আর নাই।

কিছুক্ষণ পরে রহিম বিষণ্ণকণ্ঠে বলিল—তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার দুঃখ হচ্ছে রুস্তম! তবু উপায় নেই, আমাকে যেতেই হবে! চল্‌লাম।

সে একবারও ফিরিয়া চাহিল না। রুস্তম দেখিল তাহাদের সর্দার থানার দুয়ারের পিছনে ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। মানুষের মৃত্যুর পর যেমন তাহার কণ্ঠস্বর, তার জীবনের ছোট-বড় ঘটনা, স্মৃতির পথ দিয়া আনাগোনা করে, তেমনি রুস্তমের মনে হয়, রহিম শেখ আর বাঁচিয়া নাই; শুধু তার ব্যক্তিত্বের, তার আদেশ করার গুরু-গম্ভীর কণ্ঠ মনের ভিতর চির-অম্লান ছায়া রাখিয়া গেছে! সে স্মৃতি ভুলিবার নয়!

এদিকে যখন রহিম থানার ঘরের ভিতরে ঢুকিল, দারোগা তখন ঝিমাইতেছিলেন; পায়ের শব্দে জাগিয়া উঠিয়া রহিমকে দেখিবামাত্র চিনিতে

পারিলেন। আহত হাতটিই রহিমকে দস্যু বলিয়া সনাক্ত করিল—দারোগা-সাহেবেরই প্রদত্ত চিহ্ন।

তিনি সযত্নে রিভলভারটি বাগাইয়া ধরিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন—রামতেওয়ারী, হরি সিং জলদি ইধার আও।

তাঁহার চীৎকারে আসিল অনেকে। রহিমকে নির্দ্দেশ করিয়া আদেশ হইল – লাগাও হাতকড়া।

৬

নূতন বৎসরের প্রথমদিনের আলো উদয়াচলের পথে দেখা দিল পূর্ব্বদিকের আকাশ লাল। হাজতের ভিতর রহিম নীরবে বসিয়া। পরিশ্রান্ত অবশ শরীর পঙ্গুর মত স্থির। আহত হাতটি হইতে রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে। তবু সে নির্ব্বিকার!

কিন্তু তাহার মন তখন চলিয়া গেছে,—সেই পোড়ো বাড়ীটির আশে-পাশে! সেখানে ছেলেটি হয় তো এতক্ষণে জাগিয়া খেল্‌নাগুলি দেখিতে পাইয়াছে। একটি কচি কণ্ঠের উচ্ছ্বসিত কলস্বর যেন রহিমের কাছে হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসিয়া আসে! তাহার চোখের সম্মুখে সে যেন দেখিতে পায়,—গোপন দাতাটির উদ্দেশ্যে ভিখারিণী মাতার কৃতজ্ঞতায় সজল দুইটি আঁখি!

ভিখারী ছেলেদের মধ্যে এত যাহার খেল্‌নার ঐশ্বর্য্য, সেই ছেলেটিকে আজ নিশ্চয় তাহার সঙ্গীরা রাজা-রাজা খেলায় রাজার পদটি ছাড়িয়া দিবে! কিন্তু হয় তো সে সঙ্গীদের মধ্যে খেল্‌নাগুলি বিলাইয়া দিয়াছে; নিজের জন্য রাখিয়াছে শুধু একতারাটি! সে বুঝি বাউল রাজা!

হাজতের সঙ্কীর্ণ ঘর; আলোহীন, নীরব। কিন্তু রহিমের মনে হয়—একটি ছোট ছেলের আনন্দের কত কথায়, উচ্ছল মধুর হাসিতে ঘরটি ভরিয়া আছে! হয় তো ছেলেটি এখন রাস্তার ধারে মাঠে যেখানে গত রাত্রের বৃষ্টিতে জল জমিয়াছে সেখানে গিয়া দাঁড়াইবে—সেই তার নদী! কাগজের নৌকা ভাসাইয়া উদাসভাবে একতারা বাজাইতে বাজাইতে সুর করিয়া হয় তো গান ধরিবে—

"মন-মাঝি তোর বৈঠা নেরে,
এবার পারের সময় হল —"

প্রসন্ন মনে রহিম যেন উৎকর্ণ হইয়া শোনে- একটি আত্মহারা বালকের ক্ষীণ মৃদু-কণ্ঠে আপনার খেয়াল-খুশী অনুযায়ী অর্থহীন, অসম্বদ্ধ গানের সুরেলা কথা, আর একতারার তারে শীর্ণ কয়েকটি ছোট ছোট আঙুলের ব্যাকুল-চলার বেতালা ঝঙ্কার!





চিরন্তনী

শ্রী কানাইলাল, পাল বি-এ

(১)

অপরূপ রূপ-লাবণ্য নারী জীবনের প্রধান সম্বল ও অবলম্বন সত্য বটে, কিন্তু কত সময় ঐ রূপই নারী জীবনে বোঝার মত চাপিয়া বসিয়া তাহাকে বিপদের পথে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে, তাহারও দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

রেখার জীবনে কতকটা তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

কয়েক মাস পূর্ব্বে রেখার বাবা যখন মারা যান,তখন অপূর্ব্ব-রূপ-শ্রী ও আপনার হাতে শিক্ষা ছাড়া রেখার পিতা কন্যার ভবিষ্যতের জন্য এক কপর্দ্দকও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

আপনার বলিতে ত্রিভুবনে রেখার কেহই ছিল না। তাহার মাতার মৃত্যুর পর বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া একমাত্র পিতাকে অবলম্বন করিয়াই রেখার বাহ্য জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছিল; সুতরাং পিতার মৃত্যুতে শোকে ও ভবিষ্যৎ চিন্তায় রেখা সমান মুহ্যমান হইয়া পড়িল।

পিতৃশোকের প্রথম ধাক্কা সামলাইবার পর কি করিয়া সে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনটাকে টানিয়া লইয়া যাইবে, এই চিন্তাই একটা জগদ্দল পাথরের মত রেখার মনের উপর চাপিয়া বসিল। কয়েকদিন ধরিয়া সে নানারূপ চিন্তা করিয়াও আশার কোন কূল-কিনারা খুঁজিয়া পাইল না এবং পরিশেষে আপনার জীবিকা আপনি অর্জ্জন করা ব্যতীত সে অন্য কোন উপায় আবিষ্কার করিতে পারিল না।

প্রথম কয়েকদিন সে নানা স্থানের ছোট-বড় কয়েকটী বালিকা বিদ্যালয়ে ঘুরিয়া সেখানে কোন শিক্ষয়িত্রী পদলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার প্রধান অন্তরায় হইল তাহার রূপ ও তরুণ বয়স। যেখানেই সে যাইতে লাগিল, সেখানেই

বিত্তালয়ের কর্তৃপক্ষেরা তাহার অভিজ্ঞতা হীনতার অজুহাতে তাহাকে বিমুখ করিয়া বিদায় করিল।

স্কুলের কাজে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া সে গৃহস্থ গৃহের বালিকাদের অধ্যাপনা বা সঙ্গীত শিক্ষা দিবার যোগাড়ে ব্যস্ত হইল। ছেলেদের জন্ত লোকে যেরূপ গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করে, বালিকাদের জন্তও ত অনেকে সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া থাকে। তাহার ভাগ্যে তবে কি ঐরূপ কিছু জুটিবে না?

একদিন সে একটী কর্ম্মের সন্ধান পাইয়া গৃহকর্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিল, কিন্তু কর্ত্রী তাহাকে স্পষ্টই জানাইয়া দিল—এত রূপ তোমার! এ রূপ নিয়ে তোমায় বাড়ীতে রাখতে সাহস করি না। আমরা মা, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি –কি জানি কোথা থেকে কি হয়।

এই নিদারুণ নির্লজ্জ সত্যকথা শুনিয়া সেদিন রেখার মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিবাদস্বরূপ একটা কথাও তাহার মুখ হইতে বাহির হয় নাই। সেখানে আর না দাঁড়াইয়া ছুটিতে ছুটিতে একেবারে আপনার বাসায় আসিয়া সে হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিল।

এমনি করিয়াই তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া একটা তিক্ত রিক্ততায় তাহার সারা প্রাণ-মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল।

(২)

সেদিন 'প্রবোধিনী' পত্রিকায় এই মর্ম্মে একটি বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল —

"কোন শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোকের বাটী তদারকের জন্ত একজন গৃহকর্ম্মা-নিপুণা বর্ষীয়সী নারীর প্রয়োজন। আবেদনকারিণীর চেহারা ও চাল-চলন যথাসম্ভব সাদাসিধা হওয়া প্রয়োজন। কর্ম্মপ্রার্থিনী নিম্নে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

ইতি

শ্রী বিপিনবিহারী চন্দ্র

৫ নং সন্ন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন স্তম্ভগুলি খুঁজিতে খুঁজিতে উল্লিখিত অংশটুকু রেখার নজরে পড়িয়া গেল। উৎসুক হইয়া সে বিজ্ঞাপনখানি আর একবার ভাল করিয়া পড়িয়া লইল। এই কয়েক ছত্র পড়িয়া তাহার মনে বুঝি এতটুকু আশার সঞ্চার হইল—কিন্তু গোল বাধিল ঐ বর্ষীয়সী কথাটী লইয়া। সে ত ইতিমধ্যে কত স্থানেই আবেদন করিয়াছে, কিন্তু তাহার সবগুলিই তাহার উদগ্র রূপ ও অত্যল্প বয়সের জন্ত অগ্রাহ্য হইয়াছে। আজও কর্ম্মের যদি এতটুকু হদিস মিলিল, তবু তাহার ঐ নবীনতা সেই পথের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল।

সমস্ত রাত ধরিয়া চিন্তার পর সে স্থির করিল, এ সুযোগ কিছুতেই হেলায় ছাড়িয়া দিবে না। কিন্তু কি করিয়া নিজেকে উপযুক্ত করিয়া তুলিবে, তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না। বিজ্ঞাপনে ত স্পষ্টই দেওয়া রহিয়াছে, বর্ষীয়সী ও সাধারণ চেহারার মহিলার প্রয়োজন। তবে? একটা কথা স্মরণ হওয়ায় সে সহসা উল্লসিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ মনে হইল, যদি একটু কৌশলের সাহায্য লইয়া সে আপনাকে বিজ্ঞাপন-দাতার উপযুক্ত করিয়া লয়, তাহা হইলে হয় ত একটা অবলম্বন মিলিলেও মিলিতে পারে। কিন্তু কোন প্রবঞ্চনার সাহায্য লইতে প্রথমে তাহার শিক্ষিত ভদ্র মন কিছুতেই সম্মত হইল না। ছিঃ, তুচ্ছ অন্নের জন্ত সে প্রতারণার আশ্রয় লইবে! কিন্তু, পরক্ষণেই দারিদ্র্য ও অনাহার মৃত্যুর একটা রুক্ষ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সে মনে মনে শিহরিয়া উঠিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া সে বিজ্ঞাপনের নির্দ্দেশ মত আপনাকে বর্ষীয়সীর মত সজ্জিত করিতে বসিয়া গেল। প্রথমে সে অতিরিক্ত সাবান ঘসিয়া চুলগুলিকে অত্যধিক রুক্ষ ও কটা করিয়া লইল। তাহার পর সেগুলিকে শক্ত করিয়া টানিয়া পিছনের দিকে বাঁধিয়া লইল। ড্রেসিং টেবিলটার এক কোণে এক প্রকার পীতবর্ণের

পাউডার পড়িয়াছিল, সে তাহা লইয়া হাতে-মুখে মাখিল। পরিশেষে পিতার একখানি নীল চশমা বাহির করিয়া নাকের উপর বসাইয়া দিল।

বেশবিন্যাস শেষ করিয়া সে যেন আপনাকে আপনিই চিনিতে পারিল না। চশমা পরার জন্য মুখখানা অসম্ভব রকমের চেপ্টা হইয়া গিয়াছে। চুল খুব টানিয়া বাঁধার দরুণ কপালখানি অসম্ভব রকমের বড় দেখাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা তাহার অধরপ্রান্তে মিলাইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে সে একটি বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া কড়া নাড়িতেই একজন ভৃত্য আসিয়া তাহাকে সম্মুখের ঘরে লইয়া বসাইল। সে চাহিয়া দেখিল, কক্ষের চারিপাশে সারি সারি আলমারী সাজান রহিয়াছে। সম্মুখেই একখানি টেবিল—তাহার উপর ইতস্ততঃ কত কি বিক্ষিপ্ত।

কিছুক্ষণ পরেই গৃহস্বামী আসিয়া তাহাকে দেখিয়া নমস্কার করিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল—আপনি বুঝি আমার বিজ্ঞাপন দেখে আসছেন? কেমন, তাই না?

রেখা উত্তর করিল—হ্যাঁ। এই বলিয়াই সে একেবারে কাজের কথা পাড়িয়া বসিল; বলিল, —দেখুন গৃহকর্ম্ম সম্বন্ধে আমার খুব অভিজ্ঞতা আছে। আপনারা যদি আমায় নিযুক্ত করেন, আমার মনে হয়, আমি আপনাদের কোন অসুবিধার মধ্যেই ফেল্‌ব না। তাহার পর একটু থামিয়া বলিল—দেখ্‌লুম আপনাদের একজন অতি সাধারণ চেহারার মহিলার প্রয়োজন। তা আমার মত বয়সের কর্ম্মঠ লোক আপনি আর পাবেন না, এ আমি বলে দিলুম। তাহার পর একবার আপনার সাজসজ্জার দিকে দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া সে বলিল—আমাকে বোধ হয় আপনাদের পছন্দ হবে। একটু বুড়ো হয়েছি, তা ছেলে-মেয়ের ভার আমার হাতে দিলে আপনাকে কোন অসুবিধের মধ্যেই—

বিপিন তাহাকে মাঝ পথে থামাইয়া দিয়া বলিল—দেখুন, গোড়াতেই আপনাকে একটা কথা বলে রাখা ভাল। ছেলে-মেয়েদের কথা কি বলছেন—আমার বাড়ীতে কোন স্ত্রীলোকই নেই। আপনাকেই সব ভার নিতে হবে। সেই জন্যই আমি বর্ষীয়সী মহিলার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলুম। তারপর রেখার মুখের উপর জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি তুলিয়া সে বলিল—এতে কি আপনার কোন অসুবিধে হবে?

রেখা কথা বলিল না;—মনে মনে কি চিন্তা করিয়া মুহূর্ত্ত পরে উত্তর দিল—না, এমন আর কি অসুবিধে বলুন?

তাহার মুখ হইতে কথা প্রায় লুফিয়া লইয়া বিপিন বলিল—অসুবিধে নেই ত? বেশ, বেশ, আপনাকে হলেই আমার চল্‌বে। এ উত্তর আমি আপনার কাছে প্রত্যাশা করেছিলুম। মনস্তত্ত্বের ওপর আমার যেটুকু অধিকার জন্মেছে, তাই থেকে আপনার মুখের এ উত্তর আমি আগেই কল্পনা করেছিলুম। দেখুন, আপনাদের মত সাদাসিধে মহিলাদের আমি খুবই পছন্দ করি; কারণ, তাঁরা আত্মগরিমার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। উপস্থিত আমি একখানা বই লিখ্‌ছি; তাতে দেখিয়ে দেব, আপনাদের মত নারী সংসারে কী শান্তির ডালিই সাজিয়ে রাখে! সুন্দরীগুলো কিছু নয়। শুধু মাকাল ফল। তারা কেবল মাত্র নিজের রূপ আর সুন্দর মুখের গর্ব্ব দিয়েই বিশ্ব-সংসার রচনা ক'রে চলে। কত-খানি ক্রীম-পাউডারের শ্রাদ্ধ করলে তাদের আরও সুন্দর দেখাবে, এই হয় তাদের সার চিন্তা। তারপর একটু থামিয়া বলিল—মাপ করবেন, একটা কথা বল্‌তে আদেশ দিন—রূপ সম্বন্ধে আপনার যদি এতটুকু আত্মবিশ্বাস থাক্‌ত, তবে কি আপনি বিনা দ্বিরুক্তিতে আমার মতে

সমস্ত হ'তে পারতেন ? আমি ত বিয়ে করব না ঠিক করেছি, কিন্তু যদি কোন দিন করতে হয়, জানবেন, শুধু রূপের খাতিরেই নয়। হ্যাঁ, ভাল কথা, কি বলে আপনাকে ডাকব ?

রেখা হাসিয়া উত্তর করিল—আমি বোধ হয় আপনার থেকে বয়সে বড়ই হব। আপনি ত আমাকে নাম ধরে ডাকতে পারবেন না ; বরং আপনি আমার মিস্ চ্যাটার্জ্জিই বলবেন।

সেই দিন রেখা বিপিনের বাড়ীতে গৃহকর্ত্রীর চাকুরী লইয়া হৃষ্টমনে বাড়ী ফিরিল।

৩

পরদিন হইতে সে তাহার নূতন কাজে ভর্ত্তি হইল। যে কৌশল ও চালাকির উপর নির্ভর করিয়া এই নূতন পদ লাভ করিতে হইয়াছে, তাহাকে প্রত্যহই তাহার আশ্রয় লইতে হইত। এই সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য সে প্রত্যহ শয্যা ত্যাগ করিয়াই আপনাকে অভিনব-বেশে সজ্জিত করিয়া তবে লোক সম্মুখে বাহির হইত। এমনি করিয়া তাহার নূতন কর্ম্ম-জীবনের কয়েকটা মাস কাটিয়া গেল।

এই কয় মাসের মধ্যে রেখার সহিত বিপিনের বেশ বন্ধুত্ব হইয়াছে। বিপিনের হাতে যখন কোন কাজ থাকিত না, তখন সে মাঝে মাঝে রেখাকে পড়িবার ঘরে ডাকিয়া নারী-সম্বন্ধে তাহার নূতন লেখা পাণ্ডুলিপি হইতে কোন কোন অংশ পড়িয়া শোনাইত।

এই আত্মভোলা লোকটীর খেয়ালী তর্কে যোগদান করিতে রেখাও অন্তরে অন্তরে বেশ একটা আনন্দ অনুভব করিত। সেও তাহার তর্কের উত্তরে কবে কোন্ গ্রন্থকার নারীদের স্বপক্ষে কোন কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনাইয়া মাঝে মাঝে তাহাকে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিত।

একদিন রেখা কথায় কথায় বিপিনকে জিজ্ঞাসা করিল—রূপসীদের উপর আপনি এত বিরূপ কেন বলুন ত ? কারো কাছে আপনি কি আঘাত পেয়েছেন কোন দিন ?

বিপিন উত্তর করিল—আপনি প্রেমের কথা বলছেন ? না, না, ও সম্বন্ধে কোন দিন মাথা ঘামাবার আমি সময় পাই নি। তবে ওদের সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা আছে। আমি ত অনেক বিবাহিত বন্ধুকে দেখেছি, সুন্দরী স্ত্রী পেলে তারা একেবারে বিব্রত হয়ে পড়ে। তাদের জীবনের সমস্ত পৌরুষ, সমস্ত চাঞ্চল্য ঐ একটী ছোট্ট কচি মুখের আকর্ষণের তলায় নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিয়ে বসে। অনেক চিন্তা করে দেখেছি, সুন্দরী নারী শুধু পুরুষ জীবনের অন্তরায় নয়,—শত্রু! আপনি হাসছেন—কিন্তু এ আমি বাড়িয়ে বলছি না। ইতিহাসেও এর প্রমাণের অভাব নেই। রামায়ণ থেকে আরম্ভ করে 'ট্রোজান ওয়ার' পর্য্যন্ত আলোচনা করলে দেখতে পাবেন ঐ একমাত্র সুন্দরীকে অবলম্বন করে ঐ সব ঘটনার মালা গেঁথে উঠেছে। আদম-ইভের সময় থেকে আজও সুন্দরী নারী নিত্য পুরুষকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে চলেছে। তাদের জীবনের গতি পথ দেখে আমি একেবারে শ্রান্ত হয়ে পড়েছি।

রেখা প্রতিবাদের সুরে উত্তর করিল—এ আপনার নিতান্ত ভুল ধারণা। সুন্দরী নারী যে শুধু অমঙ্গলের দূতী, এ কথাই বা আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন ? তারা আছে, তাই আজও জগৎটা টিঁকে আছে। আপনার কি ধারণা আমি জানি না ; কিন্তু আমার মনে হয়, তারা না থাকলে জগতের সমস্ত রস-মাধুর্য্য এতদিনে লুপ্ত হয়ে যেতো। সাহিত্য বলুন, শিল্প বলুন, কাব্য বলুন, সবই ঐ সুন্দরীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আপনি কি বলতে চান, ওগুলো না হলে মানুষের একদিনও বাঁচা চলত ? তারপর একটু থামিয়া বলিল—আজকের দিনের জগতের দিকে চেয়ে দেখুন, সুন্দরী নারী যেথায় যে আন্দোলনে

যোগ দিয়েছে, সেখানেই তা সাফল্য গৌরবে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সুন্দরী নারী যে পুরুষকে শুধু ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে চলেছে, একথা বল্‌লে নারীর উপর আপনার অবিচার করা হবে। জাতীয় যুদ্ধের এই দুর্দ্দিনে দেখুন, কত নারী পুরুষকে জয়ের পথে, গৌরবের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রশংসার মত আপনার কি তাদের স্বপক্ষে আজ একটা কথাও বল্‌বার নেই?

বিপিন বলিল—আছে; অনেক সুন্দরীই জাতীয় যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়েছেন জানি—কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদ্ হিসাবে একথাও আমার দৃষ্টি এড়ায় নি যে, তাদের সমস্ত প্রেরণার অন্তরালে আত্মপ্রকাশের একটা উদ্দাম বাসনা বর্ত্তমান। তাঁরা এই সব ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে অগ্রণীর স্থান অধিকার কর্‌তে চান কেন জানেন, যাতে তাঁদের খ্যাতি আরও চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। সুন্দর মুখের স্তাবকের অভাব হয় না। জগতের ব্যবসায়ে ঐটাই হচ্চে তাঁদের মূলধন। সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র। ঐ জয় গৌরবের গর্ব্বেই নিত্য তাঁরা ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছেন।

রেখা উত্তর করিল—পৌরুষের এত গর্ব্ব কিসের আপনার? সুন্দরীদের সম্বন্ধে যত মন্দ ধারণাই আপনি পোষণ করুন, আমি জানি, তারা বাস্তবিক তত ছোট নয়। বলিতে বলিতে সে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আত্ম-প্রকাশের বাণী উচ্চারণ করিবার জন্ত তাহার ওষ্ঠ দুটী থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তে আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইল; তারপর আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—থাক্, আজ আর আমি তর্ক কর্‌তে চাই নে—কিন্তু আমি জানি একদিন আপনার মত বদ্‌লাবেন। আজ সুন্দরীদের উপর যে অবিচারের ঋণ কর্‌লেন, একদিন সুদে-আসলে তা শোধ দিতে হবে। এই বলিয়া সে তাহাকে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বিপিন স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। রেখার কথাগুলি প্রতিধ্বনির মত তখনও তাহার কাণের কাছে বাজিতেছিল।

৪

মানুষের চিন্তাধারা যখন কোন প্রতিকূল মতের সম্মুখীন হয়, তখন তাহাকে অতিক্রম করিতে তাহার চেষ্টার অন্ত থাকে না। বিপিনেরও হইয়াছিল তাই। সেদিন তর্কে রেখাকে পরাজিত করিতে না পারিয়া, একটা শক্ত এবং অকাট্য প্রত্যুত্তর দিবার জন্ত সে মনে মনে প্রস্তুত হইতে ছিল। কিন্তু সেদিন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাহার সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল।

রাত্রি তখন বোধ করি দশটা কি এমনি। রেখা তাহার উপর ন্যস্ত গৃহ-কর্ম্ম সারিয়া অন্য দিনের মত অবসন্ন মনে আপনার কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। অন্যদিনের মতই সে কৃত্রিম সজ্জা পরিত্যাগ করিয়া রাত্রিবাসোপযোগী একখানি বস্ত্র পরিধান করিল। চোখের নীল চসমা খুলিয়া সে মুখের রং ধুইয়া ফেলিল। তাহার পর অদ্ভুত করিয়া বাঁধা চুলের বাঁধন খুলিয়া দিতেই উন্মুক্ত কেশরাশি কাণের ও মুখের পাশ দিয়া পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়িল। এতক্ষণ পরে সে স্বচ্ছন্দ স্বরূপে ফিরিয়া আসিয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

শয্যা গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাহিরের দিকের খড়খড়ি খুলিতেই একটা বিশ্রী উগ্র গন্ধে সে চমকিয়া উঠিল; কিন্তু কোথা হইতে সেই দুর্গন্ধ আসিতেছে, তাহা ঠিক করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে তাহার মনে হইল, নীচের কোন স্থানে বোধ হয় কিছু পুড়িতেছে। একটা দুর্ঘটনার কথা মনে হওয়ায় সে শিহরিয়া উঠিল। মা গো! যদি কোথাও আগুন লাগিয়া থাকে?

সমস্ত বাড়ীখানিতে তখন কোন সাড়া-শব্দ ছিল না। ওধারের উপরকার বিপিনের ঘরের আলো তখন নিবিয়া গিয়াছে—হয় ত সে নিদ্রিত।

নীচেকার ভৃত্যদের মহলেও জাগরণের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। সমস্ত বাড়ীখানি তখন ঘুমন্ত রাজপুরীর মত অন্ধকারে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কিছুক্ষণ স্থিরভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর আর এক ঝলক উগ্রগন্ধ তাহার নাকে আসিতেই সে আবার চমকিয়া উঠিল।

তাড়াতাড়ি নীচে আসিয়া সে প্রথমে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, সেখানে সমস্তই ঠিক রহিয়াছে। সেখান হইতে বাহির হইয়া সে চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিল, কিন্তু কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারিল না। বিপিনের লাইব্রেরী ঘরের কাছে আসিতেই গন্ধে তাহার দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল; কিন্তু তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। না, সে যতটা আশঙ্কা করিয়াছিল, ততটা ঘটে নাই। সমস্তই ঠিক রহিয়াছে, শুধু একখানি কম্বলের কিয়দংশ পুড়িয়া তাহারই ধূমে সমস্ত বাড়ীখানিকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে।

সে প্রথমে দুই হাতে আগুন নিভাইয়া ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, আর কোথাও কিছু হইয়াছে কি না। তারপর দরজা বন্ধ করিয়া নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

হলঘরের মাঝামাঝি আসিয়া তাহার আলো নিভাইতে যাইতেই ত্রিতলে উঠিবার সিঁড়িতে কাহার নিম্নগামী পদশব্দ শুনিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। নীচে নামিবার সময় সে যথাসম্ভব সাবধানে ও নিঃশব্দে নামিয়াছিল, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় অসাবধানে হয় ত সে সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়াছে, সেই শব্দে চমকিত হইয়া বোধ হয় বিপিন নীচে নামিতেছিল। রেখা লজ্জায় ও বিশেষ করিয়া এইভাবে বিপিনের সহিত সাক্ষাৎ হইবার আশঙ্কায় অন্তরে অন্তরে কাঁপিয়া উঠিল। সে কি করিবে সহসা তাহা ভাবিয়া পাইল না। কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেই বিপিন একেবারে হলঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। তাহাকে দেখিয়া রেখা আর মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। সে কম্বলখানাকে দুই হাতে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া লজ্জায় কাঁপিতে লাগিল।

বিপিন নীচে আসিয়া অতর্কিতে রেখাকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল। এত রাত্রে তাহারি হলঘরের মধ্যে অপরিচিতা সুন্দরীকে দেখিয়া তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সে আর একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—এলায়িত কুন্তলের মধ্যে তাহার শঙ্খ-শুভ্র মুখখানিতে আনীল অতন্দ্র চোখ দুটীতে যেন কোন স্বপ্নরাজ্যেরই মায়ার আবেশ মাখান রহিয়াছে! স্বল্পমাত্র বস্ত্রের অন্তরালে তাহার অপরূপ রূপ, বিশেষ করিয়া অনাবৃত সুগঠিত বাহু দু'টী ঠিক যেন শিল্পীর যত্নে গড়া মর্ম্মর মূর্ত্তির মত দেখাইতেছিল।

বিস্ময়ের ভাব কাটিতেই একটা উদগ্র ক্রোধে তাহার সমস্ত অন্তর 'রি-রি' করিয়া উঠিল। কি করিয়া এই সুন্দরী, বিশেষ করিয়া অপরিচিতা এইরূপ স্বল্পমাত্র সজ্জায় তাহার অজ্ঞাতে তাহারই হলঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। সে কি বলিবে ভাবিতেছে, এমন সময় রেখাই কথা আরম্ভ করিল।

—আপনি বোধ হয় পোড়া গন্ধ পেয়েই নীচে নেমে আসছেন? এই দেখুন, এই কম্বলখানা যত অনর্থের মূল। তারপর একটু থামিয়া বলিল—আপনি বোধ হয় অসাবধানে চুরুটের ছাই-টাই এর ওপর ফেলেছিলেন, তাই কোন রকমে এটাতে আগুন লেগে গেছ্ল। ভাগ্যিস, অন্য কিছুতে ধরেনি তাই রক্ষে। যাক্, আপনার বেশী কিছু ক্ষতি হয় নি; এই খানার উপর দিয়েই গেছে। এই বলিয়া সে কম্বলখানাকে তাহার দিকে একটু উঁচু করিয়া ধরিল।

রেখার কণ্ঠস্বর শুনিয়াই বিপিন চমকিয়া উঠিয়াছিল; তাহার মনে হইল, এ স্বর যেন

কত পরিচিত! কিন্তু তাহার দিকে বারবার চাহিয়াও কিছুই নিরূপণ করিতে পারিল না। সে উত্তর দিল না।

তাহাকে নীরব দেখিয়া রেখা আবার বলিতে লাগিল—দেখুন এমন অসাবধানে কখনও কিন্তু চুরুটের ছাই ফেল্‌বেন না। মা গো! এ থেকে আরও যে কি হতে পার্‌ত, তাই ভেবে আমি এখনও শিউরে উঠ্‌ছি।

রেখার বলার ভঙ্গিতে বিপিনের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সে রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—আমাকে উপদেশ দেবার আগে আমার একটা কথার উত্তর দেবেন কি? তারপর তাহাকে জবাব দিবার অবসর না দিয়াই সে বলিয়া চলিল—আপনি যে অগ্নিকাণ্ড থেকে আমার বাড়ীটাকে বাঁচিয়েছেন,তার জন্ম ধন্যবাদ; কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, কি করে আপনি আমার বাড়ীতে আগুনের সন্ধান পেলেন। আপনি কি আমায় বিশ্বাস কর্‌তে বলেন যে, ধোঁয়া এত তীব্র ছিল যে, রাস্তা থেকেই আপনি তার সন্ধান পেয়েছেন? কিন্তু এত স্বল্প পরিচ্ছদ পরে এই নিশীথে কোন নারীকে প্রকাশ্য রাজপথে ভ্রমণ কর্‌তে দেখেছি বলে ত আমার মনে হয় না। কি করে আপনি এখানে এলেন, আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

তাহার কথা শুনিয়া রেখা একটু হাসিয়া উত্তর করিল—আমি কি করে এখানে এলুম জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন? কেন, আমি ত এখানেই থাকি; একথা কি আপনি জানেন না?

বিপিন সবিস্ময়ে বলিল—কই, মিস্ চ্যাটার্জ্জি ত কোন দিন আমাকে এ বিষয়ে কিছু বলেন নি।

বিস্ময়ের ভাণ করিয়া রেখা উত্তর করিল—মিস চ্যাটার্জ্জি আপনাকে কিছু বলেন নি? তিনি আমার বন্ধু; কাল আমি হঠাৎ কলকাতা এসে বাধ্য হয়ে এখানে উঠেছি। একথা হয় ত তিনি আপনাকে বল্‌তে ভুলে গেছেন। যাক্, আপনাকে হয় ত কতই বিরক্ত করলুম, মাপ করবেন। এই বলিয়া সে তাহাকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বিপিন নীরবে অবাক্ হইয়া তাহার গতি পথের দিকে চাহিয়া রহিল এবং সে অদৃশ্য হইয়া গেলে চিন্তিত মনে উপরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

৫

সেদিন রাত্রে অতর্কিতভাবে রেখা বিপিনের সম্মুখে পড়িয়া মনে মনে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু সেদিন সে তাহার সত্যকার পরিচয় দিতে পারিলে হয় ত খুসী হইয়া উঠিত এবং তাহারই সূচনা করিয়া বিপিনের প্রশ্নের উত্তরে সে যে সেই বাড়ীতেই থাকে, তাহাও বলিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু বিপিন যখন তাহার ইঙ্গিত না বুঝিয়া বিপরীত প্রশ্ন করিয়া বসিল, তখন মিথ্যা পরিচয় দিয়া সম্মুখ হইতে পলাইয়া বাঁচিল। সেখান হইতে চলিয়া আসিবার পরও কিন্তু তাহার চিন্তার অবসান হইল না। ভবিষ্যতে বিপিন যদি এই অদ্ভুত ঘটনা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিয়া বসে, তাহা হইলে কি উত্তর দিয়া সে তাহাকে সন্তুষ্ট করিবে, তাহা খুঁজিয়া পাইল না; কিন্তু কয়দিন কাটিয়া গেল, বিপিন তাহাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না; পরন্তু ঐ ঘটনার কথা যে তাহার স্মরণ আছে, তাহা তাহার কথা বা ভঙ্গিতে প্রকাশ হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। রেখা উপস্থিত জবাব-দিহির হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়া মনে মনে একটা স্বচ্ছন্দতা বোধ করিতে লাগিল।

সে রাত্রের কথা বিপিন রেখাকে জিজ্ঞাসা না করিলেও বস্তুতঃ সে ব্যাপারটা ভোলে নাই; সেই রাত্রি হইতেই তাহার মনের ও চিন্তাধারার একটা আমূল পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে। সে রাত্রে অপরিচিতা সুন্দরীকে দেখিয়া প্রথমে একটা

বিজাতীয় ক্রোধে তাহার সারা অন্তর জ্বলিয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু সে তাহার সেই অপরূপ রূপ, আনীল চক্ষু দু'টী এবং তাহার সেই ব্রীড়া-সমস্ত সলীল গতিভঙ্গিটুকু মোটেই ভুলিতে পারিল না। এতদিন ধরিয়া সুন্দরীদের উপর যতখানি অশ্রদ্ধা তাহার মনের মধ্যে জমাইয়া তুলিয়াছিল, তাহার জোরেও সে এই চিন্তাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না।

কয়দিন ধরিয়া বিপিন রেখাকে কথাটা বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছিল না। সেদিন সে রুদ্ধনিশ্বাসে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—আচ্ছা ক'দিন ধরে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব বলে মনে করছি, কিন্তু কাজের চাপে পেরে উঠি নি। সেদিন রাতে আপনার এক বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ হলঘরে দেখা হয়েছিল। তাঁকে হঠাৎ দু-একটা রূঢ় কথা বলে ফেলেছি; এখনও তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া হয় নি। তিনি কি চলে গেছেন? এই বলিয়া সে উৎসুক-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রেখা মনে মনে একটু হাসিয়া উত্তর করিল—হ্যাঁ, ভাল কথা। ওটা আমারই আগে আপনাকে বলা উচিত ছিল; কিন্তু বলা হয় নি। হঠাৎ বন্ধুটী এসে পড়েছিলেন দু-একদিনের জন্য—আপনাকে বিরক্ত করা হবে ভেবে জানান প্রয়োজন মনে করি নি।

বিপিন আবার প্রশ্ন করিল—তিনি কি চলে গেছেন?

—সে রাতে অমনভাবে আপনার সামনে পড়ে তিনি বিশেষভাবে লজ্জিত হয়ে তারপর দিনই চলে গেছেন।

বিপিন হতাশ-স্বরে বলিল—চলে গেছেন! আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই?

—হ্যাঁ, আপনি যে প্রচণ্ড সুন্দরী-বিদ্বেষী একথা তিনি জানেন। তাঁর অত রূপ, বিশেষ করে আপনি যে তাঁর উপর বিরক্ত হয়েছিলেন, সেটা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। পাছে আপনি আরও বিরক্ত হন, এই ভয়ে তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সাহস করেন নি।

বিপিন ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—আপনি কি আমার এতই ছোট ভাবেন? কোন নারীকে সামনে পেলে আমি তাঁর সম্মান রাখতে পারব না, এই কি আপনি মনে করেন? সুন্দরীদের সম্বন্ধে আমার একটা মত ছিল বটে, কিন্তু সেটাই যে আমার চিরদিনের মত, এ আপনি কেমন করে জানলেন?

হ্যাঁ, আমি ত জানি, আপনার আন্তরিক ও মৌখিক মত এক নয়। কিন্তু আমার বন্ধুটীর মত ঠিক উল্টো। সে বলে—আপনি একটী ঘোর সুন্দরী-বিদ্বেষী। সেই ভয়েই ত তাড়াতাড়ি পালালো; নইলে বেচারীর এখানে দু'-চারদিন থাকবার বড়ই ইচ্ছা ছিল।

—আমার উপর এমন একটা ভুল ধারণা নিয়ে তিনি চলে গেলেন? আগে আমাকে একথা বললেন না কেন, আমি তাঁকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতুম।

—আমি ত তাঁকে তাই বল্লুম। কিন্তু তিনি কি তা শুনতে চান। ঐ নিয়ে ত প্রায় তাঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া হবার উপক্রম হয়েছিল।

বিপিন বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল—ঐ কেমন আপনার বদঅভ্যাস; ঝগড়া না করলে কি আপনি থাকতে পারেন না?

রেখা উত্তর দিল—না।

বিপিন বলিতে লাগিল—আপনার আর কি দোষ বলুন। যাক্, আমার সম্বন্ধে একটী মহিলা যে অন্যায় মত পোষণ করবেন, তা আমি মেনে নেবো না। আমি বলছি, একদিন তাঁকে নিশ্চয়ই মত বদলাতে হবে।

রেখা কথা বলিল না—হঠাৎ বিপিনের এই ভাবান্তর দেখিয়া সে মনে মনে একটা সলজ্জ আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিল।

(৬)

জগতের অভিজ্ঞতা না থাকিলেও গৃহকর্মে রেখার দক্ষতার অভাব ছিল না। সে আপনার স্বভাবগত নারী-হৃদয়ের মমতা লইয়া স্নেহ ও যত্নে বিপিনকে পরম স্বচ্ছন্দেই রাখিয়াছিল এবং আপন বিস্তৃত মায়াজালে আপনি ধীরে ধীরে জড়াইয়া পড়িতেছিল। বিপিনকে সে সত্য-সত্যই শ্রদ্ধা করিত। তাহার এই রিক্ত জীবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মূলধন ছিল এই যে, তাহার সত্যকার রূপকে জগতের মধ্যে অন্ততঃ একজন পুরুষও শ্রদ্ধা করে এবং হয় ত তাহাকে ভালোও বাসে!

রেখার উপর বিপিনের শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। কিন্তু সেই অপরিচিতাকে দেখিবার পর হইতেই একটা বিচিত্র দোলায় তাহার মনটা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল। সে আগে যতখানি সুন্দরী বিদ্বেষী ছিল, এখন ঠিক্ ততখানি তাহার বিপরীত হইয়া উঠিল। সে তাহার পূর্ব্বকার মত ও তাহারই নিদর্শন-স্বরূপ যাহা কিছু লেখা পত্র ছিল, সমস্তই পরিত্যাগ করিল ত বটেই, অধিকন্তু সে অন্তরে-বাহিরে নারী-উপাসক হইয়া উঠিল।

সেদিন রেখা গৃহকর্ম্মের তদারক করিতেছিল, এমন সময় বিপিন একখানি দৈনিক পত্রিকা হাতে করিয়া লইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া হাসিয়া বলিল—আজকের কাগজে আমার সেদিনকার সভাপতির অভিভাষণটা ছাপা হয়েছে। ওটা অনেকেরই ভাল লেগেছে।

রেখা বলিল—ওঃ, সেদিনকার সেই 'নারী ও জগতে তাহার স্থান' সম্বন্ধে যে অভিভাষণ পড়্লেন সেই কথা বলছেন? হ্যাঁ, আমার বন্ধুও আপনার খুব প্রশংসা কর্‌ছিলেন। বল্লেন—আপনার উপরে তাঁর একটা সন্দেহ ছিল। কিন্তু ঐ বক্তৃতা শুনে তিনি তাঁর মত বদ্‌লেছেন।

বিপিন উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

রেখা বলিল—আপনার অভিভাষণ তাঁর এত ভাল লেগেছে যে, তিনি প্রায় আপনার ভক্ত হয়ে পড়েছেন।

বিপিন উৎসাহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—সত্যিই তাঁর ভাল লেগেছে?

রেখা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, আমার বন্ধুর কথায় আপনি এত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ছেন কেন বলুন ত? আপনি কি তাঁকে ভালবেসে ফেলেছেন না কি?

বিপিন উত্তর করিল—প্রথম দর্শনে প্রেম যদি মিথ্যা না হয়, আর সে কথা উচ্চারণ কর্‌লে তিনি যদি অপমান বোধ না করেন, তা হলে তাই। কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—ক্ষমা যদি তিনি আমাকে কর্‌লেন, তবে তিনি আজও অন্তরালে কেন? একদিনও কি তিনি এ বাড়ীতে এসে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ কর্‌তে পারেন না?

—একদিন কেন, আপনি আদেশ কর্‌লে চিরদিনের মতই এ বাড়ীতে থাকতে পারেন; কিন্তু, তা হলে আমার দুর্দশা কি হবে? আমাকে ত তা' হলে বিদায় দিতে হবে—

—তা কি হয়? আপনি যে স্নেহ-মমতা দিয়ে আমাদের ঘিরে রেখেছেন; তার ঋণ শোধ কর্‌বার সাধ্য আমার নেই! তার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আচ্ছা, আমরা যদি তাঁকে একদিন নিমন্ত্রণ করি, তা' হলে তিনি কি আমাদের অনুরোধ রাখ্‌বেন না?

রেখা বলিল—দেখি কি কর্‌তে পারি।

* * *

পরদিন সকালে হাসিতে হাসিতে রেখা বিপিনকে বলিল—আপনার কথাই ঠিক্। তিনি আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। কাল তিনি আমার কাছে আস্‌বেন। সকালে আপনি আমায় ডাক্‌লেই তিনি আপনাকে অভিবাদন কর্‌বেন। কি বলেন?

বিপিন সম্মত হইয়া চলিয়া গেল।

সমস্ত রাত ধরিয়া রেখা ও বিপিন কেহই ঘুমাইতে পারিল না। কখন সকাল হইলে বিপিন তাহার চির-প্রত্যাশিতার দেখা পাইবে, এই চিন্তাই সারাক্ষণ তাহার মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পরদিন সকাল হইতেই সে রেখার দ্বারের কাছে গিয়া ডাকিল—মিস্ চ্যাটার্জ্জি আস্‌তে পারি কি ?

রেখা ভিতর হইতে উত্তর করিল আসুন।

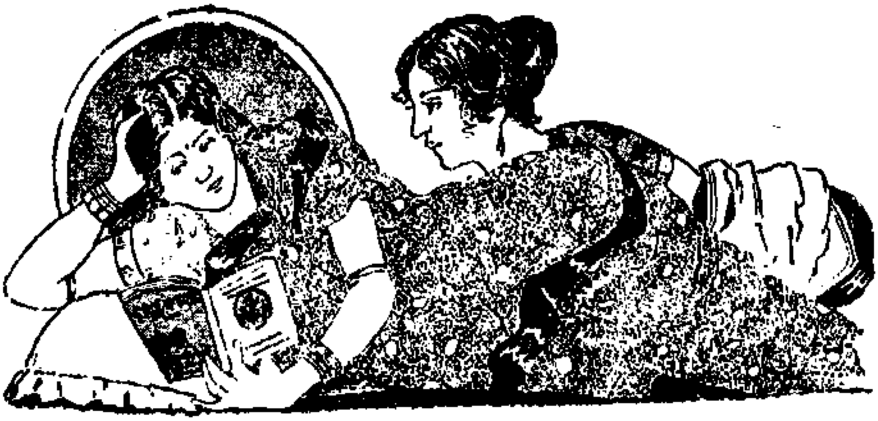
বিপিন ভিতরে প্রবেশ করিতেই রেখা দুই হাত তুলিয়া তাহাকে নমস্কার করিল। সেদিন রাত্রে বিপিন যেরূপে অপরিচিতাকে দেখিয়াছিল, দেখিল,—তাহার সম্মুখে সেই মহীয়সী নারী তেমনি প্রজ্বল বিভায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! সে অপ্রতিভভাবে জিজ্ঞাসা করিল—মিস্ চ্যাটার্জ্জি কোথা ?

সে উত্তর করিল—তিনি নেই; চলে গেছেন।

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিপিন একেবারে চমকিয়া উঠিল! সে কিছুক্ষণ সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না! দেখিতে দেখিতে আনন্দে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! রাত্রের আধ-অন্ধকারে সে যাহার মুখে পরিচয়ের এতটুকু ছাপ খুঁজিয়া পায় নাই, আজিকার এই দিনমানের উজ্জ্বল স্পষ্টালোকে বিপিন তাহাকে নিশ্চয় করিয়া চিনিতে পারিল। তারপর বিমুগ্ধ-বিহ্বল-দৃষ্টিতে আবার কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে ছুটিয়া গিয়া একেবারে তাহার হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিল এবং উচ্ছ্বসিত আনন্দে অস্ফুটকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—আপনি! তুমি!

রেখার নীল চশমাখানা তখন অদূরে মেঝের উপর লুটাইতেছিল।





ভুলের ব্যথা

শ্রীমতী প্রভা গঙ্গোপাধ্যায়

এক

'বঙ্গবীণা' মাসিক-পত্রিকার কার্য্যালয়ে বসিয়া তরুণ সম্পাদক শ্রীমান্ বিজনকুমার অত্যন্ত বিমর্ষচিত্তে ভাবিতেছিল।...

বিজন একাধারে কবি ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। কিন্তু তবুও হতভাগ্য বঙ্গদেশ তাহার যথাযোগ্য মর্য্যাদা গ্রহণ করিতে না পারায় সে ভগ্নীর বিবাহ দিবার মত যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে নাই। ভগ্নী মমতা পনেরোর গণ্ডী ছাড়াইয়া অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে ষোলোয় পা দিয়াছে এবং যেরূপ দ্রুতগতি চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে, ষোলোর গণ্ডীতেও তাহাকে বেশী দিন আবদ্ধ রাখা যাইবে না। মমতা দেখিতে সুশ্রী, ঘরকন্না ও সেলাইয়ের কাজ ভালই জানে, লেখাপড়াও কিছু কিছু শিখিয়াছে। কিন্তু তথাপি তাহার বর জুটিয়া উঠে নাই; অথবা জুটিলেও তাহাদের পণের দাবী শুনিয়া বিজনকে পিছাইয়া আসিতে হইয়াছে। বিজন সাহিত্য আলোচনা করিয়া ভগিনী বিবাহরূপ ভয়াবহ ব্যাপারটাকে ভুলিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু তাহার কাণ্ডজ্ঞানহীনা স্ত্রীটী নিতান্তই অ কবির ন্যায় তাহাকে মাঝে মাঝে কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতেন। সেই স্মরণ করাইবার মাত্রাটা সেদিন একটু অত্যধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়ায় বিজনের মনটা যথার্থই অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছিল।

কবি-বন্ধু মৃণ্ময় ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কি হে, এমন কোরে বোসে কেন? গল্পের প্লট-ট্লট ভাব্‌ছো বুঝি? যাক্, তা' হলে ডিষ্টার্ব কোর্‌বো না। ভেবে নাও ভাই—আমি বোস্‌ছি।"

বিজন মাথা নাড়িল। "প্লট-ফ্লট নয় ভাই। সে সব ছাই আর ভাল লাগে না।"

"ভালো লাগে না! বল কি হে? কবির মুখে হঠাৎ অ-কবির মত কথা!"

"হ্যাঁ ভাই, আমি ভাব্‌ছি এ সব ছেড়ে ছুড়ে দোবো।"

মৃণ্ময় দু'চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, "এ কি

কথা শুনি আজ সম্পাদক মুখে! ব্যাপারটা কি স্পষ্ট কোরে বল দিকিন্?"

বিজন ম্লানমুখে বলিল, "তোমার আর কি বল? বে-থা কর নি, দিব্য ফ্রি লাইফ। কাব্যকুঞ্জে মধুপান কোরে বেড়ানো তোমারই সাজে। আমরা ত আর তা' নয়। সংসারের ভাবনা ভেবে ভেবে—"

মৃণ্ময় 'হোহো' করিয়া হাসিয়া বলিল, "বাপ্! দশটা ছেলে-মেয়ে নেই, সংসারে শুধু একটী অবলা, সরলা, কোমলা স্ত্রীরত্ন—কাব্যের অনন্ত ফোয়ারা! তবে ভাব্‌নাটা কিসের হে? আমার মত লক্ষ্মীছাড়ার অমন লক্ষ্মী থাকলে রোজ একখানা কোরে কাব্য—"

বিজন বাধা দিল, "হুঁ—অবলা কোমলাই বটে! কিন্তু যখন বোনের বিয়ে দিতে পার্‌ছি নে বোলে লম্বা লেক্‌চার ঝাড়েন, তখন সেটা মোটেই কোমলা বলে বোধ হয় না; বরং মনে হয়, যেন খাঁটি ইস্পাতের তীরের মত বুকে বিঁধ্‌ছে।"

ব্যাপারটা উপলব্ধি করিয়া মৃণ্ময় হাসিল, "ইস্পাতের তীর না ফুলের তীর? দেখো ভাই, মিথ্যে বোলো না—বিশেষতঃ, বন্ধুর কাছে।"

বিজন বলিল, "হাস্‌ছো? কিন্তু সত্যি আমি সম্পাদক-গিরি ছেড়ে দিচ্ছি। মমতা এই ষোলোয় পড়েছে—এখনো বে দিতে পারলুম না। গৃহিণীর বাক্যবাণগুলো সম্প্রতি এত তীক্ষ্ণ কোরে উঠেছে যে, আর মোটেই হজম কোরে উঠ্‌তে পার্‌ছি নে। তাই ভাব্‌ছি, এবার সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে মমতার বর জোটাতে উঠে পড়ে লাগ্‌বো।

মৃণ্ময় গম্ভীরমুখে বলিল, "তারপর? বঙ্গবীণার কি হবে?"

"কেন? তুমি রয়েছো, বরেন রয়েছে—" বরেন বিজনের দূর সম্পর্কের মামাতো ভাই।

"না ভাই, সে সব হবে না। ওসব খেয়াল ছেড়ে দাও। বরঞ্চ তোমার সাথে সাথে আমার ও তোমার বোনের বর খুঁজে দেখ্‌তে রাজি আছি।

দুই বন্ধুর অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, আগামী দুই মাসকাল, অর্থাৎ, ৺পূজা পর্য্যন্ত বিজন অপেক্ষা করিবে। ইহার মধ্যে সকলে মিলিয়া মমতার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিতে না পারিলে বিজন সম্পাদকের ভার ছাড়িয়া দিবে; তাহাতে বঙ্গবীণা যদি চিরদিনের মত নীরব হইয়া যায়, তাহাতেও তাহার আপত্তি নাই।

দুই

একমাস কাটিয়া গেল, কিন্তু মমতার বিবাহ হইবার কোনও সম্ভাবনা দেখা গেল না। বন্ধুরা দুই-চারিটী সম্বন্ধ জুটাইয়াছিল, পাত্রপক্ষের মেয়ে দেখিয়া পছন্দও হইয়াছিল; কিন্তু বিজনকুমারের সিন্ধুকের লঘুত্বটা তাহাদের তেমন পছন্দ না হওয়ায় কোন পাকা কথা হইল না। বিজন চিন্তিত হইল।

বরেন একদিন ঠাট্টা করিয়া বলিল, "বোনের বিয়ের জন্য অত ভাব্‌ছো কেন হে? যদি পূজোর আগে না-ই ঘটে উঠে, আমাদের মৃণ্ময় তো রয়েছেই! পেটে বিদ্যে আছে, দেহে রূপ আছে, সিন্ধুকে টাকা আছে। হাতের কাছে এমন খাসা পাত্তর থাকতে তুমি কি না কস্তুরী-মৃগের মত 'ভোঁভোঁ' কোরে ছুটে বেড়াচ্ছো!"

মৃণ্ময় হাসিয়া বলিল, "রক্ষে কর ভাই; এই বুনো পাখীকে আর খাঁচায় বাঁধ্‌বার চেষ্টা কোরো না। উড়ে উড়ে বেশ আছি। ইচ্ছে মত খাই-দাই, গান গাই। হঠাৎ এখন দাঁড়ে বোসে ছোলার ছাতু খেতে হোলে গেছি আর কি! পেরে উঠ্‌বো না ভাই, মাপ কর।"

বরেন বলিল, "ঠাট্টা নয়, সত্যি—তুই কি চিরদিন এমনি আইবুড়ো থাক্‌বি মনে কোরেছিস্ না কি?"

"মোটেই নয়। বরঞ্চ বিবাহের আকাঙ্ক্ষাটা যথেষ্ট পরিমাণেই বিদ্যমান—অন্ততঃ, অন্য কোন আইবুড়োর চেয়ে কম নয়। কিন্তু—"

"কিন্তু কি ?"

মৃণ্ময় হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "কিন্তু বাবার ...থাটা মোটেই ভুলতে পারছি নে যে! বাবার ...খে জীবনে হাসি দেখি নি—সে স্মৃতি আমার ...কের ভেতর ঠিক কাঁটার মত বিঁধে আছে! ...াই প্রতিজ্ঞা কোরেছি ভাই যদি কেউ ভালবেসে ...েচ্ছায় গলায় মালা পরিয়ে দেয়, তবেই বিয়ে ...কোরব। নৈলে চিরটা কাল এমনি লক্ষ্মীছাড়ার ...তই কাটিয়ে দোব।"

মৃণ্ময়ের পিতা ও মাতার মধ্যে কোন অজ্ঞাত ...ারণে কোন দিনও মনের মিল হয় নাই। যন্ত্র-...ালিতবৎ তাহারা পরস্পরের প্রতি নিজ নিজ ...র্ত্তব্য করিয়া যাইতেন মাত্র। কিন্তু সেই ...র্ত্তব্যের মধ্যে প্রাণের অভাবটুকু মৃণ্ময় স্পষ্টরূপে ...নুভব করিত। পিতা-মাতার এই ঔদাসীন্য ...িষয়ে মৃণ্ময় ঘরে-বাহিরে নানারূপ গল্প শুনিয়া-...ছিল এবং নিজের কল্পনাশক্তি দ্বারাও অনেক-...গুলি হেতু স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু ...তাহার কোনটাতেই সে বিশ্বাস স্থাপন করিতে ...পারে নাই। তবে সে এটুকু স্থির বুঝিয়াছিল ..., ইহা ধরা-বাঁধা বিবাহের বিষময় ফল ভিন্ন আর ...কিছুই নয়।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিলে বরেন বলিল, "...কিন্তু স্বয়ম্বর-প্রথাটা যে হিন্দুদের ভেতর উঠে ...গেছে ভাই! রামায়ণ-মহাভারতের আমল তো ...আর নেই যে, হঠাৎ তোকে কেউ সুভদ্রা, ...দ্রৌপদীর মত "গলে মাল্য দিয়া বলে তুমি মম ...পতি ?"

মৃণ্ময় হাসিল, "নেই তা জানি; কিন্তু এখনো ...অনেক সম্প্রদায়ের ভিতর পূর্ব্বরাগ আর স্বয়ম্বর-...প্রথা লুপ্ত হয় নি। কাজেই কোনদিন বা হয় তো ...অদৃষ্ট ভাগার পাতা চাপা বরাতটা হঠাৎ খুলেও ...যেতে পারে।"

"ব্রহ্মজ্ঞানী হবে কোত্থেকে নাকি রে ?"

"দোষ কি ? ব্রহ্মকে হিন্দু-শাস্ত্রও মানে। তা'ছাড়া ঐ যে কি বলে—'যার যাতে মজে মন।"

বিজনকুমার একপাশে একখানা চেয়ারে বসিয়া ভাবিতেছিল। মৃণ্ময় যে তাহাদের স্বঘর এবং রূপে-গুণে সর্ব্বাংশে মমতার বর হইবার উপযুক্ত, ইহা তাহার মনে পূর্ব্বে উদিত হয় নাই। কাজেই বরেন কথাটা উত্থাপন করিতেই তাহার বুকের ভিতর ঢিপঢিপ করিয়া উঠিল। যদি সত্যই সে মৃণ্ময়ের সহিত মমতার বিবাহ দিতে পারে,—তাহা হইলে? তাহা হইলে সে কত সুখীই না হয়।

কিন্তু বিবাহ বিষয়ে বন্ধুদ্বয়ের মনোভাবের আভাস সে পূর্ব্বেই কিছু কিছু জানিয়াছিল। এক্ষণে বরেনের সহিত তাহার বাক্যালাপ শ্রবণ করিয়া সে স্থির বুঝিল যে, মৃণ্ময় বিবাহে অস্বীকৃত হইবে এবং সে যেরূপ আকাঙ্ক্ষা করে, সেরূপ পূর্ব্বরাগের ব্যবস্থা করা বা মমতাকে দিয়া সেরূপ অভিনয় করানোও তাহাদের ন্যায় গৃহস্থ ঘরে সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। এরূপ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য ? বিজন চিন্তিত হইল।

তিন

শ্রাবণের ষোলোটা দিন দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। ভাদ্রের পহেলা ভাদ্র-সংখ্যা এবং বিশে তারিখের পূর্ব্বে শারদীয়া সংখ্যা বজ্রবীণা যেরূপে হউক বাহির করিতেই হইবে। অথচ, ভাদ্র-সংখ্যা এখনও প্রেসে যায় নাই। কাজেই অফিস-ঘরে কতকগুলি কাগজ-পত্র লইয়া বিজন-কুমার অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল।

একতাড়া কবিতা, গল্প, প্রবন্ধের কপি বাহির করিয়া বিজন চটপট তন্মধ্য হইতে পুরাতন লেখক-লেখিকাদের রচনাগুলি বাছাই করিয়া ফেলিল; কারণ, 'চেনা বামুনের পৈতার দরকার হইবে না।' তারপর নূতন লেখক-লেখিকাগণের লিখিত কবিতা গল্পের স্তূপটা অদূরে টেবিলের পার্শ্বে উপবিষ্ট মৃণ্ময় ও বরেনের কাছে ঠেলিয়া

দিয়া বলিল, "এগুলো প'ড়ে ছাপাবার মত কিছু থাক্‌লে বেছে দাও ভাই। বাজে লেখা সব ওয়েষ্ট পেপার বাস্‌কেটে, আর একজনের দুটো ছাপাবার মত রচনা পেলে তার ভেতর ভালটা পূজোর জন্তে আলাদা থাকবে। ঝট্‌পট্‌ কাজ চাই—কাল্‌কে যেমন কোরেই হোক্ ভাদ্র-সংখ্যা প্রেসে দেওয়া চাই।"

পড়িতে পড়িতে একটা কবিতার প্রতি মৃন্ময়ের মন আকৃষ্ট হইল। সুন্দর হস্তাক্ষরে সুন্দর কবিতাটী—নিম্নে স্বাক্ষর শ্রীমতী আরতি-মালা বসু। কবিতাটির নাম অনূঢ়া। অবিবাহিতা যুবতীর হৃদয়-নিহিত করুণ-মধুর ভাবটুকু কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। মৃন্ময় মনে মনে পড়িল—

নারী রূপেই গড়্‌লে যদি হে বিধাতা,
বুকের মাঝে দিলেই যদি সুধা ঢেলে,
পূজায় কি গো পূর্ণ কভু হবে না তা ?
চিরটা দিন যাবেই শুধু অবহেলে ?
আশার আশে দাঁড়িয়ে রব পথ দোরে,
ব্যর্থ মম বরণ-মালা হাতে কোরে ?

বরেন হাসিয়া বলিল, "কি রে অত মন বোসে গেল কিসে ? শ্রীমতী আরতিমালা—বাঃ! বেড়ে নামটী তো! ভারী মিষ্টি লেগেছে বুঝি ?"

মৃন্ময় বলিল, "ঠাট্টা নয়, হাতের লেখাটা দেখ তো, ঠিক্ নামটির মতই সুন্দর। আর রচনাটা,—নূতন লেখিকা হোলেও মোটেই কাঁচা হাতের বলে বোধ হচ্ছে না—ভারী মিষ্টি ভাবটী।

তোমার দে'য়া প্রণয় চাহে যেতে দূরে,
বুকের কোলে উপ্‌চে পড়ে স্নেহধারা ;
বাঁধন পেয়ে গুম্‌রে মরে, অশ্রু ঝুরে,
ভাঙতে চাহে শুষ্ক মম হৃদি-কারা !
আর কত গো রইবো বসে দেহ ধ'রে,
ব্যর্থ মম বরণ-মালা হাতে কোরে ?
পরাণে মোর পরমাণুর যে স্মৃতিটী
চায় গো বিধি বিলিয়ে দিতে আপনাকে ;
বুকের মাঝে মাতৃরূপের সেই প্রীতিটী
পূর্ণ হোতে চায় যে মধু 'মা' 'মা' ডাকে !
এমন আমি রইতে নারি অনাদরে,
ব্যর্থ মম বরণ-মালা হাতে কোরে !

বরেন বলিল, "খাসা লিখেছে তো! শ্রীমতী নিজেই আইবুড়ো বোধ হয় ?"

মৃন্ময় হাসিল, "তা হবে। কিন্তু, 'বেলে পক্কে কাকস্য কিম্' ?"

"নেহাৎ কিম্ নয় হে! নামটী মিষ্টি—লেখাটী মিষ্টি—কবিতাটী মিষ্টি! চেহারাখানাও যদি মিষ্টি হয়, তা' হলে অত মিষ্টির ছড়াছড়িতে শেষকালটায় বুকে আগুন না ধরে! আমি তো মায়াবদ্ধ জীব, কিন্তু অনূঢ় সাবধান !"

মৃন্ময় হাসিয়া বলিল, "নে, কবিত্বটা এখন তোলা থাক্। ভদ্রঘরের মেয়েকে নিয়ে এমনি আলোচনা করাটা মোটেই সমীচীন নয়। তা'ছাড়া তোর বক্ষহারা হবারও কোন আশঙ্কা নেই ; কারণ, শুধু নামটাই আছে—ঠিকানাটী উহ্য "

"ঠিকানা নেই ?"

"না, বোধ হয় লিখ্‌তে ভুলেছে।

"তাই তো ; তা'হলে কি করা যায় ? শ্রীমতীর কবিতায় বেশ হাত আছে। মাঝে মাঝে এর দুটো-একটা কবিতা ছাপাতে পার্‌লে মন্দ হোতো না—অন্ততঃ আস্‌ছে পূজোর সংখ্যায়। বিজন, কি বল হে ?"

বিজন নীরবে উভয়ের বাক্যালাপ শুনিতেছিল। বলিল, "হুঁ, কবিতাটা মন্দ নয়। তা' এক কাজ কর, এটা এই ভাদ্র-সংখ্যায়ই প্রেসে দাও। নূতন লেখিকা—একটা ছাপান হোলেই ঝড়াঝড় পাঠাতে আরম্ভ কোরবে, আর ঠিকানাও পাঠাবে নিশ্চয় !"

কথাটা মৃন্ময়ের মনঃপূত হইল না। তিন বন্ধু অনেকক্ষণ তর্ক-বিতর্ক করিয়া স্থির হইল যে, কবিতাটা ছাপাইয়া তৎপার্শ্বে একটা সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিয়া দিতে হইবে।

(চার)

ভাদ্র-সংখ্যায় শ্রীমতী আরতিমালার কবিতা 'অনূঢ়া' বাহির হইল। ফুটনোটে মন্তব্য রহিল—"লেখিকাকে অনুরোধ, অতঃপর তিনি যেন আপনার ঠিকানা লিখিতে ভুলিয়া না যান; কারণ, ঠিকানা না থাকিলে আমাদের নানারূপ অসুবিধা হয়—এবং ঠিকানা বিহীন রচনাদি সাধারণতঃ পত্রস্থ করা হয় না। আগামী পূজা-সংখ্যায়, অথবা ভবিষ্যতে তাঁহার রচনা পাইলে আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।"

প্রতি শারদীয়া-সংখ্যায় লেখক লেখিকাগণের ফটো বাহির হইয়া থাকে; কাজেই সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত হইল—"চির চলিত প্রথানুযায়ী এবারেও শারদীয়া বঙ্গবীণাকে লেখক লেখিকা-গণের চিত্রে বিভূষিতা করিবার কল্পনা করিয়াছি; কিন্তু উৎসাহ না পাইলে তাহা সম্ভব হইবে না। যাঁহারা শারদীয়া-সংখ্যার জন্য ইতিপূর্বেই রচনা প্রেরণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা শীঘ্রই করিবেন, তাঁহাদিগকে সবিনয় অনুরোধ, আগামী ৭ই ভাদ্রের মধ্যে তাঁহাদের এক একখানি করিয়া ফটো পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন। অবশ্য ব্লক তৈয়ারী হইলে ফটোগুলি পুনরায় ফেরত দেওয়া হইবে। গত বৎসর যাঁহারা আমাদিগকে এবিষয়ে উৎসাহিত করিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের নিকট আমরা সবিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁহাদের ফটোচিত্র পুনরায় পাঠাইবার প্রয়োজন হইবে না।"

কবিতাটী মৃণ্ময়ের বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। একখানা ভাদ্র-সংখ্যা বঙ্গবীণা খুলিয়া নিজের পাঠকক্ষে বসিয়া সে বারবার কবিতাটী পড়িতেছিল—

পরাণে মোর পরমাণুর যে স্মৃতিটী
চায় গো বিধি বিলিয়ে দিতে আপনাকে;
বুকের মাঝে মাতৃরূপের সেই প্রীতিটী
পূর্ণ হোতে চায় যে মধু 'মা' 'মা' ডাকে!
এমন আমি রইতে নারি অনাদরে,
ব্যর্থ মম বরণ-মালা হাতে কোরে!

কি সুন্দর! অনূঢ়ার মনের ছবিটী তাহার নিজ হাতে আঁকা হইলে যত মধুর হয়, শুধু কল্পনায় তাহা হয় না। মৃণ্ময় দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইল, আরতিমালা অনূঢ়া, আর সে—

"এমন আমি রইতে নারি অনাদরে,
ব্যর্থ মম বরণ-মালা হাতে করে!"

শুধু তাই নয়। সে শুধু তাহাতেই সন্তুষ্ট নয়। তাহার আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি আরও দূরে—"বুকের মাঝে মাতৃরূপের সেই প্রীতিটী
পূর্ণ হোতে চায় যে মধু 'মা' 'মা' ডাকে!"

মাতৃজাতির কি ব্যাকুল তৃষ্ণাই না ফুটিয়া উঠিয়াছে,—ঐ দুইটী পংক্তির ভিতর! মৃণ্ময় মুগ্ধ হইল! কবিতার শেষ চরণ দুইটী ঘুরিয়া ফিরিয়া বাজিয়া তাহার হৃদয়ের গোপন তন্ত্রীটীকে বোধ হয় ধীরে ধীরে স্পর্শ করিল। অন্যমনস্কভাবে বঙ্গবীণাখানা নাড়িতে নাড়িতে ফুটনোটে লেখা নিজের মন্তব্যটুকু পাঠ করিল—সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখক-লেখিকার প্রতি অনুরোধটুকু নজরে পড়িল। মনে মনে ভাবিল, আরতিমালার ছবি দেখিবার সৌভাগ্যটুকুও হয় তো তাহার হইতে পারে—যদি সে পূজা-সংখ্যায় কবিতা ও ফটো পাঠায়। আরতিমালা কুৎসিতা নয় তো? মৃণ্ময় ভাবিল, তাহা কখনও হইতে পারে না। যাহার নামটী সুন্দর, লেখাটী সুন্দর, কবিতাটী সুন্দর, অন্তরটী সুন্দর, তার মুখখানাও সুন্দর নিশ্চয়ই! পরক্ষণেই ভাবিল, আরতি যেরূপই হউক, তাহাতে তাহার কি আসিয়া যায়? যত সব অনর্থক অকারণ চিন্তায়—বঙ্গবীণাখানা বন্ধ করিয়া রাখিয়া সে একটা নভেল খুলিয়া বসিল।

শারদীয়া-সংখ্যা বঙ্গবীণা গল্প-কবিতা ও লেখক-লেখিকাগণের চিত্রে সুশোভিতা হইয়া বাহির

হইল। তন্মধ্যে আরতিমালার ফটোচিত্রখানাই মৃণ্ময়ের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া মনে হইল। আর তাহার কবিতাটী আরও সুন্দর—আরও মধুর—

কবে সে এসে পড়ে নেইকো জানা,
রেখেছি পেতে হৃদে আসনখানা!...

তন্বীর বিবাহ না হওয়ায় পূজার পর বিজন-কুমার সম্পাদক পদে ইস্তফা দিল। অফিসের হিসাব-নিকাশ জিনিষ-পত্র প্রভৃতির চার্জ্জ নূতন সম্পাদক মৃণ্ময়কে বুঝাইয়া দিবার সময় আরতি-মালার ফটোচিত্র ও তাহার ব্লকখানা কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। গম্ভীর মুখে বিজন-কুমার বলিল, "ব্লকগুলো যত্ন কোরে রেখে ফটো-গুলো সব ফিরিয়ে দিস্ ভাই। কিন্তু এই এক সেট্ ফটো আর ব্লক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—এতো ভারী তাজ্জব ব্যাপার! অফিস থেকে চুরি গেল না কি?

মৃণ্ময় বলিল, "কোথায় যাবে আর? এখানেই কোথায় প'ড়ে আছে হয় তো—সে আমি খুঁজে বার কোরবো'খন। তোর ভাব্তে হবে না।"

(পাঁচ)

মৃণ্ময় সম্পাদক পদ লাভ করিবার পর ছয়টী মাস দেখিতে দেখিতে অতীত হইয়া গিয়াছে। তখন নব বৎসরের বৈশাখ মাস। শ্রীমতী আরতিমালার অনেকগুলি ভাব-মধুর মনোরম কবিতা ক্রমে ক্রমে বঙ্গবীণায় স্থানলাভ করিয়াছে। কয়েকটীর পার্শ্বে মৃণ্ময়ের রচিত সমভাবপূর্ণ কবিতাও প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভবানীপুরস্থ আপন প্রাসাদের ড্রইং রুমে বসিয়া মৃণ্ময় একটা গল্পের কপি পরীক্ষা করিতে-ছিল—গল্পটী আরতিমালার লেখা; গতকল্য বৈকালের ডাকে আসিয়াছে। গল্পটী সে যতই পড়িতেছিল, ততই প্লটের মাধুর্য্য ও লিখিবার সহজ সরল ভঙ্গীটুকু তাহাকে মুগ্ধ করিতেছিল। রচনাটীর কোথাও জড়তা নাই; যেন একটানে লেখা।

পড়া শেষ হইলে মৃণ্ময় মুখ তুলিয়া টেবিলের উপর সুরক্ষিত শ্রীমতী আরতিমালার ফটো-খানার দিকে মুগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিল। তারপর মুখ নীচু করিয়া গল্পটীর প্রথম পৃষ্ঠার এক কোণে ফাউন্টেন পেন দিয়া লিখিল—'জ্যৈষ্ঠ।'

গল্পের কপিটী অতঃপর একপার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া মৃণ্ময় রাইটিং প্যাড্‌টা কাছে টানিয়া লইল; ফটোটার দিকে আর একবার চাহিল, তারপর নিবিষ্টমনে লিখিতে লাগিল —

দেবী,

আপনার গল্পটী পাইয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। আপনার কবিতার ন্যায় গল্পটীও মনোরম এবং উপভোগ্য। আপনি গল্পও এরূপ সুন্দরভাবে লিখিতে পারেন, তাহা জানিতাম না। জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায়ই আপনার রচনা মুদ্রিত হইবে। আপনার রচনাবলী যতই মুগ্ধচিত্তে পাঠ করিতেছি, ততই আপনার হৃদয়-নিহিত বৃত্তিগুলি আমার চক্ষে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে এবং ততই একটা অসম্ভব আশার আলেয়ায় উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছি।

আপনার দাদা অনিলবাবু আমাকে এখনও তাঁহার মতামত জানান নাই। আমার নমস্কার গ্রহণ করিবেন। তাহার অধিক কিছু জানাইবার স্পর্দ্ধা বোধ হয় আপনি ক্ষমা করিবেন না। আশা করি কুশলে আছেন।

বিনীত
শ্রী মৃণ্ময় মিত্র

চিঠিখানি লেখা হইলে মৃণ্ময় খামে আঁটিয়া উপরে ঠিকানা লিখিল। বেয়ারাকে ডাকিয়া তাহা পোষ্ট করিতে পাঠাইল। তারপর ফটো-খানির পানে চাহিয়া কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিবার পর ড্রয়ার হইতে একতাড়া পুরাতন চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে বসিল। চিঠিগুলির

উপর এক দুই করিয়া নম্বর দেওয়া ছিল। মৃন্ময় বাছিয়া বাছিয়া পড়িতে লাগিল—

নম্বর এক

আনন্দধাম, কলিকাতা
১২ই কার্ত্তিক

মান্যবরেষু—

মহাশয় আপনার চিঠিখানি পেয়ে সুখী হোলুম। আপনি যে এতদূর কষ্ট কোরে এসে দাদার কাছে ফটোখানা দিয়ে গেছেন,—সেজন্য অশেষ ধন্যবাদ। আপনার চিঠিতে জান্‌লুম, আমার ফটোর একখানা এন্‌লার্জমেণ্ট করিয়ে আপনি রেখে দিয়েছেন—উদ্দেশ্যটা ঠিক্ বুঝ্‌তে পাল্লুম না। যা' হোক্, বজ্রবীণার নবীন সম্পাদককে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার যথাসাধ্য সাহায্যের কোন ত্রুটী হবে না। অভিবাদন জান্‌বেন।

বিনীতা
শ্রীমতী আরতিমালা বসু

নম্বর ছয়

আনন্দধাম, কলিকাতা
২৩এ ফাল্গুন

মাননীয় মহাশয়—

গতকল্য আপনাদের চায়ের টেবিলে আমাকে দেখ্‌বার আশা কোরেছিলেন এবং না দেখ্‌তে পেয়ে একটু বিমর্ষ হোয়ে উঠেছিলেন,একথা দাদার কাছে শুন্‌লুম। সকলের কাছে বেরুবার মত এখনো ততটা 'ফরওয়ার্ড'হোতে পারি নি, সেজন্য আমি লজ্জিতা। যা' হোক্, আশা ক'রি আপনি কিছু মনে করেন নি এবং আমাকে একটা জন্তু বিশেষ ভেবে রাখেন নি। আমার রচনাগুলির আপনি যতটা সুখ্যাতি আরম্ভ কোরেছেন, তার অর্দ্ধেকও যে আমি পাবার উপযুক্তা নয়, তা বেশ জানি। আমরা সব ভাল আছি। আপনাদের কুশল জানাবেন। নমস্কার।

বিনীতা
শ্রীমতী আরতিমালা বসু

নম্বর বারো

আনন্দধাম, কলিকাতা
২৯এ চৈত্র

মান্যবর মহাশয়—

আমার কবিতা দু'টী বজ্রবীণাতে ছাপা হোয়েছে দেখে আনন্দিতা হোয়েছি। আগামী পরশু আমার জন্মদিন। দাদার উপদেশমত আপনাকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি; আশা করি উৎসবে যোগদান কোরে আমাদের সুখী কোরবেন।

বিনীতা
শ্রীমতী আরতিমালা বসু

নম্বর তেরো

আনন্দধাম, কলিকাতা
৭ই বৈশাখ

মহাশয়—

আপনার পত্রখানা পেয়ে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হোয়েছি। আমার ফটোখানার এন্‌লার্জমেণ্ট করিয়ে রাখ্‌বার কারণটা বোধ হয় এতদিন পরে কতকটা বুঝ্‌তে পাল্লুম।

আপনার অতবড় আবেগময়ী লিপিখানার যথোচিত উত্তর দেবার মত শক্তি আমার নেই। আপনার সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রস্তাবটী শুনে সুখী হোলুম। আপনি আমার মত রূপগুণহীনা অভাগিণী নারীকে সহধর্ম্মিণী কর্‌বার জন্য ব্যাকুল হোয়েছেন, এটা বিস্ময় ও আনন্দের কথা! কিন্তু আপনার সাথে আমার এ বিষয় নিয়ে পত্র ব্যবহার ও আলোচনা ঠিক্ ন্যায়-ধর্ম্মসম্মত হবে না। কাজেই আপনার প্রস্তাবটী আমার মত পরমুখাপেক্ষিণীর কাছে না কোরে দাদার কাছে কোর্‌বেন; কারণ, তাঁর মতামতই এ সমস্ত বিষয়ে মূল্যবান ও নির্ভরশীল।

বিনীতা
শ্রীমতী আরতিমালা বসু

(ছয়)

শ্রীমতী আরতিমালার কবিতাগুলি ও আলোক চিত্রখানি মৃণ্ময়কে মুগ্ধ করিয়াছিল। তৎপরে সম্পাদকরূপে যতই সে তাহার সংস্পর্শে আসিতে লাগিল, ততই তাহার পত্রাবলী ও কবিতানিচয়ের মধ্যে হৃদয়ের মধুরতাটুকু অনুভব করিতে লাগিল; ততই তাহার মনের কোণে একটা অভূতপূর্ব্ব বাসনার শিখা ধিকিধিকি জলিয়া উঠিল। মৃণ্ময় ভাবিল, যদি তাহার সহধর্ম্মিণী হইবার মত কেহ থাকে, তবে সে এই আরতিমালা। কথাটা ভাবিতেই তাহার আপাদমস্তক রোমাঞ্চিত হইল। আরতি তাহার পত্নী হইবে, এই চিন্তাটার মধ্যেও এমন একটা সুখ ও আনন্দ প্রচ্ছন্ন ছিল, যাহা সে পূর্ব্বে কোনদিন অনুভব করে নাই।

ক্রমে আকাঙ্ক্ষাটা তাহাকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিল। আরতির সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। মৃণ্ময় ইচ্ছা করিয়াই সম্পাদকীয় চিঠি-পত্রের সংখ্যা অনর্থক বাড়াইয়া দিল। চায়ের নিমন্ত্রণটা ঘনঘন অযাচিতভাবে রক্ষা করিতে আরম্ভ করিল কিন্তু তবুও লজ্জা-শীলা আরতির সহিত চাক্ষুষ আলাপ-পরিচয়টা অধিকদূর অগ্রসর হইবার কোনও সম্ভাবনা দেখা গেল না।

তাই বলিয়া মৃণ্ময় হতাশ হইল না। আরতির নিজস্ব মনের কথাটুকু জানিবার জন্য সে সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। কয়দিন বৃথা চেষ্টার পর জন্মোৎসবের দিন সে আরতিকে মুহূর্ত্তের জন্য নির্জ্জনে পাইয়াছিল, কিন্তু আসল প্রশ্নটা উত্থাপন করিবার পূর্ব্বেই যখন সুযোগটা নষ্ট হইয়া গেল, তখন সে পুনরায় বৃথা চেষ্টা না করিয়া আরতি-মালাকে একখানা চিঠি লিখিয়া দিল।

পত্রোত্তরে মৃণ্ময় বুঝিল, আরতির অমত তো নাই-ই বরং যথেষ্ট আকাঙ্ক্ষা আছে। তাহার বুকের মধ্যে এক ঝলক আনন্দ 'ছলাৎ' করিয়া উঠিল। আরতির মাসতুত ভাই অনিলকে এ বিষয়ে মতামত জানাইতে লিখিয়া একটুখানি আশা-নিরাশার দোল খাইতে খাইতে সে কল্পনার সোনালী জাল বুনিতে আরম্ভ করিল। 'ভাগের পূজা' ও 'বারোয়ারী'র অনুকরণে সে ও আরতি উভয়ে মিলিয়া কয়খানা উপন্যাস লিখিবে। তাহাদের কি কি নাম হইবে, আরতিকে বঙ্গবীণার সহঃ-সম্পাদিকা করিবে কি না ইত্যাদি যখন প্রায় স্থির হইয়া আসিয়াছে, তখন হঠাৎ একদিন অনিলের অনুকূল মতসূচক পত্র আসিয়া মৃণ্ময়কে আত্মহারা করিয়া দিল। মৃণ্ময় সবিস্ময়ে দেখিল, অনিল শুধু বিবাহে মত দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, আগামী পরশ তারিখে দিন স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। এত তড়িঘড়ির কারণ বুঝিতে না পারিয়া মৃণ্ময় আশ্চর্য্য হইবার সাথে সাথে আনন্দিতও হইল যথেষ্ট। তাড়াতাড়ি পোষাক পরিয়া সে বন্ধুবর্গকে শুভ-সংবাদটা জ্ঞাপন করিতে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িল।

অফিসগৃহে প্রবেশ করিতেই বরেন অভ্যর্থনা করিল, "হ্যালো! গুড্ মর্ণিং! তারপর? অসময়ে কেন হেরি সম্পাদকে আজ? ব্যাপার কি হে? বড্ড ব্যস্ত বোলে বোধ হোচ্ছে যেন!"

মৃণ্ময় বলিল, "হ্যাঁ ভাই, একটু ব্যস্ত আছি; —পরশু আমার বে, তাই তোদের বোল্‌তে এলুম। এক্ষুনি পোষাক কিন্‌তে বেরুতে হবে।"

বরেন লাফাইয়া উঠিল, "বে! বল কি হে ব্রহ্মচারী! কোন্ সে অপ্সরা ভুলাইল ঋষির পরাণ? হঠাৎ তোমার গলায় মালা দিয়ে ফেল্লে এমন কনেটী কে হে?"

"আরতিমালা।"

বিজন ভ্রু'চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, "আরতিমালা! আমাদের লেখিকা আরতি-মালা?"

মৃণ্ময় হাসিল, 'হ্যাঁ ভাই, তিনিই।"

বরেন হাসিল, "বটে, আমাদের চোখে ধুলো

দিয়ে ভেতরে ভেতরে এতখানি কাজ গুছিয়ে ফেলেছো! তাই তো ভাব, ভায়ার আমার ঘন-ঘন চারের নেমন্তন্ন, আর আরতিমালার সুরসাল টস্‌টসে কবিতা 'হুহু' কোরে আসছে কোত্থেকে। তা বেশ ভাই, বেশ! শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হোলুম। থ্রি চিয়ার্স ফর্ আওয়ার লেডি এডিটর। হিপ্ হিপ্ হুর্‌রা।"

মৃন্ময় বাধা দিয়া হাসিয়া বলিল, "আ রে, থামো না হে। বে-টা হোতেই দাও আগে।"

বরেন বলিল, "সে তো সাইকোলজিক্যালি হোয়েই গেছে ভাই। এখন গোটাকয়েক স্বর-বিসর্গ চোখ বুজে আওড়ে গেলেই, বাস্! নিকুঞ্জের স্বর্ণ কবাটগুলো ঝটাপট্ খুলে যাবে। তারপর পিরিতি সাগরে সিনান করিব পিরিতি মাখিয়া গায়। পিরিতি বসন পিরিতি অশন শয়ন পিরিতি ছায়। আরতি—পিরিতি পিরিতি—আরতি, কি রীতি বুঝিতে নারি।"

মৃন্ময় হাসিল, "ও সব বাসরের জন্য তোলা থাক্ ভাই। এইবার দু'জন উঠে পড় দেখি কলেজ ষ্ট্রীটের দিকে।"

বিজন ও বরেন লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "চল।"

ফুলশয্যার রাত্রি।.....

আরতির দুই কাঁধের উপর দু'খানা হাত রাখিয়া মৃন্ময় নিষ্পলক-নেত্রে চাহিয়াছিল।

আরতি লজ্জারক্তিমমুখে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখ্‌ছেন?"

মৃন্ময় বলিল, "তোমাকে দেখ্‌ছি মালা! তোমার অন্তরটী যেমন সুন্দর, মুখখানিও ঠিক্ তেমনি! সত্যি, প্রথম যেদিন তোমার অনূঢ়া কবিতাটা পড়ি, সেদিন থেকেই তোমাকে ভালবেসেছিলুম। কি মিষ্ট তোমার কবিতাগুলো! অমন লেখো কি কোরে?"

আরতি বলিল, "আমি লিখি নি তো। আমি তো শুধু নকল কোরে দিয়েছিলুম।"

মৃন্ময় সাশ্চর্য্যে বলিল, "তুমি লেখ নি!"

"না, ও সব তো সেজ দাদার লেখা।"

"সেজ দাদা! সেজ দাদা কে? অনিল?"

"না। অনিল-দা তো আমার মামতো ভাই।"

"তবে সেজদাদা কে?"

"সেজদার নাম জানেন না বুঝি?—বরেন। তিনি আপনার বন্ধু তো।"

ব্যাপারটা আগোপান্ত বুঝিতে মৃন্ময়ের একটুও বিলম্ব হইল না। সে বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। বরেনের উপর তাহার এত রাগ হইল যে, সে নিকটে থাকিলে বোধ হয় হাতাহাতি হইয়া যাইত।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর আরতি বলিল, "মন কোরে রইলেন যে? হাওয়া কোর্‌বো?"

মৃন্ময় বলিল, "না, কিছু নয়। তুমি তা' হলে রতি নয়—মমতা?

"হাঁ, আমার নাম মমতা। আরতি তো [illegible]। সেজদাদা ঐ নামে কবিতা ছাপাতো।"

মৃন্ময় হতাশ হইয়া শুইয়া পড়িল।

মমতা হাত পাখা দিয়া বাতাস করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "অমন কোরে শুয়ে পড়্‌লেন যে কেন? [illegible] আমাকে ভালবাসেন?"

মৃন্ময় কথা কহিল না।

মমতা বলিল, "বুঝেছি, আমার উপর রাগ কোরেছেন, আমি কবিতা লিখি নি বলে? আমি শুধু 'আরতি' নামটী আর কবিতাগুলো ভালবেসেছিলেন; আমায় একটুও ভালবাসেন নি।"

মৃন্ময় আরতির হাতখানা ধরিয়া বলিল, "যাক্, সে যা হবার হোয়ে গেছে। তোমার ভাল- [illegible] আরতি? নিশ্চয়ই ভালবাসি।

* * *

পরদিন প্রভাতে বহির্ব্বাটীতে বরেনের সহিত

সাক্ষাৎ হইতেই মৃন্ময় চেঁচাইয়া উঠিল, "শালা জোচ্চোর ঠগ, তুমি আমার সাথে পাঁপ্পাবাজি কোরেছ—মমতাকে আরতি সাজিয়ে—?

বরেন মৃদু হাসিল, একশবার শালা বল ভাই, একটুও আপত্তি নেই। কিন্তু অমন মধুর সম্বন্ধটা যেন আর ত্যাগ কোরো না, এই মিনতি।"

কিন্তু বিজন যাহা ভয় করিয়াছিল, তাহা হইল না। মৃন্ময় মমতাকে ত্যাগ না করিয়া সুখের ঘরকন্না পাতিল ; কারণ মমতার মুখখানি না কি ফুলশয্যার রাত্রে তাহার নিকট কবিতার অপেক্ষাও মিষ্ট লাগিয়াছিল।



মনের খেলা

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ, বি-এ

১

পুরুষের সংস্পর্শে না আসিয়াও অমলার এই জাতিটার প্রতি কেমন যেন একটা বিদ্বেষ ছিল। এ জগতে তাহারা যে কোন্ অধিকারে প্রভুত্বের আসনে বসিয়া মেয়েদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে, তাহা সে যেমন খুঁজিয়া পাইত না, তেমনই তাহার জীবনে যাহাতে ও দলের কোন প্রভাব না লাগে, সেই ভয়ে প্রাণপণে নিজেকে তাহাদের সান্নিধ্য হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিত।

তাহার এই সৃষ্টিছাড়া পুরুষ-বিদ্বেষ লইয়া তাহার সাক্ষাতে যেমন তুমুল আন্দোলন চলিত, অসাক্ষাতেও তেমনি রসিকতার অন্ত ছিল না। কিন্তু কোন আন্দোলনই আজ অবধি অমলাকে তাহার এই অপূর্ব্ব মনোভাব যে নিতান্তই অস্বাভাবিক, এই কথা বুঝাইতে পারে নাই। তাই সেদিন মলিনার জন্মতিথি উৎসবে উপস্থিত নিমন্ত্রিত একটী যুবকের সহিত আপনা হইতে তাহাকে আলাপ করিতে দেখিয়া, বান্ধবীর দল একান্তে তাহাকে ঘিরিয়া যখন প্রশ্নের পর প্রশ্ন ও বিদ্রূপের পর বিদ্রূপ বর্ষণ আরম্ভ করিল, তখন সে যেন কেমন হইয়া গেল। সে না পারিল সে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে, না পারিল সখীদের বিদ্রূপ সহ্য করিতে।

সুষমা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া যেন আপন-মনেই বলিল—"যাক্, শেষটায় অমলিও আমাদের দলেই ভিড়ে গেল দেখছি!"

অমলা কথাটা শুনিয়াও যেন শুনে নাই এমনই ভাব দেখাইয়া মলিনার সহিত আলাপ করিতে লাগিল। কিন্তু কথাটায় যে কতখানি আঘাত লাগিয়াছে, তাহাও কাহারও কাছে অস্পষ্ট রহিল না।



কে একজন আরও একটু রসান চড়াইয়া বলিয়া উঠিল—"ও লোকটা বোধ হয় পুরুষ নয়—নইলে কি আর অমলা গায়ে পড়ে আলাপ করে!"

ইহার পরে আর নীরব থাকা অমলার পক্ষে সম্ভব হইল না; সে আগুন হইয়া বলিল—"কে পুরুষ আর কে পুরুষ নয় সে বিচার না করেও এইকথা বলা চলে সুষমা, যে ও লোকটা তোমাদের জানা-শোনা পুরুষদের দলের নয়। আর একথাও ভুলো না যে, অমলা আর সুষমাতে তফাৎ অনেকখানি।"

সুষমা হাসিয়া কহিল—"তোমার গোড়ার কথাটা না মান্‌লেও শেষের কথাটা খুব মানি। সুষমা আর অমলার মধ্যে যে প্রভেদ, তা যেন চিরদিন থাকে। তবে কথা অমল, আজ তুমি পুরুষের মধ্যে আকর্ষণের আভাষ দেখেছ, ভবিষ্যতে—"

অমলা উত্তেজিত হইয়া বলিল—"হাঁ, ভবিষ্যতে

আর যাই হোক, তোমাদের মত ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে পুরুষের মুখের দিকে চেয়ে থাকার মত দুর্ব্বলতা আমার হবে না সুষমা।"

সুষমা কোন উত্তর দিল না; কিন্তু তাহার মুখে-চোখে সুস্পষ্ট বিদ্রূপের আভাষ খেলিয়া গেল দেখিয়া অমলা বলিয়া উঠিল—"ধর, যদি তোমাদের মত এক পাল ছেলে-মেয়ে নিয়ে ষষ্ঠীবুড়ী হওয়াটা আমার ভাল না লাগে, তাতে বলবার কি আছে।"

সুষমা হাসিয়া বলিল—"মন অনেক কিছুই বলে অমল, তা বলে তার সব কথায় সায় দেওয়া চলে না। আজ ষষ্ঠীবুড়ী বলে আমাদের তামাসা করলে, দু'দিন পরে হয় ত নিজেই এটুকুর জন্যে লালায়িত হবে।"

অমলার সমস্ত অন্তর সুষমার বিরুদ্ধে গর্জ্জিয়া উঠিল; কিন্তু ঝগড়া করিয়া নীচতা প্রকাশ করার মত মনোবৃত্তি তাহার কোনদিনই ছিল না; তাই সমস্ত গ্লানি বুকে চাপিয়া অমলা বলিল—"বেশ ত গো, যদি এমন দুর্দ্দিনই জীবনে আসে, না হয় তোমার কাছে হার মেনেই নেব। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার পুত্রেষ্টি সফল হোক্।"

অমলা চলিয়া গেল। সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেই সমবেত তরুণীগণের কণ্ঠ হইতে মধুর হাস্যধ্বনি উত্থিত হইয়া ঘরখানির রূপ একেবারে বদলাইয়া দিল।

বেশ একটু উষ্মা লইয়া অমলা সেদিন বাড়ী ফিরিল; এবং যাহাকে কেন্দ্র করিয়া এ ব্যাপার, সমস্ত ক্রোধ ও মনের প্রচণ্ড উগ্রতা যাইয়া পড়িল তাহার উপর। কিছুদিন তাহাকেই ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়া দেখিল, মনের কোন্ গোপনতম প্রকোষ্ঠে সেই সদ্য-পরিচিত ব্যক্তির জন্য যেন একটু দরদ লুকাইয়া আছে। অমলা চমকিয়া উঠিল। তবে কি সুষমার কথাই সত্য হইয়া দাঁড়াইবে না কি? না সে কিছুতেই তাহা হইতে দিবে না। অমলা ছুটিয়া মায়ের ঘরে গিয়া আত্মগোপন করিল।

অমলার মা চিররুগ্না। তারপর কন্যার পাগ্‌লামিতে মনের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। কিন্তু এক মেয়ে তাহাকে কিছু বলিতেও মন সরে না। তা ছাড়া, স্বামী কন্যার মতের বিশেষ পক্ষপাতী; সুতরাং তাঁহার কোন কথাই সেখানে থাকে না। অমলাকে অমন করিয়া পলাইয়া আসিতে দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও আবার কি, অমন ছুটে এলি-কেন মা?"

অমলা কথা বলিল না; কিন্তু একেবারে মায়ের কোল ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িল। মা তাহার মুখে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"কাঁপ্‌ছিস যে অমলা, কি হলো বল্ না।"

অমলা সংযত হইয়া বলিল—"কিছু নয়; তোমার কাছে একবার এলুম। আচ্ছা মা, তোমার শরীর ত কিছুতেই ভাল হচ্ছে না, চল না বাবাকে বলে আর কোথাও যাই।"

মা বুঝিলেন, মেয়ের মন ভাল নাই; শঙ্কিত হইয়া বলিলেন—"বেশ ত; তোর যদি ভাল লাগে, চল। আমার আর কি, রুগ্ন দেহ নিয়ে বেঁচে থাকার চাইতে—"

অমলা কাঁদকাঁদ হইয়া বলিল—"আবার ওই সব বল্‌বে ত আমি আর তোমার কাছে আস্‌বে না।"

মা হাসিয়া বলিলেন—"এ অভিমান আমি না হয় শুন্‌লাম; কিন্তু মা, সত্যিই যেদিন মরণ আস্‌বে, তাকে ত ঠেকাতে পারবি না।"

এই সময় চাকর আসিয়া সংবাদ দিল—কে একজন বাবু অমলাকে খুঁজিতেছেন। অমলা উঠিয়া যাইবে কি না ভাবিতে লাগিল। অথচ মায়ের কাছে এই ইতস্ততঃভাব পাছে ধরা পড়িয়া যায়, এই ভয়ে সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মা মেয়ের মধ্যে এই নূতনত্ব দেখিয়া একটু বিচলিত হইলেন। কিন্তু

কোন কথা বলিয়া কন্যার এই লুকোচুরি যে তাঁহার চক্ষেও ধরা পড়িয়াছে, তাহা প্রকাশ করিলেন না।

অমলা বাহিরে আসিল। কিন্তু সাক্ষাতের পর হইতে যাহার আগমন সে প্রতিদিন কামনা করিয়াছে, তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিল না। কিন্তু একজন ভদ্রলোককে নিজে ডাকিয়া আনিয়া তাহার সহিত দেখা না করা যে কতবড় অভদ্রতা তাহা সে বুঝিল; তাই বহুযত্নে আত্মসংযম করিয়া সে বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখিল, সেই অনাড়ম্বর বেশধারী যুবক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেয়ালে ঝুলান ছবিগুলি বেশ মনোযোগের সহিত দেখিতেছে। অমলার আগমন সে জানিতে পারে নাই। তাহাকে দেখিয়া ভৃত্য পাখা খুলিয়া দিতেই যুবক চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল সহাস্যে বলিল —"আপনার মায়ের অসুখ, সে কথা ত কই সেদিন বলেন নি? জানলে এমন অসময়ে এসে জ্বালাতন করতুম না।"

"কিন্তু আমি না বললেও আপনার জানতে বাকী নেই দেখছি।"

"যাক্, আপনি যে আসবেন, একথা কিন্তু আমি ভাবতেও পারি নি অনিলবাবু।

"আমি নিজেও তা এ বাড়ীতে আসার পূর্ব্বে মনে করতে পারি নি—কারণ, এ সব ত অভ্যাস নেই।"

"আমারও নেই; আগে কোন দিন কেউ—"

"এমন করে উত্যক্ত করে নি—না? কিন্তু আমি তা জানতাম না; তাই বুঝতে পারছি এসে ভাল করি নি। আচ্ছা, নমস্কার।"

কোনদিকে না চাহিয়া অনিল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অমলা নিতান্ত বোকার মত সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু কেন যে তাহার বুক ঠেলিয়া একটা কান্নার বেগ থাকিয়া থাকিয়া উঠিতে লাগিল, বেচারী তাহা বুঝিতে পারিল না।

কি যে হইল, আর কেনই বা হইল, অমলা ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু একটা কিছু যে মনের মধ্যে থাকিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাকে বেদনা দিতেছে, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল। এতখানি বয়সের মধ্যে তাহাকে মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকিতে কেহ দেখে নাই। হাসিয়া-খেলিয়া, গান গাহিয়া মুক্ত পাখীর মত দিন কাটাইত। কিন্তু আজ দিন কয়েক তাহার সে হাসি-খেলা, গান যেন কোথায় লুকাইয়াছে! সারাক্ষণ বুকের মাঝে রোদনের উচ্ছ্বাস চাপিয়া অমলার অমন সাহসী বুক এমন অসহিষ্ণু হইয়া গিয়াছে যে, তুচ্ছ আঘাতে তাহা বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়ে! বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মিলা-মিশায় সে আর আনন্দ পায় না; অথচ, সর্ব্বক্ষণ ঘরের কোণে বসিয়া অজানা এক দুঃখের বোঝাও সে আর বহিতে পারে না!

কন্যার অবস্থা দেখিয়া পিতা-মাতা চিন্তিত হইলেন; কিন্তু যে দুঃখের আভাষ মাত্র প্রকাশ করিতে অমলার মাথা মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইবে, তাহার সংবাদ পিতা ত বটেই মায়েরও জানিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। আর প্রকাশই বা অমলা করিবে কি? অনিলের কথা মনে করিয়া তাহার বুক যে দুলিয়া উঠে, তাহাতে সে যে লজ্জায় মরিয়া যায়। মনে মনে অমলা আপনাকে শতবার ধিক্কার দেয়; কিন্তু সহস্র চেষ্টাতেও সেই অর্দ্ধ-মলিন মোটা খদ্দর পরিহিত গম্ভীর প্রকৃতির লোকটির সুন্দর মুখখানিকে ভুলিতে পারে না। দুই দিন মাত্র অল্পক্ষণের জন্য সে তাহাকে দেখিয়াছে, তাহার সামান্য দুই-একটি মাত্র কথা শুনিয়াছে, অথচ প্রতি মুহূর্ত্তে অনিলের মুখের কোন্‌খানে কি পরিবর্ত্তন ঘটে এবং সেই পরিবর্ত্তনে তাহার সেই মুখখানির সৌন্দর্য্য কতগুণ বৃদ্ধি পায়, এই সমস্ত না ভাবিয়া অমলা থাকিতে পারে না। অনিলের সংক্ষিপ্ত আলাপের প্রতি কথাটী অমলা সর্ব্বদা শুনিতে পায়। অথচ এই

লোকটার চিন্তা হইতে মনকে দূরে রাখিবার তাহার আপ্রাণ চেষ্টা।

মাঝে মাঝে পিতা ও মাতার মধ্যে তাহারই লজ্জাকর অধঃপতনের কথা লইয়া আলোচনা হয়। অমলা শুনিয়া নিজের এই পরাজয়ের গ্লানিতে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে; অথচ, প্রাণান্ত চেষ্টাতেও কই মুহূর্তের জন্যও ত তাহার অতবড় শত্রুর কথা মন হইতে দূর করিতে পারে না!

হঠাৎ মায়ের অসুখটা আবার বাড়িয়া গেল। চিকিৎসকের পরামর্শে বায়ু পরিবর্তন ভিন্ন আর উপায় নাই দেখিয়া সে মাকে লইয়া কোথাও যাইবে স্থির করিল। কিন্তু বিপদ হ'ল স্থান-নির্ণয় লইয়া। অনেক জায়গার কথা হইল; কিন্তু অমলার মা পণ করিলেন, দেশের বাড়ীতে যাইতে হয় রাজী নতুবা এই কলিকাতার মাটিতেই দেহ রক্ষা করিবেন। শেষে দেশে যাওয়াই স্থির হইল। দেশে গিয়া মায়ের সেবায় আপনাকে সঁপিয়া দিয়া অমলা নিশ্চিন্ত হইতে চাহিল।

মাসখানেক বোধ করি মাতা-পুত্রীকে এক মাত্র রোগ ভোগ ও রোগীর সেবা ছাড়া আর কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে হয় নাই। অমলা প্রাণপণে আপনাকে প্রফুল্ল রাখিয়া মাকে খুসী রাখিতে চেষ্টা করিত; কিন্তু তাহার নিজেরই শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। মাতা বলিলেন—"চল্ মা, শেষে কি তোকে শুদ্ধ হারাব!"

অমলা হাসিয়া বলিল—"কেন মিথ্যে ভয় কচ্ছ; শরীর খারাপ হয়েছে সেরে যাবে। আমি এখান থেকে কোথাও যাব না। তা ছাড়া, তোমার যখন উপকার হচ্ছে, তখন ও কথা আর তুলো না।"

মা আর কথা বলিলেন না; কিন্তু অমলার অসুস্থতা বাড়িয়াই চলিল। দুই দিন অমলা চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে দিল না; কিন্তু তার পরে আর তাহার জ্ঞান রহিল না। পরে যেদিন জ্ঞান হইল, সেদিন তাহার শয্যাপার্শ্বে যে লোকটী বসিয়া আছে দেখিতে পাইল—জ্ঞানে-অজ্ঞানে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া সেই লোকটীকেই সে কামনা করিয়াছে, ইহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত্ত অনিলের মুখের পানে তাকাইয়া বোধ করি আত্মগোপন আশায় পাশ ফিরিয়া শুইল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে অমলা বারবার চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। অনিল বুঝিতে পারিয়া বলিল—"মা ভাল আছেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না।"

অমলা চমকিয়া উঠিল—সে ত মুখ ফুটিয়া কোন কথাই বলে নাই, এই লোকটা তাহার মনের কথা বুঝিল কি করিয়া? তাহার সমস্ত গোপনতাই যদি এই লোকটার চক্ষে ধরা পড়িয়া যায় তবে? তবের কথা মনে হইতেই সে নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। এই লোকটার দৃষ্টির সম্মুখে শুইয়া থাকা যেন আর চলে না। হঠাৎ অনিল উঠিয়া যাইতে যাইতে বলিল—"আপনি বিশ্রাম করুন, আমি মাকে একবার দেখে আসি।"

অমলার মনে হইল তাহার নিজস্ব বলিয়া এ জগতে যাহা কিছু ছিল এবং আছে, এই লোকটার কাছে তাহার কিছু মাত্র অপ্রকাশ থাকিবে না। এমন পরাজয়ও তাহার জীবনে ঘটিতে পারে!

অমলার আরোগ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে অনিলের উপস্থিতিও সংক্ষিপ্ত হইয়া চলিল। কিন্তু অমলা কিছুতেই ভাবিয়া পায় না যে, এই লোকটার প্রকৃতিটা এমন সৃষ্টিছাড়া হইল কেন? ডাকিলে কাছে আসিবার মত চালচলন অনিলের নাই; অথচ, বিপদের দিনে তাহাকে ডাকিতেও হয় না। কেন বিপদে আসিয়া সাহায্য করিয়া নাম কিনিবার স্থান ত সংসারে এই একটি মাত্রই নহে; সে ত অনায়াসে অন্যত্র যাইয়া 'বাহবা' লইতে পারে; তবে এখানে তার আসা কেন? তবে কি

পরের দুঃখে প্রাণ দিয়া উপকার করাই তাহার প্রকৃতি ? আচ্ছা, তাই বা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে ? যথার্থ দুঃখীর সংখ্যাও ত এ সংসারে কম নহে। অমলা ঠিক করিল, এই যে উপকার করার ধারা এ তাহার অহমিকা।

কথাটা মনে হইতেই তাহার আত্মাভিমান আহত হইল। কেন ? যার প্রাণে এতটুকু দরদ নাই, কোন্ অধিকারে সে করুণার ছলে এত বড় অপমান করিতে আসে ? এবার আসিলে অনিলকে স্পষ্ট বলিয়া দিবে সে,—এখানে আসিবার তাহার কোন আবশ্যক নাই।

কিন্তু মজা এই যে, কথাটা স্পষ্ট করিয়া অমলাকে আর বলিতে হইল না। অনিল আর সেখানে আসে না; অথচ, এই না আসাও তাহার ভাল লাগে না। বলিবার পূর্ব্বেই অনিল অমলার উদ্দেশ্য বুঝিয়া সরিয়া দাড়াইবে কেন ? এতবড় শক্তি তাহার কেন হইবে, যে, প্রতি পদে তাহাকে তাহার হস্তে পরাজিত হইতে হইবে ? অমলার অভিমান অনিলের এই স্বেচ্ছাকৃত অবহেলা সহিতে না পারিয়া বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

সেদিন পিতা আসিয়াছিলেন। সে পিতা-মাতার আলাপের মধ্যে তাহার জীবনের সহিত অনিলের মিলন ঘটাইবার যে একটা স্বপ্ন রাজ্য গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাব শুনিল, এবং এই কল্পনাটি বাস্তবিক কার্য্যে পরিণত হইলে অমলাই যে তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী হইবে, পিতা-মাতার তাহাও বুঝিতে বাকী নাই এ কথাও বুঝিল। কিন্তু অমলা কিছুতেই তাহা নিজের কাছে স্বীকার করিল না। তবে আর একটা কথা শুনিয়া সে এতদিন জানিবার অনেক চেষ্টা করিয়াও যাহা জানিতে পারে নাই, তাহাই তাহার কাছে জলের মত সরল হইয়া গেল। শুনিল,—অনিল সেই গ্রামেরই অধিবাসী; বৎসর দুই পূর্ব্বে ডাক্তারী পাশ করিয়া গ্রামে আসিয়া প্র্যাক্‌টিশ করিতেছে। তাহার রোগ বৃদ্ধির সময় সেই ধন্বন্তরীর বরপুত্রটি চিকিৎসার ভার না লইলে সে যাত্রা তাহার উদ্ধারের কোন আশাই ছিল না, ইত্যাদি। একে একে সে অনিলের সম্বন্ধে পিতা-মাতার মুখে সেদিন অনেক কথাই শুনিল।

সমস্ত শুনিয়া অমলার কেমন যেন কান্না পাইল। আচ্ছা, লোকটা যদি এতই গুণবান, তবে তাহার সঙ্গে দেখা হইলে তাহার অমন ছাড়া-ছাড়া ভাব কেন ? গুণ তার যথেষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু সে যে ইচ্ছা করিয়াই তাহার সহিত একটা ব্যবধান রাখিয়া জয়ী হইতে চায়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সেদিন পিতা স্বয়ং অনিলকে ধরিয়া আনিয়া বলিলেন—এ বাড়ীতে প্রতিদিন অন্ততঃ একবার করিয়া তাঁহার আসা চাই; এমন কি তাহাতে তাহার ব্যবসায়ের ক্ষতি হইলেও সে ক্ষতি তাহাকে সহ্য করিতে হইবে। অনিল ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। ইহা অমলার কিন্তু ভাল লাগিল না। পিতা-মাতার কাছে মানসিক ব্যাপার লইয়া একটা অশান্তির ব্যাপার গড়িয়া তোলা ভাল হইবে না ভাবিয়া, সে গোপনে ইহার একটা প্রতিবিধান করিবে, স্থির করিল।

পরদিন অনিলের আসা ও যাওয়া কোনটাই অমলা টের পাইল না। তৃতীয় দিনে অনিল মায়ের ঘর হইতে বাহিরে আসিলে সে ঝড়ের মত তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল—"একটু দাঁড়িয়ে যাবেন অনিলবাবু।"

অনিল দাঁড়াইল—তাহার চক্ষে কৌতূহলের দৃষ্টি।

অমলা ভিজিটের টাকাটা তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল—কাল আপনি কখন এসেছিলেন জানি না, তাই দেওয়া হয় নি। আপনাকে মিছে খাটান ঠিক্ নয়; এই আপনার তিনদিনের ভিজিট্।"

অনিল একবার অমলার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত দেখিয়া লইয়া, মৃদু হাসিয়া বলিল —"আমি ত রোগী দেখ্‌তে আসি নি ; তা' ছাড়া রোগী দেখ্‌তে যেদিন আস্‌ব, সেদিন টাকাটা আপনার বাবার কাছ থেকেই নেব।"

"কিন্তু ডাক্তারের সঙ্গে রোগী দেখার সম্বন্ধ ছাড়া অন্য সম্বন্ধ আছে বলে আমার জানা নেই।"

"তা'তে এমন কিছু অপরাধ হয় নি ; সব কথাই কি সবাই জানে, না জানা সম্ভব ?"

"তা' হলে টাকা আপনি নেবেন না ?"

"আপনার দেহ এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নি ; অতটা উত্তেজনায় হয় ত বিপদ ঘট্‌তে পারে। ব্যস্ত হবেন না, টাকা নেবার সময় আমি চেয়ে নিতে লজ্জা করব না। নমস্কার।" অনিল চলিয়া গেল ; একবার ফিরিয়াও চাহিল না—অমলা নিষ্ফল আক্রোশে শুধু মনে মনে দগ্ধ হইতে লাগিল।

৫

আরও দুইমাস গড়াইয়া গিয়াছে। অমলার মনে যেটুকু গর্ব্ব যেটুকু অহঙ্কার তখনও অবশিষ্ট ছিল, সেইটুকু লইয়া আপনাকে ধরিয়া রাখা আর তাহার সাধ্যের আয়ত্ত বলিয়া মনে হয় না। অনিল নিত্য আসে, অমলার সহিত সাক্ষাৎও হয় কিন্তু সে সাক্ষাৎ বোধ করি না হওয়াই ভাল।

এক একটী আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে অমলা অনিলের সমস্ত সত্বাকেই অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে, তাহার সমস্ত যত্ন বিফল করিয়া দিয়া অনিল তাহার মনের সমস্তটা অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। সেখান হইতে তাহাকে দূর করা আর বুকখানাকে গুঁড়া করিয়া ফেলার মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

কতদিন অমলার মনে হইয়াছে যে, সে অনিলকে বলে—মানুষের মনের গোপন সংবাদ যখন তুমি জান, তখন আমার মত অহঙ্কার-সর্ব্বস্ব একটা নারীর মনোবেদনা বুঝিয়াও তাহার প্রতিকার কর না কেন ? কিন্তু প্রকাশ্যে সে কথা বলিবার ভরসা তাহার হয় নাই। অথচ নিজের সঙ্গে অহরহ এই দ্বন্দ্ব চালাইবার সামর্থ্যও তাহার আর নাই।

সেদিন অমলার পিতা আসিয়া বিকালের দিকে তাহার মাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। অমলার কিছু ভাল লাগে না ; তাই সে একখানি বই লইয়া মায়ের ঘরে বসিয়া পুস্তকের পাতার মধ্যে অনিলের কথাই ভাবিতেছিল।

সহসা তাহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিল,—ধ্যানের মূর্ত্তি তাহারই সম্মুখে শরীরীরূপে দণ্ডায়মান! কি করিবে, কি বলিবে স্থির করিবার পূর্ব্বেই তাহার মুখ হইতে অজ্ঞাতে বাহির হইয়া গেল—"মা আজ বাড়ী নেই ত।"

"তাই ত দেখ্‌ছি।" বলিয়া ডাক্তার একখানা আসন টানিয়া বসিল। অমলার বুকের মধ্যে তখন প্রবল ঝড় বহিতেছে। সে কহিল—"তাঁরা কখন আস্‌বেন তা' ত জানি না।"

"যদি বেশী দেরী করেন, তা' হলে বোধ হয় আর তাঁদের সঙ্গে এখানে দেখা হবে না। আমি আজই চলে যাচ্ছি।"

অনিল কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে, কবে ফিরিয়া আসিবে প্রভৃতি প্রশ্নগুলা একসঙ্গে অমলার ওষ্ঠাগ্রে আসিয়া বদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তার মুখে এমন একটা উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইল যে, অনিলের তাহা বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না।

সে কহিল—"আমার এই যাওয়াই যে শেষ যাওয়া একথা আমি না বললেও আপনি বুঝ্‌তে পারছেন জেনে মনটা সত্যই আমার খারাপ লাগ্‌ছে। কিন্তু জানেন, যেখানে মনের মধ্যে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা মাত্র সম্বল, সেখানে আমার থাকা চলে না!"

কথাটা অমলা ভাল বুঝিতে পারিল না ; প্রাণ-

পণে মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"এখানকার গরীবদের কে দেখবে?"

অনিল হাসিয়া বলিল—"দু'বছর পূর্ব্বে ত আমি তাদের দেখি নি। দেখ্‌বার লোক ঠিক্ পাওয়া যাবে।"

এবার অতি মিনতির সুরে অমলা জিজ্ঞাসা করিল—"না গেলেই কি চলে না—অনিলবাবু?"

"অচল হয়ে কিছুই থাকে না কোন দিন। কিন্তু আমার যাওয়া চাই।"

"তা'তে যার যত বড় সর্ব্বনাশই হোক্?"

"ও আপনার নিজের কথা; ওর উত্তর আমি কেমন করে দেব বলুন। এখন তা' হলে আসি; পারি ত বাবা-মার সঙ্গে আর একবার দেখা করবার চেষ্টা করব।" অনিল উঠিয়া চলিল অমলার সমস্ত অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল; কিন্তু অনিলকে বাধা দিবার শক্তি তাহার একেবারেই ছিল না।

অনিল বাড়ীর বাহির হইবার পূর্ব্বেই তাহার কর্ণে পৌঁছিল—একটু দাঁড়াও।

অনিল দাঁড়াইল - কিন্তু অমলার মুখ হইতে আর কোন কথাই বাহির হইল না। অনিল কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া বলিল—"তুমি যা' শুন্‌তে চাও অমলা, আজ শেষ দিনে আর সে কথা কাণে নাই বা শুনলে। এত সয়েছ, এটুকুও পারবে। অমলা নতমুখে সমস্ত শুনিয়া কি যেন ভাবিল; তারপর হাত বাড়াইয়া অনিলকে স্পর্শ করিতে যাইয়া দেখিল,—সেখানে কেহই নাই!





কাত্তিক-গণেশ

শ্রী নকুড়চন্দ্র মিত্র, বি-এ

মেহের গাড়োয়ান মরিবার সময় গফুরকে কাছে ডাকিয়া বলিল—ও রে, তোর বুড়ি মা রইল দেখিস্, ছটা মুরগী রইল দেখিস্, আর কাত্তিক-গণেশ রইল দেখিস্. তাদের নজরের আড় করিস্‌নি— তারা তোর ভাই! বলিয়া মেহের দাওয়া হইতে বার জমিন্‌টায় বাঁধা একজোড়া শিং-ওয়ালা সাদা গরুর দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু বুজিল।

কাত্তিক-গণেশ ছিল যেন মেহেরের প্রাণ! গোপালপুরের প্রসিদ্ধ গো-হাটায় কয়েকদিন যাবৎ হাঁটাহাঁটি করিয়া সে বলদ-জোড়াটি সংগ্রহ করিয়াছিল—একটিকে দেখিতে অবিকল আর একটির মত! হিন্দুদের অনুকরণে সে তাহাদের নাম রাখিয়াছিল,কাত্তিক আর গণেশ। কাত্তিককে জুতিত ডান-দিকে, গণেশকে রাখিত বাঁ-দিকে। জোয়ালো গরু-দুটো সারাদিন ধরিয়া মেহেরের কি মালটাই না বহিত! মেহেরের গাড়ী পাইলে কেহ আর অপরের গাড়ী ভাড়া লইতে চাহিত না। সারা বেলার পরিশ্রমের পর বাড়ী ফিরিয়া,মেহের গাড়ী খুলিয়া স্বহস্তে কাত্তিক-গণেশের গা-পা ধোয়াইয়া মুছাইয়া, বড় বড় দু'টা কাটিরায় সাজারাতের জাব্‌না মাখিয়া কিছুক্ষণ কাত্তিক গণেশের গায়ের মশা-মাছি গামছার খুঁটে উড়াইয়া দিয়া তবে নিজে আহারাদি করিতে যাইত। মেহেরের সময় কাত্তিক-গণেশের দিনগুলা ভারি আনন্দে কাটিত।

কিন্তু মেহেরের মৃত্যুর পর, গফুরের কাছে তাহাদের আর সে আদর রহিল না। গফুর না জানিত গাড়ী হাঁকাইতে—না জানিত গাড়িতে মাল সাজাইতে—না দিত গরু দুটাকে সময়ে খাইতে—না দিত সময়ে জিরাইতে, কেবলই তাহাদের চাব্‌কাইত। গরুদের গোয়ালে তুলিয়া দিয়াও ডাক্ পাইলে সে তখনি আবার টাকার লোভে ভাড়া খাটিতে ছুটিত।

কাত্তিক-গণেশ নিঃশব্দে সহিয়া যাইত। এমনো আনাড়ির হাতে শেষটায় তাহাদের পড়িতে হইল!

গণেশ ক্রমশঃ যেন কাহিল হইয়া পড়িতেছিল; তেমনভাবে আর গাড়ি টানিতে পারিতে ছিল

না। কাত্তিক তাহা বুঝিল। গাড়ি টানিবার সময় কাত্তিক একটু অধিক হিস্যতে মেহনত করিতে লাগিল। কিন্তু গফুর গনেশকে পিটিয়া পিটিয়া আরও হাড্ডি সার করিয়া তুলিতে লাগিল

আজকাল এক কাটুরার গরুগুটাকে জাব না দেওয়া হয়। কাত্তিক অতি অল্প পরিমান জাব না পাইয়া উর্দ্ধে মুখ তুলিয়া থাকে—গণেশ বাকিটা সব পুঁটিয়া খায়। তবু গণেশের শরীরে তাকত লাগে না; কাত্তিক করুণ চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে।

সেদিন গাড়ীতে ধানের মোট লইয়া গফুর গাড়ী হাঁকাইয়া যাইতেছিল। রাস্তাটা তেমন ভাল নয়। দু'ধারেই খাত। রাস্তায় গাড়ী চলাচলও মন্দ নয়। গফুর গরুর লাগাম-দড়িটা হাতে জড়াইয়া মোটগুলার উপর লম্বা হইয়া দিবা ঘুম দিতেছিল। কাত্তিক-গণেশ আপন-মনে পথ বাহিতেছিল। এমন সময় দূরে একটা মোটোর গাড়ীর শব্দ শুনা গেল। তীব্রবেগে গাড়ীখানা আসিতেছিল। বাঁশীর শব্দে গফুরের ঘুম ভাঙ্গিল না। কাত্তিক-গনেশ আপনারাই গাড়ীখানাকে পাশ দিবার জন্য একটু সরিয়া গেল। কিন্তু সে জায়গাটা অত্যন্ত সরু ছিল। গাড়িটা এমন ভাবে ছুটিয়া আসিয়া পড়িল যে কাত্তিককে ধাক্কা দিয়া উল্টাইয়া দেয় আর কি; এমন সময় গণেশ তাহা বুঝিতে পারিয়া হট্ করিয়া জোয়ালে টান দিয়া খাতের দিকে নামিয়া পড়িল। হাওয়ার গাড়ীখানা কাত্তিকের গায়ের এক ইঞ্চি তফাত দিয়া গোলার মত সাঁ করিয়া ছুটিয়া গেল! কিন্তু গণেশ কাত্তিককে বাঁচাইবার জন্য হঠাৎ এমনভাবে ঢালু খাতের পানে নামিয়া পড়িয়াছিল যে সে কিছুতেই নিজের পা ঠিক্ রাখিতে পারিল না—নিকটেই একটা মাটিকাটা গর্ত্ত ছিল, তাহার মধ্যে সে হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গেল - তাহার উপর গাড়ী পড়িল—ধানের মোট পড়িল—গফুর ঠিক্‌রাইয়া এইটা জঙ্গলের মধ্যে পড়িল।

গফুর মনে করিয়াছিল, গণেশ মারা গিয়াছে। কিন্তু সে মৃতপ্রায় হইলেও মরে নাই —অতিকষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল—তাহার সর্ব্বাঙ্গ ছিঁড়িয়া কুটিয়া গিয়াছিল—সেদিন আর সে গাড়িতে কাঁধ দিতে পারিল না। বাড়ী ফিরিবার মুখে দেখা গেল, তাহার একটা পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

সেদিন কাত্তিক এককুটা খড়ও মুখে তুলিল না—গণেশের পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতে লাগিল।

গণেশ খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গাড়ী টানিতে লাগিল। কিন্তু খোঁড়া গরু লইয়া গফুরের কাজ চলে না; তাই সে গোকুল ছেলেকে উহা বিক্রয় করিয়া ঘর হইতে কিছু টাকা দিয়া একটা নূতন গরু কিনিবার মতলব করিল।

গোকুল কয়েকদিন আনাগোনার পর একদিন গনেশকে আপনার বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য গফুরের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। গণেশের গলায় দড়ি ধরিয়া সে টানাটানি করিতে লাগিল; কিন্তু গণেশ কোনমতেই যাইতে চাহিল না—সে কাত্তিকের পানে চাহিয়া কেবলি চীৎকার করিতে লাগিল।

কাত্তিক কিছুদূরে একটা খোঁটায় বাঁধা ছিল। গফুর গণেশের পিঠে এক ঘা চাবুক দিতে সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। এমন সময় হঠাৎ কাত্তিক খোঁটা উপড়াইয়া এমন ভীষণ মূর্ত্তিতে শিং নাড়িয়া গোকুলকে তাড়া করিয়া আসিল যে, গোকুল 'বাপ্ রে' বলিয়া গণেশের গলার দড়ি ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া একেবারে একটা গাছে উঠিয়া পড়িল!

গফুর কাত্তিককে ধরিয়া আনিয়া বাঁধিল; বাঁধিয়া বেদম প্রহার করিল। গণেশকেও ঘা কতক দিয়া গোকুলের হাতে তাহাকে তুলিয়া দিল।

তারপর, গফুর একটা নূতন বলদ কিনিল।

গণেশের জায়গায় তাহাকে জুতিল। কার্ত্তিক ও এই নূতন বলদ গফুরের গাড়ী টানিতে লাগিল।

কার্ত্তিক ঘাড় গুঁজিয়া মনিবের আদেশ পালন করিয়া যায় বটে কিন্তু তাহার মধ্যে যেন আর প্রাণ ছিল না! নূতন বলদটা নূতন উৎসাহে পুলকে মাতিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া চলে; কার্ত্তিক না চলিলে নয়, তাই চলে। গফুরের হাতে কার্ত্তিক পূর্ব্বে দৈবাৎ মার-ধোর খাইত, আজকাল প্রায়ই দু'-এক ঘা খায়। কিন্তু গফুর বরাবরই কার্ত্তিকটাকে মনে মনে একটু স্নেহ করিত। কার্ত্তিকের পরিশ্রম সে আগে দেখিয়াছে; কিন্তু আজকাল হঠাৎ তার এ পরিবর্ত্তন কেন হইল? গফুর ভাবিয়া কিছুই ঠাহর করিতে পারে না।

বেলা প্রায় বারটা আন্দাজ—গফুর শূন্য গাড়ী লইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। পথের ধারে একটা মাঠে গোকুল হাল দিতেছিল। কার্ত্তিক এতদিন পরে হঠাৎ গণেশকে দেখিয়া একেবারে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া গেল। গণেশও কার্ত্তিককে দেখিয়া হাল বন্ধ করিল। কার্ত্তিক ডাকিয়া উঠিল; গণেশও তাহার সাড়া দিল। গফুর কোনমতেই আর গাড়ী চালাইতে পারে না—গোকুল একহাঁটু কাদায় লাঙ্গল শুদ্ধ পুঁতিয়া! এত বেলায় ক্ষুধায় নাড়ী চুঁইয়া যাইতেছিল—গোকুল হাল খুলিয়া দিয়া গণেশকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে লাগিল। গফুরও কার্ত্তিককে পিটিতে পিটিতে ঘরে আনিল।

সেই দিনই সন্ধ্যার অন্ধকারে কার্ত্তিক গলার দড়ি গাছটাকে ছিঁড়িয়া গফুরের বাড়ী ত্যাগ করিয়া গণেশের উদ্দেশে বাহির হইল। সেই মাঠটারই পারে গোকুলের বাড়ী। ঘুরিতে ঘুরিতে কার্ত্তিক সেইখানে আসিয়া পৌছিল। বাড়ী দেখিয়া সে গোয়ালের সন্ধানটা লইল। কঞ্চির বেড়া ঘেরা একটা চালার নীচে গণেশ ও আর কয়েকটা গরু ছিল। বেড়ার ফাঁক দিয়া কার্ত্তিক জ্যোৎস্নার মেটে-মেটে আলোকে গণেশকে দেখিতে পাইল। মাথা ঠেলিয়া ঠেলিয়া কার্ত্তিক বেড়াটাকে বেশ খানিকটা ফাঁক করিয়া ফেলিল। গণেশ কার্ত্তিককে দেখিতে পাইয়া প্রাণপণ শক্তিতে গলার দড়িটা ছিঁড়িয়া সেই ছিদ্র পথ দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর উভয়ে হন্‌হন্ করিয়া মাঠ পার হইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল!

পরদিন গফুর কার্ত্তিককে খুঁজিতে খুঁজিতে গোকুলের বাড়ী আসিয়া হাজির হইল। গোকুলের মুখ হইতে সমস্ত শুনিয়া এবং তাহার গোয়ালের অবস্থা দেখিয়া, তাহার বুঝিতে আর কিছুই বাকী রহিল না! গফুর সেইখানে মাটির উপর বসিয়া পড়িয়া কি ভাবিতে লাগিল। সহসা তাহার চক্ষু দিয়া জল ঝরিতে লাগিল!

কয়েকদিন পরে হঠাৎ একদিন গোকুল দেখিল,—গফুর গরুর গাড়ী বেচিয়া দিয়া স্বয়ং হাত গাড়ীতে মাল বহন করিতেছে! গোকুলকে গফুর বলিল—সে আর জীবনে গরুর গাড়ী হাঁকাইবে না!





জননী

শ্রী সরোজকুমার মিত্র, বি এস-সি

মা আর ছেলে। ছেলেটি বিদেশে কাজ করে; বছরে একবার করিয়া দেখা দিয়া যায়, তাহাতেই তাঁহার কত আনন্দ! সারাটা দিন খাবার করিতে, ঘর-দোর পরিষ্কার করিতে কাটিয়া যায়। মুখে ক্লান্তি নাই; যেন গালভরা হাসিই তাঁহার জীবনের সাথী ও সম্পদ!

ছেলের ফিরিবার সময় হইয়াছে; কাজও বাড়িতেছে। বাতাসে-বাতাসে করুণ 'মা' সম্বোধন শুনিতে পান। চোখ বুজিলেই তাহার মুখখানা ফুটিয়া উঠে; হাত দু'টি বারেবারে বুকের মাঝে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে;—আঁকড়াইতে চান আপনার বুকের মাঝে, নেহাত ছোট ছেলেটির মত। খুটখাট শব্দ হইলেই ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসেন।

রামদীনকে ডাকিয়া বলেন—যাও, দরজা খুলে দাও গে—শুনতে পাও না খোকা ডাকছে।···

কামিনীকে বলেন—যা ত মা লক্ষ্মী,—আলোটা ধর গে।

কোথাও কেউ নাই। জন-মানবহীন রাস্তা। বাতাস শুধু বহিয়া যায়। রামদীন ফিরিয়া আসিয়া বলে—কই মা'জী?

অবসাদ-ক্লান্ত দেহটিকে তিনি কোন প্রকারে আবার ঘরের ভিতর টানিয়া লইয়া যান।

রামদীন বেশ বিরক্ত হয়। দুপুর রাতে এ রকম জ্বালাতন মোটেই সহ্য হয় না। সকালে গজ্‌গজ্‌ করিতে থাকে। কামিনীকে দেখিলেই বলে—মার জ্বালাতনে অস্থির। কামিনী উত্তর দেয় সংক্ষেপে—আহা! ঐটিই সম্বল···!

২

এইরূপ ভাবে দিন চলে কিন্তু এদিন চলার ব্যাঘাত ঘটিল।

সতীশ আসিয়াছে।

এস বাবা, এস; অনেকদিন পরে—

সতীশ নির্ব্বাক্।

খোকার সঙ্গে দেখা করতে?—এখনও ত বাবা সে আসে নি; ছুটি ত পড়্‌লো—

সতীশ কি বলিবে,—বলিবার ত কিছু নাই। সে শুধু ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে। মুখের কথা মুখে বন্ধ হইয়া তাহার দেহটিকে দু'-একবার কাঁপাইয়া নিশ্চল করিয়া দেয়।

কি হয়েছে বাবা! মুখখানা এত শুক্‌নো কেন?

চমক ভাঙ্গিয়া গেল ; বলিল—না—কিছু নয়।

একটু চা খাও।

উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তিনি চলিয়া গেলেন। সতীশ একা।

চোখের সামনে পৃথিবীটা টাল খাওয়া লাট্টুর মত ঘুরিতে থাকে। ভাবিল, পড়ুক কেন্দ্রের বাঁধন, ছিঁড়ুক…

কিন্তু…সমস্ত চিন্তার সূত্রগুলি নিমেষের মাঝে তালগোল পাকাইয়া একাকার হইয়া গেল! চোখের সামনে বিরাট অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল! ভাবিতে পারিল না, কেমন করিয়া এমন ঘটিল!

চা আসিল। মা বলিলেন—তুমি বাবা কেমন কেমন হয়ে গেছ!

না মা।

বৃদ্ধার চোখের কোণে জল গড়াইয়া পড়িল ; আঁচলে মুখ মুছিয়া বলিলেন—তুমি কি বাবা পর ;—তুমিও ত আমারি ছেলে! তোমরা দুজনে পড়্‌তে, খেল্‌তে, শুতে, সে যে আমি কত আনন্দের চোখে দেখ্‌তুম, সে কি বল্‌ব বাবা! তুমি এসেছ, সে নেই! বৃদ্ধার চোখের জল আর আটক মানিল না। বন্যার মত হুহু' করিয়া আসিয়া গণ্ডদেশকে প্লাবিত করিয়া দিল।

দু'জনেই নির্ব্বাক! বৃদ্ধা বলিলেন—জান বাবা, বৌমাটিও তেমনি লক্ষী! লিখেছে—মা, আর এখানে থাক্‌তে ভাল লাগ্‌ছে না। আপনার কাছে যাব ; আপনার কোলে ছোট মেয়েটির মত শুয়ে গল্প কর্‌তে বড় ভাল লাগে! লিখেছিলুম কি জান সতীশ? আমি একা, কষ্ট হবে ; খোকা এলেই নিয়ে আস্‌বো।

নির্ব্বাক্ সতীশ হঠাৎ উঠিয়া কেন যে বাহিরে চলিয়া গেল, তাহা বৃদ্ধা ভাবিতে গিয়াও ভাবিতে পারিলেন না ; উন্মুক্ত দরজার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। হাজার হোক্, মায়ের প্রাণ ত!—অমঙ্গলের আশঙ্কা মনের কোণে উঁকি দিল। দূর ছাই, কি সব ভাবি! বলিয়া আবার তিনি কাজের মধ্যে আপনাকে জড়াইয়া ফেলিতে চলিলেন।

* * *

ছেলেটি বিদেশে মারা গিয়াছে। বৃদ্ধা মাতাকে সান্ত্বনা দিতেই সতীশের আসা। কিন্তু তাহার মুখে ভাষা ফুটিল না ; আজ কি করিয়া পুত্রগত-প্রাণা জননীকে সে তাঁহার সেই ভয়ানক অমঙ্গলের কথা শুনাইবে? তাই যখন তাহার মনটা অতি নিষ্ঠুর সত্য-ভাষণের জন্য একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, তখন সে ছুটিয়া মুক্ত বাতাসে আসিয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। হৃদয়-মথিত একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের সহিত এক ফোঁটা চোখের জল তাহার গণ্ডদেশে গড়াইয়া পড়িল!





বিধাতার আলপনা

(উপন্যাস)

শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



চার

কল্যাণ চলিয়া গেল বটে, কিন্তু পিছনে রাখিয়া গেল তার প্রত্যেকটী কার্য্যের ছাপ। আর সে ছাপ সমাজ উদরে সত্যের আবরণে, কতটা মিথ্যার প্রতিষ্ঠা যে করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহারই একটী উন্মুক্ত হিসাব-নিকাশ।

মাধব ঘোষাল বড় গরীব। বাইরে অনেকগুলি কুপোষ্য। জগতবাবুর গোপন দানই ছিল তার একমাত্র আশা-ভরসাস্থল। মলিন মুখে একখানি গীতা হাতে এক পার্শ্বে আসিয়া সে বসিয়াছিল।

শিরোমণির তীক্ষ্ণ চক্ষুটা প্রথমেই পড়িল তাহার উপর। ঘৃণাভরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "গীতাপাঠের আর কি লোক জুটল না ওঠ হে, ওঠ ওখান থেকে।"

মাধব মুখখানা কাচুমাচু করিয়া বলিল, "আজ্ঞে মা ঠাকরুণ—"

শিরোমণি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "আরে খেপেছ না কি? আমি থাকতে, দেশে এত জানা শোনা পণ্ডিত থাকতে গীতা পাঠের অধিকার দিলে কি না একটা ভিখারীর ওপরে!"

মাধব আর কথা বলিতে পারিল না, লজ্জায় তার মাথাটা মাটির সহিত মিশাইয়া যাইতে চাহিল। তাড়াতাড়ি গীতাখানি মুড়িয়া সে উঠিয়া পালাইবার চেষ্টা করিল, ঠিক এই সময়ে পশ্চাৎ হইতে শান্ত-মধুর-কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল, উঠবেন না, আপনি পড়ুন আমি শুনব।" শব্দে চকিত হইয়া সকলে একযোগে ফিরিয়া দেখিল—সলিলা।

শিরোমণি বলিলেন, "গীতা শুনবে একথা আমায় আগে জানালেই পারতে সলিলা; এত কিছু করলুম, আর এটুকু পারতুম না? আচ্ছা, ইচ্ছেই যখন তোমার হ'য়েছে আটকাবে না; ভাল পণ্ডিত—"

কিন্তু আপনাদের মেয়ে যে গণ্ড মূর্খ, একথা ভুলে যাচ্ছেন কেন ঠাকুর?"

পুরোহিত অবাক-বিস্ময়ে খানিক তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর জোর করিয়া বলিলেন, "কিন্তু শোনবার তোমার সময় কৈ মা এখুনি যে কাজে বসতে হবে।"

ধীর কণ্ঠে সলিলা বলিল, "সেই জন্তেই আরও ওঁকে বসান। শুনতে শুনতে যদি উঠতেই হয়, অপরাধ নেবেন না।"

ইহার পর আর কথা চলে না। শিরোমণি মনে মনে গর্জ্জিয়া স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন। দিনের কার্য্যের মধ্যে আর কোন বাধা-বিঘ্নই ঘটিল না। শ্রাদ্ধ শেষে সলিলা ধীর পদে আবার মাধব ঘোষালের সম্মুখে আসিয়া বসিল। মাধব দরবিগলিতচক্ষে বড় আবেগের সহিত তখনও গীতা পাঠ করিতেছিল।

দাসী আসিয়া বলিল, "সদরে মেয়ে নিয়ে এক সাহেব এসেচে দিদিমণি। মাগো, এমনি ভয় হ'ল! বাবুকে গোঁজ ক'চ্ছে; বোধ হয় পাগল, কারুর কথা কাণেও তুলছে না।"

সলিলা দেওয়ানজীর দিকে চাহিল; তিনি ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "এমন সময় কে আসবে; আচ্ছা, আমি যাচ্ছি দেখে আসি গে।"

সলিলাও স্বস্তির দুয়ার হাতড়াইয়া এ নবাগতের আগমনের কারণ খুঁজিয়া পাইল না। রামরতনবাবুকে বেশী দূর যাইতে হইল না, অপর্ণার হাত ধরিয়া এক সৌমকান্তি বৃদ্ধ ধীরপদে প্রবেশ করিলেন।

দেওয়ানজী অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "কাকে খুঁজছেন?"

বৃদ্ধ পূর্ণ নির্ভরতায় হাঁপ ছাড়িয়া হাসি মুখে বলিলেন, "আঃ, বাঁচালেন! রাস্তার সকলে ত আমাদের ভড়কে দিয়েছিল;—বলে মারা গেছেন এত মিথ্যেও বলতে পারে ওরা, কি বলিস অপর্ণা?"

রামরতন কাতরকণ্ঠে বলিলেন, পথের লোকের কথা মোটেই ঝুটো নয়; আমার মনিব জগতবাবু চলে গিয়েছেন! ইনিই তাঁর মেয়ে, আজ চতুর্থী শ্রাদ্ধ।"

বৃদ্ধ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে মাথা চুলকাইতে লাগিলেন; বলিলেন, তাই ত দেখাটা তা হ'লে হ'ল না। আমরা কিন্তু বড় আশা নিয়ে এসে ছিলুম।

প্রাঙ্গণের অন্ত পার্শ্ব হইতে শিরোমণি ঠাকুর আসিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে অপর্ণার দিকে চাহিতে চাহিতে বলিলেন, "সেই যেন, হাঁ সেই ত বটে!—ম্লেচ্ছ হ'য়ে হিন্দুর এতবড় ক্রিয়া-কলাপে বাধা দিতে মশায়দের শুভাগমন হ'ল কেন? এর মধ্যে সেই বিধর্ম্মী কল্যাণের চালবাজী আছে বোধ হয়?"

অপর্ণা চঞ্চল হইয়া উঠিল। পিতার হাত ধরিয়া ফিরাইতে চাহিয়া বলিল, "চলুন, ফিরে যাই।"

বৃদ্ধ বালকের মত ব্যথাহতকণ্ঠে বলিলেন, "তাই ত, তাই ত, অন্যায়টা হ'য়ে গেছে তা হ'লে! ভেবেছিলুম কল্যাণের মত ছেলে যে গ্রামে জন্মায়—"

বাধা দিয়া অপর্ণা বলিল "বাবা!"

বৃদ্ধ কিন্তু পরম উৎসাহে বলিয়া চলিলেন, "ঠিকই বলছি মা। ট্রেণ থেকে যেদিন নামলি তোরা, বাগদী কৈলাস মারা পড়ল, কেউ ছুঁলে না; কি না কি একটা খুঁৎ বেরিয়েছে। ছুঁৎ-মার্গটা ছোটদের ভেতরও এত বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে যে, মদ খেয়ে সারা রাত হল্লা করলে, কিন্তু মড়া উঠল না। কল্যাণ নিজে গিয়ে—"

অপর্ণা আবার ডাকিল, "বাবা, কি বক্‌ছেন, তিনি কেন ও সবে হাত দিতে যাবেন।"

কন্যার এত বড় ভুল দেখিয়া বৃদ্ধ বেশ একটু আনন্দ অনুভব করিলেন; বলিলেন, "তুই বড্ড ভোলা অপর্ণা; দু'দিনের কথা ভুলে গেলি। মনে পড়ছে না, আমরা আসব শুনে চাড়াল-বৌয়ের কি কান্না! কত আগ্রহ, কি আশীর্ব্বাদ! ওরে, সে যে কত ভাল, তোরা তা চিনতে পারলি না।"

শিরোমণি শ্লেষভরে বলিলেন, "তা'ত হবেই! ম্লেচ্ছের দলে ভিড়ে ম্লেচ্ছের কাজে ছুটবে, খৃষ্টান-গুলোকে মাথায় তুলে নাচবে, আর ভাল হবে না। কিন্তু দয়া করে খোঁজ নিয়েছেন কি, এতটা ভাল হ'তে গিয়েই আজ তাকে দেশত্যাগী হ'তে হয়েছে।"

বৃদ্ধ অপরাধী বালকের মত ক্যাকাসে মুখে শিরোমণি ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন! অপর্ণা গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিল, 'বাবা, আসুন।"

নিশ্বাস ছাড়িয়া বৃদ্ধ সবার মুখের দিকে চাহিলেন; কিন্তু সহানুভূতির একটি রেখাও খুঁজিয়া না পাইয়া উদাসকণ্ঠে বলিলেন, "তাই চল যাই।

সলিলা ধীরপদে অগ্রসর হইয়া বৃদ্ধের গন্তব্য পথে বাধা দিল; বলিল, "যাবেন না; নিজের বাড়ীতে এসে এমনি ক'রে কি কেউ চলে যায়?"

মুহূর্ত্তে অবসাদ কোথায় উপিয়া গেল: বৃদ্ধ আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন; বলিলেন, "দেখ্‌লি, দেখলি অপর্ণা, হাজার হ'ক ভায়ের বোন ত, কত বড় বংশ, কত উদার মন! বাইরের লোকে তা বুঝবে কেমন করে!"

অপর্ণা গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু বাবা এত বড় অপমানের পরও আপনার এ বাড়ীতে থাকা চল্‌বে না।"

সলিলা বাধা দিয়া বলিল, "চল্‌বে দিদি। তোমার ওপর আমাদের একটু জোর আছে।"

বৃদ্ধ উৎফুল্লকণ্ঠে বলিলেন "আছেই ত, আছেই ত, একবার কেন একশবার। অপর্ণা, দিদির পায়ে নমস্কার কর।"

"থাক, থাক, আমি এমনি আশীর্ব্বাদ করছি। অশৌচ কি না, কাজেই ওটা নিতে বা দিতে কিছুই পারি না। আসুন।"

শিরোমণি বজ্রাহতের ন্যায় শুম্ভিত-বিস্ময়ে এতক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; এবার গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিলেন, সলিলা!"

সলিলা তাড়াতাড়ি বৃদ্ধকে আগাইয়া দিল; ইচ্ছা, আর কোন অপ্রিয় কথা যেন ওই সরল লোকটীকে ব্যথা না দেয়। কিন্তু দেখিল, অপর্ণার মুখখানি কি ইহার মধ্যে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনারা নিজের কাজ করুন ঠাকুর! আমি এ বাড়ীর কর্ত্রী, এ কথা ভুলে যাবেন না!ওকি দাঁড়াবেন না চলুন আপনারা। এই যে পথ।

একখানি ঘরের মধ্যে আনিয়া সলিলা বলিল, "পথের-শ্রম আপনাদের খুব কষ্ট দিয়েছে, একটু বিশ্রাম করা দরকার। মনে কিছু করবেন না কর্ম্মের বাড়ী কর্ত্তা অনেক কেউই হয়। একটু আসি, কাজ পড়ে রয়েছে। পরে সব শুনব।"

বৃদ্ধ সহাস্য মুখে বলিলেন, "শুনবে বই কি মা, শুনবে বৈ কি; কল্যাণ কি কম কষ্ট ক'রে মেয়েটাকে বাঁচি রছে! পাঁচ-পাঁচটা গোরা, আর একা সে; ভাগ্য ভাল তাই অনিষ্ট বেশী কিছু হয় নি।"

সলিলা থতমত খাইয়া খানিক দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধ বলিলেন, "বটেই ত, কর্ম্মের বাড়ী, একজনকে নিয়ে আটকে থাকা কি চলে? কিছু ভেব না মা, এটা আমি ঘর-বাড়ী তৈরী করে নিয়েছি। বলিয়া তিনি পরম নিশ্চিন্তভাবে একখানি সোফায় বসিয়া পড়িলেন। সলিলা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। অর্পণা অধীরকণ্ঠে বলিল, "কাজটা কিন্তু ভাল হ'ল না বাবা।"

হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "গাড়োয়ানকে ভাড়া দিতে ভুলি গেছি, নয়? আচ্ছা, যাচ্ছি এখুনি।"

"সে আমি দিয়ে দিয়েছি বাবা।"

"তবে, তবে হাত বাক্সটা হারিয়ে ফেলেছি বুঝি? জানিস্ ত তোর বাবা কত ভোলা, কেন দিস?"

"সুটকেশ আছে; কিন্তু এখানে আর এক তিলও আপনার থাকা চলবে না।"

বালকেরই মত সরল হাস্যে বৃদ্ধ হাসিয়া উঠিলেন

অপর্ণা অধীরকণ্ঠে বলিলেন, "কথাটা এতটাই অগ্রাহ্যের নয় বাবা।"

পরম নিশ্চিন্তভাবে দেহটা সোফার উপর এলাইয়া দিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "ও ভাবাভাবি এ বয়সের কর্ম্ম নয় অপর্ণা; ও সব তোর ওপরই আমি ছেড়ে দিলাম মা। হাঁ, সলিলা মেয়েটী বড় ভাল না অপর্ণা?

অপর্ণা সামনে বসিয়া পড়িয়া অধীরকণ্ঠে বলিল, "আপনি নিশ্চিন্ত হ'লেও আমি আপনাকে কোন মতেই তা হ'তে দেব না। আপনাকে বোঝাবই বাবা।"

বৃদ্ধ চঞ্চল হইয়া বলিলেন, "আঃ! তোর ও লজিকের খাতা আপাততঃ বন্ধ কর মা, এই রোদে···"

কঠোর হইয়া অপর্ণা বলিল, "হ'ক রোদ; কোন ওজুহাত আমি শুনব না, এখনি বের করে নিয়ে যাব, উঠুন।"

ব্যাকুল-বিস্ময়ে বৃদ্ধ মেয়ের মুখের দিকে চাহিলেন।

বাধা দিল সলিলা। ধীরে ধীরে দু'খানি জলখাবারের রেকাব হস্তে গৃহে প্রবেশ করিয়া সে মধুর কণ্ঠে বলিল, "সে পারতে অপর্ণা যখন তোমার বড় বোন সামনে ছিল না—এ গুলো চাকর-বামুনের হাত দিয়ে পাঠাতে মন চাইলে না কাকাবাবু, অশৌচ অন্নের কাছে মানা চলে কিন্তু বাপ-মেয়ের মধ্যে নয়।"

"বটেই ত, বটেই ত! দেখলি অপর্ণা, এই দিদিকে···আমি তখনই বলেছিলুম—"

বৃদ্ধ মহা আনন্দে সলিলার হাত হইতে রেকাবি লইয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অপর্ণার আর কোন কথা বলা চলিল না।

* * *

বাহিরে কিসের একটা কোলাহল উঠিল। দাসী ছুটিয়া আসিতেছিল, সলিলা নিজেই গিয়া বাধা দিল; তারপর গম্ভীরমুখে বাহির বাটীর দিকে চলিয়া গেল।

দাসী আপন-মনে বকিতেছিল, "মাগো মা, সব বামুন উঠে চল্‌ল, বলে এ বাড়ীতে পাত পাতব না। কি যে হবে, এত লোকের মধ্যি—"

সলিলা ফিরিয়া আসিল। দাসীকে ধমক দিয়া বলিল, "এখানে দাঁড়িয়ে বক্‌বক্ করতে তোকে কেউ সাধে নি। সবাই খেতে বসেছেন, ভাঁড়ারীকে বলে আয়, হাঁড়ী সাজাতে সুরু করে দিন। এত দেখেও এটুকু ভুল তোরা কি করে করিস তা জানি না।"

বৃদ্ধ আগ্রহস্বরে বলিলেন, "সবাই না কি উঠে যাচ্ছেন মা, আমাদের জন্যে তোমার বড়ই বিপদে পড়তে হ'ল দেখ্‌ছি।"

সলিলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "ও কথা মনেই আনবেন না কাকাবাবু, তাঁদের পাওনা-গণ্ডার উনিশ-বিশ হওয়াতেই গোলযোগ উঠেছিল; মিটে গেছে!"

অপর্ণা 'হাঁ' করিয়া সলিলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ছলনা বা প্রবঞ্চনার কোন চিহ্নই সেখানে দেখিতে পাইল না। মনে হইল, একটি স্বচ্ছ সলীল প্রেমময়ী মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান!

(পাঁচ)

সেবা যত্নের মধ্য দিয়া সলিলা এই দুইটী প্রাণীকে এতটা নিজস্ব করিয়া লইল যে সে মায়ার বাঁধন কাটাইয়া 'যাই' কথাটা মুখে আনিতে অপর্ণার কেমন আটকাইয়া যাইতে লাগিল। পিতা সদানন্দবাবু এতটাই বিভোর যে, কন্যার অনুযোগ-পূর্ণ অনুরোধের ভাষাটা তাঁর কাণে পৌছিয়াও পৌছিল না। তখন অপর্ণার সকল বিরক্তি গিয়া পড়িল এ ধরিয়া রাখার কর্ত্রী সলিলার উপর; কিন্তু এক দিকের একটানা স্নেহের প্রস্রবণ অন্য দিকের চিত্ত বিক্ষোভকে এমনি ভাসাইয়া লইয়া

গেল যে, নিজের অসহিষ্ণু মনের জন্য আপনা-আপনি লজ্জিত হইয়া পড়িল।

সেদিন প্রাতঃভ্রমণ সারিয়া সদানন্দবাবু গৃহে ফিরিলেন। অপর্ণা পিতাকে আড়ালে পাওয়ার সুযোগ পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া বলিল, "চিরদিন কি এমনি করেই এখানে কাটাবেন বাবা? বাড়ী-ঘরগুলো তা হ'লে আর রাখা কেন, বেচে দিয়ে আসুন গে।"

সদানন্দবাবু 'হাঁ' করিয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁর কার্য্যের কোন খানটাতে যে বৈষম্য রহিয়াছে, তাহা ঠিক্ ধরিয়া উঠিতে পারিলেন না। আর দু'দিন এখানে থাকা না থাকার ভিতর ঘর-বাড়ী বেচিয়া আসার যে কি নৈকট্য সম্বন্ধ তাহাও ভাবিয়া পাইলেন না। হাঁপাইয় উঠিয়া তিনি বলিলেন, 'যাব না কি বল্‌ছি মা, সলিলা ছাড়ে না যে?"

অপর্ণা গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "তাই বলে পরের মৌখিক কথায় আপনার বলতে যা কিছু ভাসিয়ে দেবেন, এ কেমন কথা?"

বৃদ্ধ একটু চিন্তিতভাবে বলিলেন, "তা বটে! দাঁড়াও আজ সলিলা আসুক, বল্‌ছি।"

সলিলা আসিল,—সদ্যস্নাতা কৌষেয়-বসন পরিহিতা ব্রহ্মচারিণী। সদানন্দবাবু 'হাঁ' করিয়া খানিক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তারপর একটু গম্ভীর হইতে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার মতলব কি বল ত সলিলা, তোমার জন্যে কি আমি আমার সব ভাসিয়ে দেব?"

সলিলা হাসিয়া বলিল, "অপর্ণা আজ আবার আপনার মাথা খারাপ করে দিয়েছে বুঝি? মেয়ে ত আপনার এখন একটাই নয় কাকাবাবু, এ হতভাগীকেও দেখ্‌তে হবে? আমার আর কে আছে বলুন।"

সদানন্দবাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বার বার হতাশভাবে অপর্ণার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন, সলিলার উত্তরটা তাহারই দিক হইতে আসিবার আশায়!

সলিলা বলিল, "কাকাবাবুকে চা দিয়েছ অপর্ণা, না ভুলেছ। ও। যেমন, তেমনি

সদানন্দবা "ভাগ্যিস এ উঠেছিল! যায়?"

সলিলা চা ঢালিয়া দিতে লাগিল, বৃদ্ধ সানন্দে চুমুকে চুমুকে তাহা পান করিতে লাগিলেন। ঠিক সেই সময় একজন মুখরা বৃদ্ধা দাসী আসিয়া বলিল, 'জানি নি মা, আবার ওই গুলো ছুঁতে এলে! ফের নেয়ে মর।"

বৃদ্ধ সদানন্দবাবু দারুণ অপরাধীর মত সলিলার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন; সলিলা বিরক্তিভরে বলিল, "তোকে কাজের কৈফিয়ৎ নিতে কে ডাকলে বল ত? স্নান আমি কোন দিন না করি?"

দাসী কিন্তু ভয় খাইবার পাত্রীই নয়; বলিল, "কর; কিন্তু চিরদিন কি এমনি দিনে দশবার?"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তুই যা।" দাসী বকিতে বকিতে চলিয়া গেল।

সলিলা কৈফিয়ৎ দিবার ছলেই বলিল, "বুড়োমানুষ হাতে করে মানুষ করেছে, একটুতেই তাই শাসন করতে চায়। জিনিসটা এতটাই মিষ্টি যে, আমিও তাকে বাধা দিতে পারি না।"

অপর্ণার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল; কাল সন্ধ্যার পর ভিজা কাপড়খানা ছাড়িতে দেরী দেখিয়া সে নিজ হাতে সলিলার কাপড় আনিয়া দিলে তখনকার মত সে তা জড়াইয়া লইয়াছিল বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তার রুক্ষ চুল ও পরিধানে অন্য একখানি বস্ত্র দেখিয়া অপর্ণা অবাক হইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধিমতী সলিলা কিন্তু

অপর্ণার মনের এ ক্ষণিক চাঞ্চল্য স্থায়ী হইতে দেয় নাই ; ধীরকণ্ঠে বলিয়াছিল, "কি করব দিদি, রমু চাকরের ছেলেটা এটো মুখে ছুঁয়ে দিলে, কাজেই কাপড়টা আবার বদলাতেই হ'ল, দীক্ষিত শরীর যে !"

কথাটার নগ্ন মিথ্যা এখন বড় স্পষ্ট করিয়া অপর্ণার চক্ষে ধরা পড়িল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে পিতাকে বলিল, "আপনার যদি ইচ্ছে হয় থাকুন, আমি কিন্তু আর এক তিলও এ বাড়ীতে থাকতে পারব না বাবা।"

নিষ্ঠুর সত্যটা হৃদয়ঙ্গমে অক্ষম সদানন্দবাবু নিরাশভাবে সলিলার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। সলিলা হাসিয়া বলিল, "বংশের একজন কেউ যদি শুচি বায়ুগ্রস্ত হয়, তার শাস্তি ত্যাগে হ'তে পারে হয় ত, কিন্তু তাতেই কি তার বদ-স্বভাবটা বদলাবার সুযোগ দেওয়া হয় অপর্ণা ?"

অপর্ণা গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "কাজটা যদি ওই খানেই সীমাবদ্ধ হ'ত, হয় ত বলবার মত কিছু থাকত না দিদি! কিন্তু, কায়' অভিনয়ের কারণ হ'য়ে থাকতে আর কেউ যদি পছন্দ নাই করে, তাকে ত আর দোষ দেওয়া যায় না। কোন উপরোধ-অনুরোধেও আর আমি একদণ্ডও এখানে থাকতে পারব না; চলুন বাবা।"

বৃদ্ধ হতাশভাবে সলিলার মুখের দিকে চাহিল। সলিলা কিন্তু কোন উত্তরই খুঁজিয়া পাইল না ;—মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অপর্ণা হাত ব্যাগের ভিতর নিজেদের জিনিষ-পত্রগুলা গুছাইয়া তুলিতেছিল। এবার মাথা তুলিয়া বলিল, "সোফারকে একবার যদি খবরটা দেন না, থাক্, এইটুকু পথ বইত না, হেঁটেও যেতে পারব।"

সলিলা গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "বাধা তুমি আমায় দিতে পার অপর্ণা, কিন্তু মনে রেখো, তোমার দিদি তা পারে না। আমি নিজে গিয়ে আপনাদের ষ্টেসনে পৌছে দিয়ে আসব কাকা-বাবু ; না, বাধা দিলেও আমি তা শুনব না।"

ক্রমশঃ





শারদ পূর্ণিমা



সম্পাদক—শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৬ষ্ঠ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৩৭ | ৪র্থ সংখ্যা

মরুভূমির মঞ্জরী

শ্রী প্রভাতকিরণ বসু, বি-এ, কাব্যরত্ন

বাংলা লেখা ছাড়িয়াই দিয়াছিলাম।

সম্পাদক বন্ধু আসিয়া বলিলেন, এবারে আপনার একটা গল্প চাই।

বলিলাম, আর ত লিখি না।

সে কথা শোনে কে? তিনি ছাড়িবার পাত্র নন, বলেন, আপনারা লেখা ছাড়লে চলবে কি ক'রে।

বিন্দুমাত্র সময় নাই, কাজের তাড়া, নিজের অক্ষমতা, পাঠকদের অবহেলা প্রভৃতি বহু কারণ দেখাইলাম, কোনটাই টিকিল না। সবই তিনি বি—

প্যাডটা খুলিয়া, ফাউন্টেন পেন হাতে লইয়ে পূর্ব্ব স্মৃতি মনে পড়িল,—কেন লেখ ছাড়িয়াছিলাম।

তখন আমার জীবনের 'স্বর্ণ সময়'। বহিঃ খানা মাসিক সাপ্তাহিকে নানা লেখা লিখি সাহিত্যক্ষেত্রে কতকটা পরিচিত হইয়া উঠিয়াছি প্রতি কাগজের কমপ্লিমেন্টারী সংখ্যায় আ মারীর তাক ভারী হইয়া উঠিয়াছে, টেবিলে নীচে, খাটের তলায়, সিঁড়ির পাশে, কিনামূ পাওয়া অজস্র কাগজ স্থান পাইতেছে, ছাপা

না

পরিচিত হইয়া যাইতেছে ভাবিয়া. চলিবার, বসিবার, বলিবার কায়দায় অহঙ্কার কাটিয়া পড়িতেছে।

আমার বন্ধুর এবং তাঁর সখীদের মুখেও আমার প্রশংসা(?) অনিতে হইতে শুনিয়া পুরাণো কলম বদলাইয়া নূতন কলম কিনলাম।

পৃথিবীর তরফের অমলা, প্রমীলা, কল্পনা, নীহার, লাবণ্যলেখা, নির্ম্মলাদি', রাণীদি', আমার লেখার তারিফ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, স্কুলের, কলেজের, অফিসের বন্ধুরা আমার লেখা আলোচনা করিতে শুরু করিয়াছেন, আমার নামে অসংখ্য বুকপোষ্ট আসিতেছে, লেখা চাহিতে নানা স্থান হইতে লোক আসিতেছে,—আমি শ্রীযুক্ত লালমোহন-বাবু মনে করিলাম, যেন কি হইয়াছি।

একদিন সকালে আমার নামে একখানি খাম আসিল। খুলিয়া পড়িলাম,—ডাল্টনগঞ্জ হইতে লিখিতেছেন—শ্রীমতী প্রতিভা ঘোষ। মাত্র চারিটি লাইন,—আপনার লেখা আমার ভারী মিষ্টি লাগে। আমি 'গল্প-সাগরে'র গ্রাহিকা. তাহাতে একটী গল্প দিলে বাধিত হইব। আপনার বইয়ে আপনার ঠিকানা পাইয়াছিলাম। অশিক্ষিতার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

ডাল্টনগঞ্জ? সে ত অনেক দূরে; অতদূর আমার লেখা গিয়াছে এবং একজনের মিষ্ট লাগিয়াছে,—একথা যেমনি মধুর তেমনি অসম্ভব মনে হইল। অথচ অসম্ভব মনে হইবার কথা নয়, কাগজ ত দিল্লীও যায়, রেঙ্গুনও যায়।

আমার স্ত্রীকে চিঠিখানা দেখাইলাম। তিনি উচ্ছ্বসিত মনে তখনই জবাব দিতে বসিলেন।

হঠাৎ একদিন দেখি দু'জনের মধ্যে খুব চিঠিপত্র চলিয়াছে, এবং দুজনে 'মিলন' পাতাইয়া বসিয়াছেন। উভয়ের চিঠিতেই আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন এবং উত্তর থাকে, অথচ সকল চিঠি দেখিবার আমার অধিকার নাই।

বৎসরখানেক পরে একদিন খবর পাওয়া গেল প্রতিভা কলিকাতায় আসিতেছে, তার স্বামীর কাজ মিলিয়াছে। স্ত্রীকে বলিয়া দিলাম,—লিখে দাও, এখানে যেন একদিন আসে।

তিনি বলিলেন, সে লেখা হয়ে গেছে, তোমার বলবার অপেক্ষায় ছিলুম কি না।

অফিস হইতে ফিরিয়া সেদিন আপনার ঘরে বসিয়া সিগারেটের পরিবর্ত্তে বিড়ি পরীক্ষা করিতেছিলাম, চন্দন, গোলাপী. মৌরী কোনোটাই পছন্দ না হওয়ায় একটা চুরুট ধরাইলাম, সেও তথৈবচ। তখন উঠিয়া নাকে নস্য গুঁজিতে বসিলাম, এক টিপ লইয়া গণিয়া গণিয়া এগারোটি হাঁচি হাঁচিয়া দ্বাদশ হাঁচির জন্ত অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিয়াছি. এমন সময় পর্দ্দা সরাইয়া গৃহিণী তাঁরই সমবয়সী একটি তরুণীকে লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন,—এই মিলন।

বসুন, বলিতে গিয়া আমি হাঁচিলাম এবং তাঁরা দু'জনেই কলহাস্য করিয়া উঠিলেন।

প্রতিভা সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল, সে খুব সপ্রতিভ। কিন্তু দেখিলাম, লজ্জারক্ত মুখে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, মাঝে মাঝে চোখোচোখি হইয়া গেলে আরো বেশী অপ্রস্তুত হয়।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এ ধারণাও আমার ভাঙিয়া গেল, দেখিলাম, একজন পুরুষমানুষের সম্বন্ধে প্রথম সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠিবার পক্ষে এক ঘণ্টাই তার পক্ষে যথেষ্ট!

আমাকে সস্ত্রীক একদিন তার ভবানীপুরের বাসায় গিয়া উঠিবার জন্ত অত্যন্ত সহজভাবে অনুরোধ করিল এবং আলমারীর মধ্য হইতে যত খাতাপত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল।

সন্ধ্যা বেলা যে কোনো একটা বাসে উঠিয়া কালীঘাট অবধি আমার ঘুরিয়া আসা চাই-ই। একদিন রাস্তায় বাহির হইয়া দেখি একখানা বাস ছুটিয়াছে, সোনার জলে নাম লেখা 'মিলন'। ভারী ভালো লাগিল প্রতিভাদের পাতানো নামের কথা মনে করিয়া। সেইটাতেই উঠি-

লাম। অধ্যক্ষের ঠিকানা ১০২।১, বকুলবাগান রোড ভিতরে লেখা।

পরের দিন বাসের জন্ত দাঁড়াইয়া আছি, মিলনের দেখা পাওয়া গেল না। প্রীতম্, এসো যাচ্ছি, সাথের তরণী, বন্দেমাতরম, দে ছুট, মা, মেঘমল্ল, দীপ্তি, নীলা, জয় বিশ্বনাথ, অপ্সরা, রেখা—অনেকগুলা বাস চলিয়া গেল, আমি তবু দাঁড়াইয়া আছি। অনেকক্ষণ পরে 'মিলনে'র বাসন্তী রং দেখিতে পাওয়া গেল।

'হ্যারিসন রোড, চার পয়সা' 'ডালহাউসী' 'কালীঘাট' কণ্ডাক্টর হাঁকিয়া যাইতেছিল, আইয়ে বাবু খালি গাড়ী—বলিয়া মোড়ে মোড়ে দাঁড়াইয়া পড়িতেছিল. পিছন হইতে একখানা দোতালা গাড়ী আসিয়া পড়িল, দুইটাতে রেস লাগিয়া গেল, আরোহীদল সমস্বরে রাজনীতি চর্চা করিতে লাগিলেন,বৈকুণ্ঠনাথ গুঁই, জহরলাল পান্নালাল. কৃষ্ণদাস পাল, সেনেট হল, মেডিকেল কলেজ,—দোকান-প্রতিমূর্ত্তি-অট্টালিকা কলিকাতার জনবহুল পথের দুই পাশে চমকিয়া মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

'দাঁত বাঁধান', 'শুদ্ধ খাদি বিক্রয় করি', Tea চা, ক্লান্ কিং, ল্যাং ফুং, ক্যাবিনেট হাউস, ফোনেটিক স্কুল,—নানা বিচিত্র সাইন বোর্ড চোখের সাম্নে হইতে সরিয়া যায়, বাস যাত্রী নামিতে গিয়া টলিয়া পড়ে, ট্রাফিক পুলিশ বাম হাত তুলিয়া ধরে, গাড়ীর বিদ্যুৎবেগ সহসা থামিয়া যায়।

লাট সাহেবের বাড়ীর কাছে বাস অনেকটা খালি হইয়া গেছে। কর্জ্জন পার্কের মোড় বেঁকিবার পথে আরো অনেকে নামিয়া গেল।

হোয়াইটওয়ে, মিউজিয়ম পার হইয়া ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে গাড়ী ছুটিয়াছে, রাস্তার দুই ধারের আলো এবং মাঠের মাঝে মাঝে বহুদূর অবধি আলোর সারি, রহস্তপুরীর মত দূরে বিলীন হইয়া যাইতেছে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত যে রাস্তা বাকিয়া গিয়াছে. তার সংযোগস্থলে আসিয়া হঠাৎ গাড়ী দাঁড়াইয়া গেল। উঠিতে দেখিলাম প্রথমে একজন তরুণী, তার পশ্চাতে এক ভদ্রলোক।

সহজ দীপ্ত হাস্যে তরুণী অভিনন্দিত করিতে চিনিলাম, প্রতিভা।

আমার সামনে বসিয়া বলিল, ইনি আমার স্বামী, আর ইনি লালমোহন-বাবু!

দু'জনে দু'জনকে নমস্কার করিলাম। প্রতিভা বলিল, এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

বলিলাম, একটু বেড়াতে যাচ্ছি।

সে অনুযোগ করিল, বেড়াতে যাবার সময় হয়, আর আমার বাড়ী যাবার সময় হয় না? চলুন আজই। যাবেন?

আমি বলিলাম—এতদিন ত যেতাম, ঠিকানাটা ঠিক জানা ছিল না।

অঙ্গুলি সঙ্কেতে বাসের গায়ে ঠিকানা দেখাইয়া বলিল ঐ ঠিকানা।

—তার মানে?

—তার মানে ওঁর চাকরী যাবার পর এখানে এসে এই ব্যবসা ধরেছেন। 'মিলন' নাম দেখে আপনার কি একটুও সন্দেহ হয় নি?

—সন্দেহ হয় নি, তবে নামটা আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, অনেকগুলো বাস ছেড়ে দিয়ে এটাতে উঠেছি।

এই সময় প্রতিভা কণ্ডাক্টরকে ডাকিয়া বলিয়া দিল—এই বাবু যেদিন উঠবেন, পয়সা নিও না—কথাগুলা অবশ্য খুবই আস্তে,—কিন্তু আমি শুনিতে পাইয়া বলিলাম, তা'হলে এতে আমি আর উঠছি না।

প্রতিভা বলিল, না, না, সে কিন্তু আপনার ভারী অন্যায় হবে।

—অন্যায়টা যে কার, উনি মীমাংসা ক'রে দেবেন বলিয়া আমি তার স্বামীর দিকে চাহিলাম। ভদ্রলোক অম্লান বদনে বলিলেন, অন্যায়টা আমার মতে আপনারই।

বকুলবাগানে একটি সুন্দর সুদৃশ্য দ্বিতল বাটি। প্রতিভার ঘরটি দক্ষিণ খোলা, কোলে একটি ছোট বারান্দা। আমাকে বসিতে বলিয়া সে কাপড় ছাড়িতে গেল, স্বামী জগন্নাথ-বাবু মুখ হাত ধুইতে গেলেন। টেবিলের উপর সবুজ চিমনীর আড়ালে কেরোসিন ল্যাম্প জ্বলিতেছে, সামনে প্রতিভার কৈশোর দিনের একখানি ছবি, রাশিকৃত বেলফুল একটি কাঁচের বাটীতে। হঠাৎ তাকের উপর একখানা মরক্কো বাঁধাই খাতা দেখিয়া টানিয়া লইলাম।

প্রথম পাতায় লেখা—'অবসর সঙ্গিনী' শ্রী প্রতিভা বোষ। তারপর একটা কবিতা, তারপর একটা গল্প,—নানা রচনায় খাতা ভর্ত্তি। সব রচনার নীচে তারিখ বসানো।

প্রথম কবিতাটী পড়িয়া আমি অবাক হই-লাম। বাংলা সাহিত্যে কোন ভালো গ্রন্থ পড়িতে আমার বাকী নাই, এ লেখা পড়িয়া তবু আশ্চর্য্য হইলাম। তারপর গল্পটা পড়িয়া আমার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না।

কি চমৎকার বর্ণনা, কি সুন্দর বাংলা! এ লোক আমার লেখাকে ভালো বলে মনে করিয়া, আমার লজ্জা হইল।

আমি আবার পড়িতে লাগিলাম—

ওগো প্রিয়তম, ছিন্ন ফুলের মালা
ঝরিয়া পড়িল জীর্ণ ঘরের কোণে;
যদি কোনোদিন পড়ে তা' তোমার চোখে,—
স্বপ্ন সফল করিব সেদিন মনে!
জাগিত বাসনা, স্খলিত সভার মাঝে,
দয়ন্তীর প্রাণে বিলাতে গন্ধরাশি,
অন্ধকারার রুদ্ধদ্বার ভাঙি'
প্রিয়তম তব হেরিতে মুখের হাসি।

এ যে লিখিতে পারে, সে কি অশিক্ষিতা?

কাপড় বদলাইয়া প্রতিভা ঘরে আসিতে বলিলাম, এ কি তোমার লেখা?

সে বলিল, ঐ সব ছাইভস্ম বুঝি পড়ছেন?

আমি বলিলাম, তুমি এত চমৎকার লিখতে পারো, তবে আমি কলম ছেড়ে দোব।

সে বলিল, ছি ছি কি বলছেন! আমার আবার লেখা! মুখ চোখের এমনি ভঙ্গী সে করিল, যেন তার লেখা বাস্তবিকই কিছু নয়।

বলিলাম—এ ছাপাও না কেন?

সংক্ষেপে বলিল—উনি পছন্দ করেন না।

—আমার সঙ্গে যে মিশ্ছ?

—এও পছন্দ করেন না, কিন্তু আমি এ বাধা কিছুতেই মানতে প্রস্তুত হই নি বলে, অগত্যা মত দিয়েছেন। লেখা বার করলে নানা অশান্তি হবে।

আমি কথা বলিতে পারিলাম না, বাহিরের দূর দূর বাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলাম,—আলো-কোজ্জ্বল সৌধমালা।

একটা রেডিয়ো সেট্ আনিয়া সে টেবিলের উপর খাটাইয়া দিল। আমার হাতে হেডফোন দিয়া বলিল, দাদা একটু শুনুন, আমি চা ক'রে নিয়ে আসি।

প্রতিভা চলিয়া গেল। আমি ভাবিতে লাগিলাম—এই মহিলার লেখা একবার প্রকাশ হইলে দিকে দিকে কি কলরোল উঠিবে, মাসিকে, সাপ্তাহিকে, বেতারে, মহিলা সভায়, কতদিকে বিপুল জয়ধ্বনি অপেক্ষা করিতেছে।

জগন্নাথ ঘরে ঢুকিতে তাকে বলিলাম, আপ-নার স্ত্রী চমৎকার লেখেন।

তার মুখখানা অসম্ভব গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিল, না মশাই, মেয়েমানুষের অত পদ্যগদ্য চর্চ্চা ভালো নয়।

লোকটির দিকে আমি অবাক হইয়া চাহি-লাম। ড্যাল্‌হৌসি গেলে কি এই রকম বুদ্ধি হয়?

বলিলাম, আপনি রবিবাবুর বই পড়েছেন নিশ্চয়ই?

—কে রবীন মিত্তির? রায়-বাহাদুর?

—না, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—না মশাই, বইটই আমার বেশী পড়া হয় নি। ডাল্‌টনগঞ্জে বুকিং ক্লার্ক ছিলাম, সেখানে দু-একখানা বই পড়েছি, পারস্য উপন্যাস, হাতেম-তাই,—তা সে রবীন ঠাকুরের নয়।

প্রতিভা শুনিলাম ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়, বেথুন কলেজের মেয়ে! তাহাতে কি? সে যে বিধবার সন্তান, তাই হাতেম-তাই-পড়া স্বামীর হাতে পড়িয়াছে।

ঘরে রাশি রাশি 'অমৃতবাজার' সাজানো ছিল, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে প্রতিভা পড়ে, জগন্নাথ নয়।

চলিয়া আসিলাম, কিন্তু দুঃখ রহিয়া গেল,—সে লেখা গৃহকোণে রহিল যা গৃহপত্রিকার মত সমাদর পাইতে পারিত।

তিন মাস পরে একদিন তাহাদের বাড়ী গিয়াছি, প্রতিভার তখন কি অসুখ, ডাক্তার ধরিতে পারিতেছে না। লেখাপড়া, কি চিন্তার কাজ একেবারে বন্ধ। তবু সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে উপুড় হইয়া শুইয়া বিপুল উৎসাহে বোনটি আমার লিখিয়া চলিয়াছে। খাতার পর খাতা জমিয়া গেছে, কলম অবিশ্রাম চলিতেছে। আমায় দেখিয়া লেখা থামাইল, দেখিলাম শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, হাঁফাইতেছে, তবু লেখা চাই! যথেষ্ট অনুযোগ করিলাম।

সে বলিল—না লিখে থাক্‌তে পারি না দাদা। মরে ত যাবই, লিখে মরি। খানিকক্ষণ থামিয়া বলিল—কাল রাতে Life after death বলে একখানা বই পড়ছিলাম, পড়ে এমনি ভয় করছিল! এই পৃথিবী ছেড়ে আমারও অমনি জায়গায় যেতে হবে! আমার যে অনেক কাজ ছিল!

চোখে জল আসিল, লুকাইবার চেষ্টা করিতে সে বলিল, আমার কিন্তু কিছু দুঃখ হয় না দাদা, এই যে এত লেখা লিখে গেলাম, এরি মাঝখানে আমি বেঁচে থাকব। আপনারা আমার নাম ক'রে বলবেন, প্রতিভা লিখেছে।

কি বকৃছ বলিয়া অন্য কথা পাড়িলাম। কি সুন্দর শান্ত তার চোখ দুটি! দেখিয়া মনে হয়, রোগ যেন হয় নাই। নবপল্লবের মত নয়নপল্লব দুলিতেছে। প্রতিভা-দীপ্ত চোখগুলিকে আমি ভয় করি, অন্তরের সকল কথা তারা টানিয়া বাহির করে, কিছু লুকাইবার যো নাই।

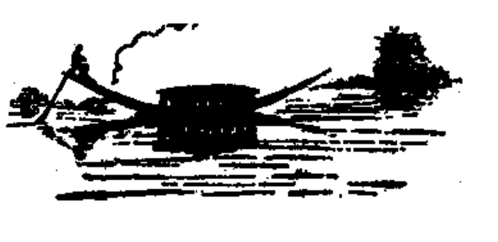
এর পরে আর একদিন গিয়াছিলাম। সে-দিনের করুণ ঘটনা আমার কলমে খুলিয়া লিখিতে পারিব না।

বাংলারচনার সকল উৎসাহ আমারও সেই-দিন হইতে মুছিয়া গেল। স্ত্রী বলিলেন, তাঁর মিলনের সম্বন্ধে একটা ছোট্ট কবিতা করিয়া দিতে, তিনি খদ্দরে লিখিয়া বাঁধাইবেন। আমি লিখিলাম—

হঠাৎ এসে আলাপ ক'রে
মিলিয়ে গেলে কোন্ সে লোকে?
মিষ্টি তোমার চিঠির গোছা
আমরা পড়ি ঝাপ্‌সা চোখে।

সম্পাদকবন্ধু নির্দ্দিষ্ট দিনে আসিয়া হাজির হইলেন, আমাদের পাওনা মিটিয়ে দিন্, পাঠক-পাঠিকারা অপেক্ষা করছেন!

হায়রে সাধারণের সেবা!





মজলিসী

শ্রী আশীষ গুপ্ত

স্থান—বাংলাদেশের যে কোনও পল্লীগ্রামের যে কোনও বাড়ীর বারান্দা।

কাল—দিবা দ্বিপ্রহর।

পাত্র অথ পাত্রী—অনেকগুলি গিন্নীবান্নী গোছের স্ত্রীলোক, দু'-একজন বধূ এবং কন্যা-স্থানীয়াও আছে।

(প্রচুর পরিমাণে পাণ এবং দোক্তার সদ্ব্যবহার চলিয়াছে)

—আমার দিদিশাউড়ীর ওপর একবার ভূতের ভর হ'য়েছিল; তবে সে ভূত বেশ ভালো ভূত,—লক্ষ্মীঠাকরুণ। ব্যাপারটা হয়েছিল কি জান,—আমার দিদিশাউড়ী লক্ষ্মী-নারায়ণের ঘরে সেবার যোগাড় করতে গিয়েছিল,—তারপর অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছে, তবুও ফিরে আসছে না দেখে, আমার শাউড়ী ভাবলে যে, এতক্ষণ ধ'রে বুড়ী কি করছে। এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঠাকুরঘরের দিকে যেতেই দেখে, দোর গোড়ায় বুড়ী পড়ে রয়েছে; আর গোঁ গোঁ ক'রে আওয়াজ করে' মাটিতে মুখ ঘসড়াচ্ছে। তাকে ধরতে যেতেই বুড়ী বলে' উঠল, 'ধোরো না, ধোরো না,—আমার মাথায় আগে গঙ্গাজল দাও, তারপর আমায় স্পর্শ কর।' ত্যাখন তার মাথায় গঙ্গাজল দিতেই সে আবার বললে, 'এইবার আমার হাত দুটো নিয়ে মাটিতে ঘষে দাও।' শাউড়ী তাই করতেই অম্‌নি সেখান থেকে দুটো বিল্বিপত্তর বেরোল।

(শ্রদ্ধাযুক্ত বিস্ময়ের সহিত) এঁ্যা, বল কি! মাটি ফুঁড়ে বিল্বিপত্তর বেরোল?

—হ্যাঁ, বেরোল বৈকি,—তারপর শোন না, ত্যাতক্ষণে গোলমাল শুনে সেখানে বাড়ীশুদ্ধ লোক জড় হয়ে গ্যাছে। তারা ত সবাই এ রকম কাণ্ড দেখে অবাক। বুড়ী ত্যাখন বলতে লাগল 'এইবার ওই বিল্বিপত্তর দুটো আমার মাথায় দাও।' আমার শাউড়ী সে দুটো তার মাথায় দিতেই বুড়ী ফের গোঁ গোঁ করে বলে উঠল,

'আমি লক্ষ্মীঠাকরুণ. তোদের ঘরে এবার থেকে চিরকেলের মতো বাঁধা রইনু,—এই বুড়ীই আমায় ধরে রেখেছে। তোদের ঘরে ভাত-কাপড়ের আর কোনদিন অভাব হ'বে না।' এই বলে বুড়ী চুপ করল ;—আমার শ্বশুর আর বাড়ীর অন্য লোকেরা গিয়ে দিদি শাউড়ীর চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে, তবে সে তার চৈতন্ত্ব হ'ল। তাখন অনেক কথা তাকে জিগেস৷ করা হ'ল ; —সে কিন্তু কিছুই বলতে পারলে না ;—কিছুই জানে না, হঠাৎ যেন ঘুম থেকে উঠেছে। বুড়ী ভালো হ'ল বটে, কিন্তু সেই থেকে তার মাথাটা কেবল ঠকঠক করে কাঁপত। (ভীতিমূলক ভক্তির সহিত কপালে হাত ঠেকাইয়া।) হঁ্যা, লক্ষ্মীঠাকরুণের খুব ভক্ত কিনা, তাই তিনি সন্তুষ্ট হ'য়ে ভালবেসে চিহ্ন রেখে গেলেন আর কি। মাগো, তোমারই মহিমে!

কন্যাস্থানীয়া কেহ—তবে আলক্ষী যে তার ভক্তকে ভালবাসেন, তার একটা অন্য কোন রকম চিহ্ন রেখে গেলেই ভালো হ'ত। দিন-রাত মাথা নাড়াটা যেন কেমন—(নিজের মাথাটা বারকয়েক অত্যন্ত জোরের সহিত কাঁপাইয়া মাথা নড়ার অসুবিধাটা সম্পূর্ণ অনুভব করিয়া লইয়া) বলিল—নাঃ, দিন-রাত মাথা নড়াটায় বড্ড অসুবিধে আছে বাপু! চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু আমার মাথাটা শুধু শুধু কাঁপতে আরম্ভ করেছে। আচ্ছা মুস্কিল ত! হাটছি, চলছি, ফিরছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি, মাথা কিন্তু নড়ছেই,—ভারী বিপদ যা হ'ক!

—ওকথা বলতে নেই,—মাগো, তোমারই দয়া ভালবাসা তোমারই মহিমে! (বলিয়া ভক্তিভরে করযোড়ে প্রণাম করিল। দেখাদেখি সকলেই নিজের নিজের ললাটে হাত ঠেকাইল)

—হঁ্যা, আর মহিমে! সেই দিন থেকে আমাদের বাড়ীতে লক্ষ্মী-শ্রী যেন একেবারে উপ্‌ছিয়ে পড়তে লাগ্‌ল। সাত মহল বাড়ী হ'ল,—তাতে এই এম্‌নি বড় বড় খাট জোড়া কপাট। সে বাড়ী একবার ঘুরে আসতে হ'লে মস্ত মস্ত পালোয়ানেরও পা ব্যাথা হ'য়ে যায়। তারপর সেই গ্রামেই তিন হাজার বিঘে জমি কেনা হ'ল—

কন্যাস্থানীয়া কেহ—আপনাদের গ্রামটা তা' হ'লে খুব বড় বলুন ?—

(ঢোক গিলিয়া) হঁ্যা তা বৈকি! পাঁচশোটা গোরু কেনা হ'ল। আমার শ্বশুরের লক্ষ ধেনু করবার ই'চ্ছে ছিল, কিন্তু তা' আর হয়ে ওঠে নি। বাড়ীতে দোল-দুর্গোচ্ছব, বারো মাসে তের পাব্বোন লেগেই ছিল। পুজোর সময় বাড়ীতে হাজার-দু'হাজার কুটুম খাওয়ান হ'ত—

বধূস্থানীয়া কেহ—আপনাদের বংশটা বেশ বড় কিন্তু, কুটুমই হাজার-দুহাজার।

(অত্যন্ত নিরীহের মত মুখে আমতা আমতা করিয়া) হঁ্যা, তা তোমার সে বড় বৈকি!—আর গরীব-দুঃখী যে কত হাজার হাজার খাওয়ান হ'ত, সে কথা তো বলেই শেষ করতে পারব না। হাজার মণ চালই পুজোর সময় খরচ হ'ত,—আর অন্য সব সামগ্রী ত আছেই। তারপর, পক্কান্ন পিঠে,—সে এক রকম ব্যাসম দিয়ে তৈরী করে—পায়েস, মেঠাই, মণ্ডা আরও কত সব অগুন্তি রকমের জিনিষ বানান হ'ত। এই সব পুজো-পাব্বোণের খবর দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল ; যে শুনত, সেই 'ধন্যি-ধন্যি' করত। কিন্তু এর একটা খারাপ ফল হ'ল,—আমাদের ট্যাকার লোভে বাড়ীতে ডাকাত পড়ল।

—(অতি কৌতূহলের সঙ্গে) এ্যা! ডাকাত পড়ল?

—হঁ্যা পড়ল বলে পড়ল, তিন-তিনবার পড়ল। তবে পেরথমবার বিশেষ কিছু সুবিধে করতে পারে নি ; বাড়ীতে সেদিন অনেক লোক

ছেল। আর তারা আগে থাকতে জানতেও পেরেছিল, তাই ডাকাতগুলো ভয় পেয়ে, 'অনেক মাছি, টের পেয়েছে, জাল গুটো' বলে সেবার পালাল। তার পরের বার যারা ডাকাতি করতে এসেছিল, তারা নিশ্চয়ই জানা লোক, নইলে আমার শ্বশুর যে সিন্দুকে টাকা না রেখে খাটের নীচে ঘড়ায় করে টাকা রাখে তা তারা কি করে জানতে পারলে ?

কত্তাস্থানীয়া কেহ (অত্যন্ত গোবেচারী গোবেচারী সুরে) অনেক টাকা ছিল বলে বুঝি আপনার শ্বশুর ঘড়ায় করে টাকা রাখতেন ?

—হাঁ সে জন্যেও বটে, আর ডাকাতদের ফাঁকি দেবার জন্যেও বটে, যেন তারা মনে করে ঘড়ায় জল রয়েছে।

—তারপর কি হ'ল ?

—এদিকে ডাকাতগুলো রাত দুপুরে হৈহৈ করে এসে দেউড়ীর দরোয়ানগুলোকে ভয় দেখিয়ে, ফটক খুলিয়ে, বাড়ীতে ঢুকে আমার শ্বশুরের ঘরের দরজা ভেঙে খাটের তলা থেকে টাকার আর মোহরের ঘড়াগুলো বার করে নিয়ে চলে গেল। টাকা নিয়ে গেল বটে, কিন্তু কাউকে মার-ধোর কিছু করলে না, এটুকু ভালো বলতে হবে। এই ত হ'ল দুবার,—আর একবার পড়েছিল পুজোর কিছুদিন আগে। ঠিক ত্যাখন সন্ধ্যেবেলা, বাতি জ্বেলে পুজোর দালানে বসে একজন পোটো তখনও ঠাকুর গড়ছিল, বাকী সবাই বাড়ী চলে গেছল। রান্নাঘরে আমার শাউড়ী ঠাকুরকে সমস্ত জিনিষ বুঝিয়ে দিচ্ছিল, আমার শ্বশুর তাঁর শোবার ঘরে বসে কতকগুলো খাত-পত্তর দেখছিল, আর সব লোকেরা বাড়ীর চারিদিকে নানা কাজে ব্যস্ত ছিল। এমনি সময় 'মার-মার' করে ডাকাতগুলো এসে পড়ল। সেই শব্দ না শুনে আমার শ্বশুর তাড়াতাড়ি পেছন দিককার দরজা না খুলে, বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তার পড়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে মারলে দৌড়। অন্য সকলে যে যেখানে পারলে চোঁচা সরে পড়ল। মেয়েরা ত সব খাটের নীচে, আলমারীর পেছনে যে যেখানে সুবিধে পেলে প্রাণের ভয়ে লুকোল,—কেবল আমার শাউড়ী পালাতে পারে নি।

—(বুদ্ধিমানের মত মুখ করিয়া) কি করে আর লুকোবে ? রান্নাঘরে ছিল যে,—সেখানে ত আর খাট আলমারী এ সব থাকে না।

—নাই ত। সেখান থেকে ভয়ে বেরোতেও পারছে না। এদিকে ডাকাতগুলো পেরথমে আমার শ্বশুরের শোবার ঘরে গেল, কিন্তু খাটের তলায় ঘড়া-টড়া কিছু পেলে না। আমার শ্বশুর এবার চালাক হয়ে উঠেছিল, ঘড়া খাটের তলায় রাখে নি। তারা ত সমস্ত বাড়ী ওলোট-পালট করে ফেল্লে, কিন্তু না পেলে একটা টাকা, না দেখ্‌লে একটা মানুষ। সব শেষে তারা রান্নাঘরের দিকে চলল। এদিকে, আমার শাউড়ীর ছিল খুব বুদ্ধি,—সে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে উঁকি মেরে যেই দেখলে যে, ডাকাতগুলো রান্নাঘর পানে আসছে, অমনি টপাটপ করে এক গা গয়না গা থেকে খুলে উনুনে ফেলে দিলে—

—আগুনের ভেতর !

—(ভড়কাইয়া গিয়া তাড়াতাড়ি) না তা কেন ? আর একটা উনুন ছিল,—সেটাতে রান্না হ'ত না, আঁচ পড়্‌ত না,—তার ভেতর। —ডাকাতগুলো রান্নাঘরে এসে দেখে যে, আমার শাউড়ী দোরের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর ঘরের এক কোণায় দাঁড়িয়ে ঠাকুর মধুসূদনের নাম জপ করছে। ডাকাতগুলো কিছু না বলে উনুনের ওপর যে দুধের কড়ায় করে একমণ দুধ জ্বাল দেওয়া হচ্ছিল, সেইটে উল্টিয়ে দিয়ে চলে গেল। ঘরময় দুধের স্রুদ্দুর বইতে লাগ্‌ল। ডাকাতেরা অন্দর থেকে বেশ ভালোয় ভালোয় বিদেয় হ'ল ; তারপর পুজোর দালানের সাম্‌নে গিয়ে দেখলে

যে, দালানের সিঁড়ির ওপর বসে তখনও তাদের এক বন্ধু ডাকাত পাহারা দিচ্ছে, যাতে কেউ সে রাস্তা দিয়ে না পালাতে পারে। মুখ্যুগুলো এটা বুঝতে পারে নি যে, সবাই বাড়ীর পেছন দিক দিয়ে আগেই পালিয়েছে। যাই হ'ক, সেই ডাকাতটার পাহারা দেবার ফলে আর কারও কিছু ক্ষতি না হ'লেও বেচারা পোটোর প্রাণটা গেল।

—প্রাণ গেল!

—হ্যাঁ, গেল বৈকি! সে বেচারা ওই পাহারাদার ডাকাতটার চোখের সাম্‌নে দিয়ে অনেক চেষ্টা-চরিত্তির করেও পালাতে পারে নি, সেই জন্যেই ত্যাখন পয্যন্ত সে ওই পুজোর দালানেই হাজির ছিল। ডাকাতগুলো ফিরে এসে তাকেই ঝেঁকে ধর্‌লে,—'বল শীগ্‌গির এ বাড়ীর কত্তা কোথায়, নইলে দিলুম এই ছুরি বসিয়ে।—' সে লোকটা যেই বল্‌লে সে জানে না—অমনি দু'-তিনখানা ছোরা এক সঙ্গে তার বুকে-পিঠে পড়ে এ জন্মের মত তার পোটোগিরি শেষ করে দিলে।

—(অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া) ইস্‌, তোমার শাউড়ী আর তোমাদের রাঁধুনী বামুনটা বড় বাঁচাই বেঁচেছে ত!

—নিশ্চয়! হয় পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যির ফলে নয় ত মা লক্ষ্মীর দয়ায়!

—সে কথা থাক্‌ গে, আগে বল পোটো কি একেবারেই ম'ল?

—হ্যাঁ, মর্‌বে না, চার-পাঁচখানা ছোরার ঘা কি সহজ কথা?

—(যথেষ্ট সন্দিগ্ধভাবে) আচ্ছা, পোটো যে মায় মূর্ত্তির সাম্‌নে অম্‌নি করে ডাকাতের হাতে ম'ল, কই মা ত তাকে রক্ষে কর্‌লেন না।

—(পরম দুঃখের সুরে) কই আর তা কর-লেন?

—(বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া) তুমি বাছা কিছু জান না। মা আর কি করে পোটোকে রক্ষা করবেন? মা কি তখনও সে মূর্ত্তিতে আদেষ্টান হয়েছিলেন? সে মূর্ত্তি ত আর ত্যাখন পয্যন্ত মা দুগ্‌গা নয়, সে ত ত্যাখনও কাদামাটি!

—হ্যাঁ ঠিক: আমার মনে ছিল না। মা ত ত্যাখন পয্যন্ত সেখানে আদেষ্টানই হ'ন নি; যদি হ'তেন তা' হ'লে নিশ্চই পোটোকে বাঁচাতেন, —এত সকলেই বুঝ্‌তে পারে।

—যদি আদেষ্টানই হ'তেন তা' হ'লে কি আর সেখান থেকে ডাকাতদের ফিরে যেতে হ'ত? মা একবারে সশরীলে আভিবভূত হয়ে ওদের সব ক'টাকে তরোয়াল দিয়ে ঘ্যাঁচাৎ করে কেটে ফেলতেন।

—(এতক্ষণ কথা কহিবার সুযোগ খুঁজিতে-ছিল। এইবার তাড়াতাড়ি করিয়া আবার আরম্ভ করিল) হ্যাঁ, ফেল্‌তেনই ত! আর যদি নেহাৎই না কেটে ফেল্‌তেন, তা' হ'লে ও নিশ্চই একটা ভয়ানক রকমের শাস্তি দিতেন। এই দেখ না কেন, একবার একজনদের বাড়ী পুজোর সময় ডাকাত পড়েছিল। পুরুত তাড়াতাড়ি গিয়ে তখনি পুজোর দালানে বসে মন্তর জপ করতে লাগল, আর বাড়ীর কত্তা একমনে মাকে ডাক্‌তে আরম্ভ কর্‌লে,—তেখনি সমস্ত ডাকাতগুলো একেবারে অন্ধ হয়ে গেল। এ ত আমার নিজের চোখে দেখা।

কন্যাস্থানীয়া কেহ—বলেন কি! আপনি নিজে এ ব্যাপার দেখেছেন?

—(থতমত খাইয়া ব্যস্ত-সমস্তভাবে) না, না, এই হ'ল গে, আমার মা দেখেছেন, আমি তার কাছে থেকে শুনেছি।—



সন্দেহের মেঘ

শ্রীমতী বিভাবতী ঘোষ

(১)

"সরলা এখন বেশ ঘুমোচ্ছে, রাত অনেক হয়েছে, তুমি একটু শোও গে, ঠাকুরপো!"

"এই যে একটা বাজে, আর এক দাগ ওষুধ খাইয়ে আমি যাচ্ছি।"

"আমি খাওয়াব 'খন। লক্ষীটি, তুমি শোও গে যাও। বেটা ছেলের কি এত সেবা করা পোষায়। ক'দিনে তোমার শরীর আধখানা হয়ে গেছে।"

স্নেহময়ী বৌদিদির মিনতি সত্ত্বেও সুরেশ তাহার রুগ্না স্ত্রীর শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিল না।

রাত্রি একটা বাজিল। সুরেশ তাহার রুগ্না স্ত্রীকে ঔষধ খাওয়াইল।

রমা আবার তাহার দেবরকে বিশ্রাম করিতে যাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে সুরেশ উঠিয়া গেল। রমা আইসব্যাগ লইয়া সরলার শিয়রে বসিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"কি ভালই বাসে সুরেশ সরলাকে! আহা, এ ক'দিনে বেচারীর সদা হাস্যময় মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে!"

(২)

উমেশ ও সুরেশ দুই সহোদর; কিন্তু উভয়ের মধ্যে বয়সের পার্থক্য বিস্তর। মধ্যে আরও কয়টি ভ্রাতা ও ভগিনী জন্মিয়াছিল, কিন্তু অল্প বয়সেই সকলে গতাসু হয়। সুরেশ সেই জন্য সকলের বড় আদরের ছিল। পিতা বহুদিন পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন; মাতৃবিয়োগের পর রমাই কনিষ্ঠ দেবরকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করেন। উমেশ পূর্ব্ববঙ্গে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন। সুরেশ সুখ্যাতির সহিত সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পাটনা কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হইয়া আসিয়াছে। এখানে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে সে রাসায়নিক গবেষণায় ব্যাপৃত আছে। বিজ্ঞানের চর্চ্চাতেই তাহার আনন্দ; গল্প-উপন্যাস প্রভৃতি 'বাজে' পুস্তক পাঠে সে কখনও সময় নষ্ট করে না।

তিন বৎসর হইল সরলার সহিত সুরেশের বিবাহ হইয়াছে। সরলা সুন্দরী ও গুণবতী। উভয়ের দাম্পত্য-জীবন অতি সুখের হইয়াছিল। সুরেশ যখন কলেজে যাইত, কিম্বা গৃহে নিবিষ্টচিত্তে বিজ্ঞান-চর্চ্চায় রত থাকিত, সেই সময়টা সরলার যেন কাটিতে চাহিত না। বিদেশে একলাটি তাহার বড়ই কষ্ট হইত। এই কষ্টের লাঘবের জন্ত সে প্রায় সমস্ত বাঙ্গলা প্রসিদ্ধ মাসিক-পত্রগুলির গ্রাহিকা হইয়াছিল এবং নূতন উপন্তাসাদি প্রকাশিত হইবামাত্র সে সেগুলি ভি-পিতে আনাইয়া লইত। ইহাতে সে বিদেশে নিঃসঙ্গ জীবনটা কোনও মতে সহনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। নতুবা যখন তরুণ অধ্যাপক মহাশয় বিজ্ঞান চর্চ্চায় ব্যাপৃত থাকিতেন, তখন তাঁহার তরুণী পত্নীর সময় কাটান অসম্ভব হইত। সুরেশ স্বয়ং উপন্তাস গ্রন্থাদি না পড়িলেও তাহার পত্নীর মাসিক-পত্র ও উপন্তাসাদি ক্রয়ের ব্যয় আনন্দে গ্রহণ করিত।

গ্রীষ্মের ছুটী আসিতেছে। উভয়েই দিন গণিতেছিল। বিহারের দারুণ গ্রীষ্মের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তাহারা সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা শস্ত-শ্যামলা বাঙ্গলার ক্রোড়ে দুই মাসের জন্ত ফিরিয়া আসিবে। সুরেশ তাহার স্নেহময় অগ্রজ ও স্নেহময়ী বৌদিদির নিকট কত সুখেই দুই মাস কাটাইবে তাহার কল্পনায় অধীর হইয়াছিল। কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। ছুটীর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সরলার জ্বর হইতে আরম্ভ হইল এবং সেই জ্বর ক্রমে টাইফয়েডে দাঁড়াইল। শীঘ্র বাটী ফিরিবার সম্ভাবনায় আনন্দে সরলা প্রথম প্রথম জ্বরকে উপেক্ষা করিয়াছিল। স্বামীকে শেষ কয়দিন কলেজে অনুপস্থিত হইতে দেয় নাই এবং জ্বরের উপরও মুখ বুজিয়া রোগযন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিল এবং প্রিয় উপন্তাসগ্রন্থাদি পাঠ করিয়া রোগের যাতনা বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার ফল ভীষণ হইল। দ্বিতীয় সপ্তাহে রোগের অবস্থা সঙ্কটজনক হইল। রমা তাহার স্বামীকে পীড়াপীড়ি করিয়া পাটনায় চলিয়া আসিলেন। এখানে কয়দিন সুরেশ ও তাহার ভ্রাতৃকন্যা ভ্রাতৃজায়া সরলাকে বাঁচাইবার জন্ত যথার্থই যেন যমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন।

(৩)

ক্রমে ক্রমে সরলা আরোগ্যের পথে আসিল। চিকিৎসক বলিলেন—জীবনের আশঙ্কা কাটিয়া গিয়াছে, তবে এখনও পূর্ব্ববৎ সেবাশুশ্রূষার প্রয়োজন আছে। রমা ও সুরেশকে তিনি ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন—এ সকল রোগে ঔষধ অপেক্ষা সেবারই অধিক প্রয়োজন এবং তাঁহারা যেভাবে রুগ্নার পরিচর্য্যা করিয়াছেন, সেরূপ তিনি কখনও দেখেন নাই। সরলার এখনও জ্বর হয়, তবে গাত্রের উত্তাপ তত বেশী হয় না। তাহার মাথা এখনও ঠিক হয় নাই; মধ্যে মধ্যে প্রলাপ বকে। তবে তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কোন ত্রুটী ছিল না।

আরও দিনকয়েক গেল। এখন সরলার জ্বর গিয়াছে। কিন্তু তাহার দেহ অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে। রমা এখনও পাটনাতেই আছেন। আরও একটু সুস্থ না হইলে ত তাঁহারা সকলে দেশে ফিরিতে পারিবেন না।

ইদানীং রমা একটি ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সরলা দিন দিন সুস্থ হইতেছে বটে, কিন্তু সুরেশের মুখের সে ম্লানভাব আরও বৃদ্ধি পাইতেছে, সে যেন আরও দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে। সরলার নিকট সে আসে, তাহাকে ঔষধ দেয়, যেন শুধু কর্ত্তব্যের খাতিরে,—আগে যেমন সে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত, এখন যেন সে সেরূপ বাসে না। সরলার রোগশীর্ণ দেহ ও বিবর্ণ মুখ দেখিয়াই কি তাহার ভালবাসা তিরোহিত হইল? না, তাহা হইতে পারে না। সরলার বিবর্ণ মুখমণ্ডলেও সতীত্বের পবিত্র জ্যোতি সুপ্রকট রহিয়াছে। তবে কি সুরেশ আর

কাহারও রূপমোহে পতিত হইয়াছে? তাহার স্থায় চরিত্রবান যুবকের পক্ষে তাহাও ত অসম্ভব। তবে কেন?

(৪)

একদিন রমা নিভৃতে সুরেশকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন। সুরেশ কাতরভাবে শুধু "আমাকে জিজ্ঞাসা করো না" বলিয়া পাঠগৃহে চলিয়া গেল। রমা বুঝিলেন, ব্যাপার কিছু গুরুতর। কিন্তু সরলা কি দোষ করিল? তাহার পক্ষে যে কোনও দোষ করা সম্ভব নয়। সে সত্য সত্যই নিরীহ সরলা বালিকা। স্বামী তাহাকে এড়াইয়া চলিতেছে, ইহা সে বুঝে না; সে মনে করে, তাহার স্বামী কোন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ব্যাপৃত বলিয়াই তাহার নিকট পূর্ব্বের স্থায় সমস্তক্ষণ বসিয়া থাকেন না।

রমা ধীরে ধীরে সুরেশের পাঠ-গৃহে গেলেন। সুরেশ জানিতে পারিল না। সে টেবিলের উপর হাতে মুখ গুঁজিয়া নীরবে কাঁদিতেছিল। রমা সুরেশের মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া মৃদুস্বরে ডাকিল—"সুরেশ।" সুরেশ মুখ তুলিল। সে কাঁদিতেছিল, রমা তাহা দেখিয়াছেন বলিয়া সে লজ্জায় মুখ নত করিল। রমা পুনরায় স্নেহ-পূর্ণ-স্বরে বলিলেন—"সুরেশ, ছেলেবেলা থেকে তোমাকে দেওরের মত নয়, ছেলের স্থায় মানুষ করেছি। কি হয়েছে বল? কেন তুমি এমন কষ্ট পাচ্ছ, আর একটি সরলা বালিকাকে কষ্ট দিচ্ছ। আমাকে সব খুলে বল।"

সুরেশ রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"বৌদি', তোমার কাছে সে কথা বলতে পারব না। স্ত্রীর প্রতি যা কর্ত্তব্য আমি কি তা করি নি? সরলা এখন ভাল হয়েছে, আমার কর্ত্তব্যও শেষ হয়েছে। তুমি ওকে নিয়ে যাও, আমি আমার কাজের মধ্যে আমাকে ডুবিয়ে দিয়ে যে রকম করে হোক জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারব।"

রমা সুরেশের মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"পাগল আর কি! লেখাপড়া করে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল দেখ্‌ছি। কি হয়েছে খুলে বল দেখি? যে সতী প্রাণ দিয়ে স্বামীকে ভালবাসে, তার প্রতি কর্ত্তব্য কি অত অল্পেই শেষ হয় না কি?"

"আর যদি সে স্ত্রী প্রাণ দিয়ে ভাল না বাসে?"

"আমি কি অন্ধ, আমি কি কিছুই দেখতে পাই না। কিসে তোমার এরকম সন্দেহ হ'ল জান্‌তে পারি কি?"

সুরেশ কিছুক্ষণ নীরব রহিল। তাহার পর সে বলিল—"আচ্ছা বৌদি', তুমি ত রাতদিন তার পাশে বসে থাকতে, জ্বর-বিকারের সময় সে বিমল বলে একজনের নাম করত শুনেছ বোধ হয়?"

মৃদু হাসিয়া রমা বলিলেন, "শুনেছি।"

"তুমি হয় ত শোন নি কতদিন সে বলেছে—'বিমল, প্রিয়তম, আমি তোমাকেই ভালবাসি; আমাকে এরকম করে ত্যাগ করো না'!"

এবারেও রমা মৃদু হাসিয়া বলিল—"শুনেছি।"

সুরেশ বিস্মিতভাবে তাঁহার প্রতি চাহিয়া অভিমানপূর্ণ-কণ্ঠে বলিল—"এখনও কি তুমি মনে কর সরলা সতী, তার স্বামীকে প্রাণ দিয়ে ভাল-বাসে?"

রমা দৃঢ়কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিলেন—"করি! তার প্রমাণ তোমাকে দেখাব; কারণ, তুমি চক্ষু থাকতেও অন্ধ, লেখাপড়া শিখেও বোকা—সতী ও অসতী স্ত্রীর পার্থক্য বুঝতে পারবার ক্ষমতা তোমার নেই। এসো আমার সঙ্গে।"

রমা সরলার গৃহে প্রবেশ করিলেন। সুরেশও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেল। রমা সরলার শয্যা পার্শ্বস্থিত টেবিল হইতে একটি সুদৃশ্য রেশমী মলাটে বাঁধা "হাসি মুখ" নামক একখানি উপন্যাস বাহির করিল। তাহার কয়েকটা পাতা উল্টাইয়া একটি পাতা বাহির করিয়া

সুরেশকে বলিলেন—উপন্যাস কখনও ত পড় না, দুটো পাতা পড় দেখি আজ।" সুরেশ পড়িল। উপন্যাসের নায়িকার সতীত্বে মিথ্যা সন্দেহ করিয়া নায়ক বিমল তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। সেই অংশটী অত্যন্ত করুণ রসাত্মক। নায়িকা যে সকল কথা বলিতেছে, সরলা প্রলাপের ঝোঁকে ঠিক সেই কথাগুলিই আবৃত্তি করিয়া গিয়াছিল।

রমা বুঝাইয়া দিলেন যে, রোগশয্যার এই করুণরসে পরিপূর্ণ চিত্রটি সরলার হৃদয়ে এত গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছিল যে, সে প্রলাপের ঝোঁকে সেই পঠিত অংশগুলিই পুনরাবৃত্তি করিয়া গিয়াছে।

সুরেশ গম্ভীরভাবে জানালার নিকট দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে ছিল—সরলা রমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে দিদি?"

রমা হাসিয়া কোমল কণ্ঠে বলিলেন—"কিছু হয় নি বোন; একটা মেঘ উঠ্‌ছিল, সেটা দূরে চলে গিয়েছে;—আবার সূর্য্যের আলো দেখা দিচ্ছে।"

সুরেশ অনুভব করিল,—সত্য সত্যই তাহার হৃদয় হইতে সন্দেহের মেঘ অকস্মাৎ অপসারিত হইয়া গিয়াছে—তাহার স্নেহময়ী বৌদিদির মৃদু হাসির অপূর্ব্ব জ্যোতিতে।



বন্ধনী

শ্রী হরগোবিন্দ সেন

কোথাও কিছু নাই।—নিরঞ্জনের 'শোবার-ঘরে' পর্দ্দা উঠিল।

বন্ধুরা বলিল, মানে?

মানে হাত্‌ড়াইতে হাত্‌ড়াইতে পুব্‌দিকের নিমগাছটা দেখাইয়া দিয়া নিরঞ্জন বলিল,—ঐ পুবের বাতাসটা—

কথাটা নির্জ্জলা মিথ্যা নয়। মাসখানেক পূর্ব্বে নিরঞ্জনের একবার নিউমোনিয়ার মত হইয়াছিল। ডাক্তার বলিয়াছিল, সাবধান।

মা বলিলেন, অমন ক'রে চারিদিককার আলো-বাতাস বন্ধ করলে আমি বাঁচি কি ক'রে!

নিরঞ্জন জানিত, বাহিরের আলো-বাতাসকে অবাধ অধিকার দিলে, ঐ সঙ্গে বাহিরের অনেক কিছুই আসিয়া পড়িতে পারে। তাই ঐ 'অনেক কিছুর' প্রবেশ-পথ সকল রকমে বন্ধ করিতে নিরঞ্জন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল।

কথাটা এই—

নিরঞ্জন বিবাহ করিবে। সমস্তই ঠিক হইয়া গিয়াছে, কেবল সেই শুভদিন আসিতেই যা দেরী। মা কন্যা দেখিয়া আসিয়াছেন। বলিয়াছেন, রূপকথার রাজকন্যা। নিরঞ্জন শাসাইয়াছে, সোরগোল করিয়া বিবাহ দেওয়া চলিবে না।—ঘটা করিয়া পাঁচজনের সম্মুখে বৌ-কে বাহির করাও হইবে না। ইহাতে নিন্দা হয়—হইবে।

হইলও তাহাই। নব-পরিণীতা দুর্গারাণী এক অন্ধকার রাত্রে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া জমিদার স্বামী-গৃহে প্রবেশের সম্মান লাভ করিল।

লোকে ছি ছি করিল। নিরঞ্জন গ্রাহ্যও করিল না। দুর্গা কিছুই বুঝিতে পারে না। মনে করে, ইহাই বুঝি বড়-ঘরের প্রথা।



সম্পূর্ণ নূতন আবেষ্টনী।

চোদ্দ বছরের দুর্গা প্রকাণ্ড একটা ঘোম্‌টা টানিয়া তাহার সীমার মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ায়। আকাশের নীলিমা তাহাকে বাহিরের দিকে টানিতে চায়;—কিন্তু পা ফেলিবার স্থান সঙ্কীর্ণ—দৃষ্টির সীমা সংক্ষিপ্ত। দুর্গা নিশ্বাস ফেলিয়া ঘরে আসিয়া বসে।

মা বুঝিতে পারেন। আহা, ছেলেমানুষ ত'! বলেন, খেলা করবে বৌমা? বলিয়া গোলকধামের ছক পাতিয়া দৃষ্টিক্ষীণ-বৃদ্ধা বালিকাকে খুসী করিতে চেষ্টা করেন।

ভিতর হইতে নিরঞ্জনের ডাক আসে। দুর্গার বুকটা 'ছাৎ' করিয়া ওঠে। বলে, তুমি বল না মা—এখন আমি যাব না।

নিরঞ্জন ঘরে বসিয়া সব শুনিতে পায়। রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ 'রিরি' করিতে থাকে। এইরূপ নিত্যই—

বিবাহ না করিয়া নিরঞ্জন বাহিরে বাহিরে ঘুরিবে—তাহাও একদিন কাহারও সহে নাই। আর আজ বিবাহ করিয়া ঘরকেই একান্ত করিয়া পাইতে চাহিতেছে—ইহাও কাহারও সহিল না।

ঐ এক কথা,—সবই বাড়াবাড়ি।

মালতী তাহার দাদাকে শোনাইয়া শোনাইয়া ইদানীং বলিতে সুরু করিয়াছে, বাইরের চত্বরটা ভাড়া দিলে ত মন্দ হয় না মা! আমাদের ত কোন কাজেই লাগছে না—উপরন্তু আয় বাড়ে।

খোঁচা খাইয়া নিরঞ্জন 'গোঁৎগোঁৎ' করিয়া বাহিরের ঘরে গিয়া বসে।

কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই—

আবার গোঁৎগোঁৎ করিয়াই এক সময় ভিতরে আসিয়া বসে। নিরঞ্জন যদি বলিত, ডেঁপো মেয়ে কোথাকার, তাহা হইলেই সব গোল চুকিয়া যাইত। কিন্তু গোল বাধিল চুপ করিয়া থাকিয়া। সমস্ত বাড়ীখানা যেন ধোঁয়াইতে লাগিল।

মা বলিলেন, ও আর ক'দিনের জন্যে এসেছে। বৌমা ছেলেমানুষ—একা বড় হাঁপিয়ে উঠছিল, তাই ওকে আনিয়েছিলাম।

নিরঞ্জন বলিল, হুঁ।

মালতীর কাছে নিরঞ্জন ঐ যে একটু খাটো হইয়া গেল, শেষে উহাই তাহাকে পাইয়া বসিল। তাহার শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য সব গেল।

নিজেকে দুর্ব্বল করিয়া ছাড়িয়া দিলেই, অপরে পাইয়া বসিবে—ইহা নিরঞ্জনও যে না বুঝিত এমন নহে। কিন্তু আপন-সংসারে, যেখানে সব চেয়ে তাহার কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার, সেখানে আবার নূতন করিয়া প্রবেশ করিবার লজ্জাই নিরঞ্জনকে মালতীর নিকট হইতে দূরে টানিয়া রাখিল।—মালতী এক আধ বছরের ছোট নহে —দশ বছরের ছোট।—এই কথাটাকে নিরঞ্জন বারবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিজের মনে আবৃত্তি করিয়াছে। কিন্তু মালতীকে কাছে টানিবার সহজ-কৈফিয়ৎ কিছুতেই খুঁজিয়া পাইতেছে না। তাই নিরবচ্ছিন্ন-অস্বস্তির গ্লানি ভারী-বোঝার মত তাহার বুকখানাকে জুড়িয়া রহিয়াছে।

জানালার পর্দ্দাগুলিতে ধুলা জমিয়াছে, রাত্রের খাবারের থালাটা তেমিই পড়িয়া আছে, ঘরের আলোটা তখনও টিপটিপ করিয়া জ্বলিতেছে! এই বিশ্রী-বিশৃঙ্খলার মাঝেই নিরঞ্জনের যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন শুনিল—বাহিরে কাহারা কলরব করিতেছে!

দুর্গা আসিয়া খবর দিল, সরকার মশায় আসিয়াছিলেন।

নিরঞ্জন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, কেন?

তোমাকে কাছারিতে যেতে বলে গেলেন।—

বটে!—তাকে বাড়ী ঢুকতে দিলে কে?—তাই এত সাজ-গোজ? নির্লজ্জ! বলিয়া তাহার হারগাছটা টান্ মারিয়া ছিঁড়িয়া দিয়া নিরঞ্জন গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেল।

দুর্গা স্তব্ধ হইয়া একইভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। বাহিরের বড় বড় প্রাচীরগুলা তাহার চোখের সম্মুখে—আজ এতদিন পরে স্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া উঠিল।

সেইদিন বৈকালেই তাড়া খাইয়া ঝড়ু যখন কাঁচা-আম ফেলিয়া পলাইল, তখন দুর্গা আর থাকিতে পারিল না। বলিল, বল—এর মানে কি?

—মানে কিছু নেই,—অনাচার আমি হতে দেবো না।

—ঐ ছোট ছেলেটা—

—হাঁ, গাল টিপ্‌লে দুধ বেরোয় বলিয়া নিরঞ্জন মুখ বাঁকাইয়া হাসিল।

স্বামীর এই বিশ্রী—ইঙ্গিত দুর্গার মুখের উপর চাবুক কসাইয়া দিল।

দুর্গাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া নিরঞ্জন চীৎকার করিয়া উঠিল,—অন্দরের শুচিতা

আমাকে বাঁচাতেই হবে। ফের যদি কোন দিন—

আর বলিতে হইল না। দুর্গা সশব্দে নিজের ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া—আজ প্রথম, এ বাড়ীতে চোখের জল ফেলিল।

নিরঞ্জন গজগজ করিতে করিতে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

মালতীকে লইতে আসিয়া প্রমথ দেখিল, এ বাড়ীর হাওয়াই বদলাইয়া গিয়াছে। মনে করিয়াছিল বিবাহের সময় আসিতে পারে নাই বলিয়া নিরঞ্জনের নিকট এবার তাহাকে অনেক কথাই শুনিতে হইবে। কিন্তু নিরঞ্জন যখন একটি কথাও না বলিয়া তাহারই পাশ দিয়া গটগট করিয়া অন্দরে চলিয়া গেল, তখন প্রমথ বিস্মিত না হইয়া পারিল না।

মালতীর চিঠিতে বৌদি'র রূপের প্রশংসা শু'নয়া শুনিয়া প্রমথ এবার লিখিয়াছিল, তোমার বৌদি'কে ব'লো—আমার মুখ-দেখা এখনও পাওনা আছে। পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিতে আমি ভট্‌চায-বামুনের চেয়েও বড়, একথা যেন তাঁর স্মরণ থাকে।

প্রমথ ভাবিতে লাগিল, ঐ চিঠিই কি তবে অনর্থ সৃষ্টি করিল?

শাশুড়ী আসিয়া জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বাড়ীর পুরান দাস-দাসী সকলেই আসিয়া তাহাদের জামাইবাবুকে প্রণাম করিয়া গেল।

কিন্তু একটা কথা প্রমথ কিছুতেই বুঝিতে পারিল না—শাশুড়ী তাহাকে ডাকাইয়া না পাঠাইয়া, নিজে বাহিরের ঘরে আসিলেন কেন?

নিরঞ্জন আসিয়া সামান্য দু'-একটা কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া খুব ব্যস্ততার ভাব দেখাইয়া আবার কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। বলিয়া গেল, শীগগির আসছি। ইহা যেমন অস্বাভাবিক, তেমনি বিস্ময়ের।

"কিহে, এবার অন্দরে কি প্রবেশ নিষেধ?" খাইবার সময় প্রমথ এই কথা বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।

নিরঞ্জন অর্থহীন কতকগুলা হোহো শব্দ করিয়া চুপ করিয়া গেল।

তারপর বিশ্রী নীরবতা।

প্রমথ ভাত মাখিতে মাখিতে কথা হাতড়াইতে লাগিল। যেন তাহার কথার ঝুলিটা এইমাত্র কোথায় হারাইয়া গেল।

শাশুড়ী আসিয়া বলিলেন, মালতী যে আজকেই যাবার ঝোঁক ধরেছে।

প্রমথর একটা গুরু-বোঝা নামিয়া গেল। সে এই বিশ্রী নীরবতার লজ্জা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য এতক্ষণ কি ব্যাকুল-চেষ্টাই না করিয়াছে! বলিল, হাঁ—আজকেই যেতে হবে, আমার আবার থাকবার উপায় নেই কিনা।

নিরঞ্জন একটা কথাও বলিল না।

চতুর প্রমথ এক নজর দেখিয়া লইয়াই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, ভায়ার কি মন খারাপ হয়ে গেল?

নিরঞ্জনের ব্যবহারে তাহার মাতারই লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া গিয়াছিল। তিনি আর একটি কথাও না বলিয়া যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনিই চলিয়া গেলেন।

প্রমথ এই কয় ঘণ্টার মধ্যেই সমস্তই বুঝিয়াছিল। নিজে বুঝিয়াও অপরকে বুঝিতে দিবে না, ইহাই প্রমথর সঙ্কল্প ছিল। তাই আগাগোড়া হাসিয়া হাসিয়াই এত বড় অপমানকে হাল্কা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সে নিজে হাল্কা করিতে চাহিলেও মালতী এই অপমান সহ্য করিতে পারিল না। পতির অপমানে সতীর দেহত্যাগ—ইহা ত আমাদেরই পুরাণের কথা।

প্রমথ বলিল, বাড়ীটাকে এমন ক'রে শ্রীহীন করলে কেন হে ?—এই খোঁচাটুকু প্রমথ ইচ্ছা করিয়াই দিল।

মুখ তুলিয়া নিরঞ্জন বলিল, কি রকম ?

নিষেধাজ্ঞার চেয়ে ঐ বড় বড় প্রাচীরগুলো কি বেশী কঠোর ?

নিরঞ্জন কি একটা বলিতে গিয়াই থামিল। ডাকিল, মা !

মা আসিলেন।

ব্যস্ত হইয়া নিরঞ্জন বলিল, প্রমথর পাতে যে কিছু নেই।

প্রমথ হাসিল। বলিল, পুরোনো হ'লেও—দেখ্‌ছি, আমার আদর কমে নি।

ইহার অল্পদিন পরেই—অকস্মাৎ, গোমস্তা তিনকড়ির জবাব হইয়া গেল।

দুর্ব্বোধ্য বলিয়া কেহ মাথা না ঘামাইলেও, সরকার মশায় হইতে সকলেই বেশ ভয় পাইয়া গেল।

অপরাধ গুরুতর।

অর্থাভাবে কন্যার বিবাহ হইতেছে না। অভাব মনিবের কাণে তুলিয়া অর্থের পরিবর্ত্তে তিনকড়ি তাড়াই খাইয়াছে। তাই মরিয়া হইয়া একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে—তিনকড়ি নাকি মনিব-পত্নীর পা জড়াইয়া পড়িয়াছিল।

তারপর ?—নূতন কিছুই নয়।

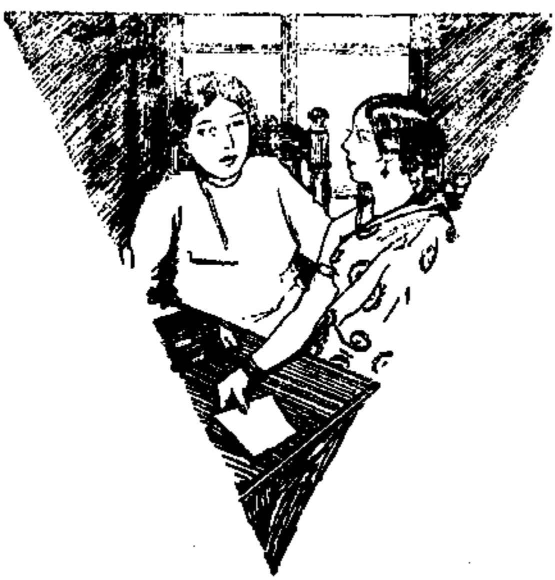
স্বামীর অধিকার গর্ব্বে গর্ব্বী পুরুষের পীড়নতলে অসহায় নারীর মূক-ক্রন্দন ! দেবতার ক্রূর পরিহাস !

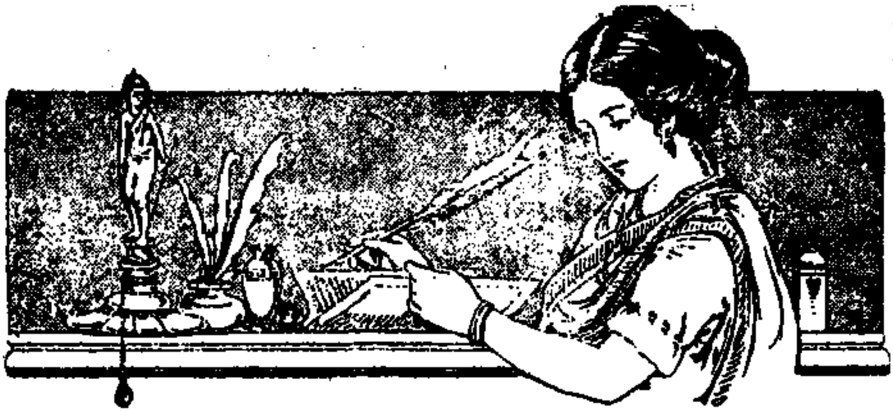
যাহার নামের সহিত তাহাকে জড়াইয়া—এই সেদিন, অকথ্য কুৎসিৎ কথার বৃষ্টি হইয়া গেল, কুগ্রহের মত আজ আবার অকস্মাৎ—সেই তিনকড়ি তাহারই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল !

সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহাকে দেখিয়া দুর্গা থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

তিনকড় বলিল, মা ! আমার চার-পাঁচটা ছেলে। না খেতে পেয়ে যে ··

দুর্গা চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু কি ভাবিয়া এক পা পিছাইয়া গিয়া তাহার মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, তুমি যাও · তুমি যাও—





নীলাম্বরীর কথা

শ্রী হরিপদ গুহ, বিদ্যারত্ন, সাহিত্য-ভারতী

অনেক দিনের কথা। ভাদ্রের শেষ, কি আশ্বিনের প্রথম তাহা ঠিক্ স্মরণ নাই। সেবার কার্ত্তিক মাসে পূজা। তাঁতীরা রাত্রিদিন খাটিয়া কাপড় বুনিতেছিল। আমাকে বুনিবার ভার লইয়াছিল, গয়ারাম। বেশ নিপুণতার সহিত খট্-খট্ শব্দে মাকু চালাইয়া সে আমার বুনন কার্য্য শেষ করিল। নীল রঙ আর তাহার কিনারায় লাল পাড়,—বড়ই সুন্দর মানাইয়াছিল। নিজের রূপ দেখিয়া খুসীতে আমার মনটা ভরিয়া উঠিল। ভগবানের চরণে কায়মনে প্রার্থনা জানাইলাম,—এমন রূপই যখন দিলে, তখন যেন তাহা ব্যর্থ না হয়;—কোন রূপসীর দেহ-লতিকাকেই যেন বেষ্টন করিতে পারি দয়াময়!

গয়ারাম তাহার স্বহস্তে প্রস্তুত অন্যান্য কাপড়ের সহিত আমাকেও লইয়া দোলাইগঞ্জের হাটে চলিল। মহাজনেরা আসিয়া পাইকারী দরে তাহার অন্য সমস্ত বস্ত্রই খরিদ করিল; কিন্তু আমাকে লইতে কেহই আসিল না। বেচারা গয়ারাম মুখখানা বেজার করিয়া একপার্শে আমাকে ফেলিয়া রাখিল। আমার মনটা বড়ই দমিয়া গেল। তাহার জন্য দুঃখও কম হইল না।

সন্ধ্যার দিকে যখন হাট ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে, তখন মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে তুলিয়া লইল। বুঝি বা আমাকে দেখিয়া তাহার পছন্দই হইয়া থাকিবে; তাই বিশেষ দরদস্তুর করিল না। গয়ারাম যাহা চাহিয়াছিল, সেই সাতসিকা দিয়াই সে আমাকে কিনিয়া লইল।

গয়ারামের কিঞ্চিৎ অর্থ হইল এইজন্য মনে একটু আনন্দ পাইলাম বটে, কিন্তু আসন্ন বিচ্ছেদ আশঙ্কায় প্রাণটা আমার হাহাকার করিয়া উঠিল। হায় রে পোড়া কপাল! আমার এই মন ভুলান রূপ লইয়া পড়িলাম কিনা শেষে বংশীধর জেলের ঘরে। দারুণ অভিমানে মনটা আমার মুসড়াইয়া গেল। অবশ্য পরে আর আমার এ মনোকষ্ট ছিল না। দয়াময় আমার প্রার্থনা শুনিয়া তাহা পূর্ণ করিতে একটুও কার্পণ্য করেন নাই; উপযুক্ত ঘরেই আমাকে দিয়াছিলেন।

আমাকে পাইয়া বংশীর স্ত্রী মালতীমালার আনন্দ আর ধরে না! ভারি খুসী সে! কত যত্নের সহিত পরিপাটিরূপে সে আমাকে পরিধান করিত। আমার গায়ে একটু ময়লা না লাগে, এই জন্য সে সর্ব্বদা সাবধানে অতি সন্তর্পণে থাকিত।

আমাকে পাইয়া যেমন তাহার আনন্দ হইয়াছিল, তাহাকে পাইয়াও আমার আহ্লাদ তাহার অপেক্ষা বড় কিছু কম হয় নাই! আমার রূপে

যেমন তাহার সৌন্দর্য্য উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল, তাহার উজ্জ্বল বর্ণ এবং বলিষ্ঠ সুডৌল দেহলতাকে বেষ্টন করিয়া আমারও নীলিমা-লাবণ্য তেমনি জলজল করিয়া উঠিয়াছিল।

পূজা আসিয়া পড়িয়াছে। আনন্দময়ীর আগমনে চারিদিকে একটা পুলক শিহরণ জাগিয়া উঠিয়াছে। শুনিলাম জমীদার-বাড়ীতে বিরাট্ ব্যাপার! মহাপূজার বিপুল আয়োজন! ধনীর দুলাল সুখময় তাহার চরিত্রহীন সঙ্গীদের লইয়া কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিয়া হাস্য-কৌতুকে সমস্ত গ্রামখানি মাতাইয়া তুলিয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে মালতী আমাকে পরিধান করিয়া পুষ্করিণীতে জল আনিতে গিয়াছিল। জল ভরিয়া যখন সে গৃহে ফিরিতেছিল, তাহার পা ফেলার তালে তালে কলসীর বারিরাশিও যেন সোহাগে উথলিয়া ছল্-ছল্ ছলাৎ শব্দে নৃত্য করিতেছিল। কি সুন্দর তাহার চলার সেই অর্দ্ধ বঙ্কিম ভঙ্গিমা! কি অপূর্ব্ব তাহার লীলায়িত সুগোল বাহুলতা!

বিপুল পুলকে আমার হৃদয়খানি থর্থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। লজ্জাহীন সমীরণ মধ্যে মধ্যে আমাকে লইয়া লুকোচুরি খেলিতেছিল। মেঘ-মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় মালতীর সুন্দর মুখখানিও এক একবার বাহির হইয়া পড়িতেছিল, পরক্ষণেই সে সলজ্জভাবে আমাকে টানিয়া তাহার অবগুণ্ঠন ঠিক করিয়া লইতেছিল।

সহসা পথিমধ্যে সদলবলে জমীদার-পুত্র সুখময়ের সহিত দেখা হইয়া গেল। মালতী এক পাশে একটা বাঁশ ঝাঁড়ের কাছে সরিয়া দাঁড়াইল। আমোদ-প্রিয় বন্ধুর দল পৈশাচিক আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাদের মধ্য হইতে এক জন বলিয়া উঠিল—"এ যে বাবা হুরীর রাজ্যে এসে পড়্লুম! হ্যাঁ হে সুখময়, তোমাদের এই আজব দেশে এমন সব নীল পরী থাকতে একেবারে চুপ করে বসে আছ?" সোল্লাসে সকলে হাস্য করিয়া উঠিল। একজন সুর করিয়া বলিল—

"চলে নীল সাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

মালতী লজ্জায় একবারে মরমে মরিয়া যাইতেছিল। সরম-জড়িত-চরণে, কম্পিত হৃদয়ে পাশ কাটাইয়া সে ধীরে ধীরে পথ চলিতেছিল। উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুর দল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অভদ্রোচিত ভাষায় অপ্রিয় হাস্য-কৌতুক করিতে লাগিল।

একপাল লোলুপ-দৃষ্টির মধ্যে মালতী বিবর্ণ হইয়া গেল। লোক হয় যাহারা সংসারে ভদ্র এবং বড় বলিয়া দাবী করে, তাহাদের এইরূপ অভদ্র নীচ ব্যবহার দেখিয়া সে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। ঘরে আসিয়া মনে মনে বলিল—স্বামীকে সে এই সব কুলাঙ্গারদের কু-কীর্ত্তির কথা প্রকাশ করিয়া দিবে। কিন্তু, পরক্ষণেই তাহার স্বামী যে তাহাতে কিরূপ চিন্তিত ও শশব্যস্ত হইয়া পড়িবে, তাহা ভাবিয়াই বুঝি সে দমিয়া গেল। একেই ত পূজার মরসুমে বংশীর পরিশ্রম খুব বাড়িয়া গিয়াছিল; অতিরিক্ত লাভের আশায় সর্ব্বক্ষণ সে নদীতেই কাটাইত। তাহার উপর আবার তাহাকে সেই কথা বলিয়া ব্যস্ত করিয়া তুলিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সমস্ত শুনিলে রাগের মাথায় না জানি সে কি একটা কেলেঙ্কারী করিয়া বসিবে; সে ভয়ও মালতীর যথেষ্ট ছিল।

সেদিন ষষ্ঠী। সানাই মধুর সুরে মায়ের আগমনী গাহিতেছিল। সে সুরে কি মাদকতা। প্রাণ-মন মাতাইয়া তুলিয়াছিল। ভক্তিতে আপনা হইতেই নত হইয়া আসিতেছিল।

প্রতিদিন মালতী গা ধোওয়ার পর বা করিয়া আমায় পরিত। তার নিঃসঙ্গ আমি যেন ছিলাম একান্ত দরদী সঙ্গী। আমাকে দেহে জড়াইয়া মালতী যখন ঘা কাজ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল,

তাহার সঙ্গীদের সহিত তখন ঘাটের অনতিদূরে একটা বড় হিজল গাছের নীচে দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে মালতীকে দেখাইয়া কতকগুলি লোকের সহিত কি পরামর্শ করিতেছিল।

মালতী ভয়ে ভয়ে ত্রস্তপদে বাটীর দিকে অগ্রসর হইল। কি এক অজানিত আশঙ্কায় তাহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। মনে মনে সে কতই না অমঙ্গলের সৃষ্টি করিল।

রাত হইয়াছে। পূজা বাড়ীর ঢাকের বাদ্য ও গোলমাল থামিয়া গিয়াছে। মালতীর চোখে নিদ্রা নাই। সে শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

কয়দিন হইতে বংশীধর বাড়ী আসে নাই। মাঝে মাঝে তাহার এইরূপ হয়। আজও আসিবে কি না তাহার কোন স্থিরতা নাই। নানা কাল্পনিক দুশ্চিন্তায় তাহার ঘুম আসিতেছিল না।

চারিদিক একেবারে নীরব হইয়া গেল। ঘুমে মালতীর চোখ দু'টি আপনা হইতেই বুজিয়া আসিতেছিল। সে কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিল, মনে নাই। সহসা একটা শব্দে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। ঘুমের ঘোরটা ভাল করিয়া কাটিবার পূর্ব্বে ব্যাপারটা ঠিক্ ঠিক্ বুঝিয়া উঠিতে না উঠিতেই কে যেন সবলে আমাকে দিয়া তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল; পরে আরও দুই-তিন-জন আসিয়া তাহাকে একেবারে শূন্যে তুলিয়া ফেলিল। সে তাহাদের কঠিন বাহুমূলে উদ্ধারের জন্য বৃথা ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। মুখ হইতে একটা অস্পষ্ট গোঁ গোঁ শব্দ বাহির হইল, পরক্ষণেই তাহারা একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মালতীর মুখের বাঁধন যখন খুলিয়া দিল, তখন বজরা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পদ্মার ভীষণ গর্জ্জন শোনা যাইতেছিল এবং উত্তাল তরঙ্গমালা সকল দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। মালতী জানালা দিয়া একবার বাহিরের দিকে চাহিয়া সীমাহীন আকাশ ও অনন্ত বারিরাশি দেখিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। দারুণ ভয়ে সে শিহরিয়া উঠিল। উদ্ধারের কোনই উপায় না দেখিয়া ভয় চকিত নয়নে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

তাহাদের মধ্য হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল—"সুন্দরী, অমন করে চাইছ কেন? কিসের অত ভয় তোমার? আজকের রাতটা সার্থক করে দাও! ভোরের দিকে আবার তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসব। এই দেখ,—সুখময়, তোমাদের জমীদারের ছেলে; সোণা দিয়ে সে তোমার গা মুড়ে দেবে!"

সকলেই আনন্দধ্বনি করিয়া তাহার কথা সমর্থন করিল।

মালতী কাঁদিয়া ফেলিয়া সজল চক্ষে মিনতি করিয়া সুখময়কে বলিল—"কেন আমার সর্ব্বনাশ করছেন? আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিন!" তাহার স্বর বড় করুণ।

সুখময় উচ্ছৃঙ্খল হইলেও মনে হইল এইরূপ কুলনারীকে বাহির করিয়া আনা তাহার পক্ষে প্রথম। মালতীর প্রতি তাহার যে লোভ হয় নাই, তাহা নহে, কিন্তু তাহাকে যে এমন করিয়া পাইতে হইবে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। লম্পট-বন্ধু নীরোদের কু-পরামর্শেই সে এই কাজটা করিয়া ফেলিয়াছে। এখন মালতীর কাতরতা তাহার মনের দ্বারে আঘাত করিল। সে একটু অনুতপ্ত হইয়া পড়িল; বুঝিল যে, কাজটা ভাল হয় নাই। সে কেমন একটু মন-মরা হইয়া গেল।

বন্ধুর দল সুখময়ের এই অবস্থা দেখিয়া ভাবী আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া পড়িল। নীরোদ সময়ের অপব্যয় না করিয়া 'হুইস্কি'র ছিপিটা খুলিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ফট্ করিয়া সোডার বোতল ভাঙ্গিয়া গ্লাস পূর্ণ করিয়া সুখময়ের হাতে তুলিয়া দিল।

সুখময় একটু মৃদু আপত্তি করিয়া চোঁ চোঁ

করিয়া গ্লাসটী নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। এইরূপ করেক গ্লাস পান করিতেই তাহার মনের কপাট খুলিয়া গেল; গোলাপী নেশায় তাহার চোখ দু'টি ঢুলু ঢুলু করিতে লাগিল।

নীরোদকে দেখিলেই স্পষ্ট মনে হয়, সে এই বিষয়ে পাকা ওস্তাদ। ইতঃপূর্ব্বে সে অনেক রাজা-মহারাজের বাড়ীতে মোসাহেবী করিয়াছে; সুতরাং সে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে লাগিল। হঠাৎ মালতীর মাথা হইতে আমাকে টানিয়া সরাইয়া দিতেই পদ্মের ন্যায় ফুটফুটে তাহার সুন্দর মুখখানি বাহির হইয়া পড়িল। সেই মুখ দেখিয়া সুখময়ের কামনা-মধুপ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

মালতী লজ্জায় জড়সড় হইয়া আমাকে আবার মাথায় টানিয়া দিয়া একপাশে সরিয়া বসিল।

নীরোদ বন্ধুদের লক্ষ্য করিয়া বলিল—"চল হে, একটু বাইরে গিয়ে বসা যাক্! পাখী এখন আর পালাবে কোথা? শীগগিরই পোষ মেনে যাবে। সুখময় ততক্ষণ ওর সঙ্গে দু'টো প্রাণের কথা বলুক।"

একটু পরেই তাহারা সকলে বাহিরে বজ্‌রার ছাদে গিয়া বসিল।

সুখময় মালতীর দিকে একটু সরিয়া আসিল। মালতী আর একটু জড়সড় হইয়া পড়িল।

সুখময় বলিল—"কি ভাবছ মালতী? কিসের দুঃখ তোমার? তুমি আমার হও, আমি তোমাকে কোলকাতা নিয়ে গিয়ে রাণী করে রাখব।" সঙ্গে সঙ্গে বিপুল আবেগে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

মালতী হাত টানিয়া লইয়া করযোড়ে বলিল—"আপনার পায়ে পড়ি, আমার সর্ব্বনাশ করবেন না। ছেড়ে দিন, আপনার রাজরাণী হতে আমি চাই না—কুঁড়েঘরে স্বামীর কাছে থাকলেই সুখী হব—আপনার ঐশ্বর্য্য আমি চাই না। দোহাই আপনার, আমার সতীত্ব নষ্ট করবেন না—আমাকে বিদায় দিন।"

সুখময় অট্টহাস্য করিয়া বলিল—"সতীত্ব কি মালতী? ও তো কু-সংস্কার! বেশ, রাণী না হতে চাও, কোলকাতা নাই গেলে। কিন্তু আজ বাকী রাতটুকু তুমি সুখী কর। ভোরের দিকে ওরা তোমায় ঘরে রেখে আসবে। কেউ কিছু জানবে না। গ্রামে তুমি যেই সতী সেই সতীই থাকবে; কোন কলঙ্কই তোমার রটবে না।"

আর কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া সুখময় তাহার হাত ধরিয়া বুকের দিকে টানিতে লাগিল। অসহায়া মালতী মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে সজল চোখে তাহার নিকট করুণা যাচ্ঞা করিতে লাগিল। আমি ভয়ে ভয়ে মালতীকে আরও জড়াইয়া ধরিতে লাগিলাম।

সুখময়ের মন কিন্তু একটুও ভিজিল না; বিপুল আবেগে সে তাহাকে পুনরায় আকর্ষণ করিতে লাগিল।

মালতী একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল। উদ্ধারের কোন উপায়ই সে করিতে পারিল না।

সুখময় মালতীর মুখখানিকে সম্মুখদিকে টানিতে চেষ্টা করিতেই, এক আসুরিক শক্তিতে সে বলবতী হইয়া উঠিল। সুখময়ের বাহুপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। হাতের কাছে খালি সোডার বোতলটা দেখিয়া সহসা সে সেইটা তুলিয়া লইল এবং সজোরে তাহা জমিদার-পুত্রের মস্তকে আঘাত করিল।

মাথা ফাটিয়া ঝরঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। সুখময়ের দেহ শিথিল হইয়া গেল। একটা করুণ আর্ত্তনাদের সহিত তাহার চৈতন্য লোপ হইল।

মালতী থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

গোলমাল শুনিয়া বন্ধুর দল ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ছাদ হইতে নীচে নামিয়া আসিল।

তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই

অদূরে শব্দ হইল—'ঝুপ'। পরক্ষণেই মালতীকে আর কেহই দেখিতে পাইল না।

আমি কল্পনায় দেখিলাম,—এমন মধু-রজনী বৃথায় গেল ভাবিয়া বন্ধুর দল কিরূপ ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে!

ভীষণা পদ্মা তেমনই বেগে কলস্বরে বহিয়া চলিতে লাগিল।

সপ্তমীর প্রভাত। পূর্ব্বদিক আলো করিয়া তরুণ অরুণ হাসিয়া উঠিয়াছে।

পদ্মার বাঁকটা ঘুরিয়া যেখানে খালের মোহনার সহিত মিশিয়াছে, সেখানে জাল ফেলিয়া কে মাছ ধরিতেছিল। সহসা ভারি কোন একটা বস্তুর স্পর্শে সে তাড়াতাড়ি জাল তুলিয়া ফেলিল। বোধ হয় মনে মনে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল,—খুব বড় মাছ পড়িয়াছে ভাবিয়া! সেটাকে নৌকায় ফেলিয়াই কিন্তু তাহার বুকের ভিতরটা কেমন কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি নিকটে গিয়া আমাকে দেখিয়াই সে চিনিল। আমিও যেন একেবারে উন্মাদ হইয়া গেলাম। এ কি বংশীধর যে! বংশী দেখিল,—তাহার বড় আদরের মালতীর প্রাণহীন দেহ! সে সমস্ত ঘটনা বুঝিয়া উঠিতে বৃথা চেষ্টা করিয়া আর্ত্তস্বরে 'মালতী মালতী' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তারপর উদাস প্রাণে, মালতীর দিকে সে কাতর-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া তাহার প্রিয়তমার সিক্তদেহ আরও সিক্ত করিয়া দিল। জীবিতের সহিত মৃত প্রেমিকার আবার মিলন হইল;—কেহ তাহাদের বিচ্ছেদ করিতে পারিল না!

হায় রে অদৃষ্ট, আমি তখনও সেই কমনীয় তনুলতাকে বেষ্টন করিয়া আছি!



হিতৈষী

শ্রী মন্মথনাথ ঘোষ, এম-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর-ই-এস্

(১)



সেদিন একাউন্টাণ্ট জেনারেলের অফিসের টিফিন-ঘরে প্রমথ ও কুঞ্জর রীতিমত হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়াছিল। নূতন কিছুই নহে। সাহিত্য-সম্পর্কীয় জটিল প্রশ্ন সমূহ,—বিশ্বসাহিত্যে নরেশচন্দ্রের দান, চারুচন্দ্রের মৌলিকতা, রবীন্দ্রনাথ বড় না বুদ্ধদেব বড়, সতীত্ব বড় না নারীত্ব বড়, ইত্যাকার প্রশ্ন লইয়া উভয়ের প্রতিদিনই তর্ক চলিত। যেমন দুই জন দাবাবড়ে খেলিতে বসিলে, প্রত্যেক দলে দশ-বারজন পরামর্শদাতা জুটিয়া যায়, ইহাদেরও পক্ষ হইয়া যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বহু ব্যক্তি বিনামূল্যে পরামর্শ দান করিয়া উভয় পক্ষকে যথাসম্ভব উত্তেজিত করিয়া তুলিতেন। সেদিন উত্তেজনার মাত্রা কিছু অধিক হইয়াছিল। কুঞ্জ চিরদিনই রক্ষণশীল ; প্রমথ তরুণ-সাহিত্যের পক্ষপাতী। প্রমথর মতে যদি কোন ষাট বৎসরের বৃদ্ধ পঞ্চদশীর পাণিগ্রহণ করে এবং সেই পঞ্চদশী যদি তাহার নারীত্বের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য কোনও তরুণের প্রণয়-প্রার্থিনী হয়, তাহাতে কিছুই দোষ নাই। কুঞ্জ এরূপ কল্পনাকেও মনে স্থান দেওয়া মহাপাপ বলিয়া মনে করে। সেদিন এই প্রশ্ন লইয়াই তুমুল তর্ক উঠিয়াছিল। যাঁহারা মনে করেন যে, একাউন্ট্যাণ্ট জেনারেলের অফিসের কেরাণীরা অতি নিরীহ জীব, তাঁহারা কেবল টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাব করিবার যন্ত্র মাত্র, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। ইঁহারা সকল বিষয়েই পারদর্শী। কেহ কেহ ফুটবল খেলা, কেহ কেহ থিয়েটার সিনেমার সমালোচনায় সিদ্ধহস্ত। অনেকে স্বয়ং অভিনয়াদি করিতে সুপটু - সুযোগ পাইলে প্রত্যেকে দানীবাবু বা শিশির ভাদুড়ী হইতে পারিতেন। রাজনীতির জ্ঞানে ইঁহারা অনেকেই নবীনভাধিষ্ঠিত বড়লাট বা সেক্রেটারী অব ষ্টেটকে সুপরামর্শ দিতে পারেন। ইঁহাদের পরামর্শানুসারে চলিলে বোধ হয় ভারতবর্ষ আরও সুশাসিত হইত। ইঁহাদের মধ্যে কবি অনেক আছেন, নীরব কবির সংখ্যাও কম নহে। সুতরাং ইঁহাদের মধ্যে যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সমালোচকের উদ্ভব হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি ?

তর্কের মুখে কুঞ্জ বলিয়া উঠিল "আজিকালিকার তরুণ সাহিত্য পড়িয়াই তোমাদের এইরূপ মনের বিকৃতি ঘটিতেছে, এবং সীতা-সাবিত্রীর দেশে তথাকথিত শিক্ষিতা রমণীদের মধ্যেও কেহ কেহ ব্যভিচারের স্রোতে আপনাদিগকে ভাসাইয়া চলিয়াছে।"

তরুণ-সাহিত্যের পক্ষপাতী প্রমথও তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল যে, "যদি একখানি বই পড়িলে কাহারও সতীধর্মে জলাঞ্জলি দিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সেরূপ সতীধর্মের বড়াই না করাই ভাল !"

তর্কটি হাতাহাতিতে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই রণভঙ্গ করিল,—চাপরাসী স্বরথনাথ। সে অতি অসময়েই আসিয়া খবর দিল যে, সেক্সনে বহুক্ষণ অনুপস্থিত থাকায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন এবং কুঞ্জবাবুকে 'সেলাম' দিয়াছেন। কুঞ্জ নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তর্কযুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া নিজের ডেস্কে আসিয়া বসিল এবং একটি অঙ্করি-

কেসে যথাসম্ভব মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

(২)

কাষটি সারিয়া যখন কুঞ্জ অফিস হইতে বাহির হইল, তখন রাত্রি হইয়াছে। সৌভাগ্য-বশতঃ শীঘ্রই সে একটি দ্বিতল বাস পাইল এবং একটু শীতল বাতাস পাইবে বলিয়া দ্বিতলে আপনার স্থান করিয়া লইল। বাটী ফিরিবার পথে তাহার একমাত্র চিন্তা হইল, আগামী কল্য প্রমথর যুক্তি নিরসনের জন্য কি কি অব্যর্থ বাণ সে নিক্ষেপ করিবে।

গাড়ী শ্যামবাজারের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এমন সময়ে কুঞ্জ দেখিল, তাহার পায়ের কাছে একটি লেফাফা মোড়া চিঠি কে ফেলিয়া গিয়াছে। উহার অধিকারীকে প্রতিপ্রেরণ করিবার জন্য সে পত্রখানি সযত্নে তুলিয়া পকেটে রাখিল; তাহার মনটা তখনও খুবই বিষণ্ণ হইয়াছে।

বাসায় আসিয়া মুখ হাত ধুইয়া সে ঘরের মধ্যে বিশ্রাম করিতে বসিল। তাহার পত্নী এক পেয়ালা গরম চা দিয়া গেল। কুঞ্জ চা খাইতে খাইতে বাসে কুড়াইয়া পাওয়া চিঠিখানি দেখিতে লাগিল। লেফাফার উপর কেবল পেলবকুমার রায়ের নাম লিখা আছে, কোনও ঠিকানা নাই। ভিতরে পেলবকুমারের বা পত্র-প্রেরকের ঠিকানা থাকিতে পারে মনে করিয়া কুঞ্জ পত্রখানি বাহির করিল। পত্রখানির উপর নেত্রপাত করিবামাত্র তাহার মুখের ভাবান্তর লক্ষিত হইল। সে পত্র-খানি পড়িয়া স্তম্ভিত হইল। পত্রখানি এইরূপ—

ভাই পেলব,

তোমাকে এত কোরেও বোঝাতে পারলুম না। রায়বাহাদুর গৃহিণী কৈশোরে তাঁর গৃহশিক্ষকের প্রেমে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর বাবা দরিদ্র গৃহ-শিক্ষকের হাতে মেয়েকে সমর্পণ না কোরে লক্ষ-পতি রায়বাহাদুর মনীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বে' দিলেন। রায়বাহাদুর বৃদ্ধ; কেবল দর্শনের ভারী ভারী বই লইয়া সময় কাটান। গৃহিণীর নারীত্ব ব্যর্থ হচ্চে। কতকগুলো কুসংস্কারান্ধ লোকের তৈরী বিধান মেনে নিয়ে একটা জীবন ব্যর্থ কোরবে? তুমি বোলবে তাদের একটি ছেলে আছে, ছেলেটাকে কি কোরবে? তোমাকে কত বার বোঝাব যে, নারীত্বের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য রাধার মতো সব ত্যাগ কোরতে হবে। তোমার মনে পড়ে কি, 'রুচিসঙ্ঘে' আমি 'পাষাণী'র আলোচনায় বলেছিলুম যে, যেখানে অহল্যা প্রণয়ীর সঙ্গে নীরবে গৃহত্যাগের অন্তরায় বলে তার পুত্র শতানন্দের গলা টিপে মারছে, সেইখানে কবি তাঁর প্রতিভার চূড়ান্ত নিদর্শন দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, সতীত্ব দূরের কথা, মাতৃত্বের চেয়েও নারীত্ব বড়। আশা করি তুমি আর বৃথা কালবিলম্ব না কোরে আজ রাত্রেই বাড়ী গিয়ে রায়বাহাদুর গৃহিণীর গৃহত্যাগের ব্যবস্থা কোরবে। কাল সকালে আমরা তোমাকে অভিনন্দন জানাতে যাবো। তোমার সাফল্য কামনা করি।

তোমার মুকুল

কি ভয়ানক ষড়যন্ত্র! হউন রায়বাহাদুর বৃদ্ধ, হউন তিনি দার্শনিক, তাই বলিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে কুলত্যাগিনী করাইতে হইবে? আবার বলে, তরুণ-সাহিত্য পড়িয়া পাপের বৃদ্ধি হইতেছে না। যে কোন উপায়ে হউক এ ষড়যন্ত্র বিফল করিতে হইবে; রমণীর সতীত্ব রক্ষা করিতে হইবে। তাঁহার নিরীহ উচ্চপদস্থ স্বামীর মাথা যাহাতে হেঁট না হয় তাহা করিতেই হইবে। আজ রাত্রেই পাষণ্ডেরা কার্য্য সমাধা করিতে চায়। আর সময় নাই। কুঞ্জ তাড়াতাড়ি গায়ে চাদরটা জড়াইয়া লইল এবং জুতা পরিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার উদ্যোগ করিল। তাহার পত্নী আসিয়া অনুযোগ করিল, এত খাটিয়া আসিয়া আহার না করিয়া এতরাত্রে কোথাও যাওয়া উচিত নহে। কিন্তু কুঞ্জ দুই-চারিবার 'ভয়ানক বিপদ! ভয়ানক

বিপদ !' বলিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া পত্নীকে গৃহে রাখিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

(৩)

একাউন্টেন্ট জেনারেলের অফিসে কর্ম্ম করায় কুঞ্জ এটুকু জানিত যে, রায়বাহাদুরদের ঠিকানা 'সিভিল লিষ্টে'র পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়া থাকে। সে প্রথমেই নিকটস্থ এক উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী রাজ-কর্ম্মচারীর গৃহে সিভিল লিষ্টের অন্বেষণে গেল। পত্রে রায়বাহাদুরের উপাধির উল্লেখ ছিল না। সুতরাং সমস্ত রায়বাহাদুরদের নামগুলি পড়িয়া যাইতে হইল। অবশেষে একটি নাম পাইল। উহা হইতে ঠিকানা লইয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল,— ভবানীপুরে রায়বাহাদুরের বাড়ী।

অনেক ডাকাডাকির পর রায়বাহাদুরের গৃহের দ্বারবান দেখা দিল। জিজ্ঞাসায় কুঞ্জ জানিল যে রায়বাহাদুর আজিকালি প্রায়ই তাঁহার নবক্রীত বরাহনগরের বাড়ীতে থাকেন। তখন রাত্রি অধিক হইয়াছে। বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া কুঞ্জ তাড়াতাড়ি বাসে করিয়া বরাহনগরের দিকে ছুটিল। অনেক অনুসন্ধানের পর যখন সে বাগান বাড়ীতে পৌছিল, তখন রাত্রি প্রায় ১১টা।

এখানে বিস্তর ডাকাডাকির পর যদি বা দরোয়ানজী লগুড় হস্তে বাহির হইলেন, তিনি ত কিছুতেই রায়বাহাদুরকে ডাকিয়া দিতে রাজী নহেন। নিদ্রিত মনিবকে উঠাইতে কোন ভৃত্যেরই ভরসা হয় না। কুঞ্জ বারবার বলিতে লাগিল, "দরোয়ানজী" ভারি দরকার; বাবুকে শীঘ্র এক বার ডাকিয়া দাও।"

দরোয়ানজী বহুদিনের লোক। সে জানিত, এরূপ দীনবেশী ব্যক্তির ধনী রায়বাহাদুরের সহিত সাক্ষাতের একমাত্র প্রয়োজন থাকিতে পারে,—সুপারিস সংগ্রহ। সুতরাং কুঞ্জকে পরদিন প্রত্যুষে আসিতে বলিয়া নির্ব্বিকারভাবে চলিয়া গেল। হায়! সে কি বুঝিবে, কি ভয়ানক বিপদ হইতে তাহার প্রভুকে রক্ষা করিবার জন্য কুঞ্জ ছুটাছুটি করিয়া এই রাত্রে সাড়ে ছয় টাকা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া এখানে আসিয়াছে!

অবশেষে কুঞ্জ স্বয়ং চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল, "রায়বাহাদুর, রায়বাহাদুর, শীঘ্র আসুন, ভয়ানক বিপদ।"

কিয়ৎক্ষণ ডাকাডাকির পর রায়বাহাদুর বারাণ্ডা হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে ?"

কুঞ্জ বলিল, "আমাকে চিনিবেন না। দয়া করিয়া শীঘ্র নামিয়া আসুন; আপনার ভয়ানক বিপদ!"

বরাহনগরে কিছুদিন চোরের উপদ্রব হওয়ায় রায়বাহাদুর একটি পিস্তল শয়নকক্ষে রাখিতেন। সেইটী হাতে করিয়া তিনি নীচে নামিয়া গেলেন। বাহিরের একটি ঘরে কুঞ্জকে বসাইলে সে ভাল করিয়া রায়বাহাদুরকে দেখিল। রায়-বাহাদুর বৃদ্ধ হইয়াছেন বটে; মাথায় টাক পড়িয়াছে, দেখিতে সুশ্রী নহেন। তাহা হইলেও, এবং বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা সম্বন্ধে নানা প্রবাদ থাকিলেও কোনও হিন্দুনারীর কি এই অপরাধে কুলত্যাগ করা উচিত? রায়বাহাদুর সাহেবী কায়দায় থাকেন বটে, কিন্তু ব্যবহারে ও কথা-বার্ত্তায় সম্পূর্ণ স্বদেশী বলিয়াই মনে হয়।

পিস্তলটী দেখিয়া কুঞ্জর গোবিন্দলাল ও রোহিণীর কথা মনে পড়িল। সে বলিল, মহাশয়, আপনি পিস্তলটি ডেস্কে বন্ধ করিয়া রাখুন। পিস্তলের কোন আবশ্যক নাই।

রায়বাহাদুর মৃদু হাসিয়া পিস্তলটী ড্রয়ারে তুলিয়া রাখিয়া কুঞ্জর সঙ্গে কথোকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

"আপনার নাম?"

"আমার নাম কুঞ্জ, একাউণ্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে কর্ম্ম করি। মহাশয়ের নামই ত রায়-বাহাদুর মনীশবাবু—"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"আমার প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন। আপনি জানেন না, আপনি এক মহা বিপদে পড়িয়াছেন। আপনার বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর চক্রান্ত হইতেছে। আপনাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, যদি কোন দোষ গ্রহণ না করিয়া প্রকৃত উত্তর দেন, তাহা হইলে হয় ত আমি আপনাকে এ বিপদ হইতে কোনওরূপে উদ্ধার করিতে পারি।"

"বলুন।"

"আপনার সহধর্ম্মিণী জীবিতা?"

"হাঁ।"

"আপনার পুত্র আছে?"

"হাঁ, আছে বৈ কি।"

"আপনি কি দর্শনের গ্রন্থ পাঠ করিতে বড় ভালবাসেন?"

"তা' কিছু কিছু পড়ি; না স্বীকার করিলে মিথ্যা বলা হইবে।"

"আচ্ছা, আপনার সহধর্ম্মিণী কি এখন এই বাড়ীতেই আছেন"

"আছেন বৈ কি।"

এই কথায় কুঞ্জ কিছু আশ্বস্ত হইল। তাহার পর সে পুনরায় প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, আপনার—আপনার স্ত্রী কি পিতৃগৃহে কোন গৃহ-শিক্ষকের নিকট লেখাপড়া শিখেন। তাঁহার নাম-ধাম বলিতে পারেন?"

"শিক্ষকের নাম-ধাম ত জানি না। তবে আমার স্ত্রী জান্‌তে পারেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।"—এই বলিয়া রায়বাহাদুর উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'সুরেন, তোমার মা'কে একবার ডেকে দাও ত?' তাহার পর রায়বাহাদুর কুঞ্জকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, বিপদটা কি তা' ত ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করলেন না?"

কুঞ্জও ভাবিল, রায়বাহাদুরের তরুণী ভার্য্যা আসিবার পূর্ব্বেই বিপদের আভাসটা রায়বাহাদুরকে গোপনে জানান উচিত বিবেচনা করিল। সে ধীরে ধীরে পকেট হইতে কুড়ানো চিঠিটি বাহির করিয়া রায়বাহাদুরের হস্তে দিয়া বলিল, "এই চিঠিখানি পড়িয়া দেখুন। আর কিছু বলা আমার আবশ্যক নাই।"

রায়বাহাদুর চস্‌মা আঁটিয়া চিঠিটী আদ্যন্ত পড়িলেন। পড়িয়া হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ করিয়া এমন উচ্চরোলে হাসিতে লাগিলেন যে, কুঞ্জ তাঁহার গৃহিণীর গৃহে প্রবেশের কথা জানিতে পারিল না। রায়বাহাদুর যখন গৃহিণীর দিকে চাহিয়া "ওগো, ভয়ানক বিপদ, শোনো শোনো" বলিয়া আবার হাসিতে লাগিলেন, তখন কুঞ্জের দৃষ্টি দ্বার-সমীপস্থ এক বৃদ্ধার প্রতি নিপতিত হইল;—যাঁহার করুণা ও স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তি দেখিলেই ভক্তিতে হৃদয় অবনত হইয়া পড়ে। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার প্রৌঢ় পুত্র সুরেন্দ্র। সুরেন্দ্র রহস্য আবিষ্কার করিবার জন্য টেবিলের উপর হইতে চিঠিটী লইয়া পড়িতে লাগিল। রায়-বাহাদুর কুঞ্জকে বলিলেন, "আমার চির-তরুণী ভার্য্যাকে আপনার কি জিজ্ঞাসা করিবার আছে করুন?"

কুঞ্জ মস্তক অবনত করিয়া বলিল, "আমার কিছুই জিজ্ঞাস্য নাই। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। এ চিঠির রহস্য আমি কিছু বুঝিতে না পারিয়া ভাল সঙ্কল্প করিয়াই এখানে আসিয়াছিলাম, আশা করি, আমাকে আপনারা ভুল বুঝিবেন না। আপনাদের এই রাত্রে কত কষ্ট দিলাম তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। অফিস হইতে আসিবার সময় চিঠিটি কুড়াইয়া পাই; ভদ্রবংশের সম্ভ্রম নষ্ট হইতে পারে, এই ভয়ে আমি গৃহে জলগ্রহণ না করিয়া সন্ধ্যা হইতে ছুটাছুটী করিতেছি। আমার মাথা ঘুরিতেছে। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, আপনারা বিশ্রাম করুন, আমাকে বিদায় দিন।"

সুরেন্দ্র ততক্ষণে পত্রপাঠ সমাপ্ত করিয়াছেন।

তিনি বলিলেন, "কুঞ্জ-বাবু, যখন এত কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, তখন চিঠির রহস্যটীও জানিয়া যান। পেলব ও মুকুল দু'জনেই আমার ছাত্র। তাহারা উভয়েই তিন-চারিবৎসর হইল আই-এ পরীক্ষায় ফেল হইতেছে। তাহাদের ধারণা পরীক্ষকগণ তাহাদের মৌলিকত্ব ও প্রতিভার প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাহাদিগকে ফেল করেন। দুজনেই ব্যাক বেঞ্চে বসিয়া তরুণ-সাহিত্য ও অশ্লীল উপন্যাসাদি পাঠ করে। সম্প্রতি তাহাদের গ্রন্থকার হইবার সাধ হইয়াছে। শুনিয়াছি, পেলব একখানি উপন্যাস লিখিতেছে, এবং মুকুল ও অন্যান্য বন্ধুরা এক এক পরিচ্ছেদ লেখা হইলেই তাহার সংস্কার সম্বন্ধে পরামর্শ দেয়। আমার একটি জ্ঞাতিভ্রাতা ঐ ক্লাসে পড়ে ;— তাহার নিকটেই সব শুনিয়াছি। পত্রখানি গ্রন্থের নায়িকা সম্বন্ধে, কোনও জীবিত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত নহে।"

কুঞ্জ এতক্ষণে সব বুঝিতে পারিল। সে কর-যোড়ে পুনরায় ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বাটী ফিরিবার জন্য উঠিল। রায়বাহাদুর বলিলেন, "এখন ত এত রাত্রে গাড়ী পাওয়া যাইবে না। বসুন, আমার মোটরটা আনিতে বলি।" গৃহিণী বলি-লেন, "তুমি বেশ লোক ত, ভদ্রলোক অফিস থেকে এসে জলগ্রহণ না করে ছুটাছুটী করিতে-ছেন, তাঁহাকে একটু জলও না খাওয়াইয়া তোমরা বিদায় দিচ্ছ।"

বলা বাহুল্য, রায়বাহাদুরের গৃহে রীতিমত জলযোগ না করিয়া কুঞ্জ তাহার আগমনাশায় প্রতীক্ষমাণা উৎকণ্ঠিতা সহধর্ম্মিণীর নিকট ফিরিয়া আসিতে পারিল না।





আহুতি

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ, বি-এ

এক

জগদীশ ডেলী প্যাসেঞ্জার। সকাল আটটায় মাথায় একঘটী জল ঢালিয়া 'অবগাহন স্নান' সারে। খাইয়া আটটা আটত্রিশের গাড়ী ধরে নিয়মিত অফিস যায়, কাজ করে এবং ছয়টা বিয়াল্লিশের গাড়ী ধরিয়া বাড়ী ফিরে,—পরের দিনের বাজার লইয়া। নিত্য ত্রিশদিন তাহার একরকমই ঘড়িধরা কাজ—ক্রমাগত সাত বৎসর এমনই চলিয়া আসিতেছে।

বয়স তাহার বেশী হয় নাই; ত্রিশ পূর্ণ হইতে এখনও তিন-চারিবৎসর বোধ হয় বাকী। কিন্তু ভাল ছেলে—বয়স কুড়ি না হইতেই বি-এ ফেল করিয়া 'গেরেস্ত' এবং 'হিসেবী'; আর বর্ত্তমানে পূর্ণমাত্রায় সংসারী হইয়া পড়িয়াছে। সংসারে এক সময়ে ছিল তিনজন,—বাপ, মা ও জগদীশ। বাপ মরিয়া চাকুরী দিয়া গিয়াছেন, আর মা মরিবার পূর্ব্বেই এক জগদীশকে দুই করিয়া বোধ করি মনের সুখেই চোখ বুজিয়াছেন। এখন জগদীশেরা দুইজনে বহু হইয়াছে এবং এই বহু-বচনের সংখ্যা আপাতত ছয়বৎসরে পাঁচটী হইতে চলিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালীর ছেলের যাহা কাম্য, জগদীশ প্রায় সবই গুছাইয়া লইয়াছে; এখন এইভাবে কিছু দিন কাটিয়া গেলেই একরকম ওর নাম কি সবই হইল।

কিন্তু এহেন আতব-বাঙ্গালীর জীবনের গোপন কোণে যে আবার বৈচিত্র্যও থাকিতে পারে, তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না। তাহা না হোক, ক্ষতি নাই, বৈচিত্র্য একটুখানি ছিল। আজ মাসখানেক জগদীশের বাড়ী ফিরিতে ঘণ্টা দুই দেরী হইয়া যাইতেছে এবং পত্নীর সোৎকণ্ঠ প্রশ্নের উত্তরে মাত্র জানাইয়া দিয়াছে, এখন হইতে দেরীটুকু হইবেই। দেরী যখন হইবেই, তখন 'কেন' জিজ্ঞাসা করিয়া কোন ফল নাই; তা ছাড়া, সারাদিন গৃহস্থালীর কাজ কাজ করিয়া আর ছেলে ঠেঙ্গাইয়া দেহ ও মনের অবস্থা যেরূপ তাহাতে একমাত্র ঘুমছাড়া নিরুপমার কাছে আর কেহ ঘেঁসিতে পারিত না। সুতরাং স্বামীকে খাওয়াইয়া এবং নিজে স্বামীর পাতে প্রসাদ পাইয়া কতক্ষণে শয্যাশ্রয় করিবে, নিরুপমার মন থাকিত সেইদিকে; অভিমান অভিযোগের কথা তাহার মনেই আসিত না। জগদীশকেও আবার আটটায় প্রস্তুত হইতে হইবে; আর তৎপূর্ব্বেই নিরুপমাকে তাহার প্রস্তুতের জোগাড় করিতে হইবে বলিয়া উভয়েই নিতান্ত ঘর সংসারের দুই-একটা কথামাত্র আলোচনা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িত। পরস্পরের প্রশ্নোত্তরের সময় তাহাদের ঘটিয়া উঠিত না।

কিছুদিন পরেই বহুবচনের সংখ্যা পাঁচ হইল ; আর সেই উপলক্ষে জগদীশের সংসারের খবর -দারী করিবার উদ্দেশ্যে দূর-সম্পর্কীয়া পিসীমাকে আসিতে হইল। পূর্ব্বেও তিনি একই উদ্দেশ্যে আরও দুইবার আসিয়া জগদীশের গৃহস্থালীর সাময়িক ভার লইয়াছেন এবং নিরুপমা একটু চাঙ্গা হইলেই ফিরিতে বাধ্য হইয়াছেন। এবার তাঁহাকে আর ফিরিয়া যাইতে হইল না ; কারণ, যেখানে এতদিন তিনি ছিলেন, সেখানে থাকিতে গেলে মরিয়া থাকা ভিন্ন গতি নাই, আর জগদীশেরও বিশেষ কারণে কলিকাতায় না থাকিলে চলে না, ফলে পিসীমা নিজের গরজ ও জগদীশের গরজ এই উভয় গরজে বাধ্য হইয়া জগদীশের ও নিরুপমার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া সেই খানেই কায়েম হইলেন।

জগদীশের কলিকাতায় থাকার এমন জরুরী প্রয়োজন যে কি, তাহা লইয়া মাথা ঘামানর সময় তখন নিরুপমা বা পিসীমার নাই। প্রয়োজন যখন নিতান্তই জরুরী তখন তাহার গুরুত্ব লইয়া মনে সন্দেহ জাগিলেও মুখে তাহা প্রকাশ করা চলে না। নিরুপমা শুধু জিজ্ঞাসা করিল—"মাঝে মাঝে আসবে ত ?"

জগদীশ হাসিয়া জবাব দিয়াছিল-

শনিবার আসব ; রবিবার থেকে সোমবারে আবার যেতে হবে।"

কিন্তু কথাটা এমন বিশ্রী করে জিজ্ঞেস করলে কেন গো ?"

নিরুপমা না হয় পাঁচটী ছেলের মা হইয়াছে তা বলিয়া বয়স তার মোটে বাইশ। চোখ ছলছল করিয়া সে বলিল—"বা রে! একলা থাকতে কষ্ট হয় না ? তা' ছাড়া, অসুখ-বিসুখ আছে, আরও কত কি হতে পারে, তাই বলছি।"

জগদীশ এক মাসের ছেলেটাকে নিরুপমার কোল হইতে তুলিয়া লইয়া তাহাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"দূরে দূরে থাকাই কিছুদিন···।"

নিরুপমা তাহাকে কথাটা শেষ করিতে দিল না ; বলিল—"যাও ও সব ভগবানের হাত। নইলে কত লোকের ত বছরে একমাস কি পনের দিন ছুটী, কই তাদেরও ত আমাদেরই মত। ও কথা থাক ; এসব ছেলে-পুলে নিয়ে একলা থাকব, কবে সেই শনিবার আসবে তার জন্যে।"

নিরুপমার চোখে জল আসিল।

জগদীশ তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিল—"আচ্ছা, মাঝে না হয় আর একদিন আসব। কেমন, এবার হলো ত ?" হইল বটে, কিন্তু ওই হওয়ার মধ্যে যে কতখানি না হওয়া লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহার হিসাব ত প্রয়োজন শুনিবে না।

জগদীশ পাঁচটী ছেলে এবং তাহাদের মায়ের ভার বৃদ্ধা পিসীমার হাতে দিয়া একদিন কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল ; কিন্তু মেসে উঠিল না।

দুই

জগদীশ কলিকাতায় কোন মেসে না উঠিয়া কোথায় বাসা বাঁধিল, তাহা লইয়া নিরুপমা কোন আলোচনা করিবার আবশ্যক বোধ করে নাই ; কারণ, স্বামীর কলিকাতায় থাকা একান্ত আবশ্যক। সে সেইটুকু জানিয়াই আশ্বস্ত। জগদীশ কলিকাতায় কোথায় থাকিবে—এবং এই কলিকাতা সহরটীতে থাকার কি প্রকারের বন্দোবস্ত, এমন কি কলিকাতা নামক স্থানটীর কি অবস্থা, নিরুপমা পল্লীগ্রামের মেয়ে তাহার কোন সংবাদই রাখে না। তাহার জ্ঞান হওয়ার পর হইতে, সে তাহার পিতার গ্রামের এবং বিবাহের পর স্বামীর গ্রামের প্রায় সকলকেই ঐ একটী স্থানে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টায় কোন না কোন অফিসে যাইতে দেখিয়া আসিতেছে। অফিস, স্কুল এবং হাসপাতাল, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর আর মা গঙ্গা এমনই গোটাকয়েক প্রধান প্রধান বিষয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোক মুখে শুনিয়া একটা মোটামুটী ধারণা সে করিয়া রাখিয়াছিল। ইহার অধিক কিছু

তাহার জ্ঞানের বাহিরে। সুতরাং স্বামী সেখানে কোথায় থাকে, তাহা জানিবার আগ্রহ হইলেও নিজের অজ্ঞতার ফলে কোথায় ভুল করিয়া বসিয়া হাস্যাস্পদ হইবার লজ্জায় জগদীশকে সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পায় নাই। তা' ছাড়া জগদীশ প্রতি শনিবার ত আসেই, কোন কোন সপ্তাহে মাঝে আরও একদিন আসিয়া প্রতিশ্রুতি পালন করে। কাজেই সেখানে থাকিয়া জগদীশ কি করিতেছে, তাহা লইয়া নিরুপমা একটুও ভাবে নাই।

কিন্তু মাস দুয়েক যাইতে না যাইতেই লোক মুখে কলিকাতায় স্বামীর গতিবিধি সম্বন্ধে কেমন একটা সন্দেহজনক 'কাণাঘুষা' নিরুপমা শুনিল। কিছুদিন পরে গোপন কথা লইয়া প্রকাশ্যে আলোচনা এবং তৎপরে গ্রামের অনেকেরই মুখে জগদীশ সম্বন্ধে যে কথা শুনিল, তাহা কোন নারী স্বামীর সম্বন্ধে শুনিয়া বুক বাঁধিয়া থাকিতে পারে না। নিরুপমারও সহ্য হইল না। সে কাঁদিল; যে সর্ব্বনাশী তাহাকে বুকের ধন হইতে বঞ্চিত করিতে বসিয়াছে,—তাহার বাছাদের কাঙাল করিবার ফিকিরে রহিয়াছে, তাহার মুণ্ডপাত করিয়া অবশেষে স্বামীকে অবিলম্বে বাড়ী আসিবার জন্য পত্র লিখিয়া নিদারুণ উৎকণ্ঠায় স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

গভীর রাত্রিতে জগদীশ বাড়ী আসিয়া দেখিল,—বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ কয়েক বৎসরের মধ্যে যাহা কোনদিন ঘটে নাই, আজ তাহাই ঘটিয়াছে—অর্থাৎ নিরুপমা সমস্তদিন অনাহারে থাকিয়া পিসীমা আর ছেলে মেয়ে কয়টী লইয়া তাহারই পথ চাহিয়া বসিয়া। অসময়ে অফিসে চিঠি পাইয়া যেরূপ উৎকণ্ঠা লইয়া বেচারা গ্রামে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছে, বাড়ী পৌঁছিয়া সকলেরই কুশল দেখার ফলে তাহার ভাবনা দূর হইল; কিন্তু তাহার রাগ হইল অসাধারণ। অকারণ তাহাকে এমন উত্যক্ত করিয়া নিরুপমার লজ্জাংশ কতখানি, কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে যাইয়া প্রশ্নের পরিবর্ত্তে তাহাকে উত্তর দিতে হইল।

নিরুপমা স্বামীকে কথা বলিবার অবসর না দিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—"ওখানকার বাসা তুলে দিয়ে এসেছ ত ?"

জগদীশ রোষের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কেন বল দেখি ?"

"ওখানে তোমার আর থাকা চলবে না।"

জগদীশ ধমক দিয়া বলিল—"তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে; কি সব বাজে বকছ ?"

নিরুপমা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—"না, কাল থেকে তোমায় আগের মত বাড়ী থেকে অফিস করতে হবে। নইলে আমি গলায় দড়ি দেব, এই তোমায় জানিয়ে রাখ্‌লাম।"

"তুমি ত বলে রাখ্‌লে—আর হয় ত কাজেও তা করিয়ে ফেল্‌বে;—কিন্তু কেন যে অতবড় কাজটা তোমাকে করতে হবে, সেইটে আমায় জানিয়ে, গলায় দড়ি দেওয়াটা কিছুদিন পরে হলেও মোটেই লোকসান হ'ত না। কিন্তু আমার বাসা না ছাড়ার সঙ্গে গলায় দড়ির এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটা হ'ল কত দিন ?"

পিসীমা বোধ করি মালা হাতে করিয়া নাক দিয়া ইষ্টদেবতাকে ডাকিতেছিলেন। জগদীশের আগমন হইতে নিরুপমার গলায় দড়ি দেওয়ার প্রস্তাব অবধি তাহার কাণে যায় নাই। কিন্তু হঠাৎ ঘুমের ঘোরে মাথাটা দেওয়ালে একটু জোরে ঠুকিয়া যাওয়ায় জগদীশের শেষ কথাটা শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"তা বাছা, মেয়েমানুষেরও দুঃখ-কষ্ট আছে ত; পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে, তাই বোমার—"

পিসীমা পুনরায় হরিনাম সুরু করিলেন।

"তা বেশ্। কিন্তু কাজটা না হয় দু'দিন পরে করতে বোলো—তবে আমায় শীগ্‌গির বাড়ী আসা হতে পারে না; কেন, সে কথা বল্‌বার এখনও

সময় হয় নি। হলে তোমরা ও জানতে পারবে। এখন আমার আর জ্বালাতন করো না।"

নিরুপমা এবার উঠিয়া জগদীশের খাবারের বন্দোবস্ত করিতে গেল। জগদীশ আফিসের পোষাকেই শয্যা আশ্রয় করিল।

তিন

সে কথা জগদীশকে সেদিন বলিতে হইল না; কারণ, গলায় দড়ী দেওয়ার ভয় দেখানর পরেও যে কোন স্বামী স্ত্রীর কথা না শুনিয়া স্বেচ্ছায় কাজ করিয়া যাইতে পারে, এ অভিজ্ঞতা পাঁচ ছেলের মা হইয়াও নিরুপমা সঞ্চয় করিতে পারে নাই। ফলে সে নিশ্চিন্ত মনে স্বামীর পাশে শুইয়া নিদ্রা দিয়াছে।

বোধ করি সে রাত্রিটা নিরুপমার এক ঘুমেই কাটিয়া যাইত, কিন্তু ছেলের মায়ের পক্ষে এক ঘুমে কেন জাগিয়া রাত কাটানও বিস্ময়ের বিষয় নহে। হঠাৎ ছেলের কান্নার ঘুম ভাঙিয়া যাওয়াতে সে উঠিয়া দেখিল, জগদীশ ঘরে নাই। অথচ এত ভোরে শয্যা ত্যাগ করা স্বামীর অভ্যাসও নহে। অভ্যাস না হইলেও যে এক-আধ দিন সকাল সকাল কেহ ঘুম হইতে উঠিবে না, এমন কোন আইন নাই। নিরুপমা যে বিষয়টা ভাবিয়া দেখিবে, সে অবস্থাও তখন নহে; কারণ, ছেলের কান্না ক্রমেই 'ভুনে' চড়িতেছে। নিরুপমাকে বাধ্য হইয়া ছেলের বাপের চিন্তা মুলতুবী রাখিয়া ছেলে লইয়া ব্যস্ত হইতে হইল। কিন্তু এত ভোরে উঠিয়া স্বামী কোন্ মহাকার্য্য সাধনে প্রস্থান করিলেন, বুঝিতে না পারিয়া মনটা কেমন খচ্ খচ্ করিতে লাগিল।

ছেলে ঠাণ্ডা করিয়া নিরুপমা বাহিরে আসিল পিসীমা তখন স্নান সারিয়া বোধ করি জগদীশের অফিসের ভাতের যোগাড় করিতে চলিয়াছেন। নিরুপমার সহিত চোখোচোখী হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"অত ভোরে জগু কোথায় গেল বৌমা।"

নিরুপমার রাগ হইল—সে জানে না,—কখন জগদীশ উঠিয়া গিয়াছে; অথচ, এই বুড়ী তাহাকে যাইতে দেখিয়াও জিজ্ঞাসা করিল না, সে কোথায় যাইতেছে। সে বলিল—"কখন উঠে গেছে আমি জানি না—তুমি দেখ্‌লে ত জিজ্ঞেস কর্‌লে না কেন?"

পিসীমা বধূর কণ্ঠের ঝাঁঝ দেখিয়া কুপিত হইলেন; কিন্তু গলগ্রহের পক্ষে গৃহকর্ত্রীর কটু কথায় রাগ হইলেও তাহা প্রকাশ করা কিংবা পাল্টা রাগ করা সুবিবেচনার কাজ নহে। সুতরাং নীরবে থাকাই বিধি। কিন্তু তিনি পিসীমা, গুরুজন, সে জ্ঞান তাঁহার পুরা মাত্রায় বিদ্যমান। ফলে অর্দ্ধস্বগতঃ কণ্ঠে বলিলেন—"আমি ত আর জোর করে তার কাছ থেকে জবাব আদায় কর্‌তে পারিনে মা—জিজ্ঞেস করলাম—গটমট্ করে চলে গেল। কিন্তু সারারাত বসে থেকে ঘুমিয়ে কাটালে কি আর কিছু জানা যায়।"

পিসীমা রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন।

নিরুপমা সেইখানে দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা একবার ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া বুঝিল,—জগদীশের এই প্রস্থান সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া কিছু স্থির করা তাহার দাম্পত্য জীবনের এলাকার বাহিরে। তবে তাহার ও পোনে ষোল আনা স্ত্রীলোকের এই ক্ষেত্রে যাহা করিবার আছে, সে সেইটুকু মাত্র করিতে পারে—আর এই পারাতে কিছুমাত্র পরিশ্রম করিতে হয় না। নিরুপমা তাহাই করিল; অর্থাৎ, ক্রোধ যাহার উপরেই হোক্, হাতের কাছে ছেলে থাকিলে মায়ের পক্ষে ক্রোধ শান্তির প্রধান উপায় ছেলে ঠেঙান। নিরুপমা একটানে বড় ছেলেটাকে বিছানা হইতে তুলিয়া গোটাকয়েক চড় তাহার গালে বসাইয়া দিয়া বলিল—"ওরে ঘুমুর বুড়ো হাতী!" যেন স্বামীর নীরব প্রস্থানের জন্য এই ছেলেটাই দায়ী।

জগদীশ সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া ভাবিয়া

দে খল,—যে রক্ত
কলিকাতার বাস ক
নিরুপমাকে এখন ব
অথচ, না বলিয়া
সুতরাং নিরুপমার
করাই সুযুক্তি।

কিন্তু জগদীশে
মানিবার কথা নহে,
চারিটার গাড়ী ধ
ঘণ্টা পূর্ব্বে সে গাড়ী
ফিরিতে হইল। f
খেলার পরে সে
মুখ দেখাইবে, ত
বাড়ী ফিরল এবং
দেখাইতেও হইল।

স্বামীকে ফিরিয়া
বুক হইতে একটা গু
অতি তুচ্ছ কারণেও
শাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট বি
নিরুপমার বুকের খা৷ল জায়গাটা জুড়িয়া বসিল। ফলে স্বামী স্ত্রীতে দেখা হইলেও কোন কথা হইল না। বহুদিন পরে, জগদীশকে এমন সময়ে ঘরে দেখিয়া ছেলেগুলা একবার কাছে যাইবার চেষ্টা করিয়া দেখিল, সেদিন পিতার গাম্ভীর্য্য পাঠশালার গুরুমহাশয়ের চাইতেও বেশী ছাড়া কম নহে। কোলের উপরেরটার মাত্র এক বৎসর কয়েক মাস বয়স; সে পিতার গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি মানসিক বৃত্তির সংবাদ তখনও ভালরকম আয়ত্ত করিতে পারে নাই। বেচারা অল্প কয়েকদিন মাত্র পা ফেলিতে শিখিয়াছে—তাই সেই নূতন শিক্ষাকেই অবলম্বন করিয়া অতি কষ্টে পিতার কাছাকাছি আসিতেই নিরুপমা তাহাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। জগদীশ যেন বাঁচিয়া গেল।

অবশ্য এখানে বাঁচিয়া যাওয়ার ফল যে ভবি-

যায় গিয়া দাঁড়াইতে পারে, সে কথা
খি.ল বোধ করি জগদীশ নিজে সাধিয়া
সহিত এই গোলমালটা মিটাইয়া
কিন্তু তাহা হইবার নয়। অফিস
ময় নিরুপমা কাছে আসিয়া অন্তদিকে
যাহা বলিল তাহাতে জগদীশ প্রায়
আসিয়াছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই
জরুরী তার আসিয়া সব গোলমাল
। তার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জগদীশের
র .য লেখা ফুটিয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া
াদ্বেগে জিজ্ঞাসা করিল—'তার এল
কে? অ্যাঁ—"
তখন জগদীশ আগড় পার হইয়া প্রায়
বেগে ষ্টেশন অভি.মুখে ছুটিয়াছে।

চার

।প্তাহ পরে যেদিন জগদীশ গ্রামে
দিন তাহার বেশ ও চেহারা দেখিয়া
হরিয়া উঠিল।
কাঁদিবার উদ্যোগ করিতে গিয়া
ধমক খাওয়া থামিয়া গেলেন। ছেলেরা ঘুমে; না হইলে হয় ত চেঁচামেচি করিয়া একটা তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া বসিত। জগদীশের মুখে একমুখ দাড়ী; কাপড়-জামা বোধ হয় পনের দিনের মধ্যে জলে পড়ে নাই। খালি পা, মাথার চুল তেল জলের অভাবে প্রায় জটা বাঁধিয়া গিয়াছে। মুখ-চোখের কথা না বলিলেও ক্রমাগত রাত্রি-জাগরণের ফলে যে বর্ত্তমান অবস্থায় পৌছিয়াছে, তাহা বুঝিতে বালকেরও বেশী ভাবিতে হয় না। জগদীশ কথা না বলিয়. জামাটা কোন রকমে টান মারিয়া খুলিয়া ফেলিয়া শুইয়া পড়িল। পিসীমা উপায়ান্তর না দেখিয়া তাক হইতে মালা তুলিয়া লইয়া নাম করিতে মনস্থ করিলেন। নিরুপমা যাইয়া স্বামীর পাশে বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। সাহস করিয়া সে অবস্থায় স্বামীকে কিছু জিজ্ঞাসা করা তাহার

ঘটিয়া উঠিল না। ধীরে ধীরে একখানি হাত স্বামীর গায়ে রাখিতেই জগদীশ সেই হাতখানি আপন বুকে রাখিয়া অতি কষ্টে যেন ক্রন্দনের বেগ রোধ করিবার চেষ্টা করিতেই নিরুপমা নীচু হইয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে ?"

জগদীশ নীরব; কিন্তু রুদ্ধ আবেগে বুক তাহার কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। আর একটু হইলেই যেন ভাঙ্গিয়া বাহির হইবে। নিরুপমার চোখে জল আসিল; সে কাঁদকাঁদ হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল —"কেন এমন করছ, আমার যে দম আটকে আসছে।"

জগদীশ একবারে ফাটিয়া পড়িয়া বলিল— "আজ সবই বলব নিরু; আজ আর লুকোবার কিছুই নেই। কিন্তু দুঃখ এই যে এমন রোগে পুরো একদিনও সে এক ফোঁটা অসুধ খেতে পায় নি।"

"সে আজ বারবৎসরের কথা। তখন আমি স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ি। বয়স মাত্র চৌদ্দ বৎসর। গ্রামে আজও স্কুল নাই, তখনও ছিল না। কোলকাতার স্কুলেই পড়তে হ'ত।

"সেদিন স্কুল থেকে বেরিয়ে দেখলাম, গাড়ী ছেড়ে গেছে; পরের গাড়ীর আড়াই ঘণ্টা দেরী। সে গাড়ী ধরবার জন্তে বসে থাকলে রাত বারটার আগে বাড়ী ফেরা হয় না। তাই ষ্টেসন থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়ালাম নৌকোর আশায়। তখনও নৌকো করে লোক অফিস যেত।

"কিন্তু সেদিন আমার ভাগ্যে নৌকোও তখন মিলল না। দেরী দেখে আমি জামা খুলে ঘাটের সিঁড়ির ওপর শুয়ে পড়ে কখন যে ঘুমিয়ে গেছি, তা বুঝতে পারি নি। ঘুম ভাঙল একজনের গলার আওয়াজে চোখ চেয়ে দেখি একটী বুড়ো লোক আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে। ঘুম ভাঙতে আমি উঠে বসলাম। সে ভদ্র-লোক আমায় বলতে অবসর না দিয়ে একেবারে আমার হাত দু'খানি ধরে ফেলে বললেন— 'আমাকে তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে যেতে হবে; কারণ, তিনি বড় বিপন্ন।'

"এই বিপন্ন কথাটার একটা মোহ আছে; আর সেই বয়সে কি জানি কেন ঐকথা শুনলে প্রাণটা কেমন করে উঠত। আমার মত একটী বালকের সাহায্য তিনি যে কোন বিপদ থেকে মুক্ত হবেন, তা বুঝে দেখবার মত বয়স তখন নয়; —তাঁর বিপদ, আর আমাকে তিনি সাহায্যের আশায় ডাকছেন, এইটুকু শুনেই তাঁর সঙ্গে চললাম।

"কিন্তু তখন যদি জানি যে, তাঁর বিপদ কি, তা' হ'লে আজ আমার এদশা হতো না। কিন্তু, যাক্ সে কথা। আমি তাঁর সঙ্গে চললুম। তখন রাত হয়েছে। বাড়ী যেতে হবে সে কথা আমার মনেই এল না।

"বড় রাস্তায় এসে একখানা গাড়ী ডেকে তাতে আমায় নিয়ে তিনি উঠে বসলেন। পথে বেশী কথা কিছু হলো না; শুধু আমার বাবা ও ঠাকুরদাদার নাম তিনি জেনে নিলেন।

"তাঁর বাড়ীতে গিয়ে কিছু ভাল করে বোঝবার আগেই আমাকে যেখানে বসিয়ে দেওয়া হ'ল, সেটা বরের আসন। আমি চমকে উঠলাম; কিন্তু শাঁকের ফুঁ আর গোলমালের মধ্যে যা হয়ে গেল,—সেটা বোধ করি বিয়ে। পরে শুনলাম, বর এসে কি গোলমাল হওয়ায় ফিরে গেছে; আর মেয়ের বাপ গঙ্গায় ডুবতে গিয়ে আমায় দেখতে পেয়ে তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে বিপদ থেকে মুক্ত হলেন; কিন্তু আমার করলেন সর্ব্বনাশ! আমি ভয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম নিরু; কিন্তু কিছুতেই বিয়ে আটকাল না। যার সঙ্গে বিয়ে হলো, তাকে একবার দেখেছিলাম—মনে হলো সে আমারই বয়সী; কিন্তু বড় সুন্দর;— এত সুন্দর যে আমি সেই অবস্থায়ও মুহূর্ত্তের জন্ত একবার খুসী হয়েছিলাম।

"সে রাত্রি কি ভাবে কেটেছিল, সে কথা গুছিয়ে বলবার আমার শক্তি নেই, আর মনেও নেই। শুধু শেষের দিকে যখন চলে আসব বলে উঠলাম, দেখি যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল সে আমার কোঁচার খুঁট শক্ত করে ধরে বসে। ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে বললে - 'এই রাত্রিতে একলা কোথায় যাবে? এখন যেও না।'

"আমি আবার শুয়ে পড়লাম; কেন না আমি সেখানকার পথ চিনি না—তা' ছাড়া সে আমাকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে দিলে না। দুঃখে, বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আমি তারই পাশে শুয়ে রইলাম। সে আমার চাইতে অনেক বেশী বুঝত তখন, তাই শুধু বললে—'কোন ভয় নেই তোমার; ভোরে উঠেই চলে যেয়ো।'

"আমি মুখ ফিরিয়ে দেখি, তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। কিন্তু সে চোখে জল দেখেও সেদিন আমার এতটুকু দুঃখ হয় নি। আমি তাকে কোন কথা না বলে পাশ ফিরে শুয়ে শুধু ভাবতে লাগলাম, কি উপায়ে এই ডাকাতদের হাত থেকে নিস্তার পাব?

"তারপর সেখান থেকে যে কেমন করে চলে এসেছিলাম, সে কথা আমার স্মরণই হয় না; কিন্তু এখনও তার সে সময়কার মুখখানি বেশ মনে আছে।"

এই অবধি বলিয়া জগদীশ একেবারে কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। নিরুপমা স্বামীর মাথাটা কোলের উপর টানিয়া লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পাঁচ

"বাড়ী এসে কি জবাব দেব ভেবে আমি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু কেন জানি না, আমাকে কোন কথাই কেউ জিজ্ঞাসা করলে না।

"তারপর এক রাত্রির সে ঘটনা মন থেকে ধুয়ে মুছে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ বছরখানেক আগে একদিন বাড়ী বসেই তার একখানা চিঠি পাই। অফিস থেকে তার ঠিকানায় গিয়ে দেখি, সেখানে সে একলা থাকে। মা-বাপ মরে যাওয়াতে এ জগতে আমি ছাড়া আপনার বলবার মত তার আর কেউ নেই। এক দিনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বার দুই মাত্র তাকে দেখেছিলাম। বার বছর পরে তাই তাকে আমি চিনতে পারি নি। কিন্তু সে ঠিক চিনেছিল। প্রথমে মনে সন্দেহ হয়েছিল; কিন্তু—সে আমার সেকেণ্ড ক্লাশের বইগুলো তখন কাছে এনে বললে—'এগুলো চিনতে পার?'

"আমি চিনলাম। আর দেখলাম নিক্ এই ক'খানি বই এই বার বছর ধরে সে কি অপরিসীম যত্নেই রেখেছে!

"তার পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। অফিসের মাইনে থেকে সে আমার এক পয়সাও নেয় নি; দিতে গেলে জোর করে ফিরিয়ে দিয়েছে; অথচ খাবার সংস্থান তার কিছুই ছিল না। সে চেয়েছিল শুধু আমাকে—আর আমি তাকে সেটুকু না দিয়ে পারি নি।

"কিন্তু সেই সুখটুকুও তার বিধাতা সইলেন না। তাকে অকালে টেনে নিলেন।

"তার পরে গিয়ে দেখি,—জ্বরের ঘোরে সে হাঁপাচ্ছে। আমায় বললে—'কাল এলে না যে?'

"আমি বললুম—হঠাৎ চিঠি পেয়ে অফিস থেকেই বাড়ী গিয়েছিলাম—কিন্তু তোমার এত জ্বর কখন হলো সুধা?' হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম,—তার নাম ছিল সুধা—বোধ হয় সুধা নাম ছাড়া আর কোন নামই তাকে মানাত না।'

"সে ওই জ্বরের ঘোরেও জিজ্ঞেস করলে 'ছেলেরা সব ভাল আছে ত? আর নিরু; নিরু ভাল আছে?"

"আমি বললুম—'হ্যাঁ।'

"সে যেন আশ্বস্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সে ঘুম

ভাঙল কাল ;—শেষ হয়ে যাবার এক ঘণ্টা আগে !

"চলে যাবার এক মুহূর্ত্ত আগেও সে তোমারই কথা জিজ্ঞেসা করেছে—তোমার কথা বলেছে—সে বোধ হয় তোমাকে আমার চাইতেও বেশী ভালবাসত।

"তার বড় সাধ ছিল তোমায় দেখে, কিন্তু আমি সাহস করে তার সে সাধ মেটাতে পারি নি !"

জগদীশ বালকের মত কাঁদিয়া উঠিল।

"শেষ দিনে মনে হয়েছিল—তোমাকে আর ছেলেদের একবার নিয়ে যাই ; কিন্তু সেই অচৈতন্য অবস্থায়ও সে আমার হাত ছেড়ে দেয় নি।

"জ্ঞান হলে বললে—'নিরুকে বোলো, আমি আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি—সে সুখী হবে।

"তারপর আর সে কোন কথাই বলতে পারলে না ;—সে চলে গেল !"

জগদীশ পাগলের মত কাঁদিতে লাগিল—আর নিরুপমা রোরুদ্যমান স্বামীর দেহটা বুকে চাপিয়া বসিয়া রহিল—তাহার চোখ হইতে বড় বড় ফোঁটা পড়িয়া জগদীশের সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিয়া দিতে লাগিল।





রাজকন্যা

শ্রী প্রণব রায়

অবাক্ হইবার কথা বটে!

সুকুমার একটি নারীমূর্ত্তি-ই বিধাতা গড়িয়াছিলেন, কিন্তু অন্তরে দিলেন একটি পুরুষালি প্রকৃতি—হয় তো ভুল করিয়াই। খেলাঘর সাজাইয়া পুতুলের ঘরকন্না করা তা'র পছন্দ হয় না, এর চেয়ে পাল-পুকুরে সাঁতার কাটিতে পাইলে সে ঢের বেশী খুশী। পড়শীদের বাগানে কাঁচা-মিঠা আম বা ডাঁশা পেয়ারার খোঁজ পাইলে আর রক্ষা নাই, কাঠবিড়ালীর মতো তড়্‌তড়্‌ করিয়া অমনি মগ্‌ডালে উঠিয়া হাজির! 'কপাটি' খেলায় সমবয়সী খেলুড়ের দল মেয়েটাকে আঁটিয়া উঠিতে পারে না।

শৈলের অমনিই স্বভাব—।

সেদিন ও-পাড়ার নন্দর সহিত পাল্লা দিয়া জামগাছে উঠিতে গিয়া শৈল এক কাণ্ড বাধাইয়া বসিল। কচি ডাল ভর সহিতে পারিবে কেন? আচম্কা পড়িয়া শৈল বাঁ-হাতখানা মচ্‌কাইল।

তবু কি নিস্তার আছে? চৈত্রমাসের দু'প্রহর বেলা; এলোমেলো হাওয়ায় নারিকেল-পাতাগুলি রৌদ্রে ঝিল্‌মিল্ করিতেছিল। দূরে কোন্ ছায়া-করা ডালে বসিয়া একটা ঘুঘু ক্রমাগত ডাকিতেছিল, ক্লান্ত সুরটুকু ক্রমশঃ ঝিমাইয়া আসিতেছে। মধ্যদিনের সেই অলস অবকাশে শৈলর মাথায় হঠাৎ এক লোভনীয় প্রস্তাবের উদয় হইল। পাল-পুকুরে মাছ ধরিতে গেলে বেশ হয়! প্রস্তাবটা নন্দকে না-শুনাইলেই নয়। সাণ্ডেল্‌দের আম-বাগানে নন্দর সন্ধানে গিয়া শৈল দেখিল, এক-কোঁচড় কচি আমের বউল্ লইয়া সে তখন পরম পরিতৃপ্তির সহিত চিবাইতেছে। নবমুকুলের সুবাসে চৈতালি বাতাসের নেশা ধরিয়াছে যেন!

মাছ ধরার প্রস্তাবটি শৈল বেমালুম ভুলিয়া গ্যালো। লুব্ধ ভঙ্গীতে হাত পাতিয়া কহিল, দে না ভাই আমায় এক মুঠো—।

দুই চোখে একবার তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া নন্দ কহিল, ইস্! আমি পেড়ে নিয়ে এলুম, তোকে দেব কেন?

শৈলর জিভে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। শেষবারের মত শুধাইল, দিবি নে?

—না।

অগত্যা বিলম্ব সহিতে না-পারিয়া শৈল নন্দর কোঁচড়টিকে অতর্কিত-আক্রমণ করিতেই সবগুলি

বউল্ ধুলায় একেবারে মাখামাখি হইয়া গ্যালো। কিন্তু মেয়েমানুষের এই অভাবিত স্পর্দ্ধা নন্দর সহ্য হইল না, শৈলর গালে সশব্দে এক চড় কসাইয়া আপনার পৌরুষের পরিচয় দিল।

মার খাইয়া মেয়েটার চোখে কিন্তু জল আসিল না; বরং খামো'কা যে-কাণ্ড করিয়া বসিল নন্দ তা'র জন্ত আদৌ প্রস্তুত ছিল না। পায়ের কাছ হইতে একটা ঢিল্ কুড়াইয়া লইয়া নন্দর রগ লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়াই শৈল ছুট্ দিল—।

রক্তাক্ত কপাল আর অশ্রুসিক্ত চোখ লইয়া নন্দ শৈলর মা যোগমায়ার নিকট নালিশ জানাইয়া আসিল। কিন্তু সমস্ত আম-বাগানটা আঁতি-পাতি করিয়া খুঁজিয়াও ফেরারী আসামীর কোনো সন্ধান মিলিল না!

সন্ধ্যার কিছু পরে, অন্ধকারের এক তারায় যখন ঝিল্লির ঝঙ্কার সুরু হইয়াছে, শৈল তখন পা টিপিয়া টিপিয়া আঙিনায় আসিয়া দাঁড়াইল। দাওয়ার বাতির আলোয় দ্যাখা গ্যালো ঘামে-ভিজা মুখখানি ওর সারাদিনের শ্রান্তিতে একেবারে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, ঝালর-কাঁপা এলো-চুলে কপালের আধখানি ঢাকা, বড় বড় দুই চোখে স্বচ্ছ সরলতা। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন সুশ্রী একটি বালককে মেয়ে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে!

মেয়েকে দেখিয়াই যোগমায়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এসেছিস্ লক্ষ্মীছাড়ি? আজ এই চ্যালাকাট তোর পিঠে ভাঙব—বল্ কোতায় ছিলি এতক্ষণ?

চ্যালাকাঠের সহিত শৈলর ইতিপূর্ব্বে ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাই দমিয়া না-গিয়া সোজাসুজি জবাব দিয়া ফেলিল, বুড়ো শিবমন্দিরের পেছনে।

যোগমায়ার সারা গা একবার কাঁটা দিয়া উঠিল। বাঁ-হাতের তর্জ্জনীটা গালে ঠেকাইয়া হতাশ বিস্ময়ে কহিলেন, এ ডাকাবুকো মেয়ে নিয়ে আমি কি করব মা! দিনমানেই সেতায় যেতে মানুষের গা ছম্‌ছম্ করে, আর এই ভর-সন্ধ্যের তুই একা—

পিসিমা দু'বাহু দিয়া শৈলকে আগ্‌লাইয়া ঘরে লইয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গ্যালেন, দোষ তো তোমাদেরি বৌ! মেয়ে বারো পেরোতে চল্‌ল, তবু ধুব্‌ড়ী ক'রে রেকে দিয়েচ!—পাড়ায় পাড়ায় ও তো কোঁদল ক'রে বেড়াবেই—!

চ্যালাকাঠখানা ফেলিয়া দিয়া, যোগমায়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন! সত্যিই তো, মেয়েকে যে এবার পরের ঘরে পাঠাইতে হইবে! কিন্তু তাঁহার এই দুরন্ত দামাল মেয়েটি পরের ঘরে ঠিক বুঝিয়া-সুঝিয়া চ'লতে পারিবে কি? শৈল যে বড় অবুঝ, বড় সরল!

যোগমায়ার চোখ দু'টি স্নেহে ভিজিয়া উঠিল।

পিসিমার উদ্যমে শৈলর বিয়ের ঠিকঠাক্ হইয়া গ্যালো—তিন মাসের মধ্যেই। তা' ঘর বর ভালোই বলিতে হইবে বৈকি! ছেলেটি কলিকাতার কলেজে পাশের পড়া পড়িতেছে, অবস্থা স্বচ্ছল।

শৈলর বাপও বিয়েতে কম ঘটা করিল না।

বর-ক'নে বিদায়ের সময় সকলেরি চোখে জল দ্যাখা দিল। কিন্তু চোখ যা'র একটুও মেঘ্‌লা করিয়া আসিল না, সে শৈল! বিয়ের সমস্ত দিন সে নিষেধ সত্ত্বেও উৎসবে মাতিয়াছে, এক-গা গহনা ও ঝল্‌মলে শাড়ী পরিয়া সঙ্গিনীদের সগর্ব্বে দ্যাখাইয়াছে, অবশেষে বাসর জাগিতে গিয়া কখন্ ঘুমে ঢুলিয়া পড়িয়াছে। এত সমারোহে তা'র ছোট্ট হৃদয়টি খুশীতে টলমল্ করিতেছিল। পরদিন সকালে রেলে চড়িয়া নতুন জায়গায় যাইবার সম্ভাবনায় শৈল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ধৈর্য্য সহে না, বলাকার মতো পাখা মেলিয়া উড়িয়া যাইতে পারিলেই বুঝি সে বাঁচে।

পড়শীরা আড়ালে বলাবলি করিল, ধন্যি মেয়ে বাবা! কলিকাল কিনা—

বৌ দেখিয়া শাশুড়ির মনে ধরিল। তিল ফুলের মতো এম্‌নি কচি-কোমল ছোটখাট বৌয়ের সাধ-ই এতদিন তিনি মনে মনে পুষিতেছিলেন। ঘরের লক্ষ্মী হইয়া বৌমা সুখের ঘর-কন্না করুক্‌, দেখিয়া তিনি চোখ জুড়ান।

কিন্তু শৈল শ্বশুর-বাড়ীতে আসিয়া এমন গণ্ডগোল বাধাইয়া তুলিল যে, সমস্ত শুভ-উৎসবে বিশ্রী-রকমের একটা জট পাকাইয়া গ্যালো। কনে সাজাইবার সময় পাড়ার মেয়ের দল ভিজা গামছা, প্রসাধন-সামগ্রী ও চিরুণী লইয়া শৈলর চুলের উপর আক্রমণ করিতেই সে রীতিমত বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বসিল। অবগুণ্ঠনের অবরোধ সে মানিতেই চায় না। ফাঁক্‌ পাইলেই সমবয়সী সঙ্গীদের সহিত ছাদের উপর এম্‌নি প্রচণ্ড উৎসাহে 'চোর-চোর' খেলিতে সুরু করে যে তা'কে সাম্‌লানো দায়!

দেখিয়া-শুনিয়া শাশুড়ি হাড়ে চটিয়া গ্যালেন। ও সব ধিঙ্গিপনা তাঁ'র দু'চোখের বিষ!

এর চেয়েও মর্মান্তিক ট্রাজেডি ঘটিল ফুল-শয্যার রাতে।

সন্ধ্যায় মুষলবৃষ্টি ধরিয়া যাওয়ার পর পরিস্কার আকাশে চতুর্দ্দশীর চাঁদ উঠিল। জান্‌লার পাশে জ্যোৎস্না যেন কৌতূহলী মেয়ের মতো আড়ি পাতিয়া আছে। বিছানাময় ছড়ানো বেলফুলের সুবাসে এক মধুর মোহ! অল্প অবগুণ্ঠনের তলা দিয়া প্রভাকর দেখিল, নব-বধূর মুখখানি বড় সুন্দর! কি একটা কাব্য-সম্মত কাজ করিবার অভিপ্রায়ে মুখের কাছে মুখ লইয়া যাইতেই, শৈল দু' হাত দিয়া তাহার মুখটাকে সজোরে ঠেলিয়া দিল। ও-সব উপদ্রব সে মোটেই সহিতে পারে না!

প্রভাকর বেচারী দমিয়া গ্যালো।

ঈষৎ ক্ষুণ্ণস্বরে শুধাইল, আমার বুঝি তোমার পছন্দ হয় নি?

প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া শৈল জানাইল,—আদপেই না। সত্যি কথা বলিতে কি, এক দিন-জ্যাঠা এই মস্ত বড় লোকটার সহিত ভাব করিবার স্পৃহা তা'র একটুও হয় নাই। ওর চেয়ে ভূতো, পঞ্চু, হারু ঢের ভালো, এমন কি হিংসুটে নন্দটা পর্য্যন্ত!

প্রভাকর কবিতার পক্ষপাতী; বৈষ্ণব-পদাবলী হইতে বাছিয়া বাছিয়া অনেকগুলি মিঠা পদ মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, সেই মিঠা পদের মাদকতায় তার নবানুরাগিনী রাধার মনোহরণ করিবে। কিন্তু কাব্যকুঞ্জ অন্ধকার করিয়া কোথা হইতে বৈশাখী-ঝড় উঠিল! বাতায়ন-পাশে ম্লানমুখী জ্যোৎস্না বৃথাই ফিরিয়া গ্যালো হয় তো!

প্রভাকর গুম্‌ হইয়া বসিয়া রহিল।

শৈল ততক্ষণে উস্‌খুস্‌ করিতেছে। নিশীথের এই নিরালা অবকাশে বাড়ীর জন্য তা'র বড় বেশী মন-কেমন করিতেছিল। চিরপরিচিত বিছানায় মায়ের পিঠ ঘেঁসিয়া শোয়া, হাবুল্টার সেই একঘেয়ে ঘ্যান্‌ঘ্যানানি, দাওয়ায় মেটে-প্রদীপের আলোয় পিসিমার সুর করিয়া রামায়ণ পড়া—সব মনে পড়িয়া গ্যালো। শৈল বলিয়া উঠিল, বাড়ী যাব—।

প্রভাকর কোন কথাই কহিল না।

পুনরায় শৈল কহিল, বাড়ী যাব বল্‌চি—

প্রভাকর এবার জাপানী-দেশলায়ের মতোই জ্বলিয়া উঠিল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া কহিল, তাই যেও। ঘাড় ধ'রে দূর ক'রে দেব চিরকালের মতন—ইডিয়ট্‌! ননসেন্স!

শৈল মুখ ভ্যাংচাইয়া কহিল, ব'য়ে গ্যাচে। বলিয়াই, দরজার খিল খুলিয়া দে ছুট—

দিন কয়েক বাদে।

ধুলার মেঘ উড়াইয়া, বেতো রুগীর মতো আর্তনাদ করিতে করিতে একখানা গরুর গাড়ী মজুমদারদের ঘরের সুমুখে আসিয়া থামিতেই, বধূবেশিনী শৈল লাফাইয়া পড়িয়া অন্দরের দিকে দৌড়াইল। যোগমায়া দাওয়ায় বসিয়া নারিকেল কুরিতেছিলেন। এক-দৌড়ে সেথায় হাজির হইয়া, শৈল হাসিমুখে সহজস্বরে কহিল, দাও না মা এক-মুঠো, নিই ?

বলিয়া, অনুমতির আগেই সুমুখের থালা হইতে একমুঠো তুলিয়া লইল।

যোগমায়া তো অবাক্! কহিলেন, ওমা, তুই কোত্থেকে এলি ? জামাইও এয়েচে নাকি ?

শৈল জবাব দিল, উঁহু।

জামাই আসে নাই, আসিয়াছিল বাড়ীর বুড়া সরকার। তাহারই মুখ হইতে মেয়ের কীর্তিকলাপ শুনিয়া যোগমায়ার মাথা কুটিতে সাধ হইল। চীৎকার করিয়া কহিলেন, জানি কালামুখী এম্‌নি ধারা কেলেঙ্কারি না-ক'রে ছাড়বে না! বারো-বচরের ধাড়ী এখনো হায়া হ'ল না এতটুকু!— দিয়েচে তো বিদেয় ক'রে ? বেশ হয়েচে! মর্ না এখুনি, আপদ্ চুকে যাক্ —

বলিতে বলিতে, চোখ দু'টি জলে ভাসিয়া গ্যালো।

শৈলর কিন্তু মরিবার কোনো তাড়া-ই দ্যাখা গ্যালো না। বরং, গাছ-কোমর বাঁধিয়া প্রফুল্লমুখে ও-পাড়ার জাম-তলায় জুটিতে ছুটিল —।

*

* *

বছর পাঁচেক পরে গল্পের শেষ পরিচ্ছেদের সুরু—

শৈল এখনো তেম্‌নিই আছে—তেম্‌নি চঞ্চল-মতি, তেম্‌নি অবোধ! বুড়ো শিবতলার মাঠে ছুটাছুটি করিবার সাধ আজো তা'র কমে নাই. রৌদ্র-ঝিমানো দু প্রহরে পড়শীদের বাগানের ছায়া-পথে আজো তা'কে ঘুরিতে দ্যাখা যায়। তবে, সাথী বড়-একটা আজকাল মেলে না; সাঙ্গনীরা সব রাঙা চেলীর ঘোম্‌টা টানিয়া দূর-দেশে স্বামীর ঘর করিতে চলিয়া গ্যাছে, আর সঙ্গীর দল— কেহ বা শহরে পড়াশুনা করিতে গ্যাছে কেহ বা খামোকা ভারিক্কে হইয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলায় আকাশে যখন একটি নীরব অবকাশ ঘনাইয়া আসে, তখন পিসিমার কোলে মাথা দিয়া শৈল আজো রূপকথা শুনিতে ভালবাসে,—কঙ্কাবতী, ডালিমকুমার, আরো কত! কিন্তু ওর রাজকুমার আসিবে কবে ? কবে ওর অন্তরের বিজনবাসিনী ঘুমন্ত রাজকন্যাকে সোণার কাঠির ছোঁয়ায় জাগাইবে ?

কোন্ অতর্কিত শুভলগ্নে ?

মেয়ের পানে চাহিয়া চাহিয়া যোগমায়ার বুক হু হু করে। জামাইকে তিনি বারকয়েক মেয়েকে লইয়া যাইবার অনুরোধ করিয়া চিঠি দিয়াছিলেন। জবাব আসে নাই।

ফাল্গুনের গোড়ায় কমলা বাপের বাড়ী আসিল। ওর স্বামী কোন্ দূর রেল-ইষ্টিশানে চাকরি করে, ইষ্টিশানের 'কোয়ার্টারে'-এই কমলাকে লইয়া সংসার পাতিয়াছে। কাজেই সংসার ফেলিয়া কমলার বাপের বাড়ী আসা ঘটিয়া ওঠে না।

বিয়ের পর এই প্রথম সে বাপের বাড়ী আসিয়াছে সন্ধ্যার পর পাড়ার মেয়ে-মজলিস্ তাই ওদের ওখানেই বসিল।

যোগমায়া কহিলেন, যা' না শৈলি, কম্‌লিদের ওখান থেকে ঘুরে আয় গে—আমার নাম ক'রে একবার আস্‌তেও বলিস।

কম্‌লি এয়েচে নাকি ? এলো চুলগুলোকে দু'হাত দিয়া খোঁপা করিয়া জড়াইয়া, শৈল বাহির

হইয়া পড়িল। কমলাদের বাড়ী কাছাকাছি। মীনা, বিমি, পাঁচী আগেই ছুটিয়া গুলতানি সুরু করিয়াছে। কমলা হাসিমুখে শুধাইল, কি লো শৈলি, চিন্‌তে পারিস্? খবর কি, মাসিমা ভালো আছেন তো?

কমলাকে সত্যিই চিনিবার যো নাই! আগের চেয়ে একটু মোটা হইয়াছে, রঙটা তত চিকণ নয়, সারা অবয়বে শরৎকালের নদীর মতো স্থির যৌবন টলমল করিতেছে যেন! পরণে চওড়া লাল-পেড়ে সাড়ী, সিথায় জলজলে সিঁদুর—মুখে-চোখে পরিতৃপ্তির একটি প্রশান্ত প্রভা। শৈল যার সহিত পাল-পুকুরে সাতারের পাল্লা দিয়াছে, সাণ্ডেলদের বাগান হইতে কাঁচা-মিঠা আম চুরি করিয়াছে—এ বুঝি সেই মেয়েটি নয়! ইহাকে সে এই প্রথম দেখিল।

অবাক্ হইয়া শৈল কহিল, বাব্বাঃ, তুই একেবারে গিন্নিবান্নি হয়ে উঠেচিস্ কমলি!—কখন এয়েচিস্?

আজ ভোরের গাড়ীতে।—কমলা কহিতে লাগিল, আস্‌ব মনে কল্লেই কি আসা যায় ভাই? সংসারের ঝঞ্ঝাট কি কম? তার ওপর ভুলো মানুষ নিয়ে আমার ঘর কন্নতে হয়! কোনো দিকে খেয়াল নেই, ময়লা পেণ্টুলুনের ওপর হয় তো ফর্সা কোট পরে বেরিয়ে গেলেন, কাছে ব'সে মাথার দিব্যি দিলে তবে পেট ভ'রে খাওয়া হয়! কাজে বেরোবার সময় পানের ডিবেটি, শোবার আগে জলের গেলাসটি আমি নৈলে কে-ই বা গুছিয়ে রাখে? কিন্তু অমন ভালোমানুষ—

মুখখানি উজ্জল করিয়া কমলা আবিষ্টকণ্ঠে কহিতে থাকে, সত্যি বল্‌চি ভাই, অমন ভালো মানুষ আর দু'টি দেকি নি! তা' ব'লে দুষ্টুবুদ্ধি-টুকুও কম নয়! রাত্তে চাঁদ উঠ্‌লে ঘুমুতে দেবে না, যত রাজ্যির গল্প আর গল্প! রাগ ক'রে এক-দিন কথা কই নি ব'লে কি ব'লেছিল শুনবি?

মুখখানি ঈষৎ রাঙা করিয়া চুপি চুপি কমলা কহিল, ব'লেছিল, আর-জন্মে বৌ-কথা-কও পাখী হয়ে তোমার মান ভাঙাব! রাগ কন্নতে পায় না ভাই! দিনের মধ্যে পঁচিশবার ছুতো-নাতা করে ইষ্টিশান থেকে বাড়ী আসা চাই—ছি, ছি, এমনি লজ্জা করে আমার!

মুখ টিপিয়া হাসিয়া বিমি কহিল, চাঁদমুখটী একদণ্ড চোখের আড়াল হলেই অম্‌নি অন্ধকার দ্যাকেন্ বুঝি?

শৈলর মুখে ভাষা জুয়াইতেছিল না। কমলার মুখে আজ যেন সে নতুন দেশের, নতুন জীবনের কথা শুনিতেছে—এমনি তন্ময়তা তার মুখে-চোখে।

পাঁচী শৈলর কাণে কাণে কহিল, বালিসের নীচে কম্‌লি ওর বরের চিঠি লুকিয়ে রেকেচে—বের কর্ না—

লুকানো-জিনিষের প্রতি শৈলর বরাবরই লোভ, তৎক্ষণাৎ সে উৎসাহিত হইয়া উঠিল। সুযোগ বুঝিয়া চিঠিখানা ছোঁ মারিয়া বাহির করিয়া লইতেই, কমলা কাড়িয়া লইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া কপট কোপে বলিয়া উঠিল না ভাই, প'ড়ো না বল্‌চি—তোমরা ভারি ইয়ে—

কে-ই বা শোনে! সবাই তখন খোলা-চিঠির ওপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কমলার বর লিখিয়াছে:

প্রাণের কমলমণি,

এইমাত্র বাড়ী ফিরে আস্‌তেই তোমার চিঠি-খানি আমার সারাদিনের খাটুনি ভুলিয়ে দিলে! তুমি ভালো আছ জেনে নিশ্চিন্ত হলুম্। আমার জন্যে একটুও ভেব না, আমার শরীর ভালোই আছে, অসুখ শুধু মনের। একলা ঘরে আমার মন আর টিঁকুচে না। ঘরের মেঝের তোমার পায়ের কাঁচা-আল্‌তার দাগ এখনো মিলিয়ে যায় নি, বাতাসে তোমার চুড়ির গান আজো বাজে! কাল অনেকরাত অবধি চোখে ঘুম আসে নি, বাইরে জ্যোৎস্না উঠেছিল, ভাবছিলুম, তুমি হয়

তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এখন আমাকেই স্বপন দেখ্‌চ, তোমার ঘুমন্ত মুখে চাঁদের আলো পড়েচে! ভয় নেই গো, শিয়রের জান্‌লাটা বন্ধ ক'রেই দিয়েছিলুম, ঠাণ্ডা লাগে নি।

আর কতদিন এম্‌নি ক'রে আমায় শাস্তি দেবে মণি? কবে আস্‌বে? চিঠির উত্তর দিতে দেরী ক'রো না কিন্তু। সন্ধ্যের ডাক চ'লে যাচ্চে, আজ এইখানেই শেষ কর্‌ব্রি। চিঠির সঙ্গে আরেকটা মিষ্টি জিনিষ পাঠালুম, কি বল তো?

তোমার

শচীন

পুনঃ—হাস্‌নুহানার গন্ধ তোমার ভারি ভালো লাগে, না? তা'রই একটা চারা এনে জান্‌লার পাশে টবে লাগিয়েচি। তুমি এসে দেখ্‌বে, ছোট ছোট কুঁড়িগুলি ফুটেচে!

খিল্‌খিল্‌ সুরে হাসিয়া উঠিয়া মীনা কহিল, মাগো, কী ঢংটাই করেছে—! তোর বর নিশ্চয় পদ্য লেখে কম্‌লি!

সবাই হাসিয়া উঠিল।

হঠাৎ শৈলের উৎসাহটা একেবারে কমিয়া গ্যালো। সখীদের হাসি-পরিহাসের কলোচ্ছ্বাসের মাঝখানে নিজেকে তাহার কেমন-যেন খাপ্‌ছাড়া লাগিতেছিল, অথচ নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না, ইহার কারণটা কি? তা'র সতেরো-বছরের জীবনে এমন কখনো হয় নাই!

খানোকা উঠিয়া পড়িয়া শৈল কহিল, চল্‌লুম্‌ কম্‌লি, কাল আবার আস্‌ব'খন।

সেই রাত্রে—ভীরু জ্যোৎস্না যখন পৃথিবীর পথে চুপি চুপি নামিয়া আসিয়াছে, প্রথম-বসন্তের বাতাসের সাথে লাজুক বকুলকুঁড়ির কানাকানি চলিতেছে—বিছানায় উপুড় হইয়া শুইয়া শৈল তখন ক'লকাতার একটি ছেলের কথা ভাবিতেছিল। আজ যদি সেই ছেলেটি কমলার বরের মতো অমন মিষ্টি করিয়া একখানি চিঠি লেখে, তবে কি সে খুশী হয় না? শৈল মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এবার যদি তা'র বর—হাঁ, বর ই তো— তা'কে বুকের কাছটিতে টানিয়া মুখের কাছে মুখ নিয়া তেম্‌নি আদর করিতে চায়, তবে সে আর কক্ষনো বাধা দিবে না! এম্‌নি চাঁদ্‌নি-রাত জাগিয়া দু'জনে মিলিয়া কতো গল্প করিবে, কমলারা যেমন করে! সে আর একলা থাকিতে চায় না, দু'জনে মিলিয়া কমলাদের মতো অম্‌নিই একটি ছোট্ট সংসার পাতিবে, রোজ তা'র বর খাইতে বসিলে মাতার দিব্যি দেয়া—

ভাবিতে ভাবিতে শৈলের বুকের তারে কাঁপন ধরে।

পাশের ঘরে যোগমায়া তখন আঁচলে চোখ মুছিয়া ঘোষাল-গিন্নীকে বলিতেছিলেন, মেয়েটা এম্‌নি পোড়াকপালী যা!—জামাই ফের বে ক'রেচে, তা' একটিবার জান্‌তেও দিলে না—

এক অতর্কিত বসন্তলগ্নে রাজকন্যার ঘুম তা ভাঙল বটে, কিন্তু রাজকুমার তখন দুয়ার হইতে ফিরিয়া গ্যাছে! ধূলি-পথের বুকে পড়িয়া রহিল শুধু অস্পষ্ট পদচিহ্নলেখা।

আজো রাজকন্যা স্বপ্ন দ্যাখে, তেপান্তরের ওপার হইতে পক্ষীরাজ ছুটাইয়া তা'র বাঞ্ছিত রাজকুমার বুঝি ওই আসিতেছে! তাবে, এবার আর তা'কে ফিরাইয়া দিবে না—!



স্পন্দন

সুরেন্দ্রমোহন বসু

নাগপুর প্যাসেঞ্জারে ঘাটশিলায় এক বন্ধুর নিকট বেড়াইতে যাইতেছিলাম।

সেদিন সেকেণ্ড ক্লাসটায় আদৌ যাত্রী ছিল না; কাজেই কথা বলিবার লোক অভাবে গাড়ী প্ল্যাটফরম ছাড়িতেই 'হুইলারে'র ষ্টল হইতে সদ্য-ক্রীত 'ভারতবর্ষ'খানা লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে লাগিলাম।

ট্রেণ কোলাঘাট থামিল। একজন প্রৌঢ়া ও একটী যুবক কামরায় উঠিয়া আসিয়া বসিলেন। যুবকের মুখে শুনিলাম, মহিলাটী তাঁহার দিদি; তাঁহাকে লইয়া সেও ঘাটশিলায় যাইতেছে। সেখানে তাহাদের একটী ছোটখাট বাংলো আছে।

কথায় কথায় তাঁহাদের সহিত আমার বেশ আলাপ জমিয়া গেল।

ঘাটশিলা পৌছাইতে আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া আমাদের গন্তব্য-স্থানে যাত্রা করিলাম। গল্প করিতে-করিতে, একটী সুদৃশ্য উদ্যান বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে প্রৌঢ়া জানাইলেন, সেই তাঁহাদের কুটীর। তখন তিনি ও যুবকটী মধ্যে-মধ্যে আমায় তাঁহাদের সেখানে বেড়াইতে আসিতে বারবার অনুরোধ জানাইয়া ফটক খুলিয়া বাগানের ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমিও তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি দিয়া বন্ধুর গৃহের উদ্দেশ্যে ধীরে-ধীরে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম।

* * *

যাওয়া-আসা করিতে-করিতে ক্রমে আমিও প্রৌঢ়ার ভ্রাতৃস্থান অধিকার করিয়া বসিলাম। তিনিও আমায় কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় স্নেহ-যত্ন করিতে লাগিলেন। একদিন অপরাহ্নে তাঁহাদের সেখানে গিয়া মালীর মুখে শুনিলাম, তাঁহারা নিকটেই কাহার বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছেন; শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। কয়দিনে মালী আমায় ভালরকমই চিনিয়াছিল; তাই সে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গেল এবং একটা ঘর খুলিয়া সেখানে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ জানাইল।

টেবিলের উপর স্বর্ণ-মণ্ডিত মেহগিনি কাঠের একটী সুন্দর হাতবাক্স ছিল। সেটী তুলিয়া দেখিতে গিয়া বুঝিলাম, তাহার চাবী খোলা; ডালাটা তুলিতেই গোলাপী শিল্কের ফিতায় জড়ানো খানকয়েক চিঠি আমার নজরে পড়িল। কেন জানি না, সেই পত্রগুলি পাঠ করিয়া দেখিতে কেমন কৌতূহল হইল; কিন্তু পরক্ষণেই মনটাকে দমন করিয়া লইলাম। বাহিরে তখনও সমানে জল হইতেছিল।

অলসভাবে একা কতক্ষণ আর অপেক্ষা করা যায় ?

কিছুক্ষণ পরে পুনরায় চিঠিগুলি পড়িতে ইচ্ছা হইল। সেবারেও জোর করিয়া মনের বল্গাটাকে টানিয়া রাখিলাম। যদিও জীবনে কখনও অনুমতি ভিন্ন অন্যলোকের পত্র পড়ি নাই এবং 'পরের চিঠি লুকাইয়া পড়া মহাপাপ' সেই সনাতন মূল্যবান উপদেশটী আমার উত্তমরূপ স্মরণই ছিল, কিন্তু বারবার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির দ্বন্দে প্রবৃত্তি কখন যে জয়ী হইয়া আমায় পত্র পাঠে মনোনিবেশ করাইয়া ছিল, তাহা কিছুই জানিতে পারি নাই।

মাধবপুর

২৫-এ অগ্রহায়ণ ১৩৩০

"ভাই ইন্দু,

তোমার চিঠি পেয়ে যে কতদূর আনন্দিত হয়েছি, পত্রের ভাষা তা প্রকাশ করতে নিতান্তই অক্ষম ;—যেহেতু সেটা প্রাণেরই নিজস্ব অধিকারে! কিন্তু উত্তরের এই বিলম্বের জন্য,—যদিও এটা অন্যায় বলে স্বীকার করছি,—তবু তুমি আমায় ক্ষমা করবে সে বিশ্বাসও রাখি ;—কারণ, হাজারীবাগে প্রথম আলাপের দিন থেকেই আমি তোমার অন্তরের পরিচয়ে ভালরূপ পরিচিত। সত্য বল্‌ছি, কদিন কাজ-কর্ম্মে একেবারেই অবসর পাই নি, তাই জবাব দিতে দেরী হয়ে গেল।

তোমরা আমাদের স্বজাতি, তাই তোমার কাছে আমার একটী প্রার্থনা আছে সই ; দেবে কি ভাই ? মনে বড় সাধ,—তোমার মেয়েটীকে আমি নিজের করে নি।

আমার ছেলের এমন সৌভাগ্য হবে কি,—যে সে সান্ত্বনার মত রত্নকে স্ত্রীরূপে লাভ করবে ?

তোমার আদর-আপ্যায়ন, স্নেহ-যত্ন যে ভোল্‌বার নয়। তাই একান্ত ইচ্ছা,—এই সূত্রে ভালবাসার বাঁধনটা আরও দৃঢ় করে নি।

তোমাকে আমার জীবনের সমস্ত ঘটনা খুলে জানাচ্ছি ; কারণ,—সত্যগোপন করে আমি কোন কাজ করতে ইচ্ছা করি না। এ জেনেও যদি তোমার মেয়েটী আমায় ভিক্ষা দাও, তা হলে আপনাকে ধন্য বিবেচনা করব।

আমার বাবা যে খুব বড়লোক ছিলেন, তা নয় ; কিন্তু সংসারে কোনদিন অভাব-অনাটনের উৎপীড়ন হতে দেখেছি বলে ত মনে হয় না। আমি বাপ-মায়ের বড় আদরের একমাত্র সন্তান ছিলুম। বাবার পড়া-শোনায় খুব ঝোঁক ছিল ; দিন-রাত্রি ব'য়ে-মুখেই থাকতেন ;—এক কথায় তাঁকে গ্রন্থকীট বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। তাই বড় পরিশ্রমে আমায় তিনি লেখাপড়া শেখাতে লাগ্‌লেন। ছেলেবেলায় আমিও বড় কম মেধাবী ছিলুম না ; চোদ্দ বৎসর বয়সের মধ্যেই সংস্কৃত, বাঙ্‌লা, ইংরিজি অনেকগুলো বই-ই তাঁর কাছে পড়ে ফেল্‌তে পেরেছিলুম। বিয়েটা যে দরকার, বয়স যে জীবনের সেই অবশ্য-করণীয় কার্য্যটীর পারে যেতে বসেছে, সেদিকে আমার বা বাবার কারও খেয়াল ছিল না। মা কিন্তু সেটা ভোলেন নি ; কাযেই বাবার সে দীর্ঘ ঘুম ভাঙাতে তিনি উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছিলেন। অনেক দেখাদেখি, কথা কাটাকাটির পর, আমাদের গাঁ থেকে পাঁচক্রোশ দূরে এক জায়গায় আমার বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হলো। তারপর আষাঢ়ের এক বাদল-রাতে শুভ কি অশুভ মুহূর্ত্তে জানি না, বরের সঙ্গে আমার দৃষ্টি-বিনিময় হয় গেল।

শ্বশুর বাড়ীতে ছিলেন, আমার শাশুড়ী আর ননদ। আমি তাঁদের সু-দৃষ্টিতে পড়্‌লুম না। ক'জন মেয়ের কপালে মায়ের জায়, অন্ততঃ মানুষের মত শাশুড়ীই বা জোটে ? আর ননদ সে ত শতকরা প্রায় একটাও ভাল হয় না।

আমার স্বামী ছিলেন,—মাতৃভক্ত। স্ত্রীকে শাসন করবার সময় তিনি তাঁর আদেশ যেরূপ পালন করতেন, অন্য বিষয়ে কিন্তু তাঁকে সে রকম

করতে দেখি নি! গাঁয়ের মেয়ে হলেও আমি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠ্‌তে পারি নি; কারণ—আমার লেখাপড়া ও সামান্য রূপ!

শাশুড়ী-ননদ ও স্বামীর তিরস্কার যখন একান্ত অসহ্য হয়ে উঠ্‌ত, তখন নীরবে ঘরের কোণে বসে মুখ লুকিয়ে কাঁদ্‌তুম। সে অবস্থায় বাঙালীর মেয়ের কান্না ছাড়া আর উপায়ই বা কি আছে? এমনই করে আমি আমার বি-এ পাশ করা স্বামীকে নিয়ে ঘরকন্না করতে লাগ্‌লুম!

বছর ঘুরে গেল। তার মধ্যে বাবা-মা অভাগীর বুকে বজ্রশেল হেনে কোন্ অজানা দেশে চলে গেলেন! সংসারে জুড়োবার, শান্তির যে একমাত্র আশ্রয়-স্থল ছিল, তাও ঘুচে গেল!

সে বিপদের সময় আমায় সান্ত্বনা দেওয়া দূরে থাক্, শাশুড়ী-ননদের জ্বালায় প্রাণভরে যে কাঁদ্‌ব, তারও উপায় ছিল না; তাতে তাঁরা সব বিরক্ত হতেন, নানা কথা শুনিয়ে দিতেন। এমনই হৃদয়-হীন! এমনই পাষাণ!

তারপর কেমন করে জানি না, হঠাৎ শ্বশুর-বাড়ীর পাশের গাঁয়ের জমীদারবাবুর কু-দৃষ্টিতে পড়ে গেলুম। একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখি,—বাড়ীর উঠান মশালের আলোয় আর লোকজনে ভরে গিয়েছে। ভয় পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি খাটের নীচে গিয়ে লুকোলুম; কিন্তু তাতেই কি যমদূতদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়? তারা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে জোর করে টেনে এনে আমার মুখ বেঁধে ফেল্‌লে। হাতের কাছে একটা লাঠি ছিল, সেইটে টেনে নিয়ে বেশ ঘা-কতক তাদের বসিয়ে দিলুম। কিন্তু শেষ রাখ্‌তে পারলুম না;—আমি একা, তায় মেয়েমানুষ; তারা অনেক, তায় পুরুষ; জয় তাদেরই হলো! তাদের যে বাধা দেবেন,—সে সাহস আমার স্বামীর হলো না। এমনই যাঁরা অপদার্থ, তাঁরাই আবার স্ত্রী-স্বাধীনতা দিতে চান!

আমার মান-ইজ্জত রক্ষা করা বোধ হয় বিধা-তার অভিপ্রেত ছিল, তাই তারা যখন মাঠ পার হয়ে সবেমাত্র গাঁয়ের ভেতর এসে ঢুকেছে, তখন একটা ঘোড়ার পায়ের শব্দ কানে এসে পৌঁছল। সুযোগ বুঝে বুকে সাহস এনে মুখের বাঁধনটা জোর করে খুলে ফেলে প্রাণপণে চীৎকার করে উঠ্‌লুম। পিশাচগুলো আমায় অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগ্‌ল। তারপর তারা আমায় ফেলে দেবে কি সঙ্গে নেবে ঠিক্ করতে-না-করতেই একজন সাহেব ঘোড়া ছুটিয়ে এসে উপস্থিত হলেন।

তাঁকে দেখে পাষণ্ডেরা ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়্‌ল। পকেট থেকে পিস্তল বার করে তিনি বজ্রনির্ঘোষে বলে উঠ্‌লেন—"যে পালাতে চেষ্টা করবে, তাকে তখনই গুলি করব, সাবধান!"

তারপর একটু থেমে অপেক্ষাকৃত নরমস্বরে তাদের তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"ইনি কে? কেন তোরা এঁকে এমন সময় এভাবে নিয়ে যাচ্ছিস?"

তারা ভয়ে ভয়ে সত্যকথা প্রকাশ করে দিলে।

সেই সময় সাহেবের আরদালী ও চাপরাসী যারা পেছিয়ে পড়েছিল, তারা এসে হাজির হলো। তিনি তাদের নিকটস্থ থানায় পাঠিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দারোগাবাবু হাঁপাতে-হাঁপাতে জনকতক কনেষ্টবল সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। সাহেব তখন তাঁকে সব জানিয়ে নিজের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করতে অনুরোধ করলেন।

তখন উদ্ধার-কর্ত্তার সম্বন্ধে জানতে বড় ইচ্ছা হলো। সাহসে ভর করে সাহেবকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে ফেললুম।

বাঙালীর, বিশেষতঃ পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মুখে ইংরিজি কথা শুনে তিনি মুগ্ধ-বিস্ময়ে একবার আমার দিকে চাইলেন। বোধ হলো, মনে-মনে একটু সন্তুষ্টও হলেন। পরিচয়ে জানলুম,—তিনি বিভাগীয় কমিশনার; নিকটবর্ত্তী জেলের সাহেব-

দের ইনিষ্টিউটের বাৎসরিক উৎসবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছিলেন।

লোকগুলোকে দারোগা থানায় নিয়ে গেলে, আমায় সঙ্গে নিয়ে তিনি আমার শ্বশুর-বাড়ীর দিকে অগ্রসর হয়ে চল্‌লেন।

বাড়ী পৌঁছে দেখি,—আশ-পাশের অনেকেই সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সাহেব আমার স্বামীকে ডেকে সমস্ত কথা খুলে বলে আমায় তাঁর হাতে সমর্পণ করে দিলেন। তারপর তাঁর বিদায়ের সময় এল। কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, চক্ষু জলে ভরে এসেছিল; মনে হচ্ছিল,—তাঁর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ি; কিন্তু, সকলের সাম্‌নে লজ্জায় তা পার্‌লুম না;—শুধু নীরবে সেলাম জানিয়ে আমার প্রাণের শ্রদ্ধা তাঁকে নিবেদন করে দিলুম।

পরের দিন সকালে গ্রামের মাতব্বরেরা মিলে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে এক সভা বসালেন। মীমাংসার বিষয় হলো,—আমায় ঘরে রাখা হবে কি না? কথাটা শুনেই ত ভয়ে আমার হাত পা আড়ষ্ট হয়ে গেল। কেবলই ভাব্‌তে লাগ্‌লুম,—তাঁরা যদি থাক্‌তে না দেন, তা হলে আমি যাব কোথায়?

পাড়ার লোকের পূর্ব্বেই কিন্তু শাশুড়ী ও ননদ তাঁদের অদ্ভুত উদ্ভাবিনী শক্তির মাহাত্ম্যে সিদ্ধান্ত করে ফেল্‌লেন,—আমি কুলটা। জমীদারের সঙ্গে আমার আগে থেকেই সড় ছিল। কাজেই ঘরে কিছুতেই আমার স্থান দেওয়া যেতে পারে না;—এমন কি গাঁয়ের মধ্যেও নয়। স্বামীও তাঁদের কুসলুনিতে ঠিক্ সেই কথাই বুঝে গেলেন। ছি, ছি, শিক্ষিত না তিনি!

তখন আর উপায় কি আছে? তাঁকে আমার নির্দ্দোষিতার কথা কত বল্‌লুম, পায়ে ধরে কাঁদ্‌লুম। তিনি শুধু আমার দিকে চেয়ে একটু হাস্‌লেন। উঃ, কী সে বক্রদৃষ্টি! কী ভয়ানক ক্রুর হাসি!

লজ্জা ঘৃণা বিতৃষ্ণায় অন্তর ভরে উঠেছিল। স্বামীকে আর কিছু না বলে, বাড়ীর গিন্নী বা তাঁর মেয়েকে কোন কথা না জানিয়ে ধীরে-ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়্‌লুম। একটা নিশ্বাস বুকের মধ্যে ঠেলে আস্‌ছিল, জোর করে সেটাকে ফিরিয়ে দিলুম। চোখের জল আর প্রাণের যন্ত্রণায় সাক্ষ্য রইলেন,—কেবল একমাত্র অন্তর্য্যামী!

বাড়ী থেকে ত বেরুলুম; কিন্তু যাই কোথা? আশ্রয় কই? স্থান থাক্‌লেও কি কেউ আমায় ঘরে বায়গা দিতে ভরসা পাবে? যার স্বামী থাক্‌তে দিলেন না, অন্যে তাকে রাখ্‌বে কোন্ বুকের জোরে? গেরস্তর বউ, রাস্তা-ঘাট চিনি না; পথ চল্‌তে লজ্জায় পা-দুটো যেন জড়িয়ে আসে! যা হোক্, চল্‌তেই যখন হবে, চলাই যখন নিয়তি, তখন দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি? অতি বড় দুষ্কৃতকারী পুরুষদের সংসারে স্থান আছে, কিন্তু আমার মত নিরপরাধিনীদের নেই! ধন্য সমাজ! ধন্য তার বিচার! ধন্য ন্যায়পরায়ণতা!

পাঁচ ক্রোশ দূরে মাসীর বাড়ী। সাত পাঁচ আর না ভেবে তারই উদ্দেশে যাত্রা কর্‌লুম।

অতিকষ্টে কোনরকমে সেখানে গিয়ে যখন পৌঁছলুম, তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। পায়ের ব্যথা ও জল তেষ্টায় শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছিল; কথা কইবার সামর্থ্য ছিল না। মাসীমার কাছে এক ঘটি জল চেয়ে নিয়ে এক নিশ্বাসে তা খেয়ে ফেল্‌লুম। অনেকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আস্তে-আস্তে নিজের দুর্দ্দশার কথা তাঁকে সমস্ত ভেঙে বল্‌লুম।

তিনি শুনে আমায় আশ্বাস দিয়ে কত দুঃখ কর্‌তে লাগ্‌লেন। অলক্ষ্যে কফোঁটা জলও তাঁর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়্‌ল। সকাল-সকাল খাইয়ে তিনি আমায় শুতে পাঠিয়ে দিলেন। মনে-

মনে ভাব্তে লাগ্লুম,—যা হোক্, মাথা গোঁজবার তবু একটা স্থান জুটল।

পরদিন বিকাল বেলা কিন্তু তাঁর মুখে যা শুন্লুম,—তাতে সে বিশ্বাস একেবারেই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল;—সঙ্গে-সঙ্গে হৃদয়ের সমস্ত তারগুলো কেমন বেসুরো বেজে উঠ্ল। মাসীমা বল্তে লাগ্লেন—'কি কর্ব মা, আমার কি অসাধ যে, তোমায় বাড়ীতে রাখি। কিন্তু পোড়া গাঁয়ের লোক কি তোমার দুঃখ বুঝ্বে? তারা কখনই তোমায় এখানে রাখ্তে মত দেবে না। আমি যদি তাদের কথা না শুনি, তা হলে আমায় একঘরে হয়ে থাক্তে হবে। এখন বোঝ দেখি মা, ইচ্ছা থাক্লেও কি করে তোমায় রাখি?'

এই মাসীমা! এই তাঁর স্নেহ! এই তাঁর হৃদয়! যাঁকে আমি মায়েরই মত শ্রদ্ধা-ভক্তি কর্তুম! এক সময় যিনি আমায় মেয়ের মত যত্ন কর্তেন, ভালবাস্তেন! হায়! তাঁরই মুখে আজ এই কথা! চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আস্তে চাইলে, অনেক কষ্টে সেটা দমন করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

জানি, পাড়াগাঁয়ে একঘরে হয়ে থাকাটা কী ভয়ানক কষ্টকর! তবু মন যে মানে না! অন্তরটা যে বেদনায় হাহাকার করে ওঠে! হায়! মা আজ জীবিত থাক্লে, তিনি কি আমায় ত্যাগ কর্তে পার্তেন!

মাসীমা বল্লেন—'আজ রাত্রে খেয়ে-দেয়ে জিরিয়ে তারপর না হয় কাল এস মা।'

হায় রে, আর সবুর সয় না, এত তাড়া! সমাজ-রাক্ষসী গলা তাঁর এমনই চেপে ধরেছে যে, তিনি একবার ভাব্বারও অবসর পেলেন না,—আমি যাই কোথা? কোথায় আমার আশ্রয়?

আর স্থির থাক্তে পার্লুম না; বলে ফেল্লুম—'অতক্ষণ থেকেও তোমায় বিপদে ফেল্ব কেন মাসীমা। আমি এখনই যাচ্ছি। স্থান পাই, খাওয়া-দাওয়া এবং বিশ্রাম সেখানেই কর্ব।'

তিনি বল্লেন—'সে কি হয়? রাগ কর কেন মা? মাথা ঠাণ্ডা করে বুঝে দেখ, আমি কতখানি অসহায়।'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর ভণিতা শোন্বার মত মনের অবস্থা ছিল না; আস্তে-আস্তে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়্লুম।

চল্তে-চল্তে হঠাৎ মনে হলো,—কমিশনার সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা কর্লে হয় না? যিনি অত দয়া দেখিয়েছেন, তিনি কি আমায় কোন উপায়ই করে দিতে পার্বেন না? কিন্তু মুহূর্ত্তে নিরাশায় অন্তরটা ভরে গেল;—তিনি যদি কিছু না কর্তে পারেন? চেষ্টা করে দেখ্তেই বা ক্ষতি কি? আশ্রয় কোথাও না জোটে, অবশেষে অকূলের কাণ্ডারী ত রইলেন! তিনি ত আর ফেলে দিতে পার্বেন না! কিন্তু, সাহেবের ওখানে কি করে যাব? রাস্তা কে চিনিয়ে দেবে? ভয় কি, মাসীর বাড়ী যেমন করে এসেছি, দূর হলেও সেখানেও তেমনিই করে যাব। তখন সাহসে ভর করে জোরে-জোরে পা ফেলে পথ চল্তে লাগ্লুম।

সন্ধ্যা নেমে এল। তার আগের দিন অতটা রাস্তা হাঁটায় পা আর চল্তে চাইছিল না! তখনও যে অনেকটা যেতে হবে! অন্ধকারে একা মেয়েছেলে কি করে পথ চল্ব? কি করে নিজের ধর্ম্মরক্ষা কর্ব? মনের জোর তখন একেবারে কমে গিয়েছিল! হা রে নারীর ভাগ্য! হা রে, তার গর্ব্ব অভিমান!

অতি কষ্টে আরও খানিক পথ চল্বার পর একটা পুকুর দেখ্তে পেলুম। জলে নেমে ক আচলা পান করে ঘাটের ওপর বসে একটু বিশ্রাম কর্তে লাগ্লুম। ক্রমে শরীরটা ঝিমিয়ে এলো; কখন যে সেখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, কিছুই জান্তে পারি নি।

ঘুম ভেঙে দেখি, ভোর হয়ে গেছে। পাখীদের গানে চারিদিক ভরে উঠেছে। যত দুঃখ-কষ্টই হোক্, সকালবেলা মনটা একটু প্রফুল্ল থাকে। প্রাণে একটা নব উৎসাহ জেগে ওঠে। তারই প্রেরণায় উঠে আবার পথ অতিক্রম কর্‌তে লাগ্‌লুম। বিশ্রাম নি, আর হাঁটি; এমনই করে যখন কমিশনার সাহেবের কুঠীতে গিয়ে উপস্থিত হলুম, তখন সূর্য্য ডুব্‌তে আরম্ভ করেছে।

বাংলোর কম্পাউণ্ডের বাগানে ঈজিচেয়ারে বসে সাহেব চা পান কর্‌ছিলেন। আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁকে সেলাম জানালুম। তিনি আমায় দেখে অত্যন্ত আনন্দ-প্রকাশ কর্‌তে লাগ্‌লেন। বদ্‌মাস্ জমীদার আর তার লোকজনকে ভাল রকম সাজা দেওয়াবার বন্দোবস্ত করে তিনি যে আমার ভবিষ্যৎ পথ কণ্টক-শূন্য করেছেন, সে কথাটা বারবার বল্‌তে লাগ্‌লেন। হায় রে, অভাগীর ভাগ্যে শূন্য কণ্টক যে তখন গভীর অরণ্যে পরিণত হয়েছে!

নিজের কামরায় এসে তিনি আমাকে তাঁর মেমের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি এবং অবসাদে আমার শরীর তখন এমনই ভেঙে এসেছিল যে, তাঁদের সাম্‌নে প্রাণের ব্যথার বোঝা নামিয়ে দেবার সময়টুকুও আমি সোজা হয়ে বস্‌তে পার্‌ছিলুম না। কিন্তু অদৃষ্টের রুদ্ধ-দুয়ার যে আমায় নিজের হাতেই খুল্‌তে হবে! নিশ্চেষ্ট হয়ে থাক্‌লে চল্‌বে কেন?

আমার কষ্টের কথা শুনে মেম রুমালে চোখ মুছ্‌তে লাগ্‌লেন; সাহেবও খুব দুঃখ-প্রকাশ কর্‌লেন। এমন সময় আরদালি তাঁর হাতে একখানা কার্ড এনে দিলে। সাহেবের ইঙ্গিতে আমরা তখন অন্য ঘরে গিয়ে বস্‌লুম।

মেম একজন হিন্দু চাপরাশীকে দিয়ে কিছু ফল ও মিষ্টান্ন আনিয়ে আমায় খেতে অনুরোধ কর্‌লেন। আমি জলযোগ করে তাঁর ছোট ছেলেটীকে নিয়ে আদর কর্‌তে লাগ্‌লুম।

মেম গল্প কর্‌তে লাগ্‌লেন—তাঁর ঠাকুরদা বহুদিন ভারতবর্ষে কাটিয়ে গেছেন। সেপাই-বিদ্রোহের সময় কোন বাঙালীর ঘরে তিনি আশ্রয় এবং আত্মীয়ের ন্যায় আদর-যত্ন পেয়েছিলেন বলে বাঙালীদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ্‌তেন এবং ভালবাসতেন, ইত্যাদি।

আরদালি এসে খবর দিলে, সাহেব আমাদের বাইরে ডাক্‌ছেন। আমরা তাঁর কামরায় ঢুকে দেখি, একটী ভদ্রলোক সেখানে বসে আছেন। আমি মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে অভ্যাসবশতঃ কেমন একটু জড়সড় হয়ে একখানা চেয়ারে গিয়ে বসে পড়্‌লুম। মেম একটা খবরের কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌তে লাগ্‌লেন।

সাহেব ভদ্রলোকটীর পরিচয় দিলেন,—তিনি একজন ধনী ও কর্ম্মী। নাম—সিদ্ধমোহনবাবু। খুব সদাশয়, মহৎ ব্যক্তি। তাঁর বন্ধুস্থানীয়। তারপর আমায় বল্‌লেন —'তোমার সমস্ত কথা এঁকে বলেছি। ইনি বল্লেন—তুমি যদি এঁর বাড়ীতে থাক্‌তে চাও, সমাদরে তোমায় স্থান দেবেন। এখন তোমার মত কি, তাই জান্‌তেই ডেকে পাঠিয়েছি।'

কি জবাব দেব, আশ্রয় যে তখন আমার প্রয়োজন। সাহেবকে জানালুমও তাই। তিনি ধীরভাবে বল্‌লেন—'সেই জন্যই ত ইনি আস্‌তেই ও কথা পেড়েছি। তবে বিশেষ একটা কথা জান্‌বার আছে;—এঁর বাড়ীতে বামুন-চাকর ভিন্ন আর কেউ নেই। তবে তুমি যদি থাক, একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক যোগাড় করে দিতে পারেন। কি বল?'

আঁচকা বিনা-পরিচয়ে এরূপ যাওয়াটা কতদূর সঙ্গত হবে? বিশেষ, বাড়ীতে যখন মেয়েছেলে থাকেন না। ভদ্রলোকটীও জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—

'আমার ওখানে যেতে কি আপনার কোন আপত্তি আছে ?'

কথা না বলেই বা করি কি ? লজ্জার বাধা জোর করে সরিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে বললুম—'পড়ে থাকবার মত স্থান দিতে পারেন, এমন কোন স্ত্রীলোক আত্মীয় কি আপনার নেই ? অযাচিত দয়া দেখাচ্ছেন বলেই এ কথা তুলতে সাহস করছি।

'এমন কোন লোকের কথা ত আমার স্মরণ হয় না,—যাঁর কাছে আপনাকে রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারি। আমার ওখানে যেতে আপনার আপত্তির কারণ যা, তা বুঝেছি ; আর সেটা স্বাভাবিক। তবে আমি বলি কি,—বাড়ীতে সম্পূর্ণ একটা আলাদা মহল নিয়ে আপনি থাকুন না কেন ? সে দিক্ আমি একেবারেই মাড়াব না। আপনার যখন যা আবশ্যক হবে, ঝিকে দিয়ে জানালেই আমি সাধ্যমত তা পূরণ করতে চেষ্টা করব।'

আশ্রয়ের জন্য বড় ব্যাকুল হয়েছিলুম, এত শীগ্‌গির যে পাব, স্বপ্নেও তা ভাবি নি ! পৃথিবীর নিয়মই বুঝি এই,—যখন যা হয়, তখন সেটা এমনই অপ্রত্যাশিতভাবেই ঘটে যায় ! কিন্তু তবু ত যেতে মন সরে না ! বাঙালীর মেয়ের এ যে চিরন্তন দুর্ব্বলতা !

ভাবনায় কাতর হয়ে পড়েছি দেখে, তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন—'ত. হলে আপনার মত হচ্ছে না ?'

'কি পরিচয়ে স্ত্রীলোক হয়ে—'

কথাটা শেষ করা হলো না ; কেমন গলার মধ্যেই বেধে গেল।

'পরিচয় ? পরিচয় এই,—তুমি আমার বোন্, আমার দিদি, আমার মা !'

এ কি আনন্দ ! আনন্দের এ কী বেদনা ! বাক্যে এ কী মাদকতা !

ধীরে-ধীরে উঠে পরিপূর্ণ ভক্তির সহিত আমি তাঁর পায়ের ওপর মাথাটা লুটিয়ে দিলুম। তিনিও আমার মস্তকে হাত রেখে নীরবে আশীর্ব্বাদ করলেন।

তারপর সাহেব ও মেমের কাছে বিদায় নিয়ে আমি দাদার সঙ্গে তাঁর বাড়ীর দিকে রওনা হলুম।

কিছুদিন দাদার ওখানে থাকতে-থাকতে ক্রমে আমার বাধবাধভাব কেটে গেল। সেটা যে আমার নিজের বাড়ী নয়, তাঁর আদর-যত্নে বাস্তবিকই সে কথাটা ভুলে গেলুম। মুখে নয়, সত্যই তিনি আমায় ছোটবোনের মত স্নেহ করতে লাগলেন।

দাদার অন্তঃকরণ দয়ায় পরিপূর্ণ। লোকের কষ্ট তিনি একেবারেই দেখতে পারেন না। তাঁর আয়ের অধিকাংশই ব্যয় হয়,—দরিদ্রের অভাব মোচনে, রোগীর ঔষধ-পথ্যে, মানুষের উপকারে। কেন জানি না, এত গুণ সত্ত্বেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর ঘোরতর সন্দেহ। বিশ্বের যে একজন নিয়ন্তা আছেন, এ কথাটা তিনি স্বীকার করতে চান না। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে একদিন তর্কও হয়েছিল।

আমি বললুম—'তুমি ভগবান মান না কেন দাদা ?'

তিনি বললেন—'প্রমাণের অভাব বলে।'

'কিসে ?'

'সৃষ্টিকর্ত্তা বলে যদি কেউ থাকেন, তিনি যে পরমপুরুষ, মানবের আদর্শ, মূর্ত্তিমান দয়া, এ কথাটা স্বীকার কর ত ? তবে তাঁর সৃষ্ট সংসারে দুঃখী, তাপিত, আর্ত্তের সংখ্যা এত অধিক কেন, শতকরা প্রায় নিরানব্বই জন ? করুণাময় হয়ে এ সব তিনি কেমন করে চোখে দেখে স্থির থাকেন ? এটাই কি ঈশ্বরের অস্তিত্বে অস্বীকার করবার যথেষ্ট কারণ নয় ?'

'মানুষ নিজের কর্ম্মফলে দুঃখ পায় ; ভগবান

কি বল্‌ছেন দাদা? সাবধান হবার জন্য তাদের অন্তরে ত তিনি বুদ্ধি বিবেক দিয়েছেন।'

'বুদ্ধি বিবেক দিলে কি হবে, প্রবৃত্তি কেমন শক্ত, হৃদয় কতবড় দুর্ব্বল? যদিই তিনি সত্য-স্বরূপ ব্রহ্ম, তা হলে এ সরল সত্যটা তিনি কি বোঝেন না? বিশ্বের বেদনায় যদি এতই কাতর, তবে কেন তিনি মানবের মন অসৎ থেকে সৎ-পথের দিকে নিয়ে যান না? আবার কেনই বা তাদের কর্ম্মফল খণ্ডন কর্‌তে এতটা কার্পণ্য করেন?'

'তা হলে সৃষ্টিটা যে একঘেয়ে হয়ে দাঁড়ায়; তার বৈচিত্র্য, মাধুর্য্য কিছুই থাকে না। দুঃখ আছে বলেই ত সুখের আদর; অমাবস্যার জন্যই না পূর্ণিমার বাঞ্ছনীয়?'

'পৃথিবীতে সুখ-শান্তির মাত্রা বৃদ্ধি পেলে সৃষ্টির মধুরতা নষ্ট হয়, এটা কিছুতেই মান্‌তে পারি না বোন্। আর একটা কথা,—যদি কর্ম্মফলেই মানুষ কষ্ট পাবে, তা হলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন? চিরদুঃখী, পথশ্রান্ত, অনুতপ্ত মানব তবে কেন তাঁর শরণ নেবে, যদি তিনি তাদের চোখের জল না মোছান, দুঃখ না দূর করেন? অসহ্য যন্ত্রণায় এই যে দিবা রাত্রি তারা 'দয়াময়', 'দয়াময়' বলে মাথা কোটাকুটি কর্‌ছে, বল দেখি, তাতে মানব-দুঃখের কতটুকু লাঘব হয়েছে? যদি কেউ সৃষ্টিকর্ত্তা থাক্‌তেন, প্রতি-নিয়ত জগতের এই প্রাণফাটা ক্রন্দনে তাঁর হৃদয় কি করুণায় গলে যেত না? এতদিন কি তিনি অচল অটল স্থির হয়ে থাক্‌তে পার্‌তেন? বার-বার আঘাতে পাষাণও যে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়! ভুল! ভুল! মহাভুল! অন্ধ সংস্কারের বশেই মানুষ শুধু 'ভগবান', 'ভগবান' বলে চীৎকার কোরে মরে বৃথা সময়ের অপব্যয় করে! নেই, নেই, ঈশ্বর বলে কেউ নেই!'

আর কি বল্‌ব, ও সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানি; কাজেই চুপ করে রইলুম। আমার চোখে জল দেখে দাদা স্নেহপূর্ণকণ্ঠে বল্‌লেন—'যদি ব্যথাই পাস্, তবে ও কথা তুলিস কেন দিদি?'

আমি তখন চোখের জল মুছে ফেলে অন্য কথা পাড়্‌লুম। আর তাঁর কাছে কোনদিন ও প্রসঙ্গ উত্থাপন করি নি।

যখন বাড়ী ছেড়ে আসি, তখন আমি গর্ভবতী ছিলুম। মাস সাতেক পরে আমার একটী ছেলে হলো। দাদা আদর করে তার নাম রাখ্‌লেন, অশোক। স্বামীর দান কেবল ওইটুকুই আমি এ জীবনে পেয়েছি! অন্ততঃ, তার জন্যও তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞ থাকা না কি কর্ত্তব্য! যাক্। দাদা নাম রেখে হেসে বল্‌লেন—'ছেলেটী যাতে শোক না পায়, গোড়া থেকেই তার বন্দোবস্ত করে দিলুম!'

অশোকের জন্য ভাল দেখে একজন কি রাখ-লেন; অনেক বারণ কর্‌লুন, কিন্তু আমার কথায় তিনি কানই দিলেন না।

এমনই করে তিন-চার বছর কেটে গেল। সেই সময়ের মধ্যে স্বামীর কোন সংবাদই আমি পাই নি। তাঁকে চিঠি দিতে মনে-মনে বড় ইচ্ছা হতো। দাদাকে একদিন বলায় তিনি নিষেধ কর্‌লেন; বল্‌লেন—'তা কখনই করো না বোন্। যে নিজের গর্ভবতী স্ত্রীকে দুঃখিনী অনা-থীর মত একলা অসহায় অবস্থায় বিসর্জ্জন দিতে পারে, নারীর জীবনের যেটা প্রধান অপরাধ, সেটাকে শুধু লাগান কথায় সত্য বলে মেনে নেয়, স্বামী হয়ে যে স্ত্রীর মান-সম্ভ্রম, ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখে না আমি তাকে কাপুরুষ ছাড়া আর কিছুই বলি না। এমন স্বামীকে উপযাচক হয়ে পত্র লিখে নিজের মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ, মনুষ্যত্বকে অবমান কোরো না। না, কিছুতেই তা হতে পারে না!'

অল্পক্ষণ চুপ করে আবার বল্‌তে লাগলেন—'স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ এ কখনই নয় যে, স্বামীরা যথেচ্ছাচার, স্ত্রীদের প্রতি অযথা উৎপীড়ন কর্‌বে, তাদের দু পায়ে থেঁতলাবে, আর তারা কেবল

মুখ বুজে সেগুলো সয়ে গিয়ে পতি দেবতার পায়ে শ্রদ্ধা-ভক্তির অঞ্জলি নিবেদন কোরে দেবে! বুকের ভেতর যখন জ্বলতে থাকে, তখন শ্রদ্ধা-ভক্তি যে কেমন করে আসে, এটা আমি কিছুতেই ধারণা কর্‌তে পারি না। যদি কেউ তা কর্‌তে যায়, সেটা কখনই প্রাণের নয়;—জোর করে টেনে-বুনে শোনা উপদেশের পদানুসরণ করা মাত্র!'

'যাই বল দাদা, তবু তিনি স্বামী।'

'ওই অন্ধ-বিশ্বাসেই এ হতভাগ্য দেশের স্ত্রীলোকেরা মরেছে! তবে ঘা খেয়ে-খেয়ে আজকাল তাদের অনেকটা চৈতন্য হয়েছে। তারা আরও জাগ্‌বে;—কারণ, অন্যায় অবিচারের আসন চিরদিন কখনই সুপ্রতিষ্ঠ থাক্‌তে পারে না।'

তিনি আমাকে প্রায়ই এই সব কথা শোনাতেন। শেষে বুঝে দেখ্‌লুম,—সত্যই ত! নারী কি এত অপদার্থ! এত হীন! এতই ঘৃণ্য! সারাজীবন কেবল নির্য্যাতন সহ্য কর্‌তেই কি তাদের জন্ম! যে স্বামী বিনা অপরাধে স্ত্রীকে ত্যাগ করেন, তাঁকে মনের মন্দিরে রেখে চিরদিন পূজা কর্‌তে হবে? দাদা ঠিকই বলেছেন—যুগধর্ম্মে নারীরা প্রবুদ্ধ হয়েছে। আমরা যদি না প্রতিকারের চেষ্টা করি, দিনে দিনে অত্যাচার অবিচার না কমে, বাড়ার দিকেই এগিয়ে চল্‌বে। তবে বাধবাধভাব,—তা বহুকালের একটা মেনে-চলা-রীতিকে উল্‌টে দিতে গেলেই সেটা হয়ে থাকে; তাতে ভয় কর্‌লে চল্‌বে কেন?

একদিন বিকালে ভাঁড়ার-ঘরের জিনিষ-পত্র গুছিয়ে রাখ্‌ছি, এমন সময় ঝি এসে খবর দিলে, দাদাবাবু ডাক্‌ছেন।

আমি তাঁর ঘরে ঢুকে দেখি,—কে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাদার সঙ্গে বসে গল্প কর্‌ছেন। তাঁকে যেন দেখেছি বলে মনে হতে লাগ্‌ল;—অথচ, কবে, কোথায়, কিছুতেই স্মরণ কর্‌তে পারছিলুম না।

ভদ্রলোকটী একটু হেসে বললেন—'তুমি আমায় চিন্‌তে পার্‌বে না মা। তুমি যখন ছোট, তখন তোমাদের বাড়ীতে অনেকদিন ছিলুম। তোমায় কত কোলে-পিঠে করেছি। আমি তোমার মামা হই। তোমার মা আমার আপন মামাত বোন্‌। তুমি আমায় জান না, তার কারণ,—আমি বরাবরই পশ্চিমে চাকরী কর্‌তুম; বাঙলা দেশের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব অল্পই ছিল। পেন্সন নিয়ে এখন দেশে এসে বাস কর্‌ছি। তোমাদের সন্ধান নিতে গিয়ে শুন্‌লুম,—তোমার বাবা-মা মারা গেছেন, তুমি শ্বশুরবাড়ী। দেশের ঘর-দোর জমি-জমা না কি সমস্ত বিক্রী করে দিয়েছ?'

'আমি বিক্রী করি নি, বাবা মা মারা যাবার পর শাশুড়ী বোঝালেন—'বৌমা, তুমি দেশে গিয়ে কার কাছে আর থাক্‌বে বাছা? তার চেয়ে ও সম্পত্তি বিক্রী করে টাকাটা তোমার নামে ব্যাঙ্কে জমা করে দেব। মানুষের দরকার, আপদ-বিপদ আছে ত?'

'যদিও তাতে আমার মত ছিল না, বারবার বলাতে শেষে কি করি, বাধ্য হয়ে রাজী হলুম। কিন্তু, বিক্রী হবার পর আজ দিই, কাল দিই করে টাকা তিনি আর দিলেনই না। যতদিন কাগজে আমার সইয়ের দরকার ছিল, ততদিন একটু ভাল ব্যবহার কর্‌তেন; তারপর, আবার যে কে সেই, নিজমূর্ত্তি ধারণ কর্‌লেন।'

'তাই আমি যেতে বুড়ী এমন সব কথা বললে যে, শুনে কানে আঙ্গুল দিতে হলো। আমি কিন্তু তার কথা একটুও বিশ্বাস করি নি; কারণ, তাদের স্বভাব আমার বেশ ভালরকমই জানা আছে! গাঁয়ের লোকের এবং তোমার মাসীর কাছে খোঁজ নিলুম, কিন্তু কেউই তোমার সন্ধান বল্‌তে পার্‌লে না। সেই থেকে মাসাবধি

অনেক চেষ্টার পর কাল তোমার ঠিকানা পেয়ে এখানে এসেছি ; এখন মা, তোমার মামার বাড়ী ছেড়ে এখানে থাকা ত আর চল্‌তে পারে না। তোমার মামী একটী কচি ছেলে রেখে মারা গেছেন। এমন কেউ আপনার লোক নেই যে, তাকে দেখে-শোনে ; আর, পরের ওপর বিশ্বাস করে ছোটছেলেকে ত ছেড়ে দিতে পারি না, তাই তোমার কাছে ছুটে এসেছি। মামার অনুরোধ তোমায় রাখ্‌তেই হবে মা।'

আমি বল্লুম—'তা কেমন করে হয় মামা-বাবু? যিনি অসময়ে আশ্রয় দিয়েছেন, আমার মান, ধর্ম্মরক্ষা করেছেন, এতদিন মায়ের পেটের বোনের মত আমায় স্নেহ-যত্ন করে আস্‌ছেন, আমার ছেলে অশোক,—যাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয়, একদণ্ড তাকে না দেখ্‌লে অস্থির হন, তাঁকে ছেড়ে যাওয়া কি কর্ত্তব্য হবে? তা ছাড়া, এদিককার সংসার দেখ্‌বারও কেউ নেই ; এমন অবস্থায় দাদাকে ছেড়ে গেলে কতবড় অন্যায় করা হবে, সেটা বোধ হয় বুঝ্‌তে পারছেন? শুধু অন্যায় নয়, অধর্ম্ম।'

দাদা আমার দিকে চেয়ে স্নেহপূর্ণকণ্ঠে বল্লেন—'আমার কোন অসুবিধেই হবে না বোন্‌। আমি যা হোক্‌ বন্দোবস্ত করে নিতে পারব। কিন্তু তুমি না গেলে এঁদের বিশেষ কষ্ট হবে। তা ছাড়া, আমি যে কথা দিয়েছি ; যাও দিদি, বড় ভায়ের কথা অমান্য করতে নেই।'

তাঁর মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয়ে মুগ্ধ হয়ে নীরবে তাঁকে আমার প্রাণের নমস্কার জানালুম। যদিও যেতে আমার একান্ত অনিচ্ছা ছিল, তবু তাঁর কথা রাখ্‌তেই আমায় শুধু রাজী হতে হলো।

দু-চারদিন পরে অশোককে সঙ্গে নিয়ে মামার বাড়ী যাত্রা করলুম। যাবার সময় দাদার কাছে গিয়ে দেখি,—তাঁর দুই চোখে জল টলমল করছে। আমায় দেখে তিনি তাড়াতাড়ি সেটা কাপড়ে মুছ্‌তে-মুছ্‌তে বল্লেন—'চোখে কি ছাই যে পড়্‌ল, কিছুতেই বার হচ্ছে না। তুই তা হলে চল্‌লি দিদি! আর, মাঝে-মাঝে দাদাকে চিঠি দিতে ভুলিস নি যেন।'

তারপর অশোককে কোলে নিয়ে আদর করে চুমো খেয়ে আমায় ফিরিয়ে দিলেন। আমি তাঁকে প্রণাম করলুম। আমার মাথায় হাত রেখে তিনি কি যেন বল্‌তে গেলেন, কিন্তু পারলেন না! যতই লুকোন না কেন, আমি বুঝ্‌তে পারলুম,—তাঁর ভেতর তখন কি হচ্ছিল!

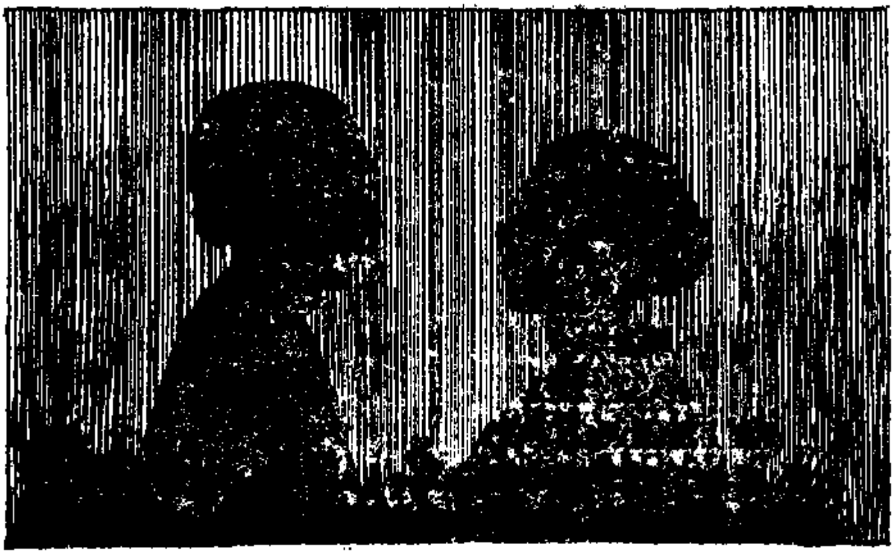
তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। সেই থেকে মামার বাড়ীতেই আছি। দাদাকে নিয়মিত চিঠি লিখি; তিনিও জবাব দেন। কখন-কখন তাঁর ওখানে কিছুদিন বেড়িয়েও আসি। মধ্যে মামাতভায়ের অসুখের জন্য হাজারীবাগে চেঞ্জে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলাপ হয় ; সেখানকার খবর ত তুমি ভালই জান।

আমার জীবনের কাহিনী সমস্তই অকপটে জানালুম। এ সব শোন্‌বার পরও কি তোমার সঙ্গে সখীত্বের বন্ধন অটুট থাক্‌বে? যদি থাকে, তা হলে তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ের আশা কি করতে পারি?

স্নেহ-ভালবাসা নিও এবং তোমার স্বামীকে নমস্কার দিও। সান্ত্বনা-মাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাতে ভুলো না। অশোক ত 'মাসীমা,' 'মাসীমা' করে পাগল! ইতি,

তোমার ভালবাসার—

[illegible]



মায়াপুরী

[ভৌতিক গল্প]

শ্রীমতী হামিদাবাণু

শিলিগুড়ির ছোট্ট ট্রেণের একটী কক্ষে চার বন্ধু। দুইজন নিদ্রিত, অন্য দুইজন প্রাকৃতিক দৃশ্যে বিভোর। পাহাড়ের গায়ে আঁকিয়া-বাঁকিয়া যে সরু লাইন গিয়াছে, তাহা ধরিয়া বক্রগতিতে ট্রেণ ধূম উদগীরণ করিতে করিতে চলিয়াছে। একদিকে সুউচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, অন্যদিকে অতলস্পর্শী 'খাদ'। মধ্যে মধ্যে পর্ব্বত গাত্র হইতে নির্ঝরিণী প্রবাহিত।

তারা ছিল ট্রেণের শেষ কামরায়। অন্য পাহাড়ে আর একটী ট্রেণ উচ্চ হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর স্থানে ছুটিয়া চলিয়াছে। যে দিকে দৃষ্টি যায়, সেই দিকেই পাহাড়;—স্তব্ধ, অচঞ্চল ভীষণ মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান। মাঝে মাঝে কুয়াসার খেলায় সব যেন মুছিয়া মুছিয়া যাইতেছে।

অচিন্ পার্ব্বত্য-পথে এই তাহাদের প্রথম যাত্রা। পূজার ছুটীর দিনগুলি একটু বিশেষভাবে উপভোগ করিতে তাহারা দার্জ্জিলিং চলিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে ট্রেণ আসিয়া দার্জ্জিলিংয়ে পৌছিল। ডাক-হাঁক্ করিয়া অপর দুইজনকে তুলিয়া চার বন্ধুতে ট্রেণ হইতে নামিয়া পড়িল।

সহযাত্রী একজন প্রৌঢ়গোছের ভদ্রলোক হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় উঠ্‌বেন আপনারা?"

প্রভাস হাসিয়া বলিল—"সে ঠিক্ করাই আছে, মায়াপুরী—আপনি?"

"আপাততঃ হোটেলে, পরে দেখে-শুনে নেওয়া যাবে। কিন্তু মায়াপুরী! খেপেছেন নাকি? না, না, সেখানে আপনাদের যাওয়া চল্‌বে না।"

"না যাওয়াও চল্‌বে না; অন্ততঃ মনেত করি তাই।......"

ভদ্রলোকটী ধীরকণ্ঠে বলিলেন—"না, না ঠাট্টা নয়, দার্জ্জিলিং সম্বন্ধে যার এতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, সেখানে যাওয়া দূরে থাক ও বাড়ীর নামও সে মুখে আন্‌বে না, ভূতের দৌরাত্ম্যে—"

প্রভাস ও সুনীল ছিল চিরকেলে একগুঁয়ে। এ কথায় হোহো শব্দে হাসিয়া উঠিল; বলিল—

"বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মশায়ের রক্ত ঠাণ্ডা এবং ইন্দ্রিয় শিথিল হয়ে পড়েছে দেখ্‌ছি। আমরা ও সব আজগুবি মানি টানি না। মরা ভূতে করবে কি? আমরাই যে এক-একটী জ্যান্ত ভূত।"

অপর দুইজন একটু ভীতুস্বভাবের, কাজেই বন্ধুদের এ কথায় সায় দিতে পারিল না। তাহাদের আমতা-আমতা করিয়া পিছাইয়া পড়িতে দেখিয়া প্রভাস হাসিয়া বলিল—"হয়েছে হয়েছে, সব জোর বোঝা গেছে। তোরা ওঁরই সঙ্গে থা; আমরা একবার দেখে আসিগে, ভূতের দৌড়টা কত। কি বলিস সুনীল?"

সুনীল বলিল—"নিশ্চয়।"

তারপর দুই বন্ধুতে মায়াপুরীর দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল।

বাড়ীটা দেখিয়া তাহারা সন্তুষ্ট হইল। যেন কোন নিপুণ শিল্পী মায়াপুরীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া নামের সার্থকতা সৌন্দর্য্যে প্রতিফলিত করিয়া রাখিয়াছে। ঘরে ঘরে ঘুরিয়া তাহারা প্রায় সমস্ত বাড়ীটাই দেখিয়া লইল; কিন্তু মালিকের সহিত চুক্তিমত কোন চাকর বা বামুনকেই দেখিতে পাইল না।

রাত্রে আহার সারিয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছে, হঠাৎ জল-প্রপাত দেখিবার খেয়াল মাথায় উঠিল। চাঁদিনী রাত, মোহন সুন্দর স্নিগ্ধ ছটায় দশ দিক মাতাইয়া যেন কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে তাহাদের আহ্বান করিতেছিল;—সে আহ্বান তাহারা অগ্রাহ্য করিতে পারিল না; বাহির হইয়া পড়িল।

অদূরেই প্রপাত; শরৎ জ্যোৎস্নার রজত-ধারায় ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিয়া দুলিয়া নৃত্য করিতেছে। মুগ্ধ-দৃষ্টিতে একাগ্রচিত্তে দেখিয়াও তাহারা যেন তৃপ্তি পাইতেছিল না। তাই মোহাবিষ্টেরই মত পায়ে পায়ে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুনীল প্রথম কথা কহিল; বলিল—"সত্যি হে প্রভাস, ভিক্টোরিয়া ফলস্‌টা না দেখ্‌লে বেশ বোকামীর কাজ করা হ'ত।"

"অতএব আজকের গোয়ারভূমি সার্থক ও সুন্দর।"

কিসের একটা বিকট শব্দে আকৃষ্ট ও চকিত হইয়া তাহারা চাহিয়া দেখিল,—তাহাদের সম্মুখে হাত দশেক দূরে একটা খণ্ডশিলার উপর একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে।

চাঁদের উপর একটুকরা মেঘ ভাসিয়া আসায় স্থানটী কেমন অস্পষ্ট ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছে। আবার সেই বিকট শব্দ পর্ব্বতে প্রান্তর কাঁপাইয়া তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল; মনে হইল,—যেন তাহাদের কর্ণপটাহ এখনি ছিন্ন হইয়া যাইবে। সুনীল ক্ষিপ্রহস্তে টর্চ্চ বাহির করিয়া সম্মুখের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিল।

সর্ব্বনাশ, একি! শিলার উপর যে লোকটী দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মুখ হইতে আধহাতটাক জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে,—একটা নর কঙ্কাল। কঙ্কাল তাহার মাংসহীন হস্তদ্বারা লোকটীর গলদেশে এমন চাপ দিতেছে যে, তাহাতে তাহার চক্ষু দুইটী কোটর হইতে ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। কপালের শিরা উপশিরাগুলি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। আর তাই দেখিয়া পশ্চাতের কঙ্কাল উন্মাদের ন্যায় বিকট চীৎকারে আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া তুলিতেছে।

সুনীলের বুকের স্পন্দন প্রায় রহিত হইল; শিথিল হস্ত হইতে টর্চ্চ ঝরণার জলে পড়িয়া তলাইয়া গেল। তাহার সমস্ত দেহ স্বেদসিক্ত এবং বেতসপত্রের মত থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিটা কিন্তু সে বীভৎস দৃশ্য হইতে ফিরিল না।

কঙ্কালের চক্ষু দুইটী যেন প্রতিহিংসার আগুনে ধকধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। মুখে কি

কুর হাসি। সুনীল শিহরিয়া উঠিল। ভগবান! ভগবান! লোকটাকে যে মেরে ফেললে!···

সুনীল উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া চলিল।···

প্রভাস "করিস কি পাগল" বলিয়া তাহার গতিরোধ করিতে চাহিল, কিন্তু পারিল না। তাহার সমস্ত শরীরের রক্ত হিম হইয়া গিয়াছে। সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হইয়া গেল। সুনীল কয়েকপদ অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই দেখিল,—নর কঙ্কাল লোকটার গ্রীবা ছাড়িয়া সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই অমানুষিক বিকট হাসি! চন্দ্রালোকে তাহার রক্তলোলুপ ধক্‌ধকে চক্ষু দুইটা সানন্দে অগ্নি উদ্গীরণ করিতে লাগিল। সুনীল ভয়ে দুই হাতে মুখ আবৃত করিল।

প্রভাস তখনও দাঁড়াইয়াছিল; তাহার বোধ হইতেছিল,—যেন দুইটা অগ্নিগোলক তাহারও আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ঝম্ ঝম্ ঝম্! মনের ভিতর প্রলয় কাণ্ড হওয়া সত্ত্বেও উভয়ে সম্মুখের দিকে চাহিল। কিসের এ শব্দ? বিস্ময় বিস্ফারিতনেত্রে তাহারা চাহিয়া দেখিল,—বাঁ হাতে লোকটার ছিন্নমুণ্ড তুলিয়া ধরিয়া নরকঙ্কাল ধেইধেই করিয়া নাচিতেছে। আর তাহারই গায়ের হাড়গুলা খড়খড় করিয়া অদ্ভুত বাদ্যের অবতারণা করিয়াছে।

হায়, কে এই হতভাগ্য! এখানে মরিতে আসিল কেন? আত্মরক্ষার চেষ্টাই বা করিল না কিসের জন্য? উহার এভাবে ঝরণার জলে নামিবার ঠিক্ উদ্দেশ্য সুনীল ধরিতে পারিল না; সভয়ে দেখিল, মৃত ব্যক্তির স্কন্ধ হইতে উষ্ণ রক্তের ফোয়ারা ঝরণার খরস্রোতে পড়িয়া স্থানটা আবীর-রাঙা করিয়া তুলিয়াছে। ক্রমশঃ তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে লোকটার দুর্গন্ধময় মাংস খসিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল।

সহসা রাস্তার অপরপার্শ্বে যেন কাহার ভয়াতুর কণ্ঠ শোনা গেল। তড়িৎ-স্পৃষ্টের ন্যায় আঁতকাইয়া উঠিয়া সুনীল চাহিয়া দেখিল,—একটী শুভ্র-বসনা নারী মুখে আঁচল চাপা দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়াছে। মেয়েটীর আজানু-লম্বিত কেশজাল সত্যই মনোহারী। সুচিক্কণ শাড়ীর আবরণ ভেদ করিয়া রূপ যেন উছলিয়া পড়িতেছে।

তাহাদের বাড়ীটার আশে-পাশে লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নাই। কেবল পাইন গাছের সারি ভূতের মত দাঁড়াইয়াছিল। এবার উভয়ে বাড়ী-টার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। গেটের গায়ে কাষ্ঠফলকে খোদিত মায়াপুরী নামটার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তাহারা শিহরিয়া উঠিয়া নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। চারিদিকের জমাট অন্ধকার জমিয়া বাড়ীটাকে যেন প্রেতিনীর আবাস করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু মায়াপুরী নামটা যেন সেই অন্ধকারকে উপহাস করিয়াই বড় বড় আগুনের গোলার মত জ্বলিতেছিল।

প্রভাসের হৃদক্রিয়া এতই বৃদ্ধি পাইল যে, বুকের ধড়াসধড়াস শব্দ ভিন্ন অন্য কিছুই শোনা যাইতেছিল না। মাতালের মত টলিতে টলিতে দু'জনে এবার পদশব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিল। নিজের নিজের দুর্ব্বলতা তাহারা কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

আবার সেই জ্বলন্ত চক্ষু তারকা তীব্র টর্চের মত আসিয়া তাহাদের দগ্ধ করিতে লাগিল। তবুও মেয়েটীর ক্রন্দনের সুর প্রভাস ভুলিতে পারিতেছিল না। ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে যে ঘর-টীতে তাহারা শয়নের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, সেইখানে আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিল,—সে ঘরটী এখন শত আবর্জ্জনায় পূর্ণ, দরজা জানালা ভাঙা, আয়নার কাচ নাই। মাকড়সার জালে ও ধূলায় ঘরখানি পরিপূর্ণ। অজ্ঞাত কি একটা কষ্টে তাহাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল।

খড়! খড়! খড়! আবার সেই বীভৎস

আওয়াজ ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যেন কাহারা কোন অদর্শনার অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে। কান্নার তখনও বিরাম নাই। অন্য কক্ষ হইতে যেন ব্যঙ্গের সুরে কাহার অট্টহাস্য ভাসিয়া আসিল—"হোঃ! হোঃ! হোঃ!"

সুনীল প্রাণপণে রাম নাম করিতেছিল; এবার মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। প্রভাস সভয়ে একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল।

কঙ্কালের হাতে মস্ত একটা কাটারী। সে সবলে তাহা চাপিয়া ধরিয়া আপন মাংসহীন পাঁজরের হাড়ে ঘষিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে কি অদ্ভুত কিরকির শব্দ বাতাসে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

পরমুহূর্তে প্রভাস দেখিল, কিয়ৎক্ষণ পূর্বে যে লোকটীকে মরিতে দেখিয়াছিল, রক্ত-মাংসের শরীরে সে আবার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহার দৃষ্টিটা কি লালসাময়ী! কাহার সন্ধানে সে যেন চারিদিকে চাহিতেছিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া কঙ্কালের সে কি উল্লাস! সে কাটারী-খানা শানাইতে শানাইতে ক্রমাগত হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিতেছিল।

সহসা দরজার বাহিরের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই প্রভাস চীৎকার করিয়া উঠিল; দেখিল,—উঠানের কদমগাছটার একটা ডালে সেই পরমা-সুন্দরী রমণী গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিতেছে। তাহার জিবটা হাতখানেক বাহির হইয়া পড়িয়াছে; চোখ দুইটী যেন আর নির্দ্দিষ্ট কোটরে থাকিতে চাহে না, ঠিকরাইয়া বাহিরে আসিতে চায়। পা দুইটী দিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া রক্তের ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে।

"ওঃ" বলিয়া প্রভাস জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। সুনীল তার অনেক পূর্ব্বেই মেঝের লুঠাইতেছিল।

* * * *

'পূর্ণিমা কটেজে'র একটী সুসজ্জিত কক্ষে কয়জন মুখোমুখি হইয়া বসিয়াছিল। প্রৌঢ় যদুনাথ-বাবু বলিতেছিলেন—"হাঁ, এমনি ছুটির দিন পেয়ে দুই বন্ধুতে এখানে বেড়াতে এসেছিল। রমণ সস্ত্রীক, অহীন একা; কারণ, সে তখনও অবিবাহিত। ঠিক সেই কারণেই তার আদর-যত্নটা বন্ধু-আলয়ে একটু বেশী করে করা হ'ত। রমণের ছিল সরল মন; অহীনের সকল সেবাভার সে নির্বিচারে সরমার হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। আর ঠিক এই কারণেই হ'ল সর্বনাশের সূত্রপাত। একদিন অহীনের হাতে রমণ প্রাণ হারাল। সরমা ও অহীনের সুখের বাস কিন্তু বেশীদিন স্থায়ী হ'ল না।

"অপমৃত্যুর ফলে রমণ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়ে ঠিক অমনি করেই একদিন ভিক্টোরিয়া প্রপাতের ধারে সে তার বন্ধুর অকৃতজ্ঞতার প্রতিফল দিয়েছিল। আর সরমা যা করেছিল, নিজ চক্ষেই ত তোমরা তা দেখেছ।

"ভাগ্যিস সময়ে গিয়ে পড়েছিলুম, নইলে কিযে হ'ত!" কথাটার শিহরণে যদুনাথবাবু একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। তারপর নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—"এর জন্যে ঠাকুরকে ঘুস কিছু মেনেছি; সেকেলে লোক আমরা, তোমাদের আজকেলের মত অবিশ্বাসী ত নই।"

বলা বাহুল্য, ইহার পর কাহারও আর দার্জ্জিলিং ভ্রমণটা উপভোগ্য বলিয়া বোধ হইল না। সেদিন প্রথম ট্রেণেই তাহারা কলিকাতা উদ্দেশে রওনা হইয়া পড়িল।



পাথর

শ্রী ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বর্ষা অন্তে শরতের প্রথমেই সেবার আমি জলপাইগুড়ি গিয়াছিলাম। জায়গাটী আমার বেশ ভাল লাগে। ইতঃপূর্ব্বে আরও দু-এক বার সেখানে গিয়াছি। সকলে তখন কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে, দুপুরে কোন কিছুই ভাল লাগিতেছিল না, পড়িবার অনেক চেষ্টা করিলাম,—সকল বইগুলিই সেদিন আমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বসিল; সেজন্য তাহাদের প্রতি আমারও মন আকৃষ্ট হইল না। সুতরাং কাজ না থাকিলে যাহা করা হয়, তাহাই করিলাম; শয্যায় শুইয়া পড়িলাম এবং ঘুমাইতে চেষ্টা করিলাম—কিন্তু ঘুম আসিল না; নিছক খোসামুদী করাই হইল—ফল কিছুই হইল না। বুঝিলাম, যাহাকে বেশী চাওয়া যায়, সেই বেশী করিয়া দূরে সরিয়া যায়। একখানা চেয়ার লইয়া বারাণ্ডায় আসিয়া বসিলাম—সম্মুখে পর্ব্বতশ্রেণী; তাহার উপর ছোট-বড় গাছগুলি মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ুতে হিল্লোলিত। অনেকক্ষণ সেদিকে চাহিয়া রহিলাম। মনটা যেন কোন্ সুদূরে অনন্তের কোলে অজ্ঞাতে ভাসিয়া চলিল—কখন সে দৃশ্য হইতে নয়ন নীল নীলাম্বরে খণ্ড মেঘরাজির আনাগোনা দর্শনে ব্যাপৃত হইয়া গিয়াছিল, ভাবিয়া পাইলাম না। এমনি করিয়া কতক্ষণ যে কাটিয়াছিল, তাহাও ঠিক্ স্মরণ নাই—অকস্মাৎ আমার চিন্তা-স্রোতে বাধা দিয়া কে যেন সুললিত মধুর-কণ্ঠে বলিল—"আমার এখানে বড় কষ্ট হইতেছে—আমাকে লইয়া চল।" আমি চমকিয়া উঠিলাম। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম; —কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। পথে জনমানব নাই; আশে-পাশে লোকের সন্ধান পাইলাম না; তবে কে কথা কহিল? একি আমার অন্তরের অভিব্যক্তি—না কল্পনার স্পন্দন! কিছুই বুঝিতে পারিলাম না—নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে কেবল স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। কেবলি মনে হইতে লাগিল, এই—মধ্যাহ্নে নির্জ্জন নির্ব্বাক্ প্রকৃতির বক্ষে কে সাড়া দিয়া উঠিল। কে আমার প্রশ্নের উত্তর দিবে?

আমার সমস্ত অস্তিত্ব লোপ করিয়া বিমুগ্ধ-বিস্ময়ে চকিত করিয়া ঠিক্ আমার সম্মুখ হইতে তেমনি মধুর কণ্ঠে উত্তর আসিল—"ভ্রম নয়, মনের বিকার নয়, কঠোর সত্য। তোমাকে আমি ডাকিয়াছি, আমাকে তুলিয়া লইয়া যাইবার জন্য।" এবারের উত্তর আমার বিস্ময়ের মাত্রা আরও বাড়াইয়া তুলিল। পূর্ব্বেরই মত চতুর্দ্দিকে

চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না—কেবল মনে হইল, যিনি কথা বলিতেছেন, তিনি আমার খুব সন্নিকটেই আছেন। আমার সন্নিকটে ও সম্মুখে যাহা কিছু ছিল, তাহা পাথর আর গাছ ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে কি গাছ বা পাথর কথা বলিতেছে,—ইহা কি সম্ভবপর; বিংশশতাব্দীর যুগে কেহ কি আমার এ কথা প্রত্যয় করিতে অগ্রসর হইবেন? কিন্তু আমি যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহা এ জীবনে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিব না।

উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কাণ খাড়া করিয়া সম্মুখের দ্রব্যগুলির উপর দৃষ্টি প্রসারিত করিলাম। এখনও সে কথা স্মরণ করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে—অপূর্ব্ব পুলকানন্দে হৃদয় ভরিয়া যায়! দেখিলাম, আমার সম্মুখে রাস্তার পর পারে কতকগুলি পাথরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পাথর নড়িতেছে এবং তাহার ভিতর হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা উচ্চারিত হইল—"আমাকে লইয়া চল; এখানে আমার বড় কষ্ট হইতেছে।" পাথরটীতে কোনও দেবদেবীর আকার ছিল না; সাধারণ এক খণ্ড প্রস্তর মাত্র। উহাকে তুলিয়া আনিয়া আমার সুটকেশের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলাম।

দুই

তারপর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছি। চার-পাঁচ মাস কাটিয়া গিয়াছে। পাথরটার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। গৃহিণী বাপের বাড়ী যাইবার সময় আমার সুটকেশটী ভাল করিয়া গুছাইয়া দিয়া গেলেন। সেই সময় সুটকেশ হইতে পাথর-খানি বাহির করিয়া বলিলেন -"এই যে দেখিতেছি তোমার অপূর্ব্ব আবিষ্কার; সাতরাজার ধন এক মাণিক—"

আমি বলিলাম—"বাঃ, আমি ত পাথরখানার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম; তুমি দেখি-তেছি এর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া গেলে।" গৃহিণীর ঠাকুর-দেবতায় অগাধ বিশ্বাস; এবং আমার নিকট পাথরের গল্পও শুনিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই আমার কথা বা পাথরখানিকে তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। আমিও সে বিষয় লইয়া তর্ক করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া একেবারে পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিয়াছিলাম।

আজ ছয় মাস পরে সুটকেশে আবদ্ধ পাথর-খানি গৃহিণীর কৃপায় বাহিরের আলোকে ও বাতাসে আসিয়া স্থান পাইল। গৃহিণী চলিয়া যাইবার পর পাথরখানিকে লইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলাম; কিন্তু আমারই মনে প্রত্যয় হইতেছিল না যে, এই পাথর একদিন কথা কহিয়াছিল। পাথরখানিকে টেবিলের উপর তুলিয়া রাখিলাম—সময় সময় উহার দ্বারা পেপার ওয়েটের কাজ হইত। তখন আর স্মরণ হইত না বা বিশ্বাস হইত না যে, এই পাথর একদিন কথা কহিয়াছে। যাহা স্বকর্ণে শুনিয়াছি, যাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বিধাতার কি বিচিত্র লীলা, তাহা আমি নিজেই বিশ্বাস করিতে পারি না; সুতরাং অন্যের নিকট কেমনকরিয়া সে অদ্ভুত কাহিনী প্রকাশ করিব।

গৃহিণী চলিয়া যাইবার দিন পনের পরে এক-দিন ঘরে বসিয়া একা তেল মাখিতেছি, এমন সময় বীণানিন্দিত-কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল—"আমার বড় গরম হইতেছে; আমাকে স্নান করাইয়া দে।" আমি সবিস্ময়ে চারিদিকে চাহিলাম, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না; বেশ স্পষ্টমনে পড়িল, পূর্ব্বশ্রুত সেই পাথরের কণ্ঠস্বর। আমার বিস্ময় তিরোহিত করিয়া পাথর বলিয়া উঠিল—"আমি টেবিলের উপর; আমাকে নামাইয়া স্নান করাইয়া দে।" সেই দিন হইতে আমার একটী কাজ বাড়িয়া গেল। প্রতিদিন স্নান করিবার সময় পাথরকে স্নান করাইয়া দিতাম। একখানি ছোট পিতলের সিংহাসন কিনিয়া আনিলাম। তাহার উপর শয্যা পাতিয়া এখন হইতে পাথরকে তাহারই উপর শুয়াইয়া রাখিতাম।

(৩)

আর এক দিনের কথা। তখন ঢাকায় হিন্দু-মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা চলিয়াছে। চিঠিপত্র আসা বন্ধ। আমার হাতে একটী পয়সা নাই। টাকার বড় টানাটানি; ঢাকা হইতে প্রত্যহ টাকার প্রত্যাশা করিতেছি। পত্র লিখিয়া, টেলিগ্রাম করিয়া কোন উত্তরই পাইতেছি না। এক-একবার মনে হইতেছে, খরচ চালাইবার মত কিছু ধার করি; কিন্তু আবার ভয় হইতেছে, টাকা যদি না আসে, তাহা হইলে বড় মুস্কিলে পড়িয়া যাইব। সেদিন রাত্রে শয্যায় শুইয়া অনেকের উপর রাগ হইল; কিন্তু শেষ রাগটা গিয়া পড়িল পাথরের উপর। ভাবিলাম, এ এক ঝঞ্ঝাট বাড়িয়াছে। প্রতিদিন ইহাকে স্নান করাইতে হইবে; কেন রে বাপু, আমার কি দায়। বলিলাম—"দেখ পাথর, কাল যদি আমার টাকা না আসে, তাহা হইলে তোমার আর বাড়ীতে স্থান হইবে না; আমি তোমাকে গঙ্গায় ডুবাইয়া দিয়া আসিব।" পরদিন ঢাকা মেল আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলাম; আপনারা বিস্মিত হইবেন না, স্তম্ভিত হইবেন না, টেলিগ্রাফিক্ মনিঅর্ডারে দুই শত টাকার স্থলে পাঁচশত টাকা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলাম; পাথরের প্রতি আমার অনুরাগ শ্রদ্ধাভক্তি বাড়িয়া উঠিল। এখন হইতে তাহার জন্য নিত্য এক পয়সার ফুলের ব্যবস্থা করিয়াছি। ফুল পাইয়া পর্য্যন্ত পাথর আর নূতন কোন কথা বলে নাই। এক-একদিন মনে হয়, কিছু ভোগের ব্যবস্থা করিলে কেমন হয়? কিন্তু তারপর মনে করি, পাথর মুখ ফুটিয়া নিজ হইতে কিছু না বলিলে আমি আর কিছু করিব না; আপন ইচ্ছায় ফুলের ব্যবস্থা করিয়াছি, বোধ হয় রাগিয়া সে কোন কথা বলে নাই। পাথরের ভিতর যে এতখানি অভিমান আছে, তাহা ত জানি না। যাহা হউক, ভবিষ্যতে পাথর যদি কোন নূতন কথা বলে, তবে তাহা জানাইতে ভুলিব না। তখন পাথর আপনি কথা বলিয়াছে,—আমি শুনিয়াছি; আজ আমি কথা বলিতেছি,—কিন্তু সে কথা বলে না, উত্তর দেয় না কেন? তার কৈফিয়ৎ সেই দিবে!





বিধাতার আল্পনা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



(ছয়)

সবার চাওয়া লোকটী তখন সকল পরিচিতের গণ্ডীবাঁধন কাটাইয়া অজানা অচেনার ভিতর তলাইয়া যাইতে বদ্ধপরিকর ; কিন্তু বিশ্বের মানব-সঙ্ঘের সংঘর্ষে আসিয়া এভাবের আত্মহত্যায় মন মাতিলেও কার্য্যতঃ তাহা এক বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যতীত অন্যে অসম্ভব। তাই, উপায়হীন কল্যাণ চিন্তার পরদার আড়ালে সরিয়া গিয়া জনবহুল ট্রেনের ছোট্ট কামরার ভিতরে আত্মগোপনের প্রয়াস পাইল। হয় ত খানিক কৃতকার্য্যও হইল। কেন না মনের দ্বারে চাবি আঁটা থাকিলে দাম্ভিক লুপ্ত জ্ঞানের বাহিরে যে অসীম, তা যতটাই সসীমের চিত্রে প্রতিফলিত হোক না কেন, ধরা-ছোঁয়ার প্রয়োজনে তার সীমাহীনত্ব অন্ততঃ তখনকার মত লোপ পাইয়া যায়।

কল্যাণ মনের সেই এলোমেলো পাগলামীর মধ্যে কখন যে কি করিতেছিল, তাহা তার নিজেরও বুঝিবার ক্ষমতা বুঝি ছিল না। তাই হঠাৎ স্কন্ধে কোন ক্ষীণ হস্তের নাড়া এবং বাহুতে আকর্ষণ পাইয়া চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল ;দেখিল,—একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক ও একটী অনিন্দ্য-সুন্দরী তরুণীর ভয়-চকিত-দৃষ্টি তাহারই উপর ব্যাকুল উদ্বেগে সীমাবদ্ধ।

না-চাওয়া লোককে হঠাৎ সম্মুখে দেখার অবস্থায় আসিয়া কল্যাণ বিকৃতস্বরে বলিল, "আপনারা—?"

প্রৌঢ় ধীর-মধুর স্নেহপূর্ণ-কণ্ঠে বলিলেন, "অমন করে ঝুঁকলে পড়ে যাবে যে বাবা! হাঁ আমরা. তোমারই সহযাত্রী।"

মনের ঘোলাটে কুয়াসা ততক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল। কল্যাণ এ সম্পূর্ণ অপরিচিতের মধ্যে হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু বিহ্বল-দৃষ্টির ক্ষুধা তখনও সমান জিজ্ঞাসু ; ঈষৎ বিরক্তির আমেজে মনটা একটু গরম হইয়াও উঠিয়াছিল। এই খোঁটানার মধ্যে পড়িয়া হয় ত সে সময় বিশেষ একটু রুক্ষতা প্রকাশ করিত ; কিন্তু আবাল্যের ভদ্রতা তার সে পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ানয় সে প্রকৃতিস্থ হইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

ভদ্রলোকটী একটু মৃদু তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "চলন্ত গাড়ী থেকে পড়লে বেঁচে ফিরে আসতে খুব কম লোকেই পারে। তুমি ত ছেলেমানুষ নও। কিছু পড়ে গেছে বুঝি ?"

একটা বিষাদের হাসির লহর কল্যাণের মুখের উপর দিয়া খেলিয়া গেল। সে উদাসকণ্ঠে বলিল, "দেখছিলুম, মানুষের ভাগ্যচক্রটা গাড়ীর চাকার সঙ্গে কতটা জড়ান থাকে ?"

তরুণীর প্রাণটা হয় ত খুবই কোমল, কেন না কল্যাণের এ উত্তর তার আঁখির দ্বারে বর্ষণের পূর্ব্বাভাষ জানাইয়া দিল। বারবার সে প্রৌঢ় ও যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া যেন আপনার বুকের সমস্ত করুণাধারায় ব্যথিতের অজানা বেদনা ধুইয়া-মুছিয়া ফেলিতে চাহিল। হয় ত একটা লঘু দীর্ঘশ্বাসও পড়িল।

প্রৌঢ় বলিলেন, "ছি বাবা, আত্মহত্যা যে মহাপাপ।"

কল্যাণ হাসিল। হতাশায় অনেকখানি কঠোর সত্যরূপ সে হাসিতে প্রকাশিত হইতেছিল। সে বলিল, 'না খেয়ে তিল তিল করে মরার নাম যে মহাপুণ্য, তা কেবল আমাদেরই শাস্ত্রে লেখে; এক অন্ধবিশ্বাসী ছাড়া তার ওপর আস্থা আজ কেউই রাখতে পারে না।"

স্নিগ্ধ মধুরকণ্ঠে প্রৌঢ় বলিলেন, "ভবিষ্যত কারও হাত ধরা নয়; অন্ততঃ আপাতঃ সেটা দেখতেও কেউ পায় না। কেবল অনুভূতির ওপর এ উত্তেজনা অন্যায়।"

কল্যাণ উন্মাদের মত হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিল; বলিল, "দেখুন, আশার কুহেলী বীনার তানে মিছে কুয়াসায় ঘোরবার ইচ্ছে আমার নেই বা অবকাশও নেই।"

মুখ ফিরাইয়া সে আবার বাহিরের নগ্ন প্রকৃতির মাঝে আত্মভোলা হইবার বৃথা প্রয়াস পাইল। তরুণী এবার কথা কহিল; বলিল, 'জিজ্ঞেস করুন না বাবা, পৃথিবীর কোন আকর্ষণই কি ওঁকে…"

কল্যাণ হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া বলিল, "স্বার্থপর পৃথিবীতে অবলম্বন বলতে মানুষ যা বোঝে, সেগুলো কেবল গলায় বেঁধে ডোববার দড়ি আর কলসী; কাজেই বাঁধন তাদের থাকার চেয়ে যাওয়াটাই অধিক প্রার্থনীয়।"

বড় করুণকণ্ঠে প্রৌঢ় কহিলেন, "পারও ত; সুখ কিন্তু এতে না থাকলে মানুষ মানুষকে চায় কেন? দাগা তুমি একটু বেশী পেয়েছ হয় ত, কিন্তু এমন ত হ'তে পারে দয়াল একটা বাঁধন কাটাচ্ছেন অনন্তের সকল দুয়ার খুলে দেবার জন্যে…"

তরুণীর মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; সে বলিল, "মানি, ভবিষ্যৎ গাঢ় অন্ধকার, ধরুন, একটু আলো কোন দিক থেকে যদি এসে পড়ে,—যে আলোয় এতদিন শান্তিতে ছিলেন, হয় ত তার তুলনায় সেটা নেহাত মুখভ্যাঙচানি হবে, তবু…"

কল্যাণ সহসা দৃষ্টিটা ফিরাইল,—উগ্র হইয়া দুকথা শুনাইবার প্রবল আগ্রহে; কিন্তু সে প্রশান্ত করুণায় বাধা পাইয়া তাহার মনের সঙ্কল্প মনেই রহিয়াগেল: তবু একটু ঝাঁঝ যা বাহির হইয়া আসিল, তাহাতে তরুণী বেশ একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। ধীরকণ্ঠে কল্যাণ বলিল, "মাপ করবেন, কারও দোরে হাত পেতে না চাওয়াটাই আমার জীবনের বদ্ অভ্যাস। আজ সে অভ্যাস ছেড়ে ফকিরি নিতে আমি আদৌ প্রস্তুত নই।"

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটী এবার কন্যার সাহায্যে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "না বাবা, চিত্রার মনের কথাটা ঠিক তা নয়। ও বলতে চায়, ধর, ভবিষ্যৎ জীবিকার উপায় যদি নিজের পরিশ্রমে তুমি করে নিতে পার, তা' হলে কি আপাতঃ তোমার মনের অসুখ কিছু কম হ'তে পারে না?"

কল্যাণ চঞ্চল হইয়া বলিল, "না, পারি না; কারণ, লোকের দোরে দোরে কেবল প্রত্যাখ্যান সহ্য করে ছুটোছুটি করব, এখন আমার মনের সে অবস্থা নয়।"

চিত্রা স্নিগ্ধদৃষ্টিতে একবার পিতার সহিত দৃষ্টি-বিনিময় করিয়া লইল; তারপর মৃদু-মধুর-কণ্ঠে বলিল, "বাবার একটা ছোটখাট কারবার আছে; তার বেবন্দোবস্ত হচ্ছে বলে একজন লোক রাখতে চান। আপনি যদি কাজটা নেন…"

কল্যাণ হাসিয়া বলিল, "আপনাদের অসীম দয়াকে ধন্যবাদ। পথের যাকে-তাকে টেনে কারবারে ঢোকালে উন্নতি যে হয় না, এটুকু বুদ্ধি লোকের মুখের দু-একটা বাজে হা হুতাশ শুনে যে ভুলে যাবেন, এ বিশ্বাস আমি করি না। তা' ছাড়া, আপনাদের কাজে যতটা দরকার, ঠিক ততটা বিদ্যে-বুদ্ধি আমার নাও থাকতে পারে। আচ্ছা নমস্কার…"

তাহাদের কোন কিছু প্রতিবাদ করিবার

পূর্ব্বেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং চঞ্চল হস্তে দ্বার খুলিয়া নামিয়া গেল।

কয়েকটা ষ্টেসন পরেই কিন্তু সে পুনরায় চলন্ত গাড়ীতে উঠিয়া আসিয়া বলিল, "এতক্ষণে বোধ হয় আপনারা আগের মতটাকে বদলে ফেলেছেন ? দুনিয়ার একটা হতভাগ্য গেল কি রইল ভাবতে চাওয়ায় লাভ-লোকসান হিসাবে এতে ক্ষতির দিকটাই বেশী প্রবল।"

প্রৌঢ় হাসিয়া বলিলেন, "আস্‌বার দিন থেকে হিসেব করে দেখ্‌লে বাবা তোমার চেয়ে এ পৃথিবীতে আসাটা আমার আগে ; কাজেই এ বিষয় আমি কিছু বেশীই বুঝি।"

কল্যাণ চঞ্চল হাসি হাসিয়া বলিল "নয় আমি যদি পাষণ্ড, খুনে, কি জাতিচ্যুত হই ?"

প্রৌঢ় আবার হাসিয়া বলিলেন, "সে বিচার আমার, তোমার নয়! যারা বনের বাঘ-ভালুককে এনে পোষ মানায়, মানুষ তাদের চেয়ে হিংস্র হ'তে পারে কি ? কি বল ?"

কল্যাণ বলিয়া ফেলিল, "তবে তাই হোক্, আমি রাজী। এমন করে কুকুরের মত ভয়ে-ভয়ে বেড়াতে আর পারি না!"

চিত্রা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িল।

সাত

যাত্রার পূর্ব্বে অপর্ণা যতটা গম্ভীর হইয়াছিল, পথে ঠিক ততটাই সংযম-হীনতার পরিচয় দিল। এখন যে ষ্টেসনটায় গাড়ী ধরিল, সেখানে খাবার-ওয়ালাকে ডাকিয়া সে অনর্থক গোলযোগের সৃষ্টি করিল। খাদ্যের প্রত্যেকটিই নাকি ঘিয়ের বদলে তেলে ভাজিয়া লোকটা লোক ঠকাই-তেছে আর এই অজুহাতেই তার খাবারের কতকটা নাকে শুঁকিয়া সে দূরে ফেলিয়া দিল। পরেই কিন্তু মনিব্যাগ খুলিয়া লোকসানী খাবারের দাম আটআনার স্থলে দুই টাকা দিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "মাগো, রেলের সব লোকগুলোই কি এমনি ঠক্!"

আত্মভোলা সদানন্দবাবুর কিন্তু এ দিক্‌টা লক্ষ্যের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। পূর্ব্ব ষ্টেসনে কেনা একখানা দৈনিক তার বাহ্যিক জ্ঞান নিঃশেষে হরণ করিয়া লইয়াছিল। কন্যার ডাকে চমক-ভাঙ্গা হইয়া তিনি শুধু ফ্যাল্‌-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

গাড়ীতে আর একদল যাত্রী ছিলেন। অপর্ণার ব্যবহার এবং বৃদ্ধের ভাবগতিক দেখিয়া তাহারা সরবে হাসিয়া উঠিলেন। অন্তরে লজ্জা পাইলেও বাহ্যিক বেশ একটু ক্রোধের ভাব দেখাইয়া অপর্ণা মুখ ফিরাইয়া বসিল।

দলের একজন সাহস করিয়া বৃদ্ধ সদানন্দ-বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "রাস্তার খাবার কোন কালেই ভাল হয় না। যদি কিছু মনে না করেন, আমাদের কাছে·

অসহিষ্ণুভাবে অপর্ণা হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া রুক্ষস্বরে বলিল, "আপনার এ অযাচিত ভদ্রতাকে ধন্যবাদ! খাবার আমাদেরও আছে। আর না থাক্‌লেই যে পথের যে কোন অপরিচিতের কাছে হাত পাততে হবে, এতদূর কাঙাল হয়ে আমরা জন্মাই নি।"

কন্যার মুখে এত বড় অশিষ্টতার কথায় বৃদ্ধ সদানন্দ বেশ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন ; হঠাৎ উভয় পক্ষের কাহাকে কি বলা উচিত, তাহা তিনি ভাবিয়াও পাইলেন না। তারপর কি যেন মনে হওয়ায় বলিয়া ফেলিলেন, "হঠাৎ চন্দন গ্রাম ছেড়ে চলে এসে, মনটা তিক্ত হয়ে উঠেছে না মা অপর্ণা ?"

অপর্ণা বেশ একটু উত্তেজনাপূর্ণ-কণ্ঠে বলিল, "হাঁ, তিক্ত হয়েছে। কিন্তু কারণ আপনি যা বল্‌লেন, তা' ছাড়া অপর কিছুও হ'তে পারে। আস্‌ছে ষ্টেসনে গাড়ী থামলে, আমি কামরা বদল করে নেব ?"

কথাটা বলিয়া সে যে ভাবে কামরার অপর দিকটায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল,

তাহাতে কারণটা বুঝিয়া লইতে কাহারও বাকী রহিল না। দলের একজন মুখর লোক বেশ একটু বিরক্ত-কণ্ঠে বলিল, "এতই যদি গরব, গাড়ী রিজার্ভ করা উচিত। আমরা কিন্তু জানি, চলতি গাড়ীর এই কষ্টটুকুই সুখ।

সদানন্দবাবু লোকটীর প্রথম অর্দ্ধ শুনিয়াছিলেন, এবং তাহারই উত্তেজনায় শেষাংশ কাণে যায় নাই। লোকটীর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "সেইটেই ভাল ছিল মা, সলিলাও বলেছিল। গাড়ী ঠিক করাও হ'ল, তুই কেবল উঠ্‌লি না।"

সলিলার নামে অর্পণার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। সে বেশ একটু উষ্ণ হইয়া বলিল, "আপনি বোঝেন না বাবা, চুপ করে থাকুন। হীনতা স্বীকার শুধু প্রতিগ্রহে হয় না, সে চিন্তাতেও হয়।"

পরের ষ্টেসনে গাড়ী আসিতেই সে হাত-বাক্সটা তুলিয়া বলিল, "আসুন বাবা।"

বৃদ্ধ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; বলিলেন, "এর মধ্যেই কি হাবড়ায় এল মা?"

অর্পণা তীক্ষ্নস্বরে বলিল, "না, ওদিকটাই আমরা যাব না; মিছে দেশ-বিদেশ ঘুরে কোন লাভ নেই।"

গাড়ীর ভিতরের একটী যুবক এতক্ষণ ধীর-ভাবে একপার্শ্বে বসিয়াছিল, এবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, "মাপ্‌ করবেন; গাড়ীর বাইরে যদি কেউ যায়, আমারই কারণ। একজন মহিলার বিরক্তির প্রায়শ্চিত্ত···"

অর্পণা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ধন্যবাদ!"

পর মুহূর্ত্তে সে ট্রেণ পরিত্যাগ করিল। অগত্যা সদানন্দবাবুকেও অনিচ্ছায় পা বাড়াইতে হইল। কিন্তু গাড়ীখানি ঠিক সেই সময়েই ছাড়িয়া দেওয়ায় ভিতরের লোক কয়টী এক প্রকার জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া রাখিল। ভিতর হইতে একটা কলরব ছুটিয়া আসিয়া অর্পণাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিল, তার অবিমিশ্রকারিতার ফল কত বেশী!

অদূরের একটা কামরা হইতে একটী যুবক ক্ষিপ্রগতিতে ট্রেণ হইতে নামিয়া পড়িল। কিন্তু দু-একপদ অগ্রসর হইতে না হইতেই পিছনের একটী লোককে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া চলন্ত একটা গাড়ীর হাতল ধরিয়া টাল সামলাইতে সামলাইতে আবার ট্রেণে উঠিয়া পড়িল। তারপর মুখ ফিরাইয়া ধীরকণ্ঠে বলিল, "আপনার বাবা যে কতটা অসহায় জানি; ভয় পাবেন না, পরের গাড়ীতে আসুন। সামনের ষ্টেসনটায় আমি ওঁকে নামিয়ে দিতে পারব।"

অর্পণা সহসা দু'-চারিপদ অগ্রসর হইল। তার বিস্ময়-বিমোহিত-কণ্ঠ হইতে অতি সহজেই উচ্চারিত হইল, "একি! একি!—কল্যাণবাবু, আপনি?"

যুবক হাত তুলিয়া মৃদু হাস্যে নমস্কার জানাইল। পরক্ষণেই দ্রুত গমনশীল গাড়ীর ব্যবধানের মধ্যে পড়িয়া অর্পণা আর কাহাকে চেষ্টা সত্ত্বেও দেখিতে পাইল না। পিছন হইতে একটী লোক ডাকিল, "দিদিমণি—"

মাধবকে দেখিয়া অর্পণার অন্তর চঞ্চল হইয়া উঠিল;—সে বলিল, "একি আপনি!"

"বড় দিদির হুকুম দিদিমণি আপনাদের পৌঁছে দিয়ে ফিরতে হবে।"

অর্পণা কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না; মাধবের মুখের দিকে উদাস-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

আট

লোকে কেন যে এমনভাবে তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা-পাশে জড়াইতে চায়, অর্পণা চেষ্টা করিয়াও তাহা বুঝিতে পারিল না। আর পারিল না, এ দুই বিষণ্ণমুখী টান্ কেবল তাহারি উপর সীমাবদ্ধ হয় কি করিয়া।

মাধব বলিল, "রোদে দৌড়িয়ে মিছামিছি কষ্ট স্বীকার কেন করছেন দিদিরাণি ; চলুন, আপনাকে বসিয়ে খোঁজ নিই, গাড়ীর কত দেরী।"

প্রতিবাদের ঝাঁজ অর্পণার প্রাণে তত জোরে সাড়া জাগাইতে না পারিলেও সে বিরক্তি-চঞ্চল চক্ষু তুলিয়া বলিল, "এমন ক'রে আমাদের জ্বালাতন করবার অভিসন্ধিটা কি আপনাদের বলতে পারেন ?"

মাধব হাসিল ; বলিল, "আমি সামান্য লোক দিদিরাণি, কাজেই ওকথার জবাব দিতে পারব না। দিদিমণির সঙ্গে দেখা ত হবে, তাঁকেই জিজ্ঞেস করবেন। আমি বরং দেখে আসি, ট্রেণ কতদূরে।"

সে চলিয়া গেল। রক্তজবা গাছের তলায় পাতা বেঞ্চখানির উপর বসিয়া অর্পণা বুঝি তেমনি রক্তাক্ত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিল,—প্রত্যাখানের বিষ অবহেলায় পান করিয়া নীলকণ্ঠের মত মানুষ মানুষকে এতটা স্নেহের নিগড়ে বাঁধে কি করিয়া ?

মাধব ফিরিয়া আসিল। রেল কর্ম্মচারীদের উপর নিদারুণ বিরক্তিতে তার হৃদয়টা অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল ; তাই ট্রেণ আসার সঙ্গে সঙ্গে সে আরম্ভ করিল, "আমি যদি এদের বড় সাহেব হতুম দিদিরাণি, তবে টিকিট-মাষ্টারকে আগে তাড়াতুম।"

তার বিরক্তি প্রকাশের ভাব দেখিয়া অর্পণা নিজের চিন্তার খেই হারাইয়া ফেলিল ; বলিল, "কি হ'ল আপনার ?"

মাধব উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিয়া চলিল—"কথা জিজ্ঞেস করলুম, জবাব্ ত দিলেই না, উল্টে হাত বাড়িয়ে দিলে, দাও ঘুষ। আমার তেমনি পেয়েছে আর কি ! দিচ্ছি এই যে ; নিক্, এবার কত নেবে !"

স্মিতমুখে অর্পণা বলিল, "কি করবেন ঠিক্ করলেন তা' হ'লে ?"

মাধব গম্ভীরভাবে বলিল, "ওদের খোসামোদ আর করব না ; গাড়ী এলেই সটান গিয়ে উঠে পড়ব।"

অর্পণা মৃদু হাসিয়া বলিল, "টাইম টেবিলটা দেখ্‌লেই পারতেন।"

মাধব আকাশ হইতে পড়িল ; বলিল, "ওই দেখ্‌ছ দিদি, কথাটা মাথায়ই জোগায় নি ; যাচ্ছি দেখে আস্‌তে !"

অর্পণা বুঝিল লোকটী সরল নিরীহ ; এক কথায় গো বেচারী ! সে মনে মনে এমন এক জনকে সঙ্গে দেওয়ার জন্য সলিলার উপর মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে যখন সেই নির্ব্বোধ লোকটী আসিয়া সংবাদ দিল,—পথের কষ্ট যতই হউক, এভাবে এখানে অপেক্ষার কষ্টটা যে তাহার অপেক্ষা ঢের বেশী, তাহা বুঝিয়া এবং ট্রেণের ঘণ্টা দুই দেরী দেখিয়া সে একখানি মোটর ভাড়া করিয়া আনিয়াছে। হয় ত সময়ের সংক্ষেপ তাহাতে নাও হইতে পারে, কিন্তু মনের চাঞ্চল্যের হাত হইতে অন্ততঃ কতকটা যে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তখন অর্পণা এই তুচ্ছ লোকটাকে আর তুচ্ছের আসনে বসাইয়া দেখিতে পারিল না ; বরং পূর্ব্বাপর ভালরূপ না বুঝিয়া কাহাকেও মনের নিক্তিতে ওজন করিতে চাওয়ার মূর্খতায় অন্তরে বেশ একটু লজ্জিত হইল।

তাহার নিশ্চেষ্ট অবস্থা দেখিয়া মাধব কিছু চঞ্চল হইল ; বলিল, "হয় ত ভুল করেছি, এই বলেন যদি,মোটরটা ফিরিয়েই দিই ; দেরী হয় যদি, কাজ নেই।"

অর্পণা সহাস্যমুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"না, না, আপনি ঠিকই করেছেন। দু'ঘণ্টা এখানে এভাবে কি কাটান যায়। চলুন না, দেরী আর কি বরং আগেই পেঁছাতে পারব।"

মাধবের মুখখানায় আনন্দের ঢেউ বহিয়া গেল। লুকাইবার কোন চেষ্টা এ সরল লোকটীর ভিতর

না থাকায় সে বেশ একটু উৎফুল্ল স্বরে বলিল, "আর একা তিনি সেখানে বসে কত কি না ভাবছেন। ট্রেণের আগে দেখ্‌তে পেলে নিশ্চয়ই খুসি হবেন।"

অর্পণা যাইতে যাইতে বলিল, "তিনি ত একা নন, দেখ্‌বার লোকের অভাব সেখানে হবে না।"

মাধব বলিল, "ক্ষেপেছেন, ওই লোকগুলো তাঁকে সাহায্য করবে, তবেই হয়েছে। আমি ভাল জানি দিদিরাণি, মানুষের মধ্যে ওগুলো জানোয়ার।"

অর্পণা হাসিল; বলিল, "ওরা নয়—কেন আর একজন যে সঙ্গে গেলেন, দেখেন নি বুঝি তাকে?"

মাধব স্বীকার করিল যে, সে অর্পণাকে হঠাৎ এ পথের মাঝে নামিয়া পড়িতে দেখিয়া কিছুক্ষণ হইতে এতটাই চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল যে, অন্য কোন দিকে নজর দিবার অবসর তাহার হয় নাই; আর সমস্ত ট্রেণ হইতে সে নিজে যখন নামিতে তিন ঘণ্টা টাল সাম্‌লাইয়াছে, তখন অন্য কেউ যে এ অবস্থায় গাড়ীতে উঠিতে পারে, সে বিশ্বাসও তাহার নাই।

অর্পণা বলিল, "তা হ'লে আপনি একটা বড় ভুল করেছেন বল্‌তে হবে। আমাদের সবার পরিচিত একজন নিজের জীবনকে বিপদের মুখে ফেলেও ছুটে গিয়েছেন। তাঁকে দেখ্‌তে পেলে হয় ত আপনি খুসিই হ'তেন।"

মাধব অবাক্ বিস্ময়ে শুধু চাহিয়া রহিল। তারপর একটা বড় গোছের নিশ্বাসে বুকের সবটুকু উৎকণ্ঠা যেন নামাইয়া দিয়া বলিল, "এমন লোক জগতে আছে, কিন্তু বড় কম। আজ পর্য্যন্ত দাদাবাবু ছাড়া…"

অর্পণা মীরকণ্ঠে বলিল, "তিনিই।"

মাধব লাফাইয়া উঠিল; বলিল, "বলেন কি! তবে ত দিদিরাণিকে খবর দিতে হবে। একটু দাঁড়ান, একটা তার পাঠিয়ে দিয়ে এখুনি আস্‌ছি।"

মোটরে চড়িয়া অর্পণা জিজ্ঞাসা করিল, "এতটা ব্যস্ত হয়ে তাঁকে তার পাঠালে তিনি—"

মাধব অর্পণার মুখের দিকে চাহিয়া অবিশ্বাস-ভরে মাথা নাড়া দিল; বলিল, "না, না, তা হ'লে মোটেই চেনেন নি তাঁকে! ভাই-অন্ত-প্রাণ; এ খবর পেলে তিনি যে কত খুসী হবেন…"

অর্পণা একটু উষ্ণ হইল; বলিল, "রাখুন, আমি বিশ্বাস করি না; তা হ'লে কাজের দিন শুধু গায়ে এমনি করে ভাইকে কেউ তাড়িয়ে দেয়?"

মাধব তার দিদিমণির পক্ষ সমর্থন করিল; বিশেষ একটু চেষ্টিত হইয়া চঞ্চল-কণ্ঠে বলিল, "আপনি জানেন না, কেবল অপমানের হাত থেকে ভাইটিকে বাঁচাতে তার এত আগ্রহ। শিরোমণি যে কাণ্ড করেছিল।"

ইহার পর অতি সহজেই পূর্ব্ব-ইতিহাসের পাতার পুনরুদ্ঘাটনের প্রয়োজন হইয়া পড়িল। অর্পণা একটি একটি করিয়া প্রায় সব কথাই জানিয়া লইল; কিন্তু তবু মনের কোণে কেমন যে একটা সন্দেহের নিবিড় ছায়া ঘন হইয়া রহিল, কিছুতেই তাহা আর দূর হইতে চাহিল না। মোটরটা তখন ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সড়ক ধরিয়া দ্রুত-বেগে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল। (ক্রমশঃ)





সম্পাদক—শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৬ষ্ঠ বর্ষ } ৫ম সংখ্যা

অনভ্যাসের ফোঁটা

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ, বি-এ

প্রথম

কেরাণীর জীবনে বিশ্রাম কথাটা উপলক্ষ করিয়াই মনে হয়,—'পেয়াদার আবার শ্বশুর-বাড়ী।' কিন্তু বিজনের মনে হইল,—পেয়দার যদি বা শ্বশুর-বাড়ী জুটিয়া যায়, কেরাণীর জীবনে বিশ্রামের আশা একেবারেই নাই। পাছে চাকুরী যায়, এই ভয়ে না কি তাহাদের মরিতেও ভয় করে। কিন্তু এই মাত্র তাহার এক মাসের ছুটীর মঞ্জুরী-পত্রখানা হাতে আসিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিল,—এই এক মাসের মধ্যে মরিলেও তাহার চাকুরী যাইবে না; সুতরাং, সে এখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া যাইতে পারে।

যাহা ইচ্ছা করা যায়, এমন কি বড় সাহেব হইতে বড় বাবু পর্য্যন্ত সকলের মাথা কাটিয়া গেণ্ডুয়া খেলিবার কল্পনা দিনে অন্ততঃ দশবার করিয়াও, এই একমাস ছুটীটা কি উপায়ে ঠিক্ ভোগ করা যায়, বিজন তিন-চারিদিনেও তাহা স্থির করিতে পারিল না। সে যে এই কয়দিন এমনি ঘুমাইয়া আর পথে ঘুরিয়া কাটাইবে, তাহা কোন রকমেই হইতে পারে না; যা হোক্ একটা মনোমত কিছু করিতেই হইবে। কিন্তু জীবনে জ্ঞানের উন্মেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ধারাবাহিক দশটা-পাঁচটা যাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষে সাহেব আর বড় বাবুকে অসাক্ষাতে দুই-চারিটা অশ্রাব্য কটূক্তি করিয়া গালি দেওয়া, আর প্রত্যক্ষে

আত্মুমি সেলাম বাজান যতটা সহজ সাধ্য, ভাবিয়া মানোমুগ্ধকর কিছু স্থির করা ততোধিক দুঃসাধ্য।

শ্রান্ত হইয়া বিজন স্থির করিল, সবিতাকে ডাকিয়া একটা পরামর্শ করিবে। অবশ্য এই কাজটাতে নিজেকে অনেকটা খাটো করিতে হইবে; কিন্তু উপায় কি? তা ছাড়া, কালিদাস বলিয়াছেন—সচিবঃ; সুতরাং, সবিতার সহিত পরামর্শ করাই স্থির। কিন্তু গত দশ বৎসরের দাম্পত্য-জীবনের মধ্যে মাসের পর মাস একমাত্র অর্দ্ধ-জাগ্রত অবস্থায় যাহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটে, তাহার সহিত...। কিন্তু বিজনকে এই অশোভন অবস্থার হাত হইতে রক্ষা করিল, সবিতা স্বয়ং।

সেদিন দিবানিদ্রা সারিয়া বোধ করি কোন কাজেই আসক্তি না থাকাতে, বিজন বিরস বদনে ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সবিতা হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া বলিল—"একটা কাজ করবে? কর ত বলি।"

বিজন ত অবাক্। এমন ভাবে সাধিয়া কোন কিছু সবিতা কোনদিন বলে না; অথচ, কি যে সে বলিয়া বসিবে, তাহা বুঝিয়া লইবার অভ্যাসও বিজনের নাই। সে মুখখানাতে রাজ্যের ঔৎসুক্য লইয়া সবিতার দিকে চাহিল। তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না

সবিতা বিজনের অবিন্যস্ত চুলের গোছার সদগতি করিতে করিতে বলিল—"কি গো, চুপ করে গেলে যে একেবারে?"

"কি করি বল; অনেকদিন এক জায়গায় বাস করি সত্য, কিন্তু তোমার এ মূর্ত্তি কখনও দেখি নি।"

কথাটায় দোষ কিছু ছিল না; কিন্তু দোষ ঘটিল তাহার বলার নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে! সবিতা আহত হইয়া বলিল—"কি মূর্ত্তি আবার দেখ্‌লে, কথায় ছিরি দেখ! আমি কি মূর্ত্তি দেখাতে এসেছি—বলে" বলিয়া বোধ করি একটা মেয়েলী ছড়া কাটিতে যাইতেছিল বিজন বাধা দিয়া বলিল—"আহা, আমি কি তাই বল্‌লাম; আর যদি বলেই থাকি, গুরুতর অপরাধ হয় নি কিছু তাতে। এখন বল, কি বল্‌তে এসেছিলে।"

"থাক্; আর বলে কাজ নেই। যা নয় তাই; আমি তোমাকে বাহার দিয়ে রূপ দেখাতে এসেছি, না?"

বিজন দেখিল, প্রমাদ উপস্থিত। বেফাঁস কথাটা বলিয়া যে আগুন জ্বালাইয়াছে; সাত সমুদ্রের জলেও সে আগুন নিভিবে কি না কে জানে! তথাপি শ্রীদুর্গা বলিয়া প্রস্থান-পরায়ণা গৃহিনীকে তুষ্ট করিতে দ্বিতীয়বার চেষ্টা করিতে উদ্যত হইল। সে কহিল—"রাগ করে ত চল্‌লে, কিন্তু একটা মজার খবর আছে; তোমায় শোনাব বলে বসে রয়েছি, তা জান?"

বিজনের হাতখানা কাঁধ হইতে বিরাগভরে সরাইয়া দিয়া সবিতা ঘরের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল এবং সগর্জ্জনে যাহা বলিয়া গেল, তাহার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে বিজনের বুদ্ধি ওলট পালট হইয়া গেল। সে শুধু ভাবিতে লাগিল,—বড় বাবুর মন যোগান আর এই সবিতার মন যোগান এই দু'য়ের মধ্যে প্রভেদ কোন্ খানটায়?

ভাবিয়া ভাবিয়া বোধ হয় কোন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চলিয়াছে, এমন সময় জ্যেষ্ঠ পুত্র আসিয়া সংবাদ দিল,—রক্ হইতে পড়িয়া গিয়া খুকীর কপাল কাটিয়া গিয়াছে; রক্ত যাহা পড়িতেছে, সবই লাল। একে কপাল কাটা, তাহাতে রক্তপাত এবং সেই রক্ত যখন সমস্তই লাল, বিজনের রক্ত তখন হিম হইয়া গিয়াছে; চোখের সম্মুখে আফিসের বড় সাহেব, বড় বাবু, আরদালি, খোঁড়া মেম, যার ডেলহাউসী স্কোয়ার যুগপৎ তাণ্ডব জুড়িয়া দিল। সে যে, এই অবস্থায় কি করিবে, কিছুই তাহার বোধগম্য হইল না।

পিতার সহিত যথেষ্ট পরিচয় না থাকিলেও

তাহার মনোজগতের কোন রাজ্যে যে বিপ্লব বাধিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া এবং এই ক্ষেত্রে তাহার নিজের কিছু করিবার উপায় না থাকায় বালকের একমাত্র আশ্রয়স্থল মায়ের কথা মনে পড়িয়া গেল। সে ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিল—"মাকে ডাক্‌ব বাবা ?"

বিজনের দেহের সমস্ত রক্ত তখন মগজে চড়িবার উপক্রম করিতেছে। নীচে খুকীর তার স্বরে চীৎকার সবিতার সানুনাসিক তর্জ্জন, ও ঝির অসংলগ্ন উচ্চধ্বনি, এই সবগুলির সমবায়ে যে ঐক্যতান সুরু হইয়াছে, তাহাতে রক্ত মাথায় চড়ে না, এমন জমাট রক্ত দুর্ঘট। বিজন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পুত্রের গণ্ডে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া তাহাকেও ঐ ঐক্যতানের বাদক করিয়া দিল, এবং এক মুহূর্ত্ত সেই তান-ধরা ছেলেটার মুখের প্রতি রক্ত-নেত্রে তাকাইয়া আলনা হইতে হাতের কাছে যাহা পাইল একটা টানিয়া লইয়া ফিরিয়া চাহিতেই দেখিল,—কপালে ফেটি বাধা খুকীকে কোলে লইয়া সবিতা দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা। তাহার পরিধেয়ের সর্ব্বত্র খুকীর কপাল কাটার চিহ্ন বর্ত্তমান। দেখিয়া বুঝিল,—ছেলের কথা খাঁটি সত্য; খুকীর কপাল হইতে যে রক্ত পড়িয়াছে, তাহা বাস্তবিকই লাল। কিন্তু বিজন যতই রক্তের বর্ণ সম্বন্ধে সন্দেহহীন হইতে লাগিল, তাহার নিজের রক্ত ততই জমাট বাঁধিতে লাগিল। সে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া আলনা হইতে যাহা লইয়া কাঁধে ফেলিয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার যথাস্থানে রাখিয়া শয্যা আশ্রয় করিল। এতক্ষণ যে ঐক্যতান তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা আর তাহার কানেও প্রবেশ করিল না।

কিছুক্ষণ পরে সে শুনিল,—সাহেব তাহাকে খাস-কামরায় ডাকিয়া বলিতেছে, এরকম করিয়া ছেলে ঠেঙাইলে তাহার চাকরী যাইবে। ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বিজন দেখিল, সাহেবের খাস-কামরায় নয়, সে আপন শয়ন-গৃহে বসিয়া। সম্মুখে দাঁড়াইয়া সাহেব নহে, সবিতা; তাহাকে চা খাইতে বলিতেছে।

দ্বিতীয়

সকালে উঠিয়া বিজন সবেমাত্র চায়ের কাপে মুখ দিয়াছে এমন সময় সবিতা আসিয়া বলিল,—"আজ একবার সুষমার ওখানে যাও; দু'মাস ধরে সে বলে পাঠাচ্ছে, তোমার আর হয়েই ওঠে না।"

সবিতার কথার ঝাঁজ দেখিয়াই বিজনের বুকের মধ্যে গুলিয়া উঠিয়াছিল—তাই চায়ের পেয়ালা সরাইয়া রাখিয়া পত্নীর মুখের প্রতি শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু পেয়ালাটা যে কোথায় নামাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহার সেদিকে খেয়াল ছিল না; সুতরাং খাটের প্রান্ত হইতে তীক্ষ্ণ চীৎকার এবং স্ত্রীর মুখ হইতে কাতরোক্তি বাহির হইতেই বিজন দেখিল,—যেখানটায় কাপটী নামাইয়া ছিল, সেখানটা খাটের অংশ নহে, খুকীর মস্তক। পেয়ালা অবলম্বন না পাইয়া অন্তরস্থিত ধূমোদ্গারী সমস্ত তরল পদার্থটুকু খুকীর সর্ব্বাঙ্গে উজাড় করিয়া দিয়া সবিতার পায়ে লুটাইতেছে। জ্বালায় খুকীর গৌর অঙ্গ রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে।

বিজন কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া ঘরের কোণ হইতে একটা বোতল তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে খাটের দিকে আসিতেই সবিতা বলিয়া উঠিল 'চা ঢেলে মেয়েটাকে ত পোড়ালে, এখন স্পিরিটের বদলে কেরোসিন দিয়ে আরও একটু জ্বালাও। একটা কাজের যদি ছিরি থাকে! তুমি আফিসে কাজ কর কি করে, তাই ভাবি।"

বিজনের প্রাণ তখন পলাই-পলাই করিতেছে। সে ত্রস্তে বোতলটা যথাস্থানে রাখিতে গিয়া সেটিকে ভাঙিয়া ঘরময় কেরোসিন ঢালিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে একান্ত বিষন্ন-দৃষ্টিতে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সবিতা বালিসের তলা হইতে একটা দিয়াশলাই বাহির করিয়া

বিজনের গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—"এবার বাকীটুকু সেরে ফেল—লঙ্কাকাণ্ড হয়ে যাক্।"

বিজন ছোট করিয়া কহিল—"অসাবধানে রাখ্‌তে গিয়ে…"

"থাক্; আর তোমাকে সুর ভাঁজতে হবে না—এমন মানুষ নিয়েও পড়েছি যে, দু'মিনিট যদি সোয়াস্তি পাই।"

বিজন দেখিল, আজ আর নিস্তারের আশা নাই—সে কাঁদকাঁদ হইয়া বলিল—"আমি তা'হলে সুষমার ওখানেই যাই।"

"সে তোমার ইচ্ছে—আমি ত তখন থেকেই বল্‌ছি।"

"কিন্তু এ সব ছড়ান রইল—এগুলো……"

সবিতা আগুন হইয়া বলিল—"বাইরে যাবে, না দাঁড়িয়ে রাগিণী ভাঁজবে? তোমার জ্বালায় কোথায় যাব বল ত।"

বিজন দেখিল, আর সেখানে অপেক্ষা করা সুবিধা নয়; চাদরখানি টানিয়া লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু কপাল যাহার ভাঙ্গে, তাহার সব দিক দিয়াই ভাঙ্গে। সুষমা বিজনের ছোট বোন্; পল্লীগ্রামে বিবাহ হইয়াছে। ইচ্ছামত দাদার কাছে যাওয়া তাহার ঘটিয়া উঠে না। আর বিজন একলা লোক, অফিস আর ঘর, ঘর আর অফিস ক্রমাগত এই করিয়া ছ'মাসের মধ্যেও একবার তাহার খবর লইতে পারে না।

আজ সবিতার তাড়া খাইয়া এবং বুদ্ধির দোষে যে কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার ফলভোগের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার আশায়, বিজন সুষমার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহার সাক্ষাৎ পাইল না। তখন বেলা প্রায় বারটা হইবে। অভুক্ত, চিন্তাক্লিষ্ট বিজন দেখিল,—সুষমাদের সদরে তালা বন্ধ; বাড়ীতে কেহ নাই। লোকমুখে শুনিল, সুষমার ভাগিনেয়ীর বিবাহ উপলক্ষে তাহাদের গৃহের সকলে কুটুম্বিতা রক্ষা করিতে গিয়াছে। বিজনেরমনের মধ্যে তখন বারবার করিয়া অফিসের কেশববাবুর কথাটাই উঠিতে লাগিল।

কেশববাবু কেরাণী। পুরুষানুক্রমে একই অফিসে কার্য্য করিয়া কেরাণী হিসাবে কৌলিন্য অর্জ্জন করিয়াছেন। তাহার তেত্রিশ বৎসরের কর্ম্ম-জীবনের মধ্যে একদিনও অনুপস্থিতি বা বিলম্বে উপস্থিতি নাই। বিজনের ছুটী লইবার অভিলাষ জানিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"ও কাজটী করো না ভায়া—আয়ুক্ষয় হবে।"

বিজনের মাত্র কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা। কেশববাবুর কথায় গূঢ় অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সে একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছিল।

কেশববাবু তাহাতে বলিয়াছিলেন—"ওটা মোটেই হাসির কথা নয়। কর্ত্তারা বল্‌তেন—'বাঙ্গালীর প্রাণ তেলে জলে'; কিন্তু এখন আর সে দিন নেই। এটা হলো বিজ্ঞানের যুগ, সভ্যতার আবহাওয়া—তাই বাঙ্গালীর প্রাণ দশটা-পাঁচটায় পৌঁছে। নিয়ম মত ঐটারই অনুশীলন কর, আয়ু বাড়্‌বে।"

বিজন দেখিল,—কেশববাবুর কথায় কোথাও এতটুকু মিথ্যার স্পর্শ নাই। একমাস ছুটীর ছয়-দিন মাত্র কাটিয়াছে, ইহারই মধ্যে তাহার বিড়ম্বনার সীমা নাই। আরও কিছুদিন এইভাবে কাটিলে পরমায়ু ক্ষয় হইতে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইবে না। অথচ, ভগ্নীর গৃহের বন্ধ দুয়ার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাঙ্গালীর জীবনে দশটা-পাঁচটা যে কতখানি তাহা ভাবিলে দিনমানে আর অন্ন জুটিবে না। সুতরাং মনে মনে সবিতার আর মুখে সুষমার মুণ্ডপাত করিতে করিতে বিজন ষ্টেশনের দিকে পা বাড়াইল।

বিজন ষ্টেশনের নিকটে আসিয়া দেখিল, গাড়ী ছাড়ে-ছাড়ে। ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া পুল পার হইতে ট্রেণখানি প্লাটফরম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বিজন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া দেখিল, গাড়ীর বেগ

দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতেছে। বিজন পুলের উপর দাঁড়াইয়া মনে মনে রেল-কোম্পানীর চতুর্দ্দশ পুরুষের জন্য নরকের ব্যবস্থা করিতে করিতে সেই অদৃশ্যপ্রায় ট্রেণখানির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল

কতক্ষণ সে এইভাবে রৌদ্রে দাঁড়াইয়া টিংড়ি-পোড়া হইয়াছে, তাহা বিজন জানে না ; কিন্তু তাহার খেয়াল হইল টিকিটবাবুর কণ্ঠস্বরে। তিনি আইনমত বিজনের নিকট টিকিট চাহিতেই সে একেবারে 'তেলে-বেগুনে' জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—"টিকিট এখনও কিনি নি।"

"গাড়ী ফেল হয়েছেন বুঝি ?"

"তা না হলে আর এখানে দাঁড়িয়ে কি তামাসা দেখ্‌ছি।"

"কলকাতার গাড়ী ত ?"

"হাঁ।"

"তা'হলে থাকুন তিনটে অবধি। তার আগে আর গাড়ী নেই।"

এই শুভ-সংবাদ জ্ঞাপন করিবার পুরস্কারস্বরূপ লোকটার মুখে একটা ঘুষি মারিবার প্রবৃত্তি বিজনের সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু অনতিদূরে খাকীর পোষাক, আর লাল পাগড়ী পরা সাত ফিট্ উচ্চ মূর্ত্তিটীকে, নাল পরান নাগরা জুতার শব্দ করিতে করিতে পরিক্রমণ করিতে দেখিয়া সে প্রবৃত্তি দমন করিতে হইল

ঠিক্ সন্ধ্যায় মনে এবং দেহে বিরক্তি ও শ্রান্তি লইয়া গৃহে ফিরিয়া বিজন দেখিল, তাহার গৃহও জনশূন্য। ছুটী পাইয়া সবিতা সেদিন বায়স্কোপে গিয়াছে। শয়নগৃহে প্রবেশ করিবার উপায় নাই ; সুতরাং ঝিকে ডাকিয়া বৈঠকখানার দরজা খুলিয়া গৃহিণীর প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় ধূলি-মলিন জীর্ণ সতরঞ্চের উপর অবসন্ন দেহ এলাইয়া দিল।

তৃতীয়

দুই-তিনদিনের মানসিক ও শারীরিক বিকারের ফলে বিজনের উৎসাহের উত্তাপ একেবারে নব্বই ডিগ্রীতে যাইয়া পৌছিয়াছে। না ঘরে, না বাইরে, কোথাও যাইয়া এই অবসন্নতা দূর হয় না। বেচারী প্রায় হাল ছাড়িয়া দিয়া ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনের মুখে নিজেকে সঁপিয়া দিবে কি না ভাবিতেছে এমন সময় কলেজের বন্ধু অজিত আসিয়া তাহাকে শিকারে লইয়া গেল।

শিকার কার্যটার প্রতি বিজনের আবাল্য একটা লোভ আছে ; কিন্তু শিকার করিতে গিয়া, কোন কোন ক্ষেত্রে শিকারী যে স্বয়ংই শিকার হইয়া ফিরিয়াছে, কোন ক্ষেত্রে বা ফিরে নাই, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। সুতরাং, পাছে শিকার করার পরিবর্ত্তে শিকার হইয়া ফিরিতে হয়, এই আশঙ্কাই তাহাকে প্রতিবার এই দুঃসাহস হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে। সবিতা অবশ্য এই কথাটা অন্য রকম করিয়া বলে। সে বলে শিকার হইবার ভয়ে নহে,—তাহারই ভয়ে বিজন এই রকমের আরও বহুবিধ ব্যসন হইতে দূরে রহিয়াছে। প্রকৃত ঘটনা যাহাই হোক,—শিকার কার্য্যটা বিজন নিজ হাতে কোন দিন করে নাই—স্বচক্ষে দেখিয়াছে বলিয়াও মনে হয় না।

তাই অবসন্ন দেহ এবং মনের সঞ্জীবতা পুনরানয়নের আশায়, বন্ধুর সহিত শিকারে যাইবার পূর্ব্বে কার্য্যটা যে নিতান্তই আশঙ্কাজনক এই কথাটা সবিতা বিজনকে জানাইয়াছিল। কিন্তু সে তখন মরিয়া ; সুতরাং ভয় বা অন্য কোন কারণে পশ্চাৎপদ হইবার লক্ষণ তাহার ভিতর দেখা গেল না। বিশেষতঃ, সবিতা সতর্ক করিয়া দিবার পরে সে বোধ করি এই ভাবটাই স্ত্রীকে এবং বন্ধুকে জানাইতে চাহিল যে, সে একান্তই স্ত্রীজিত নয়। বিজন যাইবেই স্থির হইতে সবিতা জিজ্ঞাসা করিল—"শিকার করতে ত যাচ্ছ, এদিকের সব কি হবে ?" বিজন ফাঁক পাইয়া জবাব দিল—"আমার জন্যে কিছু আটকাবে না।"

"না আট্‌কালেই ভাল—কিন্তু ফেরা হবে কবে ?"

"না ফির্‌লেই বা ক্ষতি কি ?"

সবিতা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বিজন বন্ধুর আহ্বানে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু মনটা কেমন খুৎ খুৎ করিতে লাগিল।

কিন্তু শিকার অর্থে যাহারা বাঘ বা ঐ শ্রেণীর কোন জীবের সংহার বুঝিয়া থাকে,—তাহাদিগকে বলা দরকার যে, অজিত বিজনকে লইয়া যে শিকারে গেল, তাহা ব্যাঘ্র শিকার নহে, পক্ষী বধ। কাজেই আশঙ্কার কিছু নাই। কিন্তু বিজন শিকার বলিতে পাখী মারা না বুঝিয়া ভীষণ কিছুর একটা কল্পনা করিয়া, মনে মনে উদ্বিগ্ন হইতেছিল। অথচ অজিতকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাছে 'খেলো' হইতে হয়, এই ভয়ে কথাটা পরিষ্কার করিয়া লইতে পারিতেছিল না।

কিন্তু তাহার গ্রহের ফেরে যে, পাখীই সেদিন বাঘ হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা কে ভাবিয়াছিল। বন্দুক লইয়া দুই বন্ধু অগ্র পশ্চাৎ চলিয়াছে। অজিত ঊর্দ্ধমুখে পাখীর সন্ধান করিয়া, আর বিজন পশ্চাতে ভয়ত্রস্ত নেত্রে তিন দিক্ দেখিতে দেখিতে যাইতেছিল; কি জানি, ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর হইতে যদি 'তাঁহারাই' কেহ বাহির হইয়া পড়েন।

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া অজিত বলিল—"এই বিজন, এ ঝাঁকে থেকে দু'-চারটে মারা চাই।"

কিন্তু কোন সাড়া নাই।

অজিত ফিরিয়া দেখে, বিজন পিছনে নাই। চারিদিক চাহিয়া দেখিল, যতদূর দৃষ্টি চলে বিজনের চেহারা কোথাও দেখা যায় না। অজিত চীৎকার করিয়া ডাকিল; কিন্তু প্রত্যুত্তর নাই। অজিত যেদিক হইতে আসিয়াছিল ফিরিয়া সেই দিকে চলিতে লাগিল; কিন্তু দুই দিকে মাথা সমান উঁচু ঘাসবন ছাড়া কোথাও কিছু সে দেখিতে পাইল না। অজিত দাঁড়াইয়া পড়িয়া একটা নিশানা করিবার উদ্যোগ করিতেছে,—হঠাৎ বন্দুকের শব্দে চমকিয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল এবং অল্পকাল মধ্যেই একটা জলার ধারে উপস্থিত হইয়া দেখিল,—এক হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া বিজন পিছন ফিরিয়া তাগ করিতেছে, আর কিছু দূরে একটা শৃগাল বন্দুকের শব্দে ভয় পাইয়া পিছনের দুই পায়ের মধ্যে লাঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া দিয়া পলাইতেছে।

অবস্থা দেখিয়া অজিতের ব্যাপার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বুঝিল, এই শৃগালই বিভ্রাট বাধাইয়া সরিয়া পড়িতেছে। সে হাঁকিয়া কহিল—"ভয় নেই; ওটা বাঘ নয়, শেয়াল।"

শিয়াল কি বাঘ তাহা ভাল করিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই মাত্র জঙ্গল নড়িতে দেখিয়া বিজন এই জলার আসিয়া নামিয়াছে—এবং এক হাঁটু জলে পশ্চাতস্থ অদৃশ্য জন্তুর প্রতি বন্দুক উদ্যত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এবং ভয়-কম্পিত হস্তের বন্দুক তাহার অজ্ঞাতে কখন যে আপনা হইতেই ফায়ার হইয়া গিয়াছিল,—তাহা সে বুঝিতেও পারে নাই।

বিজনের মনে বোধ হয় তখন এই ভাব যে, বাঘ যদি নিতান্তই তাহাকে ধরে ত অলক্ষ্যে ধরুক—ধরিলেও সে ত আর ব্যাপারটা দেখিতে পাইবে না। সে ব্যাপার না দেখিলেও বন্ধুর অবস্থা দেখিয়া অজিতের হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইল। কিন্তু এই অবস্থায় হাসিলে পাছে বন্ধুর প্রাণে ব্যথা লাগে,—এই ভয়ে অজিত যাইয়া তাহাকে সাহস দিয়া জল হইতে তুলিল এবং অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া তাহাকে বিশ্বাস করাইল যে, বন হইতে যে প্রাণীটা বাহির হইয়াছিল,—সেটা বাঘ নহে, শৃগাল।

কিন্তু শিকার সে যাত্রা আর করা হইল না; কারণ, শৃগাল যেকালে বাহির হইয়াছে, বাঘ যে বাহির হইবে না, তাহা কে শপথ করিয়া বলিতে পারে। ফলে দুই বন্ধু কালবিলম্ব না করিয়া কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইল।

এবার বিজন অগ্রে, অজিত পশ্চাতে। অজিতের কথায় বিশ্বাস হইলেও কি জানি দৈবের কথা বলা যায় না, তাই বিজন বন্দুক বাগাইয়া ধরিয়া আগে আগে চলিতে লাগিল। হঠাৎ বামদিকের ঘাসবন নড়িয়া উঠিতেই বিজন দূরে সরিয়া যাইবার আশায় বনের দিকে মুখ করিয়া লাফ দিল এবং ব্যাপারটা অজিতের মাথায় আসিবার পূর্ব্বেই পাশের এক গর্ত্তে যাইয়া পড়িল। ফলে একখানি পা মচকাইয়া বিজন রাত্রি একটায় বাড়ী ফিরিল।

বিজনের অবস্থা দেখিয়া সবিতা হাসিবে কি কাঁদিবে স্থির করিতে পারিল না; কিন্তু তাহাকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল যে, ভবিষ্যতে কোন কারণে আর এইভাবে শিকার করিতে বিজন যাইবে না।

চতুর্থ

দিন-তিনেক বিশ্রাম ও যন্ত্রণা ভোগের পর, বিজনের ভাঙ্গা পা জোড়া লাগিল। কিন্তু ভবিষ্যৎ দিন কয়টা যে কি করিয়া কাটিবে, এবং যে দুর্ভোগ ছুটীর প্রথম দিন হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমাগত বৃদ্ধির দিকেই চলিয়াছে তাহার শেষই বা কি উপায়ে হইবে ভাবিয়া স্থির করিতে বিজনের দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ঘুরিয়া গেল। এক এক করিয়া অনেক প্রকার উপাদানের কথা ভাবিয়া, শেষে স্থির হইল, এই কয়দিন একেবারে চুপচাপ বাড়ীতে বসিয়া কাটাইয়া দিবে—সংসারের কোন ঝঞ্ঝাটে মন খারাপ করিয়া একান্ত বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাইবে না।

বিশ্রামের শ্রেষ্ঠ সুখ শয়নে। বিজন সকালে জলযোগ করিয়া শয্যাগ্রহণ করিল। নিদ্রা ছিল সাধা—শয়ন মাত্র নিদ্রাকর্ষণ হইল। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিল—তাহা বুঝিবার আবশ্যকতা নাই—সে বুঝে নাই। কিন্তু বড় বড় চুলগুলার প্রবল আকর্ষণে ঘুম ভাঙ্গিয়া চাহিয়া দেখিল, খুকী সাগ্রহে তাহার চুল ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। আগ্রহ প্রচুর থাকিলেও খুকীর উদ্দেশ্য বুঝিবার শক্তি বিজনের হইল না—হইল প্রবল ক্রোধ। কিন্তু ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র প্রাণিটীর প্রতি তাকাইতেই সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার করিয়া, বাড়ী মাথায় করিল।

হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে এবং খুকীর কর্ণবিদারী চীৎকারে বিজনের চিত্ত বিরক্তিতে ভরিয়া গেল। অথচ, এই সানাইয়ের পোঁ ধরার 'একঘেয়ে' সুর বন্ধ করিতে না পারিলেও ঘরে থাকা অসম্ভব। তাই কোন্ উপায়ে খুকীর ক্রন্দন নিবারণ করা যায়, তাহা ভাবিয়া স্থির করিবার পূর্ব্বেই পদশব্দে চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার শঙ্কা অমূলক নয়, দ্বারদেশে সবিতা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে. সুতরাং এখন কিছু শুনিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নাই। বিজন হাতের কাছে খুকীকে পাইয়া তাহাকেই কোলে টানিয়া লইল।

সবিতা দুম্ দুম্ করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া খুকীকে লইবার জন্য হাত বাড়াইতেই বিজন ভয়ে ভয়ে কহিল—"থাক্ না, বেশ ত রয়েছে আমার কাছে।"

"অত ভাল মানষীতে আর কাজ নেই! কাজের ঝঞ্ঝাটে মেয়েটার খোয়ার হবে তাই রেখে গেলুন, তা তাকে কাঁদিয়ে এখন সোহাগ হচ্ছে।"

বিজন কহিল—"তোমার কাছে থেকেও ত মাঝে মাঝে কাঁদে, আজ না হয়…"

কথাটা আর শেষ করিতে হইল না; সবিতা মেয়েকে টানিয়া লইল।

কিন্তু ব্যাপারটা বিজনের ভাল লাগিল না। একটু রাগও হইল। সে বলিল—"মেয়ে নিয়ে যাচ্ছ, কিন্তু যদি কাঁদে, দেখ্‌বে মজা।"

"মজা ত রোজই দেখে আস্‌ছি, আজ আর নতুন কি দেখ্‌ব! এখন দাও খুকীকে।"

বিজনের কাঁধে ভূত চাপিয়া গেল। সে বলিল

—"না দেব না ; তুমি কি মনে করেছ যা নয় তাই।"

"তুমি মেয়ে দেবে কি না বল ?"

"না। আমার যখন ইচ্ছে হয় দেব।" সে খুকীকে জোরে কোলে চাপিয়া ধরিল।

সবিতা সরিয়া দাঁড়াইয়া একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল ; তারপর কহিল—"মেয়ে রাখছ, কিন্তু আমি আর ওকে ছোঁব না এই বলে যাচ্ছি।"

বিজন সবিতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, সেখানে যে ভাব আজ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে প্রলয় ঘটা বিচিত্র নয়। মেয়ে লইয়া কাড়াকাড়ি না করিলেই ভাল হইত। কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না। তথাপি শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার আশায় সে বলিল—"আচ্ছা নিয়ে যাও।" "আমার বয়ে গেছে।" সবিতা চলিয়া গেল। বিজন দেখিল ভুলের মধ্য দিয়া যে ভার আজ তাহার স্কন্ধে চাপিল, ইহা বহিয়া বেড়ান আর কোদাল কোপানর মধ্যে মূলতঃ প্রভেদ নাই বলিলেই চলে।

ঘণ্টা দুই মেয়ে কোলে করিয়া বসিয়া থাকার পরেও মেয়ের মা মেয়ের খোঁজে আসিল না, অধিকন্তু মেয়ে তখন ক্ষুধায় অস্থির। বেচারা খুকীকে কোলে লইয়া, রান্নাঘরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ ভিতর হইতে আসিল না। অগত্যা বিজন বলিল,—"খুকীর খিদে পেয়েছে বোধ হয়।" কোন জবাব আসিল না—কিন্তু ষ্টোভ, কড়া আর দুধ তিনভাগে দ্বারের কাছে আসিয়া রহিয়া গেল।

বিজন দেখিল বিরাট ব্যাপার—সে মিনতির সুরে বলিল—"ও কি আমি সুবিধে করতে পারব, ও যে নানান ঝঞ্ঝাট।"

কিন্তু ঘরের মধ্যে যে মানুষ আছে, এরূপ কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না।

খুকীর ব্যস্ততার সীমা নাই। একে ক্ষুধা—তার পরে সম্মুখে খাদ্য-সামগ্রী উপস্থিত ; তাহাকে সামলান মহাদায়। অথচ বিজন কি করিবে তাহাই চিন্তা করিতেছে—ছেলে আসিয়া করতালি ও নৃত্য সহযোগে বলিল—"বাবা খুকীকে দুধ খাওয়াবে—ওমা দেখবে এস বাবা—" শেষ করিবার পূর্ব্বেই পিতার করস্পর্শ গণ্ডদেশে কঠোরভাবে অনুভব করিয়া সে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার জুড়িয়া দিল। দাদাকে কাঁদিতে দেখিয়া খুকী তাহাতে যোগ দিল। বিজনের মাথার মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল।

সবিতা বাহিরে আসিয়া তীক্ষ্ণনেত্রে স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া বলিল "কি ভেবেছ বল দেখি, আজ সবাইকে বাড়ী থেকে তাড়াবে নাকি ?"

বিজনের রক্তে আগুন ধরিয়া গেল ; সে খুকীকে দুয়ার গোড়ায় বসাইয়া রাখিয়া বলিল—"না আমিই যাচ্ছি। তোমাদের তাড়ায় কার সাধ্য।" বিজন চলিয়া গেল এবং হোটেল হইতে আহার করিয়া যখন বাড়ী ফিরিল, তখন রাত্রি হইয়াছে।

কিন্তু নিজের ঘরে যাইতে তাহার পা উঠিল না। তাহাকে ফেলিয়া সবিতা যে সারাদিন কিছুই খায় নাই, সে কথা স্পষ্ট বুঝিয়া সবিতার কাছে যাইতে তাহার সাহসে কুলাইল না। ফলে, বৈঠকখানায় অন্ধকারের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল,—সংসারে সুখের মূর্ত্তিটার রূপ কি ?

পঞ্চম

দিনমান হোটেলের অন্নে উদর পূর্ণ করিয়া, আর রাত্রিমান অনাহারে কাটাইয়া প্রভাতে বিজন শয্যাত্যাগ করিয়া দেখিল, কোনক্রমে অন্ততঃ প্রাণ বাঁচাইয়া টিকিয়া থাকিতে হইলেও তাহাকে ছুটীর মায়া কাটাইতে হইবে, নতুবা গৃহ-ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু নির্ব্বেদ যত বড়ই হউক, গৃহ সে প্রাণ ধরিয়া ত্যাগ করিতে পারিল

না। দিনান্তে সবিতার মুখখানি না দেখিয়া বোধ করি স্বর্গে যাইয়া থাকাও তাহার পক্ষে অসাধ্য।

সবিতা অভিমানিনী; যখন তখন রাগ করিয়া দুই-চারিটা কড়া কথা শুনাইয়াও থাকে; তা বলিয়া তাহাকে যে ভালবাসে না, এমন কথা বলিলে চলিবে কেন? ঘণ্টা দুই কম্তার ভার লইয়া বিজনকে হোটেলে খাইতে হইয়াছে রাত্রিতে আহার জুটে নাই; অথচ নিত্য ত্রিশ দিন যাহাকে ঐরূপ দুই-তিনটী জীবের সমস্ত ভার বহন করিতে হয়, এবং শিশু অপেক্ষা অপোগণ্ড ও অপদার্থ শিশুদের পিতার সর্ব্বপ্রকার খপরদারী করিতে হয়, তাহার পক্ষে মস্তিষ্ক স্থির রাখিয়া কাজ করা যদি সব সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া চলে না। সুতরাং মনের দুঃখে যদি সবিতা একটু বিসদৃশ ব্যবহারই করিয়া থাকে, সেই অপরাধটুকুর জন্য তাহার ওপর ক্রুদ্ধ বা বিমুখ হওয়া কৃতঘ্নতা।

রাগ করিয়া বিজন সেদিন ঘরে না খাইয়া হোটেলে খাইয়াছে। অত্যন্ত সাধাসাধির পরেও রাত্রিতে সে খায় নাই, বৈঠকখানা হইতে নড়েও নাই। সারাদিন উপবাসের পর সবিতা রাত্রিতে খাইল কি না সে অনুসন্ধান কি বিজন করিয়াছিল? না এভাবে রোজ রোজ একটা-না-একটা গোলমাল উপস্থিত হওয়ার মূলে যে দীর্ঘ অবকাশ, তাহা এখন বিজনের কাছে অসহ্য বোধ হইল। সে দেখিল, গৃহে সকল বিষয়ে যথাসাধ্য আরাম উপভোগ করাই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে; একটু ত্রুটী দেখিলে অভিমানে আঘাত লাগে, ফলে হয় বিরোধের সৃষ্টি। কিন্তু বাড়ীতে না থাকিয়া আফিসে থাকিলে, কৈ এমন অশান্তি ত ঘটে না। গৃহে বসিয়া প্রত্যেকটী মুহূর্ত্তে গৃহিণীর ত্রুটী-বিচ্যুতি ধরিয়া কষ্ট পাওয়া অপেক্ষা সমস্তদিন পরিশ্রমের পর গৃহিণীর পরিচর্য্যাটুকু পরম উপভোগ্য। ছুটী তাহার সহিবে না। সুতরাং আজ হইতেই আবার দশটা-পাঁচটা শুরু করাই বাঁচিবার উপায়।

কিন্তু কথাটা সবিতার কাছে তুলিতে কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। কাল সবিতার অত অনুনয়-বিনয়েও বিজন কথা কহে নাই; আজ হঠাৎ যাইয়া প্রথমেই তাহার সহিত আলাপ জুড়িয়া দেওয়াই বা কেমন দেখাইবে? বিজন একবার ভাবিল, সবিতা নিশ্চয়ই চা লইয়া উপস্থিত হইবে। কিন্তু তাহার চা খাওয়ার সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও যখন চা আসিল না এবং বাড়ীর মধ্যে থালা-বাসনের ঝন্ ঝন্ শব্দ ভিন্ন আর কোন প্রকার মনুষ্য সমাগমের সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন বিজনের ভয় হইল। সে কোমরে কাপড় জড়াইতে জড়াইতে একটু দ্রুতপদেই উপরে উঠিয়া গেল এবং শয়ন-গৃহে যাইয়া দেখিল, মেজেয় শুইয়া সবিতা তখনও নিদ্রামগ্ন। মুখ দেখিয়া বুঝিল, অনাহারের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

সবিতার বিশ্রামে ব্যাঘাত জন্মাইতে বিজনের কেমন মায়া হইল। সে ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া অত্যাচার-পরায়ণা খুকীকে কোলে লইয়া তেমনি সন্তর্পণে বাহির হইয়া গেল। ঝিকে জানাইয়া দিল, সবিতা উঠিলে বিজন যে আজ আফিস যাইবে, এ কথা যেন তাহাকে জ্ঞাপন করে।

কিন্তু ঝিকে আর বলিতে হইল না; সিঁড়ির মাঝখানে যাইয়াই শুনিতে পাইল—"কোথায় যাচ্ছ চা-টা না খেয়ে?"

বিজন নিতান্ত অপরাধীর মত বলিল—"চা আমি দোকান থেকেই খেয়ে নেব। বেলা হয়ে গেছে, এখন আর ওসব ঝঞ্ঝাটে কাজ নেই।"

কাজ থাকা-না-থাকায় কোন ফল হইল না; বিজনকে উপরে যাইয়া ঘরে বসিতে হইল। সবিতার সঙ্গে কোথায় কোন্ ফাঁকে যে সন্ধি করিবে, বিজন তাহাই খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পবিত্র জিজ্ঞাসা করল—"ছুটী ত এখনও প্রায় দিন কুড়ি আছে, তবে আজই অফিস যাবে কেন ?"

কেন যে অফিস যাইবে, সে কথা বলিতে গেলে এখনই হয় ত কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যাইবে ; সুতরাং কথাটাকে মোলায়েম করিয়া বিজন বলিল—"ছুটী আর ভাল লাগছে না। অফিসে কাজ-কর্ম্মের মধ্যে না থাক্‌লে কেরাণীর প্রাণ আইঢাই করে।"

বিজনকে ছুটী শেষ না হইতেই অফিসে আসিতে দেখিয়া কেশববাবু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ভায়া, সখ মিট্‌ল ?"

বিজন মুখ নীচু করিয়া বলিল—"আর সখ ; কেরাণীর জীবনে সখ কথাটা যে একেবারেই মানায় না, এ আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।"

কেশববাবু বিজনের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন —"বেশ ভায়া, বেশ ; তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জল। কিন্তু কি রকমটা হোলো ?"

"সে মশায় নানান্ ফেচাঙ—প্রাণ যায় যায় হয়ে উঠেছিল এই ক' দিনে।"

"যাক্, প্রাণ নিয়ে যে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছ, এই ঢের।" এমন সময় বড় সাহেবের মূর্ত্তি দ্বারের পাশে চকিতের মত চোখে পড়িতেই কেশববাবু নিজের টেবিলে যাইতে যাইতে বলিলেন—"এখন থাক ; পরে সব শুনব 'খন। মোদ্দা সব খুঁটিয়ে বলা চাই।"





ঋণ পরিশোধ

কুমারী ঊষারাণী দত্ত

সেদিন হঠাৎ প্রীতির বিবাহের সংবাদে প্রতিবাসীরা যতটা আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল, পরের দিন জামাই তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেল শুনিয়া ঠিক ততটাই তৃপ্তির হাসি হাসিয়া লইল।

প্রীতি গরীবের মেয়ে, তাহাতে আবার তাহার গায়ের রংটা কালো। অভিভাবকের মধ্যে বৃদ্ধ রুগ্ন পিতা ও দশ বৎসরের ছোট ভাই মণি; কাজেই বিবাহের বয়স তাহার নিরুদ্বেগেই বাড়িয়া চলিয়াছিল। এজন্য কিন্তু প্রীতির ও তাহার পিতার লাঞ্ছনার সীমা ছিল না; সর্ব্বদাই পাড়া-পড়্‌শীর তীব্র বিদ্রূপ ও কুৎসিৎ মন্তব্য তাহাদের নিঃশব্দে মাথায় তুলিয়া লইতে হইত।

প্রীতি সহিতে পারে সব; পারে না কেবল পিতার অন্তর যন্ত্রণা, তাহাও আবার তাহারই জন্ম।

অভাবের সংসার। একটা পয়সাও আয় নাই। কে রোজগার করিবে? এক পিতা, তিনি ত বারমাসই রোগ শয্যায়। তাঁহার পথ্য, তাঁহার ঔষধ সবই প্রীতিকে যোগাইতে হইত। হউক, দুঃখের সহিত প্রীতি প্রাণপাত করিয়াছে, কিন্তু প্রতিবাসীদের নিকট কখন হাত পাতে নাই। বাড়ীর চারিধারে নিজ হাতে বেড়া দিয়া সে তরি তরকারীর গাছ পুতিয়াছিল। ছোট্ট পুকুরটীতে মাছ ছড়াইয়া অবসর সময়ে নানা রকমের শিল্প কাজ করিয়া মণিকে দিয়া সেগুলি বাজারে বিক্রয় করাইয়া সে কোনমতে সংসার চালাইয়া যাইত।

তাহার এই স্বাবলম্বন প্রবৃত্তিই হইল অপরের নিকট হিংসার বস্তু। সামান্য একটা মেয়ে তাহার এত ক্ষমতা, এত তেজ! কাজেই হঠাৎ পাওয়া সংবাদটা সকলেরই নিকট এতটা বিস্ময়ের পরে আনন্দের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

দুই

জ্যৈষ্ঠমাস। আমগুলিতে পাক ধরিয়াছে। পাড়ার ছেলেরা ভারী অত্যাচার করে; তাই সকাল সকাল গৃহকর্ম সারিয়া মণিকে সঙ্গে লইয়া গিয়া প্রীতি-আম পাড়িতে লাগিয়া গিয়াছিল। তলায় দাঁড়াইয়া মণি সেগুলি ধামায় তুলিতে তুলিতে দিদির সহিত আবোলতাবোল বকিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ মই হইতে নামিয়া পড়িয়া প্রীতি ব্যস্ত হইয়া ডাকিল—"মণি, মণি!"

মণি ভীত হইয়া বলিল—"কি বল্‌ছ দিদি?"

"এদিকে আয় ত, দেখ দেখি ঝোপের মধ্যে মানুষের মত কি একটা পড়ে রয়েছে।"

মণি অধিকতর ভীত হইয়া বলিল—"ও দিদি, শীগ্‌গির চলে এসো, ওটা নিশ্চয় ভূত; ঘোষেদের মণ্টু বলে—দুপুরে আমবাগানে ভূত থাকে; ও দিদি, চলে এসো; ও মা, কি হবে!—"

প্রীতি ধমক দিয়া বলিল—"ভূত না তোর মাথা। আয়, দেখি গে।"

"আমি যাবো না; ও নিশ্চয় ভূত।"

"তবে থাক্ এখানে দাঁড়িয়ে তুই; আমি চললুম।"

মণি ভারী বিপদে পড়িল—একা থাকা কি যায়? অগত্যা অনিচ্ছায় দিদির সঙ্গে চলিল। ঝোপের মধ্যে একটী সুন্দর যুবা ইট-পাটকেলের উপর পড়িয়াছিল। পাশে ক'টা মরা পাখী ও একটা বন্দুক। দেখিয়া প্রীতি প্রথমে বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরক্ষণে ছুটিয়া যুবকটীর নিকট গিয়া দেখিল, নিশ্বাস পড়িতেছে। সে মণিকে তাড়াতাড়ি জল আনিতে বলিয়া যুবকের মাথাটা নিজের কোলে তুলিয়া লইল।

মণি জল আনিলে প্রীতি কাপড় ভিজাইয়া যুবকটীর চোখে-মুখে ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল। তারপর অতি কষ্টে সংজ্ঞাহীন যুবকটীকে ভাই বোনে ধরাধরি করিয়া গৃহে আনিয়া হাজির করিল। এবং পরম যত্নে যুবকটীকে পাশের ঘরের বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া প্রীতি পিতার নিকট আসিয়া সকল ঘটনা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, এঁকে এনে কি আমি অন্যায় করেছি।"

পিতা মধুরস্বরে বলিলেন—"না, না, অন্যায় কিসের; বিপন্নের সেবাই যে মানুষের কর্ত্তব্য!"

প্রীতির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

তিন

প্রীতির অক্লান্ত সেবা যত্নে কিছুদিনের মধ্যে যুবকটী সুস্থ হইয়া উঠিল। প্রীতির পিতা তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, সে এক জমিদারের পুত্র; বাড়ী অনেক দূরে। শিকারের খুব সখ, সেইজন্য অসুস্থ শরীরেই শিকার করিতে বাহির হইয়াছিল। এই বাগানের পার্শ্বে দু'-চারটী পাখী মারিবার পর হঠাৎ সে মাথা ঘুরিয়া ইট-পাটকেলের উপরই পড়িয়া যায়; তারপর তাহার আর কিছু মনে নাই।

মণি বলিল—"তারপর সে আমি বল্‌ছি। জান্‌লেন সরোজবাবু, আমি আর দিদি কি কষ্টে যে সেদিন আপনাকে ঘাড়ে করে এখানে আনি,—বাবাঃ, আপনি এত ভারী!"

সরোজ হাসিয়া মণিকে কোলে টানিয়া লইয়া বলিল—"তা' হ'লেও তোমার গায়ে বেশী জোর, যখন আমায় আন্‌তে পেরেছ।"

"আহা, আমি বুঝি একা এনেছি, দিদিই এনেছে, আমি খালি পা ধরেছিলুম। আমার দিদির গায়ে খুব জোর; জানেন, একবার দিদি—"

প্রীতিকে আসিতে দেখিয়া মণি থামিল। প্রীতি এক বাটী গরম দুধ আনিয়া সরোজকে বলিল—"এই দুধটুকু খেয়ে ফেলুন।"

সরোজ হাসিয়া বলিল—"আর কতদিন রোগী হয়ে থাক্‌ব, এখন ত বেশ সেরে উঠেছি।"

"কৈ সেরেছেন, এখন ত খুবই দুর্ব্বল।"

মণি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"জানেন সরোজবাবু, যেদিন আপনি অজ্ঞান হয়ে গিয়ে-

ছিলেন, সেদিন দিদি সমস্ত দিন কিছু খায় নি, চান করে নি, আপনার কাছ থেকে ওঠে নি পর্য্যন্ত।"

প্রীতি লজ্জিতা হইয়া ধমক দিয়া বলিল—"আচ্ছা, তোর আর পাকামী করতে হবে না।"

সরোজ বলিল—"কেন ওকে তাড়া দিচ্ছেন, ও ত সত্যি কথাই বলেছে। তা মণিবাবু, তুমি দেখে নিও, তোমার দিদি যেমন আমার করেছে, আমিও তাঁর করব। তোমার দিদির নামে কিছু বিষয় এখানে আমি কিনে দেব, কিছু নগদ টাকাও দেব, আর তুমিও বাদ যাবে না, বুঝলে।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রীতির হাসি মুখখানি কালো হইয়া গেল। ভগবান, গরীব জাতটা কি এতই ছোট! তাহাদের কি প্রাণ বলিয়া কিছু নাই; টাকাই তাহাদের সব! প্রীতির প্রাণঢালা সেবার বিনিময়ে সরোজ দিবে টাকা! হায়, প্রীতি কি করিয়া বুঝাইবে, টাকাকে সে কত ঘৃণা করে!

কঠোরকণ্ঠে প্রীতি বলিল—"আমরা কি টাকার প্রত্যাশী হয়ে আপনার সেবা করেছি? জান্‌বেন, গরীবের মেয়ে হলেও ভিখারী নই, যাতে এমন অপমান—"

"এ ত অপমানের কথা নয়, তুমি আমার করেছ, আমি তোমার করব; তোমার শক্তি আছে সেবা করলে, আমার টাকা আছে সেবা কিনলুম, কেমন?"

"কিন্তু, আমরা সেবা বেচি না; সেবার প্রতিদান নিই না!" বলিয়া প্রীতি বিদ্যুৎবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চার

দু'দিন পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া সরোজ প্রীতির পিতার নিকট বিদায় চাহিল।

বৃদ্ধ অশ্রুপূর্ণনেত্রে কহিলেন—"বাবা, জানি না পূর্ব্ব জন্মে তুমি আমাদের কে ছিলে—তাই তোমায় বিদায় দিতে প্রাণে এত ব্যথা লাগ্‌ছে।"

সরোজ বলিল—"আমারও মন কেমন করছে আপনাদের ছেড়ে যেতে। আপনাদের দয়ায় আমি এ জীবন ফিরে পেয়েছি, আমার দ্বারা যদি আপনার কোন উপকার হয়—"

বৃদ্ধ আগ্রহ সহকারে বলিলেন—"সত্যি তুমি আমার উপকার করবে বাবা?"

"হাঁ, নিশ্চয়ই করব।"

বৃদ্ধ সহসা সরোজের দু' হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"তবে, তবে আমার জাত কুল মান রক্ষা কর বাবা; আমার প্রীতিকে তুমি নাও!"

"প্রীতিকে? বলেন কি?" সরোজ চম্‌কিয়া উঠিল।

"হাঁ প্রীতিকে; পারবে না কি বাবা? সত্যি বল, বৃদ্ধের এ উপকার তুমি করতে পারবে কি না?"

সরোজ কিছুক্ষণ কি ভাবিল; পরে ধীরে ধীরে বলিল—"বিয়ে করতে পারি, কিন্তু এক কড়ারে।"

"বল, কি কড়ার, আমি রাখব; যা বলবে, তাই আমি করব।"

"দেখুন, আমার বাবা মস্ত বড় লোক; দেশ জোড়া তাঁর নাম। যদি কেউ শোনে তাঁর পুত্র হয়ে আমি এমন ঘরে বিয়ে করেছি, তবে আমার বাবার উঁচু মাথা নীচু হবে, তাঁর এত যশ-মান সবই যাবে; পুত্র বলে তা' হ'লে তিনি আমার ক্ষমা করবেন না। আপনাদের সামান্য সেবার বিনিময়ে আমি এত বড় ত্যাগ করতে পারব না। তবে অকৃতজ্ঞ আমি নই; আপনাদের এই সেবার বিনিময়ে আমি অর্থ দিতে চেয়েছিলুম, তা নিলেন না। তা' যা'হোক, আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করব - কিন্তু, পরে কোন সম্পর্ক তার সঙ্গে আমার থাকবে না—কেউই জানবে না, আমি বিয়ে করেছি—বিয়ের কাজ শেষ হয়ে গেলেই আমি চলে যাব। বলুন, এতে স্বীকার আছেন?"

"ভগবান্, এমন রাজা স্বামী পেয়েও প্রীতি

আবার হারাবে? বাবা, প্রীতিকে কি গ্রহণ করতে পারবে না?"

"না।"

"বেশ, তবে তাই হোক; কেবল মাত্র তুমি তার অবিবাহিত নামটাই মুছে দাও। আর আমি পারি না! লোকনিন্দা, অপমান আর আমি সইতে পারি না! তুমি কেবল বিয়ে করেই ত্যাগ করে যেও।"

"বেশ; তবে আজই বিয়ের যোগাড় করুন।" সরোজ গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রীতি বাহির হইতে সব শুনিল। অতিথির নিকট এ হীন প্রস্তাবে অপমানে-দুঃখে তাহার বক্ষ ভাঙ্গিয়া গেল। পিতা যে তার সব গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিয়াছেন।

প্রীতি নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া সরোজের কাছে গেল।

সরোজ প্রীতিকে আড়ালে পাইতেই বিদ্রূপ করিয়া বলিল—"বড় যে সেদিন বলেছিলে, প্রতিদান আমরা নিই না, সেবা বেচি না; বেশ জলন্ত প্রমাণই তার দিলে!"

ভগবান্ প্রীতির কি মরণ নাই! কি অপরাধ করিয়াছে সে, তাই তার চির গর্ব্বিত মস্তক এমনই করিয়া নোয়াইয়া দিলে!

সরোজ বলিল—"দেখো, কিছু টাকা নিলে তোমার আমার দেনা-পাওনা শোধ হয়ে যেত; কিন্তু এখন আমার কাছে উল্‌টে তোমরাই ঋণী হলে, বুঝলে?"

"আমি আপনার এ ঋণ শোধ করতে চেষ্টা করব।"

সরোজ ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ, তুমি আবার ঋণ শোধ করবে; মুরদ ত কত!"

প্রীতি দাঁড়াইল না; ধীরে ধীরে সরিয়া আসিল। একবার ভাবিল, পিতার পায়ে ধরিয়া অনুযোগ করে; কিন্তু পরক্ষণে প্রতিবাসীদের হস্তে তাঁহার লাঞ্ছনার কথা মনে হওয়ায় সে কঠোর হইয়া গেল।

পাঁচ

প্রীতির বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আজ সরোজ চলিয়া যাইবে। ক্রমে সরোজের যাইবার সময় হইয়া আসিল। মণি কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়াছে, বৃদ্ধের অবস্থাও তদ্রূপ; কেবল মাত্র প্রীতি স্থির। সে যন্ত্র-চালিতের ন্যায় সকল কর্ম্ম নীরবে সম্পন্ন করিয়া যাইতেছে।

সরোজ বৃদ্ধের নিকট গিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—"তা' হ'লে আমি আসি।"

"কি, যাচ্ছ তুমি, না, না, আমি তোমায় যেতে দেব না!—আমার প্রীতিকে ফেলে কোথায় যাবে তুমি? কি দোষে তাকে ত্যাগ করবে? যেও না, তুমি যেও না!" বৃদ্ধ সকল শক্তি দিয়া সরোজকে জড়াইয়া ধরিলেন। মণি কাঁদিয়া সরোজের পা জড়াইয়া ধরিল—"জামাইবাবু, আমাদের ফেলে যাবেন না, আমরা যেতে দোব না!"

সরোজ মহা বিপদে পড়িল; কি করিয়া সে ইহাদের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবে।

ধীর পদে গৃহে প্রবেশ করিল প্রীতি। প্রীতিকে দেখিয়া সরোজ আরও ভীত হইল; ভাবিল, ইহারা সকলে জোট্ পাকাইয়া ধরিবে না কি? কিন্তু সরোজের আশঙ্কা মিথ্যা হইয়া গেল; ধীরে ধীরে পিতার নিকট গিয়া কোমলকণ্ঠে প্রীতি ডাকিল—"বাবা!"

"মা—মা—মা রে আমার, আমি যে আর ধরে রাখ্‌তে পারছি না! তুই ধর, ও যে চলে যাচ্ছে!"

"ছিঃ বাবা, এত দুর্ব্বল তুমি! প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেলে? ছেড়ে দাও, উনি চলে যান।"

"ছেড়ে দেব! বলিস কি তুই? তা' হ'লে ও যে আর আসবে না! না, না, আমি ছাড়্‌ব না!" বৃদ্ধ আরও জোরে সরোজকে আঁকড়াইয়া ধরিলেন।

"বাবা, বাবা, এত অধৈর্য্য কেন হচ্ছ; ছাড়, ওকে ছেড়ে দাও।" প্রীতি জোর করিয়া পিতার হাত দু'টী সরোজের কোমর হইতে ছাড়াইয়া মণিকে সরাইয়া শান্তকণ্ঠে সরোজকে বলিল—"এইবার আপনি যান, নয় ত আবার এঁরা আপনাকে আট্‌কাতে পারেন।"

সরোজ বিহ্বলভাবে প্রীতির মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

প্রীতি আবার বলিল—"দেরী করবেন না, যান।"

সরোজ অভিভূতের ন্যায় ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল

ছয়

উক্ত ঘটনার পর দীর্ঘ দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।

ইতিমধ্যে প্রীতির পিতা মারা গিয়াছেন। প্রতিবাসীদের অত্যাচারে প্রীতি মণিকে লইয়া দেশ ত্যাগ করিয়াছে। অল্প বয়স হইলেও মণি নিজের চেষ্টা এবং যত্নগুণে একটী সদাগরী অফিসে কাজ যোগাড় করিয়া লইয়া দুই ভাই-বোনে কায়ক্লেশে দিন কাটাইতেছে।

আজও কিন্তু বিগত দিনের স্মৃতি প্রীতিকে উন্মাদ করিয়া তুলে! সেদিন সম্মুখে ব্রাহ্মণ, নারায়ণ, অগ্নি সাক্ষী রাখিয়া তাহার জীবনের উপর দিয়া যে একটা প্রহসনের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, সে সেটাকে স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করে; কিন্তু পারে না! সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখে,—তাহার অজ্ঞাতে মন-মুকুরে যাহার মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে,তাহা মুছা যায় না; অন্ততঃ, সে শক্তি প্রীতির নাই—তাহার সমস্ত সত্ত্বা ক্ষণদৃষ্ট একজনের নিকট নিঃশেষে আপনার কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছে!

সেদিন রবিবার। প্রীতি জানালার নিকট দাঁড়াইয়া আপন-মনে কি সব ভাবিয়া চলিয়াছিল। হঠাৎ রাস্তার উপর কোলাহল উঠিতেই সে চমকিয়া চাহিয়া দেখিল,—একটা মোটর বিপুল বেগে ছুটিয়া আসিতেছে, আর ঠিক তাহারই পুরোভাগে একটা লোক আপন-মনে পথ চলিয়াছে; হর্ণের ঘন ঘন শব্দ তাহার চেতনা আনিতে পারিতেছে না; তাই আসন্ন মৃত্যুভয়ে সকলে চীৎকার করিতেছে। ড্রাইভারটা লোকটিকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিল, কিন্তু রক্ষা করিতে পারিল না। একটা ধাক্কা খাইয়া সে ছিট্‌কাইয়া ঠিক্ প্রীতিদের দরজার উপর আসিয়া পড়িল। তাহার মুখের উপর দৃষ্টি পড়িতেই কিন্তু প্রীতি শিহরিয়া উঠিল। পড়িয়া যাইতেছিল, তাড়াতাড়ি জানালার গরাদগুলা চাপিয়া ধরিয়া কোনমতে পতনের মুখ হইতে আপনাকে রক্ষা করিল। তারপর ধীরকণ্ঠে ডাকিল—"মণি—মণি, আমাদের দরজার সাম্‌নে একজন মোটর চাপা পড়েছে; ওকে এখানে তুলে নিয়ে আয় না ভাই। লোকগুলো যত্ন করা দূরে থাক, ভীড় করে দাঁড়িয়েছে মজা দেখ্‌তে!"

মণি দিদির একান্ত অনুগত; দ্বিরুক্তি না করিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তারপর পথের দু' একজনের সাহায্যে লোকটীকে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া আনিয়া আপনার শয্যার উপর শোয়াইয়া দিতে দিতে বলিল—"বড্ড লেগেছে দেখ্‌ছি; একটা ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি, কি বল দিদি?"

প্রীতি কথা কহিতে পারিল না; ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন—"বিশেষ ভয় নেই; কেস তত্তটা সিরিয়াস হয় নি, ঘণ্টা কয়েক পরেই জ্ঞান হবে খ'ন।"

কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের বেদনায় প্রীতির নয়ন-পল্লব সিক্ত হইয়া উঠিল।

ঘণ্টা দুই পরে যখন রোগীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, প্রীতি তখন পাশে বসিয়া বাতাস

করিতেছিল। ক্ষীণকণ্ঠে রোগী বলিল—"আমি কোথায় ?"

প্রীতির উত্তর দিতে সাহস হইল না।

আবার রোগী বলিল—"আমি কোথায় আছি ?"

প্রীতি মৃদুকণ্ঠে বলিল—"আপনি আমাদের বাসায় আছেন।"

"আমার কি হয়েছিল ?"

"অসুখ; এখন ভাল আছেন।"

"ওঃ" বলিয়া খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া রোগী বলিল—"আপনি কে ?"

কি উত্তর দিবে প্রীতি ?

"বলুন, আপনি কে ? আমার আত্মীয়-স্বজন ত কেউ এখানে নেই ; এমন করে সেবা ত আর কেউ করতে পারে না! কে আপনি ?"

প্রীতি আদ্রকণ্ঠে বলিল—"আমি, আমি নার্স।"

"নার্স! নার্স কি এমন প্রাণ দিয়ে সেবা করতে পারে!"

প্রীতি চুপ করিয়া রহিল। রোগী আবার বলিল—"মনে পড়ছে বটে, পথে মোটর চাপা পড়েছিলুম, দারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও যেন কার দু'খানি কোমল হাত সর্ব্বদাই আমায় ঘিরে থাকত; ঠিক যেন তার, তার মত!" অন্যমনস্কভাবে রোগী আবার বলিল—"আর একজনও এমনি মরণের কোল থেকে টেনে এনেছিল! কিন্তু প্রতিদানে সে কি পেয়েছিল জানেন ?—অপমান, লাঞ্ছনা!"

প্রীতি মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

রোগী বলিতে লাগিল—"সেদিন বুকে ছিল ধনের অহমিকা, চোখে ছিল ভুলের কাজল, রত্ন চিনতে পারি নি!"

প্রীতি নখের কোণ খুঁটিতে খুঁটিতে জিজ্ঞাসা করিল—"এসব কার কথা বলছেন, আপনার স্ত্রীর—"

রোগী বাধা দিয়া উঠিয়া বলিল—"স্ত্রী!—হাঁ, বিয়ের মন্ত্র পড়ার জোরে অবশ্য তাকে ওই কথাই বলা যেতে পারে; কিন্তু আমার জীবনে সেইটাই মস্ত বড় প্রহসন হয়ে দাঁড়াল!"

প্রীতির তেজোদীপ্ত চোখ দু'টী কিসের বেদনায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল ; সে তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। লোকটী বলিতে লাগিল—"তাকে অত কাছে পেয়ে এত বড় করে হারাতে বোধ করি আমার মত আর কেউ পারে না! কিন্তু ভুল ভাঙ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গ্রাম সহর পাতিপাতি করে খুঁজেছি—কিন্তু অদৃষ্ট বিড়ম্বনায় তাদের কোন সন্ধানই করতে পারি নি! আশ্চর্য্য!"

চোখের জল রোধ করা প্রীতির পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ রোগীর সেদিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে চমকিয়া উঠিল, বলিল—"ও কি, আপনার চোখে জল কেন ? হঠাৎ প্রীতির হাতের আংটীটার উপর দৃষ্টি পড়িতেই সে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া 'খপ' করিয়া তাহার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া উন্মাদের মত বলিয়া উঠিল—প্রীতি, প্রীতি!—এ ত আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি না ?—কথা কও!"

প্রীতি কথা কহিতে যেন ভুলিয়া গিয়াছে!

সরোজ উদ্বেলিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "চুপ করে থাক্‌লে চল্‌বে না, উত্তর দাও! একদিন তোমারই দেওয়া জীবন নিয়ে যে তোমাকে অপমান করতে পেছয়নি, আজ সে আবার সেই জীবনেরই ঋণ বাড়িয়ে তুল্‌তে···"

প্রীতি এইবার কথা কহিল ; বলিল—"বা রে, এ ঋণ কোথা ; এ যে ঋণ পরিশোধ!'

"তা বটে!" বলিয়া সরোজ প্রীতিকে বুকে টানিয়া লইয়া চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল।

বাহিরে মণির জুতার শব্দ পাওয়া গেল।

মণি বলিয়া উঠিল—"দিদি, দিদি, ডাক্তারবাবু বল্লেন—"



ঝড়-জল-বিদ্যুৎ

শ্রী পাঁচুগোপাল মিত্র

এক

পুষ্পিতা ভয়ানক রাগিয়া উঠিল—

টান মারিয়া হাত হইতে চিরুণীটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, ধুত্তোর ছাই—

দু মিনিট চুপ—

তারপর আবার চিরুণীটা উঠাইয়া চুল আঁচড়াইতে লাগিল।

চুল কয়টা কিন্তু এমনিই বিশ্রী বেয়াদপি আরম্ভ করিয়াছে,—কিছুতেই আর বশে আসে না। ঐ যে একটা দিক্ একটু এলাইয়া দিয়া বেশ ষ্টাইল মাফিক্ একটা খোঁপা বাঁধিবে, তাহা আর কিছুতেই হয় না। ও চুল মোটে চিরুণীতে ঘুরিতেই চাহে না—

এত ভারী মুশ কিল—

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, কাঁটা পাঁচটার ঘর ছাড়িয়া গিয়া ছ'টাকে ছুঁই ছুঁই করিতেছে। পুষ্পিতা নিজের মনেই বলিয়া উঠিল, এবার যদি না হয় তো চুলগুলো সব কেটেই ফেল্‌বো—

তারপর বেশ করিয়া জল দিয়া কেশরাজি সিক্ত করিয়া পুনরায় চিরুণী চালাইতে আরম্ভ করিল।...কিন্তু তাহার মাথার কেশ আজ যেন বিদ্রোহ করিয়া বসিয়াছে সে কিছুতেই পুষ্পিতার আয়ত্তে আসিবে না।

এবার পুষ্পিতার কান্না পাইল। ছ'টা বাজিয়া যায়।...সিনেমায় যাইবে, ওদিকে ওদের সব বুঝি হইয়া গেল।...

অথচ এই দেড় ঘণ্টা কাল তাহার কাটিয়া গেল, তবু চুল ঠিক হয় না।

পুষ্পিতা বলিল, দেখ্ বাপু, হবি তো হ, নইলে দোব টেনে ছিঁড়ে—

তা' হ'লেই বেশ সুন্দর সন্ন্যাসিনী সাজ হবে তোর···হাই কেটে ফেল্—

সঙ্গে সঙ্গে নীতা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। ইহা যে কী দুরন্ত লজ্জা, তাহা পুষ্পিতাই জানে। নিজের উপর, মাথার চুলের উপর, আর বিধাতার উপর তাহার খুব বেশী রাগ হইতে লাগিল। কেন বিধাতা তাহার চুলগুলা এমন শক্ত করিয়া তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন।···

নীতা বলিল, বলিহারি তোর চুল বাঁধা ভাই, আমি ঠায় দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ওই চুল বাঁধাই দেখ্‌চি···। পুষ্পিতার মুখ তখন লজ্জায় ছোট্ট হইয়া গিয়াছে। আর কেহ নীতার সঙ্গে নাই তো! আয়নার দিকে নজর রাখিয়াই বলিল, দেখ্‌না ভাই, এ আর প'ড়্‌তে চায় না—

নীতা বলিল, তারিফ্ দিই মহুবাবুকে। লোকটার ধৈর্য্য বটে; রোজই তোমার এ চুল বাঁধা ব'সে ব'সে উপভোগ করেন।

পুষ্পিতার স্বামী মনুজ পুনঃ মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, দেখে দেখে আমার তো মনে ধাঁধাই হ'য়ে গেছে, মেয়েদের সবারই চুল বাঁধা বুঝি এই রকম।

হাসিয়া নীতা বলিল, আপনার গিন্নীর লক্ষী স্বামীটির মত তো আর সবার স্বামী অত লক্ষী নয়, আর অনেকের আবার ছেলেপিলের ঝক্কি আছে।

মনুজ বলিল, স্বামী বেচারাদের উপায় কি বলুন লক্ষী না সেজে। নইলে পরে—

মুখটী ফিরায়ে বসি।। রহিবে প্রিয়া—
শতেক ডাকেও চাহিবে না সাড়া দিয়া—
কপালে অশেষ দুখ—
অন্তর চিরিয়া ভাঙিয়া মথিয়া ঘুচিবে সব সুখ।

হাস্ত-তরল-কণ্ঠে নীতা বলিল, বাঃ! আপনি তো শুধু আইনের শুকনো উপাসক নন্, বেড়ে কবিও যে—

পুষ্পিতার মুখ তখন ভারী থমথমে হইয়া উঠিয়াছে, আষাঢ় আকাশের মেঘা ঘন আঁধারের মত। উহার দুইটা চোখ যেন উপছাইয়া গিয়াছে। বুঝি এখনই অশ্রান্ত বারিধারা ঝরিয়া পড়িবে অঝোর ধারায়—

মনে মনে মনুজ বেশ শঙ্কিত হইয়া উঠিল; বুঝিল, ব্যাপার অনেকদূর গিয়া পৌঁছিয়াছে। তাড়াতাড়ি কথা ঘুরাইয়া লইয়া কহিল, না, আজ কি জানি ওর ওরকম হ'চ্ছে! নইলে ও ভারী চটপটে—কেমন, না পুষ্পু?

যাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই আদরের স্বরে কথা কয়টী বলা হইল, তাহার হাত হইতে সশব্দে পতিত আয়না, চিরুনী, আর "মন্মন্" পদশব্দ মনুজের অন্তরের শঙ্কাকে বেশ দ্বিগুণ করিয়া দিয়া গেল।

সর্ব্বনাশ! লক্ষী নীতা-দি, আপনি ওকে থামান। তা' নইলে আমার বাড়ী থাকা ভার হবে।

কেন খুব ঝগড়া করে না কি?

...ও বাবা! অত অভিমান আমি বোধ হয় জীবনে আর কারুরই দেখি নি।…

মাস্কতক আগে এমনিই ও বাক্স সাজাচ্ছিল, তা' দু'-তিনবার ওঠার আর নামার দেখে আমি ব'লেছিলাম—তোমার তো বাক্স গোছাতেই দিনরাত কেটে যায়। তা' যে ঘরে গেলে, রেঁধে খেতে হ'ত, কী দুটো ছেলে নিয়ে ঘর ক'রতে হ'ত, সেখানে ক'রতে কি?

এতেই ওতো চ'টে লাল। ব'লেছিল, কী, আমি রাঁধতে জানি না, ব'লে তুমি আমায় খোঁটা দিলে। আচ্ছা, বেশ, তাড়িয়ে দাও ঠাকুর।… তারপর সে বাক্স তো ঢেলে উপুড় ক'রে জিনিষ পত্র তছনছ ক'রলেই—আর অনধিকারচর্চ্চা ক'রতে গিয়ে তিন দিনেই আমাকে তো আধপোড়া আর আলুনে, অসিদ্ধ জিনিষ খাইয়ে অস্থিচর্ম্মসার ক'রে তুলেছিল।

নীতা বলিল, ভারী মজা তো—

মনুজ বলিল, শুধু তাই, কথা পর্য্যন্ত বন্ধ।

আর যত নিষেধ করি, ততই ও যেন জেদী হ'য়ে ওঠে।

তারপর থাম্‌লো কি ক'রে?

সে আর বলেন কেন? অনেক রকম ক'রেই—

হাসিয়া নীতা কহিল, দেহি পদ পল্লবম্—

মনুজ একটু হাসিল। তারপর নীতা পুষ্পিতার খোঁজে বাহির হইয়া গেল।…

দুই

পুষ্পিতা সিনেমায় তো গেলই না, আরও এমন কয়টা শক্ত শক্ত কথা নীতাকে বলিল, যাহাতে নীতাও তাহাদের এই অনেকদিনের বন্ধুত্বকে বিস্মৃতিতে চাপা দিতে অনুরোধ করিয়া চলিয়া গেল।…

দুইদিন পরে—

এই দুইটী দিন পুষ্পিতা আর মনুজের মোটেই

দেখা হয় নাই।…মন্মথ জানিত উহার ওই রাগের কাছে যাইলে কিছুই হইবে না, ফলে কতকগুলি অপমান সহিতে হইবে। কাজেই ঠিক করিয়াছিল, রাগটা খানিক নরম পড়ুক।…

কলের ঘোরা চাকার মত সংসারের কাজ ঠিকই চলিয়া যাইতেছিল। ঠাকুর ভাত রাঁধে, ভাত দেয়, ঝি-চাকরেরা সংসারের অন্যসব কাজ করে। মন্মথ অভ্যাসমত আদালত যায়, আসে।…কিন্তু ঐ নিত্য স্রোতধারার মাঝে কোথাও সজীবতা লক্ষিত হয় না। সব যেন মরা। ঐ যে দু'টা নরনারী আর পরস্পরের কাছে আসে না, পাশাপাশি বসে না, হাসি-ঠাট্টা, রঙ্গ-গীতির উজ্জ্বল প্রস্রবণ ছুটায় না।…

পুষ্পিতা ভাবে—ওঃ এতদূর! একটা ভিন্ন মেয়ের সম্মুখে তাহাকে অমন করিয়া অপমান। তাহার উপর এই দু'টা দিন তাহাকে দেখাটাও দিল না একবার খোঁজটা পর্য্যন্ত নয়।…সে কি জানে না, মেয়েদের সামনে একটা মেয়েকে লইয়া পুরুষের ঠাট্টা, অপমান কতখানি বেশী ভারী হইয়া বাজে, সেই মেয়েটার বুকে।…পুষ্পিতা ঠিক করিল, কাজ নাই তাহার সংসার, সে আত্মহত্যা করিবে। হ্যাঁ—সুইসাইড,—মন্মথ জানুক. আর সব পুরুষগুলাও শিখুক, মেয়েরা তাহাদের একদম খেলা'র জিনিষ নয় যে, সব সহিতে হইবে।

কিন্তু—তাহার এই একুশ বছরের জীবন, যৌবনের পরিপূর্ণতায় অদম্য আকাঙ্ক্ষা, অন্তরের প্রসুপ্ত কামনা…[illegible]ীর এই এতবড় রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শের বিপুল[illegible] আগ্রহ সে বৃথা যাইতে দিবে কে[illegible]ন?…

না, বিধাতার দেওয়া জীবনকে ধ্বংস করিয়া লাভ কি!

অথচ এমন কি শাস্তি [illegible]পারে—যাহাতে উহার চিরক[illegible] [illegible]য়।…

কি সে?…পুষ্পিতা ভাবিতে লাগিল…

এই সময়ে দু'টা মেয়ে অনেকরকম কলরব করিয়া ঘরের ভিতর আসিল।…

লীলা আর স্নেহ পুষ্পিতার অনেকদিনকার পুরানো বন্ধু।…সে যখন পুষ্পিতা স্কুলে পড়িত, তখনকার জীবনের।…পুষ্প, লীলা আর স্নেহ এই তিনজনে এমনিই একটা দল গড়িয়া তুলিয়াছিল যে, স্কুল শুদ্ধ তো বটেই, মা'ঝে মাঝে পথচারী পথিককুলকেও শঙ্কিত হইয়া উঠিতে হইত, তাহাদের অত্যাচারে।…

লীলা বলিল এই পুষি কেমন আছিস্?

স্নেহ বলিল, একলাটী ব'সে ব'সে সেই মুখখানাই ভাবা হ'চ্ছে বুঝি—

যার চুম্বন-রসে ভরা
কপোল তল এ…

স্নেহের স্বামীর কবিতা লেখা রোগ আছে; কাজেই স্নেহ কথার ফাঁকে কবিতার বুকনী না দিয়া থাকিতে পারে না।…

পুষ্পিতা বলিল আরে, তোরা যে কতদিন পরে! কোথা ছিলি এতদিন?

স্নেহ বলিল,

পথে পথে মোরা ভ্রমিয়ে বেড়াই,
গৃহের ঠিকানা নাহি ও গো নাই—

পুষ্পিতা বলিল, থামো গো কবি গিন্নী, তোমার কবি স্বামীর গুণ আমার জানা আছে। আর অত জাহির ক'রতে হবে না।

লীলা বলিল, সাম্‌লে কথা বলিস্ স্নেহ, শেষে আইনের প্যাঁচে তোর কবিতা খুরপাক খেয়ে ম'রবে—

তারপর একথা সেকথা…

কথায় কথায় লীলা বলিল, তোর সঙ্গে আজ প্রায় একবছর পরে দেখা। সেই একবার হঠাৎ [illegible] এই—

তোর কথা জিজ্ঞাসা ক'র্লে, আমি বল্লুম ঠিকানা জানি। তারপর আজ দু'জনে চ'লে এলুম।

পুষ্পিতা বলিল, তা বেশ ক'রেছিস্। ওঃ! স্কুলে আমাদের কী দিনই গেছে ভাই! আমার তো এখন সে সব মনে হয়, আর হাসি লাগে।

লীলা বলিল, কম দুষ্টু কি ছিলুম, সুনীতি-দি' তো আমাদের না পেরে ওঠে শেষে আমাদের ক্লাসটা'তেই আসা বন্ধ ক'রে দিলে।

স্নেহ বলিল, আর সেইটে, সেই যে একটা ছোঁড়া রোজই আমাদের জানলার দিকে চেয়ে থাক্তো, সাইকেল নিয়ে পথে পেছু পেছু ছুট্তো ···মনে আছে?

হ্যাঁ, খুব। তারপর তুইই তো তাকে বদ্‌মাইসী ক'রে কবিতায় চিঠি দিলি, তারপর তোর চিঠি মত সে যখন এসে দাঁড়িয়েছে, তখন লছমনিয়া দাইকে দিয়ে খানিকটা ময়লা জল তার মাথায় ঢেলে দিয়েছিলি।

খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া স্নেহ বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তোর মনে আছে ঠিক!

লীলা বলিল, কেন সেই আর একবার একটা ছোঁড়া বাইক ক'রে আমাদের গাড়ী একদম ঘেঁষে চ'লেছিল হর্ণ দিতে দিতে, আর তুই পুষ্প রুল কাঠ দিয়ে তার মাথায় দিয়েছিলি এক ঘা।···

স্নেহ বলিল, আমি তাই ওকে বলি মাঝে মাঝে তোমাদের কীর্ত্তি তো এই সব।···তা' ওকি ব'লে জানিস? বলে পরশমণির স্পর্শে এসে মাটি সোনা হয়ে গিয়াছে। সেটা উভয়তঃ, নয় ভাই?

লীলার গণ্ড দুইটা রাঙা হইয়া উঠিল।···

হাসি-ঠাট্টার মাঝেও কথাটা গিয়া চট্ করিয়া পুষ্পিতার বুকে বিঁধিল।

কত সুখী ওরা—তার ওই ক্রীড়া-সাথীরা।

আর সে?—অভাগী।

তাহার মত ভাগ্যহারা বুঝি দুনিয়ায় কেহই নাই আর!···

নারী চিত্ত! প্রেমাস্পদের একটু অবহেলাতেই এমনই করিয়া গলিয়া যায়।···মনে করে চিরযুগ ধরিয়াই বুঝি এই ব্যথাই পাইয়া আসিতেছে।... এত বড় কোমল জাতি ইহারা।

তিন

যত দিন যায়, উহাদের দুইজনের বাধার সেতু ততই যেন আরও সুদৃঢ় হইয়া উঠে।···

অথচ ভিতরে ভিতরে দু'জনেরই প্রাণের অভ্যন্তরে রুদ্ধ স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে হু হু করিয়া। দু'জনেই দু'জনকে চায়, কিন্তু একটা কথার অপেক্ষায় পারে না শুধু।···

মন্মথ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল,—অত বড় দীর্ঘ রজনী তাহার বিফলে কাটিয়া যায়। সুদীর্ঘ রাতটা পড়িয়া থাকে, চাঁদের আলো তাহার বুকে লুটোপুটী খায়, ভিজা পাতায় কল্পলোকের নৃত্য-নূপুর চলে···দূর হইতে কোথায় কে প্রিয়া—প্রীতি-গীতি গায়;-মন্মথের বুকের ভেতর খাঁ খাঁ করে।···

মিষ্ট রজনী, মিষ্ট জীবন!

প্রাণের প্রিয়জন ছাড়া হইয়া থাকিতে চাহে না যে।···কিন্তু সে কি দোষ করিয়াছে? তোমার বন্ধু তোমায় ঠাট্টা করিল, তাহাতেই না হয় একটা-দু'টা কথা কহিয়াছে, তাহাতেই তাহার এত দোষ হইয়া গেল।···অথচ তুমি কি জান না, সে তোমায় কত ভালবাসে।···একটা কথাকে লইয়া তুমি এতে রাগ করিয়া বসিয়া আছ যে, এই লোকটী কি করিতেছে সে খোঁজটাও লইতে চাহ না।

দুত্তোর জীবন!···

আর ওদিকে পুষ্পিতা কাঁদে।···

তাহার তরুণ জীবন—বুকের ভিতর অনেক রুদ্ধ কামনা একসাথে মাথা উঠাইয়া ঠেলিয়া উঠে।...অস্থির হইয়া সে বাহিরে চলিয়া আসে।—

বাহিরে তারাভরা আকাশ, চাঁদ ধোয়া রাত্রি, বাড়ীর নীচে কেয়া-বন, ফোঁটা ফোঁটা জলের সুর-

ঝঙ্কার তাহাকে আকুল করিয়া দেয়।…ইহা যে প্রিয়'র সাথে প্রিয়ার মিলিবার ক্ষণ।—তবু মন সকল অঙ্গ খুঁজিয়া ফেরে প্রিয়কে। পুষ্পিতার ইচ্ছা হয় ছুটিয়া যায় সে; ঐ তো ওই ঘরটায় শুইয়া আছে তাহার ঈপ্সিত বাঞ্ছিত,…হয় তো উহারই মত অস্থির চঞ্চল।…

চলিতে যায়—

কিন্তু অভিমান আসিয়া বাধা দেয়, চুপ… বুকের ভেতর বাসনা লুটাইয়া পড়ে, অভিমান গলা টিপিয়া ধরে, তাহাকে কথা কহিতে দেয় না।…

ব্যাকুলিত প্রাণের ক্ষীণ বিদ্রোহকে অভিমান তাহার বিরাট্ গর্জ্জনে অক্ষত করিয়া তুলে; যাহার জন্ম সে কাঁদিতেছে, যাহার জন্ম সে অস্থির, যাহাকে পাইবার জন্ম তাহার প্রতি প্রত্যঙ্গ উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, কই সে তো বারেকও চাহে না তাহার দিকে।…সে কি একটা দিন,—একটা মিনিট তাহাকে আসিয়া ডাকিয়াছে?

অথচ তার কি দোষ?

চুল বাঁধা হইতেছিল না,—তুমি কেন ঠাট্টা করিলে, আবার একটা ভিন্ন মেয়ের সম্মুখে, তাই না সে রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তোমার কি উচিত ছিল না, একটী বার ডাকিয়া কথা কওয়া?

কই এসো তো, ডাক দেখি, দেখি সে কেমন চুপ করিয়া থাকে!

পুষ্পিতা যেন পাগল হইয়া উঠিল।…সে যে আর এমন করিয়া থাকিতে পারে না, না সে কোথাও চলিয়া যাইবে।…ঠিক্ করিল—যেখানেই হোক সে যাইবেই। আজই বাবাকে চিঠি লিখিবে, তিনি আসিয়া তাহাকে পাটনায় লইয়া

চার

পাশের বাড়ীর বউটি সেদিন বেড়াইতে আসিয়াছিল পুষ্পিতাদের বাড়ী।…

তাদের ছোট্ট একটুখানি বাড়ী। ওপরে দুইখানা আর নীচে তিনখানা ঘর।…বউটির স্বামী এতদিন তাহাকে গ্রামের বাটীতেই রাখিয়াছিল, এবার পাঁচ টাকা মাহিনা বৃদ্ধি হইয়াছে, কাজেই এই বাড়ীটা পঁচিশ টাকার ভাড়া করিয়া ছোট্ট সংসারটি পাতিয়াছে। মা, একটী চোদ্দ-পনেরো বছরের ভাই, আর বউ লইয়া তাহার সংসার।

পোর্ট কমিশনারের অফিসে চাকুরী করে, ষাট টাকা মাহিনা পায়।

প্রথম দিনটায় যখন ছাদে উঠিয়া অবগুণ্ঠনের অন্তরাল সরিয়া গিয়া বউটির দৃষ্টি তাহাদের বাড়ীর পাশেই অত বড় বাগানওয়ালা বিরাট বাড়ীখানা দেখিয়াছিল, মনের মধ্যে অনেকখানি ইচ্ছা জমিয়া উঠিয়াছিল ঐ বাড়ীটার যাইবার।

কিন্তু সাহস হয় নাই—।

কিন্তু পূর্ণিমার চাঁদের মতই পরিষ্কার ধবধবে চেহারার, তাহার চেয়ে দু'-এক বছরের বেশী বয়সের একটী মেয়ে সেদিন সেই বাড়ীর ছাদ হইতে তাহাকে ডাকিল, এসো না ভাই, লজ্জা কিসের, কেউ নেই—সে ডাকের মোহ সে ত্যাগ করিতে পারে নাই। কাজের সংসার; রোজ যাইতে পারে না; তবে সময় পাইলেই একবার চট করিয়া ঘুরিয়া আসে। আজও আসিয়াছিল—

কথায় কথায় বউটি পুষ্পিতার বিষণ্ণতা লক্ষ্য করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মেয়েদের স্বভাবই এই। আর একটি মেয়ের সহানুভূতি,দরদ পাইবার আশায় তাহারা বুকের ব্যথা অন্তরের কথা কোন কিছু গোপন রাখিতে পারে না।

আমি ভুল ক'রেছি ?

হ্যাঁ—। মেয়েছেলে আমরা, আমাদের সব সইতে হয়। অত রাগ কি আমাদের সাজে ?

কেন ? মেয়েছেলে ব'লে কি আমাদের বলার কোন ক্ষমতা নেই। পুরুষ সে, চোখ রাঙিয়ে চ'লবে, আর আমাদের চুপ ক'রে তা মেনে মাথা নীচু ক'রে চ'লতে হবে।

বউটি বলিল, স্বামীকে যেদিন বরণ ক'রে নিয়েছি, সেই দিন থেকে তো এই-ই উপায় জানি।...তারপর তোমার স্বামী তো ভাই এমন কোন অন্যায় তোমার ওপর করেন নি। তোমারই বন্ধুর কথার উত্তরে তিনি ব'লেছিলেন, তাও তুমি যেভাবে নিয়েছ—সেভাবে নয় ; হয় ত ঠাট্টা ক'রে হাল্কাভাবেই কথাটা ব'লেছিলেন। এতেই কি ভাই তোমার এত অভিমান ক'রতে হয়।...

মেয়েরা আমরা স্নেহে, প্রেমে যদি না সব ডুবিয়ে দিতে পারলুম তো জীবনের সার্থকতা হ'ল কি ? আমরা তো ভাই মূর্খ এই বুঝি দিদি।...

পুষ্পিতা এবার কোন কথা কহিল না।

বউটি, তারপর বলিল, যাই আজ উঠি দিদি, ও। আসার সময় হ'য়ে এল। তারপর ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেল।

পুষ্পিতার মনে তাহার ওই কয়টা কথা কিন্তু খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাই তো—নারীর ধর্ম্মই তো মমতা, প্রীতির পীযুষ-ধারায় সকল মালিন্য, আবিলতাকে দূরে সরাইয়া দেয়।...

ঐ অর্দ্ধ-শিক্ষিতা পল্লীবধূ—কত বড় শিক্ষাই না সে দিল! স্বামীর জন্য তাহার সে কী আগ্রহ, ব্যস্ততা!...

আর সে ?

পুষ্পিতার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল! ...সে ঠিক করিল, আজই সে ক্ষমা চাহিবে—মনুজের পায়ে ধরিয়া।...

মনুজ স্তব্ধ হইয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া ছিল।... ঘরে আলো নাই ; অন্ধকার হইয়া আছে। মনুজের দৃষ্টি সম্মুখের জানালা দিয়া দূরে ওই জমাট অন্ধকারের দিকে প্রসারিত ছিল।

বিরাট্ অন্ধকার।...

আকাশে তারা নাই, গভীর কালোরূপে ভরিয়া আছে শুধু।...

পুষ্পিতা ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিল, এ কী আলো নেই হ্যাঁরে পান্না ?

মনুজ বলিল, থাক্, আলোর দরকার নেই। একটা দিন আর আমার আলোর কি হবে পুষ্প ? এমন ক'টা দিনই তো অমন অন্ধকারে কেটে গেল।

পুষ্পিতার বুকখানা চিরিয়া গেল—

মনুজ বলিয়া চলিল, অভাব আমার কিছুই নেই, অথচ অভাব সবেরই। তাই ভাবি কী সুন্দরই জীবন আমার! নিজেকেই নিজে তারিফ্ দিতে ইচ্ছে হয়, বাঃ!...

জানি না কেন মানুষ বিয়ে করে, সংসার খোঁজে! এই তো সংসারের সুখ—

যার কাছে জুড়োবার দাবী, সে শুধু মুখ ফিরিয়ে নেয়।—

পুষ্পিতা আর থাকিতে পারিল না। দুই হাতে মনুজের পা দু'টী জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, আমায় মাপ করো, মাপ করো তুমি ; দু'টী পায়ে পড়ি তোমার! আর আমি কখনো এরকম করবো না গো!

অশ্রুজলে মনুজের পা হইতে নিম্নে ক্ষীতিতল পর্য্যন্ত সিক্ত হইয়া উঠিল।...

ট্র্যাজেডি

শ্রী বগলারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

এক—পত্রিকার নাম "গৌরীশৃঙ্গ"—আর সম্পাদকের নাম হরপ্রসাদ। এই হরগৌরী মিলনের ফলে যে সুধা সমাজে বিতরিত হইত,—প্রাচীনেরা বলেন যে, তাহা দৈহিক ও মানসিক সুস্থ থাকার পক্ষে পর্য্যাপ্ত।

সম্পাদক হরপ্রসাদ, ঈশ্বরের প্রসাদে করেন নাই, এমন কাজ সংসারে খুব কমই ছিল। প্রথম যৌবনে কলেজ হইতে বাহির হইয়া, তিনি সমাজ সংস্কারে মন দিয়াছিলেন। কিন্তু সুবিধা না বুঝিয়া আরও কিছুদিন পরে হোমিওপ্যাথী ডাক্তার। গুটিকয়েক রোগীকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া,—বহুকাল গবেষণার পর,—অবশেষে এই প্রৌঢ়ত্বে তিনি সম্পাদক হওয়াটাই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন মনে করিলেন।

কাগজ প্রকাশের উদ্দেশ্য সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রচার। লেখকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—আর সেই অনুপাতেই গ্রাহক সংখ্যা হ্রাস হইতে থাকিল; এবং অফিসের সান্ধ্য-আড্ডায় তামাকের খরচ অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গেল।

হরপ্রসাদ চিন্তিত হইলেন। কাগজখানিকে স্থায়ী করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া পুনর্ব্বার কিছুকালের জন্য গবেষণায় রত হইবেন কি না ভাবিতেছেন, এমন সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটিল।

তাহা আর কিছুই নহে,—হরপ্রসাদের সহধর্ম্মিণী মাতঙ্গিনী দেবীর পরলোক-প্রাপ্তি। কয়েক দিন হইতেই তাঁহার সামান্য একটু জ্বর হইতেছিল, এবং সেই জ্বর যখন সামান্য একটু হইতে প্রবল একটুতে পরিণত হইল; তখন হরপ্রসাদের দৃষ্টি পড়িল—তাহার পর প্রেসের কর্ম্মচারীদের বেতন চুকাইয়া সচেতন হইবার পূর্ব্বেই মাতঙ্গিনী জবাব দিলেন।



চারিদিকে অকূল সমুদ্র। যেদিকে চাওয়া যায়,—সেইদিক্ হইতেই হতাশার পর্ব্বত প্রমাণ ঢেউ তাঁহার অস্তিত্ব বিলোপ করিবার আশায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।…

প্রাচীন মানুষ, প্রেমের ধার কোনদিনই ধারেন নাই। কিন্তু তবুও তো প্রেমছাড়া সংসারে অনেক জিনিষই আছে,—যাহা দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য্য। তাই মাতঙ্গিনী তাঁহার প্রয়োজন-জগতের একমাত্র অভাব সরবরাহক ছিলেন।

শোকটা হইল খুবই। তাই প্রথম ঝোঁকটা কাটিয়া যাইতেই পরবর্ত্তী সংখ্যা 'গৌরীশৃঙ্গে' প্রবন্ধ বাহির হইল,—"বঙ্গ সমাজে স্ত্রী-বিয়োগ সমস্যা।" তারপর মাসের পর মাস ধরিয়া এমন সব সমস্যারই সমাধান তিনি সুরু করিলেন যে, গ্রাহকবর্গের চিন্তা হইল,—তাঁহার এই সমস্যা-অমবস্যার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পরবর্ত্তী সংখ্যা হইতে কাগজ লওয়া ছাড়িয়া দিবেন কি না।

প্রচণ্ড বেগে পত্রিকা চলিতে লাগিল। তাহ্র

সংখ্যায় উদীয়মান সাহিত্যিক, কবিরাজ রাধাগোবিন্দ শীলের "দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের প্রয়োজনীয়তা" বাহির হইতেই গ্রাহকবৃন্দের নিকট কাগজ লওয়ার অপ্রয়োজনীয়তা প্রমাণ হইয়া গেল, এবং হুড়্ হুড়্ করিয়া অনাস্থা-জ্ঞাপক পত্র আসিয়া, হরপ্রসাদের চক্ষু দুইটিকে কপালের একটু নীচে উঠাইয়া মাতঙ্গিনীর শোককে সম্পূর্ণরূপে নিভাইয়া দিল।

হরপ্রসাদ সুস্থ হইয়া গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট অনুরোধ-পত্র লিখিতে বসিলেন।

দুই—কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে একটী বাল্য বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তিনি যথারীতি কুশল-সংবাদ আদানপ্রদানের পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"তারপর তোমার শৃঙ্গটী কেমন আছে হে?"

হরপ্রসাদ দস্তুরমত খিঁচাইয়া উঠিলেন—"আমার শৃঙ্গ? মানে কি হ'ল?"

"আরে তোমার কাগজ, কাগজ!

"অ-ও! গৌরীশৃঙ্গ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। তা' হরগৌরী একই কথা—কেমন চলছে?"

কেমন চলিতেছে, তাহা বলিবার পূর্ব্বেই হরপ্রসাদ নিজে চলিতে সুরু করিলেন দেখিয়া—বন্ধুটী একটু হাসিলেন মাত্র।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময় অফিসে, সমাগত সাহিত্যিকবৃন্দের সমক্ষে হরপ্রসাদ প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন যে,- অতঃপর কাগজখানিকে কি করিয়া সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া তোলা যাইতে পারে।

কবিরাজ রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন—"আমাদের উচিত,—প্রতিমাসে যাতে কয়েকটি ক'রে সুচিন্তিত প্রবন্ধ-আর সুরুচিসঙ্গত গল্প দিতে পারি, তারই চেষ্টা করা—নইলে—"

একজন কে বলিয়া উঠিলেন—"কবিতা নইলে কাগজ চলতে পারে না কিছুতেই!"

হরপ্রসাদ লাফাইয়া উঠিলেন—"কবিতা? না, না, ওসব হবে না। কবিতা ছাপান মানে কি জানেন? মোহগ্রস্থ মনের প্রমত্ত প্রলাপকে প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র। এতে 'গৌরীশৃঙ্গে'র আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা হবে। তবে, "হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি পড়িল,—'কাঞ্চনজঙ্ঘা' পত্রিকার সম্পাদক জগদানন্দবাবুর পশ্চাতে একটী যুবক বসিয়া আছেন,—মাথায় এক ঝাঁক চুল চোখে চশমা, হাতে রিষ্টওয়াচ্। সুর নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"জগৎবাবু, আপনার পেছনে উনি কে? চিন্‌লাম না তো।"

জগদানন্দবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"সে কি এঁকে চেনেন না? ইনি একজন স্বভাবকবি। 'নবঃর্ব্বা'য় নিয়মিত লেখেন। শুনলে আশ্চর্য্য হবেন,—ইনি প্রত্যেক দিন ভোরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি না ক'রে জলগ্রহণ করেন না।"

হরপ্রসাদ একটু হাসিয়া বলিলেন—"ও! আপনিই বুঝি এর আগে কবিতার কথা বলছিলেন, না? দেখুন, আমাদের কাগজ প্রকাশের উদ্দেশ্য অন্য রকম। সমাজ-সমস্যা সমাধানই এর ব্রত। ক্ষমা করবেন, আমার মনে হয়, কবিতা জিনিষটা অত্যন্ত তরল।"

মাসিক সাহিত্য-সমালোচক বেদেন্দ্র বাগ মহাশয় এতক্ষণ নীরবেই একধারে বসিয়াছিলেন, আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন—"অপরাধ নেবেন না—কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি,—ক'দিন আপনার গ্রাহকেরা এই সব গুরুগম্ভীর বিষয় ধৈর্য্য সহকারে পড়বেন? কবিতা—সনেট এবং গান কাগজকে জনপ্রিয় করবার প্রথম সোপান বলেই আমি মনে করি।"

সম্পাদক-মহাশয় বসিয়া বসিয়া চিন্তিত মুখে অনর্গল তামাকই টানিতে লাগিলেন। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে তিনি বলিলেন—"আচ্ছা—বেশ কবিতা প্রকাশে আমার অমত নেই; কিন্তু সর্ত্ত এই যে, সেগুলি রচিত হবে সৎ মনোভাবকে কেন্দ্র করে।"

বেদেনবাবু কবিকে জিজ্ঞাসা করিলেন

'আপনার কতগুলো কবিতা এ পর্য্যন্ত বেরিয়েছে ?"

কবি দক্ষিণ চক্ষুটী ঈষৎ ছোট করিয়া কহিলেন -"অ—নেক !"

তিনি সাধারণতঃ মুদারার 'গা' পর্দ্দায় কথা বলেন ; আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়িতে থাকে। কবিজনোচিত সুর,—অর্থাৎ, মধ্যরাত্রে সুন্দরী স্ত্রী স্বামীর গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া অলঙ্কার আদায়ের জন্ত যে সুরে বায়না ধরেন,—তাঁহার কথার মধ্যে তাহাই সুপ্রচুর।

"কাঞ্চকুঞ্জ' সম্পাদক মহাশয় কক্ষের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন--"সত্যি হরপ্রসাদবাবু, আমাদের এই তরুণ কবিটীর কথা যখনই আমি ভাবি, আমার হিংসে হয়। সকাল বেলায়,—কাকের কাকলীকেও স্তব্ধ ক'রে যখন ইনি আবৃত্তি করতে থাকেন -

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি—"

তখন আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। একাধারে কণ্ঠ, লেখনী, আর প্রতিভার এ রকম প্রাচুর্য্য বড় একটা দেখা যায় না।"

রাধাগোবিন্দবাবু এতক্ষণ নীরবেই শুনিতেছিলেন,—কিন্তু কবির এই লজ্জাকর গুণগান তাঁহার আর ভাল লাগিতেছিল না ; বলিলেন—"থামুন মশায়! আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না—আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি যে, উনি সুকবি।"

কবির সুর ধাঁ করিয়া মুদারার 'গা' হইতে 'ধায়ে' চড়িয়া গেল—"কোন ভদ্রলোকের কথার মাঝে কথা কওয়াটা যে বর্ব্বরতা, এটা কি মশায়ের জানা আছে ?"

রাধাগোবিন্দবাবু আর একটু গরম হইবেন কি না ভাবিতেছেন, বেদেনবাবু কি একটা উত্তর দিবার জন্ত ঠোঁট দুইটাকে সবেমাত্র পৃথক করিয়াছেন,—এমন সময় সম্পাদক-মহাশয়—"রাত্রি অনেক হ'ল।" বলিয়া সুইচ টিপিয়া উঠিয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে ঝগড়া ভুলিয়া সরস্বতীর বরপুত্রগণ নিজের নিজের জুতা খুঁজিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

তিন—মানব জীবনের বাঁকে বাঁকে কত না বৈচিত্র্য। কাহারও সুখে, কাহারও দুঃখে, কাহারও বেদনায়, কাহারও পুলকে স্বতন্ত্র যাত্রা-পথ স্পন্দিত হইতে থাকে।

হরপ্রসাদবাবুর এই প্রৌঢ়ত্বের বাঁকেও একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

কবির বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন তিনি বহুবার। এই মাতৃ-পিতৃহারা ভাই-বোনের অভিভাবক হইবার নেশা, তাঁহার মনে স্বপ্নজাল বুনিতেছিল কিছুদিন ধরিয়া।

কাজে, অকাজে, সময়ে, অসময়ে কবির বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তিনি যুবকত্বের প্রমাণ দিতে আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু প্রয়োজন হইল না। কবি নিজেই একদিন সবিনয়ে নিবেদন করিল যে, হরপ্রসাদবাবুর সহধর্ম্মিণীর অভাব তাঁহার কোমল চিত্তকে নিরন্তর পীড়া দিতেছে—

এবং মানুষের যখন ইহার প্রয়োজনও আছে—

এবং চিত্রাও যখন হাতের কাছে রহিয়াছে, তখন—এই রকম বারকতক 'আছে' 'আছে' বলিয়া সে তাঁহার কাছে কাছে ঘুরিয়া ভগ্নীর মাল্যদান-সংক্রান্ত যাবতীয় কথাবার্ত্তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া লইল।

অবশেষে এক বৈশাখের রাত্রিতে, দুইখানি মৃণাল বাহু, একখানি যুথীর মালা, 'গৌরীশৃঙ্গ' সম্পাদকের চূড়ায় জড়াইয়া দিল।

হরপ্রসাদ স্বস্তির,—কবি সার্থকতার,—আর চিত্রা স্বপ্নভঙ্গের নিঃশ্বাস ফেলিয়া জীবনযাত্রা সুরু করিল।

প্রাচীন বৃক্ষের রোমে রোমে নব অঙ্কুরোদ্গমের পুলক শিহরণ লাগে।

দিন চলে—

পৃথিবী যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে আত্মগোপন করে,—নিজের ক্ষুদ্র কক্ষের বাতায়নতলে বসিয়া চিত্রা ভাবে জীবনের অসঙ্গতি ও অপরিপূর্ণতার কথা।

সংসারে দুঃখ-দৈন্য ত আছেই,—কিন্তু দু'ইটী জীবনের পরস্পর বিরোধী সুর অসম ছন্দে চলিতে চলিতে অনন্ত কালেও যে মিলিতে পারিবে না, ইহাই তাহার কোমল বুকে অবিরাম বাজিতে থাকে।

এক অবিবেচক প্রৌঢ়ের সাংসারিক প্রয়োজন পূরণের অসীম নির্লজ্জতা,—আর এক অপরিণত মস্তিষ্ক যুবকের স্বার্থসিদ্ধির ব্যাকুল প্রয়াস,—তাহারই মাঝখানে একটী ভীরু তরুণীর আত্মরক্ষার জন্য কী সে কাকুতি!…

কিন্তু বৃথা—বৃথা—সব বৃথা!………

মেঘ করিয়া আসিতেছে, এখনই হয় ত ভীষণ ঝড় কিংবা প্রবল বৃষ্টি পৃথিবী তোলপাড় করিয়া দিবে। আঃ! আসুক ঝড়, আসুক বৃষ্টি, তবু ত এই ধরিত্রীর অসহায় সন্তানগুলির মূক রুদ্ধ ব্যথার একটা কিনারা হয়।

জঞ্জাল যখন জমে,—পাপ যখন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে,—তখনই ত একদিন বিধাতার রুদ্র বহ্নি, নির্দ্দয় ইঙ্গিতের মত ধরণীর বুকে নামিয়া আসে। সেও ত তাহারই দিকে চাহিয়া আছে।

রাত্রির ঘনান্ধকারে চিত্রার শূন্য-নিবদ্ধ-দৃষ্টির কোণ বাহিয়া টপ টপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়ে—

সাক্ষী থাকে, শুধু অগণন নক্ষত্ররাজি,—সাক্ষী থাকে, শুধু বিশ্ব নারীর অন্তর দেবতা!………

হরপ্রসাদ ঘরে ঢুকিলেন।

ভদ্রলোক বিবাহ করিয়া এক মহা-বিভ্রাটে পড়িয়াছেন। তিনি না পারেন স্ত্রীকে 'প্রেয়সী' 'প্রাণেশ্বরী' সম্বোধন করিতে, আর না পারেন 'ও গো', 'হ্যাঁ গো' বলিতে।

জীবনের প্রদোষান্ধকারে দাঁড়াইয়া ঐগুলি উচ্চারণ করিতে বোধ হয় তাঁহার লজ্জাই হয়,—হইবারই কথা।

ঘর অন্ধকার দেখিয়া তিনি বলিলেন—"ইয়ে—তা' এখনও আলো জ্বালা হয় নি দেখছি, মুস্কিল,—আমার আবার একটু—" বলিতে বলিতে নিজেই সুইচ্‌টা টানিয়া দিলেন।

চিত্রাকে জানালায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া,—আবার অকারণ কতকগুলি বকিয়া যান—"এই বর্ষাকাল—জান্‌লার—ধারে, ঠাণ্ডা লাগ্‌তে পারে,—শরীর ত আর মোটেই—" কোন কথাই শেষ করা হয় না; তবুও কোন রকমে টানিয়া টানিয়া মনোভাব ব্যক্ত করা মাত্র।

এই রকম টানা-বোনার মধ্য দিয়াই দিনের পর দিন গড়াইয়া চলে।

ভাদ্রমাসের প্রথমেই একদিন হরপ্রসাদ হি-হি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া শয্যা লইলেন। নিজের দেহের যন্ত্রণার চাহিতেও তাঁহার 'গৌরী-শৃঙ্গে'র চিন্তাটা হইল বেশী। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া, এবং ডাক্তার যখন জ্বরটীকে টাইফয়েডের পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া জানাইয়া গেলেন,—তখন শ্যালকের হস্তে পত্রিকার ভারার্পণ করিতে তিনি মনস্থ করিলেন—এবং করিলেনও তাহাই।

চার—ডাক্তার কবিরাজে বাড়ী ভরিয়া গেল—চিকিৎসার হট্টগোল—আর সেই দারুণ দুর্দ্দিনে চিত্রা নিজেকে স্বামীর পরম প্রয়োজন পূরণের কাজে উৎসর্গ করিয়া দিল।

ওদিকে অফিসে ঝাঁকে ঝাঁকে তরুণ-তরুণীর দল জুটিতে লাগিল, এবং সকলে মিলিয়া 'শৃঙ্গ'-সংস্কারে প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে লাগিল।

প্রচ্ছদ-পটের চেহারা বদলাইয়া গেল—প্রবন্ধের নাম-গন্ধও রহিল না—শুধু আধুনিক ছোট গল্প ও প্রেমের কবিতার ঢল নামিল।

কবিরাজ রাধাগোবিন্দবাবুকে ছাঁটিয়া দেওয়া হইল—জগদানন্দবাবু ম্যানেজার হইলেন—প্রাচীন লেখকবৃন্দের চিহ্নমাত্র রহিল না। টিঁকিয়া গেলেন শুধু বেদেন্দ্র বাগ মহাশয়—তাঁহার মধ্যে আংশিক আধুনিকতা আছে বলিয়া।

ভাদ্রের পঁচিশ-এ 'গৌরীশৃঙ্গ' বাহির হইলে দেখা গেল,—সম্পাদক হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে নাম রহিয়াছে সমর মুখো।

হরপ্রসাদ শ্যালক কবি সমর মুখোর অমর প্রচেষ্টা জয়যুক্ত করিতে লেখকের অভাব হইল না। কচি-কাঁচায় ঘর ভরিয়া গেল—আর নরকও রীতিমত গুলজার হইয়া উঠিল।

* * * *

আশ্বিনের মাঝামাঝি একদিন হরপ্রসাদ সুস্থ হইয়া অফিস অভিমুখে রওনা হইলেন।

কিন্তু তাঁহার না যাওয়াই উচিত ছিল; কারণ, উপস্থিত হইয়াই দেখেন, সেখানে গোটা আঠারো বড় বড় চুলওয়ালা মাথা, আর জন দুই মহিলা বসিয়া সাহিত্যালোচনা করিতেছেন।

তাঁহাকে দেখিয়াই কবি মুখো—"আ রে, জামাইবাবু যে! আসুন, আসুন। আপনি আবার এতদূর কেন কষ্ট ক'রে। আমি যেতে পারি নি,—মানে, কার্ত্তিক সংখ্যার জন্য তৈরী হ'তে হচ্ছে কি না!" প্রায় চীৎকার করিয়াই উঠিলেন। তারপর সমাগত তরুণ-তরুণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—'ইনিই আমার ভগ্নীপতি—আর 'শৃঙ্গে'র পূর্ব্বতন সম্পাদক হরপ্রসাদ বন্দ্যো।"

হরপ্রসাদবাবু একখানি চেয়ারে বসিতে বসিতে বলিলেন—"তা ত বুঝলাম; কিন্তু এ কি পাগলামী সুরু করেছ বল ত?"

কবি বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"একে আপনি পাগলাম বলেন? এই দু'মাসে আপনার কাগজের আয় কত বেড়েছে, জানেন? গ্রাহক ছিল দেড়শো, হয়েছে দেড় হাজার; বুঝলেন? এরই মধ্যে সাহিত্য-সমাজে নাম যে কতদূর ছড়িয়ে পড়েছে,—তা যদি শোনেন, তবে অবাক হবেন। আমাদের এক বান্ধবী মঞ্জুলিকা মৈত্র, একটী কবিতা পাঠিয়েছেন—আপনাকে শোনাই,—তা' হ'লে বুঝবেন যে, সত্যিকারের প্রতিভা কাকে বলে—আর আমরা তার আদর করতে জানি কি না। ইয়ে—এই কবিতাটা পড়ুন ত মৃগাঙ্কবাবু।"

হরপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইনি?"

কবি হাসিলেন—"ইনি হচ্ছেন আধুনিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ চিত্র শিল্পী মৃগাঙ্ক ঘোষ।"

হরপ্রসাদ বলিলেন—"নামটা যেন চনা চেনা; আচ্ছা, এক মৃগাঙ্ক ঘোষ একবার মির্জ্জাপুর পার্কের এক রাজনৈতিক সভায় মালবিকা মিত্রের কবিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন না?…… ……"

মৃগাঙ্কবাবুর অবস্থা করুণ হইয়া উঠিল। তিনি একটু কাসিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"না নাঃ। আপনি দয়া করে এটা শুনে নিন—আমার আবার একটু কাজ আছে।" বলিয়াই পড়িতে সুরু করিলেন—

"অয়ি প্রিয়া,
বকুল বিছানো শ্যাম বনতল দিয়া
ললিত চরণে মম হৃদয়-দুয়ারে
পঁহুছিবে একদিন—প্রেমবার্ত্তা নিয়া।
জানি আমি জানি—
স্বপ্ন মোর ব্যর্থ কভু হইবে না রাণী!
মিলনের সেই শুভ্র নিশা—
লক্ষ যুগে যুগে তব অধর সৌরভে—
হারায়েছে দিশা!

হরপ্রসাদ বাধা দিয়া বলিলেন—"বেশ

হ হচ্ছে—কিন্তু আমার ত বলবার উপায় নাই; অসুস্থ মানুষ—"

কবি খুশী হইয়া উঠিলেন—"তা ছাপা হলেই পড়বেন।" হরপ্রসাদকে উঠিতে দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন "আর হ্যাঁ, আমরা আজকের এই সভায় ঠিক করলুম কাগজখানার প্রাচীন নামটার একটুখানি সংস্কার ক'রে "শৃঙ্গার" রাখলে কেমন হয়? কি বলেন?

উত্তর দিবার লোকটী তখন রাস্তার মাঝখানে......

পাঁচ—আশ্বিন গেল, কার্ত্তিক গেল, অগ্রহায়ণও গেল। হরপ্রসাদ 'গৌরী শৃঙ্গে'র নামে খরচ লিখিয়া রাখিলেন। কারণ, তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, ইতিমধ্যে স্বত্বাধিকারীর নাম পর্য্যন্ত বদলাইবার আয়োজন হইতেছে।

শীতের সন্ধ্যা।...কয়েকদিন হইতেই প্রবল বৃষ্টি নামিয়াছে। একটা অবসন্নতা ও নিরানন্দ ভাব সমস্ত সহরের বুকে বিরাজ করিতেছে যেন।

হরপ্রসাদ শুইয়া শুইয়া বোধ হয় 'গৌরী শৃঙ্গে'র কথাই ভাবিতেছিলেন। তাঁহার সারা-জীবনের উদ্দেশ্য কয়েকটী নাবালকের হস্তে পড়িয়া যে কী রকমভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল, মনে মনে তাহারই ইতিহাস আলোচনা করিতেছিলেন।

তবু এই একটা আশার কথা যে, সময় তাঁহার কাছে প্রতিশ্রুত হইয়াছে,—পৌষ সংখ্যা যাহাতে সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিবে।

যদিও এই প্রতিশ্রুতির দাম,—একদল মাতালের মাঝে একজন মাত্র প্রকৃতিস্থের মতের দামের ন্যায়।...

চিত্রা আসিয়া একখানি কাগজ দিয়া গেল—খুলিয়া দেখেন, 'শৃঙ্গার' পৌষ সংখ্যা।

উল্‌টাইয়া যাইতে প্রথমেই চোখে পড়িল—'অনাগতা' শ্রী প্রফুল্ল পাইন; তারপরই একটা গল্প—'কামনার অঞ্জলি' সন্ধ্যা সমাদ্দার।

আরও দু'-একপাতা উল্‌টাইতেই হঠাৎ এক স্থানে চোখে পড়িল—"ও গো,...না, ...না,.. তোমার দুর্ব্বলতাকে এমন কোরে আত্মপ্রকাশ কর্‌তে আমি দেব না!"..."স্বর তার কেঁপে উঠ্‌ল—যেমন কোরে কাঁপে নীল অপরাজিতার পাতা মৃদু বায়ে!......

পুরুষ চিত্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে,...অকারণে...। একটা দুর্দ্দমনীয় কামনার বেগ সে অনুভব করে বুকে!...

রিক্ত সর্ব্বহারা ভিখারীর বিপুল অর্থ-প্রাপ্তির উল্লাস!

সে ছুটে যায়.. মেয়েটী বাধা দেবার চেষ্টা করে.. কিন্তু তবুও নিমেষের মাঝে তার পেলব দু'খানি ঠোঁটে...চুম্বনের গাঢ় কালিমা অঙ্কিত হয়ে যায়।.. তারপর......"

আর অগ্রসর হইতে হরপ্রসাদের সাহসে কুলাইল না। পায়ের তলা হইতে লেপখানি টানিয়া গায়ে দিয়া,—ধপ্ করিয়া শুইয়া পড়িয়া আজ সর্ব্বপ্রথম চিত্রাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"ও গো,—একটু জল দাও ত খাব।"



স্পন্দন

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

বৃষ্টি তখনও ধরে নাই ; পত্রের আকর্ষণে মোহাবিষ্ট হইয়া যুবকটি আবার পড়িয়া যাইতে লাগিল —

হাজারীবাগ
২রা পৌষ, ১৩৩০

"দিদি,

তোমার পত্রখানি যে সুখের সংবাদ বহন করে এনেছে, তাতে কি করে যে সন্তুষ্ট না হয়ে থাকি, তা ত বুঝ্তে পার্‌ছি না। নিজের জীবনের সত্য ঘটনা শুনিয়ে জান্‌তে চেয়েছ,— পূর্ব্বের সখিত্ব বজায় রাখতে পার্‌ব কি না ? কিন্তু ভাই, ওকথাটা বরং আমিই জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি। আমার জীবনের ইতিহাসটাও বড় কম দুঃখের নয়। ঠিক্-ঠিক্ ধর্‌তে গেলে, তোমরা সমাজের মধ্যে এ হতভাগিনীর মেয়েকে নিয়ে বসাতেই পার না। তবু যদি স্থান পায়, সে কেবল তোমার অন্তরের মহত্ত্ব ও উদারতার গুণে।

শৈশবে বাপ মা দুজনকেই হারিয়ে বসেছিলুম। দূর-সম্পর্কের এক কাকা আমায় কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষ কর্‌তে থাকেন। নতুন মা বা কাকীমা যাই বল, দিনরাত তাঁর খিচুনীর মধ্য দিয়েই আমি সে বাড়ীতে বড় হয়ে উঠেছিলুম। পাড়ার পাঁচজনের অখ্যাতির ভয়েই হোক্ কিংবা ক্রমাগত নিজের বিষদৃষ্টির ঝাঁজে বিরক্ত হয়েই হোক্, তিনি আমায় এগার বছর বয়সেই পরের ঘরে পাঠিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ; সঙ্গে সঙ্গে কাকাবাবুকেও ব্যস্ত করে তুল্‌লেন। কিন্তু, সম্বন্ধের সময় তিনি টাকার থলেটা এমন আঁক্‌ড়ে ধরে বসে রইলেন যে, অনেক সাধ্য-সাধনা করেও কাকাবাবু তা থেকে বিশেষ কিছু বার করতে পার্‌লেন না ; নিরুপায় হয়ে তাঁর বছরখানেক ধরে ঘোরাঘুরিই সার হলো। তারপর, হঠাৎ একদিন আমার অবস্থার কথা শুনে কোন সদয়-হৃদয় প্রৌঢ়ের মনটা করুণায় গলে গেল। তিনি তাঁর পুত্র-কন্যার শত অনুরোধ উপেক্ষা করে আমায় বিনাপণে বিবাহ কর্‌তে সম্মত হলেন।

কিন্তু ফুলশয্যার রাতটা পার হতে-না-হতেই আমার মাথার সিঁদূর, হাতের নোয়া সব ঘুচে গেল ! বাড়ীতে একটা কান্নার রোল উঠল। কি যে হলো, ঠিক্ বুঝতে না পেয়ে আমিও সেই কান্নায় যোগ দিলুম। পরে দেখ্‌লুম,—তাঁর দেহ-টিকে টানাটানি করে আত্মীয়-স্বজনেরা বাইরে

নিয়ে চল্লেন। শুন্লুম, দারুণ কলেরাই আমার কপাল ভেঙে দিয়ে গেল!

তারপর শ্রাদ্ধের কাজকর্ম চুকে গেলে কাকাবাবু একদিন গিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে আমায় ঘরে নিয়ে এলেন।

বছর কাট্‌ল। শ্বশুরবাড়ী থেকে আমায় নিয়ে যাবার জন্ত কোন সাড়া-শব্দ এল না দেখে, তিনি আমার বড় সতীনপোকে পত্র লিখ্‌লেন; কিন্তু উত্তর পেলেন না। বারবার লেখার পর একটার জবাব এল। কী সে কটু উক্তি! কী সে তীব্র ভৎর্সনা! স্তম্ভিত হয়ে কাকাবাবু খানিক চুপ করে বসে রইলেন। কাকীমা এসে জিজ্ঞাসা করলেন—'কার চিঠি গা?'

তিনি বল্লেন—'ইন্দুর সতীনপোর।'

কাকীমা সাগ্রহে জান্‌তে চাইলেন -'নিয়ে যাবে কবে? কিছু লিখেছে কি?'

'না; ও রাক্ষসী-মেয়েকে আর তারা ঘরে স্থান দেবে না।'

কথাটা বল্‌তেই তাঁর মুখখানা ছায়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ে দেখলুম,—কাকীমার মুখেও এই প্রথম আমার জন্ত একটা সমবেদনার ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ল। তিনি ধরাগলায় বল্লেন 'কি হবে তবে?'

কাকাবাবু মাথাটা একবার নাড়লেন; কথায় কিছুই প্রকাশ করতে পারলেন না। অনেকক্ষণ পরে কিন্তু দাঁড়িয়ে উঠে তিনি উৎসাহভরে বল্লেন—'আমি আবার ওর বিয়ে দেব!'

অবাক্-বিস্ময়ে কাকীমা তাঁর মুখের দিকে খানিক চেয়ে রইলেন; পরে বল্‌লেন—'হ্যাঁ গা, তা কি হয়? বিধবার আবার বিয়ে!'

'হয়! ইন্দুর মত বিধবার বিবাহে কোন দোষ নেই! বিদ্যাসাগর-মশায় ভালরকমেই তা প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন।

'তা ত করেছেন শুনি; কিন্তু তাঁর ব্যবস্থা তেমন চলল কই?'

'চল্‌ছে না, সে কেবল দেশের লোকের সাহসের অভাব বলে।'

'কিন্তু বিয়ে না করে আমাদের দেশের মেয়েমানুষ বিধবাদের দিনও ত কেটে যাচ্ছে?'

'কেটে যাচ্ছে, মানি। কিন্তু কেন? অভিভাবকেরা তাদের জোর করে দাবিয়ে রেখেছে বলেই না? বুকে হাত দিয়ে বল দেখি,—তারা কি মানুষ নয়? সংসার সুখের আকাঙ্ক্ষা তাদের প্রাণেও কি ঠিক্ তোমাদের মতই জাগে না? মা হয়ে ঘর-কন্না করবার প্রলোভনটা কি তাদের নিকট বাস্তবিকই এতটা তুচ্ছ! না! তুমি বল্‌লেও আমি তা স্বীকার করতে পারব না! চোখের সাম্‌নে অনেক বালবিধবাকে দেখেছি! তাদের ব্যথায় আমার প্রাণ মুচড়ে ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছে; কিন্তু উপায় ছিল না বলেই সহ্য করে গিয়েছি! এখন নিজে কর্তা হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ভয় পাব, এতই কি হীন আমি? তবে যদি বল, এই জ্ঞান এতদিন কোথায় ছিল? ইন্দুর দুঃখে সত্যই আমার চেতনা পঙ্গু হয়েছিল! তার সতীনপোর পত্রখানাই আমার মোহ দূর করে দিয়েছে! পূর্ব্বের আমিত্বকে আবার আমি আজ ফিরে পেয়েছি!'

'তা হলে তুমি ইন্দুর বিয়ে দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প?'

'নিশ্চয়! এতে আমার অদৃষ্টে যাই হোক্!'

কাকীমা আর কোন কথা বললেন না; বোধ হয় আমার সম্বন্ধে তাঁর মনের ভাব তখন একেবারেই বদলে গিয়েছিল।

তারপর দাদার,—কাকাবাবুর বড় ছেলের, কলেজের একটি বন্ধু আমার অবস্থা শুনে আমায় বিয়ে করতে রাজী হলেন। কাকাবাবুও পরম আনন্দের সহিত তাঁর হাতে আমায় সমর্পণ করলেন। কিন্তু, এই বিবাহের জন্ত আমার

স্বামীকে জন্মের মত তাঁর বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-স্বজন সব পরিত্যাগ করতে হয়েছে।

বছর পাঁচেক পরে আমাদের অশান্তিপূর্ণ অন্তরে সান্ত্বনা দিতে সান্ত্বনা এসে উপস্থিত হলো। সেই থেকে জীবনের দিনগুলো এক রকমে কেটে যাচ্ছে।

শুনলে ত আমার জীবনের কথা? এখন আমিই উল্‌টে বল্‌তে পারি, আমার মেয়ের কি এতবড় ভাগ্য হবে যে, তোমার মত শাশুড়ীর পায়ে সে স্থান পাবে। অশোক ও তোমার মামাতভাইটিকে আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানাবে। মামাবাবুকে প্রণাম দেবে এবং তুমি নমস্কার জান্‌বে। ইতি,

তোমার স্নেহের
ইন্দুরেখা"

"পুঃ—আমার স্বামী এই সঙ্গে তোমায় একখানা চিঠি দিয়েছেন। পড়ে দেখ্‌লে জান্‌তে পারবে,—তিনি কত বড় অভাগা! কী যন্ত্রণাই এতদিন নীরবে সহ্য কর্‌ছেন! আপনার জন, সমব্যথী ভেবে তিনি তোমায় এই পত্র লিখতে সাহস করেছেন; তজ্জন্য কিছু মনে করো না।

ইন্দু"

হাজারীবাগ
২রা পৌষ, ১৩৩০

মাননীয়াষু,

স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গিনী, তার সখী আপনি, সুতরাং পরম-আত্মীয়ের মধ্যেই গণ্য; এ হেন প্রিয়জনের সহিত শুধু দিনকয়েকের ফাঁকা পরিচয়ে সব শেষ হয়ে যেতে পারে না। প্রধানতঃ, দুঃখের অমানিশায় যাদের ভাগ্য-আকাশ অন্ধকার করে দিয়েছে, দুর্ভাগ্যের সঙ্গী হিসাবে যে তারা এক আত্মীয়তার বন্ধনে বন্দী হইবার উপযুক্ত, এটা বিশেষ করে জানিয়ে দিতেই আজ এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির কলম ধরা। এখন শুনুন তবে, আমার অতীত জীবনের ব্যথার কাহিনী।

বহুদিন হতে বাঙ্‌লাদেশে একটা ভীষণ অত্যাচারের স্রোত ছুটে চলেছে। তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার লোক সমাজে অতি অল্পই খুঁজে পাওয়া যায়। বাকী যাঁরা আছেন, তাঁদের জীবন্মৃত বল্‌তে পার, জড় বললেও অত্যুক্তি হয় না। ভগ্নি. আমি একদিন সেই অত্যাচারের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলুম। এক বাল-বিধবার জীবনটাকে ব্যর্থ হতে দিই নি বলে, আজ আমি আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের সহিত সকল সম্বন্ধ-চ্যুত! দেশ থেকে চিরদিনের মত নির্ব্বাসিত! কিন্তু বোন্‌, আমার বউদিদির পরিত্যাগ আমায় যে ব্যথা দিয়েছে, তার তুলনায় সে সব অতি তুচ্ছ! কী মর্ম্মান্তিক বেদনা! যার জন্য এখনও মধ্যে-মধ্যে আমায় অস্থির উন্মাদ করে তোলে!

আজও ভাল করে বুঝ্‌তে পারি নি, তিনি কেমন করে তাঁর অত স্নেহ, অত ভালবাসা বিস্মৃত হলেন? এক-একবার মনে হয়,—তাঁর সে সকল দান কখনই আন্তরিক ছিল না; উচ্ছ্বাসের আবেগ মাত্র! অভিমান প্রথমে দুঃখ, পরে রাগ, শেষে অশ্রদ্ধা এনে দেয়, এটা খুব সত্য কথা!—আমাকে দিয়েই এ গুলোর উত্তম পরীক্ষা হয়ে গেছে! তবু, তবু কেন জানি না, বউদিদির কথা মনে হলে, এখনও চোখের জল ধরে রাখ্‌তে পারি না! তাঁর কথা বল্‌তে গিয়ে এখনও অলক্ষ্যে হৃদয়-তন্ত্রী কেন আনন্দের ঝঙ্কার তোলে! ছি! এ কী দুর্ব্বলতা! কী এ মোহ! কিছুতেই তাঁকে ভুল্‌তে দেয় না! এখনও কেন এই অলীক সান্ত্বনা,—তিনি ত শুধু আমার বউদিদিই ছিলেন না! আমার স্নেহ-ভালবাসার একমাত্র আশ্রয়-স্থল! আমার গুরু, গর্ব্ব, অভিমান! তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে বসে আজ তাঁর কত কথাই মনে পড়ছে!

আমাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল না; দাদা যা উপায় করতেন, তাতে কোনরকমে সংসার নির্ব্বাহ হতো। আমি যখন গ্রামের স্কুল থেকে মাইনর পাশ করলুম, তখন আমাদের এমন অবস্থা নয় যে, সহরে গিয়ে সেখানকার বাসা খরচ চালিয়ে আরও পড়াশুনো করি। বউদিদি . যা দু-একখানা গহনা ছিল, তিনি তা গা থেকে খুলে দিয়ে মাকে বললেন—'টাকার অভাবে ঠাকুরপোর লেখাপড়া বন্ধ হবে, এ আমি চোখে দেখে কেমন করে স্থির হয়ে থাকি মা? মনে কিছু না নিয়ে এইগুলো দিয়ে ঠাকুরপোর পড়া-শোনার খরচ চালান।'

মা অনেক আপত্তি করলেন; তিনি কিন্তু সেগুলো হেসে উড়িয়ে দিতে লাগলেন; বললেন—'মা, আপনি কেন অমত করছেন? মনে করুন না, আমি আমার ছোট ভাইকে সামান্য কিছু দিচ্ছি। আমার ভাই নেই; যদি একটী পেয়েছি, তবে তার প্রতি বড় বোনের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করতে দিন।'

তাঁর গহনা নিতে একান্ত অনিচ্ছা থাকলেও সে কথার ওপর কোন কথা বলতে পারলুম না। আমায় পাঠাবার দিন বউদিদির সে চোখের জল, মাথায় হাত রেখে নীরব আশীর্ব্বাদ কিছুতেই যে ভুলতে পারছি না!

তারপর দাদা জমি-জমা বন্ধক দিয়ে সামান্য যা কিছু পেলেন, তাই দিয়ে একটা ছোট-খাট মুদাখানার দোকান করলেন। দিন-দিন তাঁর উন্নতি হতে লাগল। তিন-চার বৎসরের ভেতরেই আমাদের খড়োঘর ভেঙে কোঠা বাড়ী উঠল। বউদিদির গায়েও আবার গহনা হতে লাগল; কিন্তু সে সবে তাঁর মনের ভাব কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হতে দেখি নি।

এন্ট্রান্স পাশ করে চাকরীর চেষ্টা করব বলেছিলুম—তাতে তাঁর কী রাগ! আমার সঙ্গে সে কী ঝগড়া!

তারপর তিনি আমায় কোলকাতায় পড়তে পাঠালেন। তাঁর স্নেহ-পূর্ণ চিঠিই সেই আত্মীয়-স্বজনহীন বিদেশে আমার পাঠে উৎসাহ দিত! আমার প্রাণে নবশক্তি জাগিয়ে তুলত!

এই সময়ে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে গেল! সেবার গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ী গিয়েছি, মা আট-দশ দিনের জ্বরে হঠাৎ মারা গেলেন। মৃত্যু সময় তিনি বউদিদির হাতে আমায় সমর্পণ করে বললেন—'তুমি মা, আমার ঘরের লক্ষ্মী; তোমার হাতে মিহিরকে দিয়ে গেলুম! তোমাকে এটা বলা আমার বেশীর ভাগ; কারণ, তুমি তাকে কত ভালবাস, তা জানি; হয় ত সারাজীবনে আমিও অতটা বাসতে পারি নি! আমার বিশ্বাস,—তোমার মত তার এতবড় হিতাকাঙ্ক্ষী আর কেউ নেই! আমি চললুম। তোমাদের ভালয়-ভালয় রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে যে যেতে পারছি, এতে আমার আনন্দ ভিন্ন দুঃখ নেই!'

এই বলে ভগবানের নাম জপ করতে করতে তিনি চিরদিনের মত চক্ষু বুজলেন। আমি চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলুম। বউদিদি আমায় প্রবোধ দিয়ে বারবার বলতে লাগলেন—'আমি দিদি রয়েছি, তোমার ভয় কি ভাই?'

সে কথা, সে মধুর সান্ত্বনা এখনও যে আমায় স্থির থাকতে দেয় না! মনে হয়, ছুটে গিয়ে একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করি—'সে কথা তুমি কেমন করে ভুলে গেলে বউদিদি?'

তারপর অশৌচান্তে আমার কী ভয়ানক অসুখ! আর, বউদিদির সে কী প্রাণঢালা সেবা! মরণোন্মুখ রোগীকে জীবন-পথে ফিরিয়ে আনবার জন্য মৃত্যুর সহিত কী সে সংগ্রাম! তাঁর হৃদয়ের পরিচয় কি দেব বোন্ সে স্নেহ ভালবাসায়, সেবা-যত্নের যে পরিমাণ হয় না! জানি না, জগতের কোন সহোদরা এর চেয়ে তার সহোদরকে বেশী ভালবাসতে পারে কি না! এক কথায়

আমার বউদিদির তুলনা হয় ত সারা সংসার খুঁজলেও মিলত না!

যখন বি-এ পড়ি, তখন দাদা হঠাৎ একদিন কলেরায় মারা গেলেন! আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত হলো! মেয়েছেলের সেই সব চেয়ে বড় সর্ব্বনাশের মধ্যেও বুক বেঁধে বউদিদির আমার প্রতি কী অমূল্য উপদেশ! দাদার কোন সন্তানাদি ছিল না; আমাকে দিয়ে স্বামীর পারলৌকিক কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করাবার জন্য সতীর সে কী অক্লান্ত পরিশ্রম! চতুর্দ্দিকে কী

তারপর কারবার বেচে দিয়ে আমি কোলকাতার বাড়ী ভাড়া করে বউদিদিকে সেখানে নিয়ে গেলুম; কারণ, সেই শোকের সময় তাঁকে একা ফেলে রাখা ভাল বিবেচনা করলুম না। দাদা ক বছরে যথেষ্ট পয়সা জমিয়ে রেখে গেছলেন, কাজেই সেখানে আমাদের কোন অভাবই হলো না।

এম-এ পরীক্ষা দেব, সেই সময় একদিন হর্ষনাথের বোনের কথা শুনে প্রাণে বড় কষ্ট হলো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম,—আমি নিশ্চয়ই তাকে বিবাহ করব!—তাতে অন্ততঃ একটা বাল-বিধবারও দুঃখ মোচন করা হবে! সে প্রস্তাব যখন আত্মীয়-স্বজনের কাছে তুললুম, তাঁরা ত পাগল বলে আমায় বেশ মিষ্টি মিষ্টি গোটাকতক কথা শুনিয়ে দিলেন; যেন কি একটা মহা অন্যায় কাজই না আমি করতে চলেছি! তারপর আমার দৃঢ়সঙ্কল্প দেখে, তাঁরা বললেন—'সমাজের বুকে বসে এ কাজ যদি তুমি কর বাপু, তা হলে আমরা তোমাদের একঘরে করব।'

তাঁদের সে চোখ রাঙানি আমি হেসে উড়িয়ে দিয়ে কোলকাতায় চলে এলুম। মনে করলুম,—দূর হোক, দেশে না হয় নাই বিবাহ হবে।

বৌদিদির কাছে পরম উৎসাহের সহিত সে প্রসঙ্গ তুললুম। আমার কথা শুনে তিনি অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে মুখের আকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল! সত্য বলছি বোন্,—তাঁর সে সময়ের ভাব দেখে আমার কেমন ভ্যাবাচ্যাকা লেগে গেল;—কারণ, তাঁর সেরূপ মূর্ত্তি জীবনে আর কোনদিন দেখি নি! তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—'এ কাজ তুমি কখনই করতে পারবে না ঠাকুরপো! আমি তোমায় ভাল দেখে বিয়ে দেব।'

আমি হেসে বললুম—'তুমি কি আমায় এতই অপদার্থ মনে কর বউদিদি, যে, রূপের মোহে ভুলে আমি এ কাজ করতে যাচ্ছি। আমার বন্ধুর বোনকে এখনও পর্য্যন্ত আমি চোখেই দেখি নি।'

'তা না দেখতে পার; কিন্তু হিঁদুর ঘরে বিধবা-বিয়ে আমি কোনমতেই সহ্য করতে পারব না।'

'কেন?'

'এ কেনর উত্তর আমি দিতে পারব না।'

'শুধু সংস্কার এবং জেদের জন্য একটা বালিকার জীবন নষ্ট করে দেবে? এটা ত আমি তোমার কাছে কোনদিন প্রত্যাশা করি নি।'

'তা হলে আমার কথা তুমি রাখবে না?'

'আমি যে বাক্যবদ্ধ বউদি।'

'যাও, আজই গিয়ে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে এস। মত দেবার পূর্ব্বে একবার আমার উচিত ছিল। তুমি তিনটে পাশ করে এমনই মাতব্বর হয়ে উঠেছ যে, আমার জিজ্ঞাসার আর অপেক্ষা রাখ না। এখন আমি তোমার এতই পর!'

বউদিদির মুখে আজ এ কী শুনছি! তাঁর ওপর অগাধ বিশ্বাসের জন্যই না তাঁর মত গ্রহণ করা আবশ্যক বিবেচনা করি নি! সেটা কেন তিনি একবারও বুঝে দেখলেন না! দুঃখে অভিমানে চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। আমি

একরকম জোর করেই বলে উঠলুম—'যা অন্যায় মনে করি না, তা আমি করবই।—কিছুতেই কথার প্রত্যাহার করতে পারব না।'

বউদিদি আমার দিকে একবার স্থির-দৃষ্টে চাইলেন, তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বললেন—'বেশ! তা হলে এখন থেকে তোমার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক উঠে গেল।'

বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল! সামনে বাজ পড়লেও হয় ত অতটা বিস্মিত হতুম না! তাঁর মুখে সে কথা শুনব, এ যে কল্পনারও কোন-দিন আমার মনে জাগে নি!

অনেকক্ষণ পরে আপনাকে সামলে নিয়ে ধীরে-ধীরে বললুম—'রাগের মাথায় কী বলে বসলে বউদি! সেটা কি সত্য করে থাকতে পারবে? একটু পরেই কথাটার জন্য যে তোমায় দুঃখ করতে হবে।'

তিনি তাচ্ছিল্যের সহিত বললেন—'বয়ে গেছে আমার! যে ছেলে গুরুজনকে অমান্য করে, তার জন্য কষ্ট করব, আমি এখনও এতদূর পাগল হই নি। স্নেহের পাত্র ততদিনই শুধু স্নেহ পাবে, যতদিন সে তার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে চলবে। আজ থেকে জানব,—ভাই বলে মনে করবার, মুখে ডাকবার আমার আর কেউ রইল না।'

আর কথা না বলে আমি আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলে এলুম। তারপর বউদিদির যা কিছু পরিত্যাগ করে আমার মায়ের একখানা পুরানো ছেঁড়া কাপড় পরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লুম। যাবার সময় কেবল তাঁকে জানিয়ে দিয়ে গেলুম,—তাঁর জিনিষপত্র যেমন ছিল, তেমনই রেখে একবস্ত্রে আমি চলে যাচ্ছি। তিনি শুধু 'আচ্ছা' বলে মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। যাঁকে প্রণাম না করে কখনও বাড়ীর বাহির হই নি, সেদিন আর তাঁকে সেটা দিতে প্রবৃত্তি হলো না।

তারপর একেবারে হর্ষনাথের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে সব কথা খুলে বললুম। সে তার বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে। তাঁর একান্ত অনুরোধে তাঁদের বাড়ী থেকে আমি এম-এ পরীক্ষা দিলুম। পাশ করবার পর তিনি এখানকার এক বড়লোক বন্ধুকে ধরে তাঁর অভ্রের খনিতে আমায় ঢুকিয়ে দিলেন। আমিও ইন্দুকে বিবাহ করে হাজারীবাগে এসে নূতন ঘর-সংসার পেতে বসলুম। তারপর ক্রমে-ক্রমে কাজে আমার উন্নতি হলো; আমি মনিবের কারবারের অংশীদার হলুম। এই আমার জ্বালাময় জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস।

অশোকের সঙ্গে সান্ত্বনার বিবাহ দিতে আমাদের সম্পূর্ণ মত আছে জানবেন। আমার স্নেহ-প্রীতি গ্রহণ করবেন; যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ দেবেন।

শুভার্থী

মিহিরকুমার"

নূতনগঞ্জ

৫ই ফাল্গুন, ১৩৩০

তোদের সঙ্গে আমার খুব শীগ্‌গিরই হাজারী-বাগ যেতে হবে লিখেছিস; কিন্তু আমার দেহ বড়ই অসুস্থ; নইলে তোর কথা রাখতে, আর অশোকের বিয়েতে যেতে অসম্মত হচ্ছি; এতেই বুঝে দেখ, আমার শরীর কতটা খারাপ। যদিও সেখানে গেলে স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেকটা উপকার হতো, কিন্তু এ অবস্থায় বাড়ী থেকে বেরুতে কিছু-তেই সাহস করছি না। আজ প্রায় দুমাসের ওপর হলো কি যে হয়েছে, কিছুই বুঝতে পারছি না;—খাচ্ছি-দাচ্ছি, অথচ, শরীর দিন-দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার-কবিরাজ এ সম্বন্ধে

কিছুই ঠিক করে বলতে পারছেন না। তাঁরা অনেকটা ভরও পেয়েছেন। জীবন-রঙ্গমঞ্চে হয় ত মরণের নহবৎ বেজে উঠেছে! কে জানে!

শরীর যদি একটুও ভাল বোধ করি, তা হলে বিয়ের দু-একদিন আগে নিশ্চয়ই হাজারীবাগে গিয়ে হাজির হব।

আমার স্নেহ-ভালবাসা এবং আশীর্ব্বাদ জানবি; অশোক ও তোর মামাত-ভাইটীকে দিবি। মামাবাবুকে প্রণাম জানাবি। ইতি,

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী—

দাদা"

মাধবপুর

৮ই ফাল্গুন, ১৩৩০

"শ্রীচরণকমলেষু,

দাদা, তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না জেনে অত্যন্ত দুঃখিত হলুম। কিন্তু তা অপেক্ষা মর্ম্মান্তিক কষ্ট হলো,—তোমার অসুখের কথা শুনে! তোমার কাছে এখনই যে ছুটে যেতে বড় ইচ্ছা করছে! মন কিছুতেই বোঝ মানছে না। তোমায় দেখবার যে কেউ নেই দাদা! আর আমাদেরও সত্যিকার আপন বলতে যে তুমিই কেবল আছ! তোমার যে বড় ভরসা করি!

তোমায় এ অবস্থায় কিছুতেই ফেলে যেতে পারব না দাদা! তুমি একটু ভাল হও; বিয়ে না হয় আসছে বোশেখেই হবে। অশোক তোমার জন্ম বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে; আমায় কেবলই বলছে—'চল মা, মামাবাবুকে দেখতে যাই।'

সে ও আমি দু-চারদিনের মধ্যেই ও বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছি। আমার ও অশোকের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ কোরো।

তোমার স্নেহের ছোটবোন—

শুচিতা"

বড়দীঘি

১১ই চৈত্র, ১৩৩০

"পরম কল্যাণীয়েষু,

আজ আবার তোমায় চিঠি লিখতে বসেছি; কতদিন পরে ভাই, কতদিন পরে!

ও সম্বোধনে আর তোমায় ডাকবার অধিকার আছে কি না জানি না; কারণ, আমি নিজের হাতেই যে সে স্নেহ-সূত্র ছিন্ন করে দিয়েছি। দেবীস্বরূপা, আমার চিরপূজ্যা শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অটল বিশ্বাসে যে আঘাত দিয়েছি, তাতে কি স্বর্গ হতে আর তিনি আমায় আশীর্ব্বাদ করতে পারবেন?

ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়; কারও বা তা দু-দিন আগে ভাঙে, কারও বা দু-দিন পরে; কারও বা সারা জীবনে ভাঙে না। ভগবান যে দয়া করে আমার ভ্রম দূর করে দিয়েছেন, তজ্জন্য তাঁর চরণে অসংখ্য প্রণাম জানাচ্ছি!

সেদিন তুমি যখন আমার নিকট হতে চলে যাও, তখন আমার অন্তরের ভেতর যে কি হচ্ছিল, রাত্রি-দিনের দেবতার অতন্দ্র চক্ষুই কেবল তার সাক্ষী। তিনদিন মুখে জল পর্য্যন্ত দিতে পারি নি! প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হয়েছিল, তুমি ফিরে এসে ডেকে বলবে—'থাকতে পারলুম না বউদি; তোমার কথা রাখতেই ফিরে এলুম!'

হা রে, অবোধ হৃদয়! হা রে, মানুষের অন্ধ বিশ্বাস!

একমাসেও যখন এলে না, তখন মনকে এই বলে প্রবোধ দিলুম,—কে কার? সে যদি তার দিদিকে ভুলতে পারে, আমিও কেন আমার ভাইকে পারি না। কিন্তু, মনে করলেই কি ভোলা যায়? ভোলবার চেষ্টা করতে গেলেই অন্তরের অন্তরালে যে স্নেহের অঙ্কুর আছে, সেটা যে বেদনায় হাহাকার করে ওঠে! কেন এমন হয়? কতদিন তার মীমাংসা করতে গেছি, কিন্তু ব্যর্থ হয়েই ফিরে এসেছি!

তারপর দিনগুলো কি করে যে জীবনের ওপর

দিয়ে কেটে গেছে, অন্তরীক্ষে বসে অন্তর্যামী দেবতাই শুধু সেটা লক্ষ্য করেছেন! কতবার মনে হয়েছিল,—তোমায় শ্বশুরবাড়ী থেকে তোমায় ডাকতে পাঠাই; বিদেশে গিয়ে থাক ত, ফেরবার জন্ম চিঠি দিই; কিন্তু কর্তব্যজ্ঞান পরক্ষণেই তাতে বাধা দিয়েছে। এমনই করে দিনগুলো কর্তব্যে আর স্নেহের দ্বন্দ্বে অতিবাহিত হয়েছে! যাক্, সে সব কথা তুলে আর লাভ কি?

তুমি চলে যাবার এক বৎসর পরে মা-মরা বোনঝি সাত বছরের দোলনচাঁপাকে কাছে এনে মানুষ করতে লাগলুম। স্নেহের পাত্রের নিকট হতে আঘাত পেলে কেউ একেবারে কঠোর হয়ে যায়; কেউ বা আর একটা আধারে হৃদয়ের সমগ্র ভালবাসা ঢেলে দিয়ে অতীতের স্মৃতির ওপর প্রতিশোধ নেয়।

দোলনের বয়স দশ পার হতে-না-হতেই একটী সুশ্রী, সচ্চরিত্র, অবস্থাপন্ন পাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দিলুম। ছেলেটী কলেজে পড়ছিল। পড়া-শোনায় কী অদম্য উৎসাহই না তার ছিল! কিন্তু হঠাৎ চির-নিষ্ঠুর কাল তাকে অসময়ে হরণ করে নিলে! বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই হাতের নোয়া, সিঁথের সিঁদুর ঘুচিয়ে দিয়ে দোলনকে আমার বুকে চেপে ধরে কাঁদতে লাগলুম! ভগবান্! এত কষ্ট যদি কপালে লিখেছিলে, তবে তা সহ্য করবার ক্ষমতা দিলে না কেন প্রভু!

ক্রমে-ক্রমে সে চোখের সামনে বড় হতে লাগল। তার ভবিষ্যৎ ভেবে আমার বুকের রক্তও দিন-দিন হিম হয়ে যেতে লাগ্‌ল! কি করে যে সংসারের অদম্য প্রলোভন থেকে তাকে রক্ষা করব, এই চিন্তাই আমার ধ্যান-জ্ঞান হয়ে উঠ্‌ল! কিন্তু, পার্‌লুম না! কিছুতেই তাকে ধরে রাখ্‌তে পার্‌লুম না! প্রকৃতি কী ভয়ানক প্রতিশোধই না নিলে! উঃ!

আমাদের গাঁয়ের সতীশ মিত্রের ছেলে সুবোধকে বোধ হয় তোমার মনে পড়ে? তুমি যখন যাও, তখন সে বার-তের বছরের হবে। সে ছিল দোলনের আইবড় বেলার খেলার সাথী। এত সাবধানতা সত্ত্বেও প্রণয়-দেবতা কখন যে দুজনের প্রাণে ভালবাসার বীজ বপন করেছিলেন, কিছুই জান্‌তে পারি নি। সুবোধও একদিন তোমার মত আমার কাছে এসে বল্‌লে—'মাসীমা, আমি দোলনকে বিবাহ করতে চাই; তার জীবনটা আশা করি আপনি মা হয়ে ব্যর্থ হতে দেবেন না?''

আবার সেই আঘাত!

আমি তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—'দোলনের জন্ম তুমি কি তোমার আত্মীয়-স্বজন, সমাজ সব ত্যাগ করবে?'

সে উত্তর দিলে—'আমি সত্যের জন্ম সমস্তই পরিত্যাগ করতে পারি।'

'তোমার মায়ের মত আছে?'

'ছেলের মতেই তাঁর মত; নইলে তিনি কেমন মা? এখন আপনার অনুমতি পেলে মাকে নিয়ে কোলকাতায় যাব। সেখানে আমাদের বিবাহ হবে।'

'আচ্ছা, আমি যদি অপর একজন বালিকা বিধবাকে তোমায় বিবাহ করতে বলি, তাতে রাজী আছ?'

'দোলনকে যদি ভাল না বাস্‌তুম, তা হলে যার বিয়ে হওয়া সত্যই প্রয়োজন, তেমন বিধবাকে আমি অবশ্যই বিবাহ করতুম। বিধবা-বিবাহ করতে চাইছি বলে আমায় আপনি স্বেচ্ছাচারী মনে করবেন না।'

'যদি এ বিয়ে দিতে আমি সম্মত না হই?'

'তা হলে আমি জীবনে আর বিবাহই করব না। ভাল জীবনে একজনকেই বাসা যায়, দু জনকে নয়। ভালবাসা কি চোখের নেশা? যদি সত্যই আপনি অসম্মত হন, দোলনের দিকে আর কখনও ফিরেও চাইব না! এখন আপনার

জবাবের ওপর আমার ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নির্ভর করছে।'

কী দৃঢ়, স্পষ্ট উত্তর!

'তবে শোন, বিধবা-বিবাহে আমার মত নেই; হয় ত জীবনে কখনও তার পরিবর্ত্তন হবে না।'

'আমি তা হলে আপনাকে ভুল বুঝেছিলুম।'

'মানুষ মাত্রেই মানুষের সম্বন্ধে তার ইচ্ছামত ধারণা করে বসে।'

তারপর আর সে আমার কাছে না দাঁড়িয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল। পরে শীগ্‌গিরই বাড়ী-ঘর বেচে একদিন তারা কোলকাতার দিকে যাত্রা করলে। সন্ধান নিয়ে জেনেছি,—আজ পর্য্যন্তও সে অবিবাহিত।

এদিকে দোলন সেই থেকে দিন-দিন শুকিয়ে যেতে লাগ্‌ল। তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে, সে হেসে উড়িয়ে দিত। আমি তাকে কত বুঝিয়েছি-লুম, কিন্তু ফল কিছুই হয় নি।

একদিন সকালে উঠে দেখি,—তার প্রাণহীন দেহ দালানের মেঝের পড়ে রয়েছে! কখন রাত্রে উঠে মা আমার আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করেছে, কিছুই জান্‌তে পারি নি! আবার এক শেলাঘাত! হায়! তাকেও বেঁধে রাখ্‌তে পারলুম না!

তারপর কতদিন কেটে গেল। মনে শান্তি পাবার আশায় কত স্থানেই না ঘুরলুম! কিন্তু কোথায় শান্তি!

সেদিন বৃন্দাবনে। শ্রাবণের কালমেঘে আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল। জলের বাতাসে উত্তপ্ত মস্তিষ্কটাকে শীতল করবার জন্য সন্ধ্যার পর নির্জ্জন যমুনাতীরে একাকী চুপ করে বসে দোলনের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলুম। আমার দেহবোধই ছিল না। এমন সময় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। আমায় দেখে দোলনের অতৃপ্ত আত্মা হাহাকার করে কেঁদে উঠ্‌ল! সে আমায় ভৎসনার স্বরে বল্‌তে লাগ্‌ল—'ও গো, তুমি আমার হৃদয় বুঝ্‌তে চেষ্টা কর নি, কেবল বাইরের লোকাচার আর সংস্কারটাকেই আঁকড়ে ধরে পড়েছিলে! কাল-ধর্ম্মে কত পরিবর্ত্তন হচ্ছে দেখ্‌ছ না? পরে আরও হবে! সেকালে বাল-বিধবার সংখ্যা ছিল অল্প; কারণ, দেশে এত অকাল মৃত্যু ঘট্‌ত না। তাই লোকে তখন বিধবা-বিবাহের প্রয়োজন মনে করে নি। কিন্তু সে পুরানো নিয়ম একালে চল্‌বে কেন? সমাজকে ঠিক্ একালের মত করেই গড়ে তুল্‌তে হবে। আর জেনো,—বিধবা হলেই তার হৃদয়ের বৃত্তিগুলো এক নিশ্বাসে শুকিয়ে মরে যায় না! বিধবাদেরও প্রাণের ভেতর একটা প্রাণ আছে;—সে স্বতই একটা আধারকে অবলম্বন করে থাকতে চায়! বাধা দাও, আমার ন্যায় কিংবা এর চেয়েও শোচনীয় অবস্থা চোখে দেখ্‌তে হবে! তবে যারা বয়সে বিধবা হয়, তারা স্বামীর স্মৃতি আর ছেলেপুলে নিয়ে জীবনটা কোন রকমে কাটিয়ে দেয়। তবে বাল-বিধবা তপস্বিনী যে একেবারেই নেই, এমন কথা বল্‌লে নিতান্তই মিথ্যা বলা হবে; কারণ, পৃথিবীতে অসম্ভব কিছুই নয়। তবে তাদের সংখ্যা এত অল্প যে, বোধ হয় সহজেই গুণে ফেলা যায়। বাদবাকী সবই গুরুজনের উপদেশ, লোক-নিন্দার ভয়ে অতিকষ্টে চিত্তবৃত্তিকে রুদ্ধ করে রাখে মাত্র। আত্মাভিমানী মা আমার! আমাদের ন্যায় বিধবাদের দুঃখটা একবার ভাল করে বুঝে দেখো! জীর্ণ পুথি ফেলে অন্তর্নিহিত সত্যটাকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা কোরো।'

এই বলে তার আত্মা আবার 'হা হা' করে বাতাসে মিলিয়ে গেল!

বৃন্দাবনে আর থাক্‌তে পারলুম না; তারপর-দিনেই দেশের দিকে পালিয়ে এলুম।

তারপর থেকে অনুশোচনায় আমার প্রাণের ভেতরটা পুড়িয়ে দিচ্ছে। কেবলই মনে হচ্ছে,—বৃথায় একটা জীবন নষ্ট করেছি! একজনকে অযথা সন্ন্যাসী সাজিয়েছি! ছি, ছি, কি করেছি!

তোমরা ফিরে এস ঠাকুরপো! আমায়

বোধ অন্যায়টাকে চিরকাল উজ্জ্বল রাখ্তে আর অভিমান করে বসে থেকো না। তোমার পত্রের আশায় রইলুম। ইতি,

তোমার
অভাগী বউদিদি"

হাজারীবাগ
১৫ই চৈত্র, ১৩৩০

"পূজনীয়াষু,

তোমার পত্র পেলুম। বহুকাল পরে আবার যে তুমি আমায় মনে করেছ এবং নিজের ভুল বুঝ্তে পেরেছ, তাতে আমি সত্যই বড় আনন্দিত হয়েছি। দুঃখ বউদিদি, তুমি একাই পাও নি, আমিও পেয়েছি; তবে তোমার তুলনায় যে অল্প, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ, স্নেহ যে পায়, যে কোন আঘাতেই তার দুঃখ-অভিমান হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু, স্নেহ যে দেয়, স্নেহাস্পদের সেই ব্যথা ফিরে গিয়ে তার বুকে আরও বেশী বাজে।

দোলনের কথা শুনে প্রাণে যে কি হচ্ছে, তা এ ক্ষুদ্র পত্রে তোমায় কি জানাব! কি করবে বউদি,—অদৃষ্টে যা ছিল, তা হয়ে গেল! অদৃষ্ট ছাড়া পথ ত নেই!

এরা প্রায়ই দুঃখ করে,—দিদির রাগটা কি এতই বড় হলো যে, এখনও পর্য্যন্ত আমাদের ডেকে পাঠালেন না? তিনি স্থির হয়ে আছেন কেমন করে? সত্য, আমি আজও এ কথাটার মীমাংসা করতে পারলুম না,—এত কঠোর তুমি কেমন করে হলে!

তুমি আমাদের যেতে লিখেছ; কিন্তু, ওখানে যাওয়া কি উচিত? এ অভিমানের কথা নয়, আমাদের বাড়ীতে স্থান দিলে গাঁয়ের লোকের নিকট তোমায় মাথা হেঁট, এমন কি তোমায় এক ঘরে হয়ে থাকতে হবে।

বোশেখ মাসে আমার মেয়ে সান্ত্বনার বিয়ে। পাত্রের মা মাসের গোড়াতেই এখানে আস্ছেন। তোমায় এ আনন্দে যোগ দিতে বল্তে সাহস করলুম না;—কারণ, এখানে এলেও দেশের লোকের সহিত তোমার বিবাদ অনিবার্য্য।

আজ আর এদের চিঠি লেখায় নিবৃত্ত করে রাখ্তে পারি নি;—তোমার সাড়া পেয়েই সে ডাক দিয়ে তবে ছেড়েছে। তার পত্রে পাত্রের মায়ের মন্দ-ভাগ্যের কথা তোমায় জানিয়েছে;—পড়লে জানতে পারবে—তিনি কত বড় অভাগিনী।

আমাদের প্রণাম গ্রহণ কোরো।

প্রণত
মিহিরকুমার"

বড়দীঘি
১৮ই চৈত্র, ১৩৩০

'ভাই ঠাকুরপো,

ইন্দুর চিঠিতে পাত্রের মায়ের বিষয় সমস্তই অবগত হলুম। বাঙ্‌লা-দেশের কত মেয়ের আজ ওই দুর্দ্দশা! এর কি কোন প্রতীকার নেই? দেশের হৃদয়বান লোকেরা সত্যই কি এর কোন ব্যবস্থা করতে পারেন না?

তুমি আমার জন্য ভয় পেয়েছ;—কিন্তু এত দাগা খেয়ে কতকটা শিক্ষা হয়েছে বোধ হয়! অন্তর দিয়ে বুঝ্তে শিখ্লে পরে হয় ত আরও জ্ঞানলাভ হবে। তুচ্ছ লোকনিন্দার আশঙ্কা আর আমার নেই; গাঁয়ের লোককে সত্যই এখন আমি ডরাই না।

মেয়ে শুধু তোমাদেরই নয়; তার বড় মায়েরও। সেই জোরেই লিখ্‌ছি,—আস্‌ছে

মাসে যত শীগ্‌গির পারো এখানে চলে আসবে। সান্ত্বনার বিয়ে তার নিজের বাড়ী থেকেই হবে। দেখি, এ দেশের লোক কি করে? আর পাত্রের মায়ের হাজারীবাগে না গিয়ে এখানে আসাই ত সুবিধা।

সান্ত্বনা-মাকে আমার অন্তরের স্নেহ-ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ দেবে এবং তোমরা জানবে। ইতি,

মঙ্গল-প্রার্থিনী

বউদিদি"

হাজারীবাগ

২১এ চৈত্র, ১৩৩০

"পরম পূজনীয়া বড়মা শ্রীচরণকমলেষু,

আপনার বাড়ীতে আমাদের যেতে অনুরোধ করেছেন। আপনার বললুম, কারণ,—তাতে আমার বাবা-মায়ের অধিকার কতটুকু? যার জোরে অধিকার, আপনি স্বেচ্ছায় কি সে স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করেন নাই?

হয় ত উপদেশ দিয়ে বলবেন—'স্নেহের খাতিরে কর্ত্তব্যকে কিছুতেই লঙ্ঘন করতে পারি নি।' ও পুরোণো কথাটা আমিও জানি বড়মা। কিন্তু যা করেছেন, প্রকৃতই কি সেটা কর্ত্তব্য-পালন; না, শুধু ওই কথাটারই গর্ব্ব-রক্ষা? জানি না, আপনার স্নেহ-ভালবাসা কি সত্য লাভ করেছিল, যে বিনা-বিচারে স্নেহের পাত্রকে একরূপ তাড়িয়ে না দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে নি!

আমার মা, যিনি আপনার সামান্য দু-ছত্র পত্রের ও এতটুকু সঙ্গলাভের আশায় এতদিন পাগলের মত হয়েছিলেন, বিন্দুমাত্র স্নেহ পাবার প্রলোভনে, কণামাত্র পদধূলির আকাঙ্ক্ষায় কত দীর্ঘ দিন, কত দীর্ঘ মাস, কত দীর্ঘ বৎসর পিপাসিতা চাতকীর ন্যায় অধৈর্য্য হয়ে পড়েছিলেন, আপনি আমার সেই মাকে চোখে না দেখেই, তাঁর প্রাণের পরিচয় গ্রহণ করবার পূর্ব্বেই দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন, এমনই উপেক্ষা! এত বড় ঘৃণা! ভাগ্যে দোলন-দিদির শিক্ষা পেয়েছিলেন, তাই না এখন আপনার মত ফিরেছে?

মায়ের এত বড় অপমান সহ্য করে আপনার বাড়ী যেতে পারব না। বাবা-মা বললেও নয়; কিছুতেই নয়! কারণ, তাঁদের কথা রক্ষা অপেক্ষা মর্য্যাদা বজায় রাখাটাকেই আমি বড় বলে মনে করি।

কথাগুলো নিশ্চয়ই আপনার নিকট অত্যন্ত রূক্ষ বলে মনে হবে। আপনি হয় ত রেগে বলবেন—'দেখেছ, কালকের ছুঁড়ীর লেকচার দেখেছ! ছি! ছি! একালের মেয়ে-ছেলেগুলো হলো কি? গুরুজনের মান্য রাখে না!'

এটা যে কালের ধর্ম্ম বড়মা! কালের ধর্ম্ম! এ কালের মেয়েগুলো সেকালের মত ঠিক আর তত বোকা নেই, কারণ, তারা এখন একটু-একটু বুঝতে শিখেছে!

চিরদিন কেবল আপনার হুকুমই বজায় থাকবে,—বরাবর বাবা যেমন নতমস্তকে মেনে এসেছিলেন,—এটা যদি বুঝে থাকেন, তা হলে এখনও আপনি ভুলের পেছনেই ঘুরছেন; আপনার কিছুই জ্ঞান হয় নি! জানবেন,—স্নেহ যে দেয় এবং যে পায় উভয়েরই একরূপ জোর, সমান অধিকার! আমার এ বিশ্বাস যদি যথার্থ হয়, তাহলে,—নিশ্চয়ই আপনি এখানে চলে আসবেন এবং আমার বুকের পাশে টেনে নেবেন! তা হলে বুঝব, আমার বড়মা বেঁচে আছেন! আর একজনকেও 'মা' বলে ডাকবার প্রকৃত অধিকার এখনও হারাই নি! আর সেই দিন থেকে এ মাথাটা আপনার পায়ের ওপরে লুটিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। যদি না আসেন, জানব,—আপনি উচ্ছ্বাসের মুখেই আমায় স্নেহ-ভালবাসা জানিয়েছেন, তাতে সত্য কিছু নেই!

মিথ্যা থেকে লাভ কি ? শীঘ্র সেটা মরে যাওয়া ভাল নয় কি ? এখন আপনার অভিরুচি।

প্রণতা

সান্ত্বনা"

বড়দীঘি

২৪এ চৈত্র, ১৩৩০

"মা সান্ত্বনা,

তোর চিঠি পড়ে যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হয়েছি, তা এই সামান্য পত্রে কি প্রকাশ করব ! তোর হৃদয়-নিহিত পিতৃ-মাতৃভক্তিরূপ ফুলের সৌরভে আমার সারা-অন্তরটা ভরে উঠেছে ! বাপ-মা যে কি জিনিষ সমস্ত জীবন ধরে তা ভাল করেই অনুভব করছি ; কারণ, আমি তাঁদের হারিয়ে ফেলেছি ! ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি,—তোর এই ভক্তি চিরদিন অক্ষয়, অটুট হয়ে থাক ! তোর জীবনের গতি সরল হোক্ ! —পথের কাঁটা কোনদিন যেন তোর পায়ে না বেঁধে ! যার এমন মেয়ে, তার মা যে পরম সৌভাগ্যবতী !

তোর চিঠি পড়ে তোর মাকে দেখ্‌বার, তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবার ইচ্ছা সর্ব্বদাই যে আমার অন্তর দ্বারে মাথা কোটাকুটি করছে ! কী ভয়ানক প্রলোভন ! কী অদম্য আকাঙ্ক্ষা ! বোধ হয় মানুষের সমগ্র জীবনের সমষ্টিভূত বাসনা এর কাছে হার মানে !

বেঁচে থাক্ মা, বেঁচে থাক্ ! তুই আমার হৃদয়ের লুকানো ক্ষত প্রকাশ করে দিয়েছিস্ ! সত্যই ত আত্মগর্ব্ব এতদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, নইলে কর্ত্তব্য প্রতিপালন করছি এ বিশ্বাস প্রকৃত হলে এত আত্মগ্লানি কেন ? কেন এ মর্ম্মান্তিক দুঃখ ! অসহ্য যন্ত্রণা !

মেয়ে তুই, মায়ের প্রতি তোর এ অভিমান যে স্বাভাবিক। আমি হতভাগী, তাই তোর মত মেয়ের কাছ থেকে আজও দূরে সরে আছি ! অদৃষ্ট ! অদৃষ্ট ! সবই অদৃষ্ট রে সান্ত্বনা !

তোর বাপও আমার ওপর এমনই অভিমান করত ! অতীতের সে সমস্ত মরে-যাওয়া ঘটনা গুলোর স্মৃতি আমায় যে অহরহ আকুল করে তুলছে ! চক্ষু যে চোখেরই জলে অন্ধ হবার উপক্রম করেছে ! পাষাণী আমি, কি করে এত দিন তোদের সংবাদ না নিয়ে চুপ করেছিলুম, দিনরাত কেবলই তাই ভাব্‌ছি ! আমার মেয়ের বিয়ে, আর আমি এই পরম আনন্দ থেকে এখনও নিজেকে বঞ্চিত রেখেছি ! অভিমানের এ কী মর্ম্মান্তিক ব্যঙ্গ ! নিয়তির এ কী ক্রূর পরিহাস !

আর যে নিজেকে কিছুতেই ধরে রাখ্‌তে পারছি না ! গর্ব্ব, অভিমান, আত্ম-সম্মান সব অতল জলে তলিয়ে যাক্ ! ছেলে মেয়ের কাছে মায়ের যে চিরদিনই পরাজয় ! আর সেই পরাজয়েই ত তার আনন্দ, স্বর্গ, মুক্তি !

যাচ্ছি মা, ছুটে যাচ্ছি ! এ মাসের কটা দিন কাট্‌লেই তোদের ওখানে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছি !

আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানবি ; তোর বাবা ও মাকে দিবি। তোর মাকে বল্‌বি—তার দিদি এতদিনের সঞ্চিত অপরাধের দণ্ড নিতে যাচ্ছে, কি শাস্তি দেবে যেন ঠিক্ করে রাখে !

আশীর্ব্বাদিকা

বড়মা"

নূতন গঞ্জ

২৮ এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১

"স্নেহের বোন্‌টী,

তোর শত নিষেধ সত্বেও বিবাহের আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে নিজের অশান্তিপূর্ণ জীবনটাকে

ডুবিয়ে দিতে গিয়ে শরীরের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে, তাতে আমার ভগ্ন-স্বাস্থ্য আরও ভেঙে পড়েছে। আজ প্রায় একমাস ধরে রোগ ক্রমশঃ বাড়ার দিকেই এগিয়ে চলেছে। ডাক্তার-বদ্যি হাল একরূপ ছেড়েই দিয়েছেন। তা বলে তুই এ রকম ভেবে মিছামিছি মনে কষ্ট করিস নি যেন, তোদের সঙ্গে গিয়েই আমার এই অবস্থা হলো। না দিদি, তা নয়। আমার মনের ভেতরের মনটা প্রথম থেকেই যাবার জন্ম একান্ত ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল; শুধু রোগের অজুহাতে তাকে নিবৃত্ত করে রেখেছিলুম মাত্র। সত্য বল্‌ছি, তার জন্ম আমার কিছুমাত্র দুঃখ নেই। সেই ক'দিনের মধুময়-স্মৃতি আমার হৃদয়টা আজ আনন্দের রঙিন্ আলোয় রাঙিয়ে তুলেছে; আর তারই দীপ্তশিখা রোগের যন্ত্রনা অনেকটা পুড়িয়ে দিচ্ছে! জীবন-প্রদীপ নেভবার পূর্ব্বে দাদাকে একবার শেষ-দেখা দে ভাই! তোদের সেবা-যত্ন এখন যে আমার বিশেষ আবশ্যক হয়ে পড়েছে। মাধবপুর থেকে যত শীগ্‌গির পারিস অশোককে নিয়ে এখানে চলে আস্‌বি।

মৃত্যু! মৃত্যু! কী সে সুন্দর! এ জ্বালা-যন্ত্রনাপূর্ণ সংসার থেকে জন্মের মত পলায়ন! আত্যন্তিক দুঃখ-কষ্টের চির-নির্ব্বাণ! আমি মরণের জন্ম প্রস্তুত হয়ে বসে আছি বোন্। আর কত সয়! কত সয়!

যে গোপন বেদনা এতদিন সকলের কাছে লুকিয়ে রেখেছিলুম, ব্যথা পাবি বলে তোকেও শোনাই নি, আজ তাই বল্‌তে বসেছি, শোন্—

"আমরা দুটী ভাই-বোন্ ছাড়া আমার বাবা-মায়ের আর কোন সন্তানাদি ছিল না। বোন্‌টীকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালবাস্‌তুম; একদণ্ড চোখের আড়াল করতে পারতুম না। তাকে নিজে খাওয়াতুম, পড়াতুম, তার সঙ্গে খেলা করতুম; তার আবদার রক্ষা করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতুম।

ক্রমে সে বড় হলো; তার বিয়ে দিলুম। যেদিন প্রথম সে শ্বশুরবাড়ী যায়, সেদিন বাবা-মায়ের শত অনুরোধ সত্ত্বেও মুখে কিছু দিতে পারি নি; তারই বা কত কান্না!

চার-পাঁচ বৎসর পরে তার একটী খোকা হলো;—ঠিক যেন ফুটন্ত গোলাপটী! তাকে আদর করে সাধ মিটত না।

ছেলে হবার বছর দুয়েক পরে বোনটী হঠাৎ এক দিন আমাদের বাড়ীতেই অসুখে পড়ল। গৃহস্থের ঘরে যতদূর চিকিৎসা সম্ভব, তার কোনই ত্রুটী হলো না। ভগবানকে দিবা-রাত্রি ডাকতে লাগলুম—তোদের সেই দয়াল প্রভুকে!—মর্ম্ম ছিঁড়ে প্রাণের কাতরতা নিবেদন করে দিলুম! এক সময় তাঁর ওপর কী অগাধ বিশ্বাস, কী অসীম ভালবাসাই না ছিল!—তাঁকে স্মরণ হ'লে আমার দুই চক্ষু দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত!—বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে প্রাণটা বেদনার ভারে ভেঙে পড়ত! কিছুই হলো না দিদি, কিছুই হলো না! একদিন শীত-কাতর সন্ধ্যায় আমার সামনেই বোনটীর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল! উঃ! কী সে অসহনীয় দৃশ্য! নির্ম্মম বিধাতার কী নিষ্ঠুর পরিহাস!

সে শোককে যে কী কষ্টে সামলে নিয়ে ভাগনেটীকে মানুষ করতে লাগলুম,তা শুধু আমিই জানি। বোনটী গিয়ে অবধি আমার হাসি-আনন্দ ঘুচে গিয়েছিল—তবু দুলালকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্ম ধারকরা হাসি হাসতে হতো! সেটা যে কত বড় শক্ত,—তা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে কি করে অনুভব করবে?

তারপর অসময়ে বাবা-মা আমার মায়া কাটিয়ে সেই দেশে চলে গেলেন,—যেখান থেকে কোন মানুষের ফিরে আসার খবর আজও পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি! তাঁদের জন্মও আমি ঈশ্বরকে কম ডাকি নি! তখনও মনে অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল,—তিনি ছাড়া গতি নাই। তিনি দয়া করলেই

আমার বাবা-মা ভাল হয়ে উঠবেন! উঃ! কী সে ভ্রম! কী অন্ধ ধারণাই না আমায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

তারপর জ্ঞাতিরা সর্ব্বস্ব ঠকিয়ে নিয়ে ষড়যন্ত্র করে আমায় ভিটে-ছাড়া করলে। আমি ভাগনেটার হাত ধরে ভগবানকে দুঃখ জানাতে-জানাতে বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম। এত কষ্টেও তাঁকে ভুলি নি; আঁকড়ে ধরে পড়েছিলুম।

যা কিছু হাতে ছিল, তাতে একখানা ঘর ভাড়া করে দুলালকে নিয়ে সেখানে বাস করতে লাগলুম; আর দীনের সহায়, তোদের সেই দীন-শরণকে সর্ব্বদাই ডাকতে লাগলুম! এমনই করে দিন কাটতে লাগল।

একদিন বর্ষার বিকালে স্কুল থেকে আসবার পথে ছাতির অভাবে জলে ভিজে দুলাল জ্বরে পড়ল। সামান্য যা কিছু সম্বল ছিল, তা দিয়ে তার চিকিৎসা করাতে লাগলুম। কিন্তু, রোগ না সেরে ক্রমশঃ বাড়ার দিকেই এগিয়ে চলল। শেষে, জীবনে কোনদিন যা স্বপ্নেও মুহূর্ত্তের জন্য মনে উদয় হয় নি, তাই করতে হলো! ভিক্ষা করে ডাক্তারের ফি, ঔষধ-পথ্য যোগাড় করতে লাগলুম!—যদিও লোকের কাছে মুখ ফুটে চাইতে আমার গলার কাছে রক্ত ছুটে আসত!

তোরা না বলিস,—কাতর হয়ে ডাকলে তিনি কিছুতেই স্থির থাকতে পারেন না! তাঁকে এমন কাতর হয়ে ডেকেছিলুম যে,—সে রকম আহ্বান কোন মানুষ কোনদিন করেছে কি না সন্দেহ! হয় ত, বোনটীর জন্যও তেমন ডাকা ডাকতে পারি নি! কিন্তু, সব বৃথা! সব বৃথা! সে অচল অটল পাষাণের দয়া হলো না! অতি কঠোর মানুষও সে আহ্বানে বিচলিত না হয়ে থাকতে পারত না! যা হোক্, দুলালও আমায় পাগল করে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল!

হাঃ! হাঃ! হাঃ! মিথ্যা! মিথ্যা! ঈশ্বর মিথ্যা! ও সব ঝুটা কথায় আর কি ভুলি!

সেই থেকে তোদের দয়াময় দেবতার ওপর আমার বিশ্বাস ভেঙে গেল। এতদিন আলেয়ার পেছনে ঘুরছিলুম বলে তীব্র অনুশোচনায় হৃদয় ভরে উঠল। নেই, নেই, ভগবান নেই!

তারপর অতি সামান্য কথা। দু-একটাকা পুঁজি ভরসা করে রাস্তায় ফিরি করে বেড়াতে লাগলুম। বছর তিনেক পরে হাতে কিছু জমলো; তাই দিয়ে এটা-সেটা পাঁচ রকম কাজ করতে লাগলুম। ক্রমে আমার যথেষ্ট উন্নতি হলো; আমি একজন বড় ব্যবসাদার হয়ে দাঁড়ালুম। লোকে হয় ত বলবে—'ভগবানের দয়া।' কিন্তু, আমি বলব—'না, এ আমার দৃঢ় অধ্যবসায়, অমানুষিক চেষ্টার ফল! এ প্রাক্তন! হতেই হবে! হতেই হবে!

মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার জীবন-কাহিনী তোকে শোনালুম। চলে গেলে মাঝে-মাঝে দাদাকে মনে করিস ভাই।

আমার বোনটীকে হারিয়ে তোকে যে পেয়েছিলুম দিদি; তাই ত শেষ জীবন অনেকটা শান্তিতে কাটাতে পেরেছি! নইলে হয় ত এরও আগে কোন্ দিন চলে যেতুম। এখন তোদের দেখ্‌তে-দেখ্‌তে যদি চোখ দুটো বুজে আসে, তাতে ক্ষতি কি?

এই চিঠি পেয়ে তুই দুঃখ করবি, কাঁদবি জানি; কিন্তু তাতে ফল কি? ধরে ত রাখতে পারবি না ভাই! শমন যে আমায় জোর তলব দিয়েছে।

কাল সন্ধ্যার সময় ভাবছিলুম,—জীবনে কোন অন্যায়, কোন পাপ করেছি কিংবা লোকের মনে ব্যথা দিয়েছি কি না? অন্তরাত্মা বারবার উত্তর দিয়েছে—'না! না! না!'

ব্যস! এখন আমি নিশ্চিন্ত! আর মরতে ভয় কি? এখন কেবলই সেই চরম অব্যাহতির দিন গুণছি।

আবার তোকে বলছি—'ঈশ্বর মিথ্যা!'

তাঁকে ডাকা ছেড়ে দিয়ে মনে কোনদিন অস্বস্তি অনুভব করি নি।—এখনও নেই। যাঁর অস্তিত্বের কোন প্রমাণই জীবনে পেলুম না, মিছা-মিছি সেই অজ্ঞাত অপরিচিতের সন্ধানে ঘুরে ফল কি? বাতাসের পেছনে ফুল নৈবেদ্য ছড়িয়ে লাভ?

হাত কাঁপছে। আর লিখতে পারছি না। যা বলবার বাকী রইল, এখানে এলে তা বলব। অবিরাম মরণ-সমুদ্রের কল্লোল শুনতে পাচ্ছি! আর বেশী বিলম্ব নেই। ইতি,

আশীর্ব্বাদক
দাদা"

চিঠিখানা পড়িয়া মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল; চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ভাবিলাম,—না, থাক; আর পড়িব না। কি জ্বালাতন! জল আজ আর ধরিতেই চাহে না। বাহির হইবার পথ যে একেবারেই বন্ধ করিয়া দিল দেখিতেছি।

মনটা পুনরায় কেমন খুঁৎখুঁৎ করিতে লাগিল—এতটাই যখন পড়া হইয়াছে, শেষটুকু আর বাকী থাকে কেন? আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিল। তাহারই তাড়নায় অধীর হইয়া আবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম—

নূতনগঞ্জ
১৭ই শ্রাবণ, ১৩৩১

ভাই বেয়ান,

প্রথমেই তোমায় এক মর্ম্মান্তিক দুঃখের সংবাদ দিচ্ছি।—দাদা চলে গেছেন! আজ তের দিন হলো, তিনি আমাদের জন্মের মত ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছেন! তোমার দুখানা চিঠিই আমি পেয়েছি; কিন্তু উত্তর যে দেব, আমার এমন মাথার ঠিক ছিল না। মনের অবস্থা বুঝে আমায় ক্ষমা করো। আমি অশোককে এ বিপদের কথা জানাতে বারণ করে দিয়েছিলুম। জানালে তোমরা হয় ত ছুটে আস্তে; কিন্তু শুধু-শুধু তোমাদের টেনে এনে লাভ ত কিছু নেই; মিছে কেবল দৌড়-ঝাঁপ করান। দাদা মৃত্যুর পূর্ব্বেও তোমাদের নাম করে গেছেন। তোমাদের আদর-যত্নে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন; ইচ্ছা ছিল,—আর একবার হাজারীবাগে বেড়াতে যাবেন। কিন্তু বিধাতা তাঁর সে সাধ পূর্ণ হতে দিলেন না!

দাদার মৃত্যু সংবাদ শুনে সেদিন আশ-পাশের চার-পাঁচখানা গাঁয়ের গরীব-দুঃখী সব ছুটে এসেছিল। তাদের সে কী কান্না! ভক্ত সাধু তুলসীদাসের বাণী তিনি সার্থক করে গিয়েছেন! ধরার পান্থশালা, কর্ম্মভোগের এই বিশাল-ক্ষেত্র ত্যাগ করবার পর অশ্রুর গঙ্গাজলে কজনের স্মৃতির এমন তর্পণ হয়!

দাদা তাঁর সঞ্চিত সমস্ত অর্থই দীন-দরিদ্রের দুঃখ-মোচন ও অন্যান্য সৎকার্য্যের জন্য আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছেন। ভায়ের মত ভাই পেয়েছিলুম ইন্দু! ভগবান্ আমার এমন দাদাকে আর কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখ্‌লেন না। ভাল করে তাঁর সেবা-যত্ন করতে পারলুম না, এই বড় দুঃখ রইল। কী বাজের আগুন যে দিবা-রাত্র বুকের মধ্যে জ্বলছে, তা শুধু অন্তর্য্যামীই জানতে পারছেন।

এখানকার লোকের মনে দাদার কথা জাগিয়ে রাখতে অশোক তাঁর স্মৃতি-মন্দির তৈরী করাচ্ছে। কিন্তু হৃদয়ের চির-জাগ্রত স্মৃতির তুলনায় সেটা কত ছোট! কত অকিঞ্চিৎকর! আমি অবশ্য কাজে বাধা দিয়ে তার প্রাণে দুঃখ দিতে চাই না।

তোমরা সকলে কেমন আছ? দিদিকে আমার প্রণাম ও বেহাইকে নমস্কার দেবে। তুমি ও সান্ত্বনা স্নেহ-ভালবাসা এবং আশীর্ব্বাদ জান্‌বে।

তোমার
জোহ্ন"

হাজারীবাগ
২০এ শ্রাবণ, ১৩৩১

"দিদি,

এ কী সর্ব্বনাশের কথা লিখেছ ভাই !—দাদা আর নেই ! চিঠিখানা পড়ে অবধি মনটা যে কি রকম হয়ে গেছে, তা পত্রে তোমায় আর কি জানাব। দিদি ও ইনি খুবই দুঃখ করছেন। সান্ত্বনা কাঁদছে। দিদি বল্‌ছেন—'আমাদের সেই ক'দিনের দেখায় তাঁকে যতটুকু জান্‌তে পেরেছি, তাতেই বুঝিছি,—হ্যাঁ, একজন মানুষের মত মানুষ বটে ! সবাইকে অতটা আপনার কোরে নেবার শক্তি খুব কম লোকেরই থাকে—যেন আমাদের সঙ্গে কত দিনের পরিচয়। ইনিও বল্‌ছেন—'জগতে এমন সব লোক অল্পই আসে, অতি অল্পই আসে—দুদিনের পরিচয়ে যাঁরা লোকের প্রাণের ভেতর এমন একটা কিছু দিয়ে যান যে,—মানুষ সারাজীবনেও সেটা আর ভুল্‌তে পারে না ।

তাঁর কথা খুবই সত্য। দাদার সেই সুমিষ্ট 'বোন' ডাকটী অন্তরে যে মধু বর্ষণ করে—স্নেহপূর্ণ অকপট ব্যবহার সহোদরের অভাব যে ভুলিয়ে দেয় ! তাঁর সহিত জড়িত কদিনের মধুর-স্মৃতি চিরদিন হৃদয়-পটে উজ্জ্বল হয়ে থাক্‌বে।

দিদি প্রত্যহই আমাদের নিয়ে দেশে ফিরতে চাইছেন ; কিন্তু সান্ত্বনার একটী 'না' কথায় রোজই তাঁর যাওয়া ঘুরে যাচ্ছে। তিনি যেন তার হাতের খেলার পুতুল—তাঁকে যেদিকে ফেরাচ্ছে, সে-দিকেই ফিরছেন। রাতদিনই কেবল 'সান্ত্ব, সান্ত্ব।' আশ্চর্য্য ! এত স্নেহ-ভালবাসা কি করে এতদিন চেপে রেখেছিলেন !

আমায় ত কোন কাজই কর্‌তে দেন না ; হাত থেকে কেড়ে নেন। এক-একসময় আমায় এত আদর করেন যে, সত্যই বড় লজ্জা করে ;— আমি যেন ভাই তাঁর কাছে কচি খুকিটী ! হ্যাঁ, জায়ের মত জা বটে ; ঠিক যেন মায়ের পেটের বড় বোন্। দুর্ভাগ্য আমার, এমন দিদির স্নেহ থেকে এতদিন বঞ্চিত ছিলুম। দেওরের প্রতিও তাঁর পূর্ব্ব স্নেহের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নি ; শুধু দুজনের অভিমানেই না এতটা ঘটেছিল।

আমরা দেশে ফিরলে অশোক ও তুমি দিন-কতক সেখানে গিয়ে থাক্‌বে ; দিদিরও বিশেষ অনুরোধ। তিনি নিজেই হয় ত এ সম্বন্ধে তোমায় আলাদা চিঠি দেবেন।

আর কেঁদে- কেঁদে শরীর নষ্ট করো না ভাই। এতে কেবল দাদার আত্মাকে অস্থির করে তোলা হয়। সবই ত বোঝ কাঁদলে যদি তিনি ফির্‌তেন, তা হলে সারাজীবন ধরে কাঁদলেও তোমায় বারণ কর্‌তুম না।

তুমি আমার ভালবাসা জান্‌বে। অশোককে আশীর্ব্বাদ দেবে। ইতি,

তোমার স্নেহের—
ইন্দু"

নূতন গঞ্জ
২৬এ শ্রাবণ, ১৩৩১

"ভাই বোন,

তুমি আমায় কাঁদতে বারণ করেছ, কিন্তু না কেঁদে থাক্‌তে পারি কই ? দাদার স্নেহ-ভালবাসা আদর-যত্নের কথা মনে হয়, আর প্রাণের ভেতরটা হুহু করে উঠে আপনা-আপনি চোখ দিয়ে শত-ধারে জল গড়িয়ে পড়ে !

কাল সন্ধ্যার সময় খুব অন্ধকার করে বৃষ্টি হচ্ছিল ; আমি বাগানের দিকে খোলা জানলার ধারে একলাটী চুপ করে বসেছিলুম দাদার কথা ভাবতে-ভাবতে আমার মন তখন কোথায় উধাও হয়ে চলে গিয়েছিল। অলক্ষ্যে কখন যে চোখের জল বুক ভাসিয়ে দিচ্ছিল, কিছুই জান্‌তে পারি নি। অশোক আস্‌তে তবে আমার চমক ভাঙল। সে আদর করে ডেকে বললে—'মা আবার কাঁদছ ?'

আমি কোন জবাব দিতে পারলুম না। সে মায়ের মত স্নেহে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আঃ! কী আরাম! কী শান্তি! লোকে এই জন্যই না সন্তানের কামনা করে!

আমি অশোককে জিজ্ঞাসা করলুম—'হ্যাঁ রে অশোক, তোর মামাবাবু কি স্বর্গে গেছেন?'

সে বিস্মিত হয়ে বললে—'স্বর্গ যদি তাঁর নয়, তবে কার? কেন মা, তোমার এ অন্যায় সন্দেহ?'

'ভগবান্‌কে অস্বীকার করার মত দুর্ভাগ্য যে আর নেই বাবা! জগতের সকল অপরাধই যে তার কাছে হার মানে অশোক! তাতেই ত সন্দেহ জাগে,—নাস্তিকদের কি গতি হয়?'

'কজন আস্তিক তাঁর মত ঈশ্বরকে চেনেন মা? মালা জপ নাই বা করলেন তিনি, মুখে বারবার 'ঠাকুর, ঠাকুর' বলে নাই বা ডাকলেন, যে পরিচয় সব চেয়ে বড়, সর্ব্বনিয়ন্তার সঙ্গে তাঁর সেই সত্যকার পরিচয় হয়ে গিয়েছে! সে অমূল্য কথাটা কি ভুলে গেলে মা? —'তস্মিন্ প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব'।'

'তোমরা মুখেই কি শুধু 'দরিদ্র-নারায়ণ', 'দরিদ্র-নারায়ণ' বল? দরিদ্র-নারায়ণের দুঃখ-মোচন-ব্রতে আমার মামাবাবুর মত কামনা শূন্য হয়ে কজন জীবন-উৎসর্গ করতে পারে? মানুষকে ভালবাসবার, আপনার করে নেবার এত বড় মহত্ব কজনের হৃদয়ে আছে? এই কার্য্যই কি তাঁর প্রিয় কার্য্য নয়? শ্রেষ্ঠ সাধনা নয়? আর, আমি ত মামাবাবুর হৃদয় ভালরূপই জানতুম; মূলে তিনি কখনই নাস্তিক ছিলেন না—শুধু মর্ম্মান্তিক যাতনায় ভগবানের ওপর দারুণ অভিমান পোষণ করেছিলেন মাত্র!'

আমি তার মাথাটা বুকের ওপর টেনে নিলুম। মনের মধ্যে যে সন্দেহের কাঁটাটা মাঝে-মাঝে খচ্-খচ্ করে বিঁধছিল, অশোকের দৃঢ় প্রত্যয় দেখে সেটা একেবারে দূর হয়ে গেল। আমি মনে-মনে তাকে শত আশীর্ব্বাদ করতে লাগলুম। তারপর অন্তপারের অভয়-নগরের সেই যাত্রীর উদ্দেশে আমাদের অন্তরের প্রণাম নিবেদন করে দিলুম!

তোমরা এলে আমায় চিঠি দিও। সেই সময় দিন কতক তোমাদের ওখানে গিয়ে বেড়িয়ে আসব। আশা করি ও বাটীর সমস্ত মঙ্গল আজ তা হলে এই পর্য্যন্ত।

বোন"

পত্র পাঠান্তে মাথা তুলিতেই দেখিলাম,—বৃষ্টি ধরিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার ম্লান আলোকে দিদি দরজার নিকট স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া উদাসভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া আছেন। তাঁহার নেত্রযুগল অশ্রুভারে টলমল করিতেছে। আমার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই নিজের দুর্ব্বলতা লুকাইবার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি চোখ দুইটী মুছিয়া জোর করিয়া মুখে হাসি আনিয়া বলিলেন—"কি সুশান্ত, চিঠি পড়া শেষ হলো?"

আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। কাজটা প্রকৃতই বড় অন্যায় হইয়া গিয়াছে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম—"দেখুন, পড়বার একান্ত অনিচ্ছা—"

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন—"তাতে লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই। বেশ করেছ। তোমার সঙ্গে এতটা ঘনিষ্টতা সত্বেও এতদিন যেটা জানতে পার নি, আমার সেই সত্যকারের পরিচয় ত ওইগুলোর বুকেই আঁকা রয়েছে ভাই!"

আমি তখন উঠিয়া গিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া হাসিয়া বলিলাম—"তা ঠিক; আপনি যে আমার বৌদি হন, চিঠি কখানা না দেখলে সেটা ত অজ্ঞাতই থেকে যেত।"

তিনি বিস্মিত হইলেন; বলিলেন—"আমি তোমার বউদি হই?"

"হ্যাঁ। নরেশ-দা যে আমার আপন জ্যাঠ-তুতো ভাই।"

"কই, আমি ত তা কোনদিন শুনি নি বা এর আগে কখনও তোমায় দেখি নি।"

"কোথা থেকে শুন্‌বেন বা দেখ্‌বেন? জ্যেঠাই-মার ঝগড়ার জ্বালায় অস্থির হয়ে বাবা আমায় ও মাকে নিয়ে কোলকাতায় চলে আসেন। তখন আমি খুব ছোট। তারপর তিনি একটা ভাল চাকরী পেয়ে আমাদের সঙ্গে করে হায়দ্রাবাদে চলে যান। জ্যেঠাইমার ব্যবহারে বাবা এতদূর বিরক্ত হয়েছিলেন যে,—দু-তিন বছর পরে দাদার বিয়ের সময় পত্রে তাঁর বিস্তর অনুরোধ থাকা সত্বেও তিনি আর বাড়ী ফেরেন নি। কিন্তু জ্যেঠাইমা মারা যাওয়ার পর দাদার কাতর-মিনতি-ভরা চিঠি পেয়ে বাবা আর স্থির থাকতে পার্‌লেন না। বহু বৎসর পরে আমাদের নিয়ে আবার তিনি দেশে ফিরে এলেন।"

জ্যেঠাইমার পরলোক-গমনের সংবাদ শুনিয়া বৌদি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার দাদা কেমন আছেন?"

"ভাল।"

কিয়ৎক্ষণ চুপচাপ করিয়া কাটিল। তারপর তিনি পুনরায় শুধাইলেন—"কাকাবাবু, কাকীমা ভাল আছেন?"

"হ্যাঁ।"

তোমার আর ভাই-বোন্ কটী?"

"আমিই সবে ধন নীলমণি।"

"এখন কি কাজ কর্ম্ম কর্‌ছ?"

"বিলেত থেকে এম-এ পাশ করে এসে গভর্ণ-মেণ্ট কলেজে প্রোফেসারী চাকরী নিয়েছি।"

"বিয়ে-থা নিশ্চয়ই এতদিন হয়েছে; কি ছেলেপুলে?"

হাসিয়া বলিলাম—"না বৌদি, সেটা হয় নি—তবে, হব-হব কর্‌ছে। তাই ত বাবা-মা আজ মাসখানেক হলো আমার কোলকাতার বাসায় এসে রয়েছেন।"

তারপর যে কথাটা অনবরত মনের মধ্যে বলি-বলি করিতেছিল, সেটাকে তখন মুখ দিয়া বাহির করিয়া ফেলিলাম—"দেখুন, আপনি দয়া করে দাদার দোষ-অপরাধ ভুলে যান। সত্যই তাঁর অন্যায়ের জন্য তিনি এখন অনুতপ্ত। এই সেদিনও বল্‌ছিলেন—যদি কখনও আপনার দেখা পান, তা হলে সমাদরে আপনাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।"

"কিন্তু, তিনি নিয়ে যেতে চাইলেও আমি যাব না ঠাকুরপো।"

"যাবে না?"

"না। ভাঙ্গা ঘরে কোনরকমে মাথা গুঁজে থাকা চলে বটে, কিন্তু তাতে করে গৃহের পূর্ব্ব-মর্য্যাদা কিছুতেই রক্ষা করা যায় না। অতএব এ সম্বন্ধে তুমি আর আমায় অনুরোধ করো না ভাই। বসো ঠাকুরপো, চা নিয়ে আসি।" বলিয়াই তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

আমি ধীরে-ধীরে উঠিয়া আসিয়া খড়খড়ির ধারে দাঁড়াইয়া বাহিরে বর্ষণ-ক্লান্ত উদার আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলাম—এই যে নারী তাঁহার নারীত্বের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে আজ স্বেচ্ছায় পত্নীত্বের সম্মান বিসর্জ্জন দিলেন, তাহাতে কি তিনি পঙ্ক ছিটাইয়া সংসার-আশ্রমের পবিত্রতা নষ্ট করিলেন,—না তাহাকে চন্দনধারায় অভিসিঞ্চন করাইয়া তাহার গৌরববৃদ্ধিরই সহায় হইলেন?

কে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিবে?

শেষ

শ্রী সুরেন্দ্রমোহন বসু

মিত্র-মহাশয় (!)

শ্রীমতী কাঞ্চনলতা ঘোষ

বিশ্বনাথের বন্ধু সৌভাগ্য সম্বন্ধে মনে-মনে একটা গর্ব্ব ছিল। একথা পাঁচজনেও নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিত। হঠাৎ তাহার এক নূতন বন্ধু জুটিয়া গেল—নাম অহীন্দ্রনাথ। পরণে খদ্দর, পায়ে তালতলার চটি, মুখে সিগার দেখিলে যেন মনে হয় সরল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

অহীন্দ্র বইয়ের দোকানে কাজ করিত। সময়-অসময়ে চেনা এবং অচেনা সকলের নিকটেই বলিত—"ব্যাপার খেটে মরি বই ত নয়। বন্ধুত্বের খাতিরেই বা পড়ে আছি।"

লোকে তাহার অদ্ভুত স্বার্থত্যাগের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইত। এ হেন মহাশয়-ব্যক্তির সহিত বোধ করি কোন শুভ মুহূর্ত্তেই বিশ্বনাথের মিলন সংঘটিত হইয়া গেল।

সকলে বিস্ময়-উৎসুক-দৃষ্টিতে দেখিল,—বিশ্বনাথের বাড়ীর সান্ধ্য-বৈঠক উঠিয়া গিয়াছে। এখন প্রতিদিন অহীন্দ্রনাথের দোকান-ঘরখানিতেই আড্ডা জমিয়া উঠে—চা, পাণ কিছুরই অভাব হয় না। শীতকালের রাত্রি হইলেও দশটার কম কোনদিনই ছুটী নাই।

ব্যাপার দেখিয়া বিশ্বনাথের বন্ধু বংশীধারী বলিত—"অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়; শেষটা পস্তাতে হবে বলে দিলুম।"

বিশ্বনাথ বলিত—"পাগল, অমন সজ্জন!"

গর্জ্জনে উত্তর আসিত—"হয়েছে, হয়েছে, আর বকতে হবে না। বলে,—"

বলের পরের কথা শুনিবার ধৈর্য্য বিশ্বনাথের হইত না। বেগতিক দেখিয়া সে সরিয়া পড়িত।

দোকানে যখন অপর কেহ থাকিত না, অহীন্দ্র বন্ধুকে বলিত—"না, এমন করে আর চলে না। দেবে ত আট আনা, চার আনা, তা'ও আবার সাতদিন ঘুরিয়ে—যেন ভিক্ষে চাচ্ছি



আর কি! অথচ বিজ্ঞানবাবুর ত কই খরচের কসুর দেখি না। বড় বড় আম, টাটকা পোনা, বাবুয়ানীর কোনটা বাকী আছে বল না?"

বিশ্বনাথ বলিত, "তা বটে।"

আ রে, তুমি ত সব জান না ভাই, কাজেই বুঝতে পারছ না। এই ছোট্ট কারবারটী থেকে বিজ্ঞানবাবুর অন্ততঃপক্ষে কম হলেও চার-পাঁচশ' টাকা আয়। নইলে, ওর ছেলে ত আশী টাকা মাইনের কেরাণী! একশ' দশ টাকা বাড়ী ভাড়া আসে কোত্থেকে?"

বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করিত—"তবে যে শুনেছিলুম, ওদের এই কারবার নিয়ে অনেক টাকা দেনা দাঁড়িয়েছে।"

"আ রে, সে কি আজকালের, অনেক আগের হে, অনেক আগের। আগে আর একবার দোকান করে নি; বদ-মতলব থাকলে চলে কখনও? আমার কাছে ওটি হবার যো নেই;—দেখ না, কি রকম ভয়ে-ভয়ে চলে আমার কাছে। হুঁ:! এই শর্ম্মার হাতে পড়ে নগদ বিক্রি কি রকম বেড়ে গেছে দেখছ!"

বিশ্বনাথ ভাবিত, তাই ত এত বড় মহাপ্রাণের প্রতি এ কি অবিচার!

অহীন্দ্র বলিত—"এত কথা তুলতুম না; কিন্তু নিজের কোন কিছুর অভাব নেই, যত অসচ্ছল আমার বেলা। বললেই মুখে লেগে আছে, কোথায় পাব? শয়তানী বুদ্ধির বলিহারী! ড্রয়ারের মধ্যে দু'-চারটে পয়সা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে রাখে;

বল্লেই খুলে দেখান হয়—দেখ না অবস্থা। তাও বলি, যদি না পারিস ছেড়ে দে—সামনে চৈত্র, দেনা-পাওনার হিড়িক। আমরা দু'বন্ধুতে মিলে একবার দেখে নি, কত ধানে কত চাল! এই দেখ না হিসেবটা।"

বিশ্বনাথ অল্প টাক, মাহিনায় কোন অফিসে চাকরী করিত। লাভের অঙ্কটা তাহার চক্ষে ধাঁধাঁর সৃষ্টি করিত। সে বলিত—"এত ভাল কথা; কিন্তু অত টাকা লাভের জিনিষ কি ওরা ছাড়বে?"

"তা' যা' বলেছ, এমন বিনি মাইনের চাকর পেয়েছে; ঠকিয়ে যতদিন চলে!"

বেশীদিন কিন্তু অহীন্দ্রনাথকে ঠকাইয়া বিজ্ঞানবাবুর চলিল না; নানাভাবে জড়াইয়া প'ড়িয়া তিনি দোকান বন্ধ করিয়া দিলেন। অহীন্দ্রনাথ বন্ধুকে আসিয়া বলিল—"ও হে ঠিক করে ফেলেছি। সহজে কি দোকান ছাড়তে চায়? বিজ্ঞানবাবু ত কান্না জুড়ে দিয়েছিল। তার ছেলেটা অফিসের কেরাণী, মস্ত বড় হামবাগ; বলে—'বুড়ো বয়সে আর আমি তোমায় কোনমতেই ওসবের মধ্যে থাকতে দেব না বাবা। কেবল তাগাদা, আর তাগাদা; চোখের ওপর অপমান সওয়া যায় না।' ও হে, ওই ছোঁড়াটার জন্যেই ত যত গণ্ডগোল। সেবার নগদ টাকা এল, বল্লুম—আশুতোষ দত্তের অনেক টাকা বাকী পড়েছে, তাদের দেনাটা মিটিয়ে দাও; কাণেই তুল্লে না। নিজেদের মান্ধাতার আমলে যে দেনা ছিল, তাই বাবু শোধ করে দিয়ে বাহাদুরী নিলেন—লাভে হ'তে হ'ল,—কারবারটা যাবার দাখিল। যাই হোক এখন ভালয়-ভালয় সইটা করিয়ে দিতে পারলে বাঁচি। আমি ওদের বলেছি—বিশু কিনবে। আর দেরী নয়; কালই গিয়ে লেখাপড়া করে নাও"

বিশ্বনাথ আমৃতা আমতা করিয়া বলিল—"বেশ ত!"

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল—"আর দেখ, বিজ্ঞানবাবু বলছিল—'বিশ্বনাথ চালাতে পারবে ত?—যে বাজার, তোমার যত্ন, আমার পরিশ্রমই যখন বৃথা হয়ে গেল—' আমি হেসে উত্তর দিলুম—'সে ও বুঝবে, সখ হয়েছে, চালাক—কিছু পয়সা কামড়াচ্ছে, যাবে বই ত নয়।' তুমি চুপ করে বসে দেখ বিশু, আমি এতে সোণা ফলিয়ে দিতে পারি কি না। মাস দুয়েক দোকান বন্ধ করেই না খদ্দের-পত্র ফাঁস হয়ে গেল। আবার ছুটে আসতে পথ পাবে না; আশীর্ব্বাদ কর, এই শর্ম্মার গতরটা যেন বজায় থাকে।"

বন্ধু 'হাঁ' করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দিনকয়েক কিন্তু এ বিষয় আর কোন উচ্চবাচ্য হইল না। সেদিন বিশ্বনাথ শুনিল—'পঙ্কজিনী মন্দিরে'র সহিত দোকান লইয়া অহীন্দ্রনাথ কি সব লেখাপড়ার মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল বিজ্ঞানবাবুর ওখানে আর অহীন্দ্রনাথের আড্ডা জমিত না; পঙ্কজিনী মন্দিরেই সে ভরপুর করিয়াছিল। বিশ্বনাথকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল—"ভেবে দেখলুম বিশু, যা শত্রু পরে পরে। ওদের সঙ্গেই যা'হোক একটা বন্দোবস্ত করে নেওয়া যাক।"

বিশ্বনাথ বলিল—"বেশ ত!" তাহার মনে হইল, কে যেন বুকের উপর হইতে একটা জগদ্দল পাথর নামাইয়া লইয়াছে।

কিন্তু তাহার সে স্বস্তি বেশীদিন স্থায়ী হইল না। একদিন অচিরাৎ অহীন্দ্রনাথ সিগারের ধোঁয়া ছড়াইতে-ছড়াইতে আসিয়া হাজির—"রামচন্দ্র! ওরা করবে ওই সব! দিন থাকতেই সরে পড়লুম। দেখ বিশু, তোমাতে আমাতেই ভগবানের নাম করে খুলে পড়ি এস; দুটো মাস কষ্টে সৃষ্টে চেপে থাক না, তারপর পয়সা রাখবার একটা সিন্দুকই কিনতে হবে হয় ত।"

বিশ্বনাথ দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া বলিল—"কিন্তু, টাকা?"

"ও, সে সব ভাববার কি আছে ? সব ডিউয়ে নেব—বিক্রি করব, দাম ফেলে দেব, ব্যস্ ! এই দেখ না, বিকাশ সরকার, আদিত্য চৌধুরী আজই সকালে এসে খোসামোদ,—মাল দেব, ভাবনা কি ? শুধু দু-পাঁচদিনের জন্যে বড় জোর টাকার দরকার বই ত নয় ; তা শ'-তিনেক টাকা হ'লেই হয়ে যাবে। যোগাড় করতে পারবে না ? বড় ঠেকায় পড়ে গেছি ; নইলে নিজেই সব বন্দোবস্ত করে নিতুম। এখন শ'-তিনেক টাকার যোগাড় কর ; পরে দরকার হয়, আমার লাইফ ইন্‌সিওর করা ত রয়েছে, কিছু টাকা তুললেই চলবে। বুঝেছ কি না।"

বিশ্বনাথ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"বুঝিয়াছে।"

অহীন্দ্রনাথ আপন-মনে বলিয়া চলিল—"তারপর খোদ্দের জোটান, সে আমি দু'-দিন ঘুরলেই নিদেন পক্ষে চার-পাঁচটা মেটা পার্টি যোগাড় করে নিতে পারব। এই ধর না, এম্, সি. সরকার, গুরুদাস চাটুর্য্যে। বিজ্ঞানের সঙ্গে অনেক বেয়ে-চেয়ে দেখ্‌লুম ; কিন্তু পোষাল না। এবার দুই বন্ধুতে যখন লেগে গেছি, আর বল্‌তে হবে না।"

বিশ্বনাথের বন্ধু বংশীধারী ব্যাপারটা শুনিয়া বলল—"ভাসিয়ে দাও বিশু ; ওসব সুখের পায়রা, নরম কাঁধ পেলেই চেপে বসে। দেখ্‌লে না, পঙ্কজিনী-মন্দিরের সঙ্গে পেরে উঠল না ; জহুরী জহর চিনে ফেললে। কালই বলে দিও, ওসব হবে-টবে না। গরীব মানুষ—"

বাধা দিয়া বিশ্বনাথ বলিল—"যাঃ, তোরা বড় ইয়ে ! গরীব বলেই না আমার জন্যে অহী এত মাথা ঘামাচ্ছে। নইলে—"

বংশীধারী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—"তুই পাগল ! যাই হোক, ওর সঙ্গে কি রকম বন্দোবস্ত হবে শুনি ?"

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—"সে তোকে ভাবতে হবে না। টাকা-পয়সা নিয়ে আর যার সঙ্গে হয় হোক, অহীর সঙ্গে আমার কোন দিনই গোল-যোগ হবে না। এ তোকে জোর-গলায় বলে দিলুম। সে টাকা-পয়সার তোয়াক্কা জীবনে কোন দিনই করে নি। গভর্ণমেণ্ট মুনসেফি নিয়ে সাধ্য সাধি, পুলিশের হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা ইনিস্পেক্টারী দিতে খোঁজাখুঁজি, স্পষ্ট জানিয়ে দিলে—ওসব করে টাকা উপায়ের প্রবৃত্তি তার নেই। সে বলেছে—শ'-তিনেক টাকা যোগাড় করে নিতে, তাতেই কাজ চলে যাবে। ওইতে যা' হোক করে কারবারটা একবারটা দাঁড় করিয়ে নিতে পারলে হয় ; তারপর লাভ হ'লে দু' বন্ধুতে—"

"জীতা রহো ভাই ! তোমার কল্পনাকে তারিফ না করে থাকতে পারলুম না। আর তোমার সাক্ষাৎ বিত্তর অবতার বন্ধুটিকেও এখান থেকে নমস্কার করছি ! কিন্তু—"

বিশ্বনাথ ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল। গম্ভীরকণ্ঠে বলিল—"তোর ঘাড়ের ও 'কিন্তু' ভূতটাকে আজই দূর করে দিচ্ছি।"

"বেশ, তাই দাও ভাই, তা হ'লেও ত বাঁচি।"

বৈকালের দিকে বংশীধারীর সহিত বিশ্বনাথের সাক্ষাৎ হইতেই সে বলিয়া উঠিল—"তোকেই খুঁজছিলুম। ও রে, মানুষ চেনার ক্ষমতা থাকা চাই ; রামুকে দিয়ে একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলুম অহীর কাছে ; সে কি লিখেছে, দেখ্‌লেই বুঝ্‌বি ; ঝট্ করে যা' তা' বলাটা সোজা বটে, কিন্তু ন্যায়-সঙ্গত নয়।"

অহীন্দ্র লিখিয়াছে—"বন্ধু, তোমার পত্রখানি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমার মতে লেখা-পড়াটা যত শীঘ্র পার বিজ্ঞানবাবুর নিকট হইতে করাইয়া লও। আমার বিষয় চিন্তার কিছুই নাই ; জানই ত, টাকা-পয়সার উপর কোনদিনই আমার মমতা নাই—বিশেষতঃ তোমার সহিত ; ও কথা ভাবিতেও লজ্জা করে।"

বংশীধারী মুখ কুঁচকাইয়া বলিল—"গতিক সুবিধার নয় বন্ধু ; এসব ছেঁদো কথার—"

বিশ্বনাথ সত্য সত্যই এবার বিরক্ত হইয়া বিনা প্রতিবাদে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

কারবার লেখাপড়া হইয়া গেল। অহীন্দ্র একগাল হাসিয়া বলিল—"আঃ, বাঁচলুম! তুমি জান না বিশ্বনাথ, মানুষের মন নদীর ঢেউয়েরই মত চঞ্চল—কাজ যত তাড়াতাড়ি হয়, সেই চেষ্টাই করা দরকার—"

হিসাবে দেখা গেল। মাসে উপস্থিত এক শত টাকার উপর লোকসান—ঘর ভাড়া, লাইট, ইত্যাদি—বিশ্বনাথের বুকটা একবার চড়াৎ করিয়া উঠিয়াছিল ; বন্ধুর দিকে নজর পড়িতেই কতকটা নিজেকে সামলাইয়া লইল। এমন বন্ধু যাহার সহায়, তাহার আবার চিন্তা!—

অহীন্দ্র কবে না কি কয়েক রিম কাগজ নিজের দায়ীত্বে আনিয়াছিল,—সে হিসাবটা শুদ্ধ বাহাল তবিয়তে বন্ধুর ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইল। বিশ্বনাথ ভাবিল—আহা, বন্ধুর দেনা! শ'-দুই বই ত নয়, দুই মাসেই উঠিয়া আসিবে।

দিন দুই পরের কথা। অহীন্দ্রনাথ হঠাৎ বন্ধুকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল "ও হে, বড্ড ঠেকায় পড়ে গেছি! অমুকের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছিলুম, সে কালই বাইরে চলে যাবে ; এ সময় টাকাটা না দিতে পারলে মান থাকে না।"

বিশ্বনাথ বলিল—"সে ত বটেই ; আচ্ছা, কাল সকালে দিয়ে আসব 'খন।"

অহীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল—"সে আমি জানি! তোমার কাছে পয়সা চাইতে আমার ভারী লজ্জা করে ; কিন্তু নেহাৎ ঠেকায় পড়লে না বলেও পারি না। এই দেখ না, আজই তোমার কাছে মুখ খুলতে হ'ল! আর মাঝে-মাঝে খুলতে হবেও।"

বিশ্বনাথ ভাল-মন্দ কোন কথা বলিল না।

ব্যাপারটা কিন্তু যে শুনিল, সেই মুখ সিট্‌কাইতে লাগিল। এমন কাজও লোকে এ দুর্দ্দিনে মাথায় করে! অহীন্দ্রের মেজ ভাই নরেন্দ্রনাথ বিশ্বনাথকে ডাকিয়া বলিল—"দাদার যেমন! আপনি এ সবের ভেতর নামলেন কেন বিশুবাবু ; টাকা কিছু সস্তা হয়েছে বুঝি? খবর কিছু রেখেছেন,—অত বড় আঢ্য কোম্পানী ইন্‌সলভেন্সি ফাইল করেছে। গেরস্থের ছেলে মারা যাবেন আর কি?"

অহীন্দ্র শুনিয়া বলিল—ভাই শত্রু বিশু ; মায়ের পেটের ভায়ের মত দুষমন আর নেই! তা' ছাড়া ও জানেই বা কি! থাকে ত শুধু দশটা-পাঁচটা কলম-পেশা চাকরী নিয়ে। ব্যবসার সুখ বুঝলেই হ'ল!"

এ কথা বিশ্বনাথ নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইল।

দোকান চলিল ; কিন্তু আশানুরূপ খরিদ্দার জুটিল না। টাকা ঘর হইতে বাহির হইয়া সহজেই গেল, কিন্তু ফিরিবার বেলা আর তাহার দেখা পাওয়া সম্ভব হইল না।

একশত দুইশত—তিনশত টাকা কোথায় উবিয়া গেল। প্রথম মাসের হিসাবের পর দেখা হইল,—দুইশত টাকার উপর লোকসান! অহীন্দ্র গম্ভীর-ভাবে কহিল—"এত জানা কথাই! ভাবলে চলবে কেন?"

বিশ্বনাথ চমকিয়া উঠিল—এ কণ্ঠের সহিত ত সে এতদিন পরিচিত ছিল না! অহীন হাসিয়া বলিল—"কারবার করতে গেলেই অমন লাভ-লোকসান আছে বন্ধু। পরের লাভটার কথা ভাব!"

"তা বটে।" বলিয়া বিশ্বনাথ অন্য কথা পাড়িল। দিনকয়েক যাইতে-না-যাইতেই বিশ্বনাথ কিন্তু অহীন্দ্রের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িতে লাগিল। অন্যান্য টাকা-কড়ি দিবার কথায় বন্ধুর ততটা কাণ যায় না ; তবে নিজের প্রয়োজনের জন্য কিন্তু তাঁহার তাগাদার অন্ত নাই। অছিলারও

অভাব হয় না। হাত পাতেন, আর বলেন –কিছু ভেব না বন্ধু, হিসেবট লিখে রেখো ; আর যাই হোক, হিসেবটা পাকা রাখা চাই। আমি বিজ্ঞানবাবুকে এইজন্যে বারবার বলে এলে গেছলুম।"

বিশ্বনাথ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,–এক্ষেত্রে সে ভুল হইতেছে না।

বংশীধারীর সঙ্গ পারতপক্ষে বিশ্বনাথ সেই ঘটনার পর হইতে এড়াইয়া চলিত। সেদিন হঠাৎ পথে তাহার সহিত বিশ্বনাথের দেখা হইয়া গেল। বংশীধারী বলিল—"কি হে, কারবার চল্‌ছে কেমন? অহীকে কিছু দিতে-থুতে হচ্ছে না কি?"

বিশু কিল খাইয়া কিল চুরি করিল ; বলিল— "না, এমন আর কি; তবে বড় অভাব, মাঝে-মাঝে দু-এক টাকা—"

"তা বটে ; তুমি জমিদার লোক, সাহায্য না করলে চলবে কেন? এখনও দিন থাকতে, সাবধান হও বিশু ; নইলে শেষটা পস্তাতে হবে, এ আমি বলে দিলুম।"

বিশ্বনাথ চুপ করিয়া গেল ; প্রতিবাদ করিল না।

জল কমিতে কমিতে সেদিন শেষ ধাপে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল—অর্থাৎ, হাতে একটী কপর্দ্দকও নাই ; অথচ, একটা ডিউ না দিতে পারিলেই নয়। বিশ্বনাথের চক্ষের উপর অসংখ্য সরিষা পুষ্পের নৃত্য সুরু হইয়াছিল! বন্ধুর নিকট আসিয়া সে দেখিল,—বহুদিনের অভ্যাস-যোগ বশতঃ তাহার মধ্যে এতটুকু চাঞ্চল্য নাই–সে বেশ ধীরভাবেই বলিল—"তাই ত সমস্যা বটে! কিন্তু ভড়্‌কে যেও না বিশু! চালিয়ে নাও যেমন করে হোক—"

বিশ্বনাথ বন্ধুর পার্শ্বে বসিয়া পড়িল।

"হাঁ হে,মিটাঘর কোম্পানীর ওখানে যে বিল হয়েছিল, তোমার বন্ধু তারা, তাই তোমার হাতেই চেক দেবে বলেছিল, তার কি হ'ল? এ সময় সে টাকাটা অন্ততঃ—"

বন্ধু বন্ধুরই মত উত্তর দিলেন—"ওঃ, সে কথা তোমাকে বলি নি বুঝি? ক'দিন আগে পেয়েছিলুম বটে, কিন্তু সেটা ভাঙিয়ে নিয়ে এসে খরচ করে ফেলেছি—বড্‌ড টানা-টানি কি না ; তবে গোটা-দশেক টাকা অবশ্য এখনও পড়ে আছে, যদি বল—"

"না, থাক।" বলিয়া বিশ্বনাথ উঠিয়া পড়িল। আজ সর্ব্বপ্রথম তাহার মনে হইল —তবে কি বন্ধুর সব কথা মিথ্যা ; তাহার কি মানুষ-চেনায় এতবড় ভুল হইয়া গেল! বংশীধারীর কথাই কি তাহা হইলে সত্য! মিটাঘর কোম্পানীর ক্রশ চেকখানা সে অম্লান-বদনে ভাঙাইয়া আনিল ; তাহার এতবড় দুঃসময়ের কথা একবারও অহীন স্মরণে আনা প্রয়োজন বোধ করিল না! তবে বিশ্বাসের মূল্য কোথায়? সে যে এতদিন অন্তরের নিভৃত কোণে বড় আশা পোষণ করিতেছিল, একান্ত প্রয়োজন হইলে অহী ত আছে ; সে নিশ্চয়ই ইন্‌সিওর অফিস হইতে টাকা তুলিয়া আনিয়া বন্ধুর মুখ রক্ষা করিবে! কিন্তু সে সুখ স্বপ্নই আজ তাহাকে নিষ্ঠুর উপহাস করিয়া উঠিল।

বাড়ী আসিতেই বন্ধু বিভূপদ আসিয়া জানাইল—"ও হে, এই খানিক আগে অহীন্দ্রের ছেলে একটা টাকা নিয়ে গেল, বললে - বিশ্বনাথ-বাবুর দেখা হ'ল না ; বিশেষ দরকার, দিন ; ওবেলা দিয়ে যাব খন।"

মলিন হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—"সে আমি দিচ্ছি ভাই, নিয়ে যাও টাকাটা—"

সতীশ বলিল—"না, না, ও এখন থাক ; সে যখন ধার বলে নিয়ে গেছে, তখন দেবে বই কি? —না হয়, দিও বরং।"

বিশ্বনাথ বলিল—"আচ্ছা পাগল. তুমি নিয়ে যাও না ভাই।"

দু' চারদিন পরে বন্ধু বলিল—হ্যাঁ হে,"আচ্ছা ছ্যাচড়া লোক ত! ভদ্রতার খাতিরে একবার এসে বলে পর্য্যন্ত গেল না।"

বিশ্বনাথ হাসিতে লাগিল। এ বিষয় অল্প কয়েক মাসেই সে হাড়ে-হাড়ে অনুভব করিয়াছে যে!

বৎসরখানেক পরের কথা! গল্পের শেষ পরিচ্ছেদের সুরু—

বিশ্বনাথের দোকানের পার্শ্বে ঠিক তাহারই অনুকরণ করিয়া সাজাইয়া একটী দোকান খোলা হইয়াছে। দরজার বাহিরে একখানা চেয়ারে বসিয়া অহীন্দ্রনাথ চা পান করিতে-করিতে একজনকে হাসিয়া বলিতেছিল—"বুঝেছ মণিলাল, জীবনে এতবড় ঠকা আর কখনও আমি ঠকি নি! বুকের রক্ত জল করে খাটলুম; যা অন্য কোথাও করি নি, তাও করলুম; নিমকহারাম আমায় বলে কি না হাফ সেয়ার নাও, কাজ কর; নগদ কিছু দিতে-থুতে পারব না! লোকসান অমন ঢের হয়; তা' বলে আমি কি চুপ করে বসে-বসে মুখ দেখব! আবার হাড়ে-হাড়ে বদমাইসি কত! বলে আমার যা খরচা হয়েছে তাই দিয়ে দোকান তুমি নিয়ে নাও। এমনই বোকা পেয়েছে বটে! তোর লোকসানী কারবার নিলুম আর কি! তার চেয়ে কেমন এই নতুন দোকান খুলে বসেছি দেখ না। ও হে, এইখানেই ক্যাপিটেলিষ্টদের দম্ভ— ঠকবাজি! ওরা শুধু আমাদের দাবিয়ে চলে! যা হোক, এবার এমন কায়দা করে বেঁধে নিয়েছি যে, প্রোপ্রাইটারী রাইট আমার। গোলমাল হয়, এদের ফাঁক করে বেরিয়ে যাব! দেখ না, এরই মধ্যে যত সব খদ্দের আমার কাছে ছুটে এসেছে। যত সব বড় বড় বইওয়ালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই বই দিতে পথ পাবে না। ওর বেলাই করব ভাবছিলুম – কিন্তু চটিয়ে দিলে, তাই—নইলে—"

বিশ্বনাথ চুপে-চুপে বাড়ী ঢুকিতেছিল; সে সময় বংশীধারী তাহাদের বাড়ীর দাওয়াতেই বসিয়াছিল; বলিল –"তখনই বলেছিলুম না, ওসব অহী মহী সাপের ছায়া মাড়াস নি! এখন?—হল ত সাজা! খুব মানুষ চিনেছিলি বটে!"

বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে পাশ কাটাইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল। কোন বাদ-প্রতিবাদ করিল না; উত্তর দিবার তাহার আছেই বা কি?

বড় মেয়ে শুভা আসিয়া বলিল—"বাবা, মুখ শুকিয়ে গেছে কেন? অসুখ করেছে না কি?'

কন্যার উত্তরে বিশ্বনাথ বলিল—"না মা, অসুখ করে নি! একটা কথা বড় ভাবিয়ে তুলেছে, বলতে পারিস,—এ বন্ধুর হাসি, না শত্রুর ছল?"

পিতার কথার ভাবার্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া কন্যা 'হাঁ' করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।





ফিরে পাওয়া

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

(এক)

বৈশাখমাস। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্র সারা-পৃথিবী যেন ঝলসিয়া দিতেছিল। বায়ুহীন অসহ্য গুমোট গরম। চারিদিক নিস্তব্ধ। দুই-একটী বিহঙ্গম মাঝে মাঝে তারস্বরে চীৎকার করিয়া ছায়ার সন্ধানে ফিরিতেছিল।

গৃহের দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া মাতা ও পুত্রের কথোপকথন হইতেছিল। পুত্রের গাত্রে হাত বুলাইতে বুলাইতে জননী কহিলেন, তা' হ'লে কি করবি এখন ঠিক করলি আশীষ ?

চিন্তিতস্বরে আশীষ কহিল, কি যে করি তার উপায় ঠিক করতে পারছি না মা—এখানে থেকেই বা কি করব ? একবার ভাবছি, কলকাতা যাই, একটু চেষ্টা-চরিত্র করি ; কিন্তু চাকরীর বাজার আজকাল যে রকম, তা'তে বিশেষ সুবিধা হবে বলে ত মনে হয় না। অথচ, এ রকম করেই বা আর কতদিন চলে ? গম্ভীরস্বরে জননী সুলতা দেবী কহিলেন, তাই না হয় কর, কলকাতায়ই যা। একটু চেষ্টা না করলেই বা হবে কেন বল ?

মনে করছি যাই ; আবার ভাবছি, চাকরী করব না ; একটা ব্যবসা যদি করতে পারতুম ! কিন্তু তাই বা হয় কি করে ? যাই হোক, কাল কি পরশু একবার কলকাতাই যাব তারপর দেখা যাক কি হয়—কি বল মা ?

হাঁ, তাই আয় ; টাকার জন্য যে তোকে এমন ভাবে ব্যস্ত হতে হবে, স্বপ্নেও তা' ভাবতে পারি নি ! আজ যদি তিনি থাকতেন তাহলে কি আর তোকে এত ভাবনা করতে হয় !

ললাটে হস্ত স্থাপন করিয়া দুঃখিতস্বরে আশীষ বলিল, কি আর হবে মা যেমন অদৃষ্ট ! যাক, আমি আজ বিমলকে চিঠি লিখে দিই—তার বাসাতে উঠব—তারপর দেখে-শুনে ব্যবস্থা করে নিলেই চলবে।

তাই কর, বিমল তো তোর সেই বন্ধুটী ? আহা বেশ ছেলেটী ! সেই সেবার যে এসেছিল; সেই ত ?

অন্যমনা আশীষ উত্তর দিল, হাঁ।

স্নেহপূর্ণকণ্ঠে সুলতা দেবী কহিলেন, আহা, বেঁচে থাক ! ছেলেটী বড় ভাল। তা' হলে তাই কর—আমি যাই উঠি, কাজকর্ম্ম সব পড়ে রয়েছে।

(দুই)

কল্যাণপুর গ্রামের জমীদার রাধাকান্ত মিত্র স্বর্গারোহণ করিলে জ্ঞাতি-ভ্রাতা প্রতুলকৃষ্ণকে আসিয়া অচল জমিদারীর সকল ভার নিজহস্তে তুলিয়া লইতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া-

ছিল। কিন্তু দুই-চারিদিনের মধ্যেই সে বিস্ময় চরমে গিয়া উঠিল। শোনা গেল, প্রতুলকৃষ্ণের নিকট রাধাকান্ত মিত্র কি কারণে প্রচুর অর্থ ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ সময়ে না কি ঋণ-পরিশোধে অপারগ হইয়া সমস্ত বিষয় উইল করিয়া তাঁহাকে লিখিয়া-পড়িয়া দিয়া গিয়াছেন। আশীষ শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। সুলতা দেবী চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। শুধু বসতবাটীখানি সম্বল করিয়া কিরূপে আশীষকে মানুষ করিয়া তুলিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না।

অনেকে সুলতা দেবীকে উত্তেজিত করিতে লাগিল—জাল উইল করিয়া তাঁহাদের ঠকাইজেছে; আদালতের সাহায্য লইলে এখনই এ বিষয় উদ্ধার হয়। কিন্তু তিনি সে সব কথায় কর্ণপাত করিলেন না; হাসিমুখেই উত্তর দিলেন, মানুষেই বিষয় করে—বিষয়ে মানুষ তৈরী করে না। তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, আশীষ যেন আমার মানুষ হয়ে ওঠে; এখন ওকে লেখাপড়া শেখাতে হবে—এ সময় কি উকিল-মোক্তারের দোরে দোরে ঘুরিয়ে ওর পরকাল নষ্ট করব।

হইলও তাহাই তিনি নিজের অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল বিক্রয় করিয়া আশীষকে কলিকাতায় রাখিয়া পড়াইতে লাগিলেন। বহুদিন পরে বি-এ পরীক্ষা দিয়া আশীষ বাটী ফিরিল। মাতা-পুত্রে শেষে স্থির করিলেন—আর নয়, এইবার আশীষ চাকুরীর চেষ্টা করিবে এবং বি-এ পাশ করিতে পারিলে 'ল' পড়িবে।

মানুষের কখন কি অবস্থা হয়, এ কথা কেহ বলিতে পারে না। অত বড় জমীদার-পুত্র আজ চাকুরীর চিন্তায় ম্রিয়মান। অদৃষ্ট-নিয়ন্তার যাহা লিখন, তাহা হইবেই; মানুষ নিমিত্তের ভাগী মাত্র।

আশীষ কলিকাতা আসিয়া বিমলের সাহায্যে চাকুরী পাইল এবং একটী টিউসনিও যোগাড় হইয়া গেল। বিমলের কোনও বন্ধু তাহার ভগ্নীকে পড়াইবার জন্য একটী শিক্ষক খুঁজিতেছিলেন; বিমলের চেষ্টায় সে সেটী পাইল। কলিকাতার মেসে থাকিয়া এবং মধ্যে মধ্যে বাটী গিয়া দিনযাপন করিতে লাগিল।

(তিন)

সমস্তদিন গুমোট গরমের পর সন্ধ্যার শান্ত স্নিগ্ধ মলয় মৃদু মৃদু বহিয়া সারাদিবসের অবসাদ-গ্রস্ত ক্লান্তি দূর করিয়া দিতেছিল। মেঘের ফাঁকে তৃতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্রলেখা উঁকি দিয়া মর্ত্তের অধিবাসগণকে দেখিয়া লইতেছিল। কলিকাতার রাজপথে তখন অগণ্য জনস্রোত; আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া মহানগরী হাসিতেছিল। রমেন্দ্র বসুর প্রকাণ্ড বাটীখানা তখন বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করিতেছিল। গৃহস্থের বাটীর শুভ শঙ্খনাদ তখন মৃদু মৃদু ধ্বনিত হইতেছিল। বারাণ্ডায় রমেন্দ্র বসুর কন্যা জোনাকী দাঁড়াইয়া ছিল। হঠাৎ হর্ণের শব্দে চাহিয়া দেখিল, একখানা অষ্টীন কার তাহাদের ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল। কয়েক মিনিট পরেই অলঙ্কারের মৃদু গুঞ্জন শুনিয়া জোনাকী যেমন মুখ ফিরাইতে যাইবে, অমনি দু'খানি কোমল হাত জোনাকীর দুই চক্ষু পিছন হইতে চাপিয়া ধরিল।

হাসিয়া জোনাকী কহিল, আঃ, ছাড় না ভাই সুরভি, লাগে যে! তুই কে তা আমি ভালরকম চিনি; নে রঙ্গ রাখ! হাসিয়া সম্মুখে আসিয়া জোনাকীর সহপাঠিনী বান্ধবী সুরভি কহিল, কি করে বুঝলি ভাই? আমার গাড়ী দেখে বুঝি? যাক, এখন চটপট শাড়ীটা বদলে নে দেখি; আর মোটেই সময় নেই।

বিস্ময়পূর্ণ-নেত্রে জোনাকী কহিল, এই ত একটু আগে মুখ ধুয়ে কাপড় বদলেছি; আবার এখুনি বদলাতে যাবো কেন?

জোনাকীর পৃষ্ঠে মৃদু চপেটাঘাত দিয়া সুরভি কহিল, বিশেষ কিছু নয়—এলফিনষ্টোনে একটা নূতন ফিল্ম এসেছে, দাদা দেখে এসে বলছিল।

একলা যেতে ভাল লাগে না—তুই চটপট নে, আমি সেইজন্যই এসেছি। উঠে পড় ভাই; এই দেখ, ছটা পাঁচ হয়ে গেল বলিয়া বাম হাতখানা জোনাকীর দিকে বাড়াইয়া দিল।

ঘাড় নাড়িয়া জোনাকী কহিল, দূর, দূর, তোকে যেমন ভূতে পেয়েছে! এমন সুন্দর সন্ধ্যাটা তুই বায়স্কোপের আলো-বাতাসহীন অন্ধকার ঘরে কাটাতে চাইছিস? প্রকৃতি দেবীর এই নৈসর্গিক শোভা, এ ছেড়ে—

বাধা দিয়া সুরভি কহিল, তোর কাব্যরস রাখ এখন জোনাকী; ওসব কবিত্ব আমার আসে না, এখন তুই যাবি কি না?

আগে থেকে খবর দিলি না, এখন কি করে যাই বল দেখি? মাষ্টার-মশায় এখনি পড়াতে আসবেন; না দেখলে হয় ত রাগ করবেন। না ভাই, আজ শনিবার কাল যাব; তোর আর আসতে হবে না; আমি গাড়ীটা ঘুরিয়ে তোকে তুলে নিয়ে যাবো অখন।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া সুরভি বলিল, ওঃ, পড়ার যে মস্ত চাড় দেখছি তোর! তবু ভাল বল্‌তে হবে; ক'মাস আগে কিন্তু মশায়ের মুখেই উল্টো শোনা যেত! যা'হোক, মাষ্টারটী কেমন বল ত?

অকারণ জোনাকীর কাণ দু'টী লাল হইয়া উঠিল; সে গ্রীবা হেলাইয়া বলিল, কথার ছিরি দেখ না! রকম আর কি, কেমন আবার—দু' কাণ, দু চোখ……

সুরভি কৃত্রিম গম্ভীর হইতে চাহিয়া বলিল, তিনটে পা কি না সে খোঁজ আমি চাই নি; বলি, বয়স কত? বর হ'তে পারে কি না?…

ধোৎ বলিয়া জোনাকী মুখ ঘুরাইয়া লইল। তারপর কণ্ঠে খানিকটা বিরক্তির আভাষ ফুটাইতে চাহিয়া বলিল, ও রকম চাষাড়ে ইয়ারকী আমি ভালবাসি না সুরো! দিনদিন তুই যেন—ইহার পর যেন ভাষা হারাইয়া গেল; সে অকারণ ঘামিতে লাগিল।

সুরভি একবার তাহার প্রতি বিদ্যুৎ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, থাক, থাক, আর বলতে হবে না; আমি বুঝেছি। বলিয়া সে যেন একটা আনন্দের হিল্লোল ছড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুরভির চলিয়া-যাওয়া পথটার দিকে খানিক চাহিয়া থাকিয়া জোনাকী আপন-মনে বলিয়া উঠিল, সুরভিটা এমনি বেহায়া!

রমেন্দ্রবাবুর এই একমাত্র কন্যা জোনাকী ও একটি পুত্র লহরকুমার। পাটের ব্যবসায় রমেন্দ্র বহু প্রভূত ধনসম্পত্তি করিয়াছিলেন। চঞ্চলা কমলা তাঁহার গৃহে বেশ অচঞ্চলভাবেই বাসা বাঁধিয়াছিলেন। রমেন্দ্রবাবু আধুনিক ফ্যাসান অনুযায়ী ছিলেন; তবে হিন্দুর আচার নিয়মগুলি মানিতেন। অর্থাৎ তাঁহার বাটী পূজা-অর্চ্চনার বাধা ছিল না এবং ডিনার পার্টিও বাদ যাইত না। পুত্র কন্যা যাহাতে শিক্ষিত হয়, এ বিষয় তাঁহার বিশেষ নজর ছিল। লহর গতবার বি-এ পরীক্ষায় স্কলারশিপ লইয়া পাশ করিয়াছে; জোনাকী আগামী বৎসর প্রবেশিকা দিবে।

আশীষ জোনাকীকে পড়াইত। আশীষের কোমল স্বভাবের জন্য এ বাটীর সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত—অল্পদিনের মধ্যেই সে যেন এ বাড়ীরই একজন হইয়া পড়িয়াছিল। রমেন্দ্রবাবুও তাহাকে খুব স্নেহ করিতেন। জোনাকীর মা প্রথম আশীষের সম্মুখে আসিতেন না; কিন্তু তাহার মিষ্ট স্বভাবের গুণে মুগ্ধ হইয়া পুত্রাধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন।

(চার)

সেদিন অফিস হইতে মেসে ফিরিয়া ঘরে ঢুকিয়া আশীষ দেখিল, তাহার নামের দুইখানি চিঠি টেবিলের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। একখানি পোষ্টকার্ড তাহার কোনও সহপাঠী লিখিয়াছে; অপরখানি খামের চিঠি কল্যাণপুরের ছাপ। জামাকাপড় না ছাড়িয়াই আশীষ চিঠিখানা

খুলিয়া দেখিল মায়ের পত্র; আর তাহার সহিত আরও একখানি রহিয়াছে—সেখানি তাহার মাকে কে লিখিতেছে। সুলতা দেবী লিখিয়াছেন—

আশীষ, আমার কয়েকদিন পূর্ব্বের পত্র পাইয়াছ বোধ হয়। আজ জোনাকীর মার একখানি চিঠি পাইয়াছি; সেখানা তোমায় পাঠাইলাম। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পড়িলেই সমস্ত বুঝিতে এবং আমার মতামত বাড়ী আসিলেই জানিতে পারিবে।

তোমার মা

অপরখানায় জোনাকীর মা সুলতা দেবীকে লিখিয়াছেন; সারাংশ এই,—তাঁহার ইচ্ছা জোনাকীর সহিত আশীষের বিবাহ দেন; এখন তাঁহার অভিমত কি?

পত্র দুইখানা পড়িয়া আশীষ চমকিয়া উঠিল। এ কি জোনাকীর মা সর্ব্বজ্ঞ না কি! তাহার মনের গোপন ইচ্ছা সে ত কোন দিনই প্রকাশ করে নাই; কেন না সে যে আকাশ কুসুম! জোনাকী ধনীর কন্যা; আর সে যে দীনহীন ভিখারী। কিসের জন্য তাঁহারা তাহাকে কন্যা দিবেন? সেই দিন লহর কথার ছলে বলিয়াছিল, জোনাকীর কিন্তু তুমি না পড়ালেই চলে না; একদিন তুমি আসতে না পারলে ও বলে আজ আমার পড়াই হলো না। আমরা বলে দিতে গেলে ও বলে, না মাষ্টার-মশায়ের মত অমন সুন্দর করে বোঝাতে তোমরা পার না। ও হে, তুমি কি রকম করে পড়াও বল ত? একটু শিখিয়ে রাখলে ভবিষ্যতে হয় ত উপকারে লাগতে পারে, ইত্যাদি—আশীষের মন বলিতে লাগিল, তবে কি জোনাকী তাহাকে ভালবাসে? নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে আশীষ জোনাকীদের বাটী পড়াইতে গেল। সেখানে প্রবেশ করিয়া আশীষ শুনিতে পাইল, অর্গেন বাজাইয়া জোনাকী গাহিতেছে—"আঁধার মাঝে দেখেছি পিয়া তোমার দু'টী উজল আঁখি।" স্তব্ধ হইয়া আশীষ কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া পড়িল। কই, জোনাকীর গান ত এ পর্য্যন্ত সে শোনে নাই; এত সুন্দর গায় সে! বহুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া আশীষ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। জোনাকী তখনও গাহিতেছে—"জাগ জাগ মন গহনে. ঘুম অচেতন বিরহী পাখী।" আশীষকে দেখিয়া জোনাকী শশব্যস্তে অর্গান ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। ব্যস্তভাবে আশীষ কহিল, উঠলে কেন জোনাকী, গাও না; তুমি এত সুন্দর গান জান তা ত কই জানতুম না!

লজ্জারুণ মুখে জোনাকী কহিল, হ্যাঁ, আমার আবার গান। ও কি শুনবেন? দেখুন, আজকে স্কুলে জিওমেট্রি ছিল, মোটেই পারি নি; দেখুন ত!

আজ যেন কোনমতেই আশীষ পড়ার মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না; জোনাকীও পদে পদে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল। লেখা-পড়া শেষ করিয়া বিদায় লওয়ার সময় আশীষ কহিল, জোনাকী, তোমার মা আমার মাকে এই চিঠি দিয়েছেন এই নাও; আমার মায়ের উত্তরটাও দেখ। এ বিষয় তোমার মতামত জেনে তবে আমি তাঁর সঙ্গে কথা কইবো!

এই চিঠি যে দেওয়া হয়েছিল তাহা জোনাকী পূর্ব্বেই জানিত এবং পিতা-মাতার এ বিষয়ে নিভৃত আলোচনাও তাহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। সেই অবধিই তার মনের নিভৃত কোণে আশীষকে বসাইয়া নীরবে সে পূজা করিয়া আসিতেছে। সে জানিত, আশীষই তাহার স্বামী হইবে।

লজ্জায় জড়সড় হইয়া জোনাকী চুপ করিয়া রহিল—তাহার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া উঠিতেছিল—কি উত্তর দিবে সে? মুখ ফুটিয়া কি করিয়া বলিবে···আশীষ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া যাইতেছে; কিন্তু কিছুতেই উত্তর পায় না দেখিয়া অধীর হইয়া কহিল, বল জোনাকী, উত্তর দাও!

নতমুখে জোনাকী কহিল, মার মতেই আমার মত জানবেন।

পুলকিতকণ্ঠে আশীষ বলিল, তবে তাই হোক জোনাকী, আমার মনের গভীর কন্দরে এই কথাটাই এতদিন সাধনায় বদ্ধ হয়েছিল ; আজ তোমার সম্মতি তার সিদ্ধি এনে দিলে ! আজ এই পবিত্র মুহূর্ত্তে আমি প্রতিজ্ঞা করছি,—তোমাকে আমি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করব—তোমাকে ছাড়া আর কার' স্মৃতি আমার মনে কোনদিনই উঠবে না !

অদৃষ্ট-দেবতা অলক্ষ্যে বসিয়া হাসিলেন কি না কে বলিতে পারে !

(৫)

সুদীর্ঘ পাঁচটী বৎসর কালের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। কল্যাণপুরের নূতন জমীদার আশীষ বসু সম্প্রতি শিমুলতলায় বেড়াইতে আসিয়াছে। সে এখন আর সেই চাকুরীজীবি আশীষ নাই ; নিজে চেষ্টা করিয়া উকীল হইয়া নিজেই নিজের সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া এখন সে কল্যাণপুরের জমীদার। আজ পর্য্যন্ত আশীষ অবিবাহিত।

জোনাকীর সহিত তাহার বিবাহ হয় নাই। সুলতা দেবীকে কিছুতেই সম্মত করিতে না পারিয়া সে হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল। তাঁহার বাঁধা বুলি—কলকাতার লেখাপড়া জানা বুড়ো হাতী মেয়েকে তিনি কল্যাণপুরের জমিদার-বংশের বধূ করিতে পারেন না ! কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া কলিকাতা ফিরিয়া আশীষ আর জোনাকীদের বাড়ী যায় নাই ; তাহার মাকে চিঠি লিখিয়া দিয়াছিল,—আপনাদের অনুরোধ রাখিতে পারিলাম না, আমি এমনই অক্ষম ! এ বিবাহে মায়ের মত নাই। আপনাদের নিকট এ মুখ আর দেখাইবার নয়—তাই আজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। জোনাকীকে পড়াইবার জন্য অন্য শিক্ষক নিযুক্ত করিবেন—আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

পুত্র আর বিবাহ করিল না দেখিয়া সুলতা দেবী তাহাকে বলিয়াছিলেন—তবে না হয় সেই-খানেই বিয়ে কর। কিন্তু আশীষ তাহাতে সায় দেয় নাই। এতদিন শুধু ম্লানমুখে উত্তর করিয়াছে, না, মা, তোমার পায়ে পড়ছি,—আমায় আর বিয়ে করতে বলো না ; তা হ'লে আমি যেদিকে দু-চোখ যায়, সেদিকে চলে যাব। ভীত হইয়া সুলতা দেবী আর বিশেষ কিছুই বলেন নাই।

শিমুলতলা আসিবার আগে আশীষ কি প্রয়োজনে একবার কলিকাতায় গিয়াছিল। পথে হঠাৎ একদিন লহরের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যায়। তাহার মুখে শুনিয়াছিল, জোনাকীর আজিও বিবাহ হয় নাই; পিতামাতার সহিত বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। লহর সেখানে শীঘ্রই যাইবে। বিবাহ আজিও হয় নাই ভাবিয়া আশীষ চমকিল—তবে কি জোনাকীও চিরকুমারী-ব্রত গ্রহণ করিল না কি ? আহা বালিকা ! তাহার কি দোষ ? জীবনের সুখ-শান্তি সে সব বিসর্জ্জন দিল ! হতভাগ্য সে—সেই ত তাহার জীবনে ধূমকেতুর মত উদয় হইয়া তাহার সব ওলট-পালট করিয়া দিয়াছে !

তীব্র অনুশোচনায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। দেশে ফিরিয়াই সে প্রস্তাব করিল, শিমুলতলা যাইবে—তাহার শরীর ভাল নাই। পুত্রের প্রাণে কতটা আঘাত লাগিয়াছে, তাহা সুলতা দেবী বুঝিয়াছিলেন—তাই কিছু না বলিয়া তিনিও পুত্রের সহিত শিমুলতলা আসিয়া-ছিলেন।

দিনমণি তখন অসীমের প্রান্তভাগে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। স্নিগ্ধ সমীর চঞ্চলা বালিকার মত নৃত্য করিতেছিল—মাথার উপর সুন্দর নীল আকাশে দশমীর চাঁদ উঁকি দিতেছিল। বারান্দায় আসিয়া আশীষ কবেকার কোন্ পুরাণো স্মৃতির খাতার পাতাগুলি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উলটাইয়া যাইতেছিল

হঠাৎ বাড়ীর অদূরে পদশব্দ শুনিয়া সে

চাহিয়া দেখিল, কটকের মধ্যে সুলতা দেবী প্রবেশ করিতেছেন—আর তাহার পিছনে একটী তরুণী তাহার হাতের টর্চ্চ-লাইট উঁচু করিয়া তুলিয়া বলিতেছে, এইবার তা' হ'লে যাই—আপনি যেতে পারবেন ত ?

হ্যাঁ পারব—এসো না মা বাড়ীর ভেতর।

তরুণীটী উত্তর দিল—আজকে আর নয়, কাল একবার আসব ; বড় রাত্রি হয়ে গেছে।

সুলতা দেবী ভিতরে প্রবেশ করিয়া আশীষকে দেখিয়া বলিলেন—পথে আজ হঠাৎ এদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। আসতে কি দেয়—যেমন মা, তেমনি মেয়ে—কি অমায়িক—ওরাও বেড়াতে এসেছে—কর্ত্তাগিন্নি, আর দুটী ছেলেমেয়ে—ভারী চমৎকার লোক রে ওরা—ওই যে মেয়েটী দেখলি না, ওটী হচ্ছে গিন্নির মেয়ে—বড় সুন্দর মেয়েটি ! কলকাতায় বাড়ী, খুব বড়লোক—মেয়েকে খুব লেখাপড়া শিখিয়েছে। আহা মেয়ে ত নয়, যেন একখানি প্রতিমা ! ছেলেটীকেও দে'খলুম, এই বেড়িয়ে ফিরল—সেটীও বেশ—হ্যাঁ, বংশ ভাল বলতে হয় ত ওদের। মেয়েটির নাম কি বললে ভাল—ওঃ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, জোনাকী।

চমকিয়া আশীষ বলিল, কি বলছ মা ?

সুলতা দেবী বলিলেন, ঐ জোনাকীর কথা বলছিলুম রে ; ভারী ভাল—কাল এলে দেখিস।

সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আশীষ উঠিয়া ভিতরে গেল। কে জানে তাহার হৃদয়-আকাশে যে জোনাকী একদিন অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল,—সেই কি না ?

সেদিন হঠাৎ আশীষ বলিল—এইবার চল মা কল্যাণপুর ফিরি, এখানে থাকতে আর ইচ্ছে করছে না।

পুত্রের ম্লান মুখের প্রতি চাহিয়া সুলতা দেবী কহিলেন, তাই না হয় চল্—তোর জন্ত আমার আসা—তোর ভাল না লাগলে থেকে কি হবে ? কিন্তু তার আগে আমার একটা কথা আছে ; বল্ আশীষ, তোর দুঃখিনী মায়ের কথা তুই রাখবি বাবা ?

বিস্মিত আশীষ বলিল, কি মা, কি কথা ?

অনুযোগপূর্ণ-স্বরে জননী কহিলেন, এবার আমি একলা ছেলে নিয়ে কল্যাণপুর যাব না। তখন আমি বুঝতে পারি নি বাবা, তাই এতখানি হয়েছে ! সে ভুল ভেঙেছে ! এইবার আমি আমার জোনাকী মাকে ঘরে নিয়ে যাব—এই বলিয়া উঠিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া এক নত-মুখী তরুণীর হাত ধরিয়া আনিয়া কহিলেন, যে লক্ষ্মীকে আমি নিজের দোষে হারিয়ে ফেলে-ছিলুম, আজ সেই হারানিধিকে যখন বুকের কাছে পেয়েছি, তখন আর কি ছাড়ি ? তোর কোন কথাই আমি শুনব না। আমার ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে আমি নিজে হাতে প্রতিষ্ঠা করব !

আশীষ উঠিয়া আসিয়া জননীকে প্রণাম করিল। লজ্জায় নতবদনে কোনরূপে জোনাকী নিজেকে সংযত রাখিয়াছিল—যখন সুলতা দেবী চলিয়া গেলেন, তখন সেও চলিয়া যাওয়ার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

আশীষ জোনাকীর হাতখানা 'খপ' করিয়া ধরিয়া কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—আবার তোমায় এমনি করে ফিরে পাব, এ আশা আমার ছিল না জোনাকী !

সঙ্কুচিতা জোনাকী মৃদু হাসিয়া বলিল—আপনি ত আমায় চান নি, তাই এত দেরী হ'ল পেতে—মনের সঙ্গে চাইলে নিশ্চয় আগেই পেতেন

হাসিয়া আশীষ কহিল—চাই নি বই কি ! আমার চাঁদের আলোর দরকার নেই—জোনাকীর আলোই ভাল !

পথ দিয়া তখন কোন রঙীন প্রাণ যুবক গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল—

আজি সব আশা সব থাক্, নীরব হইয়া থাক্,
প্রাণে শুধু মিশে থাক প্রাণ।

সেণ্ট-পার্সেণ্ট

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচী

কুমার বাহাদুরের সান্ধ্য-মজলিস রাত্রি সাড়ে আটটায় জমিয়াছে। বাহিরে বৃষ্টি,—ভিতরে চা ও আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান। আলোচনা চলিতেছিল, বাঙালীর সময়ানুবর্ত্তিতার অভাব, 'ফিল্ম' কোম্পানীর অসাফল্য—ইত্যাদি। হঠাৎ কুমার বাহাদুর বলিলেন—"গল্প বল।"

নিবারণ বলিল—"ছত্রিশ ঘণ্টা সাঁতারে—"

বাধা দিয়া কুমার বাহাদুর বলিলেন—"তোমার সাঁতার থাক্; এই বৃষ্টির ভিতরে সাঁতার অসহ্য। আজ বিরহ-ব্যথা নিবেদনের দিন—প্রেমের গল্প বল। মুকুল, তুমি অবিবাহিত, তুমিই বল।"

মুকুল তখন সবে চায়ের বাটী নিঃশেষ করিয়াছে; বলিল—"বিয়ের সঙ্গে প্রেমের কোন সম্পর্ক নাই; বিয়ে না করেও প্রেম, অর্থাৎ অশান্তি ভোগ নেহাৎ কম করি নাই।—"

"তোমার কি বিশ্বাস বিবাহিত মাত্রেই অশান্তি ভোগ করে?"

মুকুল—"প্রমাণ নলিনী। তার কথা আপনারা সকলেই জানেন?"

কুমার বাহাদুর বলিলেন—"তর্ক থাক্। গল্প বল;—মনে রেখো, গল্পটি সত্য হওয়া চাই—আর সময় আধঘণ্টা; বেশী না হয়। তা হ'লে খিচুড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হ'লে প্রমাণ দিতে হবে।"

গল্প চলিল—"সে আজ পাঁচ-ছ' বছরের কথা। আমি তখন কাশীতে। আফিস দশটা-পাঁচটা। প্রতিদিন বিকেলবেলা দশাশ্বমেধ ঘাটে হাজিরা দিই। বর্ষাকাল। গঙ্গার কাণায় কাণায় জল। চানাচুরওয়ালা কালীতলাতেই 'চানা বানাওয়ে তর - র' হাঁকে। এমনি সময়ে একদিন, সেদিন ছিল দাসের প্রায়োপবেশনে মৃত্যু উপলক্ষে শোক-সভা। সভার পেছনে সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়িয়েছি; পাশেই দেখি, এক তরুণী। অপূর্ব্ব সুন্দরী বললে তর্ক উঠ্‌বে; তবে তার চেয়ে সুন্দরী আমি দেখি নি। কপালে সিঁদুর, কোলে একটি মেয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ 'চারি চক্ষুর মিলন' হ'তেই তরুণী বলল—'এই যে, আপনিও এসেছেন দেখ্‌ছি'—আমি তখন একেবারে—"

নলিনী বলিল—"গল্পটি মিথ্যা।"

—"কেন?"

"দাস তো পাঁচ-ছ'বছর আগে মারা যান নি, এ ত' সেদিনের কথা।"

"—দেশবন্ধু দাসের কথা বলেছি।"

—"তিনি তো প্রায়োপবেশনে মারা যান নি।"

"আমি বলেছি প্রায় উপবেশনে; অর্থাৎ, হঠাৎ,—এটুকু বুঝ্‌তেও তোমার কষ্ট হয়?"

কুমার বাহাদুর বলিলেন—"খুব বেঁচে গেলে! সে যাক্; এখন বল ত' ঐ তরুণীই কি তোমার প্রেমের পাত্রী?"

মুকুল সবিনয়ে জানাইল—"সেই-ই বটে।"

কুমার বাহাদুর সমাজ-সংস্কারক-সুলভ গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন—"হিন্দু সমাজে এসব চলবে না; এক বিবাহিতা স্ত্রী, একটি মেয়ে হয়েছে, তার সঙ্গে—"

মুকুল মিহিস্বরে বলিল—"তার বিয়ে হয় নি। বয়স পনের বছর।"

কুমার বাহাদুর বলিলেন—"সে কি ক'রে হবে? কপালে সিঁদুর, কোলে মেয়ে এসব তবে মিথ্যা?"

মুকুল—"আজ্ঞে না, কোলে ছিল তার ছোট বোন্; তার কপালে ছিল একটি সিঁদুরের টিপ, হয় ত' তাকে চুমু খেতে গিয়ে তরুণীর কপালে সিঁদুর লেগেছে; আমি তো সিঁথের সিঁদুর বলি নি।"

কুমার বাহাদুর—"যাক্, গল্প চলুক।"

গল্প চলিল—"আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'আমাকে চিন্‌লে কি ক'রে?'

"সে বল্‌ল 'বাঃ রে চব্বিশ ঘণ্টাই দেখছি যে।'

"সে আমাকে কি ক'রে যে চব্বিশ ঘণ্টাই দেখ্‌ছে, কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। এই ঘটনার দুই-একদিন পর কি-একটা কাজে ছাদে গিয়ে তার সঙ্গে আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। আমার ম'নসীর সঙ্গে যা' কথাবার্তা হ'ল, তা' আপনাদের শোনবার দরকার নাই—এটুকু জানলেই যথেষ্ট হবে যে, সে আমার প্রতিবাসী এবং বন্ধু রমেশের বোন—নাম রেণুকা। তার সলজ্জ হাসিভরা মুখখানি আমার মর্মে গভীরভাবে অঙ্কিত ক'রে সে নীচে নেমে গেল। তারপর থেকে আমি নিয়মিত এবং অনিয়মিতভাবে রমেশের বাড়ী যেতে লাগলাম। রেণুও সময়ে-অসময়ে আমাদের বাড়ীতে আস্‌তে লাগল। ক্রমে আমাদের বন্ধুত্ব বল, প্রণয় বল, প্রগাঢ় হ'ল।

"বোধ হয় এক বছর পর হবে, একদিন সন্ধ্যায় রেণু বই খাতা নিয়ে এসে হাজির হ'ল—আমাকে না কি তাকে পড়াতে হবে। আমি তো তার সঙ্গে মেশবার একটা উপলক্ষ্য পেয়ে বেঁচে গেলাম। দেখলাম, কয়েকখানা বাংলা বই। শুনলাম, সে ইংরিজি জানে না; শিখ্‌তেও ইচ্ছা নাই। আমি বাংলাই পড়াতে লাগলাম। এই সময়ে সে গানের ইস্কুলেও ভর্ত্তি হ'ল। পড়া শেষ ক'রে যাবার আগে সে রোজই আমায় একখানা গান শুনিয়ে কল্পনালোকে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিত। সে আমার জীবনের এক সুখময় অধ্যায়! সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় অসহ্য আগ্রহে দিনগুলি ক্রমেই ঘোরতর দীর্ঘ হ'তে লাগল। তার অভাবে আমার অস্তিত্ব কল্পনা করা তখন একেবারেই অসম্ভব। সামাজিক এবং অভিভাবকের বাধা এবং বাঁধন আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে বলে বিশ্বাস আর যেই করুক, আমরা তো করিই নি।"

"সেদিন পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না। রেণু এসে বলল—'মুকুল দা', আজ আর পড়ব না। কি সুন্দর রাত্রি! আজ কি আর পড়ায় মন লাগে?—এখন মায়ের সঙ্গে বিশ্বনাথের আরতি দেখ্‌তে যাচ্ছি। ফিরে এসে আজ ছাদে যাব—আপনিও চলুন ছাদে;—আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আস্‌ছি। আপনি ছাদে যাবেন তো?—'

"আমি বললাম—'তুমি যখন বল্‌ছ, তখন যেতেই হবে।'

"রেণু হেসে বলল—'ঠাট্টা নয়, তিন সত্য করুন—যাবেন আমি তিন সত্য করলাম।

"এক ঘণ্টার আগেই বা কিছু পরে আমার প্রবল জ্বর। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কি ক'রে যে রাত কেটে গেল জানি না।"

কুমার বাহাদুর বলিলেন—"সেদিনই তোমার জ্বর হবার অবসর হ'ল? জ্বর বন্ধ কর।"

মুকুল—"আজ্ঞে আমার কাছে কুইনিন নাই।"

কুমার বাহাদুর—"আমি দিচ্ছি।"

মুকুল—"ঘাবড়াবেন না শীঘ্রই সেরে যাবে। শুনুন,—জানি না সেদিন রেণু কতক্ষণ ছাদে অপেক্ষা ক'রেছিল। পরদিন আমার ঘরে সেই এল প্রথম। তারপর সকলেই একবার ক'রে এসে উৎকণ্ঠা প্রকাশ ক'রে গেলেন। আমি যতদিন বিছানায় ছিলাম,—সে ছিল আমার পাশে। সমস্ত দিন এবং রাত আটটা পর্য্যন্ত সে কি সেবা! মনে মনে প্রার্থনা করলাম—'ভগবান এই দুর্ল্লভ নারীকে বইবার ক্ষমতা দাও প্রভু, আশালতা যেন স্নেহলতার মত অকালে শুকিয়ে না যায়!' আচ্ছা,—যদি রেণুকে না পাই? ওঃ!—

'মুকুল দা'!' 'কি রে?' 'বড্ড কষ্ট হচ্ছে?' 'কই—না।' 'আমার কিন্তু বড্ড কষ্ট হচ্ছে।' 'তুমি একটু শোও গিয়ে।' না গো মশাই, সেজন্য নয়।' 'তবে?'"এই 'তবে'র উত্তর সে যা দিয়েছিল; তার

ভাষা আমার মনে নাই। কিন্তু তার ভাব আমার মনে এমন ক'রে এঁকে দিয়েছে যে,—আজও তা মুছে ফেলতে পারি নি! আমার বুকে মুখ লুকিয়ে সে অনেক কথাই বল্‌ল। তার সেই অস্পষ্ট বাণী স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল, একখানা চিঠিতে। লিখেছে—'My Dearest মুকুল দা',সেদিন যা বল্‌তে ভাষা মূক হয়ে গিয়েছিল,—তাই পত্রে মুখর ক'রে তুলবার একটু বৃথা চেষ্টা করছি—আশা করি ক্ষমা করবেন'—"

নলিনী—"তুমি বলেছ যে, সে ইংরিজি জানে না; তবে My Dearest লিখ্‌ল কি করে?"

মুকুল—"পরে শিখেছিল।"

নলিনী—"তুমিও তো বাংলাই পড়াতে, শিখ্‌ল কবে?"

মুকুল—"গানের ইস্কুলে ভর্ত্তির কথা বোধ হয় মনে আছে; তাদের একটা ইংরিজি ক্লাশ ছিল—রেণু তাতেও ভর্ত্তি হয়েছিল।"

নলিনী—"সে কথা তো আগে বল নি!"

মুকুল—"আমার অসুখের সময় জান্‌তে পার্‌লাম,—সে ইংরিজি পড়ছে।"

গল্প চলিল। "সম্ভবতঃ, চিঠির পর থেকেই আমাদের দু'জনের ভাবেরও অন্ত ছিল না—অভিমানেরও অন্ত ছিল না। একদিন দুপুর বেলায় ছাদে গিয়ে দেখি,—রেণু কাপড় কুঁচিয়ে তুল্‌ছে, আমাকে দেখে সে বল্‌ল—'দাদাকে তুমি সব কথা খুলে বল'—তিনি রাজি হবেন'।"

কুমার বাহাদুর বলিলেন—"ক্রমেই যে অচল ক'রে তুল্‌লে হে!"

মুকুল—"আমি তো অচল করি নি—রেণুই তো অচল ক'রেছিল!"

কুমার বাহাদুর—"না হে, ছাদের উপর দুপুর বেলায় রোদে এসব অচল।"

—"আজ্ঞে, এতটা মগ্ন ছিলাম যে, প্রাণও রোদের উত্তাপও যেন সহজ সহনীয় মনে হচ্ছিল; রেণু বল্‌ল—"

কুমার বাহাদুর—"আবার রোদ?"

মুকুল—"আজ্ঞে, সাম্‌লে নিচ্ছি।"

নলিনী—"তা হ'লে বল যে মিথ্যা গল্প?"

মুকুল—"মিথ্যা গল্প?—না হয় আমার কথা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পার; রেণু তো আর মিথ্যা বল্‌বে না? রেণু বল্‌ল—'মুখ চোখ লাল হ'য়ে উঠ্‌ল; চল, নীচে যাই।' দু'জনে নীচে গেলাম। অনেক কথাই হ'ল; কি উপায়ে আমাদের মিলন সহজ হ'তে পারে এই ছিল আলোচ্য বিষয়। কল্পনাকে বাস্তবের বেড়ায় আটকানোর যত প্রকার উপায় থাকতে পারে,—তার প্রত্যেকটিই আলোচনা কর্‌লাম। শেষে কিন্তু তার একটাও কাজে লাগ্‌ল না। সেই কথাই বল্‌ছি। হঠাৎ বদলি হ'লাম এলাহাবাদে। সুখ-শান্তি চিরতরে কাশীতে রেখে যেদিন নূতন বাসায় নূতন সংসার গুছিয়ে নিলাম, সেদিনের মনের অবস্থা প্রকাশ করবার ভাষা নাই;—আর তোমাদেরও সহানুভূতি নাই। কাজেই সে সব বাদ দিয়ে অতি সংক্ষেপেই বল্‌ছি; না হ'লে কুমার বাহাদুরের খিচুড়ি ঠাণ্ডা এবং গিন্নি গরম হবেন।

"পরদিনই রেণুর চিঠি এল। মনে ক'রো না,—যাত্রার দলের রাণীর র‍্যাক্‌টিংভরা চিঠি। অতি সোজা—কিন্তু সেখানা চিঠি। একবার আমাকে দেখ্‌তে চায়। ছুটি পেলাম না। পনের দিন কেটে গেল। পনের দিনে তার আটখানি চিঠি পেয়েছিলাম। সেই আমার সম্বল। সেই ভাষার চিত্র তার নিজের চিত্র হয়ে ফুটে উঠ্‌ত। রোজই শোবার আগে দু'-একবার না পড়ে ঘুমুতে পার্‌তাম না। পনের দিনের পর ডাক্তারবাবুকে দু'টাকা দিয়ে সাতদিনের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়লাম। ডাক্তারবাবু এরূপ আভাষও দিলেন যে, দরকার হ'লে আর দু'টাকা খরচে আরো সাতদিনের জন্য অসুস্থ হ'তে পারেন। আশা হ'ল। ডাক্তারবাবুকে নমস্কার ক'রে

একেবারে কাশীর টিকিট কিন্‌লাম। কাশী গিয়ে যা শুন্‌লাম, তাতে আমার পাগল হওয়ার কথা! কিন্তু পাগল না হওয়াতে আমি এবং আপনারাও আশ্চর্য্য হবেন! শুন্‌লাম,—রেণুর বিয়ে চব্বিশে—কোথায় বাসুদেবপুর, না কালিকাপুর কি একটা গ্রামে। নিভৃতে যখন রেণু বল্‌ল—'আমাদের বিষ খেতে হবে', তখন আমারও এই কথাই মনে হ'ল যে, এ ছাড়া আর উপায় কি?—

"বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়ে আমরা দু'জনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম—বিয়ের আগের দিন আমরা দুজনে একসঙ্গে বিষ খাব।"

* * *

"এলাহাবাদে ফিরে গেলাম। বিয়ের আগের দিন ডাক্তারবাবুকে আবার দু'টাকা দিয়ে অসুস্থ হওয়া গেল। মনে মনে বল্‌লাম—'ডাক্তারবাবু, এবারের অসুখ থেকে আর সেরে উঠ্‌ব না।' শিকোহাবাদ ষ্টেশনে নেমে এক্কা ভাড়া কর্‌লাম। ঘোড়ার চেহারা দেখে আনন্দ হ'ল। বেড়ে ঘোড়াটি! শীগ্‌গির যেতে পারব। এক্কাওয়ালা বেশী পয়সার লোভে হর্ষ পাওয়ার বাড়িয়ে দিলে। শেষে ঠিক্ গোধূলির মোড়ে এসে দিলে এক্কা উল্‌টে! তারপর কি হয়েছিল জানি না। মিথ্যা বল্‌ব না। দু'দিন পর আমার জ্ঞান হ'ল—দেখি, মাড়োয়ারী হাসপাতালে শুয়ে আছি। বড় দুর্ব্বল। মনে মনে বল্‌লাম—'বিশ্বনাথ, তুমিই তো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করালে!—আমাদের যে একসঙ্গে বিষ খাওয়ার কথা প্রভু!' প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়াতে মনের অবস্থাও ভাল ছিল না—কাজেই শরীর সারতেও তিন মাস। তবে এবার আর ডাক্তারবাবুকে টাকা দিতে হয় নি। আমার দাড়িতে যে কাটার দাগ আছে, এটা সেই দুর্ঘটনার ফল।"

নলিনী—"বাঃ রে, সেবার যে মনোমোহনবাবু তোমার ফোড়া অপারেশন ক'রেছিলেন;—এত সেই দাগ!"

মুকুল—"তুমি তো বড় তার্কিক। সে হ'ল ইউ, পিতে, আর এ হ'ল উড়িষ্যায়;—দুই-ই এক হ'ল? মনোমোহনবাবু তো আছেন—ইউ, পি আর উড়িষ্যা এক কি না তাঁকে জিজ্ঞেস কর্‌লেই বুঝতে পারবে; আমি আর বকে মরি কেন? তারপর শোন—বিষ খাওয়া আর হ'ল না। তিনমাস পর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলাহাবাদ চলে গেলাম। কয়েক বছর পর যখন আবার রেণুর সঙ্গে দেখা হ'ল, তখন তার একটি ছেলে হয়েছে। বল্‌লাম—'কেমন আছ?' সে বল্‌লে—'বেশ।' সেই দেখাই আমাদের শেষ-দেখা!—তারপর আর দেখা হয় নাই।"

কুমার বাহাদুর—"গল্পের সত্যতা প্রমাণের জন্য তোমার সেই আটখানা চিঠি চাই।"

মুকুল—"সে চিঠি তো আমার কাছে নাই। শেষবার যখন রেণুর সঙ্গে দেখা করি, তখন আটখানা চিঠিই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। বিশ্বাস না হয়, আমার বাসা খুঁজে দেখ্‌তে পারেন। ফিরিয়ে না দিলে তো আমার কাছে থাক্‌বার কথা?"

কুমার বাহাদুর—"অন্য কোন প্রমাণ আছে?"

"আছে—তার দেওয়া একখানা বই।"

"তাতে তার হাতের লেখা কিছু আছে?"

মুকুল—"আজ্ঞে, ছিল। উপহারের পৃষ্ঠায় লেখা ছিল,—'আমার প্রিয়তমের চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য—রেণুকা।' কিন্তু আমার চাকর সেই পাতাখানাই ছিঁড়ে লণ্ঠনের কাঁচ পরিষ্কার ক'রেছিল বলে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। চাকরকে তাড়ানো আপনারা তো সকলেই জানেন?"

কুমার বাহাদুর—"শেষবার যখন তার সঙ্গে তোমার দেখা হ'ল, তখন তোমাদের কথাবার্ত্তা নিশ্চয়ই অনেক বেশী হয়েছিল—কিন্তু তুমি সে সব মোটেই প্রকাশ কর নি।"

মুকুল—"সময় পেলাম কোথায়? এই দেখুন, আধঘণ্টা হয়ে গিয়েছে। আজ তবে উঠি।"

"কই হে, এ যে মাত্র পঁচিশ মিনিট।"

মুকুল—"আমার ঘড়িতে ঠিক্ আধঘণ্টা। আমার পারশোন্যাল টাইম। পারতান্ত্রিক হওয়া আমি অপছন্দ করি। আচ্ছা, কাল আর একটা সত্য ঘটনা বল্‌ব। আজ আসি। নমস্কার

বিধাতার আল্‌পনা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণকিশোরবাবুর বাড়ীর নিজস্ব বলিয়া পাওয়া ঘরখানির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে কল্যাণ বেশ-একটু চকিত, এবং না-চাওয়া জিনিষগুলা এভাবে আসিয়া পড়ায় বিশেষ একটু ক্ষুব্ধ হইল। মুহূর্ত্ত-কালও সে ঘরখানির স্নিগ্ধ মধুর আহ্বান কাণে তোলা বিপজ্জনক ভাবিয়া ত্বরিৎপদে সে সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিল। চিত্রা খাবারের রেকাব হাতে ঠিক সেই সময় ঐদিকে আসিতেছিল, তাহার এ চঞ্চলতায় ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কি হ'ল কল্যাণবাবু, যাচ্ছেন কোথায় ?"

কল্যাণ বেশ একটু রুক্ষস্বরে বলিল, "আমাকে এভাবে অপমান না ক'রে সোজা মুখে বললেই পারতেন।"

চিত্রা প্রথমটা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল; তারপর মৃদু হাসিয়া বলিল, "আসল ব্যাপারটা গোপন রেখে কেবল অভিযোগ নিয়েই যদি চলেন, তবে ব্যথার তথ্য বোঝা পরের পক্ষে কিছু কঠিন হয়ে দাঁড়াবে না কি ? হয়েছে কি; কেউ কি কিছু বলেছে ?"

তাহার সরল ব্যথাভরা মুখখানির দিকে চাহিয়া কল্যাণ প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল; কিন্তু তা' মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণেই গম্ভীরমুখে বলিল, "বললে ত বাঁচতুম, এ তারও বাড়া; আচ্ছা, আমার ঘর কি আর কাউকে ছেড়ে দেবার······"

চিত্রা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল "রক্ষে পাই! ঘর আপনার, আপনারই আছে। তবে থাকতে গেলে দরকার মত দু'-একটা জিনিষ তাতে রাখ-তেই হয়। তাই······"

কল্যাণ বলিল, "দরকার কার, আমার না আপনাদের ?"

চিত্রা বলিল, "ধরুন আমাদেরই। এ সংসারে বিনা স্বার্থে কি কেউ পথ চলে ? আমাদের উদ্দেশ্য আপনাকে খাটিয়ে নেওয়া; কাজেই হাতের কাছে যে সমস্ত জিনিষগুলো পেলে মন লাগবে বা দরকারমত কোন কিছুর জন্যে অনর্থক ছুটো-ছুটি করে খুব খানিকটা সময় নষ্ট করতে হবে না, তাই আপনার ঘরে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিলকে তাল করে দেখবার অদ্ভুত শক্তি আছে বটে আপনার।"

তার চাপা হাসি সহ্য করিতে না পারিয়া কল্যাণ ফিরিয়া ঘরের দিকে গেল। চিত্রা পিছনে আসিয়া রেকাবখানি গোল মারবেল টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিল, "আজ এলুম কোথায় নতুন একটা জিনিষ দিয়ে আশ্চর্য্য করে দিতে, আপনি কিন্তু প্রথম মুখপাতেই রসভঙ্গ করে দিলেন। এটা কিন্তু ভারি অন্যায়!"

কথাগুলা গম্ভীরভাবে বলিলেও, শেষে সে হাসিয়া ফেলিল।

নির্ব্বাক কল্যাণ 'গুম' হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চিত্রা বলিল, "তা ভাল; আমাদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আপনিই করছেন। আচ্ছা, সংযমে ধারণা বৃদ্ধি পায় শুনেছি; রাগ-টাগগুলাও কি কমে ?"

কল্যাণ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল; বলিল, "আমি খাচ্ছি চিত্রা দেবী; কিন্তু রোজ রোজ এভাবে কষ্ট কেন যে পান······চাকর-দাসী অনেকেই ত আছে, তাদের হাত দিয়ে পাঠালে নিশ্চয় আমার মানহানি হ'ত না।"

চিত্রা হাসিয়া বলিল, "ও সব হানাহানির জন্যে আমার মাথা ঘামাবার সাধ নেই কল্যাণবাবু; তার চেয়ে বলুন ত নতুন জিনিষটা আমি কি এনেছি ? আপনাকে বলতেই হবে।"

কল্যাণ ধীর মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'আমায় মাপ করুন

চিত্রা কিন্তু ছাড়িল না; স্ত্রীজাতি-সুলভ চঞ্চল আগ্রহে সে কল্যাণকে নিজের আনীত জিনিষটা আবিষ্কার করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল

দু'-একটা সম্ভবমত দ্রব্যের নাম বলিয়া কেবল হাসির উৎস বাড়িয়াই চলিতেছে দেখিয়া কল্যাণ বলিল, "নিশ্চয় জিনিষটা এমন কিছু হবে, যা সচরাচর পাওয়া যায় না। কাজেই কল্পনার ঠকে আমার নিন্দে নেই।"

চিত্রা হাসিয়া বলিল, "নেই বই কি, খুব আছে। পুরুষ হয়ে—"

বাহির হইতে কে ডাকিল, "চিত্রা।"

হঠাৎ চিত্রার মুখখানি বাদল আকাশের মতই থমথমে ভাব ধারণ করিল। সে তাড়াতাড়ি সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। বাহিরে আসিতেই একটি ছিপছিপে চেহারার সৌখীন যুবক তাহার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কাল আমাদের ওখানে যেতে হবে চিত্রা, মা বলে পাঠিয়েছেন। নিজেই আসতেন......"

তার শেষের দিকের কথায় কাণ না দিয়া চিত্রা বলিল, "কিন্তু, আমি ত যেতে পারব না সুধীনবাবু।"

সুধীন গম্ভীর হইয়া গেল। খানিকটা স্থির নেত্রে চিত্রার দিকে চাহিয়া রহিল; তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "আগে কিন্তু তা পারতে; এখন না পারার কারণটা জানতে পারলে সুবিধা হ'ত।

চিত্রার অন্তরে একটা ঝড় বহিয়া গেল। অতীত দিনের একটা স্মৃতি মনের কোণে বুঝি মাথা তুলিয়া তার সব কিছু ওলট্ পালট্ করিয়া দিল। সত্যই একদিন ছিল, যেদিন এই সুধীন অনেক কিছুর অধিকার পাইবার দাবী লইয়াই অগ্রসর হইয়াছিল। সেও মন-প্রাণঢালা সেবা-ভক্তির মধ্য দিয়া তা বরণ করিয়া লইতে কিছু মাত্র পশ্চাৎপদ ছিল না। কিন্তু আজ···হঠাৎ তাহার এ অনাসক্তির কারণ নিজেই সে অনুভব করিতে পারিল না; তাই তাড়াতাড়ি মুখ তুলিয়া বলিল, "আচ্ছা আমি যাব।"

সুধীনের মুখখানি অপূর্ব্ব দীপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে বাহির হইয়া যাইতেছিল, চিত্রা বলিল, "বা রে, চলে যাচ্ছেন যে চা-টা না খেয়ে! আপনার যাওয়া হবে না।"

অনেকক্ষণ পরে চুপিচুপি কল্যাণের ঘরের দিকে আসিয়া চিত্রা উঁকি মারিয়া দেখিল, এক গাদা কাগজ-পত্রের মধ্যে অতিথিটী নির্ব্বিশেষে ডুবিয়া আছে। চঞ্চল চরণে নিকটে আসিয়া বলিল "কি মানুষ, রাত কত হ'ল হিসেব আছে? ওসব ছাড়ুন; এখন বিশ্রামের সময়, বিশ্রাম দরকার।"

কল্যাণ মুখ তুলিয়া বলিল, "কিন্তু আমি সেটা ঠিক্ বুঝে উঠতে পারি নি। সময় যদি হ'ত তা হ'লে বিশ্রাম আপনিও করতেন?"

হঠাৎ চিত্রার মুখ-চোখ লাল হইয়া গেল: সে তাড়াতাড়ি বলিল, "না, সে জন্যে নয়, একটা কথা বলবার ছিল, হঠাৎ মনে হ'ল, আপনি জেগে আছেন কি না দেখি।"

কল্যাণ গম্ভীরমুখে বলিল, "কথাটা কি?"

চঞ্চল নয়নে চারিদিক একবার চাহিয়া লইয়া চিত্রা বলিল—"কেউ আপনাকে নেমন্তন্ন-টন্ন করতে এলে···"

চকিত নেত্রে চাহিয়া কল্যাণ বলিল—"সুধীন বাবুর কথা বলছেন? তিনি আমার কাছে এসে ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁকে বলে দিয়েছি, আমার ধাতে সইবে না।"

চিত্রা যেন আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "বেশ বলে ছেন, আমিও যাব না; ওসব মিছে গোলমালে জড়ান আমার ভালই লাগে না। তার চেয়ে এক কাজ করা যাবে, আপনাতে আমাতে জু গার্ডেনটা ঘুরে আসা যাবে। জীবজন্তুগুলোর পিক্‌নিক্; সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও বনভোজন। মনে থাকে যেন।"

কথাটা শেষ করিয়া সে পরম পরিতৃপ্তির সহিত সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। আগাগোড়া ঘটনাটা তলাইয়া বুঝিতে না পারিয়া কল্যাণ 'হাঁ' করিয়া কেবল তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল। [ক্রমশঃ



অর্চ্চনা

শিল্পী শ্রীচারু সেন



সম্পাদক—শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ষষ্ঠ বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৩৭ | ষষ্ঠ সংখ্যা

ইব্রাহিমের গদি-দখল

ডাঃ রায় শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর,
বি-এ, ডি-লিট্‌

(এক)

সে প্রায় এক শত বৎসরের কথা; সদর আদালত লোকে লোকারণ্য। সেখ ইব্রাহিমের ফাঁসির হুকুম হইয়া গেল।

ইব্রাহিম ছোটবেলায় বড় আদুরে ছেলে ছিল। মা-বাপের এক ছেলে, আটটি মেয়ের মধ্যে। পিতা ইস্মাইল খুব সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ—এই সংসারে ইব্রাহিম আসিয়াই যেন রাজচক্রবর্ত্তীর সিংহাসন দখল করিয়া লইল।

রাজগঞ্জ গ্রামটা ছিল একটা বিলের ধারে; বিলে মাছ যেরূপ সুপ্রচুর ছিল, কুমীরও তার চাইতে কম ছিল না—এবং শত শত পদ্মফুল ফুটিয়া ভাদ্রমাসে বিলটা যেরূপ সুন্দর দেখাইত, তাহাতে মনে হইত, ঐ বিলের পাড়ের লোকেরা স্বর্গবাসী।

পাঁচ বৎসরের ইব্রাহিম বায়না ধরিল, "ঐই বিলের মাঝখানের পদ্মগুলি বেশ বড় বড়; যে দু'টা খুব বড়, হাওয়ায় দুল্‌ছে,—সেই দু'টাকে আমি চাই।"

হানিফ্‌ বলিল, "আজ ঘাটের সব নৌকা নিয়ে বড় মিঞা ব্যাপার কর্‌তে গেছেন। বিলের জলে কুমীরের ভয়ে কেউ নামে না। ছোটমিঞা একটু সবুর কর,—যে নৌকা লবার আগে আসবে,—তা'তে চড়ে আমি পদ্ম দু'টা এনে দেব।"

সে কথা কে শুনে ? ইব্রাহিম হানিফের পিঠ কামড়াইয়া রক্তারক্তি করিয়া দিল। "দে এখুনি এনে দে, না দিলে বাবাজানকে বলে তোকে আমি এমনই মার খাওয়াব যে, তোর মাথার খুলিটা ভেঙ্গে যাবে।"

এই বলিয়া বালক এরূপ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল যে, অন্দরবাড়ী হইতে তাহার মাতা জুবেদা শুনিতে পাইয়া হানিফকে বকুনি দিতে লাগিলেন, "বেটা একটা করে মুরগীর ছালুন এক এক বেলায় খায়, বাড়ীর হেপাজতের ভার ওর উপরে, এই তো পালোয়ান! আমার একটুখানি ছুলাল, বিল থেকে দু'টি পদ্ম আনতে বলেছে, তা' ওকে কুকুর ভয়ে পেয়ে বসেছে। আসুন খাঁ সাহেব, হাড় ভেঙ্গে ফেল্‌বেন না।"

বেচারী কি করিবে ? প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়া বিলে নামিয়া পড়িল। মাঝখানে পৌছিয়া একহাতে পদ্ম-নালটা ধরিয়া যখন টান মারিবে, তখন জলের মধ্য হইতে কে তাহাকে আর এক দিক্ হইতে টান মারিল, তাহার হাতের পদ্ম-নালটা একবার উঠিয়া ডুবিয়া গেল ; দু'টি চক্ষু হতাশভাবে ঊর্দ্ধে উঠিল, তারপর দাড়ি-গোঁপশুদ্ধ সমস্ত মাথাটা একবারে তলাইয়া গেল—আর কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না।

ইস্‌মাইল খাঁ বাড়ী আসিয়া সমস্ত ব্যাপার শুনিলেন। হানিফের এইভাবে মৃত্যু অপেক্ষা ছোট মিঞা পদ্মফুল না পাইয়া এখনও যে আবদার করিতেছে, তাহাই খাঁ-সাহেবের মনে কষ্ট দিল খুব বেশী। "বেটা যদি পদ্ম দু'টা তুলে দেওয়ার পরে মরত, তবে ইবু এমন ক'রে কেঁদে ছট্‌ফট্ করত না।" খাঁ-সাহেবের দয়ার শরীর ; হানিফের স্ত্রী আসিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিল, তাহাকে তিনি কিছু টাকা দিয়া সান্ত্বনা দিলেন। আবার ছেলের জন্ত দরদ খুব বেশী ; তাই তিন চারটা মজুর লাগাইয়া নৌকাযোগে অনেকগুলি পদ্মফুল আনিয়া ঘরের আঙ্গিনা ভর্ত্তি করিয়া ফেলিলেন।

দশ বৎসর বয়সে ইব্রাহিম এক মোক্তাবে পড়িতে গেল—একদিন মৌলভী-সাহেব তাহার কাণ মলিয়া দেওয়াতে সে কান্নাকাটি করিয়া এরূপ গোলমাল উপস্থিত করিয়াছিল যে, ইস-মাইল সেখ ক্রোধে গ্রাম হইতে মোক্তাবটি তুলিয়া দিতে বসিয়াছিলেন ; ভয় পাইয়া মৌলভী-সাহেবের চোখ দু'টি ছানাবড়ার মত হইয়া গিয়াছিল—তদবধি ইব্রাহিমকে মোক্তাবের চাপরাসী হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই সমীহ করিয়া চলিত। সে ইচ্ছা সুখে সমপাঠীদের উপর মারধোর চালাইত—এবং মেধাবী হইয়াও কেতাবের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখিত না—তথাপি সে পরীক্ষায় সকলের উপরে হইত এবং পুরস্কার পাইত। সহপাঠী ছাত্রেরা সে কারণ মৌলভীর নামে যা' তা' বলিয়া বেড়াইত ; এজন্ত একটি ছাত্রকে ইবু জুতা পেটা করিল। মৌলভী সেই আহত ছাত্রটির নালিশে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না—বরঞ্চ ইব্রাহিমের হাত হইতে জুতার কাদা নিজ রুমাল দিয়া মুছিয়া দিতে লাগিলেন- এবং বলিলেন, "এত জোরে কি মারতে হয়, তোমারই যে হাতে লাগ্‌বে!"

ইসমাইলের ভয়ে শত অত্যাচার সহিয়াও সহ-পাঠীরা ত বটেই, অভিভাবকেরাও মুখ খুলিতে সাহস পাইতেন না। ইবু মিঞা একটা ভয়ানক দুর্দ্দান্ত কুকুর রাখিয়াছিল ; কুকুরটা সে যার তার দিকে লেলাইয়া দিত এবং সেটাও নিরীহ পথিক-দের পায়ে ও হাঁটুর নীচে কামড়াইয়া রক্তারক্তি করিয়া দিত। তাহারা কুকুরকে শাসন করিবার জন্ত চীৎকার করিয়া অনুরোধ করিতে থাকিত, এদিকে ইবু তাহাদের দিকে চাহিয়া দাঁতগুলি বাহির করিয়া খিলখিল করিয়া হাসিত। ইস্-মাইলের নিকট নালিশ হইত। তিনি গুড়ুক খাইতে খাইতে ঈষৎ হাসিমুখে বলিতেন, "ভয় কি ? দাওয়াইখানার গিয়ে আমার নাম ক'রে

দাওয়াই মেগে নাও গে। ও বড় নিরীহ কুকুর—ইবু মিঞার সখের জিনিষ, ওর কামড়ে কিছু খারাপ ফল হবে না।"

ইস্‌মাইল বিরক্ত হইয়া একদিন মাত্র বলিয়াছিলেন, "ইবু বাবাজান, কুকুরটাকে কাউকে বরঞ্চ দিয়ে ফেল।" শুনিবামাত্র ইবু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তার মাতা নুরন্নেছা সুর সপ্তমে চড়াইয়া বুড়া সেখকে আচ্ছা আচ্ছা বাত শুনাইয়া দিতে লাগিলেন, "সাত নয়, পাঁচ নয়, অন্ধের নড়ি, একটুখানি ছেলে সখ ক'রে একটা কুকুর রেখেছে, চোখ-খাকী চোখখেকোদের তাও সহ্য হয় না; এ ছুতো ও ছুতো ক'রে রাতদিন নালিশ। আর বুড়কালে তোমার কি ভীমরথী হয়েছে,—যে যা বল্‌বে, তাই শুন্‌তে হবে। আমি বাছার চোখের জল সহ্য কর্‌তে পারি না। কুকুরকে বিদায় করার আগে আমাকে ও ছেলেকে বিদায় ক'রে দাও, সাফ্‌ বলে দিলাম।"

তারপরে ফোঁসফোঁসানি ও চোখের জলের পালা। গিন্নীর এই সকল সকরুণ বিলাপে ইস্‌মাইলের মনে অনুশোচনা উপস্থিত হইল; কুকুর ত রহিলই, অধিকন্তু তিনি স্ত্রীর কাছে ঘাট স্বীকার করিলেন।

এই ক্ষুদ্র নবাবটি কালে বড় হইলে তাহার পিতামাতার কাল হইল। মস্ত বড় খামার, জমিদারীর আয়ও কম নহে। অনেকগুলি ব্যাপারী নৌকা, ধান-চালের মস্ত বড় ব্যবসা, কাজেই কর্ম্মচারী লোকজনের সংখ্যা কম নহে। এই সকল লোকজন ইবু মিঞার ভয়ে অস্থির—পাণ হইতে চুণ খসিলেই মিঞা রাগিয়া মারধোর ও গালিগালাজ ক'তে। তা' ছাড়া ভয় দেখান, বকুনি এ সকল ছিল তার নিত্য কর্ম্ম।

এদিকে তাহার ব্যবসা-বাণিজ্যে মাথা বেশ ছিল; হিসাব-নিকাশে ক্ষুরধার বুদ্ধি।—কিন্তু যাহা করিবে, তাহা করিবেই। নিজে যাহা বুঝে, তার উপর পীর পয়গম্বরেরও কথা বলিবার সাধ্য নাই। একগুঁয়ের একশেষ, অত্যাচারে নবাব খাঞ্জা খাঁ।

(দুই)

একদিন সেই গ্রামে একটা সভা হইয়াছে। বিদেশ হইতে একটি বৃদ্ধ মোল্লা আসিয়াছেন, তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনার জন্য সেই সভার আয়োজন শত শত মুসলমান তথায় একত্র হইয়াছেন; মোল্লা তাঁহার দাড়িবহুল মুখ নাড়িয়া বলিতেছেন, "সচ্চরিত্র লোক সমাজের ভূষণ, দয়ার তুল্য গুণ নাই; যে ব্যক্তি মুখে কোরাণ সরিফের ও হদিসের বয়েৎ আওড়ায়, অথচ দুর্ব্বলকে পীড়ন করে, পবিত্র মনুষ্যদেহের অসম্মান করে,—তার জন্য দুজ্‌ক।" এই ভাবের আরও যে সকল কথা তিনি বলিলেন, তাহাতে ইব্রাহিমের স্পষ্ট মনে হইল, মোল্লা-সাহেবের লক্ষ্য সে নিজে।

এই ধারণার মধ্যে কিছু সত্য যে না ছিল তাহা নহে। মোল্লা-সাহেব তার পূর্ব্ব খ্যাতে ইব্রাহিমের কীর্ত্তি-কলাপ সকলই শুনিয়াছিলেন। তথাকার লোকেরা ইবু মিঞার ভয়ে কিছু বলিতে পারিত না, কিন্তু তাঁহারা বৃদ্ধ মোল্লাকে পাইয়া সেদিন মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছিল। মোল্লার বক্তৃতায় তাহার কতকটা ঝাঁজ ছিল। স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অসহিষ্ণুচিত্ত ইব্রাহিমের মনে বক্তৃতার প্রত্যেক কথা একটা প্রদাহ উপস্থিত করিতেছিল; তাহার মাথা হইতে পায়ের তলা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিতেছিল। তাহার বক্ষে কারুখচিত কুর্ত্তার একদিকে ছোট একখানি কৃপাণ থাকিত। সহসা সেই কৃপাণ হাতে লইয়া বুড়া মোল্লার দিকে সে অগ্রসর হইল; "করেন কি? সর্ব্বনাশ! করেন কি?" বলিতে বলিতে বিপুল জনতা তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই ইব্রাহিমের কৃপাণ মোল্লার বক্ষ ভেদ করিয়া ফেলিল।

চক্ষুকোণ হইতে অশ্রু পড়িবার পূর্ব্বেই শ্বেত শ্মশ্রু-রাজি বহিয়া সন্ধ্যা-মালতীর রঙের ন্যায় রক্তস্রোত নিঃসৃত হইল। "হায় আল্লা!" বলিতে বলিতে মোল্লার মৃত দেহ মাটিতে পড়িয়া গেল।

বিচারে ইব্রাহিমের ফাঁসির হুকুম হইয়াছে—কোন সাক্ষীর অভাব হয় নাই, সকলেই সত্য বলিয়াছে। ইব্রাহিম বলিয়াছে, "হঠাৎ ক্রোধান্ধ হইয়া আমি এইরূপ করিয়াছি।" তাহার পক্ষের ব্যারিষ্টার বলিলেন, "হঠাৎ উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া একটা কাজ করিয়া বসিয়াছে; কোন মৎলব অভিসন্ধি বা হিংসার ফলে এ হত্যা সে করে নাই; সুতরাং তাহার প্রতি দণ্ড যথাসম্ভব কম হউক।" এই কথার উপর জোর দিয়া তিনি অনেক তর্কও তুলিয়াছিলেন, কিন্তু সাক্ষীরা যখন ইব্রাহিমের জীবনের পূর্ব্বাপর ইতিহাস বলিতে লাগিল,তখন হাকিমদের তাহার উপর দয়ার লেশ রহিল না। ঈদৃশ দানব প্রবৃত্তির লোক জীবনে যে আরও কত কি করিতে পারে,—তাহার শেষ নাই। তাহার জীবন সমাজের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর—এই যুক্তিদ্বারা বিচারকেরা দয়ার দাবী উড়াইয়া দিলেন।

ফাঁসি হইয়া গেল। তখনকার আমলে ফাঁসির পরে পায়ের শির কাটিয়া দেওয়া হইত না। জল্লাদ বুঝিতে পারিল,—ইব্রাহিম মরে নাই। জল্লাদই হউক বা কশাই হউক, তাহারা ত মানুষ; মানুষের প্রাণ তাহাদেরও আছে। জল্লাদের যত্নে ইব্রাহিম প্রাণ পাইল। সে বলিল, "খোদাতালার মেহেরবানি তোমার উপর পুরোপূরী—নইলে ফাঁসির মড়া প্রাণ পায়, এতো আমি দশ বৎসর এই কাজ করছি, দেখি নি। যা'হোক্ তুমি যখন প্রাণ পেয়েছ,—তখন এখানে আর তিলার্দ্ধও থেকো না; আমার এখানে নাস্তা করে যে দিকে চোখ যায়, চলে যাও। যদি ঘুণাক্ষরে কেউ টের পায়, তবে তোমাকে পুলিসে ধরবে ও আবার ফাঁসি দেবে; তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি বলে আমিও রেহাই পাব না।"

ইব্রাহিমের গায়ে খুব জোর ছিল; একরাত্রির বিশ্রামে সে বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল। ভাল করিয়া খাওয়া-দাওয়া করিয়া শেষ রাত্রে যখন শুক-তারা নিবু-নিবু, চন্দ্রের ক্ষীণ রেখা বিলীন প্রায়—তখন সে বাহির হইয়া পড়িল।

বহু কষ্টে তিনি দিন তিন রাত্রের পর সে এলাহাবাদে উপস্থিত হইল। বেশ বড় সহর। সে ভিক্ষা করিয়া, দিন মজুরী করিয়া খাইতে লাগিল।

পাঁচ-সাতমাস পরে সে একটা সাধারণের হাসপাতালে দারোয়ানের কাজ যোগাড় করিয়া লইল।

(তিন)

অমনই একরূপ দিন যাইতেছে। যে 'ছোট সাহেবে'র কাছে লোক ঘেঁষিতে সাহস পাইত না, যাহার অনুগ্রহে-নিগ্রহে লোক বাঁচিত, মরিত, সে যাহার দিকে হাসিয়া কথা বলিত, সে কৃতার্থ হইত, যাহার রাগে বনের বাঘ কাঁপিত,—আজ সে 'দারোয়ান!' এক-একবার তাহার মনে হইত, ফাঁসিকাঠে মরিয়া গেলেই ভাল হইত। ডাক্তার-বাবুদের সেলাম করিয়া তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত, তাঁহাদের চিঠি পত্র লইয়া এদিক-সেদিকে ছুটাছুটি করিতে হইত। আর আর দারোয়ানেরা যখন তাহার গায় হাত দিয়া কথা বলিত, তখন বিচুটি গায়ে লাগিলে যেরূপ জ্বালা উপস্থিত হয়, তাহার সেইরূপ হইত।

এই নিয়তি! জল্লাদ বলিয়াছিল, 'তাহার মত ভাগ্যবান কে? যমের হাত হইতে ভাগ্য তাহাকে বাঁচাইয়া দিয়াছে।" বাঁচাইয়া দিয়াছে সত্য, কিন্তু একবারে নরকে ফেলিয়াছে। ইহা হইতে মৃত্যুও যে ভাল ছিল।

ছুলা মিঞা তাহার অপেক্ষা বয়সে ছোট,—

তাহার সঙ্গেই সেই হাসপাতালে কাজ করে। সে দেখিতে ভাল, চুলগুলি কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো,—দেখিলে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। ইব্রাহিম এই ছেলেটিকে একটু ভালবাসার চোখে দেখিয়াছিল। অনেক সময় দেখা যাইত, দুইজনে মুখোমুখী হইয়া গল্প করিতেছে।

দুলা একদিন বলিল, "লোকে ভাই তোমার বড্ড নিন্দা করে, তুমি নাকি ভয়ানক গোঁয়ার ও অহংকারী।" নিজের দোষের কথা ইব্রাহিমের কোনদিনই শুনিতে ভাল লাগে নাই, সে চক্ষুরাঙ্গা করিয়া বলিল, "কে তোকে বলেছে ?"

ছোট একটি নির্ঝরের মত দুলা মিঞার মুখের কথা ছুটিয়া চলিল, "আবার কে ? জগন্নাথ সিংটা তোমায় দুচক্ষে দেখ্‌তে পারে না ; একদিন বড় ডাক্তারের কাছে বল্‌লে, 'হুজুর, এ লোকটাকে তাড়িয়ে দিন। বেটার দেমাক্ কি, আপনারা কোথায় যেতে বল্‌লে কেবলই গজর গজর করে ; জরুরী কাজ—আমরা তো হুকুম পেলেই অম্‌নি তাড়াহুড়া করে ছুটে যাই। আর ইব্রাহিম ঘরে গিয়ে জামা সাফ্ কর্‌তে বসে ; দু'ছিলিম তামাক খায়—তা' আমরা যে তামাক খাই সে তামাক নয়, বেশী দাম দিয়ে অম্বুরী তামাক কিনে আনে ; সেই তামাক খেয়ে চক্ষু বুজে আধঘণ্টা বসে বসে কি ভাবে, তারপর টুপি পরে এমনই ভাবে চল্‌তে থাকে, যেন আপনাকে কত মেহেরবাণী কর্‌তে চলেছে।' আমি বল্লুম, 'হুজুর, এই জগন্নাথ সিংটা ইব্রাহিমকে দেখ্‌তে পারে না—এই কি খুব ভাললোক ?' আর যায় কোথা, বাঘের মত লাফিয়ে লোকটা আমার ওপর পড়্‌ল ; ভাগ্যিস ডাক্তারবাবু ধমক দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিলেন, নইলে হয়ত আমাকে মেরেই ফেল্‌ত। কই, তুমি এসব শুনে তো কিছু বল্‌ছ না ?"

ইব্রাহিম মাথা হেঁট করিয়া শুধু বলিল, 'হুঁ।'

দুলু তাহার চোখ দেখিতে পায় নাই ; সে মুখ মাটীর দিকে নিচু করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার চক্ষু দু'টি হিংস্র ব্যাঘ্রের মত জ্বলিতেছিল।

এই সময় জগন্নাথ সিং সেই পথ দিয়া যাইতেছিল—তাহাকে দেখিয়া ইব্রাহিম উঠিয়া দাঁড়াইল—সহসা বাঘের আওয়াজের মত হুঙ্কার দিয়া সে বলিল, "ঐ সিং ইধার আও।" জগন্নাথ এরূপ আহ্বানে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার নিকটে আসিয়া বলিল, "ইধার আও—লবাব আর কি, ইধার আও, খবরদার, তোর নোকর নই যে যা' তা' বল্‌বি, আমার কাছে দেমাক্ চল্‌বে না।

ইব্রাহিম বলিল, "হুঁ।"

জগন্নাথ বলিল, "বেটা গাঁজাখোর, চোখ লাল করে এসেছিস্—হাসপাতালে মেমসাহেবরা আসেন, গেঁজেলের জায়গা নয়।"

অন্যমনস্কভাবে ইব্রাহিম আবার হুঁ বলিয়া জগন্নাথের মুখের দিকে চাহিল। "বেইমান, গাঁজাখোর" বলিতে বলিতে জগন্নাথ ফিরিয়া যাইতেছিল—আর কথাবার্ত্তা নাই, ইব্রাহিম বজ্রমুষ্টিতে জগন্নাথের হাত হইতে লাঠিটা কাড়িয়া লইয়া সজোরে তাহার মাথায় বসাইয়া দিল। আঘাতের তীব্রতায় জগন্নাথের মাথার খুলিটা ভাঙ্গিয়া রক্ত ও ঘি বাহির হইয়া পড়িল। চারিদিক হইতে লোকজন আসিয়া ইব্রাহিমকে ধরিয়া ফেলিল।

(চার)

আবার আদালতে প্রকাণ্ড ভিড়। দুই হাত শিকলে বদ্ধ ইব্রাহিমকে পুলিস ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এবার সে বুঝিয়াছে,—এরূপ জীবনের কোন প্রয়োজন নাই—সে আর দারোয়ান, খানসামা হইয়া প্রাণ ধারণ করিতে চাহে না। সে মোকদ্দমার গতি যেরূপ বুঝিল,তাহাতে তাহার মনে হইল, 'হঠাৎ উত্তেজনা' বলিয়া হয় ত সে কাট-দশ

বৎসরের জন্য জেলে যাইতে পারে, হয় ত মেহের-বাণী করিয়া হাকিমেরা তাহার প্রাণদণ্ড নাও করিতে পারেন—বড় ডাক্তার যেরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহাতে হাকিমদের মন কতকটা অনুকূল হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "জগন্নাথ মিছামিছি নানালোকের কাছে এর নিন্দা করত। এমন কি একদিন আমাকে পর্য্যন্ত বলেছিল, ইব্রাহিমকে তাড়িয়ে দিতে। বিশেষতঃ, ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্বে জগন্নাথ ওকে অশিষ্ট ভাষায় গালাগালি দিয়েছিল।"

হাকিমদের মন অনেকটা দয়ার্দ্র হইয়া আসিল। ইব্রাহিমের কিন্তু কুকুর বিড়াল হইয়া বাঁচিবার ইচ্ছা মোটেই নাই; ডাক্তার-বাবুর প্রতি সে একবার কৃতজ্ঞ-নেত্রে চাহিল, পিতামাতার কথা মনে পড়িয়া চোখে এক বিন্দু জল আসিতেছিল, সে তাহা কষ্টে সম্বরণ করিয়া বলিল, "হুজুর, আমি কে, এখানে কেউ জানে না। পুলিসেরাও আমার আগের খবর কিছু তদন্ত করে হদিস করতে পারে নি। আমার নাম ইব্রাহিম আপনারা জানেন, ১৮৪০ সনের ৭ই অক্টোবর তারিখের কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের নথিপত্র আনতে হুকুম করুন, তাতে দেখতে পাবেন, আমার ফাঁসি হয়ে গিয়েছে।"

বিচারক ও কৌঁসুলী সকলেই বুঝিলেন, ইব্রাহিমের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, সে আবল-তাবোল বকিতেছে।

ইব্রাহিম তাহা আশঙ্কা করিয়া বলিল, "তা নয়, আমি পাগল নই, বেশী দিনের কথা নয়, ফাঁসি কাঠে আমাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমি মরি নি—রহমৎ জল্লাদকে ডাকিয়ে আনুন, সে যখন আমাকে মড়া মনে করে নিয়ে যায়, তখন তার ছোট মেয়েটী বলে, 'বাবাজান মড়ার চোখ নড়ছে।' তারপর আমার মাথায় জল ও তেল দিয়ে তারা আমাকে ভাল করে।"

বিচারকেরা নথিপত্র তলব দিলেন রহমৎ জল্লাদকে ডাকা হইল—সে মিথ্যা বলিল না। তার পর ইব্রাহিমের আঙ্গুলের ছাপ কলিকাতা জেলে ছিল—তাহার সঙ্গে এখনকার দাগ একেবারে মিলিয়া গেল। তাহাকে অনেকে চিনিত—সুতরাং বৃত্তান্তটা অতি পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হইল।

বিচারকেরা 'রায়' দিলেন—ইব্রাহিমকে ১৮৪০ সনের ৭ই অক্টোবর মহামান্য কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারক বাহাদুরেরা ফাঁসির হুকুম দিয়াছিলেন এবং ২৮এ অক্টোবর তাহার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। আইন অনুসারে সে মৃত, তাহার মৃত্যুদণ্ড হইয়া গিয়াছে; সে আর আদালতের এক্তারে নাই। আইন অনুসারে আর তাহাকে জীবিত বলিয়া গণ্য করা যায় না; সুতরাং মৃত ইব্রাহিমের বিচারের ভার সৃষ্টিকর্ত্তার উপর দিয়া আমরা ইহাকে সম্পূর্ণরূপে খালাস দিলাম। সারা দুনিয়াটা যেন ইব্রাহিমের চক্ষে প্রহেলিকার সৃষ্টি করিল; সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া অস্ফুট-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, খোদা, খোদা, মেহেরবান! যদি এতবড় দয়াই তুমি করলে, তবে পথ বলে দাও, আমায় মানুষ কর!"

এই বিচারের পর ইব্রাহিম নিজের গ্রামে ফিরিয়া আসিল এবং সকলের বিনা আপত্তিতে নিজ গদি দখল করিয়া বসিল। তাহার শিশু-পুত্রের নামে জমিদারী এবং সম্পত্তি রেজেষ্ট্রী হইয়াছিল এবং তাহার স্ত্রীকে আদালত অভি-ভাবক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহার আর কোন ব্যতিক্রম হইল না; কারণ,আইন অনুসারে তাহার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইবে না। ইব্রাহিমের মেজাজ এই ঘটনার পর একবারে শোধরাইয়া গিয়াছিল —যখন সে বৃদ্ধ, তখন লোকেরা বলিত, এরূপ শান্ত, শিষ্ট, ধর্ম্মভীরু, অক্রোধ ব্যক্তি সে তল্লাটে আর একটি নাই। *

* সত্য-ঘটনার ছায়া অবলম্বনে লিখিত

সদর-অন্দর

শ্রী নরেন্দ্র দেব

বিজয় ছিল পিতামহ-পন্থী!

অর্থাৎ, তার বাপদাদারা বরাবর যা ক'রে এসেছেন, বিজয় অন্ধভাবে তারই অনুসরণ ক'রে চলতে চায়। বলে—আমরা কি আর তাঁদের চেয়ে জ্ঞানী?

প্রতাপ কিন্তু এই নিয়ে দাদার সঙ্গে প্রায়ই তর্ক করে। সে ছিল তরুণ এবং অতি আধুনিক নব্য-পন্থী।

সে বলে—'বাপদাদার আমলে সেযুগের ও সেকালের অবস্থা অনুসারে সংসার ও সমাজের কল্যাণের জন্ত তাঁরা যা ভালো বিবেচনা ক'রেছিলেন, যে সকল বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন বোধ ক'রেছিলেন তাই প্রচলিত ক'রে গেছেন; কিন্তু, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় এযুগের ও একালের সংসার ও সমাজের প্রয়োজন মতো আমরা যদি তার পরিবর্ত্তন ক'রে না নিই, তা' হ'লে চলতে পারবো কেন? আমাদের গতি বন্ধ হ'য়ে যাবে যে! জগতে কোনো কিছুর গতি বন্ধ হ'য়ে যাওয়া মানেই তার মৃত্যু! আপনারা এই পুরাতন-পন্থীর দল এ জাতটাকে যতই পিছনে টেনে রাখ্‌তে চাইছেন, ততই একে মরণের কোলে অাঁকড়ে ধ'রছেন জানবেন।

বিজয় গম্ভীর হ'য়ে যেতো। প্রতাপের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে তার স্ত্রী রেবাকে উদ্দেশ ক'রে বলতো—"হিন্দুধর্ম্ম আর হিন্দুজাতটাকে যদি বাঁচাতে হয়, তা হ'লে এদেশের ছেলেদের এই ইংরাজি পড়ানো আর বি-এ এম-এ পাশ করানো বন্ধ করতেই হবে। বুঝলে রেবা। গুরুদেব যথার্থই বলেন যে,—'এই শিক্ষার দোষেই আমরা ভারতের বৈশিষ্ট্য ও তার নিজস্ব ধারাটিকে হারাতে বসেছি।' আমার ছেলেকে আমি সংস্কৃত টোলে ভর্ত্তি ক'রে দেবো। ইংরাজী ইস্কুলের ছায়া মাড়াতে দেবো না।"

রেবা হেসে বলতো—"তোমার ছেলেকে কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের চূড়ামণিরা টোলের ছায়াও মাড়াতে দেবে না! আর সংস্কৃত পড়াতো দূরের কথা—'অনুস্বর' 'বিসর্গ' 'চন্দ্রবিন্দু' পর্য্যন্ত উচ্চারণ করবার তার অধিকার নেই যে! শূদ্রের উচ্চ-শিক্ষার অনধিকার,—ভারতেরই একটা বৈশিষ্ট্য ও নিজস্ব ধারা কিনা!—কিন্তু, সে কথা যাক্‌। তুমি বললে—ইংরিজি পড়ে আর বি-এ, এম-এ, পাশ করেই হিন্দুধর্ম্ম আর হিন্দুজাতটা মরতে বসেছে, কিন্তু আমি তো দেখছি এ সত্ত্বেও যখন ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তোমার মত মানুষ এ দেশে সম্ভব হ'য়েছে, তখন ভারতের পক্ষে তার হিঁদুয়ানীর ভার ঠেলে এগিয়ে যাওয়া বড় সহজ নয়!"

এমনি ক'রেই বিজয়কে যখন নিত্য তার পত্নী ও সোদরের সঙ্গে বিরোধ ও মতদ্বৈধ নিয়েই চলতে হচ্ছিল, ঠিক সেই সময় দেশে এলো আবার সরদা-বিল।

বাংলার শিক্ষিত মেয়েরা যে যে সভায় সরদা-বিলকে আবাহন, সমর্থন ও সম্বর্দ্ধনা ক'রে নিলে, রেবা তার প্রত্যেকটিতেই যোগদান করলে। প্রতাপ সরদা-বিলের স্বপক্ষে ইংরাজি ও বাংলা একাধিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখলে। বিজয় কিন্তু সরদা-বিলের বিরুদ্ধবাদীদের দলভুক্ত হ'য়ে গোড়া থেকেই এর প্রতিবাদ সভায় পাণ্ডা হয়ে উঠলো

এবং সরদা-বিলের বিপক্ষে সরকার বাহাদুরের কাছে তাদের দল থেকে যে বিরাট দরখাস্তখানা পাঠানো হ'লো, বিজয়ই তার তদারক ক'রে সর্ব্বাগ্রে তার উপর বড় বড় হরফে নিজের নাম সই ক'রে দিলে।

কিন্তু বিজয়ের দলের সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও সরদা-বিল যখন পাশ হ'য়ে গেলো, তাদের দল একেবারে যেন ক্ষেপে উঠলো! আইন বলবৎ হবার আগেই তারা নিজেদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র-কন্যাদের বিবাহ দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগলো।

বিজয়ের একটি মেয়ে, তিনটি ছেলে। মেয়েটিই তার প্রথম সন্তান—নাম অম্বপালি—বয়স সাত। তারপর ছেলেরা। বড়টির নাম—শাক্যসিংহ—বয়স পাঁচ; মেজটির নাম—সব্যসাচী—বয়স তিন; ছোটটির নাম—লোক-তিলক—বয়স এক।

ছেলে-মেয়েদের নাম রাখা নিয়ে প্রতিবারই রেবার সঙ্গে বিজয়ের রীতিমত বচসা হ'য়ে গেছে। বিজয় চেয়েছিল তার মেয়ের নাম রাখতে বিষ্ণু-প্রিয়া—কারণ, তার মায়ের নাম ছিল নাকি হরিপ্রিয়া এবং ঠাকুরমার নাম ছিল কৃষ্ণসঙ্গিণী। তা' ছাড়া, বিজয়ের গুরুদেব প্রভুপাদ বৃন্দাবন বাবাজীরও একান্ত ইচ্ছা ও অনুরোধ ছিল যেন শ্রীমান বিজয়কৃষ্ণের কন্যার নাম বিষ্ণুপ্রিয়াই রাখা হয়।

কিন্তু, রেবা বড় একগুঁয়ে মেয়ে; সে জেদ ধ'রে বসলো কিছুতেই মেয়ের ও নাম রাখবে না। ও নাম থেকে নাকি খোল-করতালের আওয়াজ পাওয়া যায়! রেবার বিশ্বাস এই, খোল-করতাল আর কীর্ত্তনই এ বাংলা দেশের সর্ব্বনাশ ক'রেছে!

বিজয় যতই কেন গুরুভক্ত হোক্ না,—সে সময় রেবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার তার সাধ্য ছিল না। নবোঢ়া তরুণী পত্নী সুন্দরী রেবার সেদিন সে একান্ত অনুগত ও বাধ্য ছিল। কাজেকাজেই গুরুদেবের সামনে মেয়ের নাম বিষ্ণুপ্রিয়া হ'লেও বাড়ীতে সে কিন্তু অম্বপালি রইল।

ছেলের নাম—'শাক্যসিংহ' রাখতে বিজয় জোর প্রতিবাদ ক'রেছিল। ওটা নাকি বুদ্ধদেবের নাম। বৈষ্ণবের ছেলের ও নাম রাখা ঠিক নয়। গুরুদেব বলেছেন—রূপ-সনাতন রাখতে; 'রূপ-সনাতন' নাম যদি পছন্দ না হয়, বেশত'—'শ্রীজীব গোস্বামী' রাখতে পারো।

রেবা শুধু গম্ভীরভাবে বলেছিল—"বৌদ্ধযুগ ভারতের শ্রেষ্ঠ যুগ; সেদিন এখানে বৃহত্তর ভারত গড়ে উঠেছিল—আমি সেই গৌরবকেই বড় বলে মনে করি—শ্রীচৈতন্তের রাই-উন্মাদনার চেয়ে। পরাধীনতার সূতিকাগারে যে ধর্ম্মের উদ্ভব,—সে কোনোদিন মানুষকে মুক্তি দিতে পারবে না! তোমাদের আদর্শ পুরুষ কংসের কারাগারে জন্মে ছিল ব'লেই সে ভারতকে ধ্বংস ক'রে গেছে—'মহাভারত' গড়তে পারে নি।

বিজয় বেগতিক দেখে রণে ভঙ্গ দিয়েছিল, এবং তারপর যখন সব্যসাচী' ও 'লোক-তিলক' এলো, সে আর কোনো প্রতিবাদ করলে না; কারণ, সে বেশ বুঝে ছিল যে, এখানে আপত্তি করা বৃথা! সে কেন,—তার গুরুদেব এলেও কিছু করতে পারবেন না!

এইটিই ছিল বিজয়ের মনের একমাত্র সান্ত্বনা। দিনও চলে যাচ্ছিল তার এক রকম মন্দ নয়; কিন্তু সর্ব্বনাশ করলে ওই সরদা-বিল এসে। গুরুদেব একদিন তাকে ডেকে আদেশ করলেন—"বিজয়চাঁদ! ধর্ম্মরক্ষার এই উপযুক্ত অবসর বাবাজী! এ সুযোগ তুমি হেলায় হারিও না! এই সময়ে তুমি তোমার কন্যার বিবাহ দিয়ে হিন্দু-ধর্ম্মের মুখ রক্ষা ক'রে একটা অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে যাও। ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখার মতো পুণ্য কাজ ও শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য মানব জীবনে আর কী আছে?—"

বিজয়ের মনে পড়লো রেবার মুখ। তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো! একবার শুধু ক্ষীণ মিনতির কণ্ঠে জানালে—"প্রভু! আমার কন্যার বয়স এখন সবে সাত বৎসর মাত্র!"

শ্রীবৃন্দাবন বাবাজী তাঁর চৈতন্য চুট্‌কী আন্দোলিত ক'রে বললেন—"তবে আর বিলম্ব কেন? তোমার কন্যা তো আর বালিকা নয় বৎস! সে তো আজ কিশোরী কুমারী! শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মায়ের তো ঐ বয়সেই শ্রীভগবানের সঙ্গে মিলন হয়েছিল! তোমার ঘরের বিষ্ণুপ্রিয়া-কেও আমি ঐ বয়সেই তার ইষ্টদেবতার চরণে স'পে দিতে চাই!—"

বিজয় থতমত খেয়ে বললে—"আজ্ঞে বাড়ীতে—"

গুরুদেব সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললেন—"হ্যাঁ, অবশ্যই বাড়ীতে এখনি গিয়ে আমার এ আদেশ প্রচার করো এবং মেয়ের বিবাহের সমস্ত আয়োজন সুরু করে দাও; আমি স্বয়ং মায়ের জন্য একটি সুলক্ষণযুক্ত পাত্র স্থির করেছি।"

বাবাজী সুলক্ষণযুক্ত পাত্র ঠিক করলে কি হবে, বিজয় মহা মুস্কিলে পড়লো রেবার মত নিয়ে!

সে বলে—"আমি কিছুতেই অতটুকু মেয়ের বিয়ে দিতে দেবো না! তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! ওর এখন খেলা করে বেড়াবার বয়স। বিয়ের যোগ্য না হ'লে আমি ওর বিয়ে দেবো না এ তো ছেলেখেলা নয়! জীবনের সব চেয়ে বড় দায়িত্ব আমি ওর মাথায় তুলে দেবো—ও যখন এক অবোধ শিশু?—এ অন্যায় আমার দ্বারা হবে না!"

বিজয় শুধু করুণকণ্ঠে বলে—"আমি গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারবো না!—তিনি স্বয়ং পাত্র স্থির করেছেন; এ বিবাহ না দিলে শ্রীগুরুর অমর্যাদা করা হবে!—তুমি এ বিষয়ে আমাকে আর অনুরোধ কোরো না রেবা! জেনো, গুরু-আজ্ঞাই আমার কাছে সর্ব্বাগ্রে শিরোধার্য্য!—"

রেবা একথা জানতো। আজ আর সে নবোঢ়া পত্নী নয়। এখন আর তার অনুরোধ বিজয়ের কাছে সব চেয়ে বড় নয়—সেদিন তার চলে গেছে। অগত্যা রেবা গিয়ে দেবর প্রতাপের শরণাপন্ন হলো। কাতরভাবে প্রতাপের হাত দু'টি ধরে মিনতি করে রেবা বললে—"ঠাকুর-পো! এ বিপদে তুমি না রক্ষা করলে আমার অব্যাহতির আর কোনো উপায় নেই ভাই! তুমিই বলো না,—এ বিয়ে কি হতে দেওয়া উচিত?—দুধের মেয়ে আমার—কচি বাচ্চা—"

প্রতাপ উত্তেজিত হয়ে উঠে বললে—"এ কখনই হতে পারে না! বৌদি', তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি বেঁচে থাকতে দাদাকে কিছুতেই এ অন্যায় কাজ করতে দেবো না!"

রেবা তার এই দেবরটিকে ভাল রকমই জানতো। সে যে একটা কিছু উপায় করবেই এ সম্বন্ধে তার আর কোনো সন্দেহই ছিল না; কাজেই সে বেশ নিশ্চিন্ত হয়েই গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করলে।

প্রতাপ তার দাদাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"শুনলুম নাকি তুমি খুকীর বিয়ের সব ঠিক করেছো?"

প্রতাপের কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটা যেন উগ্রতার ভাব লক্ষ্য করে বিজয় একটু থতমত খেয়ে বললে—"হ্যাঁ ভাই, মেয়ে যখন হয়েছে তখন বিয়ে ত' দিতেই হবে একদিন। একটা যোগাযোগও উপস্থিত হচ্ছে ভালো, তাই কাজটা সেরে রাখছি। কি জানো কন্যাদায় থেকে যত শীঘ্র উদ্ধার হওয়া যায় ততই মঙ্গল। তা' ছাড়া শাস্ত্রেও আছে 'শুভস্য শীঘ্রম্'!"

প্রতাপ বললে—"কিন্তু কন্যা ত' তোমার বিবাহযোগ্যা হয় নি এখনো দাদা! সাত বছরের

মেয়ের বিয়ে দেবে কি ?—পনের ষোল বছরের হোক্ আগে—"

বিজয় জিভ কেটে একটা মুখভঙ্গী করে বলে উঠলো—"আরে রাম রাম ছি ছি! কী বলছো তুমি প্রতাপ ? আমাদের হিন্দুধর্মের অনুশাসনই হচ্ছে কন্যা রজস্বলা হবার পূর্ব্বে তার বিবাহ দিতেই হবে—নইলে ধর্মে পতিত হবে যে!—বাপদাদার আমল থেকে যে প্রথা চলে আসছে আমাকে তা' অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে। আমাদের মা-ঠাকুরমাদেরও তো সব ওই বয়সেই বিবাহ হয়েছিল! তোমরা সব আজকালকার ইংরিজী পড়া নব্য ছোকরার দল—ধর্ম্মের বিধান মানতে চাও না—"

প্রতাপ খুব জোরের সঙ্গেই এ কথায় প্রতিবাদ করে বললে—"কোন ধর্ম্মেরই এ বিধান হ'তে পারে না দাদা, যে শিশু কন্যার বিবাহ দিতে হবে। হিন্দুধর্মেও কোনো দিন এ বিধান ছিল না। কন্যা বয়োপ্রাপ্ত হবার আগে তার বিবাহ দেওয়াটা শুধু অন্যায় নয়, অত্যন্ত কুপ্রথা এবং কুরীতি। যে যুগে এই অনাচার এদেশে সুরু হয়েছিল, সে খুব বেশী দিনের কথা নয় দাদা। সেদিন যে প্রয়োজনে এই বর্ব্বর প্রথা হিন্দু সমাজে প্রচলিত হ'য়েছিল আজ আর সেদিন নেই। এখন এখানে জীবন-যাত্রার বহু পরিবর্ত্তন ঘটেছে। সেদিনের দোহাই দিয়ে আজও যদি আমরা ওই অন্যায়ের সমর্থন করি, তা' হ'লে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের জগতের চক্ষে আমরা হেয় করেই তুলবো। হিন্দুধর্ম্মকে তা' হ'লে বিশ্বের লোক বর্ব্বরের ধর্ম্ম বলে ঘৃণার চক্ষে দেখবে।—"

বিজয় গম্ভীরভাবে বললে—"তোমার কাছে আমি হিন্দুধর্মের নববিধান শুনতে চাই নি। আমার গুরুদেবের চেয়ে তুমি এ সম্বন্ধে বেশী পণ্ডিত বলে আমি মনে করি নি। এ বিবাহ আমি দেবোই। আমার গুরুর আদেশ! কারুর অনুরোধেই আমি গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন করবো না জেনো!"

প্রতাপ আর কোনো কথা না বলে সোজা একেবারে প্রভুপাদ বৃন্দাবন বাবাজীর আস্তানায় গিয়ে উপস্থিত হ'লো। বাইরে থেকে হাঁকতে সুরু করলে—"বৃন্দাবন ঠাকুর বাড়ী আছেন ?"

বৃন্দাবনকে নাম ধরে কে ডাকে শুনে সে তড়কে গিয়ে তাড়াতাড়ি খড়মটা পায়ে দিয়ে নামাবলীখানা গায়ে জড়িয়ে হরিনামের মালা ছড়াটা হাতে নিয়ে জপতে জপতে বেরিয়ে এলো।

প্রতাপ কোনো রকম গৌরচন্দ্রিকা না করেই বললে—"আপনি কি দাদাকে তাঁর সাত বছরের মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য আদেশ ক'রেছেন ?—"

বৃন্দাবন আকাশের দিকে চেয়ে মালাশুদ্ধ হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে কার উদ্দেশে প্রণাম জ নিয়ে বললে—"আমি কে ?—সকলই সেই দয়াময়ের ইচ্ছা! হরি হে দীনবন্ধু!"

রাগে প্রতাপের সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠলো। রুক্ষভাবে বললে—"দেখুন, ও সব ভণ্ডামি আমি ঢের দেখেছি। আমার কাছে ওসব ওস্তাদী চলবে না! আমাকে দাদার মত নিরীহ ভালোমানুষ মনে করবেন না!—আপনার নিজের তো একটি পাঁচ বছরের অবিবাহিতা কন্যা রয়েছে, সেটিকে আগে পাত্রস্থ করে তারপর শিষ্যদের কন্যাদায় থেকে উদ্ধার হবার উপদেশ দেবেন বুঝলেন ?"

বৃন্দাবনবাবাজী স্নিগ্ধ হাস্যে তাঁর মুণ্ডিত মুখমণ্ডল রঞ্জিত করে বললেন—তা' কেমন ক'রে হ'তে পারে বৎস ? শাস্ত্রে আছে—'লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি' অর্থাৎ পাঁচ বছর পর্য্যন্ত ওদের লীলা-কাল, তার মানে খালার সময়! বুঝেছ ভায়া!—শ্রীভগবান এই বয়সেই কালীয় নাগকে দমন করেছিলেন। ওহো, লীলাময়!—সুতরাং লীলা-কালে তো কিছু করবার উপায় নেই। তারপর মনু বলেছেন কিনা—'দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ!' তা' বাবা, তুমি দেখেনিও, যদি ততদিন না এ দেহ

রাখি তা' হলে দশবছরের আগেই বেটিকে তাড়াবোই! তাড়াতেই যে হবে! শাস্ত্র বলছেন—'দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ'—"

প্রতাপ এই বাবাজীটির বিরাট অজ্ঞতা দেখে রাগ করবে কি হেসেই অস্থির!—সে শুধু এই বলে চলে এলো—"আচ্ছা দাঁড়াও, তোমায় আমি 'বধাচরেৎ' করে ছাড়বো!" ফিরে আসতে আসতে প্রতাপ শুনতে পেলে বাবাজী ঘন ঘন বলছেন—"হরি নারায়ণ! মধুসূদন! দীনবন্ধু! দয়াময় পার করো প্রভু!—"

প্রতাপ নিশ্চয় একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে বসবে এবং রেবাও হয় ত' শেষ পর্য্যন্ত গোলমাল না বাধিয়ে ছাড়বে না—এমনিই একটা আশঙ্কা মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে বিজয়ের মনে গোড়া থেকেই উঁকি মারছিল; কিন্তু লক্ষ্মী ছেলের মতো প্রতাপ যখন বিয়ের বাজার-হাট ক'রে আনতে রাজি হ'লো এবং রেবাও নির্ব্বিবাদে বরণডালা সাজানো এবং পিঁড়িতে আল্‌পনা দেওয়া সুরু করলে দেখে বিজয়ের মুখে হাসি আর ধরে না। সে খুশী হ'য়ে মেয়ের বিয়েতে মুক্তহস্তে ব্যয় করতে বসে গেলো। যার সঙ্গে দেখা হয়, তাকেই নিমন্ত্রণ করে, আর বলে—"শ্রীগুরুর কৃপায় কাজ আমার বেশ শান্তিতেই হচ্ছে; আর কোনো গোলোযোগ নেই। প্রভুর আশীর্ব্বাদে সব মিটে গেছে।"

লোকে তার একথা শুনে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে—"তবে কি কিছু গোলমাল বেধেছিল নাকি? কোনো অশান্তি ঘটবার উপক্রম হয়েছিল বুঝি?—"

বিজয় বলে—"না না, তেমন কিছু নয়। তবে কি জানো ভায়া? মেয়ের বিয়ে তো কত দিক থেকে কত রকম বাগ্‌ড়া আসতে পারতো হয় ত'!—"

লোকে তার কথা শুনে হাসে।

এমনি ক'রে বিজয়ের মেয়ের বিয়ের দিন এগিয়ে এলো। সমস্ত আয়োজনই সুসম্পূর্ণ হ'য়েছে। কিন্তু,—বাজার-হাট, তরি তরকারি, দই-মিষ্টি এখনো কিছুই এসে পৌঁছল না দেখে ব্যস্ত হ'য়ে বিজয় প্রতাপকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে—"কই হে, তোমার যে কিছুই এখনো এসে পৌঁছল না ভায়া?"

প্রতাপ বললে—"তুমি সে জন্যে কিছু ভেবো না দাদা। আমাদের লোকবল কই? দেখবে শুনবে করবে কর্ম্মাবে কে? আমি সেই জন্যে ওসব হাঙ্গামা না ক'রে একেবারে কণ্ট্রাক্ট দিয়ে দিয়েছি একজনকে; সে তার লোকজন আর জিনিষপত্র নিয়ে এসে সমস্ত বরযাত্রীদের খাইয়ে দেবে।"

বিজয় শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠে বললে—"বাঃ! এতো বেশ বুদ্ধি করেছো ভায়া! আমাদের আর কোনো ঝঞ্ঝাট পোওয়াতে হবে না! বরযাত্রী খাওয়াবারও আজকাল কণ্ট্রাক্টার পাওয়া যায় নাকি?—"

প্রতাপ বললে—"কিছুতো খবর রাখো না দাদা; তোমাদের কাল আর নেই, এটা এখন বিংশশতাব্দী এবং তরুণের যুগ! তোমাদের ব্যবস্থা সব এখন উল্টে গেছে। দেশ আর ও প্রাচীন পথে চলতে রাজি নয়!"

বিজয় বললে—"চলতেই হবে! চলতেই হবে! আমাদের এ সনাতন পথ! বাপদাদাদের আমোল থেকে দেশ এই পথেই চলে এসেছে! দু'দিনের জন্য ছেলে-ছোকরারা যদি বিদেশী সভ্যতার মোহে ভুলে বিপথে চলতে সুরু করে, ঘুরে-ফিরে হয়রাণ হ'য়ে এই পথেই আবার তাকে পা বাড়াতে হবে! তুমি দেখে নিও! বেদের ব্যবস্থা কি বদ্‌লাতে পারে কখনো?"

প্রতাপ বললে—"তোমরা যেটাকে বেদের ব্যবস্থা বলে চালাতে চাচ্ছো, সেটা মোটেই

বেদবিধি সঙ্গত নয়। সেইখানেই ত' তোমাদের ভুল হ'চ্ছে। কিন্তু ও কথা এখন থাক্। বর ঠিক ক'টায় সময় আসবে বলো তো?—"

বিজয় বললে—"বর ঠিক সাতটায় আসবে। সাড়ে সাতটায় লগ্ন। ছোট মেয়ে কিনা? পাছে ঘুমিয়ে পড়ে ব'লে আমি সকাল সকাল সম্প্রদানটা সেরে ফেলবার ব্যবস্থা করেছি।"

প্রতাপ উৎফুল্লভাবে বললে "বাঃ! এটা বেশ ভালো করেছো দাদা! কিন্তু, একটা বড় ভাবনা হচ্ছে, খুকীটা বিয়ের বৈদিকমন্ত্র গুলো কি সব ঠিক্ উচ্চারণ করতে পারবে? একে সব সংস্কৃত—তার উপর মানে বুঝতে পারবে না! এ অবস্থায় বিবাহটা অসিদ্ধ হ'য়ে যাবে না তো?—"

বিজয় ঘাড় নেড়ে বললে—"না নাঃ!—পুরো'হত ঠাকুর থাকবেন—তিনিই ওর হ'য়ে সব মন্ত্র পড়ে দেবেন!"

প্রতাপ যেন অনেকখানি আশ্বস্ত হওয়ার ভাণ ক'রে বললে "ওঃ! তবে আর ভাবনা কি? পুরোহিত ঠাকুর থাকবেন বটে! ও কথাটা আমার মনে ছিল না! তা' হ'লে খুকী ঘুমিয়ে পড়লেও ক্ষতি নেই। বিয়ে আট্‌কাবে না—কি বলো?—"

বিজয় গম্ভীরভাবে বললে—"নাঃ! সে জন্যে তুই কিছু ভাবিস নি। ও সব ঠিক হ'য়ে যাবে। সাড়ে সাতটার মধ্যেই সব শেষ করে ফেলবো।"

প্রতাপ বললে—"তা হ'লে তো আর সময় নেই!—আমি চল্লুম দাদা; দেখি একবার কণ্ট্রাক্টারটা এত দেরী করছে কেন? তুমি একটু বাইরে থাকো। লোকজন এলে বসিও।"

প্রতাপ বাড়ীর ভেতর চলে গেল। বিজয় বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

প্রতাপ বাড়ীর ভেতর গিয়ে রেবাকে ডেকে বললে—"বৌদি'! শীগ্‌গির! খুকীকে ডেকে দাও। আর সময় নেই বর এলো বলে?—"

রেবা বললে—"কিন্তু, যারা বর নিয়ে আসবেন ঠাকুর-পো?—আর আমাদের কন্যাযাত্রীও ত' বড় কম হবে না? তাদের খাওয়া-দাওয়ার কী করবে?"

প্রতাপ বললে—"তুমি কি পাগল হয়েছো বৌদি'? অতগুলো লোককে খাইয়ে টাকা বাজে খরচ ক'রতে আছে? আমি আজ সকালে বাজারে যাচ্ছি ব'লে প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে বলে এসেছি। হঠাৎ কাল রাত্রি থেকে বৌদি'র ভয়ানক অসুখ ক'রেছে,—বিয়েটা আজ বন্ধ রইলো—পরে আপনাদের খবর দেবো!"

রেবা দুই চোখ কপালে তুলে বল্লে—"ঠাকুর-পো এত কারসাজী খেলেছো বুঝি এর মধ্যে? কিন্তু ও তো গেলো বরযাত্রী কন্যাযাত্রীর পালা; তারপর বর তো আসবে ভাই? তখন কনে না পাওয়া গেলে যে একটা হৈচৈ পড়ে যাবে?—"

"সে ব্যবস্থা কি আর না করিছি বৌদি'?—" এই ব'লে প্রতাপ তার বৌদি'র কাণে কাণে কী বলে দিলে! বৌদি' শুনে হেসে অস্থির! বললে—"ঠিক বুদ্ধি করেছো! বাবাজীটি খুব জব্দ হবে। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল!—" প্রতাপ আর দেরী না করে খুকীকে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে নিঃশব্দে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলো।

প্রথমেই গুরুদেব সপরিবারে এসে উপস্থিত হলেন। বিজয় মহাসমাদরে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিলে। রেবা গুরুপত্নীকে ও তাঁর সেই পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যাটিকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গিয়ে বসালে।

গুরুদেব বিজয়কে বললেন—"কই হে! বর যে

আসবার সময় হ'লো ? এখনো কারুর দেখা নেই কেন ? —"

বিজয় একটু উদ্বিগ্ন হ'য়ে বললে—"তাই ত' প্রভু ! আমিও সেই কথাই এতক্ষণ ভাব'ছিলুম !"

গুরুদেব বললেন—"সময় ভুল ব'লে আসোনি তো ?"

"আজ্ঞে না ! সবাইকে সাতটার মধ্যেই আসতে ব'লে এসেছিলুম !"

গুরুদেব বললেন "তাই ত' ! তবে কি হ'লো ! সাতটা যে বাজে !"

এমন সময় বর এসে উপস্থিত হ'লো। রেবা শাঁক বাজিয়ে বরণ করে নিলে।

কেবলমাত্র নাপিত পুরোহিত এবং বরকে আসতে দেখে গুরুদেব বিস্মিত হয়ে বললেন "কই হে ? তোমাদের আর সবাই কই ?—পিছিয়ে পড়েছে বুঝি ?"

বরকর্তা একথা শুনে অবাক্ হয়ে বললেন—"আজ্ঞে ! কাউকে তো আনি নি ! বেন ঠাকুরুণ হঠাৎ পীড়িত হ'য়ে পড়েছেন শুনলুম,ছোট বেহাই-মশায় সকালে গিয়ে খবর দিয়ে এলেন— এবং নাপিত পুরোহিত ছাড়া আর কাউকে সঙ্গে আনতে নিষেধ করে এলেন !"

বিজয় শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলো ! তখনি প্রতাপকে খুঁজতে আরম্ভ করলে– কিন্তু, তাকে বাড়ীতে পাওয়া গেল না।

পুরোহিত মহাশয় এই সময় আদেশ দিলেন—"সময় হ'য়েছে। লগ্ন উপস্থিত। কন্যাকে আনতে বলুন, সম্প্রদান আরম্ভ হোক। লগ্নকাল অতি অল্পক্ষণমাত্র। শীঘ্র শুভকার্য্য সম্পন্ন করা দরকার।"

বর কাপড় ছেড়ে বিবাহের চেলি পরে পিঁড়ের গিয়ে বসলো। কিন্তু কন্যা আর আসে না !

বিজয় বাড়ীর ভিতর ছুটে গেলো। কিন্তু সেও আর ফেরে না দেখে গুরুদেব স্বয়ং ভিতরে এসে উপস্থিত হলেন। রেবা তাঁর পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে বলে উঠলো "সর্ব্বনাশ হয়েছে প্রভু ! আপনি আমার দেবরটিকে জানেন ত' ? সে এ বিবাহের ঘোর বিরোধী ছিল। কখন যে খুকীকে নিয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে গেছে, কিছুই জানতে পারি নি আমরা ! এখন আপনি এর একটা উপায় না করলে আর মান থাকে না ! শুধু যদি আমাদের জন্যই হ'ত কোনো কথা ছিল না ; কিন্তু, এতে যে আপনার মুখ হেঁট হবে, এই কথা ভেবেই আমি কাতর হচ্ছি বেশী !"

গুরুদেব বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে তাঁর শিখায় ঘন ঘন হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—"তাই ত' মা ! আমি কী করতে পারি তা'তো বুঝতে পারছি নি !"

এমন সময় বাইরে থেকে পুরোহিত হাঁকলেন —"লগ্ন বয়ে যায় !"

রেবা বললে—"একমাত্র উপায় আছে। আপনার কন্যাটিকে আমি এখনি সাজিয়ে পাঠিয়ে দিই। আপনি ওদের আর কিছু বলবেন না। শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে শেষ হ'য়ে যাক ! তারপর ওদের সব খুলে বলা যাবে।"

গুরু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে ক্ষণকাল ভেবে বললেন –"অগত্যা আর কি করা যাবে ! তাই দাও মা, আমারই মেয়েটীকে সাজিয়ে দাও—সকলি প্রভুর ইচ্ছা ! হরি হে দয়াময় !"

বাস্তব

শ্রী আশুতোষ কাব্যতীর্থ, বি এ

'ভোগে প্রকৃত সুখ নাই ; কর্ম্ম সম্পাদনেই প্রকৃত সুখ' এ ধরণের একটা কথা কাহারও কাহারও মুখে শুনা যায়। দুলাল ও-কথাটা অনেককেই বলিতে শুনিয়াছে, কিন্তু কথাটা মোটেই তাহার মনে লাগে নাই। না লাগবারই কথা। জীবনটা যখন চিরস্থায়ী নয় এবং একবার কোন রকমে দেহাশ্রয় ত্যাগ করিলে যে কোথায় যাইয়া কি করিবে, তাহারও যখন কিছু স্থিরতা নাই, তখন বাঁচিয়া থাকার দিন কয়টা সর্ব্বপ্রকারে ভোগ করিয়া না লওয়া নির্ব্বুদ্ধিতা। এই প্রকারে মূর্খের মত নিজকে সুখভোগ হইতে বঞ্চিত রাখিয়া ক্রমাগত খাটিয়া যাওয়াতে বাহবা হয় ত মিলিতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ বাহবার লোভে দুনিয়ার ভোগের সামগ্রীগুলা লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ সে কোনমতেই করিতে পারিবে না। সুতরাং সে গা ঢালিয়া দিল।

মা আর দু' ছেলেতে মিলিয়া সংসার। অবস্থা,—বুঝিয়া খাইলে চলিবার মত ; কিন্তু দুলাল খাইতে প্রস্তুত হইলেও বুঝিতে মোটেই প্রস্তুত নয়। ফলে গৃহে মা আর স্কুলে মাষ্টার এই দুই ভয়ে বার দুই ম্যাট্রিক ফেল করিয়া সেয়ানা হইয়া উঠিল এবং সে যে সেয়ানা হইয়াছে, ইহাই মাকে বুঝাইয়া দিবার জন্ত সগর্ব্বে স্কুল ছাড়িয়া ঘরে আসিয়া কায়েম হইল। ছেলের রকম-সকম দেখিয়া মা বোধ করি রাগ করিয়াই বলিয়াছিলেন – দু দুবার ফেল হইয়া লম্বা কোঁচা করিয়া বেড়াইতে দুলালের লজ্জা হওয়া উচিত। কিন্তু ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহারা এই পৃথিবীতে আসিয়াছে, তাহাদের পক্ষে বর্ত্তমান যুগের চাল চলন বুঝিয়া উঠা একেবারে অসম্ভব ; সুতরাং সেকালের উচিত একালে অনুচিত। পড়িলে তাহাকে বাধা দিবার শক্তি যে কাহারও নাই, এই কথাটাই বুঝাইতে যাইয়া দুলাল যখন নজিরের পর নজির খাড়া করিয়া প্রমাণ করিয়া দিল, যে, পাশ করা অপেক্ষা ফেল করাই নাকি ভবিষ্যতের পথ সুগম করিয়া তুলে, তখন আর মায়ের মুখে কথা যোগাইল না। দুলাল লম্বা লম্বা চুলগুলা ঘাড়ের দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল "ধর, এই রবীন্দ্রনাথ, গিরীশ ঘোষ, এমন কি রামকৃষ্ণ পরমহংস—ফেল ত দূরে থাক, ফাষ্ট ক্লাসে কারুকে উঠতে হয় নি—আমি ত তবু দুবার ফেল।" কথাটা শেষ করিয়াই লক্ষ্যহীন দৃষ্টি দূরে আকাশের দিকে প্রেরণ করিয়া, মাকে সে একেবারে 'থ' বানাইয়া দিল।

এই নজিরের পর অশিক্ষিতা জননীর পক্ষে পুত্রের কৃতকর্ম্মের জন্ত তাহাকে তিরস্কার করা সম্ভব হইল না। এবং দুলাল বিনা বাধায় কিছুদিন কল-ছেঁড়া ঘুঁড়ির মত এখানে সেখানে বেড়াইয়া সাহিত্যিক হইয়া বসিল। এখন তাহার মাথায় লম্বা চুল, কণ্ঠে মিহিসুর, চোখে লক্ষ্যহীন দৃষ্টি, মুখে পর্য্যায়ক্রমে চুরুট ও কবিতা।

মা জ্যেষ্ঠের ভাব গতিক দেখিয়া কনিষ্ঠকে লইয়া পড়িলেন। জ্যেষ্ঠ মায়ের হাত হইতে

সর্ব্বাঙ্গীন পরিত্রাণ লাভ করিয়া সাহিত্যের সাহায্যে দেশোদ্ধার করিবার চেষ্টায় যাহারা মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করিতেছে তাহাদেরই মধ্যে স্থান লাভ করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়া নিশ্চিন্তমনে নারীত্বের কাছে সতীত্ব যে অতি তুচ্ছ বিবাহ না করিয়া স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিলা-মিশা না হইলে দেশের ভবিষ্যত মসীময়, প্রভৃতি তথ্য গল্পে ও কবিতায় লিখিয়া এবং থিয়েটার নামক প্রমোদের উপকরণটী জগতে একমাত্র সত্য, দ্বিতীয় সত্য নাই, প্রভৃতি তথ্য প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া মাসিক সম্পাদকের দ্বারস্থ হইতে আরম্ভ করিল।

কিছুদিন পূর্ণ উদ্যমে সাহিত্য সেবার পর দুলাল আবিষ্কার করিল, সাহিত্যের সহায়তায় সাধারণ সমস্যার সমাধান যদিবা সম্ভব হয়, কিছুদিন হইতে তাহার নিজের বুকের মধ্যে যে এক অভিনব সমস্যার আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা পূরণ করা সাহিত্যের শক্তির বাহিরে। অথচ, সাহিত্য-সেবার ফলে তাহার অবস্থা যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে অন্ত প্রকারে সে সমস্যার সমাধানও অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, যে মায়ের মুখে ছেলেবেলা হইতে একটী রাঙাবৌ আনিবার সাধ এই সেদিন অবধি শুনিয়াছে, সেই মাও আর কোন উচ্চ-বাচ্য করেন না। দুলাল নিতান্ত বিপন্ন হইয়া বানপ্রস্থ লইবে কিনা ভাবিতেছে, এমন সময় এক অপূর্ব্ব কারণ সংযোগে সমস্যা পূরণ যেন আসন্ন হইল।

ছোট ভাই সত নিতান্তই বাঙ্গালী; অবাধে বি-এ অবধি পাশ করিয়া এম-এ পড়িতেছে; সাহিত্য সমস্যা প্রভৃতির ধার স ধারে না। ফলে বাঙ্গালী কন্যাকর্ত্তার দল উমেদারী আরম্ভ করিল এবং একজন দুলালের মাকে এমন কাতরভাবে ধরিয়া বসিল যে, তাঁহাকে নিমরাজী হইতেও হইল। কিন্তু চাপ দিল সত্য। জ্যেষ্ঠের কৌমার্য্য দূর না হওয়া পর্য্যন্ত কনিষ্ঠের দার-পরিগ্রহে অধিকার নাই, ইহাই নাকি শাস্ত্র বাক্য; সুতরাং দাদার একটা বিহিত না হইলে ধর্ম্মতঃ ত বটেই, বিবাহ করিতে সত্যর সাহসেই কুলাইয়া উঠে না। তাই সে বলিয়া বসিল—দাদার বিবাহের ব্যবস্থা না হইলে তাহার কথা আলোচনাই হইতে পারে না।

মা বলিলেন—"ধর সে যদি বিয়ে না করে?"

সত্য হাসিয়া বলিল—"দাদা! পেলে দু-চারটে বিয়ে করেও এখন গররাজী হবে না মা; তুমি চেষ্টা দেখ।"

মাতা কন্যাপক্ষকে এই কথাই জানাইলেন। ফলে এক সঙ্গেই দুই ভাই বৌ আনিয়া মায়ের সাধ মিটাইল।

দুলাল আর একবার নাড়া দিয়া অন্তরাস্থিত লুপ্তপ্রায় সাহিত্য প্রীতি কলমের খোঁচায় ফুটাইয়া তুলিতে যাইয়া দেখিল এতদিন যেখানে সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা বিভিন্ন দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া মিলিত হইত, আজ সে স্থানটা জুড়িয়া যে বিরাজ করিতেছে, তাহাকে সন্তুষ্ট করা সাহিত্য সেবার চলিবে না। এমন কিছু চাই যাহা বাস্তব এবং নিত্য প্রয়োজনীয়।

দুলাল তাহার সাহিত্যিক প্রাণের মধ্যে এই বাস্তবের দিকটা কোনদিনই অনুভব করে নাই। মাতা পুত্রের মতিগতি দেখিয়া দুই-একবার তাগিদ দিতেই দুলাল তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল, জগতে টাকা-পয়সা অতি তুচ্ছ পদার্থ; উক্ত পদার্থের চেষ্টায় সময় ও উদ্যম নষ্ট করিবার মত অপর্য্যাপ্ত অবসর ও উৎসাহ তাহার নাই। মা শুনিয়া বোধ করি আশ্বস্তই হইয়াছিলেন, কিন্তু অর্থের প্রতি হতাদর সত্ত্বেও দুলালের পিছনেই যে তাঁহাকে অধিক অর্থব্যয় করিতে হয় এই কথাটা মুখে আসিলেও বোধ করি ম বলিয়াই তিনি উচ্চারণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু দুলাল প্রায় মরিয়া হইয়া যাহাকে আনিয়া সমস্যাপূরণ করিল, তাহার মুখে কথাটা মোটেই বাধিল না।

দুলাল চাহিয়া দেখিল এই এক মহাসমস্যা! ইহার সমাধানের কোন উপায়ই তাহার জানা নাই।

বৎসর তিনেকের মধ্যে সমস্যা আরও জটিল হইয়া পড়িল। সত্য চাকরী লইয়া কর্মস্থলে এবং মা পুত্রের নূতন সংসারের বিলি করিতে যাইয়া বোধ করি বাধ্য হইয়াই সেইখানে রহিয়া গেলেন। পৈত্রিক কি ছিল, না ছিল দুলাল সেটা পূর্ব্বে নজর না করায় এখন দেখিল বসতবাটীর একাংশ ব্যতীত তাহার আপনার বলিতে আর কিছু নাই; অথচ তিনটী পুত্রকন্যা এবং তাহাদের গর্ভধারিণীকে লইয়া থাকিতে হইলে ইট কামড়াইয়া থাকিতে হয়।

দুলালের বুক চিরিয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া বাতাসে মিলাইয়া যায়। সেদিন এমনই ভাবিতে ভাবিতে দুলাল বোধ করি বাহিরের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিল—তাহার চৈতন্য হইল তরলার ঝঙ্কারে।

মুখ তুলিয়া চাহিতেই তরলা বলিল—"টাকা আজ মিটিয়ে না দিলে গয়লা আর দুধ দেবে না, শুনেছ?"

দুলাল নির্লিপ্তের মত বলিল "শুনলেই বা করছি কি বল? দুধ না দেয় ছেলে উপোস করবে।"

"উপোস করবে!"

"তা' ছাড়া আর উপায় কি?"

"উপোস না করলে কি আর আপনা থেকেই এসে হাজির হবে?"

দুলালের আর কথা যোগায় না; চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকে।

তরলা ভস্মে ঘৃত ঢালার মত খানিকক্ষণ বকিয়া অন্য কাজে চলিয়া গেলে দুলাল ভাবে সংসারটার উপর যদি তাহার কর্তৃত্ব থাকিত তাহা হইলে একদিনেই সে এখানকার এই খাওয়া পরা প্রভৃতি তুচ্ছ বিষয়গুলাকে দূর করিয়া কবিতা হাসি আর গল্প দিয়া সেই স্থানটা পূরণ করিয়া ফেলিত।

বিষয়গুলি তুচ্ছ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার একটীও না হইলে চলে না ইহাই বিপদ। এবং খাওয়া নামক তুচ্ছ পদার্থটা যে একান্তই অপরিহার্য্য, উদরে ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় দুলালের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু তরলার কথা-গুলা মনে পড়িয়া ও বিষয়ে কোন ব্যবস্থার কথা তাহাকে বলিতে সাহসে কুলাইল না।

কোথায় কোন বন্ধুর আড্ডায় যদি এক কাপ চা খাইয়াও,—কথাটা মনে হইতেই সে উঠিয়া পড়িল এবং যাইবার সময় শুনিল—"বাইরে ত , বাজার নিয়ে না ফিরলে আজ আর হাঁড়ি চড়বে না বলে দিলুম।"

দাঁড়াইলে পাছে আরও কিছু শুনিতে হয়, ভয়ে পিছনের দরজাটা সশব্দে টানিয়া দিয়া দুলাল সরিয়া পড়িল।

দুলাল সেই যে সেদিন বাহির হইল, আর ঘর-মুখো হইল না। নির্ব্বেদ আসিয়াছিল কিনা জানা নাই; তবে গৃহে ফিরিলে যে আজ আর উদরে কিছু প্রবেশ করিবে না, তাহা সুনিশ্চিত; সুতরাং ওখানে না যাওয়াই সুযুক্তি।

বৎসর তিনেক পরে বাড়ীর দোরগোড়ায় আসিয়া দেখিল, সদরে তালা ঝুলিতেছে উপরে লেখা ভাড়া দেওয়া যাইবে।

কোন বন্ধুর পাল্লায় পড়িয়া সেই এই কয় বৎসর মহানন্দে ভারতের সর্ব্বত্র নাকি পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে; বাড়ী-ঘর স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির কথা সেই আনন্দের মাঝে স্থান করিয়া লইতে পারে নাই। অকস্মাৎ সেই বন্ধুটী গতায়ু হওয়ায় বাধ্য হইয়াই তাহাকে এখানে আসিতে হইয়াছে। কিন্তু এখন উপায়?

পুত্রকন্যাগুলিকে লইয়া তরলা গেল কোথায়? —আর এরকম না বলিয়া না কহিয়া সে যে গেল, ইহা কি তাহার পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে? তরলার

উপর দুলালের ভীষণ রাগ হইল এবং সতীত্ব ও নারীত্বের মধ্যে তাহার বিচারে এখন সতীত্বই উচ্চে স্থান পাইল।

তথাপি স্বামী সে, একবার খোঁজ করিয়া দেখিতেই হইবে। কিন্তু খোঁজই বা করে কোথায়? একমাত্র মা ছাড়া তরলার আপন বলিতে কেহ ছিল না—সেই মাও তাহাদের বিবাহের অল্পদিন পরেই এপারের দেনা মিটাইয়াছিলেন—সুতরাং সে গেল কোথায়?

আশ-পাশে সংবাদ লইয়া জানিল, কে এক বাবু আসিয়া বৎসর দুই পূর্ব্বে সকলকে লইয়া গিয়াছে—কোথায় গিয়াছে, তাহারা জানে না। বৎসর দুই পূর্ব্বে! দুলালের মাথাটা কেমন করিয়া উঠিল। বাবুটী যে কে, দুলাল কিছুতেই স্থির করিতে পারিল না; ফলে যাহা সিদ্ধান্ত করিল, তাহাতে সে চক্ষে অন্ধকার দেখিল।

একটু সামলাইয়া লইয়া মনে হইল, যে স্ত্রী এই রকমভাবে স্বামীর অজ্ঞাতে কোথাও চলিয়া যায়, তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া মন খারাপ করিয়া লাভ নাই—সে যে কালে পথ করিয়া লইয়াছে, তখন আর দুলালের কি কর্ত্তব্য থাকিতে পারে? সে এখন খালাস।

সুতরাং নিশ্চিন্ত হইয়া সে এখন বাকী দিনগুলা একরম কাটাইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু দিনগুলা এক রকমে কাটাইতে হইলে যে ক্ষুধা নামক পদার্থটার বিনাশ একান্ত আবশ্যক, তাহা মনে হইতেই সে দমিয়া গেল। এমন কে বন্ধু আছে যে, তাহাকে আজীবন—হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল,—সত্যর কথা; তবে কি সত্য আসিয়াই তরলাকে লইয়া গিয়াছে—বোধ হয় তাই। দুলাল তৎক্ষণাৎ ষ্টেসনের দিকে ছুটিল।

তাহার ধারণা অমূলক নহে; তরলা দেবর গৃহেই স্থান পাইয়াছিল। গ্রামবাসীরা কেবল তাহাকে একটু শিক্ষা দিবার জন্যই সত্যটাকে সেরূপ বিকৃত করিয়া বলিয়াছিল।



[মগধরাজ বিম্বিসারকে তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু সিংহাসন লোভে হত্যা করিলে, তাঁহার বিমাতা কোশল দেবী স্বামী শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ অজাতশত্রুর নিকট হইতে ভগ্নীর বিবাহে বিম্বিসারকে যৌতুক প্রদত্ত কাশীরাজ্য প্রত্যার্পন-দাবী করিলেন। অজাতশত্রু অসিমুখে তাহার উত্তর পাঠাইয়াছেন]

দৃশ্য—[কোশলের প্রান্তরে যুদ্ধক্ষেত্রের একাংশে আহত সৈনিকদের সেবার জন্য কোশলরাজ কুমারী বিজিরা স্বয়ং স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী গঠন করিয়া উভয়পক্ষীয় আহত সেনাদিগের সেবা করিতেছিলেন। কাল সন্ধ্যা। বিজিরা একটী বিপক্ষ সৈনিকের ক্ষত-স্থান স্বহস্তে বাঁধিয়া দিতে-ছিলেন। সৈনিক বিমূঢ়ের মত তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল]

সৈনিক—আপনাদের দেশের সবই অদ্ভুত! আজ্ঞা কুমারী, সেবা দিয়ে মুমূর্ষু শত্রুর এমনি ক'রে জীবন রক্ষা করে প্রাণ দণ্ড দিয়ে আপনারা কি তার পাপের শাস্তি দেন?

বিজিরা—[বিস্মিত স্বরে] একথা কেন বলছেন সেনাপতি ?

সৈ—বলবনা ? যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তুলে এনে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন ; কিন্তু আমি তো জানি রাজার বিচারে আমার জন্য প্রাণদণ্ড অপেক্ষা কচ্ছে।

বি—প্রাণদণ্ড! [শিহরিয়া উঠিলেন]

সৈ - হাঁ, প্রাণদণ্ড! আপনি এখানে কিছুক্ষণ থাকলে হয় তো সকর্ণেই তা শুন্তে পাবেন। আমি কে জানেন রাজকুমারী ?

বি—কেন, দুর্দ্ধর্ষ অজাতশত্রুর বীর সেনাপতি আপনি।

সৈ—শুধু কি তাই,—পরাজিত, বন্দী!

বি—নিরাশ হচ্চেন কেন সেনাপতি? এবার যুদ্ধে আপনারা হেরেছেন—কিন্তু পূর্ব্বের যুদ্ধে আমাদেরই তো পরাজয় হয়েছিল। এই তো আপনাদের শেষ 'যুদ্ধ' নয়। এর পর হয়তো বিজয় লক্ষ্মী আপনাদেরই সহায় হবে। কে জানে!

সৈ—না, অজাতশত্রুর এই শেষ চেষ্টা। মগধের ভাগ্য-রবি চিরতরে অস্ত গেছে! আপনি তো জানেন, অজাতশত্রু বন্দী হয়েছেন—আপনার পিতার হাতে মৃত্যুদণ্ড তাকে নিতেই হবে—

বি—শুনেছি। কিন্তু আপনি—

সৈ। আমাকেও সেই সঙ্গে মৃত্যুবরণ ক'রে নিতে হবে ; কারণ নতশিরে প্রাণ ভিক্ষা কর্‌বার মত হীনতা আমার নেই।

বি - [আহত স্বরে] ভিক্ষা কেন সেনাপতি? অজাতশত্রু আমাদের শত্রু ; মহাপাপী সে! মগধের সমস্ত সৈনিক তো পিতার কাছে অপরাধী নন। ভুলছেন কেন, আপনি রাজকুমারীর আশ্রিত ; পিতা আপনাকে মুক্তি দেবেন।

সৈ—অসম্ভব রাজকুমারী! তা অসম্ভব! [এমন সময় দূরে গণ্ডগোল শোনা গেল। নকীব হাঁকিল—মহারাজ প্রসেনজিৎ আসিতেছেন। পরে রাজা ও অনুচরগণ প্রবেশ করিলেন। সমস্ত সৈনিককে দেখিয়া বিজিরার সম্মুখের সৈনিকের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন]

রা—(আনন্দে চীৎকার করিয়া) পাপী, আজ তোকে হাতে পেয়েছি! প্রাণদণ্ড তোর উচিত শাস্তি!

বি—সেনাপতিকে মার্জ্জনা করুন পিতা।

রা—সেনাপতি! মার্জ্জনা? এ কে জান মা! এ আমাদের পরম শত্রু অজাতশত্রু—

বি—অজাতশত্রু ? [বিস্ময়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন]—পিতা—[সে আর বলিতে পারিল না]

রাজা—বুঝেছি মা, তুমি শুধু সেবা কর নি, তুমি ওর নবজীবন দান করেছ। মার্জ্জনা কেন, ওঁর সারাজীবনের ভার আমি তোমায় দিলুম—অজাতশত্রু, বৎস!

অজা—আমি পাপী—মহাপাপী! পিতৃ-হন্তা, মাতৃঘাতী! জীবনে আমার বিতৃষ্ণা এসেছে! মৃত্যু চাই!

রা—পাপী অজাতশত্রুর মৃত্যু হয়েছে। আজ অনুতাপ-পবিত্র অজাতশত্রুর হাতে আমার কন্যা বিজিরাকে সমর্পণ কর্‌লুম। আর আজিকার এই পুণ্যদিন চিরস্মরণীয় করবার জন্য কাশীরাজ্য তোমায় অর্পণ করলুম।

অজাতশত্রু—বিজিরা। [উভয়ের মস্তকে হাত রাখিলেন]

অজাত—[অবনত মস্তকে] আপনি মহান্, আপনি মহান্।

ছায়া-রৌদ্র

শ্রী হেমচন্দ্র বাগ্‌চী

নীলুকে জানিতাম।

বর্ষার দিনে নীলু কচুঘেঁটু-বুনোওলভরা ডোবার ধারে পুঁটিমাছধরা একগাছি ছোট ছিপ লইয়া বসিয়া থাকিত। তালিদেওয়া ছাতাটি মাটিতে পোঁতা একটি লাঠির সঙ্গে বাঁধা থাকিত। তাহারই নীচে নীলু কোন্ সকালে চারিটি পান্তা-ভাত খাইয়া সারা বেলা হরিদ্রাবর্ণ পানায় ভরা ডোবার দিকে চাহিয়া থাকিত।

তোমরা হয় ত বলিবে—তাহা হইলে সে মাছ ধরিত কখন? সত্যই, মাছধরা তাহার বেশী হইত না। সন্ধ্যায় যখন সে বাড়ী ফিরিত, সঙ্গে গুটিদশ পুঁটিমাছ।

ভাইদের মধ্যে নীলু-ই বড়। তোমরা তাহার বয়স কত আন্দাজ কর?—এই, বারো থেকে পনেরোর মধ্যে যে কোনো বয়সেই তাহাকে মানায়। পাৎলা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, সমস্ত অবয়বের মধ্যে মুখখানা দৃষ্টি আকর্ষণ করিত বেশী। মেয়েদের মুখের মত কোমল মুখ—কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলেই হাসিয়া উত্তর দিত।

যেদিন সে মাছ ধরিত না, সেদিন তাহাকে সমস্ত দুপুর পাড়ার প্রায় সব জায়গাতেই ঘুরিতে দেখা যাইত। দারুণ গরমের দিনে একটি ছেঁড়া পুরানো গরম কোট গায়ে দিয়া নীলু ঘুরিত।

—কি রে, এত গরমে ও কি?

মাথা নীচু করিয়া হাসিতে হাসিতে নীলু বলিত—ও বাবার কোট!

যেন বাবার কোট গায়ে দিয়া বেড়াইবার বয়স ও যোগ্যতা তাহার আছে!

নীলুর বাবা মোহন চক্রবর্ত্তী পাড়ার লোকদের কাছে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—তোমরা শুন্‌ছ সব, ছেলেটাকে এবার ইস্কুলে দেব ভাব্‌ছি, দিনরাত উড়ে' উড়ে' মাছ ধরে' ধরে' বেড়াচ্ছে—ইস্কুলে দিলে তবু যা হোক্ একটা কিছু হবে—কি বলো হে ভায়া?

মোড়লরা তামাক টানিতে টানিতে বলিত—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা' হবে বৈ কি, তা' হবে বৈ কি—দা' ঠাকুর! চক্রবর্ত্তী মাসকতক ঐ রকম বলিয়া বেড়াইলেন, অবশেষে একদিন বাড়ী আসিয়া গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, - ছোঁড়া কি বলে? ইস্কুল-টিস্কুল যেতে টেতে চায়?

—তুমি নিজে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না, কি বলে—সব আমাকেই কর্‌তে হবে, যেমন বাপ তার তেমনি ছেলে!

চক্রবর্ত্তী কয়েকদিন উস্‌খুস্ করিয়া বেড়াইলেন, ছেলেকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। তবে নীলু নিজেই একদিন না কি বইস্লেট জোগাড় করিয়া ইস্কুলে পড়িতে গেল।

মাস দুই পড়ার পর শুনিলাম নীলু ইস্কুল ছাড়িয়াছে।

একদিন রাস্তার ধারের জামগাছ বাহিয়া নীলুকে নামিতে দেখিলাম। এক কোঁচড় জাম লইয়া নীলু ঘর্ম্মাক্তকলেবরে আমার সম্মুখ দিয়া দৌড়াইয়া পলাইতেছিল। বাধা দিলাম—নীলু, তুই না কি ইস্কুল ছেড়েছিস?

মাথা নীচু করিয়া হাসিতে হাসিতে নীলু বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, ছেড়ে দিয়েছি।

—কেন বল্ দেখি?

—পণ্ডিত বড্ড মারে, তা' ছাড়া আমার বয়েস বেশী ব'লে ছেলেগুলো বড্ড ক্ষেপায়।

—কি করবি এখন ?

নীলু সোজা আমার মুখের দিকে চাহিল। নীলুকে তেমন করিয়া কোনোদিন চাহিতে দেখি নাই। অত্যন্ত অসঙ্কোচে সে বলিয়া ফেলিল—কি আর করব ?

যেন করিবার কিছু নাই. থাকিলেও নীলুর তাহা জানিবার কোনো প্রয়োজন নাই।

•

মোহন চক্রবর্ত্তীর কয়েক ঘর যজমান ছিল। আর ছিল কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি। এই সবের আয় হইতে এক রকমে কষ্টের সংসার চলিয়া যাইত। তিনটি ছেলে, গৃহিণী আর নিজে—এতগুলি জীবের আহার-সংস্থানটা পল্লী বলিয়াই সম্ভব হইত।

সেবারে পল্লীতে অজন্মা দেখা দিল। বৃষ্টি হইল না। শুনিয়াছিলাম সেই সময় হইতেই চক্রবর্ত্তীর সংসারে দারিদ্র্যের গাঢ় ছায়া ঘনাইয়া আসে। নীলুদের প্রতিদিন একবেলা করিয়া আহার জুটিত।

পূজার সময় বিদেশ হইতে বাড়ী আসিয়া দেখিলাম, অভাব-অনটন প্রায় সকলেরই। নীলু-দের বাড়ী গিয়া দেখি, চক্রবর্ত্তীর শরীর আধখানা হইয়া গিয়াছে। না খাইয়া একবেলা খাইয়া চক্রবর্ত্তী একটু হুইয়া পড়িয়াছেন। আমাকে দেখিয়া একটু শীর্ণ হাসি হাসিয়া বলিলেন—ভায়া এসেছ। বেশ-বেশ, বসো!

জানিতাম চক্রবর্ত্তীর ভোজন-বিলাস ছিল, নিজে যেমন খাইতে পারিতেন, পাঁচজনকে খাওয়াইতেও তেমনি ভালোবাসিতেন। বলিলাম, —বল্বো না দাদা, আমাদের বাড়ীতে আজ আপনাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের নেমন্তন্ন রইলো। বৌঠাকরুণ, আর ছেলেরাও যাবেন, মা ব'লে দিলেন।

—বেশ বেশ ভাই, তা'তে কি ? তা'তে কি ? নিশ্চয়ই যাব ; আর তোমরাই হলে গিয়ে আশা-ভরসার স্থল! আর সে সব দিন ত নেই যে,—গিয়ে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবো! কর্ত্তাদের কাল হওয়ার পর থেকে আর সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই!

চক্রবর্ত্তী আমোদ-আহ্লাদ ভালোবাসিতেন। গ্রামে নূতন জামাই আসিলে চক্রবর্ত্তীর ডাক পড়িত আগে। উৎসব-পার্ব্বণে চক্রবর্ত্তী ম্যানেজার হইতেন। রন্ধন. পরিবেশন প্রভৃতি কর্ম্মে চক্রবর্ত্তীর পারদর্শিতা ছিল অসাধারণ।

একবার চক্রবর্ত্তী পৌষমাসের বনভোজনে গ্রামশুদ্ধ শূদ্র ব্রাহ্মণ সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মাংস হইবে, আরও নানা অনুষ্ঠান আয়োজন আছে। সব ব্যাপার শেষ হইলে দেখা গেল মাংসের কোনো আয়োজন নাই। অমনি সকলে চক্রবর্ত্তীর খোঁজে বাহির হইল। চক্রবর্ত্তী উধাও। কোথাও পাওয়া যায় না। অবশেষে দেখা গেল. চক্রবর্ত্তী দীঘিতে গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসিয়া আছেন। সকলে টানিয়া তাহাকে উঠাইল।—ব্যাপার কি ? পাঁটা কৈ ?

—দোহাই ভাই, মাংস আমি রেঁধে দেব, পাঁটা কাটা আমাকে দেখ্তে নেই।

—আচ্ছা, আমরা কাট্ছি, তুমি ধরবে এস।

—না ভাই, আমি পারব না ; তোমরা যা হয় করো গিয়ে!

—না, তোমাকে ধরতেই হবে ; কিছুতেই শুনবো না। মাংস খাবে, আর পাঁটা ধরবে না, তা'র মানে ?

—তা' তোমরা যখন বল্ছ. তখন আর উপায় নেই ; ত' দেখো, আমাকে ত পাঁটা কাটা দেখ্তে নেই, আমি চোখ বুঁজে ধ'রে থাকি. তোমরা কাটো।

চক্রবর্ত্তী সত্যসত্যই চোখ বুজিয়া পাঁটা ধরিলেন। আর সেই হইতে সকলেই তাঁহাকে বলিত পাঁটা-ধরা চক্রবর্ত্তী।

সে দিনের কথা বেশ মনে আছে। চক্রবর্ত্তীকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। মা একথা জানিতেন না। তাঁহাকে আসিয়া বলিতেই তিনি বলিলেন—তা বেশ তো! মোহনরা খাবে, এতে আর কি? জোগাড়-টোগাড় আর বেশী কিছু করতে হবে না; যা' আছে তা-ই হ'বে।

মধ্যাহ্নে চক্রবর্ত্তী স-পরিবারে আসিয়া উপস্থিত। কেবল নীলুকে দেখিলাম না। চক্রবর্ত্তীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—দাদা নীলু কৈ?

—হুঁ, তুমিও যেমন, সে সেই সকালে পান্তা খেয়ে মাছ ধর্‌ত গিয়েছে; ওটার কিছু হ'বে না বুঝ্‌লে ভায়া—সেই বলে না—

লিখিব পড়িব মরিব দুখে—
মচ্ছ ধরিব খাইব সুখে!

ব্যাটার আমার তাই হয়েছে!

—তা সে যাক্‌ আপনি বসুন, তামাক-টামাক খান্‌।

সপুত্র চক্রবর্ত্তী বেশ পরিতৃপ্তির সহিত আহারাদি করিলেন। বাহিরের ঘরে তাঁহাকে টানিতে টানিতে লইয়া আসিলাম। ছেলে দু'টিও পিছনে পিছনে আসিয়া হাজির। তাহাদের বলিলাম—তোরা এখন যা, খেলা-টেলা কর গিয়ে। তাহারা চলিয়া গেল।

দরজাগুলি বেশ ভালো করিয়া বন্ধ করিলাম। আড়চোখে চক্রবর্ত্তীর দিকে চাহিতেই দেখি, তাম্রকূট-ধূমে ঈষৎ পিঙ্গল গুম্ফের ফাঁকে-ফাঁকে চক্রবর্ত্তী মিটি-মিটি হাসিতেছেন। ঘরে আরও কয়েকজন পরিচিত গ্রামের বন্ধুবান্ধব ছিলেন।

তাঁহারা সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন—ওহে, দাদার শিবনেত্র হ'য়েছে। ব্যাপার সুবিধের নয়। বলিলাম—দাদা, তামাকে সুখটান দিয়ে সটান ওঠো দেখি একবার। সেটা একবার হ'য়ে যাক্‌।

—আর ভায়া, তোমরা যেমন, আর সে সব দিনকাল কি আছে? বলে গিয়ে, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—ওসব ছেলেমানুষী কি আর ভালো লাগে?

—না দাদা, উঠতেই হ'বে। বুড়ো হ'লে কি হয়? প্রাণটা ঠিকই আছে। নাও, ওঠো ওঠো—বলিয়া সকলে মিলিয়া চক্রবর্ত্তীকে একরকম জোর করিয়া উঠাইয়া দিলাম।

বামহস্তে হুঁকাটি ধরিয়া মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে চক্রবর্ত্তী উঠিলেন। সেই একদিনের জন্ত বোধ হয় প্রৌঢ়ের যৌবন-দিন ফিরিয়া আসিল। চক্রবর্ত্তীর সে রূপ আমার ঠিক মনে আছে। অর্দ্ধছিন্ন মলিন কাপড়খানি হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। শীর্ণ শরীরে শতগ্রন্থিযুক্ত যজ্ঞোপবীত—শরীরের চর্ম্ম সামান্ত একটু লোল হইয়া পড়িয়াছে। সম্মুখের কয়েকটি দন্ত নাই। তবু চক্রবর্ত্তী উঠিলেন।

তার পরের ব্যাপারটি তোমরা বোধ হয় ঠিক অনুমান করিতে পার না। কে বলিবে দারিদ্র্য মানুষের মানস-শক্তিকে নষ্ট করিয়া দেয়! অন্ততঃ সেদিন যদি তোমরা চক্রবর্ত্তীকে দেখিতে!

প্রথমে অল্প গুঞ্জন করিতে করিতে চক্রবর্ত্তী সমস্ত ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তারপর মুমূর্ষু সিংহের হুঙ্কারের মত একটি ঘনগম্ভীর নির্ঘোষ ছাড়িয়া চক্রবর্ত্তী হুঁকা হস্তে ঘরের মধ্যে প্রচণ্ড তাণ্ডব জুড়িয়া দিলেন। তারপর কিছুক্ষণের জন্ত স্তব্ধতা। পরে চক্রবর্ত্তীর বিখ্যাত নৃত্য আরম্ভ হইল।

আনা পাভ্‌লোভার নাচ বোধ করি দেখিয়াছ, কিন্তু চক্রবর্ত্তীর নৃত্য! তাহার আর তুলনা নাই!

নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে চক্রবর্ত্তীর গান চলিতে লাগিল।

আমরা বলিলাম—দাদা, সেই গানটা হ'য়ে যাক্!

চক্রবর্ত্তী গাহিলেন—

বুড়ী, তুই গাঁজার জোগাড় কর—
ও তোর জামাই এল দিগম্বর
—বুড়ী, তুই গাঁজার জোগাড় কর।

তারপর বিবিধ তান-লয়-সম্বলিত মুখের সব অদ্ভুত শব্দ হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যও চলিতে লাগিল।

অবশেষে চক্রবর্ত্তীকে আর কিছুতেই থামানো যায় না।

চক্রবর্ত্তী বলিতে লাগিলেন—আর একবার নেচে নি ভায়ারা, এমন দিন কি আর হ'বে? বলিতে বলিতে চক্রবর্ত্তী মাথা নাড়িতে নাড়িতে পা দু'খানি তালে তালে মাটিতে ঠুকিয়া ঠুকিয়া গাহিলেন—

ওহে, বাড়ীর কাছে বেগুন ছিল,
তা-ও ত' খাওয়া হ'ল না—
হোঁকা কি, হোঁকা কি, হোঁকা কি...

হঠাৎ পশ্চিম দিকের জানালার খড়খড়ি একটু নড়িয়া উঠিল। আমরা সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম—কে রে?

হুড়মুড় করিয়া শব্দ হইল। তারপর কে যেন দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি জানালা খুলিয়া দেখি, নীলু ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতেছে। হাসিয়া চক্রবর্ত্তীকে বলিলাম—দাদা, নীলু তোমার নাচ দেখ্‌তে এসেছিল।

চক্রবর্ত্তী তখন চৌকীতে বসিয়া। বলিলেন—ও ব্যাটা অমনিধারা। কুষ্মাণ্ড কোথাকার।

তারপর অনেকদিন গ্রামে ছিলাম না। অন্নসংস্থানের জন্য বিদেশে থাকিতে হইত। সময় ও সুবিধা হইলে গ্রামে আসিতাম। পল্লীর অনাবিল আনন্দ-ধারার শেষ অঞ্জলি আমরা পান করিয়াছিলাম। এখন গ্রামের আর সে রূপ নাই।

সেবার গ্রামে আসিয়া শুনিলাম, চক্রবর্ত্তী দেহত্যাগ করিয়াছেন। জীবনের প্রথমদিকে চক্রবর্ত্তীর সুখ-সৌভাগ্য ছিল। ঘরে অন্ন ছিল, গোয়ালে গরু ছিল। যজমানদের হৃদয়ে ভক্তি ছিল। জীবনের শেষদিকে চক্রবর্ত্তীর অন্নাভাব হয়। সেই অন্নাভাবের দুশ্চিন্তাই চক্রবর্ত্তীর কাল হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে চক্রবর্ত্তী গৃহিণীকে বলিয়া যান্—গিন্নী, আমি ত চল্‌লাম, তোমার এইবার সুখ হ'বে! ছেলেরা রইল।

শুনিলাম, নীলুর মা ঘটকদের বাড়ীতে রন্ধনাদি করিয়া দেন, তাহার বিনিময়ে তাঁহার ছোট দু'টি ছেলে ও তিনি নিজে সেখানে দুইবেলা আহারাদি করিতে পান। নীলু বাড়ীতে রান্না করিয়া খায়।

সেদিন নীলু আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত। দেখিলাম নীলু বড় হইয়াছে। বুকের প্রসার বাড়িয়াছে। লম্বাও হইয়াছে অনেকখানি। কিন্তু তাহার মুখের কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই। তেমনি স্বচ্ছ কমনীয়তা—বুদ্ধির দীপ্তি ঠিক ছোট বয়সের মতই আছে।

নীলু বলিল—কাকাবাবু, আমার হাতের লেখা ত' তত ভালো নয়; পুজোর মন্ত্রগুলো যদি আপনি এই খাতায় লিখে দেন, তা' হ'লে যজমানের বাড়ীতে পুজোর সময় আমার সুবিধে হ'তে পারে।

ব'লিলাম—তুমি নিজেই লেখো নীলু, লেখাটা আমাকে দেখিয়ে নিয়ে যেও; আমি, ভুল হ'লে সেগুলো ঠিক ক'রে দেব।

—আজ্ঞে আচ্ছা—বলিয়া নীলু চলিয়া গেল।

তারপর একদিন দেখি, গোটা গোটা অক্ষরে নীলু বালির কাগজে মন্ত্র লিখিয়া আনিয়াছে।

স্থানে স্থানে ভুল ছিল ; সেগুলি সংশোধন করিয়া দিলাম।

আর একদিন নীলু আসিয়া বলিল—কাকাবাবু, এ মন্ত্রে সব পুজো হ'য়ে ওঠে না—আপনি যদি আমাকে একখানা 'পুরোহিত-দর্পণ' আনিয়ে দেন ত', বড় ভালো হয়।

বুঝিলাম নীলুর পিপাসা আছে ; নীলুকে একখানা 'পুরোহিত-দর্পণ' আনাইয়া দিলাম। নীলু তাহাতেই বেশ কাজ চালাইতে লাগিল।

আমার ছুটি তখনও শেষ হয় নাই। একদিন বৈকালে নীলুদের বাড়ীতে বেড়াইতে গেলাম। দেখিলাম, নীলু নিজেই বাঁশ কাটিয়া কাঞ্চ দিয়া উঠানের একদিকে বেড়া দিতেছে। ভিতরে ছোট্ট একটু সাজর ক্ষেত। নীলুর যত্নে সেগুলি বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে।

বলিলাম—নীলু, বেড়া দিচ্ছ বুঝি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, নইলে গরু-বাছুরে বড় নষ্ট ক'রে দেয়। ও পাড়ার হার বাগদীর ছাগলগুলো আর গাছ-পালা রাখ্‌তে দেবে না।

তারপর বেড়া দিতে দিতে নীলু ডাকিল,—মা, ওমা, কাকাবাবুকে বস্‌তে জায়গা দাও না !

—এই যে, দি—বলিয়া নীলুর মা দাওয়ায় একখানি আসন পাতিয়া দিলেন, বলিলেন—বসো ঠাকুর-পো !

বসিলাম।

একথা সে কথা হইতে হইতে নীলুর মা বলিলেন—ঘটকদের বাড়ীতে আর কাজ করা পোষাল না ঠাকুর-পো !

—কেন ?

—কর্ত্তার আপত্তি, কি গিন্নীর আপত্তি ঠিক বুঝলাম না। আমাকে ত জানোই। পাগল হাবা মানুষ, সদা-সর্ব্বদা মন জুগিয়ে জুগিয়ে আর কাজ কর্ত্তে পারি নে।

বলিলাম—ব্যাপারটা কি হোল খোলসা ক'রে বলুন !

—একদিন রান্না-বান্না সেরে-সুরে বাড়ী আস্‌ছি, গিন্নী আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন,—এর চেয়ে আমার উড়ে বামুনই ভালো। কেন রে বাপু, তিন-তিনটে লোকের খাওয়া-পরা জোগাই। ঠিক এতগুনি টাকা খেতে পর্ত্তে লাগে।—বলিয়া হাতের একটা ভঙ্গী করিলেন।

বলিলাম—তারপর ?

—তারপর ত, চার-পাঁচ দিন পরে একদিন সকালে রোজ যেমন যাই,তেমনি গিয়ে দেখি, উড়ে বামুন এসেছে। সে-ই রান্না চড়িয়েছে। আমি ছেলে দুটোর হাত ধরে বাড়ী ফিরে এলাম। নীলু যজমান বাড়ী ঘুরে ঘুরে যা পায়, তাতে ত' আর এতগুলো লোকের খাওয়া-পরা চলে না ঠাকুর-পো ! তাই বলছিলাম কি—তোমার ত অনেক জানা-শোনা আছে, আমার নীলুর একটা কাজকর্ম্ম জুটিয়ে দাও।

মনে মনে বড় দুঃখ হইল। কাজকর্ম্ম জুটানো যে কত সহজ তাহা আর এই দারিদ্র্য-পীড়িতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম না। শুধু বলিলাম—আচ্ছা, দেখবো ! নীলুকে কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে হবে।

—তা ত' হবেই। না গেলে আর কি ক'রে হয় ?

নীলু বেড়া দিতে দিতে সবই শুনিতেছিল। আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—আমি যাব কাকা বাবু আপনার সঙ্গে।

নীলু তাহার বাবার সেই ছেঁড়া গরম কোট গায়ে দিয়া, ছোট্ট একটি গামছার পুঁটুলিতে একখানি কাপড় লইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠের পথ ধরিলাম। তিলফুলে আর সরিষাফুলে মাঠখানি আচ্ছন্ন। হঠাৎ পিছন ফিরিয়া দেখি, নীলু খুব আস্তে আস্তে

আসিতেছে। একটু থামিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। নীলু আর কান্না চাপিতে পারে নাই।

তারপর অনেকদিন গিয়াছে। একটি কাঠগোলায় আমার এক বন্ধু কাজ করিতেন। তাঁহারই সুপারিশে সেখানে নীলুর একটি কাজ জুটাইয়া দিলাম। কাঠগোলাতেই নীলু থাকিত। মাঝে মাঝে তাহাকে গিয়া দেখিয়া আসিতাম। বন্ধু নীলুর কাজের সুখ্যাতি করিতেন। নীলু প্রতিমাসে দশটাকা করিয়া মায়ের নামে মনি-অর্ডার করিত। একদিন কাঠগোলায় গেলে বন্ধু বলিলেন—নীলুর মাইনে বেড়েছে, তবে এর মধ্যে একটা কিন্তু আছে। ওকে কর্তারা আমাদের ব্রাঞ্চে পাঠাতে চান্, তা আমি ত আর আপনাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে কিছু বলতে পারিনে।—কি বলেন?

বুঝিলাম, আসামের জঙ্গলে, যেখান হইতে কাঠ এখানে চালান আসে, সেইখানে নীলুকে থাকিতে হইবে। ভাবিলাম, নীলু হয়ত পারিবে, কিন্তু নীলুর মা?

বলিলাম—নীলুর মাকে একখানা চিঠি লিখে জানা দরকার।

এমনি সময় নীলু আসিয়া উপস্থিত হইল। চাহিয়া দেখিলাম, যে শীর্ণ ছেলেটি ডোবার ধারে বসিয়া মাছ ধরিত, এ সে নীলু নয়। নিয়মিত পরিশ্রমশীল দীর্ঘ বলিষ্ঠ যুবক—আসামের জঙ্গল কেন?—বোধ হয় সে গ্লোব-ট্রটার হইয়া সারা-পৃথিবী হাঁটিয়া বেড়াইতে পারে। তবু তাহাকে বলিলাম—মাকে একখানা চিঠি লেখ্ নীলু, তারপর আসামে যাস্।

নীলু তেমনি মাথা নীচু করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, লিখ্‌ব।

তারপর একদিন নীলু আমার মেসে আসিয়া হাজির। বলিল—কাকাবাবু, বাড়ী যাচ্ছি, এই দেখুন, মার চিঠি।

আসাম যাইবার আগে নীলুর মা একবার তাহাকে দেখিতে চাহিয়াছেন। বলিলাম—যা, বেশী দেরী করিস্ নে।

এক সপ্তাহ পরে নীলু বাড়ী হইতে শুষ্কমুখে ফিরিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—কি রে, অসুখ-বিসুখ হয় নি ত'?

—আজ্ঞে না, অসুখ হয় নি. তবে মার যত সব কাণ্ড। আপনি কিছু জান্‌তেন না?

—কই না. ব্যাপার কি?

—আর ব্যাপার! একটা বন্ধন জুটিয়ে দিলেন আপনারা সবাই মিলে—ব্যাপার আর কি?

বুঝিলাম, নীলুর মা নীলুর বিবাহ দিয়াছেন।

তার কয়েকদিন পরেই নীলু আসাম চলিয়া গেল।

আসাম হইতে নীলু আমাকে চিঠি লিখিল—কাকাবাবু, আসাম বড় চমৎকার দেশ। এত ঘন জঙ্গল আমি অন্যত্র কোথাও দেখি নাই। আপনি শুনিলে অবাক্ হইবেন। আমি এখানেও রোজ মাছ ধরি। পাহাড়-পর্ব্বত যে কত, হরিণ বাঘ ভালুক সবই এখানে পাওয়া যায়। এখানে আসিলে আপনি কতই-না সুখী হইতেন! মাকে আমার জন্য ভাবিতে বারণ করিবেন।

তাহার সেই চিঠিখানি আমি তাহার মাকে পাঠাইয়া দিলাম। এমনি করিয়া নীলু আমাকে চিঠি দিত।

বহুদিন পরে গ্রামে গেলাম। নীলুর মা আমাকে দিনের মধ্যে শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—ঠাকুর-পো, নীলু আমার ভালো আছে ত'? বাছা আমার কত দিন হ'ল গিয়েছে, কবে সে ফিরবে বলতে পারো ঠাকুর-পো?

হাসিয়া বলিলাম—বৌ ঠাকরুণ, অত ভাব্‌তে নেই। আপনার ছেলের মত অনেক মায়ের ছেলেই বিদেশে থাকে। নীলু আপনার ভালোই আছে।

—আহা ষাট্ ষাট্ ষষ্ঠীর দাস, বেঁচে থাক্, ভালো থাক্। মায়ের প্রাণ কি না ঠাকুরপো, সদাসর্ব্বদাই ভাবি। কত কষ্টে ছেলের আমার বিয়ে দিলাম। তা', মা লক্ষ্মী আমার বড় শান্ত, ভালো মেয়ে; কবে যে নীলু ফিরে আস্‌বে, কবে যে সে ঘর-বসত্ কর্‌বে এই ভেবে আমার দিন গেল।

বৌমা এখানেই আছেন?

—হাঁ, মা আমার এখানেই আছেন। বিয়ে দিলাম। নীলু আমায় বল্লে কিনা—সাতসকালে বিয়ের এত তাড়াতাড়ি কেন? আমি বল্‌লাম—ও মা, বিয়ে হ'বে না, বলিস কি নীলু? তারপর, বিয়ে ত হ'লো; স্থায্য প্রাপ্য বেয়াই আমার দিলেন না; তা বলে বৌমার আমি কোনোদিন অযত্ন করেছি কি? কৈ বলুক দেখি, কেউ সে কথা! আমি তেমন মেয়ে নই বুঝলে ঠাকুরপো!

বুঝিলাম, কিন্তু শুধু বলিলাম—কোনো ভাবনা নেই আপনার। নিশ্চিন্ত থাকুন। নীলু ভালোই আছে।

কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া আসিয়া নীলুর চিঠি পাইলাম—লিখিয়াছে—কাকাবাবু এখানে আসিয়া আমি বেশ ভালোই ছিলাম। রোজ মাছ ধরিতাম। কাজকর্ম্মও বেশ আনন্দের সঙ্গেই করিয়াছি। আজ প্রায় দিন পনেরো হইতে বড় মজার ব্যাপার হইয়াছে। রৌদ্রে বসিয়া মাছ ধরি—আর কেবলি মনে হয়, পিঠের শিরদাঁড়া দিয়া কি যেন শির শির করিয়া উঠিতেছে, তারপর ক্রমশঃ সর্ব্বশরীর কাঁপিতে থাকে। রৌদ্রে চোখ মুখ জালা করে। ইচ্ছা করে শুইয়া থাকি। এমনি প্রায় সমস্ত রাত্রি। সকালে ভালো থাকি। তারপর রোজকার মত স্নান আহার করি। তারপর যেই রৌদ্রে বাহির হই, অমনি সেই রকম হয়। কৈ, এমন ত বাড়ীতে হইত না! এখানে ডাক্তার-বদ্যি নাই। আপনি আমাকে অতি অবশ্য অবশ্য কোন ঔষধ পাঠাইয়া দিবেন। শরীর এত খারাপ হইয়াছে যে, আপনি দেখিলে চিনিতে পারিবেন না। মাকে এখন এ-কথা জানাইবেন না। আর, কাঠগোলার মুনিবদের চিঠি দিলে তাঁহারা কোনো জবাব দেন না। আপনি তাঁহাদের আমার অবস্থার কথা বলিয়া ছুটি মঞ্জুর করার ব্যবস্থা করিবেন।

নীলুর জন্ম মনটা বড় চিন্তিত হইল। কাঠগোলায় গিয়া সব কথা বলিলাম। তাঁহারা বলিলেন—একটা দরখাস্ত দিন, তারপর ছুটির মঞ্জুর হ'বে।

দরখাস্ত দিয়া আসিয়া নীলুর নামে একটি ঔষধ প্যাক্ করিয়া পাঠাইলাম। ডাক্তার বলিলেন—খুব সাবধান মশায়—জায়গা বড় খারাপ; শীগ্‌গির Change দরকার।

তারপর কাঠগোলায় আনাগোনা করিয়া করিয়া প্রায় একমাস পরে নীলুর ছুটি মঞ্জুর হইল। ইহার মধ্যে আর নীলুর কোনো পত্র পাই নাই। নীলুকে চলিয়া আসিবার জন্ম চিঠি দিলাম।

বহুদিন পরে অনেকগুলি পোষ্টঅফিসের নানচিহ্ন বক্ষে বহিয়া আমার চিঠি ফিরিয়া আসিল। মনটা হঠাৎ একটা অলক্ষিত ভয়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িল! তাহা হইলে কি নীলু নাই? আত্মীয়স্বজনবিহীন অপরিচিত বনজঙ্গলের দেশে কি নীলু সব বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেল?

কিছুদিন পরে আমার ধারণা-ই সত্য হইল। নীলুর বিছানা-বাক্স প্রভৃতি আমার ঠিকানায় চলিয়া আসিল। কি বলিব, কাহাকে কি জানাইব—মনের অতলতলে সব বেদনা শুব্ধ রাখিয়া অচল হইয়া রহিলাম।

কিন্তু ক্রমশঃ সব কথাই প্রকাশিত হইল। বাড়ী আর গেলাম না। সে হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিবার অনেকদিন শক্তি আমার ছিল না। পরে আবার বাড়ী গেলাম। ভাবিলাম, সময়ে সবই সহ্য হয়। দারুণ পুত্রশোকও বোধ হয় নীলুর মা অনেকটা সহ্য করিয়া লইয়াছেন।

গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা এখানে আর না বলিলেও বোধ হয় চলিত। নীলুর মা বেশ নিশ্চিন্তভাবে পূর্ব্বের মতোই রহিয়াছেন। আমি বাড়ী আসিয়াছি জানিয়া দেখা করিতে আসিলেন। বলিলেন—ঠাকুরপো কতদিন পরে এলে। একটা খবরও ত দিতে হয়! নীলুর খবর কিছু পেয়েছ? চিঠিপত্র বা কোনো খবর—?

আমি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া রহিলাম। নীলুর মৃত্যু-সংবাদ আমি ত দিয়াছি। তবে কি ইঁহারা কিছু জানিতে পারেন নাই? এখন কি করিয়া ইঁহাদের সে খবর আমি দি!

বেশীক্ষণ ভাবিতে হইল না, নীলুর মা নিজেই বলিলেন,—প্রথমে ত বিশ্বাস হোল না ঠাকুরপো, নীলু আমার নেই! তারপর, কি ভেবে গেলাম ছুটিপুরের দেয়াসীনদের বাড়ী। দেয়াসীনদের বাড়ী বোধ হয় কখনো যাও নি! মস্তবড় বটগাছের নীচে মা দেয়াসীন থাকেন; মাথায় বড় বড় জটা—চোখ্ দুটো জবাফুলের মত। সেখানে গিয়ে পেন্নাম করে ভর উঠবার আগে এক আনার পয়সা মা'র চরণধুলোয় দিলাম—বল্লাম, মা, আমি কাঙাল, অনাথ; ছেলে আমার আছে কি নেই, সেই কথা জান্তে এসেছি। কত লোক সেখানে ঠাকুরপো! সবাই আমার মত ধন্না দিয়ে প'ড়ে আছে। তারপর ত নানা বাদ্যি বাজ্তে লাগ্‌ল। তারপর মা'র ভর নাম্‌ল। আবার মিনতি করে বল্লাম—মা, আমি কাঙাল, অনাথ—উত্তরে মা শুধু মাথা নাড়্তে নাড়্তে বল্লেন, হুঁ। তারপর একটা লোক উপর থেকে নেমে এল; আমার কাণে কাণে বল্লে, মা, তোমার কথা বলেছেন, আরও একআনা দিতে হ'বে। আরও এক আনা পয়সা তা'র হাতে দিলাম। তারপর আদেশ হ'ল—ছেলে তোমার আছে—এক মাড়োয়ারীর বাড়ীতে তা'রা তা'কে ভুলিয়ে রেখেছে। তক্ষুণি আমার মনে হ'ল—সে ত যে সে জায়গা নয়, কামরূপ কামিখ্যে। তাই বল্তে এলাম ঠাকুরপো তোমাকে যে, ভালো ক'রে সেই জায়গা আমাকে দেখ্তে হ'বে। সেই মাড়োয়ারীর বাড়ী, সেখানে নিশ্চয়ই আমার নীলু আছে।

কত করিয়া তাঁহাকে বুঝাইলাম। আসামের কালাজ্বরে নীলুর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার কিন্তু স্থির বিশ্বাস নীলু বাঁচিয়া আছে। সেই বিশ্বাসের বশে বধূর বিধবাবেশ তিনি হইতে দেন নাই। বধূ এখনও সীঁথিতে সিঁদূর পরে, সধবার মত থাকে।

অনেকদিন হইয়া গেল, নীলুর মা'র নীলু এখনো ফিরিয়া আসে নাই। হঠাৎ সেই ডোবার দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল। তেমনি হরিদ্রাবর্ণ পানায় ডোবাটি ভরিয়া গিয়াছে। দ্বিপ্রহর রৌদ্রে কে একজন ছাতা মাথায় দিয়া মাছ ধরিতেছে। সেইখানে গিয়া বসিলাম। বেলা বাড়িয়া চলিল। নিস্তব্ধ পল্লী, ঘাটে একটি বধূ জল লইতে আসিল। পরিপূর্ণ যৌবন-শ্রী—ভাবিলাম বোধ হয় নীলুর বৌ। সূর্য্যালোক ক্রমশঃ বিষণ্ণ হইয়া আসিল। কৈ? নীলুর বধূর সীঁথিতে ত সিঁদূর নাই। সব আশা সব বিশ্বাস জলাঞ্জলি দিয়া বোধ হয় এই তরুণী বধূটি বৈধব্যবেশ অবলম্বন করিয়াছে। নীলুর মা কিন্তু এখনও বলেন—ওগো, তোমরা কেউ গেলে না। নীলু যে এখনো বেঁচে আছে।

কপিলানন্দ

শ্রী সুনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শাঁখারীটোলার প্রবীণ সাহিত্যিক বামাচরণ হালদারকে ও-অঞ্চলে চিনিত সবাই,কিন্তু মার্চেন্ট আফিসের ত্রিশটাকা মাহিনার কেরাণী শশাঙ্কই তাঁকে আরো একটু বেশী করিয়া চেনে।

শশাঙ্ক অত্যন্ত নিরীহ, শান্ত প্রকৃতির ভালো-মানুষ। বয়স ত্রিশের মধ্যে। তাহার মুখ-চোখের মধ্যে এমন একটি করুণ অসহায়ভাব আছে যে, দেখিলেই করুণা জাগে। সকালে, শ্যামবাজারের কোন্ এক বড়লোকের বাড়ী টিউশানী করে,—আফিস যায় এবং সন্ধ্যার পর মাঠে একটু হাওয়া খাইয়া মেসে ফেরে।

এমনিভাবেই দিন নেহাৎ মন্দ কাটিতেছিল না, অকস্মাৎ কি জানি কেন, কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে বা অশুভ ক্ষণে সে বামাচরণবাবুর চোখে পড়িয়া গেল। বামাচরণবাবুও একজন প্রবীণ সাহিত্যিক হইয়া, কেন যে কৃপা করিয়া এই নগণ্য ব্যক্তিটিকে আবিষ্কার করিলেন—বলা শক্ত। সে যাহা হউক, প্রথম প্রথম শশাঙ্ক বেচারী বিপদে পড়িল। একে সে স্বভাবতই একটু মুখচোরা এবং লাজুক প্রকৃতির ছেলে, কাজেই সহিয়া যাওয়া ছাড়া তার আর অন্য উপায় রহিল না।

সেদিন সকালে বামাচরণবাবু বৈঠকখানায় বসিয়া কা'কে যেন বলিতেছেন—"আছে হে আছে, —তোমরা জান না, জিনিষ আছে শশাঙ্ক-র মধ্যে। মেসে পড়ে' পড়ে' ঘুমিয়ে আর আপিসে কলম পিষেই ওর মনে মর্চ্চে পড়ে' যায় নি। রস-বোধ আছে। আজকালকার ছেলেদের মতন উদ্ধত প্রকৃতির নয়। দেখে নিয়ো ও উন্নতি করবে।"

কথাটা বলা হইল অন্য একজনকে লক্ষ্য করিয়াই, কিন্তু শশাঙ্ক শুনিতে পাইল। কারণ, বৈঠকখানা হইতে রাস্তার প্রায় অনেকখানিই চোখে পড়ে, এবং বামাচরণবাবুর জানা ছিল, নয়টা পঁয়ত্রিশে শশাঙ্ক মেস হইতে বাহির হইয়া তাঁহার দরজা অতিক্রম করে।

কথাটা অবশ্য যেমনই হোক্, নির্জ্জলা প্রশংসা শুনিয়া শশাঙ্ক-র নেহাৎ মন্দ লাগিবার কথা নয়। কিন্তু, সে যেন শুনিতেই পায় নাই, এমনভাবে ফিরিয়া আসিয়া হঠাৎ জানালার দিকে মুখ বাড়াইয়া কহিল—"বামাচরণবাবু, সেই শিকারের গল্পটা আপনার শেষ করে ফেলুন—আমার এমন লেগেছে—বাস্তবিক আপনার মতন—আচ্ছা আপনি নিশ্চয়ই খুব ভালো শিকারী ছিলেন, নইলে অমন চমৎকার description,—একেবারে যেন চোখের ওপর ভাসছে!

বামাচরণ আনন্দে কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া রহি-লেন, পরে কহিলেন—"গল্প লেখা কি সোজা কথা? অমনি লিখলেই হ'ল? সমস্ত জীবন ধরে' দেখা-শোনায় সাধনা দরকার। তা, হ্যাঁ, আমি দুপুরেই ওটা শেষ করে ফেল্‌বো, তুমি একটু সকাল সকাল ফিরো।"

শশাঙ্ক বিস্মিত হইল। না-হয় একটু বেশী প্রশংসাই সে করিয়াছে, কিন্তু তার বিনিময়ে কি বামাচরণবাবুর সামান্য এতটুকু বিনয় প্রকাশ করিলে ভাল হইত না!

বামাচরণবাবু তাঁহার সমগ্র সাহিত্য-জীবনের মধ্যে এমন একটি নিরীহ, নির্ব্বিরোধ শ্রোতা পাইয়া মনে মনে বেশ খুসী হইয়া উঠিয়াছেন।

শশাঙ্ক-র মেসে গিয়া গল্প শোনানোর মধ্যে যে দীনতা আছে, সেটুকু তিনি স্বীকার করিতে চান না। বাড়ীতেও তাহার 'সখী-সচিব', প্রিয়-ভাষিণী গৃহিণী এ-সব পছন্দ করেন না, কারণ একমাত্র কন্যা মুক্তামালা ওরফে পুঁটু বারোর পা দিয়াছে।

অগত্যা অগতির গতি রামের চায়ের দোকানই, তাঁহার সাহিত্য-চর্চ্চার উপযুক্ত আশ্রয় স্থল হইয়া উঠিয়াছে। নানা বিভিন্ন রসের রসিকের উৎপীড়নে তাঁহাদের এই নিবিড় সাহিত্য-চর্চ্চার যে ব্যাঘাত হইত না তাহা নহে. তবু অনেকেই তাঁহার গল্প শুনিত এবং তারিফ করিত। কিন্তু তাহাদের কথা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। কারণ জনান্তিকে তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন, ওগুলি নাকি ঠিক প্রশংসা নয়, বেশীর ভাগই প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ।

একদিনের কথা বলিতেছি।

কলিকাতার ধূলি-মলিন পথে সন্ধ্যার ছায়া তখন নিবিড় হইয়া আসিয়াছে। অনেক দূরে দূরে মোড়ের মাথায় গ্যাসপোষ্টগুলি টিম্ টিম্ করিতেছে। রামবাবুর চায়ের দোকান চমৎকার জমিয়া উঠিয়াছে।

বামাচরণবাবু বসিয়াছেন একেবারে বেঞ্চির কোণ ঘেঁসিয়া। পাশেই শশাঙ্ক নিঃশব্দে সমাগত জনমণ্ডলীর আলোচনা শুনিয়া যাইতেছে।

বামাচরণবাবু সুরু করিলেন। সকলেই বেশ আরো কাছে সরিয়া বসিল। মাথা দোলাইয়া অর্দ্ধমুদ্রিত চোখে বামাচরণবাবু পড়িতেছেন ;—তাঁহার কণ্ঠ কখনো কোমল হইতে নিখাদে চড়িতেছে, কখনো বা নিখাদ হইতে কোমলে মিলাইয়া যাইতেছে।

—"তখনো মধুসূদন, অপরিণামদর্শী, নির্ব্বোধ মধুসূদন পালঙ্ক-শয়নে উপবিষ্ট হইয়া অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় সুখ-স্বপ্ন অবলোকন করিতেছে। হায়, সে কি করিয়া জানিবে কি ভীষণ কালসর্প তাহার মস্তক দংশন করিতে উদ্যত!

এই অবসরে পাঠক, আপনি ধীরপদে একবার আমার সহিত আসিয়া পাশের ঘরের দৃশ্য নিরীক্ষণ করুন। ঐ দেখুন, লোকললামভূতা বিশ্বমনোমোহিনী সুন্দরী নিস্তারিণী তাম্বুলরাগ-রক্তিম অধর দশনে চাপিয়া কুটিল প্রতিহিংসার নির্ম্মম হাসি হাসিতেছে। হরিণীর মতো আয়ত চক্ষু দুটিতে আর মাদকতা নাই, তৎপরিবর্ত্তে বিদ্যুতের মতো তীব্র দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইয়া সমস্ত অন্ধকারকে যেন বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে হাতের কঙ্কণও টুন্‌টুন্ করিয়া বাজিতেছে। হায় সৌন্দর্য্য, তুমি পাপের মধ্যেও স্বকীয় জ্যোতি তেমনই বিকীর্ণ করিতেছ, কই তোমার রূপ ত' এতটুকুও ম্লান ও স্তিমিত হইল না! হায় নিস্তারিণী, কেন তুমি মধুসূদনের সম্মুখে ধূমকেতুর মতো উদিত হইয়া তাহার স্বপ্নসৌধের উপর অকালে বজ্র নিক্ষেপ করিলে ? অথবা হিংসা! পৈশাচিক রাক্ষসী হিংসা, তুমি সব পার। তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

পাঠক, অধীর হইবেন না। ক্রোধোন্মত্তা, যৌবনালোকে জাজ্বল্যমানা, অপ্সরী-বিনিন্দিতা সেই নিস্তারিণীর চক্ষু রোষে ধক্‌ধক্ করিতে লাগিল।

লেখনি, অবশ হইয়ো না। ভীষণ পাপের ভয়াবহ পরিণাম কীর্ত্তন করিতে হইবে।"

হরিহর সামন্ত এককোণে বসিয়া গল্প শুনিতেছিল। হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—দা'ঠাকুর বা লেকেছ, একেবারে লিয্যস খাঁটি কথাটি। সেবার আমাদের ওই রূপোসপুরেও ঠিক এমনি—

চায়ের দোকান! বেচারী কথাটা শেষ করিতেই পারিল না।

বিশ্বম্ভর গোস্বামী বলিয়া উঠিলেন—তোমার গপ্‌পোতে অনেক খাসা ধর্ম্মের কথা আছে হে বামাচরণ, অনেকে পড়ে' উদ্ধার হয়ে' যাবেন। পুঁথির কথা, জ্ঞানের কথা, শাস্তরের কথা না হলে কি আর গপ্‌পো হ'ল? যেমন সব লিখে গেছেন আমাদের মুনি-ঋষিরে—

অমনি তারিণী মৈত্র চীৎকার করিয়া উঠিলেন—থামো হে গোঁসাই, জ্ঞানো ত দেখছি খুব? মুনি-ঋষিরে যা লিখেছেন সেগুলো গপ্‌পো? সে একেবারে খাঁটি পেত্যক্ষ্য জিনিষ। পেত্যক্ষ্য জিনিষ, গপ্‌পো হয় কখনো?

আলোচনা, তর্ক এবং আর একটি অপ্রীতিকর ব্যাপারের সম্ভাবনা হইতেই বামাচরণ উঠিয়া পড়িলেন,—সব একই দাদা, যে যেমন ভাবে নেয়, বুঝলে কিনা?

পথে বাহির হইয়া শশাঙ্ককে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন লাগলো হে তোমার? এ ধরণের জিনিষ পড়েছ আর কখনো?

একেবারে নিজের লেখা সম্বন্ধে এই সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি শুনিয়া শশাঙ্ক আর প্রতিবাদ করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইল না। সে নীরবে মাথা-নাড়িল।

সেই নোলক পরা, মল পায়ে-দেওয়া পুঁটুর বিবাহের দিন আসন্ন। বামাচরণবাবু অভিন্ন-হৃদয় শশাঙ্কের উপরেই সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত আরামে তামাক টানিতে লাগিলেন।

কিন্তু শনিবারের দিন বিপদ ঘটিল। তিনি দুইশত টাকা দিয়া শশাঙ্ককে বাজারে পাঠাইয়াছেন, রাত্রি বারটা বাজিল, এখনো ফিরিবার নাম করে না কেন? যে-রকম ছেলে, পথে গাড়ীচাপা পড়িল নাকি?

গৃহিণী আসিয়া অনেকক্ষণ উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিয়াছেন এবং এই অলপ্পেয়ে বুড়োর হাতে না দিয়া কেন যে তাহাকে হাত পা বাঁধিয়া গঙ্গাজলে ফেলিয়া দেওয়া হয় নাই, স্বর্গগত মাতা-পিতাকে সেই কথাই ক্রন্দনের সুরে প্রশ্ন করিতেছেন।

বারো বছরের পুঁটু কালো কালো কোঁকড়া চুল দোলাইয়া, পায়ে ঝম্‌ঝম্ মল বাজাইয়া আসিয়া কহিল—বাবা, তুমি একটু দেখে এসো না শশাঙ্ক কাকাকে? আমার ভালো ভালো কাপড়গুলো আস্‌ছে না এখনো? আচ্ছা, আমার সেই ফুল-কাটা কাপড়টা আস্‌ছে ত'?

বামাচরণবাবু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কি জবাব দিলেন, বোঝা গেল না।

সাহিত্যিককেও মেয়ের বিবাহের জন্ত ভাবিতে হয়, বিশেষ করিয়া সাহিত্যিক-জায়া যদি একটু দুর্নিবার হন। কাজেই বামাচরণবাবুকেও দিন-কতক সাহিত্য-চর্চ্চা বন্ধ রাখিয়া পাত্রের সন্ধানে ছোটাছুটি করিতে হইল, এবং শশাঙ্ক-র চেষ্টায়ই একটি ভাল পাত্র মিলিল।

সে কাল-রাত্রি অবসান হইল।

'সময় কাহারও জন্ত বসিয়া থাকে না'—এই মহাবাণী যিনি উচ্চারণ করিয়াছেন, তাঁহার মস্তিষ্কের সুস্থতার সম্বন্ধে বামাচরণবাবুর সন্দেহের যথেষ্ট কারণ ছিল। কারণ সেই রাত্রি যে তিনি কি ভাবে কাটাইয়াছেন, তাঁহার পরদিনকার চেহারা দেখিয়াই বেশ বোঝা গেল। টাকা গিয়াছে

যাক্ কিন্তু যাহাকে এতদিন তিনি পুত্রের অধিক স্নেহ করিতেছিলেন, সে তাঁহার বিশ্বাসের এতটুকু মূল্য রাখিল না!

সকালে উঠিয়াই তিনি শশাঙ্কর মেসে ছুটিলেন।

সিঁড়িতে অজয়ের সঙ্গে দেখা।

কহিল—বামচরণবাবু যে—ব্যাপার কি? শশাঙ্কটা ত' কাল রাত্তিরে এলোই না মেসে। ভাবলাম আপনার বাড়ীতে আছে।

বামাচরণবাবু অত্যন্ত ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন—তার খোঁজেই ত' এসেছি,কোথায় যে গেল কাল বিকেল থেকে।

এই বলিয়া তিনি শশাঙ্কর বিছানা এবং টেবিল ঘাঁটিতে সুরু করিলেন। টেবিলের উপরকার বসুমতী কাগজখানা সরাইতেই একখানি পেন্সিলে লেখা অর্দ্ধ-সমাপ্ত চিঠি, এবং একটি টুক্‌রা কাগজে লেখা ঠিকানা বাহির হইয়া পড়িল।

ঠিকানাটি এইরূপ—

শ্রীযুক্ত কপিলানন্দ স্বামী, জ্যোতির্বিনোদ

শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু

কপিলানন্দ কুটীর, জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষালয়

বিন্ধ্যাচল।

আর চিঠিখানিতে লেখা—

মহাশয়,

লোকমুখে আপনার অজস্র মহিমা-কীর্ত্তন শুনিয়া এবং কাগজেও আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা ও প্রতিভার পরিচায়ক আশ্চর্য্য কীর্ত্তিকাহিনী অনুধাবন করিয়া অনেকদিন হইতেই আপনার শ্রীশ্রীচরণদর্শন মানস করিয়াছি। কবে যে আপনার চরণ-যুগল দর্শন করিয়া ধন্য হইব, তাহা একমাত্র ভগবানই বলিতে পারেন। দূর হইতে দীন সেবক আপনাকে কোটি কোটি প্রণাম জানাইতেছে।

আমার একটি প্রবীণ বন্ধু বহুদিন ধরিয়া সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন। আমার মনে হয়, তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা প্রচারের অভাবেই লোকের কাছে অনাদৃত হইয়া রহিয়াছে। এমনই হয়, প্রকৃত ক্ষমতাবান্ সাহিত্যিক, তাঁহাদের জীবিতকালে লোকচক্ষুর অগোচরেই থাকিয়া যান।

কিন্তু কবে যে তাঁহার সাহিত্য-যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে—অদৃষ্টের দ্রষ্টা, ভাগ্যনিয়ন্তা আপনিই বলিতে পারেন, কারণ নিয়তিকে আপনি আপনার করতলগত করিয়াছেন।

আমি তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া থাকি বলিয়া, আমার বন্ধুগণ আমাকে যথেষ্ট উপহাস করিয়া থাকেন। তাই আমি মনস্থ করিয়াছি যে, তাহাদের দেখাইব, আমার উৎসাহের মূল্য আছে।

আমার সেই বন্ধুর অগোচরেই এই পত্র লিখিতেছি। তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য হোম, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন এবং গ্রহপূজার জন্য কত ব্যয় হইবে তাহা—"

চিঠিটা প্রায় শেষ হইয়াছে মনে হইল। বামাচরণবাবু বার দুই চিঠিখানি পড়িলেন। তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ভুলিয়া গেলেন যে, পরের বৃহস্পতিবার তাঁহার কন্যার বিবাহ। বাড়ীতে গৃহিণী তাঁহার প্রত্যাশায় বিশেষ উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছে। শশাঙ্ক সেই যে টাকা লইয়া বাজার করিতে গিয়াছে আর ফেরে নাই—এ সমস্ত কিছুই তাঁহার মনে পড়িল না। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে শুধু ভাসিতে লাগিল একটি শান্ত, নিরীহ, গৌরকান্তি তরুণ যুবা একান্ত অনুরক্তের মত নিবিষ্টভাবে তাঁহার গল্প শুনিতেছে।

অজয় তাঁহার সঙ্গে ঘর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। সে তাঁহার এই ভাবান্তর দেখিয়া ব্যথিত হইল। ভাবিল, এতগুলি টাকার শোক! অত্যন্ত কোমলস্বরে কহিল,—বামাচরণবাবু, বসুন তামাক খান। কাল নিশ্চয়ই ও আসবে'খন।

বামাচরণবাবু কহিলেন না সে আর শীগ্‌গীর আস্‌ছে না। ছুটী নিয়েছে বোধ হয় আফিস থেকে। সে গেছে বিন্ধ্যাচল। এই চিঠি দেখুন না।

চিঠিখানা অজয়ের হাতে দিয়া বামাচরণবাবু একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন

আরো দুইদিন উৎকণ্ঠায় কাটিল।

বামাচরণবাবুর তবু উৎকণ্ঠার মধ্যে সান্ত্বনা ছিল। কারণ তিনি বুঝিলেন যে, পৃথিবীতে এমন একজনও আছে, যে তাঁহার জন্য ভাবে। কিন্তু পুরুষ-প্রকৃতি বিশিষ্টা গৃহিণী ত' বাড়ী মাথায় করিয়া তুলিলেন। আর মুক্তামালা,—না বাপের কাছে, না মায়ের কাছে,—কোথাও সুবিধা না পাইয়া মন-মরা ভাবে এখানে ওখানে ফিরিতে লাগিল।

এমন সময় তৃতীয়দিন প্রাতঃকালে পিয়ন হাঁকিল—চিঠি আছে বাবু।

বামাচরণবাবু ত' একেবারে 'উঠি ত' পড়ি' করিয়া ছুটিয়া আসিয়া পিয়নের হাত হইতে চিঠিটা লইলেন। কিছুক্ষণ চিঠিখানা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার হাতে চিঠিখানা তখন থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

গৃহিণী আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন—কা'র চিঠি? তোমার সেই ছোক্‌রা বন্ধুর বুঝি? দেখ, আবার কি সাফাই গেয়েছেন।

বামাচরণবাবু কোনোরকমে বলিলেন—তুমি যাও, আমি দেখ্‌ছি।

গৃহিণী কহিলেন—ও চিঠিতে আমি ভুল্‌ছি নে। ঠিকানা নিয়েই ছোটো এখন।

আরও কিছুক্ষণ ক্রোধ প্রকাশের পর গৃহিণী নিক্রান্ত হইলে বামাচরণবাবু কম্পিতহস্তে চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিলেন।

তাহাতে লেখা ছিল—

শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু—

বামাচরণবাবু, আপনি বহুকাল যাবৎ আমাকে পুত্রের মতোই স্নেহ করিয়া আসিতেছেন, এবং যথেষ্ট বিশ্বাস আসিতেছেন। এবং সে বিশ্বাস আপনার মনে যদি বদ্ধমূল হইয়া থাকে, তবে আশা করি আমার এই তিনদিনের অদর্শনে তাহা শিথিল হয় নাই। আমি এই পত্র আপনাকে লিখিতেছি কৈফিয়ৎ-স্বরূপ নহে, আপনাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়াই।

আমি আপনার সহিত যে কপটতা করিয়াছিলাম তাহার কারণ ছিল। আমার বিশ্বাস যে, আপনার সাহিত্য রচনার যে অসাধারণ ক্ষমতা, জন-সাধারণের মধ্যে বিশেষ সমাদৃত হইতেছে না,—তাহার কারণ আপনার রাশি নক্ষত্রে কোনো দুষ্ট গ্রহের প্রকোপ হইয়াছে।

আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট শুনিলাম এবং কাগজেও দেখিলাম —বিন্ধ্যাচলের কপিলানন্দ স্বামী হঠযোগ বিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যার আশ্চর্য্য শক্তিমান পণ্ডিত। গ্রহশান্তি এবং স্বস্ত্যয়নও তাঁহার বিশেষভাবে জানা আছে।

আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি এবং আশা করি আপনি অচিরে অক্ষয় যশ অর্জন করিয়া সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠিত হউন।

আমি আপনার টাকা লইয়া এখানে আসিয়াছি এবং সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া রাখিয়াছি। শ্রীমৎ কপিলানন্দ স্বামী বলিতেছেন—আপনার আসা একান্ত প্রয়োজন।

বধূঠাকুরাণীকে আমার প্রণাম জানাইবেন এবং চিঠি শুনাইয়া আমাকে মার্জনা করিতে বলিবেন। শ্রীমতী পুঁটুর বিবাহের দিন, কয়েক দিন বাদে স্থির করুন। ২।১ মাসের বিলম্বে মহাভারত এমন কিছু অশুদ্ধ হইবে না। পুঁটুকে

বলিবেন,—শশাঙ্ক-কাকা ফুল-কাটা শাড়ী আর মুক্তোর মালা লইয়া শীঘ্রই যাইতেছে।

আপনি শীঘ্র রওনা হইবেন। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

ইতি
প্রণত
শশাঙ্ক

পুঃ—আসিবার সময় শ'খানেক টাকা আনিলে ভালো হয়। আপিস কামাই হইতেছে। কি করিব?

ইতি
শ—

বামাচরণবাবু পুনশ্চটা বাদ দিয়া এবং তার উপরের কথা কয়টি বেশ জোরে পড়িয়া স্ত্রী এবং কন্যাকে শুনাইলেন।

স্ত্রী শুধু সংক্ষিপ্ত একটি উত্তর দিলেন—হুঁ।

কন্যা জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ বাবা! আস্‌ছে ত' ঠিক? না মিছিমিছি—

বামাচরণ বাবু মৃদুহাস্যে কহিলেন—দেখিস্ তখন!

দুপুরবেলা বামাচরণবাবু শশাঙ্ককে চিঠি লিখিলেন—

স্নেহাস্পদেষু—

তোমাকে ধন্যবাদ দিবার ভাষা আমার নাই। সাক্ষাতে সব বলিব ও শুনিব। আজই টাকা লইয়া রওনা হইতেছি। ষ্টেশনে অতি অবশ্য উপস্থিত থাকিবে।

ইতি—
আঃ পত্র
শ্রীবামাচরণ হালদার

সেইদিন রাত্রির ট্রেণেই বামাচরণবাবু দুর্গানাম স্মরণ করিয়া বিন্ধ্যাচল রওনা হইলেন।



যদি—

—শ্রী হরগোবিন্দ সেন

পঞ্চানন চল্লিশ টা বছর স্রেফ্ মদ্ খাইয়া কাটাইয়া দিল। বিবাহ করিবার কথা উঠিলেই বলিত, আর না দাদা,—বাপ্-পিতামোর আমল্ থেকে দেখ্ছি, ও আমাদের সয় না। বাবার পাঁচটা বিয়ে,—ঠাকুরদা'র নাকি হাতে গোণা যেতো না। কিন্তু সব ঐ এক দশা—বিষ-দড়ি জল। কেবল মার বেলায় একটু ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছিল। হাত পা সিঁটকে—

লোকে আর শুনিতে চাহিত না। বলিত, বেশ করেছ—গরীবের আর ঘোড়া-রোগ কি!

হে-হে, যা বলেছ দাদা—ঘোড়া-রোগ বই কি। ঘোড়া তবু দুটো দানা পেলেই সন্তুষ্ট,—ওদের বায়না কত—

পঞ্চানন ইহার বেশী বলিতে পারে না। তাহার বন্ধু বৃন্দাবন যতটুকু তাহার নিকট বলিয়াছে, ততটুকুই সে জানে। জানিবার আগ্রহ তাহার মাঝে মাঝে হইত। একটুখানি আব্দার—একটুখানি স্নেহের পরশ;—কিন্তু কি হইবে সে সব কথা বলিয়া? বলে, বেশ আছি।

ভাঙা-ঘরের দাওয়ায় বসিয়া পঞ্চানন ঠাকুর গড়ে। কাদা-খড়ের জড়-প্রতিমাকে মনের মত করিয়া সাজায়। মেয়েরা বলে, পঞ্চাননের বেশ হাতটি। পঞ্চানন দাঁত বাহির করিয়া হাসে।

পঞ্চাননের রোজ্গার্ মন্দ হইত না। কিন্তু হইলে কি হয়,—বলিলে বলে, কি হবে আমার এ-সব।

একঘেয়ে এই পৃথিবীটা তাহার কাছে তিক্ত হইয়া উঠে। জ্যোৎস্না-রাত্রি মদ্ খাইয়া ভুলিবার চেষ্টা করে। বলে, কি দরকার ছিল এই সবের?—বিধাতার অপচয়? দুটো চাল-ডাল আর মদ্; ব্যস্—

কিন্তু এম্নি করিয়াই তো চল্লিশ টা বছর সে কাটাইয়া দিয়াছে। চোখ বুজিয়া ভাবে—উঃ, সে কতদিন! অম্নি তাহার বৃন্দাবনের ঘরখানির কথা মনে পড়ে। ছোট্ট ঘরখানি, ঝক্ঝকে তক্তকে—

নিশ্বাস ফেলিয়া এক গ্লাস মদ্ ঢালে। বলে, নাঃ—আজ আর রাঁধ্তে পারি না।

এম্নি করিয়াই দিন চলে।

তবু জীবনটাকে টানিয়া টানিয়া লম্বা করিবার মোহ! বলে, বাঁচিতে হইবে!

জীর্ণ ঘরখানি কখন্ পড়িয়া যায়—কে জানে! পঞ্চু দিনের বেলায় চাহিয়া চাহিয়া দেখে। ভাবে, আবার রাত্রি আসিবে—আবার বর্ষা নামিবে! শূন্য বোতলটার দিকে একবার চাহিয়া, ধীরে ধীরে ওঠে। রাস্তার ওপারে বৃন্দাবনের বাড়ী। বৃন্দাবন তখন গুণ গুণ করিয়া গান ধরিয়াছে,

"কালা আমার বাজায় বাঁশী কদমতলায় ব'সে,
যমুনার জল আন্তে গেলে ঘন ঘন হাসে॥"

পঞ্চুকে এত সকালেই আসিতে দেখিয়া বৃন্দাবন বলিল, কিরে ঘর পড়েছে বুঝি?

—না, এখনও পড়েনি,—দুটো বাঁশ দে দেখি যদি রাখ্তে পারি।

—দেবে', কিন্তু বল্—এবার পূজোর টাকা পেলেই ঘর বাঁধ্‌বি ?

—মাইরি বল্‌ছি—

আবার কি-দিব্যি গাল্‌ছ ঠাকুর-পো ? বলিয়া বৃন্দাবনের স্ত্রী কল্‌মি আসিয়া দাঁড়াইল।

পঞ্চানন অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, না না—এবার সত্যি—

—কেমন সত্যি ঠাকুর-পো ?—যেমন সত্যি তুমি মদ্ ছেড়েছ ?

পঞ্চাননের ইচ্ছা হইল বলে, কেন—মদ্ ছাড়ব কার জন্যে শুনি ? আমার কে আছে ? কিন্তু কোন কথাই তার মুখে যোগাইল না। চুপ্ করিয়া গোঁজ্ হইয়া বসিল।

—রাগ কর্‌লে ঠাকুর-পো ?

—না না, রাগ কি—

—তোমার শরীরের জন্যেই বলি।—একবার চেয়ে দেখ দেখি।

—কিছু না বৌদি',—এম্নি ক'রেই ষাটটা বছর পার ক'রে দেবো। ও বাপ্-পিতামোর বাঁধা-কোঠা আমাদের। বাবার 'লিবার' পাক্‌তে পাক্‌তেই ষাট্ বছর কেটে গেল। আমাদের বংশটাই যে মাতালের বংশ। বলিয়া পঞ্চানন টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

কল্‌মি ভাবে, কেন এমন হয় ? ঐ তো তাহার স্বামীও রহিয়াছে—তামাকটা পর্য্যন্ত খায় না! এইটাই তাহার কাছে বড় বিস্ময়, কি করিয়া ঐ লোকটি তাহার স্বামীর বন্ধু হইল! সময় সময় তাহার ভয়ও করিত।—কি জানি, মাতাল তো—

কল্‌মিকে চুপ করিয়া যাইতে দেখিয়া বৃন্দাবন বলিল, চল্‌রে পঞ্চু—চল্, ঘরটার এইবেলা একটা কিনারা ক'রে আসি।

পঞ্চাননের ঘর এবারও টিঁকিয়া গেল। টিঁকিয়া অনেক কিছুই যাইতেছে। পেট জোড়া পিলে লইয়া হেমন্তর ছেলেটা আজ তিন বছর ধরিয়া টিঁকিয়া আসিতেছে। বামুনপাড়ার ঐ জীর্ণ বটগাছটা পড়ি-পড়ি করিয়াও আজ দু'বচ্ছর খাড়া রহিয়াছে। পঞ্চানন—সে তো উপোস করিয়া, মদ্ গিলিয়া, শরীরটাকে অবজ্ঞা করিয়াই চল্লিশ বছর কাটাইয়া দিল। তবে তুচ্ছ একটা ঘর টিঁকিবে—সে আর নূতন কথা কি ?

আগাম্ টাকা লইয়া পঞ্চানন মল্লিকদের প্রতিমার কাযে হাত দিয়াছে। পূজার পূর্ব্বেই যাহা পাইল, পূজা আসিতে আসিতে তাহা কোথায় কি ভাবে খরচ হইয়া গেল—পঞ্চানন বুঝিতেই পারিল না! ঠিক করিল, এবার টাকা পাইলেই বৃন্দাবনের হাতে দিয়া আসিবে। ঘর এবার তাহাকে তুলিতেই হইবে।

বৃন্দাবন মাঝে মাঝে তাগিদ্ দেয়—টাকা-কড়ি কিছু পেলি ?

—নারে ভাই, ঘরে একরত্তি চাল পর্য্যন্ত নাই।

বৃন্দাবন হাসে। সে শুনিয়াছে, মল্লিকরা তাহাকে আগাম্ ৫০্ টাকা দিয়াছে। ভাবে, অদ্ভুত সৃষ্টি-ছাড়া এই পঞ্চানন!

রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া পঞ্চানন কত প্রতিমাই গড়িল। রংএর তুলি টানিতে টানিতে নূতন গৃহের স্বপ্ন দেখে।—এবার সে মনের মত করিয়া—ঠিক ঐ বৃন্দাবনের মত ঘর তুলিবে। একটি তক্তাপোষ, দু'একখানা কাঁসার বাসন আর ঐ বৃন্দাবনের মত ছোট একটি টুল,—চাল্‌চিত্তির করিতে বড় কষ্ট হয়।—

হিসাব করিয়া দেখিল, এবার সে অনেক টাকাই পাইবে। ঘরে চাল নাই। মিত্তিরদের বাড়ী গিয়া দশ টাকা চাহিয়া আনিল।

এম্নি করিয়া অল্প অল্প চাহিয়া চাহিয়া পূজার দিন পর্য্যন্ত আসিয়া ঠেকিল। পূজার পরেই হিসাব ধরিয়া দিলে সে মোটা টাকা পাইবে—এই আশা।

কিন্তু হিসাব যখন হইল—

তখন দেখা গেল, তাহার মোটা-টাকা এক-কুড়ি তিন-এ ঠেকিয়াছে!

টাকা আনিয়া পঞ্চানন বৃন্দাবনের হাতে দিয়া বলিল, এই নে বাপ্—খুব বাঁচিয়েছি ঐ ক'টা।

বৃন্দাবনের চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। সে জানিত, ঐ ক'টাও পঞ্চু রাখিতে পারিবে না

কলমি আসিয়া . কত টাকা পেলে ঠাকুরপো?

বৃন্দাবন লাফাইয়া উঠিল। বলিল, বলিস্‌নে পঞ্চু—আগে ঘর তোলা হোক্—

পঞ্চু লজ্জায় মরিয়া গেল।

জীবনের অনেক রকম ব্যাখ্যা হয়ত আছে,—অনেক সুরেই তাহাকে বাজান যায়। বিশ্ব-মানবের বিশ্ব-ভাষায় তাহাই তো দাগ কাটিয়া কাটিয়া লেখা হইয়া যাইতেছে।

পঞ্চুর ভাষা হয়ত অস্পষ্ট—হয়ত নয়। পৃথিবীর ক্ষুদ্র কোণে কে কোন্ ভাষায় কতটুকু দাগ রাখিয়া যাইতেছে, দুর্বোধ্য বলিয়া হয়ত কোনদিন তাহার পাঠোদ্ধারও হইবে না। নাই হইল। মানুষ তো এক একখানি অর্থ-পুস্তক নহে!

সারারাত্রি মদ্ গিলিয়া পরের দিন সকালে পঞ্চুর মনে হইল, আজ ভাত না হইলেও চলে। মাথা এবং পেট দুটোই বেশ ভার আছে। দাওয়ায় বসিয়া আজ তাহার প্রথম নজর পড়িল,—উঠানের এক কোণে কবেকার মরিয়া-যাওয়া যুঁই গাছটার আবার নূতন পাতা গজাইয়াছে—হয়ত ফুলও ধরিবে। পঞ্চু টলিতে টলিতে উঠিয়া গাছটাকে টানিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিল। নিজের মনেই বিড়্ বিড়্ করিয়া কত কি বকিল। তারপর দাওয়ায় বসিয়া সুদূর দিগন্তের দিকে দৃষ্টি মেলিয়া দিল।

বৃন্দাবন আসিয়া বলিল, কি রে—অমন্ ক'রে ব'সে যে? কাল্ বুঝি খুব মদ্ গিলেছিস্?

মদ্ সে রোজই গেলে। বৃন্দাবনও জানে-সেও জানে। উপদেশ—উপদেশ!—বিশ্বের মত আজ সকলেই তাহাকে উপদেশ দিতে আসিতেছে! পঞ্চু টলিতে টলিতেও খাড়া হইয়া উঠিল। বলিল, বেশ করেছি—নিজের পয়সায় মদ্ খাই।

বৃন্দাবন তো অবাক!—পঞ্চুর মুখে এরূপ কথা! আঘাত একটু হয়ত পাইল। তবু সে টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

বৃন্দাবনের ছোট ছেলেটা ভয় পাইয়া গিয়াছিল। সে বাপের কোল্ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, চল্ বাবা—বাড়ী চল্।

বৃন্দাবন সত্যই চলিয়া গেল।

পঞ্চুর সেই রাত্রেই জ্বর হইল

তারপর—কতদিন কি ভাবে কাটিয়াছে, পঞ্চুর কিছুই মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে—একখানি কোমল হাতের স্পর্শ—তাহার মাথার চুল লইয়া সেই খেলা—অতি মিষ্টি দুটি কথা—তুমি ঘুমোও, তুমি ঘুমোও—

বৃন্দাবন বলে, তাহার নাকি খুবই অসুখ হইয়াছিল। পঞ্চু হাসে।

পঞ্চু আবার সারিয়াও উঠিল। কিন্তু রোগ-শয্যার সেই অচিন্-পরশ আজও তাহার চুলে খেলা করে। ভাবে, সেইটাই যদি সত্য হইত?—

টুকনির কথা মনে পড়ে।

সেই একদিন—বাবা যখন বলিয়াছিল, "টুকনিকে আমি বৌ কর্‌ব।" টুকনির সে কী লজ্জা! তারপরেও টুকনি আসিত—লজ্জাবনতা গৃহ-বধূর সম্ভ্রম লইয়া। পঞ্চুরও কেমন কেমন করিত। তখন তাহাদের বয়স কতটুকুই বা! সেদিনও তাহাদের নূতন করিয়া ঘর বাঁধিবার কথা হইয়াছিল। ঐ সাম্‌নের আঙ্গিনার যুঁই-দোপাটির বাগান,—ছোট্ট একটু পথ—

কিন্তু কি যে হইল,—তিনদিনের জ্বর—সকল আশা বুকে লইয়া টুকনি চলিয়া গেল।

পঞ্চু ভাবে, টুকনি যদি না মরিত?—নিশ্চয় সে মদ খাইত না—ঐ বৃন্দাবন যেমন খায় না। টাকা জমাইত—আরও কি না সে করিত,—বৃন্দাবন যাহা আজও করিতে পারে নাই। আর বৃন্দাবন কি-ই বা বোঝে?—বলে, আর পারি না মন জুগিয়ে চল্‌তে! আমি হ'লে—

পঞ্চু আর মনে করিতে পারে না। সে হ'লে কি যে করিত,—মনের কল্পনা অতদূর পৌঁছোয় না।

পূজার পর পঞ্চু আরও দুই দফা টাকা পাইয়াছে। অসুখ না হইলে দুই একখানা কালীও বোধ হয় হাতে আসিত। কিন্তু পঞ্চুর এবার মত ফিরিয়াছে। বলে, না—ঘর তুলিব না।

বৃন্দাবন হাসে।

অকস্মাৎ শীতের মাঝামাঝি একদিন—পঞ্চুকে অবাক্ করিয়া সশব্দে তাহার ঘরখানি পড়িয়া গেল। কি করিয়া কি হইল—পঞ্চুর ভাবিতেই গেল অনেক সময়।

বৃন্দাবন আসিয়া বলিল, আর কেন—এবার চল্ আমার ওখানে

পঞ্চু কি ভাবে,—তারপর বলে, চল্।

কল্‌মির ইহা ভাল লাগে নাই। জানিয়া শুনিয়া একজন মাতালকে—হইলই বা বন্ধু।

পাড়ার মাতব্বররা বলিলেন, কাজটা ভাল কর্‌লে না হে বৃন্দাবন!

বৃন্দাবন ভাবে, তাই ত!

পঞ্চুও দেখিত, বৃন্দাবন যেন দিন দিন কেমন হইয়া যাইতেছে! কাল্ ঘরের ভিতর লুকাইয়া লুকাইয়া সারা রাত্রি মদ খাইয়াছে। সকালে সে উঠিতেই পারে নাই। তবুও বৃন্দাবন কেন যে তাহার খোঁজ লয় নাই!—

বেলা বাড়িয়াই চলে।—পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা। একঘটি জল খাইয়া আবার সে শুইয়া পড়ে। ভাবে, কেন এমন হইল!

বৃন্দাবনের ছোট ছেলেটা জল ঘাঁটিয়া, মাটি মাখিয়া, এটা ভাঙ্গিয়া—ওটা ছিড়িয়া, মার কাছে ছুটিয়া যায়। মারও খায়—চুমাও পায়। কল্‌মি ডাকে, ওগো!—একটা ডুব দিয়ে এসো, কাল্ একাদশী গিয়েছে—খাওনি তো কিছু—

পঞ্চু চাহিয়া চাহিয়া দেখে;—কল্‌মি যেন তাহার স্বামী-পুত্রকে লইয়া একটি ছোটখাটো পৃথিবী গড়িয়াছে। এ পৃথিবী কেবল তাহারই। ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া, ছিড়িয়া, সাজাইয়া—নিত্য নূতন করিয়া গড়িবার আনন্দে ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াই-তেছে! এখানে হতভাগ্য পঞ্চুর স্থান কোথায়?

রাত্রির অন্ধকারে—সকলে ঘুমাইলে পঞ্চু মদের বোতল বাহির করে। দিনের আলোয়—বৃন্দাবনের ঘরখানির দিকে চাহিয়া পঞ্চু আর মদের বোতল ছুঁইতে পারে না। তাহার কেন

যেন মনে হইত, এ ঘরে বসিয়া মদ খাওয়া চলে না। আরও একটা কোথায় তাহার বাধিত।—কল্‌মি?—হাঁ হাঁ—ঐ কল্‌মি হয়ত কি মনে করিবে।—

সেদিন আকাশে কোথাও একটি তারা ছিল না। হয়ত মেঘ করিয়াছিল,—কিন্তু কে এই তুচ্ছ থাকা না থাকা লইয়া মাথা ঘামাইবে? অন্ধকার হইলেই হইল।—লক্ষ্য বস্তুকে মুছিয়া ফেলিবার অন্ধকার।

সেই অন্ধকারে পঙ্কু তখন বোতল শেষ করিয়া মত্ত-স্বরে গান ধরিয়াছে,—'কল্‌মি-বনে সাঁতার পানি—'

মাধব ভট্‌চায আপন মনেই ছি ছি করিয়া উঠিলেন। গভীর রাত্রি—কাহারও জাগিয়া থাকিবার কথা নয়। তবে কিনা—গৃহিণী ৪৫ পার করিয়া আসিয়াও অনেক যন্ত্রণার পর এই-মাত্র একটি কন্যা প্রসব করিয়াছেন, তাই—

গৃহিণীর নিরাপদ প্রসবে নিশ্চিন্ত—মাধব ভট্‌চায পঙ্কুর ঐ উচ্ছৃঙ্খল-বেহায়াপনায় বার কয়েক শুধু ছি ছি করিয়,—আপন মনেই বলিতে লাগিলেন, তখনই বলেছিলাম বৃন্দাবনকে—

বৃন্দাবনের দাওয়া-ঘরখানার একটা কোণে উনুন্ পাতিয়া পঙ্কু রাঁধিতেছিল। 'না খেয়ে না খেয়ে, শরীরের ছিরি হয়েছে দেখ'—নিজের মনেই বলে আর হাসে। বৃন্দাবনের গোল-গাল শরীরটা অম্‌নি চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে। একটা নিশ্বাসও পড়ে হয় ত।—সে যদি বৃন্দাবন হইত!

চল্লিশটা বছর হয় ত বেশী নয়,—কিন্তু আজ এতদিন পরে—না, না, বিবাহ সে আর করিতে পারে না। কিন্তু যদি করিত?—

কল্‌মির প্রতিটি আনাগোনা তাহার মনে পড়িয়া যায়। বাসন মাজিয়া, ঘর ধুইয়া, রাঁধিয়া বাড়িয়া স্বামীর প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবার ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত।

একজন আর একজনের জন্য প্রাণপাত করিতেছে! চোখ বুঁজিয়া পঙ্কু যেন কি অনুভব করিবার চেষ্টা করে। তাহার যদি অমনি একটি—

এম্নি পঙ্কু কতদিন ভাবিয়াছে। কিন্তু আজ যেন তাহার ক্ষুধিত-বুকখানা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল! কি যে সে চায়—কত কি যে সে চায়—

একটা সীমাহীন অতৃপ্তির উত্তরঙ্গ সমুদ্র বুকের মধ্যে শুধু আছ্‌ড়াইতে থাকে। কান্না হয় ত আসে—জল নাই, তাই চোখ জ্বালা করে।

সন্ধ্যার পর বৃন্দাবন যখন ঘরে ফিরিল, তখন কল্‌মি আসিয়া ঝাঁঝাল সুরে জানাইয়া দিল—এ বাড়ীতে আর সে কিছুতেই একলা থাকিতে পারিবে না। মাতাল—সে আবার কখন ভাল হয়!

ভাল যে হয় না—সে বৃন্দাবনও ইদানীং বুঝিয়াছিল। কিন্তু ব্যাপারটা যে কতদূর গড়াইয়াছে, ইহাই জানিবার জন্য বৃন্দাবন তখন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। বলিল, চুপ কর্ মাগী—যা হয়েছে তা বল্।

কল্‌মি কাঁদিয়া ফেলিল।

তথাপি যে-হেঁয়ালি সে-হেঁয়ালিই রহিয়া গেল। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর বৃন্দাবন এইটুকু জানিতে পারিল,—পঙ্কু নাকি সারাদিন 'হুঁ' করিয়া কল্‌মির দিকে চাহিয়া থাকে—সে চোখ যেন কি এক রকম, দেখিলেই ভয় করে।

বৃন্দাবন ডাকিল, পঙ্কু!

পঙ্কু অবাক হইয়া গেল!—বৃন্দাবন ডাকিতেছে—এতদিন পরে—অকস্মাৎ!—

পঙ্কু ভাত ফেলিয়াই উঠিয়া আসিল। স্নেহ-ভিক্ষু পঙ্কু আজিকার এই দুর্লভ অকস্মাৎ-মুহূর্ত-

টিকে তুচ্ছ ভাত খাইয়া যাইতে দিবে কি বলিয়া ! বাহিরের অন্ধকার তখন বেশ একটু কাল হইয়া উঠিয়াছে।

পঞ্চু ডাকিল, কইরে ?

বৃন্দাবন আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, বেরো আমার বাড়ী থেকে।

পঞ্চু সেই অন্ধকারে বৃন্দাবনকে একবার দেখিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সবই তখন কাল হইয়া গিয়াছে।

—এই নে তোর এক কুড়ি তিন,—

বৃন্দাবনের বজ্র-মুষ্টির নীচে নোটের তাড়া।

পঞ্চু হাত পাতিতেই বৃন্দাবন গলা খাটো করিয়া বলিল, আরও এক কুড়ি বেশী থাক্‌লো। ওতেই তোর ঘর তোলা হবে।—বলিয়াই হন্‌ হন্‌ করিয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

কল্‌মি আসিয়া বলিল, হাঁ গা – ভাত দেবো ?

—দাও।

পাড়াগাঁয়ের অন্ধকার,— কাল দৈত্যের মত যেন ওৎ পাতিয়া আছে। পাশের বাঁশবন হইতে অবিরাম সর্‌ সর্‌ শব্দ হইতেছে। কতকগুলো কুকুর উঠানময় দৌড়াইয়া 'হ্যা-হ্যা' শব্দ করিতেছে।

কল্‌মি আসিতেই বৃন্দাবন ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, হাঁ গা— পঞ্চু কি চলে গেল ?

—হাঁ—ও আবার যাবে !— ঘরে তো আলো জল্‌ছে দেখ্‌লাম।

বৃন্দাবন নিশ্চিন্ত হইল। বলিল, আহা— থাক্‌ আজ রাত্রিটুকু।— যে অন্ধকার !

সকালবেলায় ঘুম ভাঙ্গিতেই বৃন্দাবন বুঝিতে পারিল, পঞ্চু চলিয়া গিয়াছে। কল্‌মি তখনও গাল্‌ দিয়া চলিয়াছে—আ মর্‌ হতচ্ছাড়া—ভালর কাল নাই—

বৃন্দাবন চাহিয়া দেখিল, পঞ্চুর ঘর হইতে কল্‌মি বোতলগুলা টান্‌ মারিয়া মারিয়া ফেলিতেছে।

হাত মুখ ধুইয়া বৃন্দাবন পঞ্চুর খোঁজে বাহির হইল। কিন্তু পঞ্চুকে পাওয়া গেল না।—

মাধব ভট্‌চায্‌ একগাল হাসিয়া বলিলেন, সে আর গাঁয়ে মুখ দেখাতে পারে।

দূরের বনান্তলেখা যেখানে ধূসর হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে,—সেইদিক্‌ পানে চাহিয়া চাহিয়া বৃন্দাবন ভাবে, পঞ্চু যদি মানুষ হইত !



শাঁখাওয়ালা—

—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(এক)

"চাই শাঁখা—শাঁখা চাই গো—"

লোকটী শাঁখা লইয়া পথ দিয়া চলিতে চলিতে শ্রান্তকণ্ঠে চীৎকার করিতেছিল।

বৈশাখের দারুণ রৌদ্র, পথ যেন ফাটিয়া যাইতে চায়। শাঁখাওয়ালা বাধ্য হইয়াই গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; যদিও জানে, এই গলির অধিবাসীদের মধ্যে খুব কমই শাঁখার আবশ্যক হয়। ইহারা এত গরীব যে, কোনরূপে দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতেও পায় না। আরও কয়েক-দিন সে শাঁখা লইয়া এদিকে আসিয়াছিল, বৃথাই সারা পথটা চীৎকার করিয়া গেছে, কেহই ডাকে নাই।

বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে; ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বুক পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছিল। পথের কলগুলি জলশূন্য। দুই-একটা বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া সে একঘটি খাওয়ার জলের প্রার্থনা করিয়াছে, কেহ দেয় নাই; উপরন্তু গালাগালিই দিয়াছে।

কণ্ঠ দিয়া স্বর বহির্গত হইতেছিল না; তথাপি সে চীৎকার করিতেছিল—"শাঁখা চাই গো—শাঁখা।"

খুট্ করিয়া পার্শ্বের ঘরখানির দরজা খুলিয়া গেল। ঘরখানির দেয়াল বেড়ার, তাহার গায়ে মাটি লেপা, উপরের চালা টিনের, ভিতরে সম্ভব ছাদ আছে। ঘরের সামনে সরু ছোট একটী বারাণ্ডা—উপরে টিনের চালা।

দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছোট একটী মেয়ে, বয়স বোধ হয় চৌদ্দ-পনের হইবে। সুগৌর বর্ণ, মুখখানি বড় সুন্দর, তাহাতে বর্ষীয়সী গৃহিণীর ভাব এখনও ফুটিয়া উঠিতে পায় নাই। আলুলায়িত চুলগুলা পিছনে দুলিতেছে, মাথার কাপড় দেওয়া সত্বেও দুই-চারি গুচ্ছ স্কন্ধের উপর দিয়া সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে।

মেয়েটীর পরণে একখানি চওড়া লাল পাড় শাড়ী, সিঁথায় উজ্জ্বল সিঁদুর; দু'টী জ্র মাঝখানে উজ্জ্বল সিঁদুরের টিপটী ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। মৃদুকণ্ঠে সে ডাকিল—"তুমি বুঝি শাঁখাওয়ালা, শাঁখা বিক্রী করছ?"

হঠাৎ এই মেয়েটাকে এমনভাবে দরজা খুলিয়া প্রশ্ন করিতে শুনিয়া প্রৌঢ় সুবল থতমত খাইয়া গেল;—একটু থামিয়া বলিল—"হাঁ, আমিই শাঁখা বিক্রী করছি; তুমি কি পরবে মা লক্ষ্মী?"

মেয়েটী তাহার সুগৌর সুগোল হাতখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া একটু ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল—"পরতে তো ইচ্ছে করে, হাতে কিছু নেই। কতকগুলো কাঁচের চুড়ি ছিল, তাও সেদিন ভেঙ্গে গেছে; ও ঘরের বউ তাই আর একটা লোহা ডান হাতে পরিয়ে দিলে। আচ্ছা, তুমি একটু বারাণ্ডায় বস; আমি ওঁকে একবার জিজ্ঞেস করে আসি—পরব কি না।"

সুবল বারাণ্ডায় উঠিয়া বসিল; মেয়েটী চলিয়া গেল। মুগ্ধনেত্রে সুবল তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

অনেক দিনের পুরাতন একটা কথা মনে পড়িতেছিল। তাহার লক্ষ্মী,—মা-মরা মেয়েটা ঠিক ইহারই মত দেখিতে ছিল না? ঠিক এমনই চেহারা, দাঁড়াইবার ভঙ্গী, চলিবার ভঙ্গী, এমন কি কথা বলার ভাবটি পর্য্যন্ত! সে আজ

দশ বৎসরের কথা—তাহার লক্ষ্মীকে বধূরূপে সাজাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছিল! মেয়েটী দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার শুষ্কগণ্ডের উপর নিজের কোমল গণ্ড রাখিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল—"বাবা, শ্বশুর-বাড়ীতে আমার সবাই মারে; তুমি আবার শীগ্‌গির আমায় এনো; নইলে মার খেয়ে আমি মরে যাব।"

হইলও তাই। একদিন সে শুনিল, তাহার লক্ষ্মী নাই! গোপনে শুনিল, মাতাল দুশ্চরিত্র স্বামী গলা টিপিয়া লক্ষ্মীকে হত্যা করিয়াছে!

সুবল উন্মত্ত হইয়া গেল; কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। আজ সে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে; চুরি-ডাকাতি কোন কাজেই সে পিছায় না; তবু তাহার মনে হয়,—যদি মেয়েটাও থাকিত, তাহার জীবন-যাত্রা এভাবে চলিত না!

মেয়েটী ফিরিয়া আসিল; মুখ শুষ্ক, বড় বড় চোখ দুইটী যেন জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

উৎসুকভাবে সুবল জিজ্ঞাসা করিল—"কি হলো মা?"

কান্নাঝরা-সুরে মেয়েটী বলিল—"না, শাঁখা পরব না; উনি বল্লেন—পয়সা নেই—পরা হবে না।"

সুবল বলিল—"তুমি এস মা, আমি তোমায় শাঁখা পরিয়ে দিয়ে যাই; এর পর যতদিনে তোমার পয়সা হবে, আমায় দিয়ো।"

ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা সে তখন ভুলিয়া গিয়াছিল

শাঁখার ঝুলি হইতে সে একজোড়া খুব দামী শাঁখার বালা বাহির করিল

মেয়েটী সঙ্কুচিতভাবে বলিল—"ওর দাম যে অনেক; অত পয়সা কোন দিন দিতে পারব না।"

সুবল বলিল—"দেখি মা, হাতখানা বেশী দাম নয়; না হয় বছরখানেক পরেই দিয়ো; আট আনা পয়সা বই তো নয়।"

বালা জোড়া দেখিয়া মেয়েটীর বড় পছন্দ হইয়াছিল; দাম অতি অল্প শুনিয়া সে পরিতে বসিল।

সুবল সন্তর্পণে সেই সুন্দর হাত দু'খানিতে বালা জোড়া পরাইয়া দিয়া অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া রহিল। মেয়েটী হর্ষোৎফুল্ল-মুখে বারবার হাত দু'খানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া বলিল—"তুমি মাঝে মাঝে এ দিকে এসো; পয়সা জম্‌লেই আমি দিয়ে দেব।"

ঝুলি স্কন্ধে ফেলিয়া শাঁখাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার নাম কি মা?"

"আমার নাম লক্ষ্মী—"

সুবল পথে নামিয়া পড়িল!

(দুই)

ভাঙ্গিখানা—

দলে দলে লোক আসিয়া জুটিয়াছে। ভিতরের একটা ঘরে জুয়াখেলা চলিতেছে। মাতালেরা তাড়ি খাইতেছে; চীৎকার করিতেছে।

লোকে এ পথ দিয়া যাইতে ভয় পায়; এটী গুণ্ডার আড্ডা। যাহারা এখানে আসে, তাহারা সকলেই পুলিসের হাত-ফেরতা; কেহই নির্দ্দোষ নয়।

পার্শ্ববর্ত্তী আর একখানি ঘরে জিনিস-পত্র ভাগ হয়। এই গুণ্ডাদলের সর্দ্দার সুবল—তাহার নাম এবং প্রতাপ বড় বেশী—সকলেই তাহাকে ভয় করে।

দিনের বেলা সে শাঁখা বিক্রয় করিয়া বেড়ায়; সন্ধ্যার সময় হইতে সে আর এক মূর্ত্তি ধরে

ক্ষুদ্র ঘরটীতে কয়েকজন জুটিয়াছিল। সর্দ্দার সুবল সেদিনকার জিনিসগুলি ভাগ করিয়া দিল। দলের একটী লোকের পকেট কিছু ভারী বলিয়া বোধ হইতেছিল; সুবল গর্জ্জিয়া উঠিল—"পকেটে এখনও লুকান জিনিস আছে; ভাগের তরে বার করিস নি বুঝি?"

লোকটা থতমত খাইয়া বলিল—"না সর্দ্দার, ও

অন্ত কোন মাল নয় ; আমার পরিবারের শাঁখা। আমি নেশায় পয়সা পাই নে, আর আমার পরিবার কি না দশটাকা দামের শাঁখা হাতে দিয়ে বেড়াবে। চাইলুম, দেয় না ; তখন জোর করে কেড়ে এনেছি। বিক্রি করে এই টাকা দিয়ে নেশা চালাব।"

"শাঁখা —"

সুবলের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল। তথাপি রাগতভাব দেখাইয়া সে বলিল—"কই. বার কর শাঁখা দেখি।"

মাধব পকেট হইতে শাঁখার বালা বাহির করিয়া সুবলের হাতে দিল।

এ সেই শাঁখা, যে শাঁখা সেদিন সুবল তাহার মা-লক্ষ্মীর হাতে পরাইয়া আসিয়াছে!

কি পিশাচ এই লোকটা! সেই সরলা বালিকার হাত হইতে এ দু'টি ছিনাইয়া লইয়া আসিতে এতটুকু ইতঃস্ততঃ করে নাই? আহা, মেয়েটী যখন আসিয়া বলিয়াছিল - 'পয়সার অভাবে সে শাঁখা পরিতে পাইবে না, তখন তাহার মুখখানি কিরূপ মলিন হইয়া গিয়াছিল, আর যখন সে বালা জোড়াটী তাহার হাতে পরাইয়া দিল—বালিকার মুখখানা কিরূপ দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল —সে কতখানি আনন্দ পাইল। এই নরাধম স্বামী বালিকা স্ত্রীকে কোনদিন হয়তো এতটুকু জিনিষ দিতে পারে নাই, অথচ তাহার নিজের জিনিষ কাড়িয়া লইতে এতটুকু সঙ্কুচিত হয় নাই।

সুবল বালাজোড়া নিজে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এর দাম কত?"

মাধব বলিল—"তা টাকা দশেক হবে। আমার কাছ থেকে সে লোকটা দশটাকা নিয়েছিল।"

তাহার এই মিথ্যা কথা শুনিয়া সর্দ্দারের মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল; সে আর একটী কথা না বলিয়া তাহাকে দশটা টাকা ফেলিয়া দিয়া শাঁখা লইল।

(তিন)

"শাঁখা চাই গো—শাঁখা—"

লক্ষ্মী সাড়া দিল না। শাঁখাওয়ালা বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া ডাকিতে লাগিল—"কই গো মা লক্ষ্মী, শাঁখার দামটা—"

লক্ষ্মী বাহির হইয়া আসিল ; হাতখানা তাহার কাপড়ে ঢাকা। সে শুষ্ককণ্ঠে বলিল—"তুমি যে বলেছিলে একবছর পরে দাম নিয়ে যাবে ; এখনই এলে যে?"

সুবল একটু হাসিয়া বলিল—"দেখতে এলুম মা লক্ষ্মী, আমি যে তোমার ছেলে ; ছেলে মাকে দেখতে এসেছে, সেটা তো দোষের নয়। দেখি মা শাঁখাজোড়া।"

লক্ষ্মীর মুখ শুকাইয়া গেল ; সে সজল-নেত্রে একবার সুবলের পানে চাহিয়া অন্যদিকে চোখ ফিরাইল।

মনে মনে হাসিয়া সুবল বলিল—"আর একজোড়া বালা এনেছি ; ঠিক ও জোড়াটার মতন কি না মিলিয়ে নেব। দেখি মা হাতখানা—"

লক্ষ্মী লোহা পরা হাত বাহির করিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "কাল রাতে উঠোনে কড্ড পড়েগেছলুম শাঁখাওয়ালা, দুটো বালাই ভেঙে গেছে।"

স্বামী যে লইয়া গিয়াছে, এই ছোট মেয়েটী সে কথা মুখেও আনিল না। প্রশংসমান দৃষ্টি তাহার মুখের উপর রাখিয়া সুবল বলিল—"যাক্ গিয়ে, এই জোড়াটা পর দেখি মা। একটু সাবধানে চলা-ফেরা কোরো, যেন আবার পড়ে যেয়ো না।"

সে শাঁখা বাহির করিল। বিবর্ণমুখে লক্ষ্মী বলিল—"আবার দিচ্ছ? আমি যে সেই বালার দামই এখনও দিতে পারলুম না।"

"সে হবেখ'ন, তার জন্তে ভাবতে হবে না। দেখি তোমার হাতখানা—"

হাত দু'খানা নিজের কঠিন হাতের মধ্যে লইয়া সুবল বালা পরাইতে লাগিল। সেই সময়ে এই

নিষ্ঠুর লোকটার দুই চক্ষু দিয়া কয়েক ফোঁটা জল নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িল।

"তোমার আর কে আছে মা—বাপের বাড়ীতে কে আছে?"

বিবর্ণমুখে লক্ষ্মী বলিল—"কেউ নেই।"

সুবল প্রশ্ন করিল—"এখানেও স্বামী ছাড়া আর কেউ নেই তা বুঝ্‌তে পেরেছি। স্বামী বেশ ভাল তো?"

বালিকা মাথা কাত করিয়া বলিল—"হাঁ, তিনি খুব ভাল।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার কাপড়ের পানে তাকাইয়া সুবল বলিল—"একজোড়া কাপড় এনেছি মা, ছেলে হয়েছি কি না মাকে সাজাতে এসেছি।"

মেয়েটী পিছনে সরিয়া গিয়া সত্রাসে বলিল—"না, কাপড় তুমি নিয়ে যাও শাঁখাওলা ও আমি নেব না—"

ব্যথিত-কণ্ঠে সুবল বলিল—"লজ্জা পাচ্ছ কেন মা, তুমি যে আমার হারান মেয়ে লক্ষ্মী! দশ-বছর আগে সে শ্বশুর-বাড়ী গিয়েছিল—আর ফেরে নি! এই দশ বছর আমি তার মত একটী মেয়েকে খুঁজে বেড়িয়েছি; আজ তোমায় পেয়েছি। আজ নেব না বল্‌লেই কি আমায় ফিরিয়ে দিতে পারবি মা! বুড়ো বাপ তোর এমনই কি ফিরে চলে যাবে?"

সবল বলিষ্ঠ দেহখানা আবেগে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল; সুবলের দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা ছুটিল।

রুদ্ধকণ্ঠে লক্ষ্মী বলিল, "কেঁদ না বাবা, আমি কাপড় নিলুম।"

(চার)

পূজা আসিয়াছে।

কয়েকদিন মাধব দলে যোগ দেয় নাই; সুবল ও কয়েকদিন ও পাড়ায় লক্ষ্মীকে দেখিতে যাইতে পারে নাই। ষষ্ঠীর দিন সুবল কতকগুলি জিনিষ কিনিয়া আনিল। সে লক্ষ্য করিয়াছিল, লক্ষ্মী লালপাড় শাড়ী পরিতে বড় ভালবাসে। সেই জন্য সে বাছিয়া নিজের পছন্দ মত দেশী লালপাড় শাড়ী একজোড়া কিনিল; ফরমাইস দিয়া শাঁখার চুড়ি একসেট আনাইল; আলতা, কাশীর সিঁদুরের কৌটা ভরিয়া সিন্দুর কোন জিনিস লইতেই সে ভুলিল না।

আজ তাহার ঝুলি পূজার উপহারে পূর্ণ হইয়া গেল; সে ঝুলি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। সমস্ত পথ নিঃশব্দে গিয়া গলির মধ্যে হাঁকিতে লাগিল "শাঁখা চাই গো—শাঁখা।"

সে ঘরের দরজা আজ খোলা; কিন্তু কেহ সে দরজা পথে উঁকি দিল না।

সুবল ধীরে ধীরে পথ হাঁটিতে লাগিল; উচ্চ-কণ্ঠে বার বার চীৎকার করিতে লাগিল—শাঁখা চাই গো—শাঁখা।"

কেহই তো আসে না—সুবল উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

আজ যদি মাধব বাড়ীতে থাকে, হয় তো সেই জন্যই লক্ষ্মী বাহির হইতেছে না।

খানিকক্ষণ সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর বারাণ্ডায় উঠিয়া পড়িল—

"মা লক্ষ্মী—শাঁখা এনেছি যে গো—"

"বাবা—"

ঘরের মধ্যে মেঝেয় পড়িয়া লক্ষ্মী।

এ কি, এ কি সেই লক্ষ্মী? তাহার পরণে সেই উজ্জ্বল লালপাড় শাড়ী কই, ললাটে সেই উজ্জ্বল সিঁদূর কই, হাতে শাঁখা দূরে থাক, লোহাও যে নাই।

তাহাকে দেখিয়াই লক্ষ্মী হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"কা'কে আর শাঁখা পরাতে এসেছ বাবা, যে এতদিন জোর করে আমার শাঁখা খুলে নিয়ে লোহা পরিয়ে দিত,—সে যে আজ সে লোহাও নিয়ে চলে গেছে গো!—"

বজ্রাহতের মত সুবল দাঁড়াইয়া রহিল।

মনুর বংশ

শ্রী সরোজকুমার রায় চৌধুরী

তিনকড়ির সঙ্গে আলাপ আমার আজকের নয়। ওদেরি দেশে আমার মামার বাড়ী। তিনকড়িদের আড্ডাটি ছিল খুব জমকালো। আর তারি লোভে মামার বাড়ীও যেতাম খুব ঘন-ঘন।

গাঁয়ের মধ্যে তিনকড়ির কথা উঠ্‌লেই, সবাই একবাক্যে বলত,—হ্যাঁ ছেলে তো তিনকড়ি। অমন ভালো ছেলে, কিন্তু দেমাক-অহঙ্কার একেবারে নেই। পানটি অবধি খায় না, টেরিটি অবধি কাটে না। আরেকটা বিষয়ে গাঁয়ের সবাই একমত ছিল। সে হচ্ছে এই যে, একে দিয়ে তাদের গাঁয়ের অনেক কিছু হবে।

চুলগুলো তিনকড়ির ছিল ছোট্ট ছোট্ট করে ছাঁটা। আর তার পোষাক-পরিচ্ছদে বাবুগিরি ছিল না বললে সবটা বলা হয় না। কারণ তার পোষাক-পরিচ্ছদে ছিল বাবুগিরির ঠিক উল্টোটা। এক কথায় ছেলেটী ছিল নিছক গদ্যময়।

একটা দিনের কথা মনে পড়ে গেল। সে বহুদিনের কথা। সেবারে ওদের দেশে গিয়ে থিয়েটারের আখড়াটা খুব জমিয়ে তুলেছি। রিহার্সাল যখন থেমে গেল, তখন রাত বারটা বেজে গেছে। নিজের নিজের ঘরে ফেরবার উদ্যোগ কর্চ্ছি, এমন সময় কে একজন বলে উঠল,—ভাই, আম চুরি করতে যাবি? বোসেদের বাগানে?

—রাজি।

সবাই এক সঙ্গে উঠে পড়ে চলেছি। হঠাৎ দেখি তিনকড়ি সরে পড়বার চেষ্টায় আছে। টপ্‌ করে তার একখানা হাত ধরে বললাম,—কিরে পালানো হচ্ছে যে বড়?

তিনকড়ি হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে—না, চুরি করবার ইচ্ছে নেই।

সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তিনকড়ির সেই উজ্জ্বল, তেজস্বী চোখদুটার পানে চেয়ে আমাদের যাবার শক্তি লোপ পেল। দু'একজন উপেক্ষার সঙ্গে বললে,—ওকে ছেড়ে দে ভাই! ও ভালো ছেলে, ওর কথা—

বল্লে বটে কিন্তু না তারা যেতে পারলে না পারলাম আমরা। সেই একদিন তার যেরূপটি আমি দেখেছিলাম, ঠিক তেমনি দেখলাম আর একদিন।

সেই কথাই বলব,—

অনেকদিন দেশে যাইনি। কারো কোন খোঁজখবর রাখবারও অবসর পাইনি। ছেলেপুলে নিয়ে যে ঝঞ্ঝাট!

সে দিন রবিবার। বাইরের ঘরে বসে আছি। দারোয়ান একখানা কার্ড দিয়ে গেল,—প্রভাত বসু।

একটু পর দেখি, একি? এযে তিনকড়ি! অবাক হয়ে চেয়ে আছি দেখে তিনকড়ি তার ফ্যান্সি ছড়িটার ডগা দিয়ে আমার মাথায় মেরে বললে,—কিরে চিনতে পাচ্ছিস না, না কি?

চিনতে না পারবারই কথা। তার সেই ছোট্ট ছোট্ট করে চুল ছাঁটা মাথায় একরাশ

কোঁকড়ানো চুল ঢেউ খেলে যাচ্ছে। চোখে সোনার চশমা।

তাড়াতাড়ি তাকে হাত ধরে সোফায় বসিয়ে জিগ্যেস করলাম,—তারপর, ব্যাপার কি বল্‌তো? কি করছিস?

তিনকড়ি আমার হাতটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে,—'আজকে তোরে দেখতে এলাম
অনেক দিনের পরে।'

তিনকড়ি যে কবিতা বলে? আমি তার একটা হাত হাতের মধ্যে নিয়ে বললাম,—'তিনকড়ি, ব্যাপারটা কি বলতো?'

—কিসের ব্যাপার?

—কি করা হচ্ছে?

—কিচ্ছু না।

একটু থেমে তিনকড়ি বললে,—আপাতঃ, এলাম তোকে নিমন্ত্রণ করতে।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ আসছে বুধবারে আমার বিয়ে।

আনন্দের আতিশয্যে আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললাম,—সে কি রে?

মুখটা নীচু করে সে একটু হেসে বল্‌লে,—তাই।

বিয়ে জিনিষটা legalised Prostitution নয়?

—না।

—আর প্রেম?

—তাও সত্যি! 'সে নহে স্বপন, সে নহে কাহিনী।'

—কিন্তু এ সুমতি আরো কিছুদিন—

—সে আমার অদৃষ্ট দাদা। বলে কপালটা হাত দিয়ে দেখাল।

—এখন এটা too late নয় তো?

তিনকড়ি সোফার ওপর একটা চাপড় দিয়ে বলল,—Better late than never.

আমি বললাম—বহুৎ আচ্ছা। লাগাও বিয়ে।

তিনকড়ি একটু থেমে বলল,—কিন্তু—

আমি একটু চমকে বললাম,—কিন্তু, কি?

কিন্তু একটু ছিল। তিনকড়ি "লভে" পড়েছে। এবং হঠাৎ গৌরের অসবর্ণ বিবাহটা কাজে সফল করার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে বসেছে।

আমি বললাম—কিন্তু, তোমার বাবা—

তিনকড়ি বললে,—তা কি করব? যে আমার সত্যিকারের স্ত্রী, মাত্র সামাজিক কু-সংস্কারের জন্য তো তাকে ত্যাগ করতে পারি নে?

সে ঠিক। বললাম,—তাহোলে এ বিয়েতে তাঁরা বোধহয়—

—না; তাঁরা কেউ আসবেন না।

—তাহোলে বিয়েটা হচ্ছে কোত্থেকে?

—একটা বাড়ী ভাড়া নিতে হবে।

একটু থেমে বললাম,—আচ্ছা, বাড়ী ভাড়া করে আর কাজ নেই। আমার এখান থেকেই না হয়—

তিনকড়ি সাগ্রহে বললে,—তোমার এখান থেকে?

—ক্ষতি কি?

দুইজনেই চুপ করে ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ কার্ডখানা চোখে পড়তেই ডাকলাম,—দারোয়ান।

কার্ডখানা দেখিয়ে বললাম,—বাবু কোথায়?

তিনকড়ি একগাল হেসে বললে, ওটা আমারি কার্ড।

তবে কি—। হাতের পাশের খোলা মাসিক পত্রের পাতাটার ওপর আঙুল দিতেই, তিনকড়ি সলজ্জ ভাবে হেসে বললে,—হাঁ, ওটা আমারি লেখা।

হুঁ। তিনকড়ি হয়েছে "প্রভাত বন্ধু," আর লিখেছে কবিতা।

এরি কিছুদিন পরে একবার মামার বাড়ী যাবার দরকার হয়েছিল। দেখলাম গাঁয়ের লোকেরা তিনকড়ির ওপর বেজায় খাপ্পা হয়েছে। তারা আবার তেমনি নিঃসংশয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করছে,—"এই ছেলেটা গাঁয়ের মুখ আঁধার করে দিলে। এর দ্বারা গাঁয়ের কোনো উন্নতি হবার আশা নেই।

বছর দশেক পরের কথা। সন্ধ্যেবেলা বেড়িয়ে বাড়ী ফিরছি। ঘরের মধ্যে হঠাৎ গিয়েই দেখি আমার স্ত্রীর কাছে আরেকটি মেয়ে। চুপ পিছিয়ে আসতেই আমার স্ত্রী বললে,—তিনকড়ি ঠাকুর-পোর বউ।

হাঁ, সেই-ই তো। রোগা হয়ে গেছে বলে, খানিকটা লম্বা দেখাচ্ছে। আমার স্ত্রী যে রকম ভাবে বললে,—তিনকড়ি ঠাকুর-পোর বউ, তাতে চলে যাওয়া উচিত, কি দাঁড়ানো উচিত, ঠাওর করতে দেরী লাগলো।

তিনকড়ির স্ত্রীর হাত থেকে একখানা চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললে,—এদের বড় বিপদ হয়েছে।

তাইতো। কিন্তু, তিনকড়ি কি জানি, এ কি রকম হোল!

তক্ষুনি চলে গেলাম থানায়। বহুকষ্টে তিনকড়ির দেখা পাওয়া গেল। দশবছর আগের সে তিনকড়ি নেই। তার মাথায় ছোট্ট-ছোট্ট করে চুলছাঁটা, গায়ে একটা আধময়লা খদ্দরের পাঞ্জাবী। ঠিক যেন ছেলে বেলার সেই ভাল ছেলে তিনকড়ি। কেবল দেহটা অনেকটা রোগা, আর চোখ দুটা অনেকটা বসা।

বললাম,—তিনকড়ি, এ কি ব্যাপার?

তিনকড়ি সহজ সতেজ ভাবে বললে, আফিসের টাকা ভেঙেছি। এর মধ্যে যেন লজ্জার কোনো চিহ্ন নেই।

—আফিসের টাকা ভেঙেছিস? তুই?

—হাঁ।

—এর অর্থ?

তিনকড়ি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে যা বললে তার ভাবার্থ এই যে, গত কয়েক মাস থেকে, প্রথমে তার স্ত্রী তারপর তার দুই ছেলে পর-পর জ্বরে পড়ে। তাদের বাঁচাবার আর কোনো পথ ছিল না। অথচ, তাদের বাঁচানো চাই-ই। তাই শেষকালে—

আমি বললাম—কিন্তু, তুমি জেলে গেলে, তোমার স্ত্রী-পুত্রের সম্বন্ধে কি হবে, তা জানো?

তিনকড়ি হাতদুটো মুঠো করে, বিব্রতভাবে তীব্রদৃষ্টিতে একবার আমার পানে, একবার ওপরে, একবার নীচে তাকিয়ে নিলে।

একটু পরে আমি বললাম,—আচ্ছা, তোকে বাঁচাবার যদি কোন পথ থাকে, তাহোলে তোকে বাঁচাব। কিন্তু, এ কী করেছিস তিনকড়ি?—এ যে চুরি?

তিনকড়ি তীব্রদৃষ্টিতে আমার পানে তাকিয়ে বললে,—ইচ্ছে হয়, বাঁচিও। কিন্তু, ভগবান্ না করুন, যদি দরকার হয় তো, আবার চুরি করতে দ্বিধা বোধ করব না। এই জেনে আমায় বাঁচাতে চেষ্টা করো।

দ্বিতীয় কথা না বলে সে কয়েদীর খাঁচা থেকে নেমে গেল। আমার জন্ত রেখে গেল, শুধু একটা আগুন-চাউনির বাণ।

আমার মনে পড়ে গেল, সেই পুরোণো দিনের কথা। আজকের এ দৃষ্টি ঠিক সে দিনের মতো।

যে শাখায় ফুল ফোটে না ফল ধরে না——”

শ্রী বগলারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

পঞ্চাশ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়া বৃদ্ধ সুরেন্দ্রমোহনের মনে প্রেম সঞ্চারের পরিবর্ত্তে, ভীতি সঞ্চারই হইল। স্ত্রীকে বলিল "ওগো শ্যাখ,—ছাদে টাদে বেশী উঠোনা যেন,—মানে ছাদটা "

তৃতীয় পক্ষের নববধূ মুচ্ কিয়া একটুখানি হাসিল মাত্র।

সুরেন্দ্রমোহন প্রথম বিবাহ করিয়াছিল,—বরিশালের কোন এক পল্লীগ্রামে। কিন্তু অল্প বয়সে হঠাৎ অদৃশ্য বংশধরের মাতৃত্ব লাভের ধকল্ টুকু সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহাকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

তারপর,—দ্বিতীয় বিবাহের কথা স্মরণ করিলেই সুরেন্দ্রমোহনের চক্ষু বাহিয়া জল পড়িতে সুরু হয়,—সেটা রাগে কি দুঃখে তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন। তবে এইটুকু জানা যায়,—কলিকাতার মেয়ে হেনা, স্বামীর এই ছাদে উঠিবার নিষেধ সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করিয়াছিল। কারণ গত তিন বৎসর ধরিয়া সে বেথুনের 'বাসে' উঠিয়া উঠিয়া পা দুইখানিকে এমনই অভ্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল যে, যদিও এটা পল্লীগ্রাম, এখানে কিছুতেই উঠিবার নাই,—তবুও ঐ ছাদটুকুতে উঠিবার অধিকার যদি সে না পায়—তাহা হইলে এখানকার বাসই তাহাকে উঠাইতে হয়,—এমনই ছিল তার ধারণা।

এই সমস্ত সহ্য করিয়াও সুরেন্দ্রমোহনের দিন একরূপ কাটিতেছিল মন্দ নয়,—কিন্তু যেদিন সে রান্নাঘরের দাওয়াতে বসিয়া ভাত চাহিল এবং ভাতের পরিবর্ত্তে যখন হেনা খুব গম্ভীরভাবে একটা তেলের বাটী আনিয়া আসনের সম্মুখে রাখিল,—তখন তাহার পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িল। কপালের উপর ভুরু দুইটাকে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ তুলিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—

"মানে ?"

"মানে—স্নান কোরতে হবে।"

আরও বিস্মিত হইয়া সুরেন্দ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিল—

"মানে ?"

"মানে—ভাত হয়নি কিনা !"

"কিন্তু কাল্ কে রাত্রে আমার যে একটু খানি জ্বর হয়েছিল,—মহারাণীর সেটা—দেখা হয়েছিল-কি ?"

"সেটাকে জ্বর বলেনা—ওর নাম হ'চ্ছে উত্তাপ,—ওটুকু না থাকলে মানুষ বাঁচে না, মহারাজের সেটা জানা উচিত ছিল।"

গভীর ক্রোধে সুরেন্দ্রমোহন কিছুক্ষণ হাঁ করিয়াই রহিল,—পরে তেলের বাটীটাকে টান্ মারিয়া উঠানে ফেলিয়া দিয়া—দ্রুতপদে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু,—মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা বলিয়া একটা দুর্নিবার পদার্থ রহিয়াছে —

এবং ক্রোধের বশে পথ হাঁটিলে তাহার নিবৃত্তি হয় না। কাজেই সুরেন্দ্রমোহনকে বাড়ী ফিরিতে হইল।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অতখানি

ক্রোধের মধ্যেও মনের মাঝখানে কোথায় যেন একটা বেদনার মত বাজে……

বাস্তবিকই হেনা রূপসী। যৌবনের পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে সে যেন এই প্রৌঢ়ের অভিজ্ঞ মনটাকে জড়াইয়া লইতেছে দিনের পর দিন ধরিয়া…

এ যেন এক নিরস্ত্র ব্যাধের,—মায়া-মৃগীর পিছনে—শুধুই অবিরাম ধাওয়া আর ধাওয়া ….

নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুরেন্দ্রমোহন দিনের অবশিষ্ট কাজে মন দিবার চেষ্টা করে।

কিন্তু বিধাতা যাহার কপালে বঞ্চনার ছাপ মারিয়া দেন—পৃথিবীতে তাহার আর বঞ্চিত হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কাজ থাকে না।

নহিলে এমন কাই বা বলিয়াছিল সে ? —

ও পাড়ার মিত্তিরদের বাড়ীর চরিত্র সম্বন্ধে সুনাম কোন যুগেই ছিল না। সেই বাড়ীরই কোন এক বিবাহে নিমন্ত্রিতা হেনা, যখন যাইবার জন্য বায়না ধরিয়া বসিল, তখন সুরেন্দ্রমোহন সম্পূর্ণ অসম্মতিই জানাইয়াছিল —

কিন্তু ইহাতেই সে কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিল এবং চোখের জলে সমস্ত মুখ নাকে অস্পষ্ট করিয়া, শয়ন গৃহের দরজা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল।

আশ্চর্য্য কিছুই নয়,—নারী চরিত্রের ইহাই বৈশিষ্ট্য। নহিলে যে বাড়ীর একটী মাত্র প্রাণীও চরিত্রবান নয়—

হইলই বা নিমন্ত্রণ—

তাই বলিয়া যাইতেই হইবে এমন কী কথা আছে…… ?

যদিও প্রথমতঃ কলিকাতার মেয়ে, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষিতা এবং তৃতীয়তঃ সুন্দরী বলিয়া হেনা নিজের দর চড়াইয়া রাখিয়াছে—

তথাপি—

স্বামী হইয়া, পুরুষ হইয়া, তাহারও ত একটা কর্ত্তব্য রহিয়াছে……

জানিয়া শুনিয়া ওখানে পাঠানো চলেনা কিছুতেই।

সন্ধ্যার পর, আলো জ্বালাইয়া, শোভাযাত্রা বর লইয়া আসিল।

মঙ্গল বাদ্যের তালে তালে, হেনার ক্ষুব্ধ হৃদয় সেই আনন্দ সমারোহের সাথে সাথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল……

এতক্ষণ হয়ত বর গিয়া তাহার আসনে বসিল……, কন্যা মাধুরীকে চন্দন পরানো হইতেছে এঃ, বিশ্রী করিয়া ফেলিল……, পাড়াগেঁয়ে ভূত কোথাকার……, নাঃ যাইতেই হইল……

সুরেন্দ্রমোহন বাহিরের ঘরে বসিয়া হিসাবের খাতা দেখিতেছিল। হেনা একছুটে সেখানে আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "কিন্তু তুমি আমাকে যেতে দেবেনা কেন—শুনি ?" উত্তর আসিল "চরিত্রহীনের বাড়ীতে……কথাটা কি জান,—বরের চেয়ে তুমিই লোভনীয় হবে বেশী,… নইলে……

বিবাহ বাড়ীতে উলুধ্বনি হইতেছিল……বর বোধ হয় বিবাহ সভায় আসিল……

হেনা গর্জ্জিয়া উঠিল "চরিত্রহীন ?—কেন, তারা কি আমায় খেয়ে ফেলবে নাকি ?" সুরেন্দ্রমোহনের দৃষ্টি হিসাবের খাতায়।

—"উত্তর দাও না—?"

—"চরিত্রহীন"…হেনা রাগে ফাটিয়া পড়িল।

"চরিত্র চরিত্র ক'রে লাফাচ্ছ, তুমিই বা কোন্ চরিত্রবান শুনি ?"……

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সুরেন্দ্রমোহন বলিল—"কি বললে ?—

তয় দেখাচ্ছ কাকে? আমি কি কিছুই জানিনে মনে কর? পাশের বাড়ীর বিনোদিনী—"

পুরুষ মানুষ, মুহূর্ত্তমধ্যে রক্ত গরম হইয়া উঠিল,—হাতের ওজন ঠিক ছিল না, হেনা সশব্দে মাটীতে পড়িয়া গেল·········

রাত্রি তখন গভীর।

বিবাহ বাড়ীর বাঁশী বেহাগে আলাপ করিতেছে······

সুরেন্দ্রমোহনের হৃদয়ের গভীরতম তল হইতে একটীমাত্র কথা, ভাষা পাইবার চেষ্টা করে,—ভালবাসি······ভালবাসি······

আমার সুন্দরী ষোড়শী স্ত্রীকে আমি ভালবাসি······

তাহার রূপকে, গুণকে আমি ভালবাসি······

তাহার দোষকে, অপরাধকে আমি ভালবাসি······

তাহার সমস্ত সত্তাকে আমি ভালবাসি······

আমার রক্ত দিয়া, আমার মন-প্রাণ দিয়া, আমার একাগ্র কামনা দিয়া।

হেনাকে স্পর্শ করিবার অদম্য ইচ্ছায় সে শয়নগৃহের দিকে চলিতে সুরু করিল······

সেই যে মার খাইয়া সে সন্ধ্যারাত্রে উপরের ঘরে টলিতে টলিতে উঠিয়া আসিয়াছে. তাহার পর তার নিজেরই খোঁজ লওয়া উচিত ছিল এতক্ষণ······

মুখখানি তার ম্লান,—আশাভঙ্গের সমস্ত কয়টী রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে—গালে,...চিবুকে,··· কপালে.. ...চোখে······

দরজা একটু ঠেলা দিতেই খুলিয়া গেল... সুরেন্দ্রমোহন চমকিয়া উঠিল······

পরণের কাপড়খানি পাকাইয়া দড়ীর মত করা হইয়াছে······এবং তাহাই গলার সহিত জড়াইয়া,—উপরে বাঁধিয়া,—হেনা ঝুলিতেছে···

জিভ্ বাহির হইয়া পড়িয়াছে—দৃষ্টি বিস্ফারিত, স্থির। দেহখানি সম্পূর্ণ অনাবৃত······

যেন, স্বামী ঘরে প্রবেশ করিতেই, নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া,—লজ্জায় হেনা এইমাত্র জিভ্ কাটিয়াছে... ..

এইত গেল চল্লিশ--সুরেন্দ্রমোহনের কথা। তারপর দশটী বৎসর কাটিয়াছে শুধু এই চিন্তায়—যে, সত্যই আর বিবাহ করা চলে কি না।

কিন্তু দশবৎসর পরে প্রয়োজনই জয়ী হয়,—মুর্শিদাবাদ জেলার কাশীপুরের একটী বয়স্থা কন্যার গ্রন্থিবদ্ধ-অঞ্চলের টানে সুরেন্দ্রমোহন—বানপ্রস্থে না গিয়া, গৃহের আসিয়া উঠে······

সন্ধ্যা তখনও হয় নাই। দীপ্তি আসিয়া বলিল "হ্যাঁগা আমাকে একটা এস্রাজ কিনে দেবে?"

"কেন?"

"ওমা! কেন আবার কি,—বাজাব!"

"জান?"

"শিখেছিলাম ত। কিন্তু সে সামান্য। আচ্ছা,—এখানে তোমার জানাশুনা এমন কেউ নেই,—যে এস্রাজ বাজাতে জানে? ভাল ক'রে শিখতাম তা' হ'লে।"

সুরেন্দ্রমোহন ভাবিয়াই পায় না—ইহার কী উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। বলিল "দেখ্‌ব।"

"দেখ্‌ব নয়— দেখতে হবে,—বুঝলে?"

বলিয়া দীপ্তি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

* * *

নামের সহিত স্বভাবের এই রকম আশ্চর্য্য মিল দেখা যায় না। দীপ্তির প্রত্যেকটী কথার ভিতর হইতে এমন একটা জোর প্রকাশ পাইত, যাহার নিকট সকলকেই চুপ করিয়া থাকিতে হইত।

পঞ্চাশ বৎসরের সুরেন্দ্রমোহন সম্পূর্ণরূপে দীপ্তি-কবলিত হইয়া গেল। তাহা রূপের মোহে, কিংবা প্রেমের ফাঁদে নহে, শুধু বৃদ্ধের জন্ত প্রতিবাদের শক্তি তাঁহার লোপ পাইয়াছে বলিয়া।

কিন্তু সত্য সত্যই একদিন মোহিত সেন নামে একটী ছোকরা এস্রাজ শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিল। প্রথম সাক্ষাতেই দীপ্তি লাফাইয়া উঠিল—"মোহিত-দা'। তুমি এখানে?" মোহিত-দা' শুধু চেষ্টা করিয়া বলিতে পারিল—"তুমি…তুমি" সুরেন্দ্রমোহন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"চেন নাকি একে?" "চিনি না? ইনি আমাদের ঠিক পাশের বাড়ীতেই থাকতেন যে! কত ভাবই ছিল আমাদের দুই বাড়ীর মধ্যে। [illegible] কতকাল পরে দেখা বলত? চল চল—ওপরে চল।" বলিয়া দীপ্তি মোহিতকে একরূপ টানিয়া লইয়া গটগট করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া গেল। [illegible]

সুরেন্দ্রমোহন ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল [illegible]

[illegible]

সেবাপরায়ণা হইয়া উঠিল। ত্রুটী কিছুই নাই, যথাসময়ে তেল, জল, ভাত, পান, আর তামাকটী পর্য্যন্ত সমস্তই। তবুও কোথায় যেন একটা মস্ত ফাঁক থাকিয়া যায়—যাহা সেবায় দ্বারা পূরণ হয় না কিছুতেই……

সুরেন্দ্রমোহন বসিয়া বসিয়া ভাবে,—পরিপূর্ণ দাম্পত্য-সুখ কি পৃথিবীতে নাই? নহিলে বিবাহ তো তিনবারই করিল সে—! তথাপি এই বিচ্ছেদের বেদনা, এই আত্মতৃপ্তির অভাব তাহাকে বারেবারেই সহিতে হয় কেন?

কোন্ এক অজ্ঞাত গ্রহের সতর্ক দৃষ্টি তাহার জীবনের প্রারম্ভ হইতে তাহাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে—যাহার [illegible] [illegible] [illegible] বিষাক্ত হইয়া উঠে। [illegible]

[illegible]

সুরেন্দ্রমোহন স্পষ্টই অনুভব করিল—[illegible] আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে [illegible] অভাব অনুভব করিতেছে সে [illegible]

[illegible]

কিন্তু লোকে বলিতে আরম্ভ করিল—

তবে সুরেন্দ্রমোহনকে লইয়া নয়—। এপ্রাজ শিখিবার উপলক্ষ্যকে লক্ষ্য করিয়া,—মোহিত সেনের দুঃসাহসকে উল্লেখ করিয়া, আর দীপ্তির নির্লজ্জতাকে কেন্দ্র করিয়া···

. . . .

বাজার হইতে ফিরিবার পথে নিতাই খুড়োর আড্ডায় সুরেন্দ্রমোহনকে একবার বসিতে হইল।

হুঁকায় একটা টান দিয়া—সুরেন্দ্রমোহনের হাতে দিতে দিতে খুড়ো সুর ধরিলেন—"ভায়া কি আজকাল জেগে ঘুমোচ্ছ নাকি?" প্রতিপক্ষকে কোন উত্তর দিবার অবকাশ না দিয়াই পুনরায় সুরু করিলেন,—পার্শ্বস্থ রামময় চক্রবর্ত্তীর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া,—"সেদিন আমাদের ক্যাবলা কি বলছিল হ্যা চক্রবর্ত্তী? সে বল্লে যে, "রাত্তির তখন আটটা কি সাড়ে আটটা হবে, জ্যোছনা রাত্তির, পরিষ্কার দেখলাম মশায়, আমাদের সুরো-জ্যাঠার বৌ, আর জমিদারের নায়েবটা হাত ধরাধরি করে ছাদে পায়চারী করছে"—ছিঃ, ছিঃ, এসব কি আরম্ভ হ'ল বলত সুরেন?"

সুরেন্দ্রমোহন তখন একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিবার চেষ্টা করিতেছে—"কই আমি ত খুড়ো একদিনও—"

খুড়া বাধা দিয়া জোর গলায় বলিলেন—"আরে, —তুমিই যদি দেখবে তা হলে আর বাহাদুরীটে হ'ল কি? কি বল হে চক্কোত্তি? ওসব হ'ল কাশীপুরের মেয়ে; ওদের খুঁড়লে গাছ বেরোয়। আরে বাবা, আমিত জানি সেটা কী দেশ? গিয়েছিলাম একবার ওই হরিদাসের মেয়ের সম্বন্ধ ঠিক কোরতে। পাত্রের নাম বোধিসত্ত্ব, তাকে লোকে বুদ্ধা বলে। সে হতভাগা রাস্তায় রাস্তায় বাঁশী বাজিয়ে বেড়ায়। রাত্তির বেলায় দেখে আমি ত সেখান থেকে দে চম্পট। বলি বাবা কাজ নেই, ওই জেঠাকুরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে...এতে যদি হরির মেয়ের বিয়ে না হয়—নাই হলো বুঝলে, এমনই সে দেশ।"

সুরেন্দ্রমোহনের উত্তর দিবার শক্তি তখন লোপ পাইয়াছে।

খুড়ো কিন্তু বকিয়া চলিলেন—"পঞ্চাশবছরের বুড়ে—দের বোধ হয় রাত্তিরে সিদ্ধি-কিদ্ধি খাইয়ে; তারপর লে বাবা, মরগে বা তুই...। একটু চোখ মেলে দেখো, এটা ত বৃন্দাবন নয়, এটা ভদ্রলোকের গ্রাম, নইলে আমাদের আর কী?"

সুরেন্দ্রমোহন ধীরে ধীরে বাজারের ঝুলিটা তুলিয়া লইয়া বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়,—যেন পক্ষাঘাত হইয়াছে...

দারুণ দুর্ণাম। সুরেন্দ্রমোহনের সমস্ত শিরায় শিরায় একটীমাত্র সুরধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলিয়া ফেরে—দীপ্তি-ভ্রষ্টা ... দীপ্তি চরিত্রহীনা···দীপ্তি বিশ্বাস-হন্ত্রী···

সারাদিন সে একটা অপ্রত্যাশিত দুঃখের সুতীব্র অনুভূতিতে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়া রহিল।

কিন্তু সন্ধ্যার পরই যখন দক্ষিণের বাতাস ঝুর্‌ঝুর্ করিয়া খোলা জানলা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিল,—যখন কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি নক্ষত্রখচিত হইয়া উঠিল—তখন সুরেন্দ্রমোহন ছাদে আসিল—

এবং সেই বিশ্বব্যাপী অখণ্ড নিস্তব্ধতার মাঝখানে তাহার এই কথাই কেবলই মনে হইতে লাগিল যে,—মানুষ, মানুষের উপর অত্যাচার করিতে পারে না,—স্বামীত্বের অধিকারেও না; কারণ, স্বতন্ত্র রুচি ও স্বতন্ত্র প্রকৃতির সংমিশ্রণেইতো মানুষ, মানুষ। এতটুকু ব্যত্যয় ঘটিলে তাহার উপর অত্যাচার করিব,—এমন কী অধিকার আমার আছে?...

পরমুহূর্ত্তেই কাণে গেল দীপ্তি সিঁড়ির নিকট দাঁড়াইয়া কাহাকে যেন বলিতেছে—"একটু সকাল সকাল আসতে পারো না; বড্ড দেরী ক'রে

ফ্যালো তুমি। কাল থেকে ভোরবেলায় তা'হলে এক ঘণ্টার জন্যে এসো, কানাড়া গৎখানা তা' হলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে; ভুলোনা।"

সেই রাত্রিতেই শুইবার সময় সুরেন্দ্রমোহন দীপ্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, "এসব কি হচ্ছে?"

"কি সব?"

"এই এস্রাজ মাঝখানে রেখে?"

"স্পষ্ট করে বল।"

সুরেন্দ্রমোহন বিরক্ত হইয়া বলিল—

"আমি আর কি স্পষ্ট করে বলব। তুমি এতই স্পষ্ট করে তুলেছো যে, পাড়ায় আর কান পাতা যায় না।" দীপ্তি চুপ্ করিয়া রহিল।

ঘরখানি সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। শুধু টেবিলের উপরে টাইমপিস্ ঘড়িটা অবিশ্রান্ত একটানা টিক্ টিক্ টিক্ টিক্ শব্দ করিয়া চলিয়াছে···

"তোমার মন এত ছোট, তা' আমি জানতাম না।"

"কী, মন ছোট আমার···?"

"নিশ্চয়ই, শুধু তাই নয়, —নিজের স্ত্রীকে নিয়ে ইতরোমিতেও তুমি অভ্যস্ত। মদ খেয়ে এসেছ নাকি?"

'কী' বলিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সুরেন্দ্রমোহন লাফাইয়া উঠিতেই—চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল—হেনার উলঙ্গমূর্ত্তি, পরণের কাপড়খানি দড়ির মত গলায় জড়ান—তেমনি জিভ কাটা অবস্থায়! মুখখানি ম্লান, বিবাহ-বাড়ীতে যাইবার জন্য খোঁপাটী সুন্দর করিয়া বাঁধা...

"না—না—না"—বলিয়া বিকট একটা চীৎকার করিয়া বিদ্যুৎবেগে সুরেন্দ্রমোহন দীপ্তিকে নিজের বুকের সহিত বিপুল বলে জড়াইয়া ধরিল।

পরদিন—

বেলা তখন বোধ হয় একটা কি দেড়টা। সুরেন্দ্রমোহন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিয়াই ডাকিল—"দীপ্তি!" উত্তর না পাইয়া আবার ডাকিল -"দীপ্তি!"

অন্যদিনের মত দীপ্তি বাহির হইয়া আসিল না দেখিয়া সে ক্রুদ্ধচিত্তে উপরে উঠিয়াই বুঝিল, ঘরে কেহ নাই, দরজা খোলা ..জানালা দুইটা খোলা ···হাঁ · হাঁ · করিতেছে।

ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, বিছানার উপর দোয়াত দিয়া চাপা একখণ্ড কাগজ রহিয়াছে···

সর্ব্বাঙ্গ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া ঘাম ঝরিতেছে। —অস্নাত, অভুক্ত সুরেন্দ্রমোহন লেখার উপর চোখ বুলাইয়া চলে—

শ্রীচরণেষু,

তুমি আমাকে সন্দেহ করেছো,—সত্যিই আমি অপরাধী। তোমার উচিত ছিল না পঞ্চাশ বৎসর বয়েসে আবার বিয়ে করা। কলঙ্ক মুখর গ্রামে আর আমার থাকা উচিত নয়—তাই চল্লাম। ক্যাসবাক্সের ভেতর আশীটা টাকা ছিল হার গড়াবার জন্যে, সেটা নিয়ে গেলাম, কিছু মনে করো না। প্রণাম নিও।

তোমারি—

দীপ্তি।

মাথাটার ভিতর ঝিঁ···ম্ করিয়া উঠিল। টলিতে টলিতে কোনরকমে সে পূর্ব্বদিকের জানালার কাছে গিয়া 'ধপ্' করিয়া বসিয়া পড়িল।

বৈশাখের খর মধ্যাহ্ন, চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে···আকাশের যতদূর দৃষ্টি যায় একটী পাখীও উড়িতেছে না...গাছের একটীমাত্র পাতাও নড়িতেছে না...কোনদিকে যেন কোমলতার চিহ্ন মাত্রও নাই···

দূরে,—নদীর বালুচরের পার হইতে একটা চখা অবিশ্রান্ত ডাকিয়া চলিয়াছে...তাহার ক্ষীণতম রেশটুকু স্তব্ধতার বুক চিরিয়া চিরিয়া জানালা দিয়া ঘরে ঢুকিতেছিল—

কোয়াক্···কো, কোয়াক্···কো....

অভিশাপ

শ্রী অপূর্ব্বমণি দত্ত

(এক)

বাতিক ছাড়া ইহাকে আর কি বলিব? ট্যাক্সি ভাড়া, ট্রেণ ভাড়া এই সব খরচ করিয়া কলিকাতা হইতে প্রায় একশত মাইল দূরে বিনয়-দের দেশে মাছ ধরিতে গিয়াছিলাম। মাছ একটীও মিলিল না। ফিরিবার পথে বিনয় আমার সঙ্গী হইল; দুই বন্ধু মিলিয়া পরামর্শ স্থির করিলাম, বৈকালের ট্রেণটা ধরিয়া রাত্রি আটটার মধ্যে শিয়ালদহে পৌছিয়া বৌবাজার হইতে একজোড়া ইলিশ মৎস্য কিনিয়া বাড়ী ফিরিলেই চলিবে।

কিন্তু দুর্দ্দৈব আর কাহাকে বলে? ষ্টেশনে আসিয়াই শুনিলাম যে, স'পাঁচটার ট্রেণখানা সেই মাসের পয়লা হইতে সময় পরিবর্ত্তিত হওয়ায় পৌনে পাঁচটায় চলিয়া গিয়াছে। কাজেই হতাশ-চিত্তে ষ্টেশনের ভাঙ্গা বেঞ্চির উপরে আমি পদ্মনাভ হইলাম; বিনয় প্ল্যাটফরমে পায়চারি করিতে লাগিল।

একঘণ্টা পরে একখানি ট্রেণ ছিল, সেখানি আবার সেই ক্ষুদ্র ষ্টেশনটীতে থামে না। ষ্টেশনের দেওয়ালে টাঙ্গানো বৃহৎ টাইমটেবেলটী পড়িয়া বুঝিলাম যে, রাত্রি সাড়ে নয়টা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

সারাদিনটা যাহারা ছিপের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে ক্লান্তিবোধ করে নাই, ষ্টেশনে বসিয়া এই সাড়ে চারি ঘণ্টার কৃচ্ছ্রসাধন তাহাদের কাছে কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু ক্লান্ত যথেষ্ট হইয়াছিলাম, মৎস্যকুল সংহার করিতে না পারার দুঃখটাও যে অন্তরে বাজিতেছিল না এমন নয়, সেই জন্যই মনে হইতেছিল যে, একটা আস্তানা পাইলেই যেন স্বস্তি বোধ করিতাম।

আমার বেঞ্চিখানির পশ্চাতেই ষ্টেশনের দেওয়ালে টাঙ্গানো "ফায়ার" লিখিত রক্তবর্ণের তিনটি বালতী ছিল। মুখে এবং মাথায় ধূলা যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছিল, তাই হাত মুখ ধুইবার মতলবে রেলওয়ের আইন ভঙ্গ করিয়া একটীকে নামাইয়া দেখিলাম যে, তাহাতে বালি বোঝাই রহিয়াছে। অগ্নি জ্বলিলে হয় তো জলের প্রয়োজন বালুকার দ্বারা সাধিত হইতে পারে, কিন্তু হাত মুখ ধুইবার প্রয়োজন থাকিলে জলের অভাব বালি দ্বারা মেটে না। সুতরাং দ্বিতীয় বালতীটাও নামাইতে হইল; তাহার ভার অনুভব করিয়াই বুঝিয়াছিলাম যে, তাহা শূন্য। তৃতীয়টী নাড়া দিয়া জলের সন্ধান পাওয়া গেল এবং সেই অপরিচ্ছন্ন জলেই আমাদের প্রসাধনকার্য্য শেষ করিয়া লইলাম।

এমন সময়ে আর একটী সঙ্গী পাওয়া গেল। ভদ্রলোকের বয়স খুব বেশী নয় হাতে একটী চামড়ার ক্ষুদ্র ব্যাগ, আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই ভদ্রতার খাতিরে সেই বেঞ্চিরই এক পার্শ্বে তাঁহাকে বসিবার স্থান দিলাম।

তিনি ধন্যবাদ জানাইয়া বসিয়াই পকেট হইতে সিগারেটের একটা বাক্স বাহির করিয়া আমার সম্মুখে ধরিলেন, আমি বিনীতভাবে যখন জানাইলাম যে,ধূমপানের রসে আমি বঞ্চিত, তখন তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া আর একটী কৌটা বাহির করিয়া বলিলেন, "বেশ, তবে পান নিন একটা।"

এবার আর আপত্তির কারণ রহিল না। কথা কহিতে লোকটী দেখিলাম বিলক্ষণ ওস্তাদ। পৃথিবীর কোন অংশে কি হইতেছে তাহার সমস্ত

বিবরণ যে এই ক্ষুদ্র ষ্টেশনটীর সান্নিধ্যে থাকিয়া তিনি কি প্রকারে সংগ্রহ করিলেন, তাহাই আশ্চর্য্য।

পরিচয় লইয়া জানিলাম যে, তিনি এক ইন-সিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট। জীবন জিনিষটা নশ্বর হইলেও যে কি মহামূল্য সামগ্রী এবং সেই মূল্যের সার্থকতা রক্ষা করিতে গেলে যে জীবনবীমা মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহার সহস্র যুক্তি তাঁহার জিহ্বাগ্রে। আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনটার একটা সঠিক্ মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য তিনি মনে মনে হিসাব করিতেছিলেন, এমন সময়ে বিনয় বলিল, "হ্যাঁ মশায়, আপনাদের 'ফায়ার' ইনসিওর আছে ?"

লোকটী মহা-উৎসাহের সহিত বলিল, "নিশ্চয়! ফায়ার, লাইফ, মেরিণ, ওসেন, এক-সিডেণ্ট, মটরকার, যায় এরোপ্লেন ইনসিওর পর্য্যন্ত আমাদের আছে। এমন কোম্পানী আপনি কোথাও পাবেন না।" বলিয়া হাতের ব্যাগটী খুলিয়া একখানা বই বাহির করিয়া বোধ হয় 'ফায়ার' ইনসিওরেন্সের পরিচ্ছেদটাকেই খুঁজিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, "ফায়ার ইনসিওর কি হবে হে বিনয় ?"

বিনয় পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, "একটা করাবো ভাব্‌ছি।"

তাহার কথাটার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, কোথাও পাটের গুদাম খুল্‌ছো না কি ?"

পাটের গুদাম ফায়ার ইনিওসর করিয়া কোম্পানীকে ফাঁকি দিয়া রাতারাতি বড়লোক হইবার প্রয়াসে কয়েকটী লোক সম্প্রতি কি ভাবে জেলে গিয়াছেন, তাহার বিবরণ খবরের কাগজে পড়িয়াছিলাম। ভাবিলাম, বিনয়ও কি সেইরূপ একটা মতলব আঁটিতেছে না কি ? তাহা হইলে তো ভাল কথা নয়!

কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তরে বিনয় বলিল "না সে সব কিছুই নয়।"

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে ?"

বিনয় বলিল, "দেশের বাড়ীখানার একটা ফায়ার ইনসিওর করাবো ভাবছি।"

আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। বিনয়ের দেশ হইতে এইমাত্র আসিতেছি, সুতরাং তাহার দেশের বাড়ী সম্বন্ধে আমার অজানা কিছুই নাই এই ক্ষুদ্র ষ্টেশনটী হইতে চার মাইল গরুর গাড়ী এবং আড়াই মাইল নৌকায় যাইয়া নিতান্ত এক গণ্ডগ্রামের মধ্যে তাহার বাড়ী। হয় তো তাহার পূর্ব্বপুরুষদের ঐশ্বর্য্যের সময় বাড়ীখানির অবস্থা ভাল ছিল, কিন্তু তাহার চারিদিকের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যে অংশটুকু কালের সঙ্গে লড়াই করিয়া এখনো মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহা দেখিলে এই বাক্যবাগীশ এজেণ্ট বেচারাকেও হতাশার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ফিরিতে হয়।

বিনয়ের কথার উত্তরে আমি বলিলাম, "হঠাৎ তোমার মাথা খারাপ হোল নাকি বিনয়? তোমার ঐ পচা, পুরানো, পাড়াগাঁয়ের ভাঙ্গা বাড়ী হঠাৎ ফায়ার ইনসিওর করবার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছো, কি মতলবটা হে ?"

বিনয় বলিল, "এর মধ্যে কথা আছে রে ভাই। আমাদের বাড়ীর এক পুরোনো ইতিহাস আছে।"

ট্রেনের অপেক্ষায় দীর্ঘকাল ষ্টেশনে বসিয়া নরকযন্ত্রণা সহ্য করার চেয়ে ইতিহাস ছাড়িয়া বিনয় যদি ভূগোল আওড়াইত, তাহাতেও আমি আপত্তি করিতাম না। সুতরাং সাগ্রহে তাহার ঐতিহাসিক-কাহিনী শুনিবার বাসনা জানাইলাম।

নিছক একটা আরব্য উপন্যাসের গল্প! বাংলাদেশে যখন বর্গীর হাঙ্গামা হইয়াছিল, সেই সময়ে তাহাদের বংশের যিনি বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহার নাম সনাতন মিশ্র। কি উপায়ে

দয়াপরবশ হইয়া এক বর্গী সর্দ্দার ও তাঁহার আহত পুত্রকে তিনি লুকাইয়া আশ্রয় দেন তাহার কাহিনী শেষ করিয়া বিনয় বলিল যে, হাঙ্গামা একটু থামিয়া গেলে সেই সর্দ্দার নিজের দলের সন্ধানে চলিয়া গেলেন, ছেলেটী তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই, সেজন্ত তাহাকে মিত্র-মহাশয়ের আশ্রয়েই রাখিয়া গেলেন। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনা, সপ্তাহ না যাইতেই সনাতন মিত্র শুনিলেন যে, তাঁহার কোথাকার কাছারীবাড়ী বর্গীয়া লুঠ করিয়া তাহাতে আগুণ ধরাইয়া দিয়াছে।

এই ব্যাপারটার প্রতিশোধ তিনি আগুণের দ্বারাই লইলেন। বর্গী সর্দ্দারের সেই ছেলেটাকে তাঁহার বাড়ীর উঠানে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিয়া নিজের প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন। সে বেচারা নিজের জীবন রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া মিত্র-মহাশয়কে মরণ অভিশাপ দিয়া গেল যে,—যদি ঈশ্বর সত্য হন, তাহা হইলে মিত্র-মহাশয়ের এই ভদ্রাসন অগ্নিতে আহুতি দিয়া এই নিরপরাধ বালকের মৃত্যুর প্রতিশোধ স্বয়ং ঈশ্বরই লইবেন; অথবা যদি জন্মান্তর সত্য হয়, তাহা হইলে সে নিজেই এক সময়ে জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া তাহার এই মর্ম্মান্তিক অভিসম্পাতকে সফল করিয়া যাইবে।

উচ্চহাস্য আর চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। বিনয়ের মত শিক্ষিত লোকেও যদি এই সব আজগুবি ব্যাপার এখনও পর্য্যন্ত বিশ্বাস করে, তাহা হইলে সেকালের বৃদ্ধাদের দোষ দেই কেন? তাহাকে বলিলাম, "ভাই, বর্গীর হাঙ্গামার পর প্রায় দুশো বছর কেটেছে। এই দুশো বছরের মধ্যে বোধ হয় সনাতন মিত্তিরের দশ বার পুরুষ পৃথিবীতে এসেছেন এবং গিয়েছেন। সুতরাং এতকাল পরে সেই দুর্ভাবনা মাথায় নিয়ে মিছে কতকগুলো টাকা প্রিমিয়মে নষ্ট করার চেয়ে সে টাকা খরচ করবার অন্ত অনেক উপায় আমি বলে দেব। এতকাল যদি কারোর ইন্‌সিওর না করে কেটে থাকে, তাহলে ঐ ভাঙ্গা বাড়ীর কল্যাণ কামনা করে মিছি মিছি কতকগুলো টাকা নষ্ট করো না। ওর মেয়াদের বাকী ক'টা দিনও এমনি ভাবেই কেটে যাবে

একটা মস্ত ক্লায়েন্ট হাতছাড়া হয় দেখিয়া সে ভদ্রলোক লাফাইয়া উঠিলেন এবং বিনয়কে লইয়া প্ল্যাটফরমের অপর প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইবার উদ্যোগ করিলেন, আমি তখন বাধ্য হইয়াই তাঁহার সঙ্গে অন্ত গল্প সুরু করিয়া তবে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলাম।

(দুই)

প্রায় বছরখানেক পরে বিনয়ের কন্তার বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়া আবার তল্পীতল্পা বাঁধিয়া তাহার দেশে রওনা হইলাম।

টিকিটখানি দিয়া ষ্টেশনের ক্ষুদ্র ফটকটার বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে, আমাকে লইতে বিনয় নিজেই আসিয়াছে। কষ্ট করিয়া নিজে না আসিয়া একখানা গরুর গাড়ী পাঠাইয়া দিলেই যে যথেষ্ট হইত এই কথাটা বলিবামাত্র বিনয় মুখখানি অত্যন্ত ম্লান করিয়া বলিল, "ভাই, গরুর গাড়ী একখানাও নেই, তোমাকে হেঁটেই যেতে হবে।"

হাঁটিতে আমি অবশ্য পিছপাও নই, কিন্তু গরুরগাড়ী জিনিষটা পল্লীগ্রামে এমন কিছু দুষ্প্রাপ্য নহে যে, তাহার অভাব ঘটিয়াছে বলিয় সেই বার্ত্তা জানাইতে বিনয় নিজেই এতখানি পথ কষ্টস্বীকার করিয়া আমাকে লইতে আসিয়াছে।

কিন্তু ব্যাপারটা যাহা শুনিলাম, তাহা নিতান্ত হাসিয়া ওড়াইবার মত নহে।

নদীর ওপারে একটা পরিত্যক্ত নীলকুঠী ছিল, তাহারই সংলগ্ন আম্রকাননে এক মিশনরী সাহেব ডাক্তার আসিয়া তাঁবু ফেলিয়াছিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে দূরবর্ত্তী অন্ত একটা গ্রামে এইভাবে ছাউনি ফেলিয়া ঔষধ বিতরণ করিতেছিলেন,

হঠাৎ কি একটা সূত্রে বিনয়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। নিজেদের গ্রামের দুর্দ্দশার কথা করুণভাবে জানাইয়া বিনয় মিশনরী সাহেবকে বলিয়াছিল যে, তিনি যদি তাহাদের গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন একটা স্থানে যাইয়া অবস্থান করেন, তাহা হইলে চারিদিকের লোক প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবে। দশক্রোশের মধ্যে একজন ভাল চিকিৎসক নাই, এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া তবে বিনয় সাহেবটাকে ওখানে আনিতে সম্মত করিতে পারিয়াছিল।

ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট পল্লীগ্রামবাসীরা বিনামূল্যে বিচক্ষণ চিকিৎসকের ঔষধ ও পরামর্শ পাইয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, কিন্তু গোলোযোগটা বাধিল অন্য দিকে।

গ্রামের যিনি জমীদার তাঁহার পেশা ছিল ডাক্তারী। তবে কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ডাক্তারীর উপাধিলাভ করিয়াছিলেন, ইতিহাস সে সম্বন্ধে নীরব, কিন্তু অনন্যোপায় হইয়াই লোকে জীবন-মরণের দায়ে তাঁহাকেই ডাকিত এবং রোগীর মৃত্যুর পরেও ডাক্তারের ভিজিট ও ঔষধের দাম শোধ দেওয়া বাড়ীর লোকেদের নিকট একটা মস্ত বিভীষিকা বলিয়া মনে হইত।

মানুষের প্রাণ লইয়া এই ডাক্তারটী ছেলেখেলা করিতেছিলেন, সেই সময়ে হঠাৎ মিশনরী সাহেব ডাক্তারের আবির্ভাবের সংবাদে তাঁহার মাথায় একেবারে বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল।

বিনয় ছেলেটিকে তিনি ভাল বলিয়াই জানিতেন, কিন্তু তাহার দ্বারাই যে তাঁহার এই সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইল এ কথাটাও অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না।

বিনয়কে তিনি ডাকাইয়া অনেক বুঝাইয়া বলিলেন যে, সাহেবকে সে বলুক যে, এখানে খৃষ্টান মিশনরীর ঔষধ সেবন করিয়া হিন্দুধর্ম্ম লোপ পাইয়া যাইবে সুতরাং সাহেব অন্যত্র চলিয়া যান। কিন্তু বিনয় সে যুক্তিটা ঠিক্ সদযুক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। ফলে, মিশনরী সাহেব রহিয়া গেলেন, এবং নীলকুঠীর দুই-চারিটী ঘর মেরামত করিয়া সেখানে একটী ছোটগোছের হাসপাতাল ও মিশন স্কুল স্থাপন করা যাইতে পারে কি না তাহারই চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

কিন্তু ষোল আনা রকমের প্রায়শ্চিত্তটা বিনয়কেই করিতে হইল। সে যখন নিজের মনের আনন্দে কন্যার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছিল, তখন ডাক্তার জমিদারটীর প্রতিহিংসাবৃত্তিও গোপনে জলিয়া উঠিতেছিল। আগামী কল্য কন্যার বিবাহ,আজ সে জানিতে পারিল যে,তাহার কার্য্যের জন্য চারিপার্শ্বের কোন গ্রাম হইতে একখানিও গোযান সংগৃহীত হইবে না। শুধু তাই নয়, মাছওয়ালা বায়না ফেরত দিয়াছে, মিষ্টান্নের সরবরাহকার আজ প্রাতে আসিয়া যথেষ্ট বিনয়ের সহিত জানাইয়াছে যে, মিষ্টান্নের ভার সে লইতে অসমর্থ, উহা যেন অন্য কাহাকেও দেওয়া হয়।

একটা অতি সামান্য কারণে যে মানুষের প্রতিহিংসাবৃত্তিটা এতখানি নির্ম্মম হইয়া উঠিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। বিনয়কে ভর্ৎসনার স্বরে বলিলাম, "এত বড় কাণ্ডটার তো কিছুই ঘটতে পারতো না বিনয়, যদি তুমি মেয়েকে কোলকাতায় নিয়ে গিয়ে আমার ওখান থেকে বিবাহ দিতে। চিরকাল সহরের আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে এখনও যদি আমাদের এই সব প্রাচীন সামাজিক কলকাঠীর অধীনে চল্‌তে হয়, তা হলে তো জীবনটাই দুর্ব্বহ হয়ে ওঠে।"

কিন্তু বিনয় বলিল, "যা হয়ে গিয়েছে তার তো আর উপায় নেই ভাই, কিন্তু এখনকার ব্যবস্থা—"

ভাবিয়া দেখিলাম দু'-তিনটী ষ্টেশন পরে যে সহর আছে, সেখান হইতে মিষ্টান্ন আনাও কিছু শক্ত কাজ নয় এবং চেষ্টা করিলে বরপক্ষীয়দের জন্য দু'-চারখানা ঘোড়ার গাড়ী এবং পাল্কীর ব্যবস্থা করা ব্যয়সাধ্য হইলেও অসম্ভব নহে।

আমরা তখন প্রায় মাইলখানেক পথ আসিয়াছি, বিনয়কে বলিলাম যে, তাহা হইলে সময় নষ্ট করা আর আদৌ উচিত নয়, আমি এখান হইতেই ফিরিলাম। একঘণ্টা পরে যে ট্রেণখানি যায়, সেই ট্রেণে যাইয়া আমি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও গাড়ী পাল্কীর বন্দোবস্ত করিয়া কাল সকালে ফিরিব। জমীদার ডাক্তারবাবুটীকে আমরা দেখাইয়া দিতে চাই যে, তাঁহার প্রতিহিংসার আগুনের ক্ষুধিত জিহ্বা আমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না।

(তিন)

অনেকগুলি টাকা বাজে খরচ হইয়া গেল বটে, কিন্তু বন্দোবস্ত সবই ঠিক করিয়া পরদিন প্রভাতে আমি বিনয়ের বাড়ীতে পৌঁছিলাম। সেইদিনই বিবাহ।

সন্ধ্যার ট্রেণে বর আসিবার কথা ছিল, তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আমিই গেলাম ষ্টেশনে। কিন্তু সন্ধ্যার ট্রেণ যথাসময়ে আসিল এবং চলিয়া গেল, বর অথবা সে পক্ষের কোন লোকজন নামিল না। এক ঘণ্টা পরে আর একখানা ট্রেণ ছিল সেখানিও চলিয়া গেল, তখন আমিও বড় ভাবিত হইয়া পড়িলাম। টাইম টেবেল পড়িয়া দেখিলাম পরবর্ত্তী ট্রেণ আসিবে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরে, তখন লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু তবুও তাঁহাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইল এবং সে ট্রেণখানিও যখন ঘণ্টাধ্বনি ও বংশীনিনাদ করিয়া দ্বিপ্রহর রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল, তখন বুঝিলাম যে, আমরাই পরাজিত হইয়াছি। আমরা যখন গাড়ী ও মিষ্টান্নের বন্দোবস্ত অক্ষত করিয়া মনে মনে আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছিলাম, তখন ঠিক কি উপায়ে বরপক্ষীয়দের নিকট কি কথা রটনা করিয়া বিবাহটা পণ্ড করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা জানিতে না পারিলেও ব্যাপারটা কল্পনা করিতে দেরী হইল না।

একখানা গাড়ী লইয়া যখন আমি বিনয়ের বাড়ী পৌঁছিলাম, তখন সকাল হইয়াছে।

বিনয়ের সে কি বীভৎস চেহারাই সেদিন দেখিলাম। মানুষ যে বিনা দোষে মানুষের এমন সর্ব্বনাশ করিতে পারে, তাহা আগে বুঝিতাম না। আমার হাতখানি ধরিয়া সে বালকের মত কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না। ওদিকে শুনিলাম, বাড়ীর ভিতর বিনয়ের স্ত্রীর ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতেছে।

বিনয়কে বুঝাইয়া বলিলাম যে, গ্রহের ফের ছিল, কতকগুলা টাকা অনর্থক নষ্ট হইল,—কিন্তু ইহাতে নিজেকে দুর্ভাবনার সৃষ্টি করিলে চলিবে না। তোমাদের সকলকে লইয়া আমি আজই কলিকাতা যাইব। দেখা যাক্, তোমার কন্যার বিবাহ আমি দিতে পারি কি না।

আমার পরামর্শে স্বীকৃত হওয়া ছাড়া বিনয়ের গত্যন্তর ছিল না। সাংসারিক কতকগুলা ব্যাপারের একটা ব্যবস্থা করিয়া সে কয়েক দিন পরে আমার ওখানে আসিবে, এই প্রতিশ্রুতি লইয়া চলিয়া আসিলাম।

(চার)

ব্যাপারটা আগাগোড়া ভাবিয়া দেখিলাম। সামান্য একটু আগুনের স্ফুলিঙ্গ কবে কোন্ স্থত্রে একটুখানি উড়িয়াছিল, তাহাই পরিণত কি বিরাট একটা সর্ব্বনাশের সৃষ্টি করিয়া বসিল। সাধারণের হিত কামনায়, মৃত্যুর সর্ব্বগ্রাসী আক্রমণ হইতে দেশের লোককে রক্ষা করিবার জন্যই বিনয় সেই মিশনরী সাহেবটাকে গ্রামের নিকট আসিতে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু সেই সামান্য কারণটুকু হইতে তাহার সংসারের ইতিহাসে একটা কত বড় কালিমা মুদ্রিত হইয়া গেল। যাহাদের মঙ্গলের জন্যই সে এ কাজ করিয়াছিল, তাহারাও তো তাহার এ সময়ের আনন্দে কৌতুক দেখিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিল না।

কয়েকদিন পরেই বিনয়ের সপরিবারে আসিবার কথা ছিল, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে আসিল তাহার এক পত্র। কন্যার বিবাহের রাত্রে তাহার স্ত্রীর সেই যে মূর্চ্ছা হইতে সুরু হইয়াছিল, সে মূর্চ্ছা আর সারিতেছে না; প্রায় প্রতি মুহূর্ত্তেই ক্রমাগত মূর্চ্ছা হইতেছে। সেই সাহেব ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, অদ্যবস্ত্রের অবস্থা বড় আশাপ্রদ নয়, সুতরাং এ অবস্থায় এ স্থান ত্যাগ করা অসম্ভব।

বেচারার বিপদের উপর বিপদ দেখিয়া মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল। একটা সুটকেশে দু'-একখানা খানা কাপড় জামা গুছাইয়া লইয়া বৈকালের ট্রেণেই রওনা হইলাম।

যখন পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি বোধ হয় নয়টার কম হইবে না। আমার সাড়া পাইয়া সে পাগলের মত বাহিরে আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া যাহা বলিল, তাহাতে বুঝিলাম যে, তাহার স্ত্রীর মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিবে না। জীবনের হিসাব-নিকাশ শেষ হইবার পূর্ব্বেই একমাত্র কন্যার এত বড় সর্ব্বনাশটা সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি যেখানে চলিয়া গিয়াছেন সে স্থান শত্রুতা সাধনের বাহিরে। আমিও কাঁদিয়া ফেলিলাম।

গ্রামের কোন লোকেই যে শবদেহ সৎকারের জন্য আসিবে না, ইহা অনুমান করিতে আমার দেরী হইল না; দেখিলাম, বিনয়ও আমার সঙ্গে সে বিষয়ে একমত। তবু একবার বাহির হইলাম; কিন্তু যাহাদের দেখা পাইলাম তাহাদের মিষ্টবাক্যপূর্ণ অজুহাতের অভাব ঘটিল না।

শ্মশান প্রায় ক্রোশখানেক দূরে। চেষ্টা করিলে আমরা দুইজনে মৃতদেহ বহন করিয়া সেখানে লইয়া যাইতে পারি বটে, কিন্তু অন্যান্য ব্যবস্থা তো লোকের সাহায্য না পাইলে করা যায় না। কাজেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। এত বড় সর্ব্বনাশ মানুষের অদৃষ্টেও ঘটে!

হঠাৎ বিনয় পাগলের মত চীৎকার করিয়া উঠিল—"হয়েছে ভাই। ব্যবস্থা আমি করছি।" বলিয়াই সে দাঁড়াইল।

পাগলামির খেয়ালে আবার সে কি একটা করিয়া বসে, এ জন্য তাহার হাত ধরিলাম। সে বোধ হয় আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াই বলিল, "ভয় নেই ভাই, আমি পাগল হই নি। আমার স্ত্রীর মৃতদেহ সৎকার হবে না? দেখ তবে। এইখানেই—"

"এই গ্রামের বুকেই—শ্মশান প্রতিষ্ঠা করে, চলো, তোমার সঙ্গে মেয়ে নিয়ে বেরুই।" বলিয়া একটা কুড়ুল লইয়া দুয়ার, জানালা খণ্ড খণ্ড করিয়া সেই মৃতদেহের উপর চাপাইল। তার পর ভয়ঙ্কর একটা চীৎকার করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল।

আমি বলিয়া উঠিলাম, "বেশ করেছ বিনয়, এই ঠিক কাজ।" হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত আমার মনে হইল, একবৎসর পূর্ব্বেকার সেই কথাটা,—যেদিন মাছ ধরিতে আসিয়া ফিরিবার সময় ষ্টেশনে সে সেই বর্গীর ছেলের গল্পটা বলিয়াছিল।

উঃ! সর্ব্বাঙ্গ যেন কাঁটা দিয়া উঠিল। ভাবিলাম, পুনর্জ্জন্ম বলিতে আমরা নাসিকা কুঞ্চিত করি, অভিশাপ জিনিষটা হাসিয়া উড়াই, কিন্তু এ কি ভয়ঙ্কর ঘটনার ভিতর দিয়া নিজেদের শিক্ষা-গর্ব্বিত বিশ্বাসকে আজ অন্ধ-সংস্কারের পায়ে নত করিতে হইল।

ভাবিলাম, সেই বর্গীযুবক কি সত্য-সত্যই এতকাল পরে জন্মান্তরে আসিয়া এই অগ্নিকাণ্ডের সূচনা করাইল? কিন্তু সত্যই যদি তাই হয়, তাহা হইলে সে কে?—বিনয় নিজে?—না, গ্রামের সেই ডাক্তার জমীদার?—না, সেই মিশনরী সাহেব?

পাথেয়

শ্রী পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

বৈশাখের দু'পহর,—দীর্ঘ বিসর্পিত পথ মুমূর্ষুর মত আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে। রৌদ্রের সে কি তেজ! গরুগুলি বোঝাই করা গাড়ী কিছুতেই টানিতে পারে না—চোখের কোণ বহিয়া তা'দের জল ঝরে; কিন্তু মূঢ় পশুর সে মূক বেদনা বুঝিবে কে!—গাড়োয়ান জোর করিয়া পিঠে বাড়ি হাঁকড়ায়।

ছোট একটা ন্যাংটো ছেলে তৃষ্ণার তীব্রতায় পথের ধারের খানিকটা নোঙরা জল তুলিয়া মুখে পুরিয়া দেয়!—বোধ করি সংসারে একা!

চাকুরীর চেষ্টায় গিয়াছিলাম—হয় নাই। শূন্য পকেট আর শূন্য মন লইয়া বাড়ী ফিরিতেছি, পথের উপর এই সব দেখিতে দেখিতে।

এমন আরও কত চলিয়াছি—কত কি চোখে পড়িয়াছে। এমন কিই বা আর!

আরও খানিকটা পার হইয়া আসি। পথের মোড়ে প্রকাণ্ড একটা সরবতের দোকান—খরিদ্দারের ভিড় লাগিয়াছে। যদি একটা গ্লাস নিঃশেষ করিয়া চলিয়া আসা যায়, তা' হইলে সরবৎওয়ালা লোকটা কি বলে? আলাপ নাই, বোধ হয় খুসী হইবে না। তবু একটা নূতন কিছু হয়—চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি!···না, মনের মধ্যে কোথায় যেন বাধে, কোথায় যেন আজও লজ্জা এবং সঙ্কোচ বাসা বাঁধিয়া আছে!

—বাঃ! ডান দিকের ওই দু'তলা বাড়ীটার জানালায় যেন অকাল বরষার ঘনঘটা! কিন্তু মেঘ সত্যিই নয়, একটি মেয়ে! মেঘের মতই কালো চুল—একেবারে শ্রাবণ আকাশের সমারোহ! কিন্তু এই নির্জ্জন স্তব্ধতার মধ্যে পথিকহীন পথের দিকে চাহিয়া থাকা কেন? এ'ত' নিরালা শয্যায় পড়িয়া গত রজনীর সুখস্মৃতি স্মরণ করিবার অবসর,—পুরাণো মিষ্টি কথাগুলি বারবার মনে মনে আবৃত্তি করিবার। বেশীক্ষণ একজায়গায় দাঁড়াইয়া থাকা, আর যাই হ'ক সুরুচির পরিচয় নয়। আবার চলিতে থাকি! কিন্তু সেই কালো কেশ-সমারোহ ও দু'টি স্তব্ধ দৃষ্টি আমাকে পাইয়া বসিয়াছে!

হয়ত ওই মেয়েটির কোন সাধ আজও মিটে নাই, হয়ত তার মাথার সিঁদুরের কোন মানে নাই, অকারণ।

কি জ্বালা! আমিই বা কেন এই সব মাথা-মুণ্ডু ভাবিয়া মরি! হয়ত ওই মেয়েটার কিছুই হয় নাই, দুপুরের অসহ্য গরমের জন্য পিঠ হয়ত ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল—হয়ত চুল শুকায় নাই!

অনেকক্ষণ অন্যমনস্কের মত চলিতে থাকি। নিজের কথাও বুঝি মনে ছিল না! ওদিকের ফুট-পাথের ধারে কাণা একটা ভিখারী লাঠির সাহায্যে পথে নামিয়া এ'পারে আসিবার উদ্যোগ করিতেছে—যদি ছায়া পায়! কিন্তু ছায়া যে এদিকেও নাই, সে কথা এপারে না আসিলে কে তাহাকে বিশ্বাস করাইবে!

হাঁ, হাত ধরিয়া একটু সাহায্য করিলাম। কিন্তু লোকটা বোধ হয় আশীর্ব্বাদ করিল না—কারণ এখনও ছায়া নামিতে ঢের দেরী।

আবার চলিতে সুরু করি।

ফুটপাথের ঠিক নীচেটাতেই খানিকটা জল জমিয়াছিল, গোটা দুই মোষকে গাড়োয়ান সেইখানেই ছাড়িয়া দিয়াছে! জানোয়ার দু'টির দিকে চাহিলে মনে হয়, তা'রা পঙ্ক-পল্বলের সুখ অনুভব করিতেছে। সত্যই ত', এই বা

তাহাদের দেয় কে! গাড়োয়ানটাকে নিশ্চয়ই ইহারা মনে মনে অজস্র ধন্যবাদ দিয়াছে,—অকথিত মূক কৃতজ্ঞতা!

* * *

একটা গীর্জ্জার নীচে তখন একটুখানি ছায়া নামিয়াছে।—বট-ছায়া নয়, কিন্তু স্নেহ-স্পর্শের মত সুশীতল স্নিগ্ধ।

একটা পাঞ্জাবী ছেলে ঠিক গীর্জ্জার নীচেটাতেই একটা দোকান পাতিয়াছে!—ঠিক দোকান নয়, ফুটপাথের উপরই কয়েকটা জিনিষ সাজান! জিনিষই বা এমন কি! গোটাকত রঙীন ঝুনঝুমি খানকয়েক খাতা, কয়েকটা সস্তা পেন্সিল,—এই সব। গীর্জ্জার চূড়ায় ঘড়ি—দুইটা বাজিয়াছে। কিন্তু একটা জিনিষও বোধহয় বিক্রী হয় নাই; ছেলেটা দেয়ালের গায়ে ভর দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! কোথায় পাঞ্জাবের সেই ধূসর তাম্রবর্ণ মাটি, আর কোথায় কলিকাতার এই কোলাহল পঙ্কিল পথ! ছেলেটা বোধ করি মস্ত আশা বুকে বাঁধিয়া বাড়ী ছাড়িয়াছিল—কলিকাতার পথে পথে কেবল হয়ত চক্রাকার রূপার স্বপ্ন দেখিয়াছিল, আর আজ যদি একটা কিছুও কেউ না কিনে, তবে বোধ হয় এমনি ঘুমাইয়াই তা'র সমস্ত দিন কাটিবে। ইচ্ছা হয় ছেলেটাকে ঘুম হইতে তুলিয়া তার দেশের কথা জিজ্ঞাসা করি, একটা জিনিষ কিনিতে পারিলেও ভাল হইত, কিন্তু পকেট যে দুপুরের পথের মতই পয়সার জন্য জিভ বার করিয়া আছে!…না, চোখের জল ফেলিয়া লাভ কি…ঠুন্‌কো ভাব-প্রবণতায় ছেলেটার কোন লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই! উল্টা আমার মূঢ়তা দেখিয়াই কোন হুঁসিয়ার হিসাবী হয়ত ব্যঙ্গ করিয়া যাইবে। পথ দীর্ঘ—দুঃখও দীর্ঘ, বিস্তীর্ণ! কাজ কি!

ছেলেটা গীর্জ্জার সাম্‌নে দোকান পাতিবার সময় নিশ্চয়ই মোটা রকম কিছু উপার্জ্জনের আশা করিয়াছিল…এখন উপাসনার ঘণ্টা কাণে গেলে সে নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে না।

আরও কিছুদূর! তারপর প্রকাণ্ড হাস-পাতালটার সাম্‌নে! ভিতরে মৃত্যুর সঙ্গে মানুষের লড়াই চলিয়াছে—অদৃষ্ট-লিপির সঙ্গে মানুষের সৃষ্টি-বিজ্ঞানের। বাহিরের গেটের ঠিক সামনেটায় একটা বুড়ী প্রত্যহই হাত পাতিয়া বসিয়া থাকে; আজও আছে। কিন্তু আজ আর একলা নয়, আজ আর 'বাবা গো দয়া হোক' বলিয়া চীৎকার করে না। জানে তারই মত আরও একটি বুড়ী আসিয়া বসিয়াছে। পথের জনতার দিকে তার কোন রকমের কৌতূহল নাই—পার্শ্ববর্ত্তিনীকে সখী সম্ভাষণে ব্যস্ত বোধ হয়। বোধ হয় অনেক দিনের হারাণ একটি সখীর সহিত হঠাৎ আজ দেখা—যা' কেউ কোন দিন আশাই করে নাই। বহুকাল আগে হয়ত একই গ্রামে ইহাদের বাস ছিল, প্রতিদিন সকালে উঠিয়া এ উহার গলা জড়াইয়া ধরিত, হাসিত, কাঁদিত, মারামারি করিত…

না, যত রাজ্যের উদ্ভট কল্পনা! বাজে, ভূয়ো! এখনও অনেকখানি পথ বাকি…এইটাই সত্য!

ফুটপাথ ছাড়িয়া কখন রাস্তায় নামিয়াছি, খেয়ালই ছিল না, হুস্ হইল পাশ দিয়া একটা লাণ্ডো ছুটিয়া যাইতে! আর একটু উন্মনা থাকিলেই এতক্ষণ রাস্তায় ভিড় জমিয়া যাইত!… কিন্তু নিজের চোখকেও হঠাৎ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না! কতক্ষণই বা! তাহারই মধ্যে দেখিলাম একটা বার্ণিশ করা কালো, ষাড় ছাঁটা লোকের পাশে বসিয়া মীরা! কিন্তু বহুকালের পরিচয় না হইলে হঠাৎ তাহাকে সেই মীরা বলিয়া চেনা দুঃসাধ্য। নূতন কবির প্রথম প্রেম কবিতার মত সেদিন ও ছিল, ভীরু, কৃশ—অনতি-পরিস্ফুট! আজ সেই মেয়েটিই ওজনে বড় বড় ভারতীয় পালোয়ানদের হারাইয়া দিতে পারে। অথচ, উহারই মুখের দিকে চাহিয়া

একদিন আমারও কবিতা রচনার সাধ গিয়াছিল, 'মানসী' আগা-গোড়া মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছি! আজও দুই-একটি কবিতা হয়ত গোটাই বলিয়া ফেলিতে পারি! মীরাও সে বয়সের আইন মানিয়া চলিতে কোন রকম ত্রুটি করে নাই; কাছে দিবারাত্রি কত কি বলিয়া যাইত! আজ যদি সে কথাগুলি মীরাকে মনে করাইয়া দেওয়া যায়, তবে সে কিছুতেই স্বীকার করিবে না এবং পাশের লোকটা আর যাই করুক, টী-পার্টিতে নিমন্ত্রণ করিবে না!

মীরা আমাকে নিশ্চয়ই দেখে নাই; দেখিলেই বা কি ক্ষতি হইত! ওর মুখের ভাবটা কেমন হয় শুধু তাই দেখিতাম!

—সূর্যাকে ঢাকা দিয়া মেঘের রাশ কখন চুপি চুপি আকাশ জুড়িয়া বসিয়াছে। বৃষ্টি হইবে কি না কে জানে, বাতাস একেবারে উতরোল!...দ্রুত চলিতে হইল,—ভিজিবার ভয়ে নয়, জামা মোট একটা, তাই।

একটা গাড়ী-বারান্দার নীচে। অনেকে জড় হইয়াছে—জল আসে কি না দেখিয়া পা বাড়াইবে। একপাশে জায়গা করিয়া লই।

—চমৎকার! একা ছেঁড়া চাটাইয়ের উপর নেংটী ইঁদুরের মত একটা বাচ্চা ছেলে পড়িয়া আছে—তৈল নিষেকে সর্ব্বাঙ্গ চকচকে! পাশেই একটি মেয়ে; বয়স কত বলা কঠিন, মুখের একটা দিক্ একটু বাঁকা, একটা চোখ একটু ছোট—হাত দু'টিও ঠিক সোজা নয়! পিছনে বসিয়া একটা বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সের লোক মেয়েটার বেণী রচনা করিতে ব্যস্ত। হ্যাঁ, বেণীই বটে! বহরে আট ইঞ্চির বেশী হইবে না! কিন্তু তা'তে কি! ঠিক পাশেই যে এতগুলি লোক জমিয়াছে, সে দিকে পর্য্যন্ত দৃষ্টি দিবার অবসর তা'দের নাই!

সেইখানেই এক পাশে কতকগুলি হাঁড়িকুড়ি এবং কয়েকটা ছেঁড়া কাঁথাও চোখে পড়িল। একটা মৃৎপাত্রে ভাত ভিজিতেছে, কলায়ের ভাঙা একটা ডিসে কতকগুলি লুচির টুকরা এবং শুক্‌নো মিষ্টান্ন; লুচির গায়ে তরকারির দাগ—বোধ করি কোন উৎসব-বাটীর ভুক্তাবশেষ! দেখিয়া বুঝিতে পারি, এইখানেই তাহাদের সংসার, এই তাহাদের ঘর!

মেয়েটা মধ্যে মধ্যে হাত বাড়াইয়া ছেলেটাকে আদর করিবার চেষ্টা করিতেছে—মুখে চোখে গর্ব্ব ও সুখ যেন মাখামাখি। এ দৃশ্য যতখানি সুন্দর হউক, হাসি আসিল ছেলেটার দিকে চাহিয়া। ভাবিলাম, যেদিন এই প্রণয়ী যুগলের অস্তিত্ব আর মাটিতে থাকিবে না, সেদিন এই গোত্র-পরিচয়হীন হতভাগার দিন কি করিয়া কাটিবে কে জানে! হয়ত গাঁঠ কাটিয়া জেলে যাইবে, কিম্বা রিক্সা টানিয়া মুখে রক্ত তুলিবে! যাক্, সে ভবিষ্যতের কথা; আমার তা' লইয়া দুশ্চিন্তা না করিলেও চলে। কিন্তু একটা বড় কথাও বুঝি সেই সঙ্গে শিক্ষা হইয়া গেল। এই প্রকাশ্য পথের উপর, উদার আকাশের তলায় পড়িয়া, অস্ফুট তারকালোকের দিকে চাহিয়া উহারা যখন প্রেম-গুঞ্জন করিয়াছিল, তখন আগামী প্রভাতের কথা ইহাদের মনে ছিল না। হয়ত ভুলিয়া গিয়াছিল পথ উহাদের ঘর, ভিক্ষা উপজীবিকা! অথবা জানিয়াও ...কে জানে!

* * *

—না, এলোমেলো বাতাসই শুধু বহিতেছে, বৃষ্টি এখনও বহুদূর। বাহির হইয়া পড়িলাম। মেসের এক মাসের ভাড়া বাকি পড়িয়াছে, ম্যানেজার অন্ততঃপক্ষে ছাপান্নবার তার জন্য তাগাদা দিয়াছে...আজও দিবে। তা' দিক্, চুপ করিয়া থাকিলেই চলিবে।

মেঘের আড়ালেই সন্ধ্যা হইয়া আসে। রাস্তায় গ্যাস জ্বলিয়াছে! বারটা হইতে সাতটা পর্য্যন্ত পথেই কাটিল; কালও কাটিবে—হয়ত আরও বহুদিন! কিন্তু সে সব দুর্ভাবনার সময় এখন নয়। চুপিচুপি ঘরে ঢুকিয়া এক গ্লাস জল গলায় ঢালিয়া একটা প্রগাঢ় ঘুম দিলেই চলিবে।

কাল সকালের কথা কাল। ইতিমধ্যে ভূমিকম্পে মেসশুদ্ধ আমরা যে চাপা পড়িব না, তাই বা কে বলিল!

গল্প-লেখার সুরু

শ্রী অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ক

ছেলেটি পড়ে···সকাল থেকে রাত অবধি ;— বারোটা, একটা, দুটো।

একতালার ছোট্ট ঘরখানিতে আর কারুর প্রবেশাধিকার নেই। তার ধ্যান-মগ্ন সাধনায় বাধা দিতে আসে না কেউ।... ...

খ

রাস্তার ওপারের বড় বাড়ীখানার দোতালার জান্‌লা দিয়ে মেয়েটি মাঝে মাঝে দেখে আর অবাক্ হ'য়ে মনে মনে বলে—বাবাঃ; কী অসাধারণ খাটতেই পারে ওই ছেলেটা; সেই সকাল থেকে বই মুখে ক'রে বসেছে···পড়ছে তো পড়ছেই !···

গ

এ-বছরের গোড়ায় সহসা সাম্‌নের খালি বাড়ীটার বন্ধ তালা খুলে যায়···ঝাড়-পোঁচ্ সুরু হয়···গাড়ি বোঝাই হ'য়ে জিনিষ-পত্র আসে। বই-এর স্তূপ নিয়ে ছেলেটি নীচেকার ঘরখানি অধিকার ক'রে বসে। তাদের পরিচয়ের খবর পথ পেরিয়ে বড় বাড়ীর আদরের কন্যা তরুণী মেয়েটির কাছে পৌঁছয় না।

ঘ

গ্রীষ্মাবকাশে। দীর্ঘ বিশ্রাম !

প্রত্যূষে উঠে শিথিল খোঁপাটাকে জড়িয়ে নিতে নিতে মেয়েটি জানলায় এসে দাঁড়ায়; দেখে,— ছেলেটি এরই মধ্যে কখন পড়া আরম্ভ ক'রে দিয়েছে ! মাথার একরাশ কোঁকড়া চুল অবিন্যস্ত হ'য়ে ছড়িয়ে পড়েছে···বিচিত্র ছবি আঁকা, রেখা-টানা মোটা বইখানার ওপর তার চোখ দু'টী নিবদ্ধ···জগতের আর কোন খবরই যেন জান্‌বার আবশ্যক বোধ করে না ও !!···

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটির রাগ ধরে যায় !

ঙ

দুপুর বেলাটা আর কাট্‌তে চায় না—

ইতিহাসের চিরন্তন কাহিনীগুলোর প্রতি একটা বিতৃষ্ণা আসে; উপন্যাসখানা বিস্বাদ···

মেয়েটি পড়া ছেড়ে জানলার ধারে উঠে আসে।

মোটা পাতার ওপর ছেলেটি তখন একটি জটিল সমস্যার মধ্যে মগ্ন···সহসা খড়খড়ির খট্‌-খট্ শব্দ শুনে মুখ তুলে চায়; দেখে,—সাম্‌নে বাড়ীর ওপরের জান্‌লায় একখানি অনিন্দ্য-সুন্দর মুখের কৌতূহল-পূর্ণ-দৃষ্টি বুঝি তারই প্রতি নিবদ্ধ···!

মুহূর্ত্তমাত্র·····তারপরেই ছেলেটি চোখ নামিয়ে নেয়···

এই নিয়ে দু'দিন দেখা !

আশ্চর্য্য হ'য়ে ছেলেটি ভাবে,—কে এই চমৎকার তন্বী মেয়েটি !···

সেদিন তার সমস্যাটা অসমাধিতই হয়ে যায়।

দুপুরবেলা ছেলেটি যখন স্নানাহারের জন্য বাড়ীর ভিতর যায়, মেয়েটির লুব্ধ-দৃষ্টি তখন চোরের মতো ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষ তন্নতন্ন করে দেখে—

চারিদিকে নানান বস্তু ছড়ানো...খাতা, পেন্সিল, সাপ্তাহিক, কলম, ছুরি, মাসিক, কত কী ! টেবিলের ও-ধারে একটা বড় অ্যালাম্ ঘড়ি; ভোর চারটায় তারই বাজনায় প্রত্যহই মেয়েটির ঘুম ভেঙে যায়।

ছুটি হ'লে স্কুল খোলে।

বাস্ আস্‌বার অনেক আগেই মেয়েটি তৈরী হয়ে দাঁড়ায়,—কখনো বা ওপরের জানলায়, কখনো বা নীচের সদর দরজায়।

প্রত্যহ এই সময়টুকু ছেলেটির পড়ার ব্যাঘাত ঘটে; মন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে অকারণে!

কিন্তু এই ব্যাঘাত আর এই চঞ্চলতাটুকুর জন্য ছেলেটির মন প্রতিটি সকালে উন্মুখ হ'য়ে ওঠে,—নিজেরই অজ্ঞাতে।

আজকাল নিত্য দেখা-শোনা···মুগ্ধ চোখের নীরব বাণী বিনিময়!

ছ

সেদিন শনিবার।

শব্দ সাড়া ক'রে মেয়েটি দরজায় এসে দাঁড়ায়···

তাকে দেখে ছেলেটির টানা চোখ দু'টী অকস্মাৎ নিস্পলক হয়ে যায়···

মেয়েটি আজ আর স্কুলে যাবার পোষাকে নয়; পরণে তার একখানি চমৎকার মাদ্রাজী সাড়ী···মুক্ত-বেণী পিঠের ওপর লুটিয়ে পড়েছে··· জোড়া-ভুরুর মাঝখানে সিঁদুরের ছোট্ট টিপখানি আজ বড় সুন্দর ক'রেই মানিয়েছে... পায়ে টকটকে লাল ভেলভেটের নতুন নাগরা!

এ যেন তার বিশ্ব-বিজয়ের অভিসার বেশ!

ছেলেটির মুগ্ধ দু'টী চোখে মৌন প্রশংসা ফুটে ওঠে···মেয়েটি মনে মনে বিজয় গর্ব্ব অনুভব করে!

সহসা তার কম্পিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়... মেয়েটি কা'কে যেন বলছে—আজ আমাদের স্কুলে প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশান কিনা তাই··· হ্যাঁ।

বাস্ আসে। আজ আর তা'তে অন্যদিনের মতো ঠাসা থাকে না; আজকের আয়োজন অল্প ক'জন কৃতী ছাত্রীর জন্যই।

সেদিন সারা-বৈকালটায় ছেলেটি একবারো পড়ায় মন বসাতে পারে না;—বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

সন্ধ্যা হ'য়ে গেলে পর সহসা পরিচিত মোটরের 'হর্ন্' শুনে ছেলেটি ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়।

মেয়েটি গাড়ি থেকে নামে; হাতে একরাশ বই। এবার আর ফিরে তাকায় না; বিজয়িনীর মতো গর্ব্বিত পদক্ষেপে সোজা বাড়ীর ভিতর চলে যায়।

ছেলেটির মুগ্ধ দৃষ্টি ব্যথায় ম্লান হ'য়ে আসে।

জ

ম্যাট্রিক পরীক্ষা এগিয়ে এসেছে।

সারা-বছরের না-পড়া পাঠ ত্বরস্ত করে নিতে মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সেই জন্যই বোধ করি ছেলেটি আজকাল তার নিয়মিত দেখা পায় না।

ঝ

কয়েকদিন পর।

সেদিন সকালবেলাতেই মেয়েটি সাজগোজ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

বোটানিক্যাল গার্ডেন্-এ আজ তাদের মস্ত বন-ভোজন...এখুনি বাস্ এসে পড়্‌বে!...

আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা আর একবার ঠিক করে নিতে গিয়ে মেয়েটি দেখ্‌লে,—একজন চশ্‌মা-পরা ছেলে এ'সে সামনে বাড়ীর ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেল।...

মেয়েটির চোখের সমস্ত দীপ্তিটুকু সহসা স্তিমিত হ'য়ে গেল; তার সাজগোজ করবার উৎসাহ সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে গেল...চুলে ক্লিপ্ আঁটবার নতুন ক্যাসানটা, যা' সে অনেক কষ্টে লীনার কাছ থেকে আদায় করেছিল, সেটা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়্‌ল।

যা রাগ হচ্ছিল তার, ওই চশ্‌মা-পরা উড়ুন-চণ্ডে ছেলেটার ওপর!

এর

মেয়েরা তখন এক-একটি ছোট্ট দল পাকিয়ে বাগানের চারধারে ছড়িয়ে পড়েছে…বিচিত্র পোষাকে তাদের ফুলের বাগানে একঝাঁক প্রজাপতির মতো দেখাচ্ছে

লীনা আর বীনার সঙ্গে মেয়েটি অদূরে বেড়াচ্ছিল; উঁচু ক্লাসের সেরা মেয়ে তারা, সবাই-কার সঙ্গে মেশে না।

লীনা বল্লে–এই মিলি, চল, ওই যে দু'জন ছেলে বসে বসে কি করছে, দেখে আসি।

বীনা বল্লে—দূর, ওরা মনে করবে, ওদের দেখ্‌বার জন্যই বুঝি আমরা ওখানে গেছি।

লীনা বল্লে—ওরা কি মনে করবে তাই মনে কর্‌তেই তুই মরে গেলি; করুক, চল, মিলি।

মেয়েটিকে দু'বার বল্‌তে হ'ল না; আকর্ষণটা তার তখন ওদের চেয়ে অনেক বেশী।

কাছাকাছি গিয়ে তার সন্দেহ ঘুচে গেল; সামনে বাড়ীর ছেলেটিই বটে; সঙ্গে রয়েছে, সেই চশ্‌মা-পরা ছেলেটা।

লীনা বল্লে—আচ্ছা, ওদের দু'জনের মধ্যে কে বেশী attractive বল্‌ত,—যার চোখে চশ্‌মা, না যার খালি চোখ?

বীনা বল্লে—চশ্‌মা-পরা ছেলেটির মধ্যে বেশ একটা activity রয়েছে; কিন্তু পাশের জন যেন একটু গোমড়া মুখো; দেখ্‌ছিস না, কি রকম মুখ বুজে বসে রয়েছে।

লীনা বল্লে—পাঁউরুটি কাটবে, না কথা কইবে! ওর মধ্যে বেশ একটা ভাবুকতা রয়েছে, ও বোধ হয় কবি।

বীনা মেয়েটিকে ধাক্কা দিয়ে বল্লে—এই, তুই কিছু বল?

মেয়েটি পতিয়ে গিয়ে মুখখানা লাল ক'রে, কি বল্লে বোঝাই গেল না।

চশ্‌মা-পরা ছেলেটি তখন বল্‌ছে—ওরে, বিপদ্ সমুহ; একবার দেখ চেয়ে…

ছেলেটি বন্ধুর কথায় মাথা তুলে সাম্‌নের দিকে তাকিয়েই তৎক্ষণাৎ মুখ নামিয়ে তার কাজ করে যেতে লাগ্‌ল…তার ডাগর চোখের অপার বিস্ময় সঙ্গীর কাছে ধরা পড়ল না।

সহসা চশ্‌মা-পরা ছেলেটি চেঁচিয়ে উঠল—আহা, হা, করলি কী…পাঁউরুটি কাটতে গিয়ে আঙুলটাই…এই নে রুমাল দিয়ে বাঁধ। তারপর নীচু স্বরে বল্লে—যার জন্যে আঙুল কাটলো, তাকে তো চিনি নে ভাই; হাত ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিতে কা'কে ডাকবো, বলে দে।

হাতটা বাঁধতে বাঁধ্‌তে ছেলেটি সত্রাস নয়নে বল্লে—চুপ, ষ্টুপিড! শুনতে পাবে যে ওরা।

মেয়েদের দলটি ধীরে ধীরে ওপারের দিকে চলে গেল।

ট

ষ্টীমার-ঘাটের কাছে দু'খানা বেঞ্চি অধিকার ক'রে বসে মেয়েদের ভিতর তখন পড়াশুনার আলোচনা চল্‌ছিল। সকলেই নিজেদের পড়ার সময়ের অল্পতা প্রমাণ করতে ব্যস্ত। কেউ যে বেশী পড়ে এ কথা প্রাণ গেলেও কেউ স্বীকার করতে চায় না।

একজন বল্লে—বাস্তবিক, যারা চব্বিশ ঘণ্টা বই মুখে ক'রে বসে থাকে, তারা হয় ভণ্ডামী করে, নয় কিছু বুঝ্‌তে পারে না; মুখস্থ করতে করতে হায়রাণ হয়ে মরে।

ছেলে দু'টী তখন সেখান দিয়ে চলেছে।

হঠাৎ মেয়েটি বেশ একটু উঁচু-গলায় বলে ওঠে—যা বলেছিস; আমারও তাই মনে হয়। আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে একটি ছেলে থাকে; চব্বিশ-ঘণ্টা কী

পড়াটাই পড়ে ভাই! বাব্বাঃ! দেখা যাবে, পরীক্ষায় কি রকম রেজাল্ট্ করে।

কথার শেষ দিক্‌টায় বুঝি খানিকটা তাচ্ছিল্য প্রকাশ পায়! চশ্‌মা-পরা ছেলেটি সঙ্গীর হাতে টান দিয়ে বলে—ইউ বুব! অমন ক'রে দাঁড়িয়ে পড়্‌লি কেন?

ছেলেটি সচকিত হ'য়ে চলতে আরম্ভ ক'রে দেয়। পিছন থেকে একটা হাসির কিঙ্কিনি ভেসে আসে।

ঠ

সে রাত্রে ছেলেটার ঘরের আলো নেবে না। সারা-রাতই তার ক্ষীণ একটা রেশ মেয়েটির শয়ন-কক্ষের দেওয়ালে এসে লেগে থাকে। পরের রাত্রে। রোজই।

সেয়ানো পাঠক তার নিদ্রার অল্প অবসর-টুকুকেও সাধনার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে।

মেয়েটির সমস্ত আকর্ষণ সহস্র চেষ্টাতেও আজ-কাল বারবার প্রতিহত হ'য়ে ফিরে আসে।

ড

ম্যাট্রিক পরীক্ষার খবর আগে বেরুলো।

মেয়েটির অপ্রত্যাশিত মন্দ ফল দেখে হেড্ মিস্‌ট্রেস তার খাতা পুনর্ব্বার পরীক্ষা করালেন। কিছুতেই কিছু হ'ল না। তৃতীয় বিভাগেই রয়ে গেল। মেয়েটির বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। হেড মিস্‌ট্রেস তো দু'দিন কারুর সঙ্গে ভাল ক'রে বাক্যালাপই কর্‌লেন না,—তিনি স্থির নিশ্চয় করেছিলেন—তাঁর স্কুল থেকেই এবার ম্যাট্রিকে প্রথম হবে…।

মেয়েটি কিন্তু নিজে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার; সে জান্‌তো,—পরীক্ষা সে ভাল দেয় নি…।

সামনে বাড়ির ছেলেটি একখানি গেজেট্ হাতে ক'রে বাড়ী এল। মেয়েটি লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে জান্‌লা থেকে সরে গেল—ছি, ছি, ছি! হয় তো ও তার নাম জেনেছে; বিশ্রী রেজাল্ট্ দেখে কি মনে কর্‌বে…।

নিজের অকৃতকার্য্যের লজ্জা এই প্রথম তাকে সত্যিকারের পীড়া দিলে। তারপর যখন ছেলেটি গেজেট-খানি না খুলেই সযত্নে বই-এর নীচে রেখে দিলে, তখন মেয়েটি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লো।

ঢ

দিনকয়েক পরের কথা।

সেদিন ছেলেটির পাশের খবর বেরিয়েছে; তার প্রশান্ত মুখখানা আজ যেন আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। বন্ধু-বান্ধব, সতীর্থ, সহপাঠী আজ সবাই এসে তাকে তার কৃতত্বের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে যাচ্ছে। ক্লাসে তারা তাকে গ্রাহ্যই করত না; কিন্তু অগ্নি-পরীক্ষায় তাদের সকলের ওপর 'টেক্কা' দিয়ে তার নামটাই যখন সবার ওপরে দেখা গেল, তখন সবাই তার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিলে।

ছেলেটির জয়ের আনন্দ-কলরব শুনে সহসা মেয়েটির চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়্‌ল; কেন, তা' সে স্পষ্ট ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌লে না।

জানলার ধারে বসে চোখ মুছে মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌ল—ভারী তো ফার্ষ্ট হয়েছেন, তার আবার এতো চাল কিসের! আর আমি বলে-ছিলুম বলেই তো অত ক'রে ও পড়্‌লে! আমার জন্যেই তো ওর আঙুল কেটে গিয়েছিল; আমার জন্যেই তো ও ফার্ষ্ট হল…

সহসা মেয়েটির বিষাদ ক্লিষ্ট অন্তরের গাঢ় অন্ধকারের বুকে কি এক অজানা আলোর তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল; তার এই আকস্মিক আনন্দের কোন কারণই সে আবিষ্কার করতে পার্‌লে না। নিজের পরাজয়ের ভগ্ন-স্তূপের ওপর কখন যে তার বিজয়-স্তম্ভ রচিত হয়ে গেছে, তা' সে জান্‌তে পার্‌লে না।

* * *

আজও কথাটা উঠ্‌লেই মেয়েটি তার মাথা দুলিয়ে বলে ওঠে—হাঁ গো মশাই! আমি না থাক্‌লে ফার্ষ্ট হ'তে পার্‌তে—বৈকি! বল্‌লেই হ'ল। এখন তো ইন্‌স্পিরেশানটা তুচ্ছ বল্‌বেই। পুরুষ জাতটাই ওই রকম অকৃতজ্ঞ।

মুখের হাসি দিয়ে কথাটা অমান্য কর্‌তে চাইলেও ছেলেটি মনে মনে ওর কথাটা বরাবরই মানে।



স্নানের পথে



সম্পাদক—শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ষষ্ঠ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ } অষ্টম সংখ্যা

নিয়তি

স্বামী বাসুদেবানন্দ

এক

সে আজ অনেকদিন হয়ে গ্যাছে, উজ্জয়িনীর নিকটবর্ত্তী গ্রামে পূর্ণকলস নামে এক কুম্ভকার বাস করত। তখন পৃথিবী ছিল ধনধান্যে পূর্ণ, বিবাদ-বিসম্বাদ বড় একটা দেখা যেত না, রাজার চাইতে লোকে ভয় করত ধর্ম্মকে। ইহকালটা ত আর সব নয়, তাই পরকালের ভাবনা ছিল। সেজন্য গৃহে ছিল শান্তি স্বচ্ছলতা। পাল পার্ব্বণ উৎসবের মধ্য দিয়েই দিনটা বেশ কেটে যেত। ইহকালের সিদ্ধি নিয়ে এত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংঘর্ষ, এত যান্ত্রিকতা ছিল না বলে জাঁতা, তাঁত, চাক্, ঢেঁকি দিয়েই সব কাজ সফল হ'ত। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল পরকালের, তাই অজস্র শিল্পী, সাহিত্যিক, চিত্রী ভাস্কর, তক্ষণ, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, জ্যোতিষীর প্রাদুর্ভাব হয়েছিল—সকল কর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য ছিল অরূপকে কিরূপে রূপায়তনে বিস্তার করা যায়, অসীমকে সীমার ফাঁদে ফেলে কিরূপে তাকে পোষ মানান যায়।

পূর্ণকলস কুম্ভকারের রাজা। তার নির্ম্মিত পাত্র ছাড়া রাজবাড়ীর উৎসব চলে না, পূজারম্ভের বিলম্ব ঘটে। রাজকন্যারা তারই পাত্রে শীপ্রা জল পূর্ণ করে মীনকেতনের ঘটস্থাপনা করলে, তবে মদনোৎসব সুসম্পন্ন হয়। এমনি কারিগর সে। কিন্তু পুত্র রসপূর্ণ ও বিদ্যায় একেবারে অজ্ঞ। তাই পিতার মনে এত স্বচ্ছলতার মধ্যেও সুখ নেই, স্ত্রী মালবীর নিকট কেবল অভিযোগ করেন। মাতা রসপূর্ণকে কত বোঝান, তাড়না করেন, ক্রন্দন করেন—কি করে স্বামীর মর্য্যাদা-রক্ষা পুত্র করবে ভেবেই পান না।

মাতা যত অভিযোগ করেন, পুত্র ততই কর্ম্মশালা থেকে দূরে অবস্থান করে—রাগখাণ্ডব ভক্ষণ করে মত্ত হয়ে রাস্তায় রাস্তায় বয়স্য মেঘদত্তের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, কখন বা সখী স্বপ্নবাসবীর সহিত মায়া-মন্দিরে ক্রীড়া করে। ক্রমে মাতা আবেদন অভিযোগে ক্ষান্ত হলেন, পিতাও কিছু বলেন না, মাঝে মাঝে করুণ দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে, কর্ম্মশালার কর্ম্মস্রোতে অবগাহন করেন।

কিন্তু হঠাৎ একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা গেল। পিতা মাতার অভিযোগ যত নীরব হয়ে আসতে লাগল, রসপূর্ণেরও গৃহের প্রতি আসক্তি ও তৃপ্তি তত বাড়তে লাগল। পিতা কথা বলেন না, আহার কালে রসপূর্ণ কি একটা উদ্বেগ-পূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কি যেন বলতে চায়, কিন্তু সাহস হয় না। মাতার চক্ষুতে উপেক্ষা, বাসবীর পিতা রূপদেবও বাণিজ্যোপলক্ষে কুসুমপুর গমন করেছেন, মেঘ দত্তের পিতাও খুব তাড়না করেছেন। রসপূর্ণ উঠে একবার মায়াদেবীর মন্দিরে গেল, প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করে ক্লান্ত হয়ে হাতের ওপর ভর দিয়ে বসে ক্রীড়া-কন্দুকটি ধীরে ধীরে মাটিতে আঘাত করতে করতে দেবীর দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে একবার মেঘ দত্তের প্রাকার তোরণযুক্ত, সুধাধবল, উশীর পরিমলযুক্ত, ধূপধূপিত লতা-মাল্য-শোভিত, বিতান ধ্বজ-পতাকাশোভী, মণি-স্বর্ণখচিত, প্রাসাদ গাত্রের অবকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ফের বাড়ি ফিরে এলো।

মালবী তখন গঠনের মৃত্তিকা প্রস্তুতে নিবিষ্ট। রসপূর্ণ ডাকল, "মা।" মাতা পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তায় গভীর নিমগ্ন, তাই নিরুত্তর রইলেন। আবার কোকিল-কুজিত ধ্বনি উঠল, "মা।" মালবী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, দেখলেন পুত্র ছলছলনেত্রে দণ্ডায়মান। তাঁকে চোখ ফেরাতে দেখেই রসপূর্ণ তাঁর গলা জড়িয়ে সেখানে উপবেশন করল।

"মা আমি শিখব।"

"এতদিন শেখ নি কেন?"

"আমার ও ঘট-সরা গড়তে ভাল লাগে না।"

"কি ইচ্ছা করে?"

"প্রতিমা।"

"তোমার পিতা তাতেও ত দক্ষ।"

"তিনি বলেন, আগে ঘট-সরা গড়তে হবে। ও জড় নিয়ে আমি থাকতে পারি না। তাই পালিয়ে বেড়াই। মা, তুমি আমায় মূর্ত্তি গড়া শিখিয়ে দাও, নইলে আমি বাঁচব না।"

"সে কি-রে?—"

এমন সময় পূর্ণকলস সেখানে উপস্থিত হলেন। মালবী বল্লেন, "রসপূর্ণ প্রতিমা গড়তে চায়, ও ঘট সরা গড়তে পারবে না।" পূর্ণকলস মৃদু হেসে চুপ করে রইলেন, দেখলেন পুত্রের সেই উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টি।

"বাবা, তুমি প্রতিমা গড়, কিন্তু তাকে জীবন্ত করতে পার?"

পুত্রের কথা শুনে পূর্ণকলস গম্ভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কর্ম্মশালায় নিমজ্জিত হলেন।

দুই

কয়েকদিন যাবৎ রসপূর্ণ লোকচক্ষের বহির্ভূত। কেউ তাকে আর দেখতে পায় না। অর্গলরুদ্ধ শয়ন-কক্ষে কার ধ্যানে নিবিষ্ট থাকে। অন্ধকার-লোকে কার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় কেউ তা জানে না। একদিন মালবী প্রভাতে রসপূর্ণের শয়ন-কক্ষ পরিষ্কার করতে করতে দেখতে পেলেন একটি থেঁদা-বোঁচা পুত্তলিকা। সেটি হাতে নিয়ে খানিক পরীক্ষা করে হেসে উঠলেন এবং জানলা দিয়ে রাজপথে নিক্ষেপ করলেন। এমনি দিনের পর দিন রাস্তায় বালক বালিকারা খেলা করতে এসে পুতুল কুড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

একদিন রাজা প্রচ্ছন্নবেশে নগর পরিক্রমা করতে করতে পূর্ণকলসের বাড়ীর ধারে এসে দাঁড়ালেন। সহসা পথে পতিত একটি

ভগ্ন পুত্তলিকা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনি সেটিকে মুহূর্ত্তের মধ্যে হাতে নিয়ে পর্যাবেক্ষণ করতে লাগলেন। তাঁর চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ওষ্ঠে ক্ষীণ হাসির রেখাও দেখা দিল, সহসা তিনি বলে উঠলেন,"এমন কারিগর আমার রাজধানীতে আছে?—কই পূর্ণকলস একদিনও ত এমন মূর্ত্তি আমার জন্ম আহরণ করে নি?"

রাজা ডাকলেন, "পূর্ণকলস!" পূর্ণকলস গৃহমধ্যে গঠন কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। আদেশ-ব্যঞ্জক গম্ভীর স্বর শ্রবণে ব্যস্ত-সমস্ত ও কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে গৃহ-প্রাঙ্গণে এসে দেখেন, রাজা দণ্ডায়মান। কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার ও ভীতি-গদ্‌গদ কণ্ঠে বললেন, "মহারাজ, আদেশ করুন, কি নিমিত্ত আমার গৃহ পবিত্র করলেন?"

"এ মূর্ত্তির নির্ম্মাতা কে? তুমি ত এমন কোনও মূর্ত্তি আমার জন্ম এতদিন আহরণ কর নি?"

"মহারাজ! ওটি আমার অপদার্থ পুত্রের কীর্ত্তি। সে আমার আচার্য্যত্ব অস্বীকার করেই কারিগর হতে চায়।" এই বলে পূর্ণকলস একটু সশ্রদ্ধ হাস্য রাজ-সন্নিধানে নিবেদন করলেন।

রাজা বললেন, "চল না, তোমার পুত্রকে একবার দেখে আসি।" রসপূর্ণ তখন অশ্বশালে কর্দ্দম-সংস্কে ব্যস্ত। হঠাৎ তার কি চিন্তার ব্যথা মনে জেগে উঠেছে। দক্ষিণ হস্তের চম্পক কলিগুলি মৃত্তিকার মধ্যে প্রবিষ্ট—মুক্তাকাশের দিগন্তপ্রসারী মহিমায় তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। রাজা প্রবেশ করেই মৃদুকণ্ঠে বললেন, "পূর্ণকলস! নীরবে থাক, কথা বলো না।" রাজা দেখলেন, সমাধিস্থ বালকের আকর্ণবিসারী চক্ষুপ্রান্ত হতে হিম মুক্তা ঝরে পড়ছে। রাজা ও পূর্ণকলস নিস্তব্ধে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। যাবার সময়ে রাজা বললেন, "পূর্ণকলস, কাল থেকে তুমি উপযাচক হয়েই বালককে মূর্ত্তির অবয়ব-সম্বন্ধ ও পরিমাণ বিষয়ে উপদেশ দেবে।"

"কিন্তু মহারাজ! সে যে আমায় দেখলেই সংকুচিত হয়ে পড়ে—মূকের ন্যায় নিরুত্তর হয়ে থাকে। কেবল মাঝে মাঝে তার মাতার নিকট নির্ম্মিতগুলি সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করে। তার মাতাও তাকে বলেছিলেন, 'পিতার নিকট অবয়ব-সম্বন্ধ শিক্ষা কর, পরিমাণ জ্ঞান না হ'লে ভাব সম্পূর্ণ হয় না।' সে তাতে উত্তর করে, 'ও ত সকলেই করে থাকে। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে অবহেলিত মৃত্তিকার মধ্যে আমার জীবনের সন্ধান পাওয়া।' মহারাজ! আমরা বালকের হৃদয়-কথা যে কী—তা বুঝি না।"

রাজা গম্ভীরভাবে কি ভাবতে লাগলেন, পরে বললেন, "বালকের চিত্ত-কলস ভাব রসে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, কিন্তু তার আস্বাদ বেদনময়। অবয়ব-সংস্থান জ্ঞান না হওয়ায় তার ভাব আধার-বিহীন। তাই ভাবে ও রূপে মিলন হচ্ছে না। ভাব রসিকদের কেউ আদেশ করতে পারে না, যদি তারা নিজে বশ্যতা স্বীকার না করে। বালকের মাতাই যেন কাল থেকে নিয়মিতভাবে অবয়ব-পরিমাণ সম্বন্ধে উপদেশ দেন। বালকের উপযুক্ত আচার্য্যকে আমি অনুসন্ধান করব। দেশের ভবিষ্যৎ আমাদের পরিপূর্ণ করাই ত রাজার কর্ত্তব্য।"

তিন

প্রভাতে মালবীর বক্ষে ভর দিয়ে রসপূর্ণ গুচ্ছ থেকে একটি একটি করে আঙুর ছিঁড়ে গলাধঃকরণে ব্যস্ত এবং মাঝে মাঝে দক্ষিণ পদ দোলায়িত করে মাটিতে আঘাত করছে। মাতা জিজ্ঞাসা করলেন, "বৎস! বল দেখি ঐ আলেখ্য কার?"

"তথাগতের নিকট গোপা ও রাহুল কৃপা ভিক্ষা করছেন।"

"কি করে বুঝলে কৃপা ভিক্ষা করছেন?"

"ভিক্ষার দীনতা ঐ চোখের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেচে।"

"কিন্তু চক্ষু ও দীনতা ত এক জিনিষ নয় ?"

"চক্ষু আধার, দীনতা ভাব ; ভাব অদৃশ্য, তাই আধার তাকে রূপ দেয়।"

"যদি আধার নষ্ট হয় ?"

"ভাব অদৃশ্য হবে।"

"যদি আধার বিকৃত হয় ?"

"ভাব বিকৃত হবে।"

"আধার নিখুঁত হলে ?"

"ভাব নিখুঁত হবে।"

"বৎস! তোমার মূর্ত্তিগুলির হৃদয় ও আনন যেমন নিখুঁত, অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তেমন নিখুঁত হয় না কেন ?"

"মা! আমার ঈপ্সিত পূর্ণরূপ স্বপ্নে আমি দেখেছি, কিন্তু সে কোথায় হারিয়ে গেল! তাকে পাবার জন্য কত বিনিদ্র যামিনী হৃদয় ও চিত্তের ধ্যানে মগ্ন রয়েছি। আমাকে উপেক্ষা করে সে চলে গ্যাছে, তাই উপেক্ষিত মৃত্তিকার মধ্য হতেই তাকে জীবন্ত করে তুলতে চাই। হৃদয় ও চিত্তই ত জীবকে জীবন্ত করে, প্রাণ ত আরও কত গভীরে। আর্য্যে, আমি অন্যান্য অবয়বের বিষয় কখনও ভাবি না, তাই বোধ হয় নিখুঁতও হয় না।"

"কিন্তু বৎস! অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠবতা রক্ষা করতে হলে পরিমাণ ও সম্বন্ধ জ্ঞান হওয়া বিশেষ প্রয়োজন; তা ছাড়া, প্রকৃতি পাঠ না করলে দেহ সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হয় না। প্রকৃতির রূপসম্ভার দিয়ে দেহকে সাজ্জিত করতে হয়। বল দেখি বৎস, ঐ ছবিখানি কার ?"

"ক্রোধে রক্তচক্ষু শ্রীকৃষ্ণ বাহুতে সুদর্শন ধারণ করে ভীষ্মকে বধ করতে যাচ্চেন।"

"কোথা থেকে এর সৌন্দর্য্য সংগ্রহ করা হয়েচে ?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"সূর্য্য ও পদ্ম থেকে। ক্রোধ চক্ষু সূর্য্যের খরকরসম্পাতে, দেহ নীলে, বাহু মৃণালে সুদর্শন ফুটে উঠেচে। প্রকৃতির অপূর্ব্ব রূপসম্ভার দেহে মিশিত করলে ভাব আরও দিব্য ও উজ্জ্বল হয়ে মহিমান্বিত হয়।"

এমন সময় পূর্ণকলস সেখানে উপস্থিত হলেন। মালবীকে সম্বোধন করে বল্লেন, "অন্তরালে দাঁড়িয়ে তোমার শিক্ষাদান কৌশল অবগত হচ্ছিলুম। বৎস, কাল রাজা আমাদের গৃহে শুভাগমন করেছিলেন। তোমার অজ্ঞাতে তোমার গঠন তন্ময়তা দেখে, প্রসন্ন হয়ে আমাকে উপদেশ দিতে বলে গ্যাছেন এবং শীঘ্রই তোমার উপযুক্ত আচার্য্য তিনি প্রেরণ করবেন।"

বালকের বক্ষে ও আননে পদ্মরাগ লজ্জা মিশ্রণে দেখা দিল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে মাতার বক্ষে নিজ মুখকমল নিমজ্জিত করে অবস্থান করতে লাগল।

চার

একদিন রসপূর্ণ নির্ম্মাণে নিবিষ্ট, বিষয়টি অবগুণ্ঠনবতী এক তন্বী। এমন সময় ভাস্করদেব নিঃশব্দ পাদচারে তার কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে বালকের নিপুণ চাতুর্য্য লক্ষ্য করতে লাগলেন। ইনিই ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর প্রধান। এঁর মূর্ত্তির কারুতা অপূর্ব্ব। যেখনে তাঁর মর্ম্মর মূর্ত্তিগুলি লোকে জীবন্ত বলে ভ্রম করত। অতুল ভাব সৌন্দর্য্য ও দৈহিক গঠনের পরিমিত পরিমাণ একত্রিত হয়ে প্রতিমাগুলি এক অপূর্ব্ব চারুতার সৃষ্টি করত। এখন তিনি অতি বৃদ্ধ, হস্ত কম্পিত হয়, তাই গঠন তিনি খুব কমই করেন, কিন্তু মূর্ত্তি সকল বড়ই ভাবময়—মনোবৃত্তিগুলি তাদের চক্ষে দীপ্ত হ'য়ে দর্শকের হৃদয় মুগ্ধ করে—মূর্ত্তি-চক্ষে আনন্দ, শোক, ক্রোধ, প্রীতি, স্নেহ, কুটিলতা রূপ নিয়ে বিকশিত হয়।

ভাস্করদেব ডাকলেন, "রসপূর্ণ!" রসপূর্ণ নিরুত্তর। কাষ্ঠিকার রেখা তার তখনও সম্পূর্ণ

হয় নি। মলয়ের সুখস্পর্শে তার চূর্ণকুন্তল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ভাস্করদেব তাঁর রুমকদেশীয় শাল উত্তরীয়রূপে জড়িত করে শ্যামক দেশীয় বেত্র যষ্টির মুষ্টিকায় আঘাতের দ্বারা রসপূর্ণকে প্রবুদ্ধ করে উচ্চকণ্ঠে বললেন, "রসপূর্ণ, তোমার শিক্ষক কে?"

বালক সচকিত হরিণচক্ষু নিবদ্ধ মাত্র দেখতে পেলে সুউচ্চ ভ্রূযুগলের শুভ্র কেশগুচ্ছের নিম্ন হতে প্রখরদৃষ্টিসম্পন্ন এক বৃদ্ধ দণ্ডায়মান।

বালক, তোমার শিক্ষক কে?" বালক প্রীতিপূর্বক কৃতাঞ্জলি হয়ে বল্লে, "মহাশয়, আপনি কে?—আমার শিক্ষক আমার পিতা পূর্ণকলস।"

"আমি তোমার পিতার বন্ধু। কিন্তু তোমার মূর্তিগুলি ত পূর্ণকলসের প্রণালীর অনুপাতি নয়?" বালকের বক্ষে ও গণ্ডে রক্তরাগ উপলে উঠল। এবং সংশয়িত চক্ষে বৃদ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করে, কম্পিত-কণ্ঠে বললে, "আর্য! আপনি সত্য কথাই বলেছেন। পিতা আমায় শিক্ষা দেন বটে, কিন্তু আমি রাজপ্রাসাদের কলাভবন থেকে ভাব সংগ্রহ করে, ভাস্করদেবেরই অনুসরণ করি।" ইতিমধ্যে বালক বস্ত্রাচ্ছাদিত ক'রে মূর্তিটি স্থানান্তরে রেখে এল।"

ভাস্করদেব কক্ষগাত্রে সজ্জিত একটি মূর্তি হাতে নিয়ে বললেন, "বৎস! এটি কি বিষয়?"

পুণ্য।"

"কর্তন মন্দ হয় নি—চক্ষে ও ভ্রূলতায় বক্রভাব—নাসিকা ও ওষ্ঠে গর্ব—" বলতে বলতে তিনি মূর্তিটিকে কখন দূরে, কখনও নিকটে, কখন পূর্ণ আলোকে, কখনও অল্পালোকে চালিত করতে লাগলেন। পরে সহসা হাস্য করে বলে উঠলেন, "যদি আমার শিষ্য হ'তে চাও, এরূপ বিষয় জ্ঞান হ'লে চলবে না। বিষয়টি যদি 'না রক্ত' বলতে তা হলে আমি খুসী হতুম।" এই বলে হস্তস্থিত বেত্রের দ্বারা মূর্তিটি ভেঙে দূরে নিক্ষেপ করলেন। যুবক উত্তেজিত হ'য়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হ'ল, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে নীরবে নিরীক্ষণ করে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কি স্বয়ং ভাস্করদেব, 'তিনি ছাড়া' এরূপ ভাব-জ্ঞান উজ্জয়িনীতে আর কারও ত নেই।"

"হাঁ, রাজাদেশে আমি তোমায় শিক্ষা দিতে এসেছি। তোমার মূর্তিগুলিকে এক এক করে আমার হাতে সমর্পণ কর। যদি একটিও আমার মনঃপূত হয়, তা হ'লে আমি তোমায় শিক্ষা দেব।"

আশা-কিরণে বালকের মুখের পাপড়ী দু'টি প্রফুল্ল হয়ে উঠল। সে তৎক্ষণাৎ আর একটি মূর্তি সংগ্রহ করে তাঁর সামনে ধরলে।

"বিষয়?"

"প্রেম"

"বৎস! প্রেম বলতে তুমি কি বোঝ? সে কি স্বদেশের প্রতি অথবা বিশ্বমানবের প্রতি অথবা বিশ্বাত্মা ভগবানের প্রতি?" বলতে বলতে তিনি পূর্ববৎ মূর্তিটি পর্যাবেক্ষণ করতে লাগলেন।"

"দেব! এ সেরূপ নয়—এ নারীর নরের প্রতি বা নরের নারীর প্রতি।"

"মূর্খ তুমি! ওকে প্রেম বলে না,—সৃষ্টি কামনা থেকে উত্থিত 'মোহ।' এই 'মোহ' নাম দিলে আমি খুসী হতুম।" এই বলে বৃদ্ধ সেটিও চূর্ণ করে ফেল্লেন।

এমনি করে বালকের কল্পনাজাত সমস্ত আদর্শ বৃদ্ধের নির্দয় যষ্টির আঘাতে চূর্ণ হতে লাগল। শেষে বালক বক্ষের ওপর যুক্তবাহু হয়ে অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইল। বৃদ্ধ মৃদু হাস্য করতে করতে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বৎস! সবই কী শেষ হয়ে গেল।" যুবক নির্বাক, নিস্পন্দ! শুধু উষ্ণধারে তার গণ্ডস্থল প্লাবিত হচ্ছে।

"বৎস! তুমি এখনও ত তোমার সব শেষ

কর নি? আচার্য্যের নিকট গোপন করা উচিত নয়।"

"দেব! একটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। কিন্তু সেটি নষ্ট হলে আমার প্রাণও নষ্ট হবে।"

"শীঘ্র আনয়ন কর।" বালক সভয়ে যে প্রতিমাটি তখন নির্ম্মাণে নিবিষ্ট ছিল, ধীরে ধীরে তার নিকটে গিয়ে বস্ত্র উন্মোচন করলে। মূর্ত্তিটি নারী, গঠন স্বাভাবিক, সুন্দর ও সমপরিমিত—অতি স্থূল নয়, অতি ক্ষীণ নয়, বাহু সুডোল, পাণি ও পদতল খুব ছোট নয়—বদন অপূর্ব্ব, চক্ষুর অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত অবগুণ্ঠিত—তরঙ্গায়িত কৃষ্ণ-প্রবাহে পৃষ্ঠদেশ ভাসমান, বক্ষ সমুন্নত, গম্ভীর মধ্য কিন্তু সীমা মাধুরী অতিক্রম করে নি, বুদ্ধিহীনের ন্যায় ললাট নিম্ন নয়—অর্দ্ধাবরিত চক্ষুর ভিতর আশা ও সংশয়,—নাসিকা, কর্ণ, চিবুক স্পষ্ট—ওষ্ঠে মোহ। ভাস্করদেব পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পরীক্ষা করে বললেন, 'এ মূর্ত্তিটি তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৎস, এ মূর্ত্তিটি কি 'প্রবঞ্চনা?'—এখানে জীবনের এক ভীষণ ক্রূর ছায়াপাত দেখতে পাচ্ছি। যেন জলদেবী, পদতলে হতভাগ্য নাবিককে নিমজ্জিত দেখে হাস্য করছেন। সত্যই এ মূর্ত্তিটি 'শঠতা'র জীবন্ত বিগ্রহ।"

"না, না, না গুরু! এটি আমার মায়া-মন্দিরের স্বপ্নবাসবী!"

"মূর্খ সরল! একবার পুণ্যকে নারিকার ছাঁচে ঢেলেছ। আবার মাতৃকার অবগুণ্ঠন নিয়ে ওষ্ঠাধরে মোহকে রূপ দিলে। প্রতিমা সম্পূর্ণ হ'ল, কিন্তু তোমার আখ্যা জ্ঞান হ'ল না। এ যে 'শঠতা'—প্রবঞ্চনা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে!"

বালক কি ভাবল। পরে ধীরে ধীরে উঠে মূর্ত্তির পাদপীঠে লিখল—

"নিয়তি!"



মায়ের দান

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

এক

অনেকদিনের পর সরোজের পত্রখানা পাইয়া মায়ের আনন্দসাগর উথলাইয়া উঠিতেছিল। তিনি নিজে পড়িতে জানেন না, তাই পোষ্টম্যান পত্র দিবামাত্র উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "একবার দেখ না বাবা, পত্রখানা কোথা থেকে আসছে ?"

সে কভারের উপরের ছাপ দেখিয়া বলিল - "কোলকাতা হতে আসছে গো।"

দীর্ঘকাল পরে সরোজ পত্র দিয়াছে। আজ প্রায় দুইমাস তাহার পত্র নাই, মায়ের দিন যে কি ভাবে কাটিয়াছে তাহা শুধু তিনিই জানেন।

আর জানে একটী মেয়ে, সে কল্যাণী।

মেয়েটীর বয়স বছর সতের হইবে, বালবিধবা। সেই জননী তারার পত্রাদি লিখিয়া দেয়, পড়িয়াও দেয়, সংসারের হিসাব-পত্র লেখে, অসুখ-বিসুখ হইলে দেখা-শোনা করে।

তারা পত্রখানা পড়াইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু এ সময়ে কল্যাণীকে ডাকিবার সাহসও তাঁহার হইল না। ভ্রাতৃবধূর শাসনে কল্যাণীর কেবলমাত্র দুপুর ছাড়া অবসর ছিল না, সেই সময়ের জন্য তাঁহাকে অপেক্ষা করিতেই হইবে।

সেদিন তারার আহারাদির কথা মনেও রহিল না ; পত্রখানি বুকে লইয়া তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

দুপুরে আহারাদির পর কল্যাণী বাড়ীতে পদার্পণ করিবামাত্র তিনি সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে মা, তুই এসেছিস। সরোজের একখানা চিঠি এসেছে, কাকে দিয়ে যে পড়াই তার ঠিক নেই, তোর আশায় বসে আছি, কখন তুই আসবি। তোকে ডাকতেও তো সাহস হয় নি, --যে তোর বউদি, আমার ওপরকার রাগটা তোর পরেই ঝেড়ে দেবে।"

কল্যাণী বিষণ্ণভাবে হাসিয়া বলিল, "সে গুণ বউদি'র খুব আছে। কই দেখি পত্রখানা - পড়ে দেই।"

তারা তাহার হাতে পত্রখানা দিলেন।

কভারের উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল, "অনেকদিন পর সরোজ দা' পত্র দিয়েছে দেখছি। সত্যি কাকিমা, মানুষ কোলকাতায় গিয়ে যেন কি রকম হয়ে যায়—আর তাদের বাড়ীর কারও কথা মনে থাকে না। এই সরোজ দা', একদণ্ড তোমার কাছ ছাড়া হতো না, মা বলতে যে অজ্ঞান—সে আজ কতকাল তোমার কাছ ছাড়া হয়ে রয়েছে বল দেখি ? বাড়ী আসবার নাম তো নেই ই, তা ছাড়া পত্রও কতকাল দেয় নি। তুমি তো অথচ কি হপ্তায় একখানা করে চিঠি দিয়ে আসছ।"

মা ক্ষীণ হাসিলেন, "তার কি সময় আছে মা ? আমাদের আর কি বল ? সারা দিনরাত ছুটি, সেই জন্যে কেবল তার কথাই মনে পড়ে ; তার কাজ কত ? সেদিন সুবল ঠাকুরপো বলছিল—সে নিজের কলেজ তো করছেই, তা ছাড়া চার-পাঁচটা টিউশানীও করছে। পড়ার খরচ তো চাই, বিধবা দুঃখিনী মা তার পড়ার খরচ তো যোগাতে পারে না, নিজের খরচ তাকে নিজেই যোগাড় করে নিতে হয়।"

একটু রাগ করিয়া কল্যাণী বলিল, "তা হোক, তবু এই যে ক'টা বছর গেছে, এর মধ্যে একটীবার ছাড়া আর সে এখানে আসবার সময় পেলে না ? এই যে সুবল ঠাকুরদা' কোলকাতার

যাচ্ছে আর আসছে ; এতো দু'মাস ন'মাসের পথ নয় কাকিমা, যে আসতে পারবে না।"

নিদারুণ বেদনায় মায়ের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি সে ভাব সামলাইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "ওই যে কতকগুলো টিউশানি নিয়েছে, শুনেছ—তার একটা দিন—এমন কি একটা বেলা পর্য্যন্ত কামাই করবার যো নাই।"

"তা তুমি যাই বল না কাকিমা, আমি তোমার কোন কথা শুনব না। ছেলের নামে পাছে দোষ পড়ে, তাই সকল মায়েই ছেলের গুণ ব্যাখ্যা করতে চায়।"

বলিতে বলিতে কল্যাণী কভার হইতে পত্রখানা বাহির করিল।

"আজ তো দেখছি খাও নি,—রান্নাও হয় নি ?"

কুণ্ঠিত হইয়া তারা বলিলেন, "রাঁধব এখন, একলা মানুষ—অত তাড়াতাড়ি করবারই বা দরকার কি ? তুই আগে পত্রখানা পড়ে দে, তারপর কথা হবে এখন।"

কল্যাণী পত্র পড়িতে লাগিল।

পত্রে বেশী কথা ছিল না, সামান্য দু' চারকথা লেখা ছিল। সরোজ লিখিয়াছে—

"অনেকদিন তোমায় পত্র দেই নি, দেওয়ার ইচ্ছাও ছিল না, এখনও ইচ্ছা নেই। কেন—তার কারণ তুমিই জানো, আর কেউ জানে না, এমন কি আমিও তা ভাল করে আজও জানি নে, কেবল উড়ো কথায় বিশ্বাস করেছি।

"বিশ্বাস করতে চাই নি—কিন্তু আমায় বাধ্য হতে হয়েছে। আমার মনের অবস্থা বড় খারাপ। একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি—আমায় বাঁচিয়ে রেখেছিলে কেন, কেন আমায় মেরে ফেল নি। এখন মনে ভাবছি—এ খবর শোনার আগে আমার মরণই যে ভাল ছিল, এ জন্ম তা হ'লে কাউকে দেখাতে হতো না।

"আমি শুনতে চাই—সত্য ব্যাপার কি ? যতদিন না জানতে পারব, ততদিন আমি তোমার কেউ নই। নিজের পক্ষে যেদিন প্রমাণ দেখাতে পারবে, সেদিন আবার তোমায় 'মা' বলে ডাকব তার আগে নয়।—

হতভাগ্য সরোজ"

কল্যাণী বিস্মিতভাবে মুখ তুলিলে দেখিতে পাইল,—তারার মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, আড়ষ্টভাবে তিনি বসিয়া আছেন, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়,—সে দেহে যেন জীবন নাই।

কল্যাণী পত্রখানা কভারের মধ্যে পুরিয়া তাঁহার পার্শ্বে রাখিয়া উঠিল।

চমকিয়া উঠিয়া তারা তাহার পানে চাহিলেন, বিকৃতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাচ্ছিস কল্যাণী ?"

কল্যাণী বলিল, "হ্যাঁ, বউদি' জানতে পারলে বকবে, লুকিয়ে চলে এসেছি। বিকেলে ঘাটে যাওয়ার সময় আর একবার আসব এখন।"

সে চলিয়া গেল।

পুত্রের পত্রখানা খুলিয়া কালো কালো অক্ষরগুলার উপর দৃষ্টি ফেলিয়া দুর্ভাগিনী মাতা আড়ষ্টভাবে বসিয়া রহিলেন।

দুই

দিন চলিয়া যাইতেছিল।

সরোজের পত্রের মধ্যে এমন কোন কথা প্রচ্ছন্ন ছিল, যাহা কেবল তারাই জানিতেন ; কল্যাণী একটু সন্দেহ করিলেও কথাটা জানিতে পারে নাই।

সেই দিন হইতে তারার জীবনীশক্তি দিন দিন যেন কমিয়া আসিতেছিল, তাঁহার দেহও দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছিল।

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হয়েছে কাকিমা, সরোজ-দা'র পত্র পাওয়ার দিন থেকে যেন তোমার চেহারা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, অসুখ হচ্ছে কি ?"

শুষ্ক হাসিয়া তারা বলিলেন, "না, অসুখ করে নি তো।"

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল,"সরোজ-দা'কে আর তো পত্র দিলে না কাকিমা ?"

তারা বলিলেন, "এখন থাক, দিনকতক পরে দেব।"

ইহারই পরে একদিন তিনি হঠাৎ প্রস্তাব করিলেন, "আমায় কোন রকমে প্রথম ভাগ আর দ্বিতীয় ভাগখানা পড়িয়ে দিতে পারবি কল্যাণী ?"

কল্যাণী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এখন তুমি লেখাপড়া শিখবে কাকিমা ?"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তারা বলিলেন, "তাতে তো লজ্জা নেই মা। আজ যদি তুই কোথাও চলে যাস তখন কোথায়—কার কাছে পত্র লেখাতে পড়াতে যাব বল দেখি ? তাই ভাবছি, যদি অন্ততঃপক্ষে কোন রকমে এই দু'খানা বই পড়ে ফেলতে পারি, হাতের লেখাট শিখতে পারি, তা হ'লে পত্র এলে পড়ানোর জন্যে বা লেখাবার জন্য কারও কাছে ছুটে যেতে হবে না।"

কল্যাণী সহজেই রাজি হইল ; মহোৎসাহে তারা কল্যাণীর নিকট পড়া ও লেখা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

এই প্রৌঢ়া নারীর স্মৃতিশক্তি দেখিয়া কল্যাণী আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তিনি অতি শীঘ্রই বই দুঃখানি শেষ করিয়া ফেলিলেন এবং লিখিতেও শিখিয়া গেলেন।

এই শিক্ষার মূলে জননীর প্রাণের ঐকান্তিক কামনা ছিল, সেই জন্যই ২ই মাসের মধ্যে তারা আশ্চর্য্য রকমের সফলতা লাভ করিলেন।

নিজের হাতে তিনি পুত্রকে পত্র দিলেন—তুমি একবার এখানে এস, আমার যাহা কিছু কথা তাহা শুনিতে পাইবে।

সরোজ কোনও উত্তর দিল না। ইহার পরও তারা কয়েকখানি পত্র দিলেন, পত্রাশায় পথের পানে চাহিয়া রহিলেন, সরোজের পত্র আসিল না।

সেদিন কল্যাণী আসিয়া বিস্মিত হইয়া দেখিল, তারা দু'-একখানা কাপড় গুছাইয়া লইতেছেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছ কাকিমা ?"

তারা উত্তর করিলেন, "একবার কোলকাতায় যাচ্ছি মা। ভূপেন মুখুর্য্যের বাড়ীর সবাই কালীঘাটে যাবে, ওরা কোলকাতায় থাকবে, মনে ভাবছি, ওদের সঙ্গে যাই—গঙ্গাস্নান, কালীঘাট দর্শনও হবে, আর সরোজের সঙ্গে দেখাটাও হবে।"

দরজায় কুলুপ লাগাইয়া চাবিটা কল্যাণীর হাতে দিয়া সজল-নেত্রে তারা বলিলেন,"চাবি তোর কাছেই থাকল মা, যদি ফিরে আসি, তা হ'লে নেব—আর যদি না ফিরি, মাস দুই তিন অপেক্ষা করে সরোজের যে ঠিকানা তোর কাছে আছে, সেই ঠিকানায় পত্র দিস, যেন সে এসে আমার যা কিছু আছে নিয়ে যায়।"

কল্যাণী চাবিটা লইয়া অঞ্চলে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, "আজ ঘাটে শুনে এলুম কাকিমা—সরোজ-দা'র নাকি বিয়ে—"

জননী অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন, চমকিয়া ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার ?"

কল্যাণী উত্তর দিল, "সরোজ-দা'র।"

রুদ্ধশ্বাসে তারা বলিলেন, "কোথায় বিয়ে—কার কাছে শুনলি ?"

কল্যাণী বলিল, "প্রমথ মামা কোলকাতা হ'তে আজ এসেছে. সে বললে, সরোজ-দা' যে বাড়ীতে পড়াত, তাদেরই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে।"

ধীরে ধীরে তারা বসিয়া পড়িলেন।

তিন

সরোজ কলিকাতায় সংসার পাতিয়া বসিয়াছে।

সংসারের কর্ত্রী পিসীমা। ইনি এতকাল সুদূরে বর্ম্মায় পুত্রের নিকট বাস করিতেন। সরোজ এতদিনের মধ্যে মায়ের মুখে একদিনও শুনিতে পায় নাই, তাহার পিসীমা বা আর কোনও আত্মীয়-কুটুম্ব আছে। গ্রামের হরি কাকাকে সে এখানে একদিন মাত্র পূর্ব্বে দেখিয়াছিল, হঠাৎ একদিন তাঁহারই সহিত পিসীমা বিমলাদেবী তাহার মেসের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ইহার পর সরোজ মেসের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া পিসীমার বাসা পটলডাঙ্গায় চলিয়া গেল এবং সেখানেই রহিল।

ইনি যে সত্যই তাহার পিসীমা সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না। পিসীমা ভ্রাতুষ্পুত্রকে কোলে টানিয়া লইয়া স্বর্গগত ভ্রাতার নাম করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

বিস্ময়ে কতক্ষণ সরোজ নির্ব্বাক ছিল, তাহার পর ক্রমে ক্রমে পিসীমার নিকট হইতে সে অনেক কথাই শুনিতে পাইল।

পাষাণের মত বসিয়া বসিয়া সরোজ সমস্ত কথা শুনিল। যখন সব কথা শেষ হইয়া গেল তখন সে একটা দীর্ঘনিশ্বাসও ফেলিতে পারিল না। অতি বড় ঘৃণায় তাহার সারা অবয়ব কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

পিসীমা বলিলেন, "যা হবার তা ত হয়েই গিয়েছে বাবা, এখন বিয়ে করে দেশে চল, রাজার ছেলে তুই, তোকে আবার রাজ-সিংহাসনে বসিয়ে তবে আমাদের ছুটি! কর্ম্মদোষেই না পাঁচভূতে লুটে খাচ্ছে সব।"

সরোজ বারুদের মত ফাটিয়া উঠিয়া বলিল, "না, না, আমি কোনমতে সেখানে যাব না! তুমি আর কোন দিনও অনুরোধ করো না পিসীমা।" বলিয়াই কিন্তু সহসা বালকের মত কাঁদিয়া উঠিল।

চার

সে যখন কিছুতেই দেশে যাইতে চাহিল না, তখন বিমলাদেবী নিরস্ত হইয়া তাহার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা সরোজের বিবাহ দিয়া স্বামী-স্ত্রীকে একেবারে দেশে লইয়া যাইবেন।

দেশ হইতে আত্মীয়-আত্মীয়াগণ সকলেই এই সুযোগে কলিকাতায় আগমন করিলেন। বিবাহের পাত্রী ঠিক হইয়া গিয়াছিল, দিনও ঠিক হইয়া গেল।

যাহার বিবাহ তাহার মনে কিন্তু সুখ নাই, শান্তি নাই। সরোজের মনে হইতেছিল, একমাত্র মাকে হারাইয়া সে জগতে যাহা কিছু সকলই হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার আর কিছু নাই।

মায়ের হস্তলিখিত কয়েকখানি পত্র তাহার সম্বল; শেষ পত্রে মা জানাইয়াছিলেন, তিনি হয় তো শীঘ্রই কলিকাতায় আসিবেন, সরোজ কি তখনও একবার পাঁচমিনিটের জন্য তাঁহার সহিত দেখা করিবে না? তিনি অনেক কথাই তাহাকে বলিয়া যাইতে চান, সরোজের ভয় নেই, তিনি তাহার নিকটে থাকিবেন না, একবার দেখা করিয়া বহুদূরে চলিয়া যাইবেন।

দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া সরোজ সবেগে মাথা নাড়িল,—কখনও না, সে কিছুতেই দেখা করিবে না! মায়ের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই, কোনও সম্পর্ক নাই।

কথাটা জোর করিয়া সে মনকে মানাইতে চায়, কিন্তু মন মানে কই? অশিষ্ট অবাধ্য মনে যে ছবিটী জাগিয়া উঠে—সেটী যে তাহার দীন দুঃখিনী মায়ের মূর্ত্তি। মা তাহাকে নিজের হাতে না খাওয়াইয়া দিলে তাহার খাওয়া হইত না, মায়ের বুকের উপর মুখখানা না রাখিলে তাহার ঘুম হইত না। তাহার একটু মাথা ধরিলে মা অস্থির হইয়া পড়িতেন, একবার তাহার সামান্য একটু জ্বর হইয়াছিল, মা কতরাত্রি বিনিদ্র তাহার

শিয়রে বসিয়া কাটাইয়া দিয়াছেন। সে কোথাও না বলিয়া গেলে মায়ের আহার নিদ্রা থাকিত না, তিনি পথে পথে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেন। সে যে এই কিছুদিন আগেও গর্ব্ব অনুভব করিয়াছে,—যদিও তাহার কিছু নাই, তবু তাহার মা আছে।

সেই মায়ের স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলা কি সহজ ?

অবাধ্য মন এক একবার মায়ের কাছে ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছিল। কাজ নাই তাহার প্রতিষ্ঠা বা প্রশংসার অর্থে জমিদারীতে কাজ নাই, সুন্দরী শিক্ষিতা স্ত্রীতে কাজ নাই, সে মায়ের ছেলে হইয়া মায়ের নিকটে থাকিবে। জন্ম-দুঃখিনী মা, দেড়বৎসরের পুত্র লইয়া মাত্র ষোড়শ বৎসরেই বিধবা হইয়াছিলেন, হয় তো—

উঃ! মা তো জানিতেনই কোনদিন না কোন-দিন তাঁহার সন্তানের কাণে এ কথা যাইবেই, তবে কেন তিনি তাহাকে এই অপরিসীম যন্ত্রণা দিবার জন্য বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, কেন তাহাকে বাল্যে মারিয়া ফেলেন নাই ?

রুদ্ধকণ্ঠে সে আপনিই বলিয়া উঠিল, "এ কি করলে মা! আমার এতটুকু যায়গা রাখলে না, যেখানে আমি নিজেকে পাঁচমিনিটের জন্যে অকলঙ্কিতভাবে রাখতে পারি ?"

পাঁচ

বিবাহের পূর্ব্বদিন। বাড়ীটি লোকজনে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সরোজ নিজ বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করিবার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইতেছিল, সেই সময় একটী ছেলে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নামই কি সরোজবাবু ?"

বিস্মিত হইয়া সরোজ বলিল, "হ্যাঁ;—কেন ?"

ছেলেটী বলিল, "একটী মেয়ে আপনার কাছে আমায় একখানা চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই নিন পত্র।"

সে পত্রখানা সরোজের হাতে দিল।

পত্র খুলিয়া হস্তাক্ষরের পানে চাহিয়াই সরোজের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল কল্যাণী পত্র দিয়াছে। সে লিখিয়াছে—"সরোজ দা', কাকিমার অবস্থা বড় খারাপ, আপনাকে একবার দেখতে চাচ্ছেন খুব দরকার—শীগগির এই ছেলেটীর সঙ্গে চলে আসুন।"

খানিক স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে মুখ তুলিল, জিজ্ঞাসা করিল, "এঁরা কোথায় আছেন ?"

ছেলেটী বলিল, "কাছেই, সুকিয়া ষ্ট্রীট।"

"চল—" বলিয়া সরোজ অগ্রসর হইল।

খানিকদূর চলিয়া পার্শ্বস্থ একখানি বাড়ী দেখাইয়া ছেলেটী বলিল, "এই বাড়ীতে যান, তাঁরা এইখানেই আছেন।"

দরজার পার্শ্বেই কল্যাণী সাগ্রহে পথের পানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সরোজ প্রবেশ করিতে সে তাহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইল।

সুদীর্ঘ তিন বৎসর পরে সরোজ কল্যাণীকে দেখিল। কল্যাণী তখন ছিল চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা দুষ্টের একশেষ, এখন সে সপ্তদশবর্ষীয়া তরুণী, দেখিলেই মনে হয় সে এখন শান্ত সংযত হইয়াছে, গৃহিণীপণা শিখিয়াছে।

শান্তকণ্ঠেই সে বলিল, "ঘরে চল সরোজ-দা', কেবল তোমায় দেখবার জন্যেই এখনও কাকিমা বেঁচে আছেন। আজ তিনদিন এখানে এসেছি, তোমার খোঁজ কোথাও পাই নে। যে মেসে থাকতে, সেখানে পরেশকে কতবার পাঠিয়েছি, আজ একটী বাবু তোমার পিসীমার বাড়ী তাকে দেখিয়ে দিয়েছেন, তবে আজ তোমায় দেখা পেয়েছি।"

সরোজ খানিক নির্ব্বাক থাকিয়া জিজ্ঞাসা

করিল, "তুমি এখানে কার সঙ্গে এসেছ কল্যাণী, তোমার দাদা, বউ দি'—"

কল্যাণী বাধা দিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "তাঁরা আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন, ওঁদের বাড়ীতে আর আমায় থাকতে দেবেন না।"

সরোজ বিস্মিত হইয়া বলিল, "অপরাধ?"

কল্যাণী বলিল, "অপরাধ—আমি কাকিমার কাছে যাই-আসি, তাঁর অসুখের সময় দেখা-শোনা করেছি। দেশের লোক দাদাকে সমাজ-চ্যুত করতে চেয়েছিলেন, দাদা দাঁতে কুটো নিয়ে ক্ষমা চেয়ে সমাজে উঠেছেন, আমি দাঁতে কুটো করি নি—কাকিমাকে দেখতে যাওয়াও বন্ধ করি নি এরই জন্যে আমায় তাঁরা বাড়ীর বার করে দিতে দ্বিধাবোধ করলেন না।"

সরোজের রক্ত গরম হইয়া উঠিল, সুগৌর মুখখানা লাল হইয়া গেল, সে বলিল, "ও বুঝেছি। তা হ'লে তোমার আর কোথাও আশ্রয় নেই?"

"না, আর কোথাও আশ্রয় নেই সরোজ-দা'—"

বলিতে বলিতে সে মুখ ফিরাইল; তখনই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, "সে সব কথা পরে হবে এখন, এখন ঘরে এসো, মাকে আগে দেখ।"

ঘরের ভিতর হইতে ক্ষীণস্বরে কে ডাকিল—"কল্যাণী—"

কল্যাণী ত্রস্তপদে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল, "এই যে কাকিমা, সরোজ-দা' এসেছে।"

এই কি মা? দেহ একেবারে বিছানার সহিত মিলাইয়া গিয়াছে, উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ কালি হইয়া গিয়াছে চোখ দুইটী বসিয়া গিয়াছে। সরোজ দরজার উপর দাঁড়াইয়া বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া রহিল।

ক্ষীণকণ্ঠে মা ডাকিলেন, "সরোজ—"

"মা—"

সন্তান আর দূরে থাকিতে পারিল না, শিথিল পদে সরোজ অগ্রসর হইল, মায়ের বিছানার পাশে বসিয়া পড়িয়া দুইহাতে তাঁহার শীর্ণ দেহখানি জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বুকে মুখ রাখিয়া সরোজ ক্ষুদ্র বালকের মতই কাঁদিয়া ফেলিল। মায়ের কোটর-প্রবিষ্ট চক্ষু দুটিও শুষ্ক রহিল না, ধীরে ধীরে দু'টী ফোঁটা জল চোখের কোণ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ছয়

"সরোজ—"

সরোজ মুখ তুলিল, চক্ষু মুছিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কেন মা?"

মাতা শীর্ণ হাতখানা পুত্রের মুখে মাথায় দিতে দিতে বলিলেন, "তুই যে মা বলে ডাকবি নে সরোজ, উঃ কি আঘাতই পেয়েছি বুকে বাবা! আমি যে এ ব্যথা সামলাতে পারছি নে সরোজ!"

সরোজ নীরবে শুধু মায়ের বুকে মুখখানি রাখিয়া পড়িয়া রহিল।

"ওঠ সরোজ,—আমি তোকে সব কথা না বলে মরতে পারব না, কেবল তোর অপেক্ষায় আমি মরতে পারছি নে। আমার সব কথা শোন, তারপর যদি তোর ইচ্ছে হয়, আমায় ক্ষমা করিস, না হয় করিস নে।"

একটু থামিয়া তিনি বলিলেন, "আমি শুনলুম, তুই তোর পিসীমার কাছে রয়েছিস, তোর পিসীমা তোর হারাণো বিষয় তোকে দেবে। কিন্তু দলিল পত্র সব যে আমার কাছে সরোজ, সে দলিল-পত্র না পেলে কেউ যে বিশ্বাস করবে না তুই সরোজ, তুই এখনকার জমীদার। কল্যাণী, সেই কাগজ-পত্রগুলো তোর কাছে রয়েছে মা, সেগুলো সরোজকে দে।"

আজ্ঞামাত্র কল্যাণী কতগুলি কাগজ-পত্র আনিয়া সরোজের সম্মুখে রাখিল।

বিকৃতকণ্ঠে মা বলিলেন, "এই কাগজ পত্র দেখালে কেউ আর তোকে বাধা দিতে পারবে

না। কেবল তোর দিকে তাকিয়ে—ও রে হতভাগা ছেলে কেবল তোর জন্তেই আমি চোর অপবাদ পর্য্যন্ত নিয়েছিলুম, এই সব দলীল চুরি করে পালিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম, তোর বয়েস যখন তেইশ-চব্বিশ হবে, তখন তোকে সব বুঝিয়ে —আমার সব কথা বলে চুপি চুপি বিদায় নেব। কিন্তু আমার কাছে তুই তো কিছুই শুনলি নে, পরের কাছে শুনে আমাকেই একমাত্র অপরাধিণী স্থির করে নিলি ?"

পুত্রের হাতখানা নিজের বুকের উপর খানিক-ক্ষণ চাপিয়া রাখিয়া তাহার পর আস্তে আস্তে বলিলেন, "আজ ছেলের কাছে মা হয়ে নিজের পাপ-কাহিনী স্বীকার করতেই হবে—নইলে আর উপায় নেই। তোকে দেড় বছরেরটী কোলে নিয়ে যখন আমি বিধবা হই, তখন আমি মাত্র পনের ছাড়িয়ে ষোলতে পড়েছি। ষোল বছর বয়েসে কারও বুদ্ধিই পরিপক্ক হয় না। তোর পিসেমশাই—"

চকিতকণ্ঠে সরোজ বলিল, "পিসেমশাই—!"

দৃঢ়কণ্ঠে তারা বলিলেন, "হ্যাঁ উনিই। তোমার পিসীমারও যে তাতে স্বার্থ ছিল না, তা' ত নয়। ভাই থাকতে তিনি ওখানকার কিছুতেই হাত দিয়ে পান নি, ভাই মারা যেতে ছেলে-মেয়ে-স্বামীসহ তিনি গিয়ে জমকিয়ে বসলেন। দলিল-পত্র সব আমার হাতে ছিল, কোনক্রমে এগুলি যদি হাত করতে পারতেন, আজ ঘটনা অন্যরকম দাঁড়াত সরোজ, তোর জন্তে কারও এত মাথা ব্যথা পড়ত না। তোর পিসেমশাই আমার জ্ঞানহীনা কিশোরী পেয়ে আমার ইহ-পরকাল—"

অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি খানিক ছটফট করিতে লাগিলেন, তাহার পর ধীরকণ্ঠে বলিলেন—কিন্তু "দলিল-পত্র নিতে না পেয়ে তখন ওরা স্বামী স্ত্রীতে চারিদিকে আমার কুৎসা রাষ্ট্র করে দিলেন, আমার লোকসমাজে মুখ দেখানোর পথ বন্ধ হল ; এদিকে বাড়ীর মধ্যে আমার পরে যে নির্য্যাতন চলল, তা আমিই জানি। বুড়ো চাকর জগবন্ধু এই রকম সব ব্যাপার দেখে আমার ছেলে নিয়ে পালানোর উপদেশ দিলে। তখন কেবল তোর জন্তেই আমার ভয় হ'ল সরোজ, ভাবলুম, ওরা যদি কোন রকমে তোকে পৃথিবী হ'তে সরাতে পারে, এই বিশাল সম্পত্তি দখল করার বাধা দিতে আর কেউ থাকবে না।

"এই রকম সময়ে একদিন গভীর রাত্রে নিজের গহনা আর দলিল-পত্র নিয়ে তোকে বুকে ধরে জগবন্ধুর সঙ্গে সে বাড়ী ছাড়লুম। আমার আশ্রয় আর কোথাও নেই, মায়ের এক মামা তখনও বর্ত্তমান, আমি তাঁরই কাছে গেলুম।

"নিশ্চিন্ত হয়ে তোকে নিয়ে সেখানে বাস করতে লাগলুম। ওরা কেউ আমার সন্ধান পাই নি, তারপর বিফল মনোরথ হয়ে ওরা রেঙ্গুণে চলে যায়।"

তারা একটু দম লাইলেন, তাহার পর রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আমি অস্বীকার করব না, সত্যিই আমি পাপ করেছিলুম, কিন্তু আজীবন কাল ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত তো করেছি। তুই একবার বল সরোজ, তার প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও হয় নি ?"

তাঁহার দুই চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

দুই হাতে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া সরোজ আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল—"ভুলের স্বপ্ন ভেঙে গেছে, আমায় ক্ষমা কর মা !"

তাহার চোখের জল ও মায়ের চোখের জল একত্রে মিলিয়া গেল। দীর্ঘকাল পরে মাতা পুত্রের মিলন দেখিয়া কল্যাণীর চক্ষুও শুষ্ক ছিল না।

অনেকক্ষণ পরে নিজেকে কতকটা সামলাইয়া লইয়া মা বলিলেন, "আমি আর বাঁচব না সরোজ, আমার দিন শেষ হয়ে গেছে, আমার শেষ ইচ্ছাও পূর্ণ হয়েছে—আর আমি বাঁচতেও চাই নে। তোর জিনিস তোকে ফিরিয়ে দিলুম, নিশ্চিন্ত হয়ে

মরব। কল্যাণীর কাছে আমার খাশুড়ীর দেওয়া এক ছড়া হার আর একটী সোণা বাঁধান লোহা আছে এঁদের বংশানুক্রমে এই হার আর লোহা পুত্রবধূকে দেওয়া হয়, আমিও এই হার লোহা তোর বউকে দেওয়ার জন্যে রেখে দিয়েছি। আমি চলে যাব, বউয়ের মুখ দেখতে পাব না। সে হার লোহা তোর মায়ের পবিত্র আশীর্বাদের মত তুই-ই তাকে পরিয়ে দিস। আর এক কথ—"

অতিরিক্ত কথা বলিয়া তিনি হাঁপাইতেছিলেন। দুই হাতে দুর্বল বুকটাকে চাপিয়া ধরিলেন, যেন তখনই প্রাণটা বাহির হইতে চায়—তিনি আরও কিছুক্ষণ তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে চান।

কল্যাণী তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "থাক কাকিমা, আর কথা বলবেন না, একটু জিরিয়ে নিন।"

"জিরান" তাহার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, "একেবারেই জিরানর সময় আসছে মা, আর সময় নেই, এই বেলা যা বলবার কথা আছে, বলে যাই, তোর একটা ব্যবস্থা করে যাই, নইলে তুই দাঁড়াবি কোথায় মা?"

পুত্রের পানে তাকাইয়া ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কল্যাণীর ভার তোর উপর দিয়ে যাচ্ছি সরোজ, ওকে দেখিস। আমার কলঙ্কের কথা গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে যাওয়ায় সকলেই আমায় ত্যাগ করেছে, ত্যাগ করে নি শুধু কল্যাণী, সেই জন্যে ওর দাদা ওকে বাড়ী হতে বার করে দিয়েছে। ওর আর কোথাও আশ্রয় নেই। আজ তোর হাতে ওকে দিয়ে যাচ্ছি সরোজ, তোর বিয়ে হলে ও তোর সংসারে থাকবে। ওর যেন অযত্ন না হয়—দেখিস।"

সরোজ একবার মুখ তুলিয়া কল্যাণীর আরক্তিম মুখখানার পানে তাকাইল, তাহার পর ধীরকণ্ঠে বলিল, "তোমার দেওয়া দান আমি তুলে নিলুম মা, কল্যাণীর জন্যে তোমার এতটুকু ভাবতে হবে না। তোমার হার আর লোহা কল্যাণীর কাছেই থাকবে, দ্বিতীয় আর কেউ ও জিনিস নিতে আসবে না।"

কল্যাণী মুখ তুলিয়া, আর্ত্তকণ্ঠে কি বলিতে গেল—

সরোজ বাধা দিয়া বলিল, কোন ওজর চলবে না, "আমার মায়ের দান আমি মাথা পেতে নিলুম কল্যাণী।"

সেদিন দুপুরে পুত্রের কোলে মাথা রাখিয়া বড় শান্তিতে তারা চিরদিনের জন্য ঘুমাইয়া পড়িলেন।



পশ্চাৎ-

শ্রী হরগোবিন্দ সেন

এক

রবীন্দ্রনাথের ছবিখানা এ ঘরে রাখা যেতে পারে কিনা এবং তিনি কি করেননি আর কি করেছেন, এই নিয়ে দুই শিশু-বক্তা যখন বক্তৃতা ছেড়ে হাতাহাতি সুরু করেছে, তখন গিরিজাকুমার এলেন রাঁচী থেকে ফিরে। সরকারি-কাযে এম্নি তাঁকে প্রায়ই যেতে হ'তো।

একটু মাত্র শব্দ—মোটর-হর্ন্। Open Fireএর কায করলে।

চুণী বল্লে, এই রে-এ বাবা! তার-পরেই মুহূর্ত্তের দুড়্-দুড়্ শব্দ,—কেউ কোথাও নেই।

নীলা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে তার প্রথম এবং প্রধান খবর যা দিয়ে গেল, তার থেকে অতি কষ্টে দুটি কথা গিরিজাকুমার আবিষ্কার করলেন। এক,—বাড়ীর ছাদ্; দুই,—নিশান্। দুটি কথা লাভ ক'রেও, গিরিজা-কুমার বুঝ্তে পারলেন—তাঁর কোন লাভই হয় নাই। গৃহিণীর মুখে বিস্তৃত শুনে, তাঁর 'হাঁ' এবং 'চোখ' যে পরিমাণে বিস্তৃত হ'য়ে পড়্লো, তাতে ছেলের তিরস্কারের পরিমাণ এবং পরিণাম ভেবে গৃহিণী বেশ একটু ঘাবড়ে গেলেন।

গিরিজাকুমার ডাকলেন, মধু!

মধুর বুদ্ধি এবং দেহ একটু বেশী মাত্রায় সূক্ষ্ম। বোধ হয় এই অতি-সূক্ষ্মতার জন্যেই অনেকে-ও দুটোর অস্তিত্বে সন্দেহ করত।

বুদ্ধি খরচ ক'রে কায করবার মাথা অনেকের থাকে না। কিন্তু যা নাই,—তাকে আছে ব'লে জোর ক'রে প্রতিপন্ন করতে গিয়েই মধু মাঝে মাঝে মুস্কিলে পড়্ত। নইলে কায্ করত সে গাধার মত।

ডাক্ শুনে মধু ছাদের ওপর থেকে উত্তর দিলে, যাই বাবু!

'ছাদের ওপর কি কর্‌ছিস্ রে'—ব'লেই গৃহিণী চেয়ে দেখলেন, চুণীর 'স্বরাজ পতাকা' ছিন্ন-পাতার মত পাক্ খেয়ে খেয়ে নীচে পড়্ছে।

গৃহিণী আতঙ্কে শিউরে উঠ্লেন। বল্লেন, কি করলিরে হতভাগা!—আজ যে ভারতের 'স্বাধীনতা-উৎসব।'

গিরিজাকুমার কিছু না ব'লেই নিজের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লেন।

চুণী যখন ফিরে এলো, তখন গিরিজাকুমার খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে বিশ্রাম করছেন। চুপি চুপি মাকে এসে বল্লে, মা, সব ঠিক ক'রে এলাম।

—কি রে?

—ঐ ভুলাদের বাড়ী আমাদের সভা হবে।

মা সে কথার উত্তর না দিয়ে বল্লেন, আরে—তোদের স্বরাজ-পতাকা যে পড়ে গেল।

—যাক্ সে ভালই হ'য়েছে মা, আমিও মনে করছিলাম—এখুনি নামিয়ে নেবো।

মার চোখ সঙ্গে সঙ্গে জলে ভ'রে উঠলো।

চুণীর গলার আওয়াজ গিরিজাকুমার অনেকক্ষণ থেকেই শুন্‌তে পাচ্ছিলেন। আলো-চনার কথাগুলি অস্পষ্ট, কিন্তু বিষয় তাঁর কাছে বেশ সুস্পষ্ট। ডাকলেন, চুণী!

চুণীর মুখ ভয়ে এতটুকু হ'য়ে গেল।

মা বল্লেন, ভয় কি।—ভয় করলে কি স্বরাজ আসে।

স্বরাজ পাবার লোভেই হোক বা মাকে মনে

পেয়েই হোক্ চুণী ধীরে ধীরে বাবার সামনে এসে দাঁড়াল।

কথা উঠ্‌লো স্বরাজ মানে কি?

চুণী ত' ঘেমে অস্থির। অনেক বড় বড় ব্যাখ্যা তার গলার ভিতর ভীড় ক'রে ঠেলাঠেলি করছিল, সেগুলোকে গুছিয়ে বল্‌বার ব্যাকুল-চেষ্টায় তার ঠোঁট-দুটোই ন'ড়ে ন'ড়ে উঠ্‌লো—কথা বেরুলো না।

গিরিজাকুমার হেসে বল্লেন, যা খেতে যা।

এত বড় একটা নিষ্কৃতি পেয়েও চুণীর আর পা উঠছিলো না। তার সব চেয়ে বড় ব্যথা—বাবা তাকে নির্ব্বোধ মনে ক'রে রেহাই দিয়েছেন। তার নিজের উপরই রাগ হচ্ছিলো। বাবার কাছে কেন সে গুছিয়ে বল্‌তে পারে না! এই যে অক্ষমতা—এর যে কৈ'ফয়ৎই থাক্ না কেন, নির্ব্বোধের অপবাদ ত' তাকে বহন করতেই হবে।

অতি-লজ্জা এবং অতি-বিনয়—সব সময় প্রশংসার নয়। তাই লাজুক-ছেলে পিতার কাছে চিরদিনই কৃপার পাত্র।

গিরিজাকুমার ঘরের চুণীকেই দেখে আস্‌ছেন। কোন দিন বাইরের চুণীকে দেখবার তাঁর অবকাশও হয়নি, আবশ্যকও হয়নি। গিরিজাকুমার নিজের কাজকেই এমন একান্ত ক'রে গ্রহণ করেছিলেন যে তার বাইরে কোথায় কি হচ্ছে এবং কে কি করছে সে দিকে তাঁর দৃষ্টিই ছিল না। তাই চুণীর আজকের এই দেশ-প্রীতিকে আকস্মিক একটা দুর্ঘটনা বলেই তিনি প্রথম গ্রহণ করেছিলেন। তারপরেই চুণীর সঙ্গে কথা। তাঁর সব সংশয় দূর ক'রে বুঝি এই কথাটাই শুধু সে জানিয়ে দিয়ে গেল, আমি সেই শিশু চুণীই আছি।

গিরিজাকুমার পরম নিশ্চিন্ত হ'য়ে, মধুকে ডাক দিলেন। মধু আসতেই তিনি গর্জ্জন ক'রে উঠলেন, শূয়ার! ছাদের ওপর থেকে ঐ 'ফ্ল্যাগ'টা কে নামাতে ব'লেছিলো?

মধু থতমত খেয়ে গেল।

—যাও, যেমন ছিল—

গৃহিণী বোধ করি নিকটেই ছিলেন। হুড়মুড় ক'রে ঘরে এসে বল্লেন, না—ওকে যেতে হবে না।

কেন কি—হয়েছে কি? ব'লে গিরিজাকুমার বিছানায় উঠে বস্‌লেন।

—হয়েছে কি? কেন, ও কি জানেনা—বাইরের ঘরে আজ চুণীদের সভা হবে? ওরা তিন দিন ধ'রে ধোয়া-পোঁছা ক'রে ঘর খানাকে সাজিয়েছে, আর তোমার যত রাজ্যের লটবহর-গুলো নিয়ে ফেলে এলো কিনা—

শূয়ার!—ব'লে গিরিজাকুমার লাফিয়ে উঠলেন।

দুই

এর কিছুদিন পরেই—চুণী 'বন্দেমাতরম্' ব'লে ইস্কুল থেকে বেরিয়ে এলো। ইচ্ছা,—তার এত বড় কীর্ত্তিটা, তার বাবার কাণে কেউ পৌঁছিয়ে দেয়। কিন্তু সাতদিন পার হ'য়ে গেল—চুণী দেখলে এ-নিয়ে বাড়ীতে কোন হৈ চৈ-ই হ'লো না। চুণী ছট্‌ফট্ ক'রে বেড়ায়। শেষে মা'ই একদিন কথা পাড়লেন;—এমন ক'রে ষাঁড়ের মতন ঘুরে বেড়াবি—শেষে দশা হবে কি তোর?

চুণীর রক্ত গরম হ'য়ে গেল। বাইরে ক'দিন ধ'রে প্রশংসা পেয়ে-পেয়ে নিজে যে কত বড়—এই কথাটই সব সময়ের জন্যে তার মনের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করছে। অ'চ এত বড় একটা খ্যাতি—ঘরে তার কোন স্থানই নাই!—মনে হতেই চুণীর সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল। বল্লে, যা বোঝ না,—তা নিয়ে মাথা ঘামিও না।

মা আর কিছু বল্লেন না। বোঝেন না ব'লে নয়, বলা নিষ্ফল ব'লে।

মাকে চুপ করে থাকতে দেখে চুণীর অগ্নি

বক্তৃতার নেশা চেগে উঠলো। বল্লে, মা!—দেশকে স্বাধীন ক'রে তবে আমাদের পড়াশুনা।

মা বিরক্ত হয়ে চ'লে গেলেন।

তখনকার মত ঐ পর্য্যন্তই—

সন্ধ্যার সময় গিরিজাকুমারের হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল, চুণী অনেকদিন থেকে তাঁর কাছে আর পড়া ব'লে নিতে আসছে না।

বাইরে শীতের কন্‌কনে বাতাস। তবু তাঁর মনে হলো, আজ অফিসের কাগজ-পত্তরের জঞ্জাল-গুলো ফেলে বাড়ীটার চারদিক একবার ঘুরে দেখে আসেন। যেন কতদিন এ সব দেখেননি! বারান্দায় এসে ফুলের টবগুলোর দিকেই অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। কালকের ফোটা ফুল ঝ'রে ঝ'রে টবেই পড়ে আছে—কেউ ফিরেও দেখে না! চোরের মত একবার এদিক ওদিক দেখে নিয়ে, গিরিজাকুমার তাড়াতাড়ি সেগুলো পকেটে পুরলেন। যেন তাঁর আজকের এই একটি দিনের যৌবন,—বর্ত্তমানকে ফাঁকি দিয়েই তিনি চুরি করে নিলেন।

—একি! তুমি আবার ঠাণ্ডায় এলে কেন?

গিরিজাকুমার চম্‌কে উঠলেন। দেখ্‌লেন, গৃহিণী তাঁর অতি নিকটে দাঁড়িয়ে। তিনি হাসতেই গেলেন কিন্তু হাসির চেয়ে লজ্জাটাই ফুটে উঠলো বেশী।

—নাও, ঠাণ্ডায় আর দাঁড়িয়ে থাকে না—চল।

'হাঁ এই যাই' ব'লে গিরিজাকুমার বাইরের আকাশ বাতাস গাছপালার দিকে—যেন কতকাল পরে আজ দেখা এমনভাবে চাইতে লাগলেন।

—তোমার আজ হ'লো কি?

হয়নি কিছুই, -পেন্‌সেন্‌ নেবার সময় হ'য়ে এলো কিনা—কাজকর্ম্ম আর ভাল লাগছে না, ব'লে গিরিজাকুমার খুব খানিকটা হেসে নিলেন।

পেন্‌সেন্‌ নেবার কথায় গৃহিণীরও বুঝি অতীত দিনের কথা মনে পড়লো। বল্লেন, তোমার মনে পড়ে,—কত জ্যোৎস্না-রাত্রি এই বারান্দায়—

—হাঁ, ঐ কোনটায় একটা মাধবী লতা ছিল।

—চুণী জঙ্গল হচ্ছে ব'লে সেটা কেটে ফেলেছে।

চুণীর কথা উঠতেই গিরিজাকুমার ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, আচ্ছা, চুণী আর পড়া বলে নিতে আসছে না কেন জান?

গৃহিণী একটু থেমে আস্তে আস্তে বল্লেন, সে ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছে।

গিরিজাকুমার যেন বুঝ্‌তেই পারেন নি এমনিভাবে গৃহিণীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

বারান্দায় চাপা-জুতোর-শব্দ শোনা গেল।

গিরিজাকুমার ডাক্‌লেন চুণী!

চুণী চম্‌কে উঠলো।—ভয়ে নয়, বিস্ময়ে।

অতি ছোট বেলা থেকে—যতটুকু তার মনে পড়ে, এমনটি সে আর কখন দেখেনি। মূঢ় মানব বিষ্ণুর রূপ ধ্যান করতে ব'সে পুঁথির নির্দ্দেশ মত শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম ছাড়া যেমন আর কোন রূপই কল্পনা করতে পারে না চুণীও তেমনি বাবাকে গলায় গলাবন্ধ গায়ে লম্বা কোট, পায়ে মোজা ছাড়া মনে আন্‌তেই পারে না। তিনি কিনা আজ—

চুণী প্রতিদিনই এমনি রাত ক'রে বাড়ী ফেরে। পিতার রুদ্ধ-ঘর তার কাছে পরম নিশ্চিন্তের মতই এক পাশে প'ড়ে থাকে। কিন্তু আজ একি বিস্ময়!

চুণী হিসেব ক'রে দেখলে, তার ইস্কুল ছাড়া আজ ১২ দিন হলো। এই ১২টা দিন সে তার বাবার চোখের আড়ালে আড়ালেই রয়েছে, কোন দিন কোন কারণে তার ডাক পড়েও নি—সেও ধরা দেয় নি। ভেবেছিলো, আরও দিন কতক যাক্‌ না এমনি ক'রে। কি জানি—

একটা লোভ যে তার না ছিল এমন নয়। সে তার বাবার কাছে 'বাহবা' পাওয়ার লোভ। কতদিন সে রাত্রে স্বপ্নে দেখেছে, বাবা তাকে বুকে

ক'রে কুতূহলী জনতার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। —মু'খে তাঁর স্বর্গ-পাওয়ার আনন্দ, চোখে তাঁর গর্বোজ্জ্বল দৃষ্টি।

চুণী এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে আসে, আর কত কথাই সে ভাবে।

কিন্তু যে স্বপ্ন,—সে স্বপ্নই!

গিরিজাকুমার বল্লেন, কাল থেকে ইস্কুলে যাবে—

চুণী খুব বড় ক'রে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু শুধু একটা 'কিন্তু' ব'লেই থেমে গেল।

এর মধ্যে আর কিন্তু নেই। কিন্তু যা—সে ঐ ইস্কুলের পাঠ শেষ ক'রে। ব'লে গিরিজা-কুমার হাসতে হাসতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

তিন

চুণী সারারাত ভেবে ঠিক করলে, এবার সে বিদ্রোহ করবে। ইস্কুল সে যাবে,—কিন্তু কালই সে একটা চরকা কিনে নিয়ে আসবে—খদ্দর পরবে—এবং আরও কিছু যা হয় একটা করবে।

যা হয় আর কি;—সকাল বেলায় দেখা গেল—সে এক নাপিত ডেকে নিয়ে এসে মাথা নেড়া করছে।

নীলা ত' হেসেই অস্থির। বলে, দাদা বোষ্টম—

রাতারাতি চুণীর এই অদ্ভুত বেশ পরিবর্ত্তন দেখে সকলেই অবাক হ'য়ে গেল।—পরণে খদ্দর, মাথায় গান্ধী টুপি, পায়ে বার্ম্মা চটী।

ভুলা বল্লে, লজ্জা করছে না?

—লজ্জা কিরে! এই তো আমাদের জাতীয় পোষাক।

—তা হ'ক,—আমার তো ভাই লজ্জা করে টুপিটা ভাই তুই খুলে ফেল্।

চুণী এক মুহূর্ত্ত কি ভাবলে। তারপর সজোরে ঘাড় নেড়ে ব'ল্লে নাঃ—এ আমি খুলতে পারি না। তারপর সোজা গট গট ক'রে ইস্কুলের দিকে এগিয়ে চল্লো।

ভুলা বল্লে, কোথায় চল্লি?

—ইস্কুল।

এই ইস্কুল কথাটা চুণী এমন জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করলে, যেন সেইটের উপরেই তার বড় আক্রোশ;—আর এই যুদ্ধ সজ্জা সেই জন্মেই।

হেড মাষ্টার বল্লেন, ও টুপি প'রে স্কুলে আসা চলবে না।

—কেন স্যার?

—আমি নিষেধ করছি।

—তবে আজিজ্ কেন স্যার—

'বড় ডেঁপো হয়েছিস্—বড় ডেঁপো হয়েছিস্' বল্‌তে বল্‌তে হেডমাষ্টার নিজের অফিসে গিয়ে ঢুক্‌লেন।

চুনী অমনি চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—বল ভাই, বন্দেমাতরম্

হেড্‌মাষ্টার স্কুল রক্ষার আর কোন উপায় না পেয়ে শেষে গিরিজাকুমারের শরণাপন্ন হলেন। শান্ত প্রকৃতি গিরিজাকুমার ছেলের এই ঔদ্ধত্য শুনে হাসতে লাগলেন। বল্লেন, ওদের ওসব শিশু-উত্তেজনা।—

—কিন্তু এতে যে অনিষ্ট হচ্ছে।

ঐ গান্ধী টুপিতে?—ব'লে গিরিজাকুমার উচ্চহাস্য ক'রে উঠ্‌লেন।

হেড্‌মাষ্টার বিব্রত হ'য়ে পড়্‌লেন। তাঁকে চুপ্ ক'রে থাক্‌তে দেখে গিরিজাকুমার বল্লেন, আপনি প্রাচীন ব্যক্তি, ওদের সঙ্গে আপনিও ক্ষেপ্‌বেন না।

মাষ্টার মশায়ের ইচ্ছা হ'লো বলেন, ক্ষ্যাপা কি মশায়—এতটুকু-টুকু ছেলেগুলো আমাদের বাঁদর-নাচান্ নাচাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ চুনী এসে পড়ায় তাঁর মনের কথা মনেই থেকে গেল।

চুনীর আপাদ-মস্তক একনজর দেখে নিয়ে গিরিজাকুমার হো হো—হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন।

চুনী ভেবেই পেলে না, এ হাসি, পূর্ব্বের জের—না, এই আরম্ভ ?

মাষ্টারমশায় হতবুদ্ধির মত গিরিজাকুমারের মুখের দিকে চেয়ে ভাবলেন, পাগল না কি ?

—তোকে মানিয়েছে ত' রে বেশ !

চুনী অবাক্ ! বুকের আনন্দ-জোয়ার যেন পঞ্জর-তটে তার আছ্ড়ে আছ্ড়ে পড়্ছে। তার মনে হ'লো—আজ একদিনে, ভারতের বেদী-পীঠে তার পূজাঞ্জলি সার্থক হ'য়ে গেল। বাবার ঐ একটি মাত্র মুখের কথা—'তোকে মানিয়েছে ত'রে বেশ' চুনীকে যেন আজ নাচাতে লাগ্লো। বাবা যদি এখন সব ছেড়ে ছুড়েও দিতে বলেন,—কিন্তু অকস্মাৎ যেন কিসের ভয়ে সে কেঁপে উঠ্লো। বল্লে, না-না, গান্ধী টুপি আমি মাথা থেকে নামাতে পার্ব্ব না।

হেড্মাষ্টার কট্মট্ ক'রে চাইতে লাগলেন। যেন দুর্ব্বাসার রুদ্র-চোখ।

গিরিজাকুমার চুনীকে যেন আজ প্রথম দেখ্লেন! নির্ণিমেষ চোখে চুনীর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কত কি যে ভাব্তে লাগ্লেন।—সেদিনকার শিশু চুনী,—আজ অকস্মাৎ—অকস্মাৎ বলেই মনে হ'লো, যেন তাঁকে আড়াল ক'রেই কতকগুলো বছর বড় হ'য়ে নিয়েছে! আজ এ চুনী কথা বল্তে শিখেছে! বল্লেন, না, নামিও না।

ছোট্ট একটু কথা,—কিন্তু মাষ্টারমশায় চম্কে উঠ্লেন। বুঝ্তে পার্লেন, বাপের আদরেই—

চুনী আর একবার মাষ্টারমশায়ের দিকে চেয়ে, পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল।

মাষ্টারমশায়ও উঠি উঠি কর্ছিলেন, কিন্তু গিরিজকুমার তখন ব'লে চলেছেন, দেখুন মাষ্টার মশায়, মনের এই দৃঢ়তা বড় কম সংযম নয়। ক জন এমন জোরের সঙ্গে 'কর্ব না,' পারব, না' বল্তে পারে? চুনী ভাল কর্ছে কি মন্দ কর্ছে, সে অন্য কথা। কিন্তু ওর ঐ; শিশু-মুখের নির্ভীক উত্তর—

হেড্মাষ্টার আর সইতে পার্লেন না। তিনি ধড়্ মড়্ ক'রে উঠেই বল্লেন, আর না—আমার আবার—

গিরিজাকুমার ব্যস্ত হ'য়ে আসন ছেড়ে উঠ্তে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মুখ তুলেই তিনি দেখ্তে পেলেন মাষ্টার মশায় তখন ফটক্ পার হ'য়ে গিয়েছেন

চার

চরকা কেটে দেশ স্বাধীন হ'তে পারে কি না, বা মিলের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে কাকে বিদায় নিতে হবে—এ সব কূট প্রশ্ন না তুলেও, গিরিজাকুমার চরকা কাট্তে লাগ্লেন। কি ক'রে এই অসম্ভব সম্ভব হ'লো,—ছোট্ট ক'রে বলি।

চুনীর আনা চরকাটা এখন বারান্দার এক কোণে শুধু নীলার কৌতুহল উদ্রেক কর্তেই প'ড়ে থাকে। এই অনাবশ্যক জিনিষটার উপর চুনীর মমতা না থাক্লেও ক্ষমতা ছিল। সেই ক্ষমতার জোরেই সে সকলকে জানিয়ে দিলে, আমার চরকার যে হাত দেবে—ইত্যাদি।

নীলার বড় লোভ—একবার নিজের হাতে ঘুরিয়ে সে সুতো কাটে। সুতো সে কাট্তে জানে না, আর জানে না ব'লেই তার অত লোভ।

মা বল্লেন তুই কাট্তে পার্বি ?

দীর্ঘ একটা 'হাঁ' ব'লেই নীলা প্রমাণ ক'রে দিলে কাযটা মোটেই দুরূহ নয়,—বরং জলের মতই সোজা। তারপরেই বাবাকে গিয়ে জানালে, দাদার মত তারও একটা চরকা চাই।

চরকা এলো। ব্যস্ত হ'য়ে নীলা চরকা ঘুরোতে গিয়েই দেখে, বাঁ হাতের সঙ্গে ডান্হাতের সহযোগীতা সম্পূর্ণ অসম্ভব।—বাঁ হাত চালাতে ডান্ হাত থামে, ডান্ হাত চালাতে বাঁ হাত।

শেষে গিরিজাকুমারকেই ঐ কাউরি 'বয়ট' থেকে সুতো বের করবার কঠিন ভার নিতে হয়। এই তাঁর চরকা গ্রহণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এখন সন্ধ্যা হলেই নীলা ছুটে আসে তার বাবার কাছে—চরকা এবং তুলো নিয়ে। গিরিজাকুমারও বেশ আমোদ পান। বলেন, মন্দ কি? নিজের হাতে কাপড়—

চুনী চেয়ে চেয়ে দেখে, আর নিজের মনেই বলে—না, বাবার মধ্যে 'পার্টস্' আছে। আমি বাবাকে খুব ভালবাসতাম—যদি এই সময় চাকরিটা উনি ছেড়ে দিতেন।

সেদিন গোলদিঘীতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে চুনী এই কথাই খুব জোর গলায় ব'লে এলো—আমি অনেককে জানি, যাঁরা ঘরে বসে এই 'মুভমেণ্ট'কে সাহায্য করছেন। কিন্তু চাকরির মোহ এখনও ত্যাগ করতে পারছেন না।—এই দুর্ব্বলতার নামই 'স্লেভ মেণ্ট্যালিটি' ইত্যাদি—

পরদিনই চুনীর বক্তৃতা কাগজে বেরিয়ে গেল। চুনী ইচ্ছা ক'রেই সেই কাগজখানা গিরিজাকুমারের ঘরে ফেলে এলো। কিন্তু গিরিজাকুমারের চৈতন্য হ'লো না। বরং তার দিন-দুই পরেই বড় সাহেবের 'ফেয়ার্ ওয়েল্'-এ নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে এলেন।

এই নিয়ে দু'-একটা কথা চুনীকে পথে-ঘাটে শুনতেও হ'লো। চুনী কাগজে প্রবন্ধ লেখে,—প্রাচীন নবীনকে বাধা দেবেই,—কারণ, নবীনের উপর প্রভুত্ব করবার লোভ—পুরাতনের স্বভাব-ধর্ম। কোন প্রভাবই যেন ব্যক্তিত্বকে বিনাশ না করে। হাতে-গড়া নূতন পথই হবে—নবীনের যাত্রা-পথ।

প্রবন্ধ দেখে গিরিজাকুমার আপন মনেই চীৎকার ক'রে উঠলেন—চমৎকার।

গৃহিণী চা দিতে এসেছিলেন; বল্লেন, সে আবার কি?

—চুনী কাগজে কি লিখেছে দেখেছ?

—কি?

—লিখেছে, আমাদের—এই বুড়োদের, আর ও। মানবে না।

—সে ত দেখতেই পাচ্ছি।

গিরিজাকুমার নির্ব্বোধের মত গৃহিণীর মুখের দিকে চাইলেন।

সেদিন সকাল সকাল খেতে এসে চুনী মার কাছে তাড়া খেয়ে সেই যে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, আর দেখা নাই। মা'র মন বোধ হয় ব্যাকুল হয়ে উঠছিলো, তাই ব্যস্ত হ'য়ে বল্লেন, আহা,—বেঁচে থাক।

পাঁচ

—লোকে যে 'ছি ছি' করছে বাবা!

—'ছি ছি'র কাষ করলে তারা ত করবেই।

—এবার আপনি চাকরি ছেড়ে দিন।

গিরিজাকুমার হাসলেন।

এই হাসিটুকু গিরিজাকুমারের একান্ত নিজস্ব।—কেমন অনাড়ম্বর—স্বচ্ছ—সরল! চুনী অনেক কথাই বলবে ব'লে এসেছিল। কিন্তু তার একটি কথাও আর মনে এলো না। ঐ হাসি যেন সকল যুক্তি তর্কের খণ্ডন।

গৃহিণী এসে বল্লেন, চুনী ত' রাগ ক'রে—না খেয়েই বেরিয়ে গেল।

গিরিজাকুমার আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লেন, কেন?

—লোকে নাকি তোমার নিন্দে করছে—সাহেবের চাকরি কর ব'লে।

গিরিজাকুমার উচ্চহাস্য ক'রে উঠলেন। বল্লেন, খাবে এখন।

—আচ্ছা, হ্যাগা—সত্যিই নিন্দে করছে?

গিরিজাকুমার গৃহিণীর অন্তরের কথা বুঝলেন। বল্লেন, তুমিও ওদের মত ছেলে মানুষ হ'লে?

টং টং ক'রে ঘড়িতে দশটা বেজে গেল।

ঘড়ির দিকে একবার চেয়ে গিরিজাকুমার চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন।—নাঃ, আজও অফিস্ যাওয়া চলে না দেখ্ছি। হাত পা ঝেড়ে একবার পরীক্ষা ক'রেও নিলেন—যাওয়া চলে কি না।

গৃহিণী বল্লেন, কায্ নেই অমন ক'রে গিয়ে। শরীরের চেয়ে ত কায্ বড় নয়।

'হুঁ' ব'লে একবার করুণ-চোখে ঘড়িটার দিকে চেয়ে গিরিজাকুমার নিশ্চিন্ত হ'য়ে বস্লেন। বল্লেন, আজও দু' একখানা 'টোষ্ট' ছাড়া কিছু নয়—বুঝ্লে ?

—এই জন্তেই বলি, তোমার ও-সব সইবে না।

কথাটা মিথ্যা নয়। বড় সাহেবের বিদায়-ভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে এসেই গিরিজাকুমার অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। সর্দ্দি,—অল্প একটু জ্বর। শীতের রাত্রির চারঘণ্টার-ঠাণ্ডা গিরিজা-কুমারের পক্ষে বড় কম কথা নয় আর হ'লোও তাই—

দেখ্তে দেখ্তে তাঁর অসুখ বাঁকা পথ ধর্লে।

চুণী বলে, এ তাঁর অতি-সাবধানের ফল। ঘর থেকে বেরুবেন না মোটেই।

চুণী ভুলে যায়, তার বাবাও একদিন তারই মত দুর্দ্দান্ত বয়েস পার ক'রে—আজ ঘাটে এসে পৌঁচেছেন।

গিরিজাকুমারের বাল্যবন্ধু প্রসাদবাবু, বন্ধুকে দেখ্তে এসে তাঁদের ছোট বয়েসের গল্প করেন।

চুণী অবাক্ হ'য়ে শোনে।

নীলা বলে, তারপর জেঠামশায় ?

প্রসাদবাবু বলেন, সেবার আগ্রা না কোথায় যাচ্ছি—তোমার বাবা-ত' এক গোরা-সাহেবকেই মেরে বস্লো।

চুণী আশ্চর্য্য হ'য়ে বলে, কি রকম ?

—গাড়ীতে অসম্ভব ভিড় সেকেণ্ড ক্লাসের এক দোর ধ'রে এক গোরা, বাঙ্গালী বাবুদের কিছুতেই উঠ্তে দেবে না। তোমার বাবা তাড়াতাড়ি ইণ্টার ক্লাসের টিকিট বদ্লে, ঐ সেকেণ্ড্ ক্লাসের দরজায় এসে দাঁড়ালো। সাহেব ত' চ'টে লাল। এক প্রচণ্ড ঘুসি গিরিজার নাক লক্ষ্য ক'রে তুল্তেই—কোত্থেকে কি হ'লো গিরিজার ঘুসিতেই সাহেবটা আর্ত্তনাদ ক'রে পড়ে গেল।

নীলা হেসে কুটোকুটি। বলে, তারপর—কি হ'লো জেঠামশাই ?

—তারপর গার্ড্ সাহেব এসে, তাকে অন্য গাড়ীতে তুলে দিলে।

—সাহেব আর কিছু বল্লে না ?—নীলার কণ্ঠে ভয়-বিস্ময় সুর।

প্রসাদবাবু হেসে বলেন, না।

চুণী স্তব্ধ হ'য়ে শোনে। নিজের শরীরটার দিকে একবার তাকায়। পরে নিজের মনেই বলে, এবার থেকে একটু একটু 'এক্সার্সাইজ' করতে হবে।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই গিরিজাকুমারের অবস্থা খুব খারাপ হ'য়ে গেল। ডাক্তার ব'লে গেলেন, আজ্কের রাত্তিরটা কাটে কি না—

সত্যই কাটলো না। শেষ রাত্রে গিরিজা-কুমারের শেষ আশাটুকুও শেষ হ'য়ে গেল। আছাড় খেয়ে মার কোলে প'ড়ে গেল।

সব অন্ধকার! কোথাও কিছু নাই—শুধু অশ্রান্ত কান্না! যেন লক্ষ-কান্না অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফুপিয়ে উঠেছে! চুণী 'মা গো' ব'লে একবার চোখ মেল্লে। গোটা ভারতবর্ষটা—তার চোখের সাম্নে একটা বুদ্বুদের মত ফট্ ক'রে ফেটে মিলিয়ে গেল!

মুখে চোখে জল দিয়ে বাতাস করতে করতে প্রসাদবাবু ডাক্লেন, চুণী!

প্রসাদবাবুকে দেখে চুণী ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্লো। বল্লে, আমাদের কি হবে জেঠামশায় ?

মেকি

শ্রী সত্যেন্দ্রকুমার বসু. বি-এ

এক

কাঁচড়াপাড়া লোক্যাল ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময় শীর্ণকায় একটা লোক প্রায় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় আমাদের কামরার সম্মুখে উপস্থিত—তাহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গ ঘর্ম্মসিক্ত। অতি দ্রুত ছুটিয়া আসাতে তাহার নাসারন্ধ্র কম্পিত হইতেছিল। কোনমতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাতরকণ্ঠে সে বলিল, "মশয়, একটু জায়গা—এই ক্ষমা-ঘেন্না ক'রে, গরীব ব্রাহ্মণ মশয় -"

গাড়ীর মধ্যে পাঁচ-সাতজন চীৎকার করিয়া উঠিল, "মাইরি? ও রে, আমার গোপাল রে!"

তিসরা ঘণ্টা পড়িয়া গেল, গার্ডের হুইসিল বাজিল, নিশান ত্তলিল। তখন লোকটার চোখে-মুখে যে আতঙ্ক-জড়িত কাতর ব্যাকুল ভাব ফুটিয়া উঠিল, শকুন্তলা-হারা রাজা দুষ্মন্তের শকুন্তলার স্মৃতি উদিত হইবার সময়েও তাহা দেখা দিয়াছিল কি না সন্দেহ। দরজাটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া দিয়া চলন্ত গাড়ীতে তাহাকে তুলিয়া লইলাম। গাড়ী প্লাটফরম প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিল ও মুহূর্ত্ত পরে ষ্টেশন ছাড়াইয়া গেল।

"দাঁড়িয়েই যাব মশয়—এই একটুকু ঠাঁই হলেই হবে 'খন। আঃ! খুব পেয়ে গেছি মশয়।" হাঁপাইতে হাঁপাইতে লোকটা কথা কয়টা বলিয়া আধ-ময়লা উত্তরীয় দিয়া হাওয়া খাইতে লাগিল। তখনই আমার প্রতি দৃষ্টি পতিত হওয়ায় আবার বলিল, "আঃ! খুব উপ্‌গারটা করলেন মশয়! এটা না ধরতে পারলেই ভোগাভো আর কি। মশয়ের নিবাস? ব্রাহ্মণ?"

আমি বলিলাম, "না, কায়স্থ। আপনি ব্রাহ্মণ? প্রণাম।" লোকটা হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। লোকটা আধাবয়সী না হইলেও দেহের অবস্থা ও বেশভূষার ধরণ-ধারণ দেখিয়া তাহাকে তরুণ বলিয়া মনে করিতে দ্বিধা বোধ হয়, অথচ তাহার মুখে তারুণ্যের কোমলতার ছাপ ঈষৎ প্রচ্ছন্নভাবে লুকাইয়াছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। আধ ময়লা কাপড়, ধূলিধূসরিত ছিন্ন পাদুকা, তদনুরূপ উত্তরীয়, গলদেশে জীর্ণদীর্ণ তেলচিটা ময়লা যজ্ঞোপবীত—দেখিলেই মনে হয় যে, ব্রাহ্মণ এইমাত্র চাটের দোকানে কাঁকড়ার দাড়ার কড়া চাপাইয়া আসিতেছে। তাহার হাতে চামচিরকুট কাল ক্যাম্বিসের ব্যাগ এবং বর্ণহীন খেরোর মোড়া এক-তাড়া কাগজ, বোধ হয় প্রাচীন পুথি। সে আমার সম্মুখে দরজা ঠেসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার অঙ্গের অথবা অঙ্গাবরণের সুবাসে পাশের লোকের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল—বিশেষতঃ, মুখগহ্বর হইতে যে উৎকট তীব্র গন্ধ নির্গত হইতেছিল, তাহার তুলনা কোথায় খুঁজিয়া পাইব? সে যে কিসের গন্ধ, তাহা তাহার ঘূর্ণায়মান রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিয়া অনুমান করিয়া লওয়া কষ্ট-সাধ্য ছিল না।

জানালার দিক হইতে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলাম, "ঠাকুর, যাওয়া হচ্ছে কোথা? বাড়ী এই দিকেই না কি?"

সে বলিল, "না, যজোমান। যাচ্ছি শিব্যি বাড়ী।"

একটি বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তোমারও শিব্যি আছে না কি ঠাকুর? অধম্মো আর কি!"

গাড়ীতে হাসির রোল উঠিল। ঠাকুর চটিয়া

আগুন। বোধ হয় সে কাল হইলে দুর্ব্বাসার মত পৈতা ছিঁড়িয়া শাপ দিতেন, নতুবা হয় ত একবারে ভস্মই করিয়া ফেলিতেন। করমচার মত রাঙ্গা চোখ দুইটা আরও রাঙ্গা করিয়া বলিলেন, "কি? আমার শিষ্যি নেই? বলে,—বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান—ফুলের মুকুটি – খড়দার মেল—অ.মি হরকালী শিরোমণির প্রথম পুত্র ত্রিলোচন শর্ম্মা—আমার বলে কি না—"

আমিও গাড়ীর হাসিতে যোগ দিয়া বলিলাম, "ঠিক, ঠিক। তুমি যদি ত্রিলোচন না হ'তে তা হ'লে গাড়ী ফেল হতে হতে বেঁচে যেতে না। বাপ্, সামনে পেছনে তিন তিনটে লোচন!"

আবার একটা হাসির গররা উঠিল। কিন্তু ত্রিলোচন ঠাকুরের সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নাই! তিনি তখন ক্যাম্বিসের ব্যাগ খুলিয়া এক ছিলিম চড়াইবার উদ্যোগে ব্যস্ত। আপন-মনে বলিলেন, "জান বাবুরা—আমরা সাতপুরুষে গুরু—এটা আমাদের বাপ-পিতামোর ব্যবসাই বল, আর পেশাই বল—"

ভিন্ন কোণে যে ঘাড় কামানো 'বাটারফ্লাই' বড়ীর গোঁফওয়ালা ছোকরা বাবুটি এতক্ষণ বেঞ্চ চাপড়াইয়া 'এসে হেসে কাছে বসে' সুরখানা অতুচ্চ অনুনাসিক স্বরে আবৃত্তি করিতেছিল, সে হঠাৎ সুর থামাইয়া বলিল, "হাঁ, পৈত্রিক জমিদারী বল্লেও পার ঠাকুর।"

এবার হাসির রোল বোধ হয় গার্ডের গাড়ীতেও গিয়া পোঁছিল।

ঠাকুর তখন ছিলিম চড়াইয়া চক্ষু দুইটি বুঁদ করিয়া শোষ টান মারিয়াছেন – তাঁহার শীর্ণ দেহের শিরাগুলি দড়ির আকারে ফুলিয়া উঠিয়াছে, উদরটা যেন অতল গহ্বরে ঢুকিয়া গিয়াছে। এঞ্জিনের নলের মত অনন্ত অপারিমেয় একরাশি ধূমোদ্গীরণ করিয়া ছিলিমটি আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া ত্রিলোচন শর্ম্মা বলিলেন, "আসুন বাবু।"

আবার হাসির শব্দে গাড়ী ভরিয়া গেল।

আমি বলিলাম, "না ঠাকুর, এখনও ব্যোমপথে যাবার তত সখ হয় নি, অমৃতে কি ভাগ দিতে আছে? তা, মশায়ের কি এই জমিদারী নাড়া-চাড়া করে খাওয়া হয়, না আর কিছু করা হয়?"

চোখ দুইটী কোন মতে জোর করিয়া খুলিয়া ঠাকুর বিস্মিতভাবে বলিলেন, "জমিদারী? চোদ্দ পুরুষে ও সব ধার ধারি নি বাবা, আমাদের জমিদারী, যজমান। হাঃ হাঃ জমিদারী! বাবুরা কি যে বলেন!"

একটি যাত্রী বলিলেন, "তা নিতান্ত মিথ্যে বলে নি ছোকরা। এমন ঝক্কি-ঝামেলা না পুইয়ে খাজনা আদায় আমাদের ইংরেজ রাজা করতে পারেন? খাতা নেই পত্তোর নেই দলিল নেই দস্তাবেজ নেই, আইন নেই আদালত নেই,—দয়া ক'রে একবারে পায়ের ধূলো দিয়ে যজমানকে কৃতার্থ করলেই হল, বাস!"

একজন বলিল, "কি রকম?"

পূর্ব্বোক্ত যাত্রী বলিলেন "এর আর হেঁয়ালিটা কি? মানুষ জন্মাবার আগে থেকেই এরা খাজনা আদায় করেন, আবার মরেও এঁদের কাছে নিস্তার নেই, মানুষ মরে ভূত হয়েও বছর বছর খাজনা দিতে হয়।"

আমি বলিলাম, "তার মানে?"

যাত্রী বলিলেন, "মানে? মানে এই যে, গর্ভাধান, পুংসবন চূড়াকরণ, বিবাহ মৃত্যু, শ্রাদ্ধ, আদ্যশ্রাদ্ধ, সপিণ্ডকরণ,—সব চাই,—উপরন্তু বছর বছর বছুরকী! মরে ভূত হয়েও খাজনা না দিয়ে পালাবার যো নেই বাবা এঁদের কাছে।"

হো হো হাসির গররা উঠিল। কিন্তু যাঁহার উদ্দেশে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ চলিতেছিল, তাঁহার সে দিকে আদৌ দৃষ্টি ছিল না, তিনি তখন ছিলম রাখিয়া গণ্ডদেশে উত্তরীয় জড়াইয়া যোড়হস্তে ভক্তিভরে পশ্চিম মুখে প্রণাম করিতেছেন।

আমি বলিলাম, "কি ঠাকুর, এটা ত খড়দা! শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করছো না কি ?"

ঠাকুর বলিল, "খড়দা! আমার এসেছে খড়দার শ্যামসুন্দর দেখাতে! খড়দা যে ত্রিলোচন শর্ম্মার 'অসারে খলু সংসারে' তা ত জান না বাবু! পেন্নাম করছি তার চেয়েও বড় দেবতাকে, তা জান ?"

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "শ্যামসুন্দরের চেয়েও বড় দেবতা ? কে তিনি শুনি নি ত ?"

ত্রিলোচন এইবার বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, "তা শুনবে কেন ? ইনি যে জাগ্রত দেবতা। স্বয়ং ধান্যেশ্বরীরও উপরে যান।"

সকলের বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইল।

গাড়ী প্লাটফরমে প্রবেশ করিল। ত্রিলোচন মালপত্র লইয়া অবতরণকালে বলিল, "জান না বাবুরা ? এখানকার তাড়ি ? আহা হা মশয়! বললে না পেত্যয় যাবেন, একবারে রাবড়ী মালাই!"

ত্রিলোচন প্লাটফরমে নামিয়া আর একবার যোড়হস্তে প্রণাম করিল, গাড়ীশুদ্ধ লোক হাসিয়া আকুল। ত্রিলোচন পুনরায় বলিল, "একবারে বাস্তুদেবতা। ও সেরি-স্যাম্পেন যাই বলুন, আমাদের তাড়ি-ধান্যেশ্বরীর কাছে কিছুই না— ওঁরা বাস্তুদেবতা।"

গাড়ী মোশন দিয়াছে। ত্রিলোচন গাড়ীর সঙ্গে চলিতে চলিতে বলিল, "দেখেন না, এই তাড়ি আর মালপোয়াভোগে গোসাঞি-মহাপ্রভুদের কেমন সমস্তু ভূঁড়ী বাগিয়ে উঠেছে ?"

এবার হাসির আওয়াজে গাড়ীখানা যেন ভাঙিয়া পড়িল। আমি বলিলাম, "কৈ ঠাকুর, শিষ্যবাড়ী গেলে না ?"

ত্রিলোচন বলিল, "হবে হবে ক্রমে। শুঁড়ালয়ে একটু মেরে নিয়ে—"

আর শোনা গেল না—গাড়ী তখন প্লাটফরম ছাড়াইয়া জোরে ছুটিয়াছে। লোকটা একটা বিদায়-সম্ভাষণও করিয়া গেল না। দূর হউক, ইহার জন্য আমার কি মাথা ব্যথা পড়িয়া গেল!

দুই

কেহ বলে, আমার গৃহিণী বন্ধ্যা, কেহ বলে, আমিই তাই। কিন্তু আমার বন্ধ্যা হওয়ায় ক্ষতি বিশেষ কিছু হয় নাই। গৃহিণীর সম্বন্ধে কিন্তু একথা বলা চলে না। যতই দিন যাইতেছে, গৃহিণীর শুচিবায়ুর আকার ক্রমশঃই বিকটকার দৈত্যের মতেই ভয়-ভক্তিজনক হইতেছে। তাঁহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম পূজা অর্চ্চার ধরাবাঁধা টাইম সংসার কর্ত্তব্যকেও ক্রমশঃ ছাপাইয়া যাইতেছে।

বাড়ী পৌঁছিয়া অন্যদিনের মত হাতের কাছে সব জিনিসের যোগাড় পাইলাম না। ডাকিয়াও তাঁহাকে পাইবার যো নাই। বিন্দির মার কাছে শুনিলাম, তিনি পাড়ায় ভাগবত শুনিতে গিয়াছেন। পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল! আজ শনিবার, —জানেন আমি বাড়ী আসিবই। দূর তোর বাড়ী নিয়ে কিছু করেছে ? এই ধম্মোকম্মোগুলো কবে উচ্ছন্ন যাইবে!

হাতমুখ ধুইতে ধুইতে গাড়ীর কথাটা বারবার মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলাম। ত্রিলোচন বললে, সে অনেক লোকের গুরু। উঃ! লোকটা কত লোকের সর্ব্বনাশ করেছে না জানি! পাঁউরুটি-বিস্কুটওয়ালা বা কাঁকড়ার দাড়া চচ্চড়িওয়ালা বামুনের সঙ্গে এই গাঁজাখোর নিরক্ষর বামুনটার প্রভেদ কি ? এরাই ব্যাস বশিষ্ঠের সন্তান বলে পরিচয় দেয়! এরাই লোকের কাণে বীজমন্ত্র দেয়! ব্যাস বশিষ্ঠ!— দূর তোর,—সে ত্যাগ, সে শিক্ষা, সে বিদ্যা, সে পরহিত চিন্তা কোথায় আজ ?

"ও মা! তুমি এসে পড়েছ ? আমি —"

হঠাৎ সম্ভাষণে চমকিত হইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম। গৃহিণী হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া

দালানে প্রবেশ করিতেছেন। বলিলাম, "বাঃ, বেশ যা হোক!"

গৃহিণী সামান্য একটুও অপ্রতিভ হইবার ভাব না দেখাইয়া বলিলেন, "সব গুছিয়ে রেখে গিয়েছিলুম চারটের সময়। ভাবলুম, সন্ধের পর আসে ত, তা খপ করে না হয় বিমলাদিদের ওখান থেকে কথাটা শুনেই আসি। ও আমার পোড়াকপাল! কথা শেষ করতে না-করতেই কথক ঠাকুরের এলো খাঁড়মুখ ভেঙ্গে জর!"

আমি অনুচ্চস্বরে কথক ঠাকুরের এখন মাস দুই তিন একশ আট ডিক্রী জর কামনা করিয়া বলিলাম "তা বেশ হয়েছে। নাও, এখন শর দিকি এইটে—"

পথে হঠাৎ উদ্যতফণা কালসর্প দেখিলে পথিক যেমন চমকিত হয়, গৃহিণী তেমনিই চমকিত হইয়া চিবুকে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়া বিস্ময় ও ঘৃণা-মিশ্রিতস্বরে বলিলেন, "ও মা! কি ঘেন্নার কথা গো! কোথাকার কত আঘাটা কুঘাটা মাড়িয়ে এল পথ বয়ে, বলে কি না ঐ পুঁটুলি ছুঁতে! নাও, পুঁটুলিটা জলে ধুয়ে নাও, তার পর আমি একবার গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে নেব 'খন। বিচার নেই, আচার নেই—"

আমি রহস্য করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, "আর মশাই কোথা হতে এসে ঘরে ঢুকছেন বলুন ত? ওতে বুঝি আঘাটা কুঘাটা হয় না?"

গৃহিণী যে বিলক্ষণ অপ্রতিভ হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু নারীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অদ্ভুত। গৃহিণী তৎক্ষণাৎ কথাটা পাল্টাইয়া লইয়া বলিলেন, "হাঁ গা, বটুদের না কি চাকরী নিয়ে গোলমাল হচ্ছে? ও মা! কি কাল স্বদেশী এল যে—"

আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। এই সমস্ত নিরক্ষরা অশিক্ষিতা গ্রাম্য নারীদিগকে লইয়া যাহাদের অহরহ সংসার করিতে হয়, তাহারা স্বরাজ পাইবার স্পর্দ্ধা করে কিরূপে? তবে একটা কথা, সবাই এমন নহে। এই পার্শ্বের গ্রামেই নারী কর্ম্মীদের কি উৎসাহ, কি আগ্রহ, কি সত্যপ্রাণতা, কি দেশপ্রেমিকতা! দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়

"বলি হাঁ গা, আনমনা হয়ে কি ভাবছ? নাও না খপ করে কাপড়-চোপড় ছেড়ে। হাঁ দেখ, পুঁটুলিটা একবার চুবিয়ে নাও ত জলে। আচ্ছা, না, না থাক সেই ত আবার ঘাটে নামতেই হবে একবার। আমিই নিয়ে যাব 'খন ঘাটে।"

আমি বলিলাম, "এত রাত্তে আবার ঘাটে কি দরকার হলো তোমার?" প্রচ্ছন্ন পরিহাসের ইঙ্গিত গৃহিণী বুঝিলেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি জবাব দিতেও ছাড়িলেন না।

"ঢের দরকার আছে ঘাটে", বলিয়া গৃহিণী নথ নাড়া দিয়া চলিয়া গেলেন। বুঝিলাম, বাহির হইতে রাস্তা-ঘাট মাড়ান কাপড়—সে কাপড়ে পুকুরে ডুব না দিলে ত গৃহিণী শুদ্ধ হইবেন না।

আমি কিছুক্ষণ নীরবে তাঁহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলাম। হউক পল্লীকন্যা পল্লীবধূ, হউক কলেজি শিক্ষায় অশিক্ষিতা, হউক শুচি-বায়ুগ্রস্তা,—তবু, এ রণচণ্ডী ঘরে না থাকিলেও ত ঘর মানইত না মোটেই। ঝগড়াই করি, একাধিকই করি,—তবু, তবু, বাঙ্গালী গরীবের ঘরের এ রত্নের কি তুলনা আছে!

পরদিন রবিবার—বেলায় ভোজন-পর্ব্ব সমাধা হইল। গৃহিণীর হস্তের পাঁচরকম অন্নব্যঞ্জন, সে অমৃতের সহিত যখন চাঁপাতলার বাসায় উৎকলীয় ব্রাহ্মণের পাঁচন-সিদ্ধের তুলনায় কথা মনে পড়িল, তখন আপন-মনেই খানিক হাসিয়া ফেলিলাম। রবিবারে বেলায় ভোজনের আরও কারণ ছিল। ছয় দিন পরে একদিন গ্রামে আসা—গ্রামের পাঁচজনের সঙ্গে

দেখা-শুনা করা—বাঁধা বকুলতলায় হুঁকা হস্তে সকলের সঙ্গে একত্র তৈলমর্দ্দন করা—একত্র সকলের পুষ্করিণীতে সন্তরণস্নান করা,—শনিবারের সহরে কেরাণীবাবুর এ সকল ত লাক্সারি! রাত্রিতে পাড়ার ছোকরাদের এমেচার পার্টিতে গিয়া বেহালায় ছড়ি ঘষাটা কেরাণীবাবুর নৈমিত্তিক।

দরিদ্র কেরাণী জীবনের সারা-সপ্তাহ সাহেবের খিঁচুনী খাওয়ার পর মাত্র এই দুইটি রাত আর একটি দিন! এ সুখ যে হেলায় হারায়, তাদের জন্য বিধাতা কোন্ নরক নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন! বাঙ্গালী জীবনে যত দুঃখ বিপদই সহ্য করুক, কিন্তু বিধাতার আশীর্ব্বাদে গৃহের এ সুখ ও শান্তি যেন চিরদিন তাহার আরও থাকে!

গৃহিণী আমায় বাহিরে যাইতে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বলি, মশায়ের সুড়সুড় করে যাওয়া হচ্ছে কোথায়? গোপাল মুখুয্যের তাসের আড্ডায় বুঝি! বাবা, বাবা! একটা দিন ছুটি তা একটু যদি বিশ্রাম থাকে! একটু গড়িয়েই নাও না আগে, যাবেই ত খেলতে।"

আমি বলিলাম, "আরে, আমার কি অসাধ, ঘরে তোফা আরামে একটু নিদ্রা দিই। এ সুখ ত ক'লকাতায় হবার যো নেই। কিন্তু ওরা যে আমায় স্ত্রৈণ বলবে সবাই!"

গৃহিণী আমার সশব্দ হাসিতে যোগদান করিলেন, বলিলেন, "বলে বলুক গে। এস, একটু শোবে এস, লক্ষ্মীটি! এই নাও, পাণ খাও দিকি।"

অগত্যা একটু গড়াইয়া লইতেই হইল। গৃহিণীকে আহার করিতে বলিলাম। তিনি তাহার জবাব না দিয়া আমার অঙ্গে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "দেখ, আমার ঠাকুর-মশায়ের কাল হয়েছে শুনেছ ত। ও মা! শুনবেই বা কি করে, তুমি রইলে ক'লকাতায়। বুধবার চিঠি পেইছি। এই দেখ না চিঠিখানা, লিখছেন ঠাকুরের পুত্তুর—তিনি যাত্রা করেছেন বাড়ী থেকে—আজকালের মধ্যেই এসে পৌছবেন এখানে।" ঠাকুর ও ঠাকুর পুত্তুরের নামোচ্চারণ-কালে গৃহিণী যে ললাটে যোড়হস্ত স্পর্শ করিলেন, একথা বলা বাহুল্য।

আমার অঙ্গ জল হইয়া গেল! গরীবের ঘরে 'ঠাকুর' নামক জীবের আবির্ভাব ও অধিষ্ঠান—বিশেষতঃ, আমার মত অবিশ্বাসী ম্লেচ্ছের ঘরে—সে কথা থাক। আমার মুখের ভীতত্রস্ত ভাব দেখিয়াই গৃহিণী বোধ হয় অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন, আমি মনে মনে কি ভাবিতেছি। তিনি ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "ও পাঠ ত তোমাদের ঘরে কখনও হ'ল না! কি করি, কাজেই বাবার ঠাকুর-মশায়ের কাছেই মন্তর নিতে হয়েছে। আহা, সাক্ষাৎ দেবতা ছিলেন! এমন নির্দ্দোষ বামুন - বাবার কাছেই শুনেছি, অগাধ পণ্ডিত, কিন্তু কি চমৎকার মাটীর মানুষ!" গৃহিণী উদ্দেশ্যে তাঁহাকে আবার একবার প্রণাম করিলেন।

আমি বলিলাম, "না, না, তা ত নিশ্চয়ই। তিনি মস্ত পণ্ডিত ছিলেন, তা এখানে যতবার এসেছেন সবাই বলেছে।"

গৃহিণী গর্ব্বদৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, "জান, তিনি সেবার মার শূলের ব্যামোর সময় সারা-রাত জপে বসেছিলেন, মার বিছানার শিওরে বসে। ভোরে মার স্বপ্ন হ'ল,—ওষুধ মুঠোর মধ্যে রয়েছে। মা গো! গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে!"

আমি বলিলাম "তা বেশ ত, তাঁর শ্রাদ্ধ, আমাদের যথাসাধ্য দেওয়া-থোওয়া যাবে, তার জন্যে ভাবনা কি? সে হয়ে যাবে 'খন। নাও, যাও দিকি, খেয়ে নাও গে চট করে। আমি এখনই ঘুরে আসছি।"

সন্ধ্যার পর মুখুয্যেদের চণ্ডীমণ্ডপ হইতে তাস

পিটিয়া বাড়ী ফিরিতেছি, এমন সময় হঠাৎ দমকা হাওয়া বহিল। দেখিতে দেখিতে আঁধিতে আকাশ-বাতাস ছাইয়া ফেলিল আমি হনহন করিয়া ছুটিলাম। তেমাথানির বাঁকের মুখে বিদ্যুতের চমকানিতে কোন মতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এমন সময় অপর দিকের পথ হইতে একটা লোক ছুটিয়া আসিয়া আমার উপর সজোরে নিপতিত হইল, 'বাবা রে, গেছি রে!' চিৎকারে স্থানটা ভরিয়া গেল। হাটের ফেরতা একটা লোক মোট মাথায় লইয়া হ্যারিকেন হাতে মোড়ের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সে আলোটা তুলিয়া ধরিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "এ কি ভবদা' না কি? কি, হ'ল কি?"

ততক্ষণ আমি উঠিয়া বসিয়াছি। চাহিয়া দেখি, আমার প্রতিবেশী হারাণ কর্ম্মকার। সে বলিল, "দুজনে ঠোকাঠুকি হয়ে গেছে বুঝি! উঃ! লোকটার কপাল কেটে গেছে দেখছি—তোমার দাঁত ভাঙলো না কি? এস, ওরে তুলি। এখনও গোঁগোঁ করছে।"

হারাণ মোট নামাইয়া লোকটিকে উঠাইয়া দিল, রক্তে তাহার মুখচোখ ভাসিয়া যাইতেছে, আমারও মুখ দিয়া রক্ত গড়াইতেছে, তবে দাঁত ভাঙিয়াছে কি না তখনও বুঝিতে পারি নাই। মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে, ঘনঘন আকাশ ডাকিতেছে, বিদ্যুৎ বিকাশ হইতেছে। সকলে বাড়ীর দিকে চলিলাম। নবাগত লোকটি তখনও কুঁপাইয়া কাঁদিতেছে ও উত্তরীয় দিয়া মুখ মুছিতেছে

হারাণের বাড়ী আগে। সেখানে আমরা উভয়ের আহত স্থান পরীক্ষা করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ লোকটির মুখের দিকে ভাল করিয়া দৃষ্টি পড়াতে আমি চমকিয়া উঠিলাম। কি আশ্চর্য্য! এ সেই না?

আমি শুশ্রূষা না করিয়াই বলিলাম, "কি ঠাকুর, তুমি এখানে?" সে যে গাড়ীর সেই ত্রিলোচন ঠাকুর, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কি অভাবনীয় যোগাযোগ!

ত্রিলোচন আমার দিকে ক্ষণেক ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া বলিল, "মশায়কে ত চিনতে পারলুম না।"

"কি রকম, কাল শিয়ালদার গাড়ীর এক কামরায় চেপে এসেছি—যাক্ এদিকে কোথায়, এ দুর্য্যোগে?"

"দুর্য্যোগ কি আর সঙ্গে এনেছিলুম? আপনিই ত দুর্য্যোগ ঘটালেন। উপরন্তু কপালটা একবারে দেফাঁক করে দিয়েছ বাবু! বামুনের রক্তপাত!"

"তুমিই কোন কসুর করেছ ঠাকুর? দাঁতের পাটি গোটা ত এখনই চকচক করে নড়ছে—"

"আরে, আপনারা বড়লোক—দাঁত গেল দাঁত গজাবে? আর আমরা?—কাল বাদে পরশু বাপের শ্রাদ্ধ—রক্তপাত করলেন আপনি?"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "এঁ্যা! বাপের শ্রাদ্ধ? কিন্তু কাল গাড়ীতে মশায়ের পায়ে চটি দেখলুম যেন মনে হচ্ছে!"

ব্রাহ্মণের মুখ শুকাইল। হারাণ তখন ভিতরে কাপড় ছাড়িতে ও হাটের কেনা মাল বুঝাইয়া দিতে গিয়াছে। ব্রাহ্মণ সভয়ে এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিল, "পালবোশেখী উঠলো আর নাবলো। চলুন, দেবতা ধরে গিয়েছে, এইবার যে যার জায়গায় যাই।"

আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম, যাত্রাকালে উচ্চৈঃস্বরে হারাণকে দ্বাররুদ্ধ করিতে বলিয়া গেলাম।

পথে পড়িয়াই দেখিলাম, দিব্য জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, আকাশে চাঁদ হাসিতেছে, যেন ক্ষণপূর্ব্বে সে ঘনঘটা কোন কালে হয় নাই। ব্রাহ্মণ প্রথমে কথা কহিল, বলিল, "বাবু, পথ চলতে হ'লে কি এসব মানলে চলে? ওসব

আপদ্দম্মো, বুঝলে বাবু? হেঃ হেঃ! বামুন-পণ্ডিতের ছেলে, পূজো আছে, বার-বরতো বার মাস লেগেই ত রয়েছে। ওসব মানতে গেলে আর সংসারে থাকতে হয় না, জঙ্গলে যেতে হয়।"

আমি অনুযোগের সুরে বলিলাম, "তা বলে, বাপ মরেছে,—পায়ে জুতো?"

ত্রিলোচন বলিল, "হেঃ হেঃ! বার মাস পূজো আছে, আর বার-বরতোর জন্তে যদি আগের দিন সব সময়ে আলোচাল কাঁচকলার হবিষ্যি ঠেলতে হতো, তা হ'লে আর বাড়ী বাড়ী নিত্যি পূজো করতে হতো না।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "এঁ্যা! তবে কি কর ঠাকুর? পোলাও কালিয়ে খাও না কি?"

ত্রিলোচন বলিল, "না, তা না, তবে দিব্যি ভাত মাছের ঝোল খেয়ে—বুঝ্‌লে কি না বাবু—পরের দিন তিলক-চন্দন কেটে যাই—হাঃ হাঃ হাঃ! যাক গে, বাবুর আসে টাসে? বিষ্টিতে গাটা কালিয়ে গেল। চড়াই এক ছিলিম, কি বল? এস, বোসো না এই সাঁকোটার ওপর।"

আমি আর্দ্রবস্ত্রে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলাম, তথাপি এই গাঁজাখোর বামুনটাকে বিদেশে বিভূঁয়ে একলা ফেলিয়া চলিয়া যাইতে মন সরিতেছিল না। আমি বলিলাম, "চড়াও তুমি। কোথায় এসেছ বল্‌লে না ত?"

ঠাকুর তখন হাতের তেলোর মাল ডলিতেছিল। সেই দিকেই তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। সেই অবস্থায় থাকিয়াই সে বলিল, "শিষ্যির বাড়ী।"

"ও হো হো! গাড়ীতে ঐ ভাবের কি একটা কথা বলেছিলে বটে। তা, কোথায়, এই গাঁয়ে, না ভিন্ গাঁয়ে?"

"এইটে ত—? আমায় ত এই গাঁয়ের কথাই বলে দিয়েছিল।"

"বটে, তা কার বাড়ী?"

"ভবতারণ মিত্তিরস্য—তস্য পত্নী জীবনতারা দাস্যা গুরু অহং—"

আমি লাফাইয়া উঠিলাম। এঁ্যা! এই জীবনতারার গুরুপুত্র?—গুরুঠাকুর? এমন বাপের এমন সন্তান? সমস্ত অন্তরটা রিরি করিয়া উঠিল।

আমি ক্ষণকাল নীরবে রহিলাম। তাহার পর বলিলাম, "ঠাকুর, আমিই ভবতারণ।"

তখন ত্রিলোচনের মুখখানাতে যে ভাবের অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিল, তাহা সুনিপুণ চিত্র-শিল্পীর তুলবার যোগ্য বটে। ব্রাহ্মণ প্রায় কাঁদ-কাঁদভাবে আমার পায়ে ধরিতে উদ্যত হইল। আমি বলিলাম, "ছি, ছি, কর কি ঠাকুর, তুমি না বামুন? চল, কিছু বলবো না বাড়ীতে।"

বেচারার তখন যেন ধড়ে প্রাণ আসিল। যখন বাড়ী গিয়া বিন্দুর মাকে আলো আনিতে বলিলাম এবং সেই আলোকে ত্রিলোচনের সর্বাঙ্গ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলাম, তখন দেখিলাম, তাহার গলায় কাছা, হাতে কুশাসন! চমৎকার!

মনে পড়িল, অফিসের বড়বাবুর এটর্ণি ভগিনীপতির কথা। একবার বড়বাবুর কাযে এই এটর্ণিবাবুর আফিসে যাইতে হইয়াছিল। প্রায়ই এমন যাইতে হইত। এটর্ণিবাবু আমায় খুব চিনিতেন। যখন সেখানে পৌঁছিলাম, তখন টিফিনের সময়। আমি তাঁহার প্রাইভেট রুমের বাহিরে খাস বেহারাকে টুলে বসিয়া থাকিতে না দেখিয়া সরাসরি ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম, জরুরী কায। ঢুকিয়াই অপ্রতিভ, তিনিও তাই। পাঁচ সাতদিন আগে বাবুর মাতৃ-বিয়োগ হইয়াছিল। বাবু কচ্ছ তোফা টেবিলে কাঁটা-চামচ ধরিয়া কাউলের কাটলেট ও ডাক্‌-রোষ্টের সেবা করিতেছেন—গলায় কিন্তু কাছা ঠিকই আছে!

তিন

সেদিন সন্ধ্যার পর যখন আমি আর্দ্রবস্ত্র ছাড়িয়া দরদালানে উপস্থিত হই, তখন এক কাণ্ড দেখিয়া আমার চক্ষু স্থির! দেখি, গৃহিণী গুরু-পুত্রের পদধৌত করিয়া দিয়া আপনার আজানু-লম্বিত কুঞ্চিত সুচিক্কণ কেশগুচ্ছের অগ্রভাগ দিয়া মুছাইয়া দিতেছেন! আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তখনই একটা অনর্থ ঘটিয়া যাইত, ভাগ্যে ত্রিলোচনই সামলাইয়া লইল, সে আমায় আসিতে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি পাদদ্বয় সরাইয়া লইয়া ভীত-চকিতস্বরে বলিল, "কর কি মা, কর কি মা! ও আমিই সেরে নিচ্ছি মা লক্ষ্মী!" তাহার পর আমার দিকে সরিয়া আসিয়া কাতর-মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "হে, হে, বাবু বুঝি? তা, বড্ড ভিজেছেন জলে, একটু চা-টা করে,—"

আমি তাহার অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম, এ জগতে মানুষ চেনার মত শক্ত কায আর কিছু নাই!

যথাসাধ্য গুরুঠাকুরের শ্রাদ্ধে সাহায্য করিলাম। তিনি পুণ্যাত্মা পণ্ডিত লোক, তাঁহার আত্মার সদ্গতির কল্যাণে যাহা কিছু দেওয়া যায়, অপব্যয় হইবে না, এ বিশ্বাস আমার ছিল। তাহার উপর গৃহিণীর অনুরোধ। সংসারে দেবা—আর দেবী, ছেলে নাই, পুলে নাই,—এ অনুরোধ না রাখিবার কারণই কিছু ছিল না।

ইহার পর কয়েক মাস অতীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে গুরুঠাকুরের বিশেষ কোন সাড়াশব্দ পাই নাই।

শনিবার বাড়ী যাইব, হঠাৎ শুক্রবার বাড়ীর চিঠি আসিয়া হাজির। গৃহিণী লিখিয়াছেন, "কালকাতায় কেমিকাল সোণার গয়না পাওয়া যায়, এক সেট এনো, অতি অবিশ্যি, আমার মাথা খাও! সোমবার বিরজা দিদির মেয়ের বিয়ে, যেতেই হবে সেখানে নেমন্তন্ন রাখতে।"

অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। সারা-রাত্রি কথাটা মনে মনে তোলাপাড়া করিলাম, ব্যাপার কি? গরীবের ঘরে চলনসই আটপৌরে গহনার অভাব ত গৃহিণীর নাই, বরং তাহারও উপরে তাঁহার মাতামহীর প্রদত্ত দুই চারিখানা দামী অলঙ্কারও আছে। তবে? কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না।

বাড়ী পৌঁছিয়া যখন সকল রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হইলাম, তখন ভাবিলাম, কে বলে হিন্দুধর্ম্ম কলিকালে ত্রিপদ হারাইয়া এক পদে দাঁড়াইয়াছে? এ যে দেখিতেছি, বরং চারিপদের স্থলে আরও একপদ বৃদ্ধিই হইয়াছে! কি তোফা মাথা খেলান! ফরাসীদেশের আপাচি অথবা মার্কিন মুলুকের ক্রুক কোথায় লাগে এ দেশের ধড়িবাজ জুয়াচোরের কাছে

ব্যাপারটা এই। মাঝে গৃহিণীর গুরুপুত্র বা গুরু সেই ত্রিলোচন সস্ত্রীক গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে এই গরীবের আস্তানায় পদধূলি দিয়াছিলেন। দুই দিন উভয়ে চর্ব্বচোষ্যলেহ্যপেয় ভোগ করিয়া গৃহ প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে গুরুপুত্রবধূঠাকুরাণী আমার পত্নীর অলঙ্কারগুলির অশেষ প্রশংসা করিয়া এক-একখানি করিয়া খুলিয়া লইয়া আপনার বরঅঙ্গে ধারণ করিয়া আমার পরম ভাগবত পত্নীকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

গৃহিণী সমস্ত দিন মুখ ফুটিয়া বলি বলি করিয়াও শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অলঙ্কারগুলি প্রত্যর্পণ করিতে বলিতে পারেন নাই। কিন্তু গুরু-দম্পতি গোযানে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বিন্দুর মা আর থাকিতে পারে নাই। সে বলিয়াছিল, "ঠাকরুণ, গয়নাগুলো?"

ঠাকরুণের হইয়া ঠাকুর জবাব দিয়াছিলেন, "বল কি মা, সাক্ষাৎ দেবতার গায়ে যা চড়েছে,

তা কি আর কাউকে পরতে আছে? তখনই যে সাপ হয়ে কামড়াবে ওরা? হেঃ হেঃ!"

ব্যস! ঐ পর্য্যন্ত। বিন্দুর মা একটা হৈচৈ করিতে গেলে গৃহিণী বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন, "ছিঃ! বিন্দির মা! তুচ্ছ ইহকালের জন্তে কি পরকালের খোয়ার করবো?"

তা ত বটেই! তবে দুঃখ এই, ইহকালের জন্ত যাহাকে সপ্তাহের ছয় ছয়টা দিন মেসের ছারপোকার কামড়ে রাত জাগিয়া, উৎকলীয় ব্রাহ্মণের পাঁচন-সিদ্ধ গলাধঃকরণ করিয়া, আর সাহেবের ও বড়বাবুর খিঁচুনি বেমালুম হজম করিয়া প্রফুল্লচিত্তে প্রবাস বাস করিতে হয়, তাহাকে পরকালে তুলিয়া লইবার পূর্ব্বে গৃহিণী একবার পরামর্শ করাটাও প্রয়োজন মনে করিলেন না!

এই মেকির যুগে গরীব কেরাণীর জীবন যে আসিতে যাইতে শাঁকের করাতে কাটা পড়ে, কয়জন তাহার খবর রাখেন?



গল্পের শাসন

শ্রী নীলমণি চট্টোপাধ্যায়, বি-এ

ক

মহা আড়ম্বরে কেশব ঘোষালের রাসবাড়ী সাজান চলিয়াছে,—তাহারই মাঝে ক্ষুদ্র ইঁদুরের মতই সেই শীর্ণ কাল মেয়েটি অবাক্‌ হইয়া রঙ্গীন কাগজের শ্রাদ্ধ দেখিতেছিল। কোথা হইতে এক টুকরা লাল কাগজ অসহায়ের মত উড়িয়া আসিয়া তাহার চরণে লুটাইল,—সাগ্রহে কুড়াইয়া সেই বহুমূল্য সংগ্রহটিকে বালিকা পাট করিতেছিল, এমন সময় রাসবাড়ীর তের বৎসরের খোকা অমরনাথ আসিয়া তাহার অসহায় পৃষ্ঠ যথাশক্তি আঘাত করিল। অমরনাথের অমরত্বসূচক গঠন নাই সত্য, কিন্তু বিদ্রুধের একটা দুর্দ্দান্ত প্রভাব ত আছেই,—বালিকা ব্যথায় ও লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

এতবড় আঘাত করিয়াও বালক ক্ষান্ত নহে, সে চক্ষু পাকাইয়া বলিল, "কেন কাগজ চুরি করেছিস্‌ ?"

লজ্জা ও ব্যথাকে ঠেলিয়া একটি দুর্ব্বল প্রতিবাদ তাহার ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়াই ফিরিল—সে ত চুরি করে নাই।

কিছুদূরে রোয়াকের উপর অমরনাথের ঠাকুরমা ছিলেন। ব্যাপারটি ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহার অগোচর রহিল না, তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ডাকিলেন, "খোকা !"

চকিত হইয়া খোকা ঠাকুরমার নিকট ছুটিয়া গেল। বালিকাও বাঁচিল।

কিন্তু আবার ঠাকুরমা যে তাহাকেও ডাকিয়া বসিলেন, এইবার বুঝি তাহার নিস্তার নাই!

ঠাকুরমা বলিলেন, "আয় ত মা এদিকে।"

একটা মমতার আশ্বাসে সে ধীরে ধীরে ঠাকুরমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সস্নেহে ঠাকুরমা বলিলেন, "খুব লেগেছে বুঝি ?"

সজলদৃষ্টি ঠাকুরমার মুখে নিবদ্ধ করিয়া বালিকা জানাইল—না, তেমন লাগে নাই। ঠাকুরমা সমবেদনা প্রকাশ করিয়া অমরনাথকে ভৎসনা করিলেন—"এই ছোট মেয়েটির উপরও গুণ্ডামি করেছ—ছিঃ !"

ইতিমধ্যে অমরের দিদি দুর্গা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি করেছে ঠাকুরমা ?"

ঠাকুরমা বালিকার প্রতি ইঙ্গিত করিলেন, "একে উনি মেরেছেন।"

অমরনাথ দিদির সমর্থনলাভের আশায় বলিল, "ও যে সাজাবার কাগজ চুরি করেছিল।"

বালিকার কাতর-দৃষ্টি দুর্গার দিকে ফিরিল, কিন্তু দুর্গা ভ্রাতার পক্ষই অবলম্বন করিয়া বলিল "কেন তুই চুরি করেছিলি ?"

তীব্র কটাক্ষে বাধা দিয়া ঠাকুরমা বলিলেন, "তুই কি খুকি না কি ?"

পঞ্চদশবর্ষীয়া অবিবাহিতা দুর্গা মনে মনেই চটিল, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ করিতে পারিল না।

ঠাকুরমা বালিকার হস্তে কিছু মিষ্টান্ন দিয়া মিষ্টবচনে বিদায় করিলেন।

ঠাকুরমা হইয়া এতটা অপমান! অমরনাথ রাজ্যের অভিমান টানিয়া আনিল। অত সাধ্যসাধনা করিয়া সেদিন তাহাকে ভাত খাওয়ান হইল। অবশ্য ঠাকুরমাই খাওয়াইলেন।

খ

ঠাকুরমার বিপক্ষে অভিমান যে বেশীক্ষণ টিকিতে পারে না। এক শয্যায় শয়ন, তাহার

উপর ঠাকুরমার গল্প যে ঘুমের ঔষধ। রাত্রে যখন ঠাকুরমা ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন দুর্গা ও অমর জাগিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মুখ যে গম্ভীর—কি করিয়া গল্পের কথা বলা যায়।

চতুরা দুর্গা বলিল, "ঠাকুরমা, তোমার এত দেরী হ'ল ?"

ঠাকুরমার গাম্ভীর্য্য টুটিল,—তিনি বলিলেন, "তোরা কি এখনও জেগে আছিস্ ?"

এইবার অমরনাথ সাহস করিয়া অর্থপূর্ণ উত্তর দিল, "হুঁ।"

দুর্গা আত্মসম্মান বাঁচাইবার জন্য অমরের উদ্দেশ্যে বলিল, "আমার গা ঠেল্‌লে কি হবে, ঠাকুমাকে বল্ না।"

এইরূপ মিথ্যা দোষারোপের প্রতিবাদ করিয়া অমরনাথ জানাইল, সে দিদির গা ঠেলে নাই।

সহাস্যে তাহাদের থামাইয়া ঠাকুরমা বলিলেন, "তোদের খোসামোদের লোভ আমার নেই, কিন্তু রাত যে অনেক হ'ল।"

দুইজনেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল "তা হোক্, তুমি বল।"

ঠাকুরমা আরম্ভ করিলেন,...

"সে এক অনাথা মেয়ে, আগেই বাপকে হারিয়েছিল। যখন তার মা তাকে ছেড়ে চলে যায়, তখন তার বয়স দেড় বছর, চোখের জল মুছিয়া তার মামী তাকে বুকে তুলে নিয়েছিল। তারপর থেকে মামার বাড়ীতেই সে মানুষ হয়। তার মামা কিন্তু সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি মামীকে প্রায়ই বল্‌তেন, 'ভাতকাপড়ের কথা নয়, ও একটা দায় তা জান কি ?' মামী এসব কথা সইতে পারতেন না, বল্‌তেন, 'দায় হলেই বা কি হচ্ছে। তেমন যদি সঙ্গতি না হয়ে ওঠে, তা হ'লে না হয় আমার যা কিছু আছে তাই দিয়েই দেব।' এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে একটু রাগারাগিও হত। সেই অনাথা মেয়েটি এইসব শুন্‌ত আর আড়ষ্ট হয়ে থাকত। মামী মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বল্‌তেন, 'তোর মার কাছে যেতে পারিস্ না! আমিও তা হ'লে নিশ্চিন্ত হই।' তারপর পিছন ফিরে ভাঙ্গা গলায় আপন-মনেই বল্‌তেন, 'হাস—হাস, ঠাকুরঝি স্বর্গে বসেই হাস।' মেয়েটার মুখ বুক শুকিয়ে উঠত।

"এমনি করে দিন কেটে যায়। ক্রমেই তার বিয়ের সময় হ'ল। তার কিন্তু রূপ ছিল না, তবুও সকলে বল্‌ত 'রূপ নাই থাকুক, শ্যামবর্ণের ওপর থাট থাট গড়ন, মুখখানি বেশ ঢলঢলে—চটক আছে কিন্তু।' যাই হোক্ মেয়েটির বিয়ে-ভাগ্য ভাল। তাদের পাশের পাড়ার একটি ভাল ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হ'ল। তারা একটি পয়সা নিলে না বলে মামাও সন্তুষ্ট হলেন।

"তার শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা সচ্ছল ছিল না, তবে গ্রামে থাক্‌লে একরকমে দুটি খেয়ে পরে চলে যায়। যখন মেয়েটির বিয়ে হয়, তখন তার স্বামী 'ল' পড়ে। 'ল' পাশ দেবার পর তার স্বামী কোলকাতায় এসে ওকালতি কর্‌ত, আর সেই বছরেই তাদের একটি খোকা হ'ল! আহা! ছেলের কি রূপ! অমন মায়ের অমন ছেলে, যেন গোবরে পদ্ম ফুলটি! তাদের দুঃখ হ'ত যে, তারা গরীব—ছেলেকে খাইয়ে-পরিয়ে তাদের আর আশ মেটে না। খোকাকে ছেড়ে কিন্তু তার স্বামী থাকতে পারত না। শেষে তারা তিন জন কোলকাতায় এল। দেশের বাড়ীতে রইলেন বুড়ী পিসীমা।

"কোন দিক দিয়েও নতুন ওকালতিতে সুবিধা হ'ল না। দেশেও এমন কিছু নেই যাতে কোলকাতার খরচ চলে যায়। ক্রমেই সংসার চলা ভার হ'ল। বাড়ীওয়ালা তুলে দিতে চায়, মুদির কাছেও বাকি অনেক। স্বামীর মুখে হাসি নেই, অমন সোণার চাঁদ ছেলে যেন দিনে দিনে কালমূর্ত্তি হয়ে গেল। সব চেয়ে মেয়েটার কষ্টই বেশী তাদের না খাইয়ে ত খেতে পারে না। সে ঠিক কর্‌লে, মামীকে লিখবে, কিন্তু স্বামীকে

না জানিয়েই বা লেখে কেমন করে। একদিন সে স্বামীর কাছে কথা পাড়লে স্বামী মুখভার ক'রে বল্লেন—'উচিত নয়।' মেয়েটির মুখ শুকিয়ে গেল। এদিকে দুঃখের আর সীমা রইল না।

"সে যে খেত না, একথা তার স্বামীর কাছে গোপন রইল না। তারপর থেকে তার স্বামী অপর যায়গায় খেয়ে এসে বাড়ীর খাবার তাকেই জোর করে খাওয়াত। কিন্তু তার স্বামীর অপর যায়গায় খাওয়ার কথা সত্য নয়, আর কেই বা খেতে দেবে। একথা মেয়েটি আগে জানতে পারে নি। ঘুম নেই, খাওয়া নেই, ভাবনায়-চিন্তায় যখন তার স্বামী শয্যাশায়ী হ'ল, তখন সব কথা প্রকাশ হয়ে পড়ল,—কিন্তু তখনও সে অতটা সর্ব্বনাশের কথা ভাবে নি।"

দুর্গা বলিল, "ও কি ঠাকুরমা, তোমার গলা ওরকম হ'ল কেন?" সামলাইয়া লইয়া ঠাকুরমা বলিলেন, "কি আবার হবে, শোন বলি।"

"তার বড় যত্নের ছোট ছোট দু'-চারখানি গয়না সে চোখের জলেই বিদায় করলে, কিন্তু তাতেও যে অভাব মেটে না, আগুনে ঘি পড়ার মত কেবল দাউদাউ করেই ওঠে। সে তার মামীকে স্বামীর অসুখের কথাই লেখে, অভাবের কথা জানায় না। তবুও একবার তার মামা এসে তাকে দশটি টাকা দিয়ে গেল। তার স্বামী বল্লে, 'কেন নিলে?' দশ টাকার নোট-খানা তার মুঠোর ভেতর যেন জ্বলে উঠ্‌ল,—শেষে খোকার হাতে সেই নোটখানার শেষখশা ঘট্‌ল। তারপর থেকে আর সে মামীকে চিঠি লিখত না।

"একদিন সন্ধ্যাবেলা তার স্বামী খেতে চাইলেন। কি দেবে সে! একটা পুরাতন বিস্কুটের টিনে মুড়ি থাক্‌ত, ঝেড়ে দেখলে কিছু নেই, একটু গুঁড়োও পড়ে নেই। প্রাণটা তার হাউহাউ করে কেঁদে উঠ্‌ল! একখানা কানচটা কাঁচের ডিশ, একটা হাতল ভাঙ্গা পেয়ালা, আর একটা পেতলের ফাটা বাটি—এই বাসনই তো শেষ সম্বল! এর কোন্‌টি কে কিন্‌বে? একটি বুড়ী ঝি ছিল, সে ইদানী মাহিনা নিত না। তার স্বামীকে সে ছেলের মত ভালবাসে। কিন্তু সেও আজ তিনদিন অসুখ ক'রে বাড়ী চলে গেছে। তখনও রাত্রি হয় নি, তবুও অন্ধকারটাকে যেন ডেকে আনবার জন্যই রাস্তার আলো জ্বালা হয়েছে। দাঁতে ঠোঁট চেপে সে একটা মতলব ঠিক করলে, তার-পর ঘুমন্ত স্বামীর মুখ পানে চেয়ে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। দরজার বাহিরে ছেলে আবদার ধরলে, 'আমি যাব।' সে খোকার মুখে হাত দিয়ে বল্লে, 'চুপ কর বাপ।' কিন্তু খোকাকে যে নিয়ে যাওয়া যায় না। বড় বড় দোকানগুলোর যে আলো! খোকা হয় তো চেঁচামেচি ক'রে তাকে বেআবরু করে দেবে! রাস্তার খাবারের দোকানের কাছে হয় ত ভূতের মত তাকিয়ে থাকবে। এ গুলো না হয় সামলান যায়, কিন্তু ও যে তার কালামুখী মার ভিক্ষা করা দেখ্‌বে!! সে আঁচলে চোখ মুছে খোকাকে ভুলিয়ে বল্লে, 'খোকন,—আমি তোমার জন্য খাবার আনতে যাই বাবা—তুমি ঘরে বোসো। যেন গোলমাল কোরো না,—ওঁর অসুখ করেছে।'

"ঝনাৎ করে সদর দরজা বন্ধ হ'ল! সে রাস্তায়! পা টলে উঠ্‌ল—বুক কেঁপে উঠ্‌ল! সে টলতে-টলতেই বড় রাস্তায় এসে পড়ল। সামনেই একখানা মোটর গাড়ী! ড্রাইভার চোখ রাঙ্গিয়ে উঠ্‌ল। গাড়ীতে কর্ত্তা, গিন্নী আর তাঁরই মত একটি ছেলে। কর্ত্তা বললেন, 'চাপা পড়্‌ল নাকি?' গিন্নী ঘাড় কাত ক'রে দেখলেন, ছেলেটা অবাক! গাড়ীটা চলে গেল।

"ঐ যে একটা কাণা পা ঘসে ঘসে এগিয়ে চলেছে—রাস্তার পাশেই একটা খোঁড়া; মাথা

দুলিয়ে ভিক্ষা চাইচে—ঐ যে ছেলেটা নাকিসুরে বল্‌ছে, 'একটা পয়সা।' আজ সে তা হ'লে তাদের দলেরই একজন! ওকথা সে ভাবতে পারে না যে !!

"সে দেখলে একজন বুড়ো ভদ্রলোক আস্‌ছেন। ওঁর কাছে চাইতে দোষ কি? কিন্তু কি করেই বা চাইবে? ওই ছেলেটার মত? বুড়ো লোকটা ততক্ষণ এগিয়ে এসেছে। সে বলে ফেল্‌লে, 'বাবা একটা পয়সা।' বুড়ো হাত নেড়ে বল্‌লে, 'যাঃ যাঃ, বিরক্ত করিস নি! মাগো !!! ও গো, না—সে আর ভিক্ষা কর্‌তে পারবে না।

"হঠাৎ একটা লোক তার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল,—ছিঃ, তার গায়ে কি গন্ধ! সে কথা টেনে টেনে বল্‌লে, 'রাস্তায় কেন বাবা?' মেয়েটি ভয়ে পিছিয়ে গেল। লোকটার জামার বোতামে গোটাকতক ফুল যেন লজ্জায় মুখ লুকিয়ে রয়েছে।

"আহা রাগ কর কেন? এই নাও একটা টাকা নাও', বলে লোকটা তার কাপড়ে একটা টাকা ছুঁড়ে দিয়ে গেল। টাকাটা কাপড়ের ভাঁজে আটকে রইল। অনেকক্ষণ সে চুপ করে দাঁড়িয়ে কত কি ভাবলে, তারপর টাকাটা জোরে মুঠো করে নিয়ে চোরের মত চল্‌ল।"

গ

"তখন রাত্রি আটটা হবে। সমস্ত বাড়ীখানা যেন ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধ। বাইরের দরজা খুলতেই তার গা ছম্‌ছম্‌ ক'রে উঠ্‌ল, মনে হ'ল যেন অন্ধকারটার হাত-পাগুলো গায়ে এসে ঠেকছে! সে চুপ করে শুনলে তার স্বামী জেগে আছে কি না। কিছুই শোনা যায় না। হাতড়ে হাতড়ে সে একটুকরো মোমবাতি জ্বাল্‌লে।

"তার স্বামী একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রয়েছে, মাথায় হাত দিয়ে সে বল্‌লে, 'তোমার জন্ত আঙুর আর মিছরি এনেছি, এইবার তোমায় খেতে দেবো। তাড়াতাড়ি ঠোঙ্গা থেকে দু'টি আঙুর নিয়ে স্বামীর অসাড়মুখে নিঙড়ে দিয়ে বল্‌ল, 'খাও,—ও কি, মুখ বুজে খাও, দেরি হয়েছে বলে রাগ করেছ বুঝি? আর কখন দেরি হবে না, খাও। কেন? অমন ক'রে একদৃষ্টে চেয়ে আছ কেন?' কি হ'ল! নিশ্বাস পড়ে না যে !! মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত তার ঝিমঝিম করে উঠ্‌ল,—সে মেঝেতেই লুটিয়ে পড়ল! যখন সে চোখ চাইলে তখন খোকা আলোর কাছে বসে আঙুরগুলি খাচ্ছে। তার একবার উঠ্‌তে ইচ্ছা হ'ল,—কিন্তু সমস্ত শরীরটা যেন পাথরের মত ভারি! পেটটা জ্বালা করে উঠ্‌ল,—সে হাত পেতে বললে, 'খোকন, আমাকে দু'টি দে বাবা।' খোকা তার হাতে দু'টি আঙুর দিলে।

"খোকন আঙুর শেষ করে মিছরি ধরেছে। সে আঙুর চিবিয়ে বললে, 'ও কি রে হতভাগা,—সব খেলি!—কাল উনি কি খাবেন বল দেখি!' হঠাৎ তার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠ্‌ল!"

সহসা অমর বলিয়া উঠিল, "উঃ! ছেলেটা কি রাস্কেল!"

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে ঠাকুরমা বলিলেন, "বল্‌তে নেই ভাই,—সে যে তোমার বাবা হয়!"

বিস্মিত আতঙ্কে উঠিয়া বসিয়া তাহারা দেখিল,—অশ্রুজলে ঠাকুরমার বক্ষ ভিজিয়া গিয়াছে।

ঘ

সে রাত্রিতে অমরনাথের অতিকষ্টে অল্প ঘুম হইল, তাহাতেও সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল,—যেন একটা পথের ধারে তাহার ঠাকুরমা ও তিন বৎসরের ছেলের মত তাহার পিতা এবং তাহাদেরই পার্শ্বে সেই শীর্ণ কাল মেয়েটি! তিনজনেই যেন বলিতেছেন, "আমাদের মের না,—দেখ দেখি, কি রকম মেরেছ।" তাঁহারা পিছনে ফিরিয়া

দাঁড়াইতেই অমরনাথ দেখিল তিন জনের পৃষ্ঠেই পাঁচ আঙ্গুলের চিহ্ন!

"ও গো, না গো, আর আমি কখন এমন কাজ করব না!" বলিয়া অমরনাথ ঘুমের ঘোরেই চিৎকার করিয়া উঠিল।

ঠাকুরমা তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া অমরনাথকে জাগাইলেন। দুর্গাও উঠিয়া বসিল।

ঠাকুরমা বলিলেন, "কি হয়েছে অমু, তুই অমন করলি কেন?"

নিদ্রাজড়িত-কণ্ঠে সে স্বপ্নের কথা বলিল। ঠাকুরমার মুখে ম্লানহাসি খেলিয়া গেল।

অমরনাথ সভয়ে ঠাকুরমার পিঠ দেখিতে চাহিল। ঠাকুরমা হাসিয়া বলিলেন, "সে এতক্ষণ মিলিয়ে গেছে,—তুই ঘুমো।"



চোখের আলো

শ্রী বৈদ্যনাথ বন্দোপাধ্যায়, বি-এল

নিরঞ্জন বড় হয়—কিন্তু তার চোখের আলো জন্মাবধিই নিবানো।

পিয়ারী কাঁদে—বলে "হা ভগবান্‌!" সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা—একেও এমনি করলে!

নিরঞ্জনের জন্ম ইতিহাসের কথা পিয়ারীর মনে পড়ে! বাইজীর মেয়ে সে, তাকে নিয়ে দু' জনের ঝগড়া।

একজন বলে "শহরে আমার এতবড় দোকান, এত পয়সা—পিয়ারী আমার।" আর একজন বলে "সত্যি নাকি, হোক দিকি পিয়ারী তোর—ওকে তা হ'লে দেখে নেবো না।"

প্রায়ই এমনি চলে।

সেদিন রাস্তায় দু'জনের দেখা, রাত্তিরবেলা। একজন বলে "আজ এই রাতের আঁধারে আমাদের একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক—পিয়ারী কার?"

আর একজন বলে "মন্দ কি।" তারপর তুমুল হাতাহাতি।

পরদিন রাস্তায় পড়া এক অন্ধকে লোক হাসপাতালে নিয়ে যায়,—ক্ষত সারে, তবে চোখের জ্যোতি ফেরে না। কিন্তু গোল বাধে পিয়ারীর বাড়ী। পিয়ারীর মা বলে "মুখে আগুণ, দূর করে দে, কানা রঞ্জার জন্তেই এত।"

পিয়ারী বলে "বেশ তা তোর কি? সেই কাণাকে নিয়েই থাকবো আমি। আমার খুসী।"

পিয়ারীর মা বলে "যেয়ো তা হ'লে আমার বাড়ী থেকে।"

পিয়ারী বলে "তাই যাচ্ছি। ভয় নাকি?" পিয়ারী রঞ্জনের হাত ধরে বেরিয়ে পড়ে—কোথায় —তা সে নিজেই জানে না।

রঞ্জন বলে "পিয়ারী, তোমায় কষ্ট হবে, আমার কাছে। থাকবি কোথা? ঘর আছে কি?"

পিয়ারী বলে "কেন গাছতলায়?"

রঞ্জন আর কথা বলতে পারে না।

পিয়ারী যায় ভিক্ষে করতে, সারাটিদিন। সন্ধ্যা হয়, পিয়ারী ফেরে।—তারপর দুটো ফুটিয়ে নেয় দু'জনের মত।

দিন যায়।

রঞ্জন বলে "পিয়ারী, ছেলের মা তো হলে—খাওয়াবে কে?" বাপ তো কাণা।"

পিয়ারী বলে "সে ভাবনা তোমার কেন? যে সবাইকে খাওয়ায় সেই খাওয়াবে।"

রঞ্জন তার ছেলের নাম রাখে—নিরঞ্জন।

পিয়ারী হাসে, বলে "মনের মত নাম হয়েছে বটে!"

তাদের সুখের কল্পনার জের কিন্তু বেশী দিন চলে না। ওপার থেকে রঞ্জনের ডাক পড়ে।

যাবার সময় সে বলে "পিয়ারী, এতদিন মরাই ছিলাম—বাঁচবো এইবার। কি বলো?"

পিয়ারীর চোখ ছল্‌ছলিয়ে আসে—নিরঞ্জনকে কোলে তুলে চুমু খেয়ে সেটা সামলে নেয়।

লোকে বলে "ছেলেটার দৃষ্টি খারাপ—বাপ-খেকো।"

নিরঞ্জনের কিন্তু হুঁসপবন নেই—সে আপনায় গানে আপনি মত্ত।

একদিন এক ভিখারী আসে তাদের পাড়ায়। তার গান শুনতে নিরঞ্জন ছুটতে যায়। হোঁচট

খেয়ে রক্তারক্তি। ভিখারী বলে "আহা ছেলেটী বুঝি দেখতে পায় না গা।"

পিয়ারী বলে "চুপ করো বাছা, শুনতে পাবে। কি করবো সবই ভাগ্যি।"

নিরঞ্জন বলে "হ্যাঁ মা,আমি বুঝি দেখতে পাই না—কাণা ?"

পিয়ারী বলে "কেন পাবে না—বালাই !"

নিরঞ্জন বলে "না মা, তা হ'লে দেখতে পেতুম একটা পাথর আছে দোর গোড়ায়। হোঁচট খেতুম না।—কৈ, তুমি তো হোঁচট খাও না।"

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভিখারী বলে "আহা, বাছা রে আমার—মরে যাই।"…

নিরঞ্জন দুষ্টুমি করে ছোটাছুটি করে, আর পড়ে। পিয়ারী ছুটে গিয়ে কোলে নেয় আর কাঁদে।

নিরঞ্জন বলে "আমার চোখ কবে ভাল হবে মা ? তা হ'লে আর এমনি করে পড়বো না।"

পিয়ারী আঁচলে চোখ মোছে আর বলে "হবে বাবা, ভাল হবে বৈকি—ভগবান…"

* * * *

নিরঞ্জন গান করে—অতি সুন্দর গলা। পাড়ার লোক বলে "শিখলো কোত্থেকে এতটুকু বয়সে।"

পিয়ারী বলে "কি জানি।"

নিরঞ্জন বলে "মা এইবার আমার চোখ ভাল হচ্ছে, আকাশ, বাতাস, বন, মাঠ, চারদিক আমার গানের ভিতর দিয়ে দেখা দিচ্ছে।" তার পর সে গান ধরে। গানের অর্থ সুরের ভিতর দিয়ে মূর্ত্ত হয়ে উঠে। পিয়ারী অবাক হয়ে শোনে।

নিরঞ্জনের গানের সুখ্যাতি চারিদিকে। লোকের ভিড় লাগে তার গান শোনবার জন্যে।

কেউ বলে "কি মিষ্টি গলা !"

কেউ বলে "কি সুন্দর গান !"

আবার কেউ বলে "কিছু না,—সবই বাজে—খালি চোখ বুঁজে রোজগারের ফিকির !"

একটি মেয়ে নাম তার নীলা। সে চুপটী করে সারাটীদিন গান শোনে,—রোজ।

একদিন গান শেষ হয়—সবাই চলে যায়। নীলা যায় না।

পিয়ারী বলে "খুকী বাড়ী যাবে না, রাত হলো যে।"

নীলা বলে "না।"

পিয়ারী বলে "থাকবে কোথা ?"

নীলা বলে "তোমার কাছে।"

পিয়ারী বলে "দূর পাগলি—তা কি হয়—বাড়ীতে ভাববে যে।"

নীলা বলে "ভাববে কে ? বাবা মা মারে,—মদ খেয়ে।"

নিরঞ্জন বলে "আহা থাক মা ও আমাদের কাছে।"

নীলা থেকে যায়।

* * * *

অনেক দিন পরে।

পিয়ারীর ভোমর-কালো মাথার চুল শোনের দড়ি হয়ে আসে। নীলার অঙ্গে রূপ ধরে না।

খবর এলো এক ফকির এসেছে। সে না কি লোকের চোখ সারায়। নীলা নিরঞ্জনকে বলে "চলো না একবার দেখিয়ে আসি।"

নিরঞ্জন হাসে—বলে "একি সারবার !"

নীলা শোনে না, বলে "যেতেই হবে তোমাকে।"

নিরঞ্জন বলে "আচ্ছা চলো।"

দু'জনে চলে।

ফকির বলে "কে হয় তোমার ?"

নীলা চুপ করে থাকে। খানিক পরে বলে "আমার স্বামী।"

ফকির বলে "বেশ, কাল সকালে মসজিদে পাঠিয়ে দিও—স্নান [illegible]রিয়ে। আমি ওষুধ দেবো।"

ফকির বটে! সাফল্য-গৌরবে নীলার বুক ফুলে ওঠে, সে বলে "কেমন দেখছো?"

নিরঞ্জন সদ্য-পাওয়া অর্থহীন উদাস-দৃষ্টিতে চারিদিকে চায়, বলে 'ভাল আর কি? আমি যে কাণা থেকে তোমায় আরও ভাল দেখতুম।"

নীলা মুখ ঘুরিয়ে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে বলে ওঠে "নাই বা আমায় মনে ধরলো। চোখ তো পেলে—এখন যাকে পছন্দ হয় তাকে নাও।"

নিরঞ্জন বলে "রাগ করো না, ছিঃ, তুমি আমার—

নীলা বাধা দিয়ে হেসে বলে "ভালো তো ভালো—আর বাজে বকতে হবে না, বাড়ী চলো।"

নিরঞ্জনের বুকে যেন উৎসবের বান। সে বলে "এক কাজ করো, তুমি যাও—মা একা। আমি একটু বেড়িয়ে আসি।"

বিস্ময়ে নীলার চোখ বড় হয়ে উঠে, সে বলে "কোথায় যাবে?'

"যেখানে চোখ যায়। দেখে আসি পৃথিবীটা ঘুরে—কেমন সুন্দর। কখন ত দেখি নি।'

তৃপ্তির একটা সুর যেন নীলার বুকে তড়িৎ ছুঁইয়ে যায়, সে মনে মনে নিরঞ্জনের উপভোগ-স্পৃহা দেখে হাসে, বলে এসো কিন্তু ফিরতে দেরী কর না যেন!"

নিরঞ্জন ঘাড় নাড়ে, বলে 'না।' তারপর যৌবন-চপল মেয়েটীর দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে থাকে।

* * *

পিয়ারী বলে "রাক্ষুসী, তুই নিরুকে আমার খেয়েছিস নিশ্চয়, তা না হ'লে সে গেল কোথায়?"

নীলা হাসে, বলে "এলেই ত হ'ল, ভেব না।

কিন্তু দিন যায়, ভাবনা বাড়ে। নীলা চুপটী করে বসে থাকে জানালার দিকে চেয়ে, পথ চেয়ে।

আট বছর পরে।

নীলার অসুখ। পিয়ারীর চোখে ছানি। শ্রাবণের রাতে দুর্য্যোগের বিরাম নেই। ঝড়-বৃষ্টির দাপাদাপি। রাত দুপুরে আগড় খোলে কে? পিয়ারী বলে "কে রে?"

উত্তর আসে "আমি।"

"কে নিরু, এলি বাবা?"

"হাঁ মা—আমি এসেছি গো।"

দেশ ঘুরে নিরঞ্জন বাড়ী ঢোকে। দেখে নীলার সাদা মুখখানিতে মৃত্যুর ছায়া।

নিরঞ্জন নীলার বিছানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদে, বলে এই দেখবার জন্যেই কি ফিরে আসতে আমায় অত করে দিব্যি দিয়ে রেখেছিলে নীলা!"

নীলা বলে "ছি কাঁদতে নেই, বেটা ছেলে! বসো ভালো হয়ে।"

নীলা নিরঞ্জনের হাতটী টেনে নেয়, খুব কাছে। কি যেন বলতে চায়, পারে না।..

রাতের শেষ। নীলারও শেষ। কিন্তু বৃষ্টির বুঝি শেষ নেই।

কড়কড় করে মেঘ ডাকে—বাজ পড়ে। পিয়ারী ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপে। নিরঞ্জন মাঠ দিয়ে ভিজতে ভিজতে ছোটে। ডাকে "নীলা, নীলা।"

দুর্য্যোগ থামে। পাড়ার লোকে দেখে পিয়ারীর কুঁড়ে ঘরখানা একেবারে ভূমিস্মাৎ। তার তলায় পিয়ারীর হাড় ক'খানা মাটিতে মিশিয়ে গেছে!

নিরঞ্জনকেও পাওয়া যায়। মাঠের উপর তাল গাছতলায় পড়ে আছে—বেহুঁস্! লোকে বলে "বাজ লেগেছে গায়।"

সেবা-শুশ্রূষায় নিরঞ্জনের জ্ঞান ফেরে,—কিন্তু চোখের আলো আর ফেরে না।

লোকে বলে, "আহা, চোখটা গেল ফের—তা যাক্, প্রাণ তো পেলে, পুনর্জন্ম!"

নিরঞ্জন চুপ করে শোনে, উত্তর করে না, মনে মনে বলে "পুনর্জন্মই বটে!"

এই ত চেয়েছিল সে।

লুব্ধা

শ্রী রামপদ মুখোপাধ্যায়

শীতের ধোঁয়া অন্ধকার গলিটার সর্ব্বাঙ্গ চাপিয়া ধরিয়াছে। বুঝি আরব্য উপন্যাসের কোন ধূম্রাকার-দৈত্য এখনই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে!

ভদ্রলোকেরা নাকে রুমাল চাপিয়া দ্রুতপদে সেই স্থানটা পার হইবার সময় একবার সরোষ দৃষ্টিপাতে—নিশ্চিন্ত—গল্প-গুজবরত ঝদর্য্য অধিবাসীদের অবিবেচনার উপর কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন।

তাহারা কিন্তু সেই ধোঁয়ার রাজত্বে—ছেঁড়া মাদুর, খাটিয়া বা একখানা তক্তা পাতিয়া - তামাক-বিড়ির সঙ্গে খোসগল্পের আশ্তশ্রাদ্ধ করিতেছে ও মনিবকে ঠকাইয়া কেমন করিয়া মজুরীর ঘণ্টা বাড়াইয়া লইয়াছে—তাহারই বাহাদুরীতে নিজ নিজ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা করিতেছে।

মুক্ত হাওয়া বা আলো তাহারা দেখিতে পাইলেও—কাজের কারাগারে—প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পায় না। তাই, ধোঁয়া অন্ধকারের মধ্যে—নিশ্চিন্ত জীবনের স্বাদ এতটুকু তিক্ত করিতে পারে নাই। তাহারা মজুর।

মুক্ত প্রান্তরে চাঁদের আলো ও অমাবস্যার অন্ধকারের একই মূল্য দিয়া থাকে। দূষিত ও রুদ্ধ বায়ুর পরিবর্ত্তে স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল বায়ুর উপকারিতা কি বুঝে না এবং স্বদেশ-স্বরাজ এ সবের অর্থ—তাহাদের কাছে মূল্যহীন।

তথাপি তাহারা মানুষ। এবং এই মানুষ লইয়াই আমাদের দেশ।

জমীরুদ্দিন সবে কলিকাটায় ফুঁ দিয়া নিভন্ত গ্নি জ্বালিয়া 'চোঁৎ' করিয়া পোড়া তামাকটায় কটা টান মারিয়াছে,—এমন সময় তাহার বৃদ্ধা মাতা আসিয়া রুক্ষকণ্ঠে বলিল,—ওরে হতভাগা,—এমনি ক'রেই কি সংসার চালাবি!

সমস্ত দিন মজুরি খাটার পর যে কয়েক আনা পয়সা উপার্জ্জিত হইয়াছিল,—তাহাতে সংসারের অচলত্ব সম্বন্ধে জমীরের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সে অবাক হইয়া মায়ের মুখের পানে চাহিল।

বৃদ্ধা বলিয়া চলিল,—সাঁঝ উত্‌রে গেল—দোকান থেকে চাল-দাল কিছুই এলো না। কখন রান্না চড়বে—আর কখনই বা গিলবে? আমি কি দু'বেলা বাজার-হাট ক'রতে পারি!

বুড়ীর বাক্যস্রোতে সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ধোঁয়ার চেয়ে শ্বাস-রোধকারী ওই কথাগুলি। আর জমীরের মাকে জানিত না বা ভয় করিয়া চলিত না, হেন লোক বস্তিটার মধ্যে কেহ ছিল না। তাহার দুর্জ্জয় প্রতাপ—পর রসনার জোরে—আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল।

জমীর শুষ্ককণ্ঠে কহিল,—কেন, জমীর?—আর যাব কোথায়? বোমা ফাটিলে যেমন খানিকটা স্থান প্রচণ্ড শব্দ ও কম্পনে আলোড়িত হইয়া উঠে,—তেমনই ক্রোধে ফাটিয়া খনখনে গলায় বুড়ী বলিল,—সে পারবে না, ছেলেমানুষ ক'দিক দেখবে? তুমি বুড়ো মিন্‌সে—মাগ রয়েছে—ছেলে রয়েছে গায়ে ফুঁ দিয়ে গল্প ক'রে বেড়াবে, আর সে মরবে খেটে খেটে! কেন কি দায়? বয়ে গেছে।

তারপর দম লইয়া বলিল,—আর তোমাদেরও বলি বাছা,—অতগুলো মরদ মিলে—কেন আর ওর মাথাটাকে চিবিয়ে খাচ্ছ? একটু রেহাই দাও—তামাম রাতই ত আছে!

জমীর তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল,—চল—যাচ্ছি।

বুড়ী অতৃপ্ত রসনাকে পুত্রবধূর উদ্দেশে মুক্ত করিয়া দিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইল।

লোকগুলি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

পয়াণ বলিল,—জমীরটা—নেহাৎ গোবেচারা, তাই। নৈলে, হোঁৎকা মিন্‌সে আমীর—মার আদরে খেয়ে খেলিয়ে বেড়ায়—এক কড়ার উবগার নেই—।

মনিরুদ্দিন বলিল,—নসীব—ভাই, নসীব। তার নসীবে আছে সুখ—

জালাল মৃদুস্বরে বলিল,—এর শোধও তোলা আছে রে ভাই। আগে বুড়ীটা কবরে যাক,—তারপর দেখবি ও দানাপানির যোগাড় করে কোত্থেকে? জমীর বলেছে—অমন ভাইকে জবাই ক'রে দরগাতলায় সিন্নি দেবে।

ছিরু বলিল,—আমাদের ঘরে হ'লে পাঁশ পেড়ে কাটতো।

দুই

সেই কদর্য্য গলিটার একপাশে চন্দ্রসূর্য্যকে আড়াল করিয়া একখানি ভাঙ্গা খোলার কুঁড়ে। দাওয়াটা উঠানের সঙ্গে মিশিয়াছে। একটা নর্দ্দমা দাওয়ার কোল ঘেঁসিয়া উঠানের সঙ্গে পার্থক্য রাখিয়াছে মাত্র। তারই উপর একখানা খাটিয়া পাতা সমস্ত দিনমান ও রাত্রি—একখানা ছেঁড়া কাঁথা পাতিয়া বুড়ী তাহার উপর কখনও শুইয়া—কখনও বসিয়া গৃহকর্ম্মরত পুত্রবধূর খবরদারী করে। কোনখানে কাঠখানি রাখিলে উনানে জাল দিবার সুবিধা,—কখন তরকারীতে হলুদ-মশলা দিতে হইবে, ভাজাগুলি নরম থাকিল কি পুড়িয়া গেল, উঠানটায় মাটি লেপা হইল কি না,—বড়িগুলি রৌদ্রে দেওয়া,—ঘর, উঠান ঝাঁট,—বাসন মাজা ইত্যাদি গৃহকর্ম্মের ত্রুটি ধরিয়া অনর্গল বাক্যবর্ষণ এবং সময়ে সময়ে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া সংসারের শৃঙ্খলা বিধান করিয়া থাকে।

ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া শীর্ণকায়া এক নারী যন্ত্রের মত বুড়ীর শ্যেনদৃষ্টির তলে ঘুরিয়া বেড়ায়।

ছেলেটা কাঁদিলে বুড়ী তাহাকে মুখে আদর করে—ভুলায়—কিন্তু কোলে লয় না। সে ভার বধূর। অবিচ্ছিন্ন কাজ-কর্ম্মের মধ্যে দিনে দশবার তাহাকে কোলে লইতে হয়।

বুড়ীর ছোট ছেলে আমীর—সকালে উঠিয়া খেলিতে যায়,—বেলা বারটায় একবার হুম্‌কি দিয়া খাইতে আসে—ছেলেটাকে কাঁদায়—আবার খানিক পরে বাহির হইয়া যায়। বুড়ী গজ্‌গজ্‌ করে এবং সমস্ত দোষ গিয়া পড়ে ঐ শীর্ণা নারীটির উপর। এমনই করিয়া সংসার চলে।

জমীর আসিয়া দেখিল, ছোট দাওয়ার এক কোণে বসিয়া বধূ উনানে ফুঁ পাড়িতেছে—আমীর খাটিয়াখানায় চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া আছে। তাহার কর্ম্মক্লান্ত দেহ আমীরের এই নিশ্চিন্ত আলস্যে জ্বলিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, একটা লাথি মারিয়া উহার এই আরাম উপভোগ ভাঙ্গিয়া দেয়। কিন্তু পশ্চাতে খর রসনার অধিকারিণী মা।—

সামলাইয়া বলিল,—কি আনতে হবে?—

বুড়ী বলিয়া দিল—জমীর হিসাব করিতে লাগিল।

শেষ হিসাব হইতে একটি পয়সা উদ্বৃত্ত হইল।

জমীর বলিল,—খোকার জন্যে এক পয়সার সাবু কিনে আনি,—কাল সকালে উঠে খাবে।

আমীর চক্ষু মেলিয়া মাকে বলিল—মা, তেঁতুল আনতে দাও না, খাট্টা হবে।—

বুড়ী ছেলের পানে চাহিয়া বলিল, তাই আনিস। সাবু কাল সকালে আমি এনে দেব।

জমীর আর কোন কথা না বলিয়া রাগে ফুলিতে ফুলিতে চলিয়া গেল।

রাত্রি একটায় হেঁসেলপাঠ তুলিয়া বধূ শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিতেই বুড়ী অন্য কক্ষ হইতে খন্-খনে গলায় হাঁকিল,—এত সকাল সকাল ঘুম কিসের ? বসে বসে বাবুর জামাটা সেলাই কর, আমার কাপড়টায় অমনি একটা ফোঁড় তুলে দিবি—আর জামাইয়ের বোতাম ক'টা টেঁকে দিবি।

বধূ কেরোসিন তৈলের কুপি জ্বালাইয়া কাপড়, জামা, সূচ, সুতা লইয়া বসিল।

স্বামীর পাশ ফিরিয়া নিদ্রাজড়িত স্বরে বলিল, আঃ—ভাল আপদ না হোক! রাত্তিরে আলো জ্বালিয়ে বসলো কাজ করতে—একটু ঘুমুতে দেবে না!

বধূ আলো আড়াল করিয়া স্বামীর ঘুমের সুবিধা করিয়া দিল। তারপর কাজ শেষ করিয়া দারুণ ক্লান্তিভরে সেইখানেই আঁচলটা বিছাইয়া শুইয়া পড়িল।

হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর একটা ক্লান্তি জাগে, কিন্তু দুঃখ ইহাতে নাই। অবসরের ফাঁকে বেদনাটা ফুটিয়া উঠে ও সুখ-দুঃখে সে দুঃখের পরিমাণটা বুঝাইয়া দেয়। কিন্তু অখণ্ড শ্রম তাহার সে বোধশক্তিকে পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। কলের মত ক্লান্তিহীন অবিচ্ছিন্ন কর্ম্ম ও ত্রুটি-বিচ্যুতিতে গালি-প্রহার সহ্য করা—জীবন-যাত্রার অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া সে মানিয়া লইয়াছিল।

ছেলেটা উঠানের ধূলা-কাদা মাখিয়া কাঁদিতেছে, বুড়ী বাড়ীতে নাই, বাজারে গিয়াছে। এদিকে ভাতের ফেন না গালিলে গলিয়া পুড়িয়া যাইবে। বধূ শিশুর কান্নায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ফেন গালিতে লাগিল।

স্বামীর আসিয়া সে ব্যাপার দেখিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল,—বলি, হারামজাদী কি কালা হয়েছিস না কি ?

বধূর নীরব কণ্ঠে ভাষা ফুটিল; মৃদুস্বরে বলিল,—ভাতটা যে পুড়ে যায়—

তোমার মাথা হয়। ছেলেটার চেয়ে—ভাতটা হ'ল বেশী ?

বার আনা রোজের মজুরের মুখে এ কথা না মানাইলেও বধূ তাড়াতাড়ি আসিয়া পুত্রকে কোলে লইল। বুড়ী উঠানে পা দিয়া ব্যাপার দেখিয়া জ্বলিয়া গেল। কর্কশকণ্ঠে হাঁকিল,—আ—মলো! উনুনটা খাঁ-খাঁ ক'রে জ্বলে যাচ্ছে—নবাবের বেটীর সেদিকে হুঁস নেই। ভাতারের সঙ্গে হাসি-মস্করা হচ্ছে। কি বেহায়া বেইমান গো! —

শিশুকে ফেলিয়া বধূ তাড়াতাড়ি হেঁসেলের কাছে গিয়া বসিল।

স্বামীর হাঁকিল,—ভাত বাড়্‌……

দুপুরবেলায় বুড়ী ঘুমাইয়াছে। পাশের ঘরে লতিফের বোন্ দেলজান আসিয়া চুপি চুপি বলিল,—দেখ ভাই ফতিমা, তোর বড্ড সহ্যগুণ! আমরা হ'লে—মুখে ঝাড়ু মেরে তালাক দিয়ে চলে যাই।

বধূ ভয়-দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া ভীতকণ্ঠে বলিল, ছি—ভাই! আমার বাবু বেঁচে থাক,—কিসের দুঃখ।

দেলজান বলিল,—পোড়াকপাল—লজ্জার! ছেলেটাকে ত ফেলে পালাবি না,—তার ভাবনা কিসের ? ওকে নিয়ে পালিয়ে চ'।

ফতিমা ব্যথিত-দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া রহিল,—কোন উত্তর দিল না।

দেলজান বলিল,—আমাদের লতিফ ত রাজী আছে। খাওয়া পরার কষ্ট নেই, কেউ খিট্-খিট্ করবে না—সুখে থাকবি। দু'জনে পালা ক'রে খাটবো—আর মনের সুখে গল্প করবো।

মনের দুর্ব্বলতায় ব্যথা এই সহানুভূতির প্রলেপে—টন্‌টন্ করিয়া উঠে,—বন্ধনের বেদনা তীক্ষ্ণ হইয়া অঙ্গে কাটিয়া বসে।

কাজ-কর্মের ফাঁকে—এ কি সুখের অবাধা উৎপীড়ন! ফতিমা দেলজানের হাত ধরিয়া কাতরকণ্ঠে কহিল,—না ভাই, ও সব কথা আমায় শুনিয়ো না,—গুণা হবে।

হাসিয়া দেলজান বলিল,—গুণা! খোদা জানেন,—এতে কতটা শাস্তি। মুখ বুজে যা সইছিস্—তাতে বুঝি—বেহেস্তটা দুনিয়ায় নেমে আসছে? পোড়াকপাল!

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ-চাপ রহিল।

অবশেষে দেলজান বলিল,—কেমন—রাজি?

প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া ফতিমা বলিল—না।

দেলজান রাগ করিয়া উঠিয়া গেল; ফতিমা ভাবিতে লাগিল।

চার

বস্তির মধ্যে একটা সরকারী জলের কল আছে। পানীয় জল অধিবাসীরা ঐ স্থান হইতেই সংগ্রহ করে।

ফতিমা ভোরবেলায় উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে বাল্‌তি ও ঘড়া লইয়া জল লইতে আসে। বেলা হইলে ভিড় বাড়ে—জল লইবার সুবিধা হয় না।

আজও প্রথামত জল লইতে আসিয়া দেখিল, কে একজন কলের নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কল টিপিয়া বাল্‌তিটা তাহার মুখে পাতিয়া দিল। দরিদ্রের আবার মান-সম্ভ্রম লজ্জা কি? সংসারের কাজ-কর্ম্মের মুখে এসবের আবশ্যকতাও কম।

যে দাঁড়াইয়াছিল,—সে একটু সরিয়া গিয়া বলিল,—ফতিমা বিবি,—একটা আরজী আছে।

স্ত্রীলোকের কাছে আরজী!

ফতিমা কথা না বলিয়া এক হাতে ঘোমটা টানিয়া দিল। সে কহিল—আমি দিল্লী যাচ্ছি; তাই বলতে এলাম, তোমার সুবিধা হবে কি?

কিসের সুবিধা? ফতিমা কোন উত্তর দিল না।

সে ব্যক্তি একবার ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—বুঝতে পারছ না, আমি লতিফ।

ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। লজ্জায় ভয়ে ফতিমার বুকের ভিতরটা কেমন যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। আবার সেই কথা! দেলজানের সেই মন-ভুলানো যুক্তির আশ্বাস! উহার মূল্য অনেকখানি হইলেও আশঙ্কার তাড়না রহিয়া রহিয়া তাহার বুকের মাঝে খোঁচা দিয়া জানাইয়া দিতেছিল,—এ অত্যাচার—এ পীড়ন তোর একান্ত নিজস্ব। দুঃখ থাকিলেও একটা সুখ-মিশ্রিত আশাও যে ইহার সঙ্গে জড়ানো—আর সব ফেলিয়া লজ্জার মাথা খাইয়া—সুদূরে পলায়ন,—অনিশ্চিতের পশ্চাতে ছোটা? ছি!

লতিফ কোমলস্বরে বলিল, তা হ'লে সন্ধ্যে-বেলায় ঠিক হয়ে থেকো—

সহসা ফতিমার বুকের মাঝে সুপ্ত নারীত্ব জাগিয়া উঠিল। বারম্বার একই আঘাত!

সে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে লতিফের পানে চাহিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, সাহেব, জেনানার ইজ্জত কি তোমরা এমনি করেই রাখ? পথ ছাড়—

লতিফও অল্প উত্তেজিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল,—কিন্তু অদূরে কাহাকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া গেল।

বাড়ী আসিয়া ফতিমা তাহার ছেঁড়া মাদুরটার উপর লুটাইয়া পড়িল। অশ্রান্ত কর্ম্মের মধ্যে তাহার মানসিক প্রাণ এখনও একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। সেখানে এতটুকু স্পন্দন আছে—এবং সুখ-দুঃখজড়িত সে অনুভূতি মানুষকে জানাইয়া দেয়,—কোথায় তার জাগরণের জন্মভূমি। রূপে-রসে গন্ধে-শব্দে সম্পদশালিনী—ধরিত্রীর চেতন দ্বারে—যেদিন সে সহসা আসিয়া দাঁড়ায়,—সেদিন পশ্চাতের পানে চাহিয়া দেখিলে আতঙ্কে অবসাদে তাহার সারা অন্তর ভাঙ্গিয়া পড়ে। আঘাত প্রতিমুহূর্ত্তে প্রচণ্ড হইয়া জানাইয়া দেয়,—জড় আলস্যে আর নিশ্চিন্ত

নির্ভরতার যে শান্তি,—তাহা মানুষের নহে। দুঃখের অন্ধকার ও সুখের আলোক লইয়াই জীবনের রাত্রি দিন। তাহারই মধ্যে থাকে গতি—স্ফূর্ত্তি—বিকাশ। যে গতি প্রতিনিয়ত ধরণীকে আবর্ত্তিত করিয়া, ঋতুর অর্ঘ্য সাজাইয়া, পূজা উপচার দিয়া নব নব বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করিয়া থাকে,—তাহার আনন্দ প্রসাদ-কণিকা লইয়াই ত মানুষের জীবন!

ফতিমার জীবনে আলো ছিল না—অন্ধকারও ছিল কি না সে বুঝিতে পারে নাই—কারণ মায়ার সূক্ষ্ম রজ্জু, তাহার অনুভূতির চৈতন্যকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। দেলজান সে বন্ধনের দৃঢ়বদ্ধ গ্রন্থি খুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিল,—গতিক একটি আঘাতে তাহা ছিঁড়িয়া দিল। ফতিমা শরবিদ্ধ বিহগীর মত যন্ত্রণায় লুটাইয়া পড়িল।

আজ তাহার অন্তরের মধ্যে আঘাতে আঘাতে যে তরঙ্গ উঠিয়াছে,—তাহাকে শান্ত করিতে না পারিলে বুঝি সর্ব্বস্ব হারাইতে হইবে। সে জীবন ফিরিয়া পাইয়াছে, কিন্তু আলো চাই,—বায়ু চাই,—মুক্তির এতটুকু শ্যামল-ক্ষেত্র চাই, যেখানে সে অব্যাহত-গতিতে বিচরণ করিয়া বেড়াইবে। রাত্রিতে জমীরের পায়ের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া সে হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

জমীরের শরীর সেদিন ভাল ছিল না,—মনিবের নিকটে ভৎসনা খাইয়া মনটাও তিক্ত ছিল। সবেগে পা দু'খানা সরাইয়া লইয়া কর্কশ কণ্ঠে কহিল, আ—মলো—রাত্তিরে এলি ঘ্যান্ ঘ্যান্ কর্‌তে—! দূর হ—

ফতিমার চক্ষু দুইটি মুহূর্ত্তের তরে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে মুহূর্ত্ত মাত্র। তারপর আর সে কাঁদিল না—কোন কথা বলিল না।

অদূরে ক্ষুদ্র মলিন শয্যায় খোকা তৃপ্তিতে ঘুমাইতেছিল। স্বপ্ন-আবেশে তাহার কাঁচ মুখখানিতে ঈষৎ হাসি লাগিয়া আছে।

কয়েকদণ্ড সেদিকে চাহিয়া ফতিমার প্রদীপ্ত ও সজল চক্ষুর আবেগ তরঙ্গ মিলাইয়া গেল। কোন্ সুদূর জীবনের সাফল্যের ভাব। আশার আলোক সে হাসিতে মাখান ছিল—কে জানে?

পরদিন ফতিমা উঠিয়া শান্তচিত্তে গৃহকর্ম্মে মনোযোগ দিল।



যৌবন-স্বপ্ন

শ্রী বগলারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

ছোট একখানি গ্রাম।

তার চেয়েও ছোট একটা সংসার। সংসার আর কি, বাপ ও মেয়ে। দুখানি মাত্র খড়ো ঘর, একটী তুলসীমঞ্চ, আর—উঠানের এক-কোণে খানিকটা জায়গা জুড়ে লাউকুমড়োর মাচা—ব্যস্।

দুইটী মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি কান্না, মিলন-বিরহ—সবই এই সীমাটুকুর মধ্যে স্পন্দিত হয়।

গ্রামের শেষে একটী মন্দির—বোধ হয় শিবের। বাপ তারই পূজারী। আয় বেশী নয়—তবে উপোস করতেও হয় না। জীবনের প্রথম দিকে পশ্চিমের কি একটা সহরে তিনি চাকরি করতেন। তারপর—একটী মাত্র কন্যা রেখে স্ত্রী মারা যাওয়াতে, চাকরির মায়া ছেড়ে পৈতৃক ভিটেতে এসে বসবাস করছেন—আর পিতার পরিত্যক্ত যজমান ও শিবমন্দিরের দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন চলছে।

পশ্চিম দিগন্তের শেষে সূর্য্য যখন ম্লান হেসে ডুবে যায়, সরোবরের বুকে পদ্ম যখন প্রিয় বিরহে—পাপড়ির অবগুণ্ঠনে কেঁদে মুখ লুকায়, ঘনিয়ে-আসা অন্ধকারের মাঝে যখন একটানা ঝিল্লীর ঝঙ্কার চলে—

তখন মন্দিরের আরতি শেষে পূজারী বাড়ী ফেরেন। হাতের সামান্য প্রসাদটুকু দাওয়ায় নামিয়ে রেখে, ডাকেন—মা!

দু'খানি ঘরের যে কোন একখানির থেকে উত্তর আসে, যাই বাবা!

তারপর অনেক রাত্রে নক্ষত্রখচিত আকাশের তলে ব'সে, বাপ মেয়েকে শাস্ত্র শিক্ষা দেন—বেদ-গীতা; কাব্য-উপনিষদ্, আরও কত কি—যা জীবনের পরিপুষ্টি আনে।

বিপুল বিশ্বের বৈচিত্র্যময় দিনগুলি, একখানি ছোট গ্রামের ছোট্ট একটি পরিবারের কাছ থেকে এর বেশী মধু কোনদিনই আহরণ করতে পারতো না।

কিন্তু সময় এল—

মেয়ে বড় হয়ে উঠ্‌ল। বাপের নিশ্চিন্ততার আড়ালে পরিপূর্ণ যৌবনের ভারে সে টলমল টলমল করতে লাগ্‌ল......

বাপ বললেন—ওরে মাধু! তোর যে এবার বিয়ে দিতে হবে রে?

বিয়ের কথায় লজ্জা পাবার শিক্ষা মাধবী পায় নি যদিও—তবুও সে কোন কথা না ব'লে বাপের মুখের দিকে চেয়ে, একটুখানি হাসলে শুধু। বাপও বোধ হয় হাসবার চেষ্টাই করলেন, কিন্তু না পেরে কেমন যেন অন্যমনস্কর মত রৌদ্রকরোজ্জল অসীম শূন্যে চেয়ে রইলেন। সেখানে বহুউর্দ্ধে একটা চিল তখন ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছিল...

প্রবাসের প্রাচুর্য্যের সুখস্মৃতি মাধবীর মনে গোপন স্বপ্নের মত ছিল,এবং বড় ঘরের ঘরণী হবার একটা প্রচ্ছন্ন-কামনা সে নিশিদিন বুকে বহন ক'রে ফিরত। তাই তার বাবা যখন পাত্রস্বরূপে তারই ছেলেবেলার খেলুনি চপলকে মনোনীত ক'রেছেন বললেন,—তখন এই-গ্রামেরই আর এক প্রান্তে অবস্থিত চপলদের খড়ো ঘরগুলি চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে,—তার প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার সুপ্ত স্বপ্নকে, যেন প্রচণ্ড বেগে আঘাত করল—

সে সজোরে মাথা নেড়ে বললে—না বাবা।

বাপ বিস্মিত হ'লেন। বললেন—কেন মা? চপল কি –

না-না-না বাবা! বলতে বলতে মাধবী একটা যেন দুঃসহ কান্নার বেগ চেপে দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে চলে গেল!

শোবার ঘরের জানলাটা খুলে দিলে, ছোট একখানা মাঠের পরেই গ্রামের জমিদারের প্রকাণ্ড বাড়ীটা চোখে পড়ে—

অবিশ্যি তাঁরা কেউ আর এখানে থাকেন না, কিন্তু তবুও কোলকাতা থেকে—মাঝে মাঝে হাওয়া বদল ক'রতে যখন গ্রামের বুকে পা দেন—

তখন,—শান্ত-নিরীহ গ্রামের সাত্ত্বিক দিনগুলি সভ্যতা-সিক্ত হাসি কলরবে, আর বনবনান্ত অনভ্যস্ত বন্দুক-নির্ঘোষে ক্ষুব্ধ ও কম্পিত হ'য়ে ওঠে।

সন্ধ্যার ঠিক পরেই—

মাধবী জানলাটা খুলে দিলে।—ওরা আবার এসেছে স্বাস্থ্য সঞ্চয় কোরতে।— প্রত্যেকটী কক্ষ আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বাইরের বৈঠকখানা থেকে-একটা মিষ্টি আওয়াজ ভেসে আসছে—বোধ হয় কেউ বাঁশী বাজাচ্ছে।

একটী মেয়ে—বেশ সুন্দরী, জানলার গরাদে ধ'রে এইদিকে চেয়ে আছে। পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যের শ্রী ফুটে উঠেছে ওর মুখের রেখায় রেখায়। মাধবীকে ও দেখছে না নিশ্চয়। বোধ হয় গ্রাম, কি প্রকৃতি, কি অমনি একটা কিছুর মোহ, ওকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে ঐখানে...'

একটী সুশ্রী যুবা এসে পেছনে দাঁড়াল। মেয়েটী একবার পেছনটা দেখে নিয়েই একটুখানি হেসে আবার এই দিকে চেয়ে রইল। পুরুষটী—

একি!

মাধবী জানলা থেকে উঠবার চেষ্টা করে। কিন্তু হায়! তার বাপের সমস্ত শিক্ষাকে, সংযমের উপদেশকে অতিক্রম ক'রে, একটা চিরন্তনী নারী-প্রকৃতি, মাধবীর মুগ্ধ দৃষ্টিকে, ওই চুম্বনরত নারী ও পুরুষের দিকে,—নিবদ্ধ করিয়ে বসিয়ে রাখে —

তার যৌবন নিকুঞ্জে ফুল ফোটাবার জন্যে।

বিধাতার নির্দ্দয় পরিহাস,······

দীপ্ত দ্বিপ্রহরে, যখন গ্রামের পথে লোক চলাচল ক'রছে না, যখন সৃষ্টির একটা গভীর ও গম্ভীর রাগিনী, মধ্যদিনের বীণায় ধ্বনিত হচ্ছে, যখন বটের ছায়া শীতল শাখা থেকে, ঘুঘুর একটী মাত্র ক্লান্ত-সুর, স্তব্ধ প্রকৃতির শান্তি ভঙ্গ করছে —

তখন,—বাপের আসতে দেরী হচ্ছে দেখে, মাধবী মন্দিরের দিকে পা বাড়াল।

অন্যমনস্কতায় ঝোঁকে রাস্তা বেয়ে চলেছে সে—

বিপুল বেগে একখানা মোটর এসে তার

ওপর প'ড়ল। সমস্ত শরীরটাই রক্ষা পেল, বাঁ হাতখানা ছাড়া···

"খুকী! তোমার কোথায় লেগেছে বল ত?" মাথায় চোট্ লেগেছিল—সেই ধূলি-শয্যায় শুয়ে—সে চোখ চাইলে,—দেখলে অপরূপ সুশ্রী এক যুবা, তার মুখের কাছে হাঁটু পেতে ব'সে—ব্যাকুল আগ্রহে প্রশ্ন ক'রছে "খুকী! তোমার কোথায় লেগেছে বল ত?"

আবেশে তার চোখ বুজে এল......

এইত তার রাজপুত্র, এইত তার যুগে যুগে চাওয়া কামনার ধন, যার পদধ্বনির প্রেরণায়, চপলকে আপনার ক'রতে পারলেনা সে······

সে ত বসন্তের লীলা-বিলাসে আসে নি,—শীতের রিক্ততায় ত সে আসে নি, বর্ষার শ্যাম-সমারোহ তাকে বহন ক'রতে অক্ষম—

সে এসেছে গ্রীষ্মের উত্তপ্ত জ্বালায়,—ধূলি-মলিন রুক্ষ দ্বিপ্রহরে,—উগ্র প্রচণ্ড তপস্যার মতো—

তার চলার বেগে,—প্রণয়িণী রথের তলায় পিষে যায়,—তার দাবীর দুয়ারে, উর্ব্বশী বরমাল্য সাজিয়ে আনে—ভিখারিণীর মিনতি নিয়ে······

সে রুদ্র,—সে ভয়াল,—সে প্রেমিক,—সে সুন্দর······

জ্ঞান হ'লে সে শুনলে বাইরে কে যেন বলছে, মা নেই? আহা! আমার ড্রাইভার ব্যাটাও যাচ্ছে তাই একেবারে,—হারামজাদাকে আজই তাড়িয়ে দেব। আচ্ছা আসি তা হ'লে এখন,—আবার আসব আমি।

তার বাবা হাউহাউ করে কেঁদে কি কতকগুলো বলে গেলেন—বোঝা গেল না।

বাইরে মটরের আওয়াজ হ'ল।

মাধবী সেরে ওঠে।

কিন্তু তার জীবনে সেই রাজপুত্রের স্পর্শের ইতিহাসটুকু অক্ষয় হ'য়ে থাকে

বাপ মেয়ের মুখে রক্ত সঞ্চারের চেষ্টা করেন,—মাধবীর হাসি পায়।—এ যেন রাত্রের ঝড়ে বিপর্য্যস্ত মেরুদণ্ড ভাঙা রজনী গন্ধার বুকে—প্রভাতে পুনরায় ফুল ফোটাবার চেষ্টা।

অবশেষে—

একদিন মাধবী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল।—

কিন্তু তার বাঁ হাতখানি বিকৃত অবস্থাতেই থেকে গেল।—মাধবী ভাবে,—এইত চেয়েছিল সে। সব সময়েই মনে তার আশঙ্কা জাগত, যদি তার হাতখানি সম্পূর্ণ নিরাময়ই হ'য়ে ওঠে,—তবে ত তার রাজপুত্রের আবির্ভাবের কোন চিহ্নই বহন করতে পারবে না সে! তারপর ডাক্তার যেদিন বলে গেলেন বাঁহাতখানা আর ভাল হবে না, সেদিন সে গোপন চুম্বনে হাতখানাকে ছেয়ে ফেলেছিল।

এইত তার রাজপুত্রের দান এ জীবনে। অক্ষয় অপরিমেয় তুলনা-বিহীন এ-দান।

বাপ গিয়ে চপলের বাবাকে ধরে পড়লেন—তুমি একটু বলবে চল ভাই। ওর ভাবগতিক আমি কিছুই বুঝছি নে। মা-মরা মেয়ে আমার, ওকে জোর ক'রে কোন কিছু বলতে বুকে বাজে।

চপলের বাবা এলেন; মাধবী তখন শুয়ে ছিল। বললেন, আমার ঘরে চল মা! চপল

তোমার অপ্রিয় নয়—এটা আমি জানি বলেই, তোমাকে বলবার সাহস আমার হয়েছে।... অবিশ্যি তোমার যদি অমত থাকে এতে, তবে আমি বলতে চাই নে কিছু। তা নইলে আমার ছেলেকে ত আমি জানি, সে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে যে বিয়ে করবে—এ ত আমি বিশ্বাস করতে পারব না...মা! এই ব'লে তিনি উত্তরের অপেক্ষায় মাধবীর দিকে চাইলেন। সে তখন বোধ হয় তার রাজপুত্রের কথাই ভাবছিল,—তাই কোন উত্তর না দিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে যেমন ছিল, তেমনই পড়ে রইল ··

"এক কাজ কর ভাই—তুমি একবার চপলকে আসতে বোলো ওর কাছে, কারণ, আমরা বুড়ো হয়েছি এটাত ঠিক? হয়ত বুঝিনে কিছু ওদের ভেতরের ব্যাপার।—আমি চললাম।" মাধবীর বাবাকে বাড়ীর এক কোণে ডেকে নিয়ে গিয়ে কথাগুলো বলে তিনি চলে গেলেন···।

চপল,—যদিও মাধবী বড় হবার পর থেকে একদিনও এ বাড়ীতে আসে নি,তবুও সে আসতে রাজী হ'ল। বাল্যের খেলার সাথীই যে একদিন যৌবনের প্রেয়সীর স্থান অধিকার করবে, তা কেই বা জানত সেদিন!

কিন্তু পুকুর থেকে ফিরবার পথে যেদিন একটি সিক্ত-বসনা নারীর সঙ্গে একটী পুরুষের দৃষ্টির মিলন হ'ল, তখন পুরুষ বুঝলে—যে এই নারীকে তার প্রয়োজন আছে—জীবনযাত্রার পথে;—

তাইত চপল আজ উদ্‌ভ্রান্ত। সে বললে আচ্ছা যাব আমি সন্ধ্যার পর।

বাপ নিশ্চিন্ত হ'লেন!

মাধবীর ভাগ্যলিপি নিয়ে মানুষে-মানুষে কাণাকাণি চলে। কিন্তু ভাগ্য-বিধাতা সেদিকে নজরই দেন না মোটে,—

দিলে, অশ্রুহীন চোখেও আজকে অশ্রু দেখা দিত...

একদিকে দায়ীত্বহীন বিধাতা আর একদিকে লক্ষিত হতভাগ্য-সৃষ্টি।

ভীরু-জ্যোৎস্না যৌবন-ভীরু কিশোরীর মতো ত্রস্ত জড়িতপদে পৃথিবীর বুকে নেমে এল।

মাধবী জানলাটা খুলে দিয়ে সেখানে গিয়ে বসল। চারদিকে যেন জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে—

ওই যে বাড়ীটা,—নির্জ্জন প্রকাণ্ড বাড়ী, শুভ্র চন্দ্রালোকে ও যেন আজ সুদূর—রহস্যময়!

আজ এই চাঁদের আলোতে আকাশ আর ধরার মধ্যে যেন একটা সন্ধির প্রস্তাব চলছে—গাছপালা মৃদু মাথা নেড়ে নেড়ে তাতে সায় দিচ্ছে···

এই রাত্রে কোথায় কোন সমুদ্রপারে প্রেয়সী হয়ত কাঁদছে বাতায়নে বসে···

হয়ত কোন কুঞ্জবনে অভিসারিকা আজ চুম্বন দিচ্ছে তার প্রিয়তমের অধরে—

কোথাও হয়ত নির্জ্জন ছাদের উপর কাব্যালোচনা করছে কোন দম্পতি! দু'জনের শরীরের উপর দিয়ে আলোর প্লাবন বয়ে যাচ্ছে—

মাধবী স্বপ্ন-লীলায় ডুবে যায় ..

সে এক বাসন্তী নিশা, পুষ্প পেয়েছে পূর্ণতা··· গাছ-পালা পেয়েছে শ্যামলিমা...আর প্রকৃতি পেয়েছে সার্থকতা। যখন শিশু দেখছে স্বপ্ন যৌবনের—বৃদ্ধ দেখছে স্বপ্ন যৌবনের—কিশোরী দেখছে স্বপ্ন যৌবনের।

যৌবনের মূর্ত্ত প্রতীক—সে এল তাদের দ্বারে, কপালে চন্দন টীকা—গলায় দুলছে বরমাল্য—মুখে মোহন-হাসি।

শুভদৃষ্টি হ'ল!

বাপ বিদায় দিলেন, বন্ধু বান্ধবেরা বিদায় দিল,—সে তাকে নিয়ে গেল দূরে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে যে বাড়ীটি আকাশ ছোঁব ছোঁব করে সেইখানে ..

দাসদাসী, লোকজন, আত্মীয়স্বজন, বিলাস-ঐশ্বর্য্যের চরম পূর্ণতা।...

দিন কাটে...

গ্রীষ্মের দীপ্ত-দুপুরে বর্ষার সজল প্রাতে শরতের স্বচ্ছ-দিনে, হেমন্তের লাবণ্যে, শীতের রুদ্রতায়, আর বসন্তের মোহন-মায়ায়—

কূজনে, গুঞ্জনে, হাসি, গল্পে, কাব্যে...

সে জানলার গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, প্রিয়তম এসে খোঁপা খুলে দেয়—চুম্বনে চুম্বনে কপোল আচ্ছন্ন করে দেয়, আদরে-সোহাগে তাকে ছিঁড়ে ফেলতে চায় যেন...

নব অতিথির আগমন সম্ভাবনায় পুলক লাগল তার দেহে, স্বপ্ন জাগল তার মনে...মোহ-অঞ্জন আঁকা হ'ল তার আঁখিতে...

তারপর এল সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের দিন।

রাজপুত্র চলে গেল কোন্ সে তেপান্তরের পারে—"আবার আসব আমি বলে।"

যুগ-যুগান্তর কেটে গেলো তার পথ চেয়ে! কত মরুভূমি সাগর হ'ল, কত সাগর মরুতে পরিণত হ'ল—কত সূর্য্য গেল এল, কত গ্রহ, কত চন্দ্র দান শেষ করে চলে গেলো অসীমের বিলুপ্তির মাঝে!—

ধরিত্রীর বুকে একটা জন্ম-জন্মান্তরের ওলট-পালট হয়ে গেল—

কিন্তু তবু সে ব'সেই রইল তার বাতায়নের পাশে সজল উৎসুক-দৃষ্টি দূর পথ-প্রান্তে নিবদ্ধ ক'রে,—

তার প্রিয়তম আস্‌বে বলে—

অনন্ত সে প্রতীক্ষা...

চপল ঘরে ঢুকল—

মাধবীর খুব কাছটিতে সরে এসে ধীরে ধীরে ডাক্‌ল—মাধু!

মাধবী তেমনি বসেই রইল, উত্তর দিল—উঁ।

—আমি এসেছি মাধু!

মাধবী দ্রুতপদে উঠে দাঁড়াল—চোখে তেমনি স্বপ্নের ঘোর ঘিরে—

ক্রন্দন কম্পিত-কণ্ঠে বল্লে—

এসেছ?—এতদিন পরে এলে তুমি?

চপলের সমস্ত শরীর তখন অনুরাগে আর উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে ..

মাধবী নির্ভয়ে এগিয়ে এসে চপলের হাত ধরল। বললো আমায় নিতে এসেছ কি তুমি?

—হ্যাঁ মাধু!

'চল।' ব'লে চপলের হাত ধ'রে মাধবী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—ধীরে...ধীরে...



জয়ী

শ্রী রমেশচন্দ্র সেন, বি-এ

এক

সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রশান্ত জামিন মুচলেখা দিয়া জেল হইতে বাহির হইল। তখন একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে। বাতাসে পাগল ভাব, যেন শীঘ্রই একটা ঝড় আসিবে। দোকানী দোকানের ঝাঁপ নামাইয়াছে। রাস্তার কেরোসিন আলোর ঢাকনীর কাচ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। পথিকের চলাচল কম। পলাতক সৈন্যের পক্ষে আত্মগোপনের এমন অবসর বুঝি আর নাই।

প্রশান্ত ছিল এই জেলার সব চেয়ে বড় কর্ম্মী। তার বক্তৃতায় উত্তেজিত হইয়া কত ছাত্র লেখা-পড়া ছাড়িয়াছে, কত যুবক হাসিতে হাসিতে জেলে গিয়াছে। ছেলেরা তাকে পূজা করিত, বয়স্করা তাকে স্নেহ করিতেন। ত্যাগও তার কম ছিল না। পরীক্ষা দিলেই প্রশান্ত প্রথম শ্রেণীতে এম্-এ পাশ করিতে পারিত। তাদের পরিবারের দীর্ঘ অভিশাপের মত দারিদ্র্যের পাষাণ চাপ লঘু হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বেহিসাবী লোকটি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দেশের কাযে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সে জানিত তার অর্থ,—প্রহার, উপবাস, ভিক্ষা।

পুলিশ যখন প্রশান্তকে লইয়া যায়, তখন এই সহরটি তার পিছনে পিছন চলিয়াছিল তাকে শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য। সে তখন জাতির বীর। আর আজ পাঁচ মাস পরে সে সেই পথ দিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে সংক্রামক রোগগ্রস্তের মত! তার স্পর্শে বাতাস যে দূষিত হইবে!

কেন সে ইহা করিল? আজ দুই দিন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া এই এক কথাই সে ভাবিয়াছে, কি করিবে? তার অন্ধ পিতা আর বৃদ্ধা মাকে দেখিবার কেহ ছিল না। সেই তাঁদের একমাত্র সন্তান, আশা-ভরসার একমাত্র স্থল। প্রশান্ত যখন জেলে যায়, তখন ঘরে যোটে তিন সের চাল ছিল। সে আশা করিয়াছিল, দেশ তার পিতা-মাতাকে দেখিবে।

একটা কর্ম্মীর পিছনে চিৎকার করিবার লোকের অভাব হয় না, কিন্তু যে সেবার নাম, যশ প্রভৃতি কোন পিপাসার তৃপ্তি নাই, সে সেবা খুব কম লোকেই করিতে পারে। অন্ততঃ, প্রশান্তের জেলার লোকেরা তাহা পারিল না।

জেলে বসিয়াই সে শুনিল, পিতা-মাতার অন্নকষ্টের কথা। আজকাল তাঁদের প্রায়ই উপবাস করিয়া থাকিতে হয়। যারা পুত্রকে উৎসাহ যোগাইয়া ছিল, পিতা-মাতাকে অন্ন যোগাইবার সময় তারা পিছাইয়া পড়িল। প্রশান্তের সঙ্গে যে কয়টী কর্ম্মী ছিল, তারা জেলে, তাই এই অবস্থা।

উপবাসী বাপ-মার কষ্ট শুনিয়া প্রশান্ত নির্জ্জনে অশ্রু ফেলিয়াছে। তার মনে হইয়াছে, দেশকে সেবা করিতে গিয়া সাক্ষাৎ ভগবানের অবহেলা করিয়াছে।

তারপর আসিল মার পক্ষাঘাতের সংবাদ। বৃদ্ধ বয়সে দু'মুঠা ভাতের অভাবে তাঁর এই অসুখ। এখন ঔষধ-পথ্য যোগাইবে কে? সেবা-শুশ্রূষা করিবার লোক নাই। এত দিন প্রশান্তের মা অন্ধ স্বামীর সেবা করিয়াছেন। আজ সেই অসহায় অন্ধই তাঁর একমাত্র নির্ভর।

মার অসুখের সংবাদের পর হইতে প্রশান্তের মুখে অন্ন উঠে নাই। নিজেকে কতটা ছোট

করিতে হইবে, তাহা সে জানিত। মানুষের ঘৃণার কথাও তার মনে হইয়াছিল, তবু মুচলেখা দিয়া জেল হইতে বাহির হইয়া আসিল।

দুই

সে ধীরে ধীরে বাড়ীর দরজায় যাইয়া আঘাত করিল। কয়েকবার শব্দের পর ভিতর হইতে তার পিতা বিমলাচরণ বলিলেন······"কে ?"

পাছে কেহ তার পরিচয় জানিতে পারে,—সেই ভয়ে প্রশান্ত মুখে কোন জবাব দিল না,—আবার ধীরে ধীরে করাঘাত করিতে লাগিল। বিমলাবাবু বিরক্তিপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন... "কে রে ?"

প্রশান্তের মা বলিলেন..."আমাদের বাড়ীতে ডাকাত পড়বে না, দেখই না এগিয়ে কে এসেছে ?"

ঠিক এই সময় রাস্তা দিয়া একটী যুবক যাইতেছিল। প্রশান্তের দিকে অগ্রসর হইয়া তাকে দেখিয়া সে বলিল—"খবরটা দেখছি তা'হ'লে ঠিকই। তুমি বুঝি মুচলেখা দিয়ে এসেছ ?" প্রশান্ত বলিল······"হ্যা······তা···না মা······অসুখ।" যুবকটি একটু হাসিয়া চলিয়া গেল।

বিমলাবাবু দরজার খিল খুলিতে খুলিতে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন······"কে ?" "আমি প্রশান্ত"···—গলাটা ক্ষীণ······অস্পষ্ট ·····

আনন্দের সহিত তাড়াতাড়ি দরজা খুলিতে খুলিতে বৃদ্ধ বলিলেন····· "বাবা এসেছিস, বেশ, বেশ, শরীর ভাল ত ?" প্রশান্ত পিতার পদধূলি লইতে ভুলিয়া গেল। সে বলিল......"হাঁ বাবা।" বৃদ্ধ তাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন।

একটী রেড়ীর তেলের ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছিল রোগিনীর শয্যা পার্শ্বে। সৌদামিনী পুত্রের দিকে চাহিয়া চোখ নত করিলেন। প্রশান্ত আসিয়া মা'র বিছানার পাশে বসিল। মা'র হাতে হাত বুলাইতে লাগিল। তার মা'র চোখ দিয়া তখন জল গড়াইয়া পড়িতেছে !

খানিকক্ষণ পরে প্রশান্ত ডাকিল···"মা।" সৌদামিনী তার দিকে না চাহিয়াই বলিলেন··· "ভাল কর নি প্রশান্ত।" তাঁর হাত পুত্রের হাতখানিকে চাপিয়া ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল। আর বাহিরে তখন বৃষ্টির জল আরও জোরে পড়িতেছিল। টিনের চালার উপর মেঘের দেবতা যেন তীব্র কষাঘাত করিতেছিলেন।

হঠাৎ এই সময় জল-ঝড়ের মধ্যেই উৎসাহীর দল তার বাড়ীর দরজায় চীৎকার করিয়া উঠিল... "প্রশান্ত ঘৃণ্য, অতি ঘৃণ্য !"

বিমলাবাবু বলিলেন···"ছেলেগুলো কি পাজি। এতদিন এ গরীবদের খোঁজ নেয় নি। আর আজ এসেছে হল্লা করতে। গৃহের আর দু'টি প্রাণী তখন নীরব।

* * * *

তারপর পনের দিন কাটিয়া গিয়াছে। প্রশান্ত দুই-একদিন দোকানে গিয়াছিল। প্রথম দিন তাকে দেখিয়াই তার একটী বন্ধু দোকান হইতে চলিয়া গেল। তারপরে আর একদিন দোকানী বলিল..."আপনি দোকানে এলে খদ্দের আসা বন্ধ হবে।" সেই হইতে প্রশান্ত বাড়ীতে বাড়ীতে বন্দী হইয়া আছে। জেলখানা এর চেয়ে সহস্র গুণ ভাল ছিল। সেখানে সঙ্গী ছিল, খাতির ছিল। এখানে জানালা খুলিয়া রৌদ্র-বাতাসকেও আসিতে দেওয়া নিরাপদ নয়। বাড়ীতে কল নাই, স্নানের জন্য পাশের বাড়ীর পুকুরে যাইতে হয়। লোকের টিটকারীতে তাহাও অসম্ভব। সাহায্যের জন্য সে কয়েকজনের কাছে গিয়াছিল। কেহ বলিয়াছেন···"সুবিধে হবে না।" কেহ বলিয়াছেন···"কেন, সরকার থেকে কি টাকা পাচ্ছ না ?"

শুশ্রূষা ভিন্ন পিতা-মাতার কোন সহায়তাই সে আসে না। আগে বিমলাবাবু এবাড়ী ওবাড়ী

হইতে দুই-একটাকা ভিক্ষা পাইতেন, এখন তাহাও বন্ধ। ছোট সহরে সকলেরই তিনি পরিচিত। পুত্রের কলঙ্ক আজ তাঁর মুখেও কালীর ছাপ দিয়াছে।

প্রশান্ত ফিরিয়া আসায় তাঁর যে প্রসন্নতা হইয়াছিল, তাহা আর নাই। এখন প্রশান্তের অবলম্বন শুধু জননীর সস্নেহ অর্থপূর্ণ দৃষ্টি।

ভীরুতার ছাপ, গুপ্তচরের কলঙ্ক, এমন কি তার চেয়েও বড় বড় গালাগালি তাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। অভিশপ্ত জীবনের এই যে চরম পুরস্কার! মানীর মান যাওয়া যে কত বড় বজ্রপাত, তাহা যে এমন করিয়া বুঝিবে, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

তিন

সহরময় হৈচৈ। কর্ত্তৃপক্ষ সভা বন্ধের হুকুম দিয়াছেন। দেশ-সেবকদের সঙ্কল্প তারা সভা করিবেই।

সভার জন্য তিনটার সময় মিছিল বাহির হইল। সমস্বরে সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল··· "বন্দে মাতরম্···জয় মহাত্মা গান্ধী কি জয়!" আকাশে-বাতাসে শুধু সেই একই ধ্বনি, "বন্দে মাতরম্·· জয় মহাত্মা গান্ধী কি জয়!"

সভার ময়দানে পুলিশ দেশসেবিদের পথরোধ করিল। একজন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী তাদের সভার নিষেধাজ্ঞা পড়িয়া শুনাইলেন। তারপর তিন মিনিট সময় দিলেন ফিরিয়া যাইবার জন্য। ছেলেরা গান ধরিল—

"পড়ে থাকা পিছে
বেঁচে থাকা মিছে···"

তিন মিনিট কাটিয়া গেল। কর্ম্মচারীর হুকুমে লাল পাগড়ীর দল লাঠি উঁচু করিয়া ভলান্টিয়ারদের তাড়া করিল। ছেলেদের মাথায় শ্রাবণের ধারার মত লাঠি পড়িতে লাগিল।

লাঠির আঘাতে অনেকগুলি ভলান্টিয়ার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল, কিন্তু কেহ পিছাইল না। অদূরে কয়েকটা বদ চেহারার লোক ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। জানি না ঠিক তাহাদের নিকট হইতে বা আর কোথা হইতে কতকগুলি ইট আসিয়া পুলিশের উপর পড়িল। দলের মধ্যে কে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল ······"ফায়ার"

রক্তাক্ত কলেবরে প্রশান্ত পুলিশের বন্দুকের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। তার মাথা কাটিয়া চোখের পাশ দিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে। বুকের বোতাম খুলিতে খুলিতে সে বলিল .. "সুট্ মি ফার্ষ্ট।"

পুলিশ ছেলেদের বুক লক্ষ্য করিয়া বন্দুক তুলিল। ছেলেরা চীৎকার করিয়া উঠিল··· "বন্দে মাতরম্।"

পুলিশ-সাহেব বাধা দিবার জন্য ঘোড়া ছুটাইয়া ঘটনাস্থলে আসিবার পূর্ব্বেই শব্দ হইল গুম, গুড়ুম, গুম···প্রশান্ত পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন।

তারপর দিন মৃতদেহের সৎকারের প্রশেসন্ বাহির হইল। সরকার বাধা দিলেন না। প্রশান্তের দেহ লইয়া তার জানালার নীচে আসিয়া ভলান্টিয়ারেরা চীৎকার করিয়া উঠিল—"জয় প্রশান্তের জয়।"

হাজার হাজার লোক শবের পিছনে চলিয়াছে। সকলে নগ্নপদে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতেছে। সৌদামিনী স্বামীকে বলিলেন··· "জানালাটা খুলে দাও।"

জানালা খোলা হইল। আবার জয় প্রশান্তের জয়!"

তার পরদিন বিমলাবাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন···"কোন্ ছেলে আমাদের বড়? যে অপমান সহ্য ক'রে বাপ-মার সেবা করতে এসেছিল সে, না যে এ ভাবে মৃত্যুকে বরণ কর্‌ল?"

সৌদামিনী স্বামীর কথার কোন উত্তর করিলেন না। তিনি অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে আপন-মনে বলিতেছিলেন···"জয় প্রশান্তের জয়!"

বাহাদুর

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ, বি-এ

প্রথম

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বাপ-মা নাম রাখিয়াছিলেন, বাহাদুর। নামের সার্থকতা যদি যাহার নাম তাহার দ্বারা না ঘটে, তাহা হইলে নামই বৃথা। কাজেই ছেলে বাহাদুর হইয়া উঠিল।

খোরাকাঠির মাথায় আলু বসাইয়া দিলে, যদি মানুষের আকার অনুমান করা চলে, তাহা হইলে বাহাদুরের আকৃতি সহজেই বুঝা যাইবে। অথচ, এমন বীরোচিত চেহারাখানিকে প্রাণপণে নাড়া দিয়া সে যখন বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইত, তখন দর্শকমাত্রেরই মনে হইত—"হাঁ, বাহাদুর বটে!" মা হাসিতেন, বাপ হাসিবার মত মুখ করিয়া তাহাতে সায় দিতেন। হাসিটা তাঁহার ঠিক আসিত না।

ছেলে 'গায়ে সারে না' দেখিয়া মা বলিতেন —"সবাই বলে ছেলের গায়ে ক'খানি হাড়, কোন পোষ্টাই ওষুধ খাওয়াও, তোমার সেদিকে খেয়াল নেই।"

বাপ কথাটা চাপা দিয়া বলেন—"পোষ্টাই আপনিই হবে, ওষুধ খাওয়ালে, হয় ত এমন ফুলবে যে, হাড় সমেত…"

মা বাধা দিয়া বলেন—"ষাট্ ষাট্, অমন অলক্ষুণে কথা মুখে এনো না।"

মুখ বাঁকাইয়া বাপ বলেন—"ওর দিকে তুমি আমি তাকাই বলে মনে ভেবো না যে যমও তাকাবে।"

মা রাগ করিয়া উঠিয়া পড়েন, কিন্তু যাওয়া হয় না। ছেলে তখন পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া বলে—"মা, আমি মদ খাব, ঐ বাবার গেলাসে।"

মা বলেন—"ছি, ও কথা বলতে নেই।" ছেলেকে কোলে তুলিয়া ভুলাইতে চেষ্টা করেন; কিন্তু ছেলের নাম বাহাদুর, সে ভুলিবার পাত্র নয়। সে বায়না ধরে—"হাঁ খাব, আমি মদ খাব।"

মা হাল ছাড়িয়া দিয়া চুপ করেন; কিন্তু ছেলে থামে না। সে বলে—"আচ্ছা, দাঁড়াও না, আমি বড় হই আগে, তখন কারও কথা শুনব না। বোতল বোতল খাব।"

ইহার পরে মা আর বলিবার মত কোন কথা খুঁজিয়া পাইলেন না। সাত-আট বৎসর বয়সের ছেলে যখন বোতল বোতল মদ খাইতে চাহে, তখন মায়ের আর বলিবার কি থাকিতে পারে?

বাপ হাসিয়া বলিলেন—"কি গো, থেমে গেলে যে, পোষ্টাই কর।"

মা ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "যাও, তুমি আর জ্বালিও না, বলে…।"

কিন্তু বলা আর হইল না। বাহাদুর হঠাৎ অদৃশ্য কোন প্রলোভনের আকর্ষণে সলম্ফে মায়ের কোল হইতে পড়িয়া ছুটিল।

মাতা সোদ্বেগে পুত্রের অনুসরণ করিলেন; কারণ, পুত্রের লক্ষ্য কোথায়, সে কথা জানা না থাকিলেও লক্ষ্য যে অব্যর্থ ও অনিষ্টকর, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

পিতা পত্নী ও পুত্রের হাত হইতে নিস্তার পাইয়া কাজে মন দিলেন।

কিন্তু কাজ করে কার সাধ্য? মনে হইল, বাহিরে ডাকাত পড়িয়াছে। বিশ-পঁচিশ রকম বীর দর্পের বিরুদ্ধে, পত্নীর সানুনাসিক প্রতিবাদ জ্ঞাপনের ব্যর্থ চেষ্টা ক্রমশঃ অশ্রুসজল হইবার উপক্রম করিতেছে, বিলম্বে হয় ত বান ডাকিবে—

আর সে বানের মুখে বাঁধ বাঁধিতে যাইয়া তাঁহারই প্রাণান্ত হইবে।

ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে যে কাছা অজ্ঞাতে খুলিয়া গিয়াছিল, তাহাকে যথাস্থানে স্থাপনের বারকয়েক ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়া, আজানুলম্বিত ভুঁড়ির উপর বেল্টের অভাবে হাত চাপা দিয়া কান্তিবাবু রণাঙ্গনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন

কান্তিবাবু আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বুক শুকাইয়া গেল। দেখিলেন, কলিকাতার পথে শিশু-প্রিয় দ্রব্যাদি যাহারা 'ফেরি' করে, তাহাদের সমাগমে তাঁহার অঙ্গন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। চানাচুরওয়ালা হইতে ভালুক নাচ প্রভৃতি যত প্রকারের ওয়ালা আছে, তাহাদের সকলেই তাঁহার গৃহে পদধূলি দিয়াছে, এবং 'আর্জি' পেশ হইয়াছে ; এখন বিবিধ ভাষায় যে যাহার পক্ষ সমর্থন করিতেছে। ব্যাপারটা মস্ত সমারোহের—সুতরাং কান্তিবাবু ভাবিলেন, রণে ভঙ্গ দেওয়াই এই ক্ষেত্রে বীরোচিত কার্য্য। কিন্তু শত্রুপক্ষ তাহা শুনিল না। সুদূর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বেহার, মায় উৎকল পর্য্যন্ত ভাষায় সমস্বরে সবিস্তারে এমন বর্ণনা সুরু করিয়া দিল যে, তাঁহাকে সেইখানেই দাঁড়াইয়া এই মিশ্রভাষায় দুর্ব্বোধ্য উক্তিগুলা পরম ধৈর্য্য সহকারে শুনিতে হইল।

তবে সুরাহা এই যে, তিনি প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াও একমাত্র "এহি বাড়ীকা লেড়কা" কথাটি ভিন্ন একটি কথাও বুঝিতে পারিলেন না।

কিন্তু দোদুল্যমান ভুঁড়ি লইয়া তাঁহার সেইখানে একাকী সমস্ত ভারতের লক্ষ্যস্থল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা কষ্টকর হইল। ফলে মাথায় হাত দিয়া বসিতে যাইয়া, হাত ছাড়িতেই অবলম্বনহীন বিপুল উদর, সবেগে সঙ্কীর্ণ কোন কঠিন পদার্থে আহত হইয়া ঝুলিয়া পড়িল, এবং কতকগুলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে আসিয়া পড়িল

কান্তিবাবুর মনে হইল, তিনি বোধ হয় এক যুগ পিছাইয়া গিয়াছেন, এবং শত্রুপক্ষ যুগপৎ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিতেছে। কিন্তু গৃহিণীর উচ্চকণ্ঠে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল ; তিনি নতনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন, এটা দ্বাপর যুগ নহে ; আর যাহা আসিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পড়িয়াছিল, তাহা শত্রুপক্ষের হইলেও নিক্ষিপ্ত শর নহে। চেনাচুর বিক্রেতা মোড়ার উপরে তাহার চানার বারকোষ রাখিয়া অভিযোগ জ্ঞাপন করিতেছিল। কান্তিবাবুর ভুঁড়ির চাপে বারকোষ উল্টাইয়া চালভাজা হইতে নুন অবধি সমস্তই তাঁহার গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। শরশয্যা গ্রহণের আবশ্যক নাই।

গৃহিণী এতক্ষণ সমগ্র ফেরিওয়ালা-সমিতির অভিযোগ শুনিয়া এবং যথাসম্ভব বুঝিয়া তাহাদের উপর যে ক্রোধ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা এইবার কর্ত্তার উপর উজাড় করিয়া দিয়া বলিলেন—"পার না ত এস কেন সব তাতে কর্ত্তাতি করতে।"

কর্ত্তা দেখিলেন ভুল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভুল শুধরাইতে যাইয়া আবার কোন্ কাণ্ড বাধাইয়া বসিবেন, এই আশঙ্কায় মনের সমস্ত শক্তি এক করিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু বিধি বাম। বারকোষ এবং কান্তিবাবুর ভুঁড়ি এই দুইয়ের মধ্যে চানাচুর গরম রাখিবার অছিলায় বারকোষের মধ্যস্থলে যে ধূমশীর্ষ অগ্নাধার স্থাপিত থাকে, তাহা চাপিয়া বসিয়া যাওয়ায় মিনিট খানেকের মধ্যেই কান্তিবাবুর উদরের একাংশ জ্বালা করিয়া উঠিল। তিনি সলম্ফে সরিয়া আসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গুরুভার দেহ লইয়া সরিয়া আসা সম্ভব হইল না ; চেষ্টায় ফলে এবং দাহের জ্বালায় ভুঁড়িটি ঈষৎ নড়িল মাত্র।

ব্যাপার দেখিয়া ব্যবসায়ীর দল তাহাদের অভিযোগ ভুলিয়া কান্তিবাবুর ভুঁড়ির উদ্ধার সাধনে ব্যস্ত হইল। কিন্তু কান্তিবাবু সেদিন

ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি। তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া আলাময় উদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে গৃহিণীকে জিজ্ঞাসিলেন—"ব্যাপারটা কি বল দেখি—আমি ত কিছু ঠাওর করতে পারছি না।"

স্বামীর অবস্থা দেখিয়া গৃহিণী একটু নরম হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"থাক্, এখন আর তোমার এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি চল ওপরে।"

কিন্তু কর্ত্তার নড়িবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি সমস্যার একটা সমাধান করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প। গৃহিণী ব্যাপারটা বুঝাইতে যাইতেছেন, এমন সময় কোথা হইতে বাহাদুর আসিয়া পিতার কাছা ধরিয়া বলিল—"দেখ মা, বাবার কেমন ল্যাজ বেরিয়েছে।" পিতার ধৈর্য্য আর থাকিল না, তিনি প্রবল বেগে ফিরিয়া পলায়নপর বাহাদুরের উদ্দেশ্যে ছুটিলেন। গৃহিণী ব্যাপারটার পরিণাম ভাবিয়া উভয়ের পশ্চাদনুসরণ করিলেন; আর যাহারা এতক্ষণ মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া এই প্রহসন দেখিতেছিল, তাহারা বিবিধ প্রকারের মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে সেইদিনের মত স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

দ্বিতীয়

এহেন বাহাদুর এখন আর আট বৎসর বয়সের বালক নহে। জগতে সেয়ানা হইলে যাহা কিছু জানা এবং বুঝা দরকার, বাহাদুর সে সমস্ত অনেকের চাইতে বেশী জানে এবং অনেক বেশী বুঝে।

আকৃতির দিক দিয়া উন্নতি না হউক, পরিবর্ত্তন কম হয় নাই। নাকের নীচে গোঁফের রেখা পড়িয়াছে। আর জামায় ঢাকা থাকিলে খেংরাকাটীর মাথায় আলু না হইয়া গরাণ খুঁটির মাথায় কালো হাড়ীর কথা দর্শকের মনে আনিয়া দেয়।

চেহারায় যতটা না হোক্, মনে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে অনেকখানি। সে এখন 'নিশিদিন' কোন না কোন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং 'অবসর মত' তাহার রস আস্বাদনও করে। পিতা মারামারি করিয়া বছর চারেক তাহাকে স্কুলে রাখিয়াছিলেন—এখন বৎসর দুই যাবৎ পুত্রের সহিত মিত্রবৎ আচরণ করিয়া নীতি-বাক্য মানিয়া আসিতেছেন। গত্যন্তর নাই। মাতা-পুত্র মিলিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছে, লেখা পড়া জিনিষটার আবশ্যকতা সবক্ষেত্রে সমান নহে। সুতরাং, কান্তিবাবু জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফলে যে সম্পদ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে বাহাদুর বিনা শিক্ষায় অনায়াসে পারিবে। চিন্তা করিয়া মিথ্যা শরীর মাটি করিলে বাহাদুরের সদ্ব্যবহারের উপযোগী অর্থের পরিমাণ হয় ত অল্প হইয়া যাইবে। কান্তিবাবু পিতা হইয়া পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এমন উদাসীন হইলে কোনদিন হয় ত তাঁহাকে পত্নী-পুত্রের অভাবে দুঃখ পাইতে হইবে। সুতরাং তিনি মনে মনে পুত্রের পরিণাম চিন্তা ভিন্ন মুখে আর কিছু বলিতেন না।

"এক্ষুণি দশটা টাকার দরকার মা, না হ'লে চল্‌বেই না।"

"যা না কর্ত্তার কাছে—এখনও আফিস যায় নি।" বলিয়া মাতা পুত্রকে কর্ত্তার বসিবার ঘর নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

বাহাদুর মুখ বাঁকাইয়া বলিল—"ও দেবে না মা—ওর কাছে আমি চাইতে পারব না। তুমি দাও—পরে তুমি ঐ কেপ্পণ বুড়োর কাছ থেকে চেয়ে নিও।"

স্বামীর প্রতি গৃহিণীও এই দোষারোপ করিতেন। পুত্রও যে এই বয়সেই পিতাকে চিনিতে পারিয়াছে, ইহাতে খুসী হইয়া তিনি বলিলেন—"দশ টাকা কি করবি এখন?"

বাহাদুরের উত্তর দিবার সময় নাই—সে কোন

রকমে বলিয়া ফেলিল—"সে অনেক কথা, এসে বলব 'খন, তুমি শীগ্‌গির দাও।"

আপন সঞ্চিত অর্থ হইতে শতবার গুণিয়া দশটি টাকা আনিয়া পুত্রের হস্তে দিতে যাইবেন, এমন সময় কান্তিবাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —"কি কিনতে দিচ্ছ ওই হতভাগাকে ?"

বাহাদুরের মুখ দেখিয়া বোধ হইল,—সর্ব্ব প্রথমে যে মুহূর্ত্তটীর উপস্থিতি সে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছে, পিতার আগমনে সেই অকরুণ মুহূর্ত্ত আসন্ন হইয়াছে।

কিন্তু গৃহিণী সব দিক বজায় রাখিবার জন্ত বলিলেন—"তুমি আবার এখানে কেন এলে বল ত ? সব তাতেই বাড়াবাড়ি।"

কান্তিবাবু মুখ খিচাইয়া বলিলেন—"তুমি কিছু বোঝ না, ওর হাতে টাকা দেওয়া যে ডাইনীর হাতে ছেলের ভার দেওয়া।" তারপর বাহাদুরের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"বেরো বেটা বোম্বেটে দুষ্‌মন কোথাকার।"

গৃহিণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রসনামুক্ত করিতে যাইবেন, এমন সময় মাতা ও পিতার মধ্যে বাহাদুর এক লম্ফে আসিয়া পড়িল, তাহার পর যে কি হইল, সেইটুকু বুঝিতে এই প্রৌঢ় দম্পতীর একটু সময় লাগিল। তবে যখন বুঝিলেন, তখন দেখা গেল, বাহাদুর পিতার অবাধ্যতাচরণ করে নাই; স্থান ত্যাগ করিয়া গিয়াছে বটে, তবে মাতার হস্তে যে দশটী টাকা ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইয়াছে।

তৃতীয়

সেদিন বাহাদুর হঠাৎ মাকে আসিয়া বলিল —"মা, তোমরা কি আমায় ঘরে থাকতে দেবে না

কথাটা মা ঠিক ধরিতে পারিলেন না— জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে বাহাদুরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বোধ করি পুত্রের সমতল মুখাবয়বে কোন্ মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বুঝিতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু বাহাদুর বড় দাগা পাইয়াছে, হালদারদের মল্লিকা আজ তাহাকে যে বিপদে ফেলিয়াছিল, তাহা এজীবনে ভুলিবার নয়। সে চট্ করিয়া বলিয়া বসিল—"হাঁ করে দেখ্‌ছ কি, আমার কি বয়েস হচ্ছে না ?"

মায়ের কাছে আশীবৎসর বয়সেও ছেলের বয়স হয় না—সুতরাং তিনি হাসিয়া বলিলেন— "তোর আবার বয়েস কি, মোটে ত এই সতের।"

"সতের না ত বাহাত্তর হবে না কি—বাবার ত পনের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল।"

কথাটা মা বুঝিলেন -ছেলে আবদার ধরে, কিন্তু নিজের বিবাহ লইয়া যে আবদার চলিতে পারে, সে কথা বোধ করি মায়ের জানা ছিল না। তিনি বলিলেন - "থাম্ থাম্ সে হবে 'খন।" যেন লজ্জা তাঁহারই কথাটা কোনক্রমে চাপা দেওয়া চাই।

বাহাদুর থামে কি করিয়া, একঘাট মেয়ের সামনে মল্লিকা ছুঁড়ী তাহাকে যা-নয়-তাই অপমান করিয়াছে, সুতরাং তাহার থামা চলে না। সে বলিল—"হ্যাঁ থামবো বই কি, দেখ না কি কাণ্ড করি। আমি একমাস দেখব, তারপর আর তোমাদের তোয়াক্কা রাখব না—"

বাহাদুর চলিয়া গেল—মা বোধ হয় আপনাকে রত্নগর্ভা মনে করিয়াই বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া সেই খানে বসিয়া রহিলেন।

বাহাদুর এতদিন ছেলেমানুষ ছিল। কিন্তু এই ছেলেমানুষী ধীরে ধীরে যেখানটায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেখানে আসিলে না কি মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পায়।

কাজেই তাহার কল্পনার মানসী মল্লিকার সহিত একটু বেশী রকম আলাপ জমাইতে গিয়া মুখরা মেয়েটির নিকট সে রীতিমত লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বান ডাকিলে কি বাধ মানে! মল্লিকাকে তাহার চাই-ই—অথচ কি উপায় অবলম্বন করিলে যে কাজটা হাসিল হইবে, বাহাদুর মাথা খুঁড়িয়াও তাহা

স্থির করিতে পারে নাই। নিতান্ত অস্থির হইয়া সে যখন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় তাহার মনে হইল, যেন হঠাৎ তাহার বুদ্ধি খুলিয়া গিয়াছে। মল্লিকাকে বিবাহ করিয়া ফেলিলেই সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যায়।

পাছে সদ্যজাগ্রত কল্পনা আবার কোন কারণে ফাঁসিয়া যায়, এই ভয়ে তৎক্ষণাৎ মায়ের কাছে উপস্থিত হইয়া পুত্রের যে বয়স বাড়িতেছে, এবং সেই বয়স বৃদ্ধির প্রতি যে তাঁহার লক্ষ্য থাকা উচিত, তাহাই তাঁহাকে বুঝাইতে গেল, কিন্তু নিতান্ত ব্যস্ত এবং বিক্ষিপ্ত মন লইয়া আসায়, আসল কথাটাই সময়কালে মনে পড়িল না। ফলে মা ছেলের অভিপ্রায় বুঝিয়াও তাহার লক্ষ্য-স্থল নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। তা ছাড়া, ছেলের এই নির্লজ্জ বেহায়ামি দেখিয়া একটু বিচলিত হইতেই, বাহাদুর বেগে প্রস্থান করিল বলিয়া ভাল করিয়া বুঝিবার অবসরও তাঁহার হয় নাই।

কিন্তু মায়ের অবসর থাকা-না-থাকার কোন মূল্য নাই। বাহাদুর যে সেয়ানা হইয়াছে এবং অবিলম্বে ইহার একটা ব্যবস্থা না করিলে ব্যাপার আরও গুরুতর দাঁড়াইতে পারে, এইটুকুই যথেষ্ট। কাজেই তিনি পুত্রের দুই হাত চার হাতের চেষ্টায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন এবং দু'-চারদিনেই পুত্রের মানসীর সন্ধানও করিয়া লইলেন

সেদিন হঠাৎ মায়ের কাছে উপস্থিত হইয়া বাহাদুর দেখিল যে, সেখানে বিপুল সমারোহ! মেয়ের দলে দালান প্রায় জনাকীর্ণ। বাহাদুরের মুখমণ্ডল হইতে নৈরাশ্য আর বিরক্তি মুছিয়া গিয়া ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বাহাদুরের বিপক্ষে বলিবার মত অসংখ্য অভিযোগের একটাও উল্লেখ না করিয়া, কি একটা নূতন, অথচ উপভোগ্য বিষয়ের আলোচনায় তাহারা তৎপর।

ক্ষণকাল পরে যাহা শুনিল, তাহা বিশ্বাস করা যায় কি না ভাবিতে ভাবিতে সে শুনিল, মায়ের কোন কথার উপরে মল্লিকার পিসী বলিলেন—"তোমার মত হ'লে যেদিন বলবে দু' হাত এক হয়ে যাবে। বাপ-মা-মরা মেয়ে, একটা গতি তুমি তার কর।"

মা বলিলেন—"দেখছ ত আমার এই কচি ছেলে, ছোট-খাট একটী সুন্দরী মেয়ে হলেই ভাল হ'ত; তা তোমরা সবাই যেকালে বলছ, আমি মল্লিকাকেই ছেলের বৌ করব।" পরে বাহাদুরকে দরজার নিকট দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন—"দেখ ত বাবু ঘরে আছেন কি না?"

বাহাদুর যে দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিবে, এতখানি ধৈর্য্য তাহার তখন থাকিতে পারে না, সে হাঁ করিয়া বলিয়া বসিল—"বাবা আছে তার অফিস ঘরে, আমি এই দেখে আসছি। ডাকব এইখান থেকে?"

বাহাদুরের তাড়া দেখিয়া মা বলিলেন—"আচ্ছা, বা তুই কোথা যাচ্ছিলি; আমি যাচ্ছি তাঁর কাছে।"

বাহাদুর শেষ না জানিয়া যাইতে চাহে না—কিন্তু কি জানি পিতা আসিয়া আবার কি কাণ্ড বাধাইবেন ভাবিয়া অনিচ্ছাসত্বেও স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। বাহাদুর সেখান হইতে গেল বটে, কিন্তু বাড়ীর বাহির হইল না। সকলে চলিয়া যাইতে-না-যাইতে মাকে আসিয়া ধরিয়া-পড়িল—"কি বল্লে বাবা, রাজী হয়েছে? অ্যাঁ! বল না, রাজী হয়েছে ত?"

পঞ্চম

বাহাদুরের পিতা-মাতার সৌজন্যে এবং বিধাতার নির্ব্বন্ধে চারি হাত এক হইল বটে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বাহাদুর আবিষ্কার করিল যে, এই চারি হাত এক না হইলেই ভাল হইত।

সে দেখিল, মল্লিকাকে বাগ মানান তাহার

বাহাদুরীতে কুলাইবে না! প্রথমতঃ, কাছে ত তাহাকে পাওয়া যায়ই না—আর যদি বা কোন দিন তালে-গোলে সেই সুবিধা ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে সে রাত্রি বাহাদুরের 'দোর গোড়ায়' দাঁড়াইয়া কাটান ছাড়া উপায় থাকে না। অথচ, ইহা লইয়া সোরগোল করিলে যে অনর্থ ঘটিবে, বাহাদুর এক আঁচড়েই তাহা বুঝিয়া লইয়াছে।

সেদিন অকারণেই ঘরে আসিয়া বাহাদুর দেখিল মল্লিকা; তাহার মনে হইল, আজ যখন হাতের কাছে পাওয়া গিয়াছে, তখন এ সুবিধা সে হাতছাড়া হইতে দিবে না। বাহাদুর নিঃশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিতে যাইয়া এমন একটা প্রচণ্ড শব্দ করিয়া বসিল যে, মল্লিকার ত কথাই নাই, সার বাড়ীর দাসী-চাকর পর্য্যন্ত শঙ্কাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিল। লাভের মধ্যে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে বাহাদুরের জীবনান্ত। সুতরাং, এই অবসরে মল্লিকা যে কোন্ ফাঁকে বাহির হইয়া গিয়াছে, বাহাদুরের তাহা খেয়ালই হইল না, বা হইবার অবকাশও পাইল না। কিন্তু খেয়াল যখন হইল, তখন মল্লিকা যে বাড়ীর কোন্ খানে যাইয়া আত্মগোপন করিয়াছে, হাজার চেষ্টা করিয়াও বাহাদুরের পক্ষে তাহার সন্ধান করা সম্ভবপর হইল না।

ইহার পরে যাহা ঘটিল, তাহাতে বাহাদুরের কিছুদিন পত্নীর অনুরাগ আকর্ষণের অবসর আর ঘটিয়া উঠিল না। মাস দুয়েক অগ্রপশ্চাৎ কান্তি-বাবু সস্ত্রীক স্বর্গারোহণ করিলেন; এবং চারিদিক হইতে গোলমাল আসিয়া বাহাদুরের তরুণ প্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে ওলট-পালট করিয়া দিয়া যখন সরিয়া দাঁড়াইল, তখন দেখা গেল, মল্লিকা অনেক দূরে, আর তাহার পিসী ভ্রাতু-ষ্পুত্রীর অগোছাল সংসারের ভার লইয়া সুখে ঘর-সংসার করিতেছেন। বাহাদুর চাকরী খায় আর বাহিরে বাহিরে কাটায়। ঘরমুখো হইতে গেলে পিসী-ভাইঝীতে মিলিয়া এমন একটা সোর-গোল বাধাইয়া দেয় যে, বাহাদুর পলাইয়া বাঁচে—বাঁচা ছাড়া যখন উপায়ই নাই।

সেদিন কি কারণে পিসী গৃহে অনুপস্থিত। সংবাদটা বাহাদুরের মনে একটা লোভ জাগাইয়া দিল। সে সটান নিজের ঘরে যাইয়া দেখিল, মল্লিকা চুল বাঁধিতেছে। বাহাদুরের বুকের মধ্যে তখন বিপ্লব বাধিয়া গিয়াছে। দূর হইতে অনেক নারীকে সে দেখিয়াছে, কিন্তু কাছে দাঁড়াইয়া নিজের স্ত্রীকেও এমন করিয়া দেখিবার সৌভাগ্য পূর্ব্বে তাহার ঘটে নাই। সুতরাং, এসব ক্ষেত্রে ঠিক কি করিয়া কি করিতে হয়—তাহা বাহাদুরের অভিজ্ঞতার বাহিরে। কাজেই, সে কিছুকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল —"আমি···"

মল্লিকা মুখ না তুলিয়াই জবাব দিল—"অনেকক্ষণ দেখেছি, কিন্তু কেন?"

বাহাদুরের স্বামীত্ব গর্জ্জিয়া উঠিল—সে অতি মাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল—"আমার ঘর আমি আসব না না কি?"

মল্লিকা যেন সে কথা শুনেও নাই, সে তাহার কথারই জের টানিয়া বলিতে লাগিল—"লজ্জার মাথা এমন করে আর কে খেয়েছে—যেমন চেহারা, তেমনি বুদ্ধি!"

চেহারা যাহাই হউক, বুদ্ধি তাহার নাই, এমন অপবাদ বাহাদুরের মাও দিতে পারেন নাই। মল্লিকা কি না স্ত্রী হইয়া তাহাকে এই অপবাদ দেয়। বাহাদুর বুদ্ধির দৌড় দেখাইতে যাইয়া একটা ভয়ঙ্কর কিছু করিবে স্থির করিতেই পশ্চাতে পিসীর ঝঙ্কার শুনা গেল—"ওখানে দাঁড়িয়ে আবার কি ঢং হচ্ছে শুনি?"

বাহাদুরের মাথা তখন ঘুরিয়া গিয়াছে—সে আত্মরক্ষার আশায় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে গেল, কিন্তু অকস্মাৎ ফিরিতেই নাকের উপর দরজাটা সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। বাহাদুরের মনের অবস্থা যে কি, তাহা সে নিজেই ঠিক বুঝিতে

পারিতেছিল না। তাহাকে বাঁচাইল নিতাই। বাহাদুর লগুড়াহত জীববিশেষের মত সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া বন্ধুর কাছে আশ্রয় লইল।

সেদিন রাত্রিতে এক বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিল। অধিক রাত্রে সোরগোলে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া বাহিরে আসিয়া সকলে দেখিল, বাহাদুর শয়ন-গৃহের দ্বারের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া আপন-মনে স্খলিতস্বরে যাহা বলিতেছে, তাহা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিবে না,—এমন মানুষ মনুষ্য নামধেয়ের মধ্যে একালেও মিলিবে না। তাহার মুখ হইতে এক প্রকার তীব্র গন্ধ বাহির হইয়া স্থানটাকে অসহ্য করিয়া তুলিয়াছে। পিসীমা চাঁচা গলায় বাড়ী মাথায় করিলেন। তখন একদিকে মাতাল গৃহস্বামী, আর অপর দিকে তাহার শ্বশ্রূসম্পর্কীয়ার সম্পর্ক বিরুদ্ধ উচ্চ আলাপে চাকর-দাসীরাও মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল, কিন্তু মল্লিকার কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

মাতাল অনেক বকিয়া তখন একটু স্থির হইয়াছে, এমন সময় পিসীমা আদেশ করিলেন—"ওটাকে বাইরে রেখে আয়।"

চাকরেরা ধরাধরি করিয়া বাহাদুরের দেহ তুলিয়া লইয়াছে,—এমন সময় মল্লিকার রুদ্ধ দুয়ার হড়াৎ করিয়া খুলিয়া গেল এবং সকলকে বিস্মিত করিয়া দিয়া সে নিজের গৃহের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"এই, বিছানায় শুইয়ে দিগে যা।"

ক্ষণকাল পরে যখন দেখা গেল, মাতাল ঘরে থাকিতেও মল্লিকা দরজা বন্ধ করিয়া দিল, পিসীমার মুখ হইতে তখন বাহির হইল—"ও বাবা, তাই এত!"



বিধাতার আল্পনা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এগার

সেদিন নিরাশার আর্ত্তনাদ বুকে বহিয়া অপর্ণা বাড়ী ফিরিল; কিন্তু কিছুতেই অভি যোক্তার পদে দাঁড়াইয়া কল্যাণের বিরুদ্ধে মনকে দৃঢ় করিতে পারিল না। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে যত চিন্তার গেণ্ডুয়াই সে মনের কোণে ফেলিয়া আলোড়ন করিতে চায়, ফলে কল্যাণের সমস্ত অপরাধ পশ্চাতে ফেলিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়,—সলিলা। বাস্তবিক যত কিছুর নিয়ামক ত সেই।

অপর্ণা স্থির সিদ্ধান্ত করিল, যাক্ পরের হাঙ্গামা ঘরে ঢুকাইয়া সে আর মাথা গরম করিবে না। কিন্তু করিব না বলা এক কথা, আর মনের ভিতরের গোপন-পটে আঁকা ছবি নিঃশেষে মুছিয়া ফেলা ঠিক তার বিপরীত। কাজেই চিন্তাকে ত থামাইয়া রাখা চলিল নাই, বরং তার ফাঁকে কখন সে নিজেকে পর্য্যন্ত হারাইয়া বসিল।

মানুষ ত! অভিমান ব্যাধি হোক্, কিন্তু এক্ষেত্রে যে কত বড় স্বাভাবিক, তা মনে-প্রাণে অপর্ণা জানে, বুঝে, অনুভব করে। তাই বিশ্বের বিরুদ্ধে কল্যাণের এ অভিমান সে সমর্থন করিতেই প্রস্তুত।

হঠাৎ কাহার ডাকে চমক ভাঙ্গিল; অপর্ণা চাহিয়া দেখিল, অজ্ঞাতে কখন চুরি করিয়া বেলাটা অনেকখানিই বাড়িয়া গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া বলিল, "চা আনব বাবা?"

কিন্তু পিতা তাহার সে তল্লাটেই ছিলেন না; পরিবর্ত্তে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সলিলা মুচকি মুচকি হাসিতেছিল। অপর্ণা অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! এ লোক এ ভাবে তাহাদের বাড়ীতে, এ যে চোখে দেখিলেও বিশ্বাস হয় না!

সলিলা হাসিয়া বলিল, "খুব আশ্চর্য্য করে দিয়েছি, না বোন্? কিন্তু ভাইটী আমার কাছে যে কত বড়, তা যদি জানতে, তা হ'লে মোটেই—"

অপর্ণা চঞ্চলকণ্ঠে বলিল, "সে থাক্, এলেন কখন?"

সলিলা ধীরকণ্ঠে বলিল, "এই ত; গাড়ীর দোলা এখনও শরীরের মধ্যে খানিকটা আছে। বাবু কোথায়?"

"কে বাবা? এইখানেই ত ছিলেন, দেখ্‌ছি। কিন্তু এ বিধর্ম্মীদের ঘরে অন্ততঃ হাত-মুখ ধোয়াটা চল্‌বে কি?"

সলিলা হাসিয়া বলিল, "শুধু চল্‌বে না দিদি, এবাড়ীতে থাক্‌তেও হবে। ভায়ের যে গতি, বোনকে তা' থেকে বাইরে গেলে চল্‌বে কেন?"

অপর্ণার চক্ষের সম্মুখে সলিলার এ ব্যবহার যেন একটা আলোর সন্ধান আনিয়া দিল। তাহার এত বড় খোঁচার ঘা গায়ে না মাখিয়া কেহ যে এমন করিয়া মধু ঢালিয়া দিতে পারে, এ যেন তাহার কল্পনার বাহিরে। নিজের রূঢ় ব্যবহারের জন্য সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যথার আঁচও তাহার প্রাণে বাজিয়া উঠিল; সে অন্যমনা হইয়া মুখ নত করিল।

সলিলা বলিল, "রক্তের টান যে দিদি, এ কি ভিন্ন হয়। কল্যাণ রাগ করে থাক্‌তে পারে, কারণ, সে ছোট ভাই, পুরুষ; বড় বোন হয়ে

আমার ত তা খাটে না—দেখ না, ছুটে আসতে হ'ল। ভাল আছে ত?"

অপর্ণা ধরাগলায় বলিল, "কিন্তু সে ত আসে নি দিদি।"

শেষের দিকের সম্পর্কের সম্ভাষণটা অজ্ঞাতেই বাহির হইয়া গেল - হয় ত সেটা মুহূর্ত্তের উত্তেজনার ফল। অপর্ণা কিন্তু তাহা শুধরাইয়া লইবার মোটেই চেষ্টা করিল না; কারণ, অনিচ্ছায় হইলেও সে বুঝি মনে প্রাণে অনুভব করিল,—এ ডাকের পিছনে অনেকখানি তৃপ্তি আছে।

সলিলার বুকে এ 'আসে নি' কথাটা তখন বড় জোরেই ধাক্কা দিয়াছিল, সে তাল সামলাইয়া লইতে খানিক নীরব রহিল, তারপর ধীরকণ্ঠে বলিল, "হাতে পেয়েও ধরে রাখতে পারলি না বোন?"

অপর্ণা আনুপূর্ব্বিক ঘটনাটা জানাইয়া দিয়া বলিল, "বড় আশা করেছিলুন, অন্ততঃ, ষ্টেশনে এসে তাঁকে দেখতে পাব! বাবা কত বড় অসহায়, তা আমার চেয়ে তিনি কম জানেন না—তাঁকে যে এমন করে ফেলে যেতে পারেন, এ আমি এখনও কল্পনায় আনতে পারছি না দিদি!"

মাধব আসিয়া বলিল, "ধুলো পায়ে কালী-দর্শন এবেলা কি তা হ'লে থাকবে দিদিরাণি, না মোটর দাঁড়াতে বলব?"

সলিলা উদাস-দৃষ্টিতে খানিক শূন্যের দিকে চাহিয়া রহিল। অপর্ণা আগ্রহভরে বলিল, "তাই চলুন দিদি, এমন অবস্থায় দেবতার পায়ে নিবেদন আপনাদের সমাজের ত বিধি।"

কথাটা বলিয়া সে বেশ একটু জিজ্ঞাসু-ভাবেই সলিলার মুখের দিকে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। মাধব কহিল, "দেওয়ানজীও বলছিলেন, মায়ের পূজা বিশেষ করেই দিতে—"

একটা টানা নিশ্বাসে বুকের বোঝা অনেকটা নামাইয়া দিয়া সলিলা বলিল, "তুমি কি যেতে পারবে অপর্ণা?"

"পারব না! রসো, বাবাকে ধরে নিয়ে আসি।"

সলিলা কোন কিছু বলিবার অগ্রেই সে সদানন্দবাবুর বসিবার ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল।

* * * *

পূজা অন্তে সবারই মন অনেকটা হাল্কা দেখা গেল। সলিলা বলিল, "আমি কিন্তু আশাই করতে পারি নি যে আপনি আসবেন।"

সহজ সরল বালক বৃদ্ধটি একথায় বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিলেন; বলিলেন—"আমাকে একটা মস্ত বড় কালাপাহাড় ধরে নিয়েছিলে, না সলিলা—আমি—"

তিনি হয় ত আরও কিছু বলিতেন, অপর্ণা কিন্তু বাধা দিয়া বলিল, "আমি বলি, পূজার আর একটা দিক্ বাকি, এত কাছে এসেও মূক জীব-গুলোকে—"

সদানন্দবাবু বালকের উৎসাহেই বলিলেন, "খুব ভাল প্রস্তাব; কি বল সলিলা, বেশ হবে। বুড়োর হাত থেকে তারা যখন কেড়ে কেড়ে খাবে, ওঃ, সে কি আনন্দ!"

চোখ বুজিয়া কল্পনায় যেন তিনি তখন হইতেই সে আনন্দে ভরপুর হইয়া গেলেন। এদিকে হাতের ছড়ি গাছটার যে কি গতি হইল, তাহা তিনি দেখিবার অবকাশও পাইলেন না। সলিলা তাহা তাঁহার হাতে দিলে অপর্ণা হাসিয়া বলিল, "অদ্ভুত মানুষ দিদি, আমার এই বাবাটি! খেয়াল কোন কিছুতেই নেই। তা আগুন ধরে যদি ওঁর জামার খুঁটটাও জলতে থাকে, হয় ত টেরই পাবেন না। কম সামলে কি আমাকে চলতে হয়।"

তাদের লক্ষ্যস্থল বৃদ্ধ তখন সযত্নে খাবারের ঠোঙাটী পকেটে পুরিতেছিলেন। পরিমাণের তারতম্যে একটী যে আর একটীতে তার স্থান সঙ্কুলান করিয়া লইতে সম্পূর্ণ অক্ষম, সে খেয়ালই

তাঁহার ছিল না। সলিলার অতীত দিনের কথা মনে পড়িল,—বালক কল্যাণের বহু পূর্ব্বের সেই ছায়া চিত্রটী,—যা চিরদিন স্মৃতির সহিত জড়িত হইয়া আছে! ঠিক্ এমনি যত্নে, এমনি আগ্রহে নিত্যতাহার আপ্নভোলা বৈরাগী ভাইটীকে দেখিতে হইত! একদিন দৃষ্টির আড়াল হইলে হয় ত তাহার খাওয়া-দাওয়ার কথাই মনে পড়িত না! কয়দিন মাত্র সে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিল, কিন্তু বিধাতার নিষ্ঠুর দণ্ড বুকে লইয়া বিধবার বেশে যেদিন সে চিরকালের মত পিত্রালয়ে আসিয়া ঢুকিল, সেদিন তাহার নিজের দুঃখের অপেক্ষা কল্যাণের অযত্ন-শীর্ণ দেহটীর জন্যই তাহার মন হাহাকার করিয়া উঠিয়াছিল! আর আজ?

হঠাৎ একটা জরুরি কথা মনে পড়িয়া যাওয়ার বৃদ্ধ লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—"এক গাড়ীতে গায়ে গায়ে বসে যাওয়া ত যাবে না; কিন্তু, এই অবেলায় গিয়েও আবার তোমার স্নান করতে হবে ত?"

লজ্জায় অপর্ণার কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। এর পর মুখ তুলিয়া সলিলার দিকে চাওয়াটা কোন প্রকারেই সে কর্ত্তব্যের মধ্যে ধরিতে পারিল না।

রক্তলিপ্সু বাঘের খাঁচার দিকে সেদিন কাহাকেও যাইতে দেওয়া হইতেছিল না; শোনা গেল, কোন দর্শককে না কি সে সেদিন ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

বার

প্রাণ ঢালা সেবা ও যত্নের মধ্য দিয়া চিত্রা কল্যাণকে আরোগ্যের পথে টানিয়া আনিল সত্য, কিন্তু তাহার মুখের বিষণ্ণতা এবং দেহের অবসাদ দূর করিতে পারিল না। দিন দিন সে যেন বিছানার সহিত মিশাইয়া যাইতে লাগিল। উদ্বেগ চিত্রার বুকের আলোড়ন মুখে ফুটাইয়া এমন একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল, যাহাতে মা-বাবা ত ভয় পাইলেনই, বাটীর চাকর-লোকজনও পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। সবারই মুখে এক প্রশ্ন, "দিদিমণির এ হ'ল কি?"

কি হইল বা হইয়াছে মা বুঝিলেন অনেকখানি, বাপ বুঝিলেন কিছু কিছু, তখন উভয়ে মিলিয়া অনেক যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিলেন, কিন্তু কোন কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অগ্রেই ডাক্তার সাহেবের দিক হইতে হুকুম আসিল, ইহার পর বায়ু পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক। মা-বাপ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। মানুষের নিয়মই যে তাই, নিজের চিন্তা পরের ঘাড়ে চাপাইতে পারিলেই তাহারা বাঁচিয়া যায়।

আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে যেন একটা ভিন্নরূপ আসিল। কল্যাণের মুখের চির বিষাদ কালিমার ফাঁকে যেন একটা তৃপ্তির দীপ্তি বিকাশ পাইল, আর সেইটুকু লক্ষ্য করিয়াই বুঝি চিত্রা অনেকখানি শান্ত হইল—কাজেই বুড়া-বুড়ীর ত কথাই নাই।

গাড়ী আসিলে চিত্রা বলিল, "এইবার আমার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়ান দেখি। কি মানুষ, দেহে এককড়ার বল নেই, তবু জেদ ছাড়বেন না; নিন্, ঘুরে পড়ে আর আমার মাথাটা খাবেন না!"

কল্যাণ মাথা তুলিয়া একবার চিত্রার দিকে চাহিল, মুখে কিন্তু কোন কথাই বলিল না।

দুইজন চাকর একখানা চেয়ার লইয়া আসিল। চিত্রা ধীরে ধীরে কল্যাণকে তুলিয়া তাহার উপর বসাইয়া দিয়া একখানা শাল বেশ ভাল করিয়া তার সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া দিল। তার পর ত্বরিত হস্তে একবাটি গরম দুধ তার মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "এটুকু খেতে আপত্তি তুল্লে চল্‌বে না; ওদের ত বুদ্ধি, নিয়ে যাবে হ্যাচ্যাং হ্যাচ্যাং করতে করতে, পথেই না ভিরমী

যান। তবু গায়ে একটু বল পাবেন,—ফল দু'-এক টুকরো? না, সব তাতেই 'না', আপনার ও 'না' আমি শুনবই না।

পথে কয়েকটী ভিখারী দাঁড়াইয়াছিল। চিত্রা হাতছানি দিয়া তাদের নিকটে ডাকিল, তারপর স্নিগ্ধ দীপ্তিভরা নয়নপল্লব কল্যাণের দিকে ফিরাইয়া বলিল, "আপনার টাকা থেকে আপাতঃ গোটাকতক ধার নিলুম কল্যাণবাবু?"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কল্যাণ অবাক বিস্ময়ভরা মুখ তুলিয়া বলিল, "আমার টাকা! সে কি?"

চিত্রা হাসিয়া বলিল, "বটে, যে লোক বালিশের তলায় রোজ রোজ টাকা ফেলে ভুলে যায়, তাকে জিজ্ঞাসা করাই আমার ভুল হয়েছে। চাকর-নফরে যে কত খেয়েছে, জানি না, আমার হাতে জমেছে বেশ মোটামুটি কিছু, দিনের পর দিন যাচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে বয়ে আনা টাকাগুলোও—আপনার কিন্তু হুঁসই নেই। এই লছমন, এই নোটখানা নিয়ে বেচারাদের মিষ্টি কিনে দিগে।"

কৃষ্ণকিশোরবাবু কল্যাণকে গৃহে আনিবার সঙ্গে সঙ্গে অফিসের কাজে নিয়োগ করিয়াছিলেন—এবং একদিনেই তাহার আগ্রহ ও তৎপরতা দেখিয়া অনেক কিছু ভারই তাহার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছিলেন—পরের নিছক গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইল না জানিয়া কল্যাণও সানন্দে তাহা মাথায় তুলিয়া লইয়াছিল। এই নেওয়া-দেওয়ার ভিতর অর্থের একটা গোপন সম্বন্ধ ছিল; হাত খরচার জন্ম পরের মুখ চাহিয়া থাকা যে কতটা কষ্টকর, কৃষ্ণকিশোরবাবু তাহা অনুভব করিতেন এবং সেই জন্মই নিত্য পাঁচ টাকার একখানা নোট কল্যাণের বিছানার নিম্নে ফেলিয়া আসিতেন।

আত্মভোলা কল্যাণের কিন্তু তাহা দেখিবার স্পৃহা বা অবকাশ একদিনও হইত না। এদিকে হাতে তুলিয়া দেওয়ার অপমান পাছে কল্যাণ সহ্য না করে, এই ভয়ে বাড়ির কর্ত্তাটিও পূর্ব্বোক্ত অনুরূপ ব্যবস্থার কোন ওলট্-পালট্ করিতে ভরসা পান নাই। কাজেই এ দেওয়ার খবর কল্যাণের নিকট একদিনও পৌছায় নাই বা পৌছাইলেও সে দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি দিবার আবশ্যক সে মনেও করিত না।

কিন্তু চিত্রার সতর্কদৃষ্টি কল্যাণের প্রত্যেক খুঁটিনাটি কর্ত্তব্যের উপরেই ছিল। বাপের এ দানের খবর না জানিলেও একটা কিসের আকর্ষণে প্রতিদিনই বিছানাটা নিজের হাতে ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া পাতিয়া রাখিবার লোভ সে যেন সংবরণ করিতে পারিত না। আর সেই না পারার ভিতর দিয়া নিত্য লাভ করিত সেই ফেলিয়া যাওয়া অর্থগুলি। প্রথম প্রথম সে কল্যাণকে অনুযোগের ভিতর দিয়া বুঝাইতে গিয়া দেখিল, কথাটা যাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে, তাহা তাহার নিছক স্মৃতির বাহিরে; তখন অনুযোগটা রূপান্তরিত হইয়া অন্য কিছুতে পরিণত হইল। চিত্রা ভাবিল, এই আত্মভোলা লোকটীর সকল ভার নিজের স্কন্ধে তুলিয়া না লইতে পারিলে—চাকর-নফরদের হাতে পড়িয়া তাহাকে মারা যাইতে হইবে।

কাজেই প্রাত্যহিক কার্য্যের মধ্যে চিত্রার এ কাজটিও বাড়িয়া গেল। মুখে খানিক অনুযোগের সুর সে নিত্যই তুলিত কিন্তু কল্যাণের কাছে তা সম্পূর্ণ অবোধ্যই থাকিয়া যাইত। নিত্যই নিজের কাজের ফাঁকের দোষগুণ সে মনে মনে অনেক আলোচনা করিত, কিন্তু ঠিক ঠিক কারণটী খুঁজিয়া না পাওয়ার অপরাধে সে নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হইয়া থাকিত।

অন্তকার একথায় তার আগাগোড়া স্মৃতিটা আর একবার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল, কিন্তু হাতের কাছে হাতড়াইয়া সে কিছুই খুঁজিয়া পাইল না।

ভিখারীদের আনন্দ চীৎকারে পথের অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

একখানি মোটর ছুটিয়া পাশ দিয়া বাহির হইয়া যাইবার মুখে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। চিত্রাদের মোটর তখন অনেকখানি পথ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

শেষোক্ত মোটরখানি হইতে শব্দ আসিল, "দিদি, দিদি, চেয়ে দেখ এদিকে, তিনিই না?"

সলিলা ঝুঁকিয়া পড়িয়া গতিশীল মোটরখানির দিকে চাহিল, বলিল, "হাঁ, কল্যাণই ত; কিন্তু চলে গেল যে, কাকে জিজ্ঞেস করা যায়?"

কিন্তু জিজ্ঞাসা করিবার মত আগ্রহ বা অবকাশ অপর্ণার হইল না, উৎকণ্ঠে সে সোফারকে ডাকিয়া বলিল, "ওই অষ্টিন মোটরকার, পিছু নাও।"

কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া সোফার মাথা নাড়া দিয়া বলিল, "ধরা যাবে না, মিছে চেষ্টা।"

অপর্ণা কিন্তু দমিল না, বলিল, "চালাও, শেষ পর্য্যন্ত না হয়, তখন দেখা যাবে'খন।"

দৈব যেখানে বিরূপ, সেখানে মনুষ্য শক্তির বিকাশ সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াই যেন পথের মধ্যে এক অন্ধকে চাপা দিয়া মোটর নিশ্চল হইল। পুলিশ আসিয়া সোফারের নাম, ঠিকানা, নম্বর ইত্যাদি লইবার পর যদিও গাড়ী চলিল বটে, কিন্তু চলার পথে নয়,—হাসপাতালে। সলিলা জেদ করিয়া মেয়েটীকে গাড়ীতে তুলিয়া লইল, বুঝি জীবন-শেষের ক্ষীণ প্রদীপটির সলিতাটি উস্কাইয়া দিতে।

ঘণ্টা দুই পরে ফিরিবার পথে অপর্ণা বলিল, "যে গাড়ী-বারান্দায় মোটরটা ছিল, দেখ্‌লে হয় ত চিনতে পারব। চলুন না, একবার খোঁজ নিতে দোষ কি?"

বিদেশ যাত্রীদের ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দিয়া সোফার সবেমাত্র ফিরিয়া আসিয়া গাড়ীখানা গ্যারেজে তুলিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ পিছনে ডাক শুনিয়া ফিরিয়া চাহিল। ভদ্রমহিলাদের সম্মান দিতেই যেন তাড়াতাড়ি গাড়ী ছাড়িয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া অভিবাদন করিল।

অপর্ণা ধীরকণ্ঠে বলিল, "কল্যাণবাবু বলে কেউ এখানে থাক্‌তেন?"

সোফার আর একবার সেলাম দিয়া বলিল, "জী, হুজুর।"

অপর্ণা গলা খাকারি দিয়া ভারিগলায় বলিল, "তিনি ফিরেছেন?"

সোফার সসম্ভ্রমে বলিল, "নেহি হুজুর, হাওয়া বদলনে পুরী গিয়া—"

সলিলা এবার কথা কহিল, বলিল, "বাবুর কি কোন অসুখ হয়েছিল?"

"জী, হুজুর।"

উৎকণ্ঠিত-কণ্ঠে অপর্ণা বলিল, "সেরেছেন ত?"

"হাঁ হুজুর, ডাক্তারবাবু হুকুম দিয়া পুরী যানে…"

জানিবার অনেক কিছু রহিল, কিন্তু ইহার পর সামান্য চাকরের নিকট আর বেশী কিছু আদায় করা চলে না, কাজেই "আচ্ছা এই নাও তোমার বকশিস" বলিয়া সলিলা হাত বাড়াইয়া দিল।

হঠাৎ দুইপদ পিছাইয়া গিয়া সোফার টুপি স্পর্শ করিল, বলিল, "নেহি হুজুর, সাহাব গোসা করেগা।"

"না, না, রাগ করবেন না, তুমি নাও।" বলিয়া হাতের টাকা ফেলিয়া দিয়া সলিলা নিজের সোফারের দিকে ফিরিয়া বলিল, "চালাও, ঠিক হ্যায়।"

বাড়ী আসিয়া সলিলা সাগ্রহে অপর্ণার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আজই আমি সিন্নি দেব অপর্ণা।"

"কিন্তু এ বাড়ীতে পুরুত..."

"সে জন্যে ভাবনা হবে না ভাই, দেবতার কাজ মানুষে করে না। জুটে যাবে।"

ফর্দ্দ লইয়া লোক বাজারে ছুটিল। একখানি ঘর নিজ হাতে আগাগোড়া গঙ্গাজলে ধুইয়া সলিলা দেব-অর্চ্চনার যোগাড়ে মনোনিবেশ করিল। দূরে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ অবধি একমনে তার প্রতি খুঁটিনাটি কাজটি অভিনিবেশসহকারে দেখিতে দেখিতে অপর্ণা বলিল, "আচ্ছা দিদি, ইচ্ছে যদি হয় গোটা ফল কিছু কিনে দিতে, বিধর্ম্মী বলে তোমার দেবতাও কি আপত্তি তুলবেন?"

সলিলা স্থির-দৃষ্টিতে খানিক অপর্ণার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; পরে বেশ প্রফুল্ল-কণ্ঠেই বলিল, "তা কেন বোন্, দেবতার মনে কি ভেদাভেদ আছে। মরি আমরা মানুষগুলোই ঝগড়া-কাটা-কাটি করে। দেবতা তোমারও যিনি, আমারও তিনিই, কেবল নামের হের-ফের বই ত নয়!"

খুসি হইয়া অপর্ণা ছুটিয়া চলিল; বলিয়া গেল, "দাঁড়াও দিদি, স্নানটা সেরে আসি, গঙ্গাজল তোলাই ত আছে।"

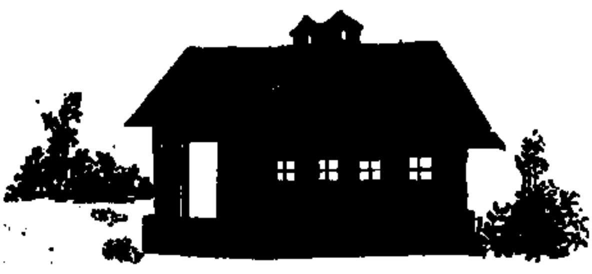
বড় যত্নে অপর্ণা সেদিন দেবসেবার প্রত্যেক কাজটী নিজ হাতে করিল। আসনে দেবতার ছবিটী রাখিয়া ফুলে ফুলে এমন করিয়া সাজাইল, যাহাতে সলিলার মুখে তৃপ্তির আনন্দ ফুটিয়া স্থায়ী-ভাবেই বিরাজিত রহিল। সে হাসিয়া বলিল, "এরপরও যদি পুরুত না পাওয়া যায় অপর্ণা, দেবতার পূজো যে হয় নি, একথা কেউ বলতে পারবে না।"

অপর্ণার দুই গাল বেশ একটু লালিমায় ভরিয়া উঠিল। দেওয়ানজী আসিয়া ডাকিলেন, "মা।"

সলিলা ধীরপদে অগ্রসর হইয়া আসিয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলিল, "আজ এটুকু সহ্য আপনাকে করতেই হবে কাকাবাবু। আমি যে .."

কথাটা শেষ হইল না, হইবার আবশ্যকও বুঝি ছিল না। দেওয়ানজী আপন অন্তর দিয়াই তার অন্তরের কথা বুঝিয়া লইলেন।

(ক্রমশঃ)





অসুন্দরের হাসি



সম্পাদক—শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ষষ্ঠ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৩৭ { একাদশ সংখ্যা

আতিশয্য

শ্রী জগৎ মিত্র, বি-এ

গাড়ীতে ওঠবার সময় মা কেঁদে আড়ালে বললেন—আজ থেকে তুই হলি সৎমা। দেখিস মা, ও নাম যেন ঠাট্টার কথা না হয়ে ওঠে, তুই যেন সকলের কাছে সৎই হ'তে পারিস, ইন্দু।

ইন্দু গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লো। চোখের জলে চারিদিক ঝাপসা হয়ে গেছে। চেষ্টা করেও সে একবার মায়ের মুখখানি দেখ্‌তে পেলে না।

গাড়ী চলেছে। ইন্দু ভাবছে—সত্যি, কেন সৎমাদের এত বদ্‌নাম, তা'রা কেন এত নিষ্ঠুর হয়? পরের ছেলে আপন হয় আর স্বামীর ছেলে, তাকে ভালবাসা যায় না?

গাড়ীতে ইন্দুর আর কোন চিন্তা রইলো না। সে শুধু নববধূ নয়, সে একেবারে মা হ'য়ে স্বামীর ঘরে যাচ্ছে। ইন্দু তার ছেলের কথাই ভাব্‌ছে। সে শুনেছে তার ছেলে চার-পাঁচ বছরের। আচ্ছা, কেমন তা'কে দেখ্‌তে? সে কি আধো আধো কথা বলে? তা'র দাদার ছেলে 'সোণা'র মতো কি তা'র খোকা অমনি ছোটটি? তা'র খোকার নাম কি হবে?

ইন্দু উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে, কখন গাড়ী শ্বশুরবাড়ী পৌঁছবে। তা'র ছেলে ছোট, দু'টি কোমল বাহু মেলে ছুটে এসে মা'র কোলে চ'ড়ে বস্‌বে, আর মা খোকার চাঁদের মতো মুখখানিকে অজস্র চুমায় ভ'রে দেবে।

গাড়ী এসে পৌঁছলো। নববধূকে বরণ করবার জন্যে জনসমাগম সামান্যই। দ্বিতীয়বারের বিবাহ, সুতরাং বিনয়ের মনে উচ্ছ্বাস ছিল না। মানুষের মুখে যেটুকু হাসি ফুটে উঠেছে, তা' যেন কাষ্ঠ হাসির মতো নিষ্প্রাণ। তবু শাশুড়ী এগিয়ে এসে বল্‌লেন—এসো এসো, আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এসো মা। আমার কালো ঘরে আলো হোক্‌। তারপরই বোধ হয় মৃতা পুত্রবধূর কথা স্মরণ ক'রে কেঁদে ফেল্‌লেন।

বিনয়ের সংসার তা'র বিধবা মা এবং বিধবা দিদি জ্ঞানদাকে নিয়ে, সুতরাং শ্বশুরবাড়ীতে

ইন্দুর সমবয়সী বল্‌তে কেউ ছিল না। আজ নববধূকে বরণ করতে যাঁ'রা এসেছে, তাঁ'দের মধ্যে পাশের বাড়ীর বৌ বীণাই ইন্দুর সমবয়সী। বীণা অনেকক্ষণ ইন্দুর কাছে কাছে রইলো।

ইন্দুর কিন্তু সর্বক্ষণ বুক কাঁপ্‌ছে। ঐ বুঝি তা'র খোকা এল। কোথায় তার ছেলে, এত দেরি করছে কেন? খোকা কি ঘুমুচ্ছে? একটি ছোট কালো কোল ছেলে দরজার কাছে উঁকি মেরে নববধূকে দেখ্‌ছে। ঐকি তা'র খোকা? ইন্দু তা'কে ডাক্‌লো কিন্তু খোকা পালিয়ে যাচ্ছে। ইন্দু ছুটে গিয়ে ছেলেটিকে ধর্‌লো—শুনে যাও খোকামণি। তোমাকে কত খেল্‌না দেব—গাড়ী-ঘোড়া কত কি! আমি তোমার কে হই বল দিকি?

খেলনার লোভে খোকা কাছে এল, গম্ভীর ভাবে বল্‌লে—হ্যাঁ জানি, তুমি আমার মামীমা হও—তুমি 'সতু'র মা!

ইন্দুর হাত ছাড়িয়ে ছেলেটি পালিয়ে গেল। এ তা হলে তার নিজের ছেলে নয়, তা'র ননদের ছেলে! ইন্দুর ছেলের নাম কি তবে সতু? কিন্তু সতু আস্‌ছে না কেন?

বীণা আস্‌তে ইন্দু অধীরভাবে জিজ্ঞেস কর্‌লে—হ্যাঁ ভাই, সতু কোথায়? তা'কে একবার ডেকে আনো না।

বীণা বল্‌লে—সতু? সেতো এখানে নেই—তা'র মামারা তা'কে যে অনেকদিন নিয়ে গেছে।

ইন্দু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। আজকের দিনে তা'রা তা'র ছেলেকে কেন নিয়ে এলো না। অতিথিরা চ'লে গেছে, বীণাও গেছে। জানদা যখন নববধূর তত্ত্বাবধান কর্‌তে এলো, ইন্দু তা'কে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ ঠাকুরঝি, সতু কি আজ আস্‌বে?

জানদা হাস্‌লে কিন্তু তা'র হাসিতে মিষ্টি নেই, বল্‌লে—সতু? ও বাবা, নতুন-বৌ যে এরি মধ্যে ছেলের নামটি পর্যন্ত জেনে নিয়েছ। না গো বৌ, সতুর এখন আস্‌বার বিশেষ কোন ঠিক নেই। কেনই বা আস্‌বে বল—তার মামারা তাকে পাঠাবেই বা কেন? আর এ সময় তা'দের মনটাও তো ভাল নেই বৌ।

শ্বশুর কাছে গিয়ে ননদ বল্‌লে—জান মা, বৌ আমাদের বেশ চটপটে গো! এরি মধ্যে সতুর খোঁজ কর্‌ছিল, তা' আজকালকার মেয়ে কিনা কিসে নিন্দে হয় বা না হয় তা' বেশ জানে।

শাশুড়ী কি উত্তর দিলেন তা' অবিশ্যি ইন্দু শুন্‌তে পেলে না কিন্তু ননদের কথায় যে বেশ ঝাঁঝ আছে—তা' বুঝ্‌লে। কিন্তু কেন তা'রা পাঠাবে না—মায়ের কাছে ছেলে আস্‌বে না কেন?

ফুলশয্যার রাত্রে ইন্দু স্বামীকে বল্‌লে—দেখ, সতুকে আমার বড় দেখ্‌বার ইচ্ছে কর্‌ছে, একবার আনো না গো।

বিনয় হাস্‌লে, আদর ক'রে বল্‌লে—ইস্ ছেলেকে না দেখেই যে ছেলের ওপর তোমার মায়া পড়েছে দেখছি। কেন বেশ তো আছ, আবার ওসব ঝঞ্ঝাট।...

স্বামীর আলিঙ্গন ইন্দুর আগুনের মতো লাগছিলো। ছিঃ, পুরুষরা বুঝি এই রকমই! আরক্তমুখে ইন্দু বল্‌লে—মায়ের কাছে ছেলে আসবে না কেন?

বিনয় গম্ভীরভাবে বল্‌লে - সে কথা নয় নতুন-বৌ, তবে খোকাকে ওরা হয়তো এখন পাঠাবে না - ওরা আমার ওপর চোটেছে কিনা ··

—তা' বলে ছেলেকে তুমি পর ক'রে দেবে?

ইন্দু ক'দিন গম্ভীর হয়ে রইলো, স্বামীর সঙ্গে কথা বল্‌লে না। বিনয় বুঝ্‌লে তার রাগ হয়েছে। একদিন বিনয় হেসে এসে বল্‌লে—ওগো, শুন্‌ছো ভারি সুখবর আছে একটা।

ইন্দু শোনবার অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রইলো —কি ?

—বল্‌ব না, আগে বল কি দেবে ?

ইন্দু লজ্জায় লাল হ'য়ে বল্‌লে – যাও, তুমি ভারি দুষ্টু ! বিনয় হেসে তা'কে কাছে টেনে বল্‌লে—কাল সকালে খোকা আস্‌ছে, কিন্তু বিকেলেই আবার সে চলে যাবে।

ইন্দু আনন্দে লাফিয়ে উঠ্‌লো – সত্যি ? কি মজা ! সে রাত্রে ইন্দু সমস্তক্ষণ খোকার স্বপ্ন দেখলো। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সে সতুর জন্যে একটা সিল্কের রুমাল বানিয়েছে এবং চাকরকে দিয়ে দিনের বেলায় হরেক রকমের খেলনা আনিয়েছে। কাল তার খোকা আসছে ও যেন রূপকথার রাজপুত্র –স্বপ্ন দিয়ে গড়া। ··

খবরটা বীণাকে দেবার জন্যে ইন্দু অনেকবার ছাদে উঠেছিলো, কিন্তু বীণার দেখা মেলে নি। তা'রপর যখন ভোর হোল, দিনের সর্ব্বপ্রথম সূর্য্যরশ্মিটুকুকে ও প্রণাম করে ঘরে নিলে। মনেহ'ল ওর পৃথিবী সোণা দিয়ে তৈরী।

শোবার ঘরে একটা বড় তৈলচিত্র আছে। ইন্দু শুনেছ ওটি সতুর মায়ের। কি সুন্দর নম্র চেহারা ! বেশের কোথাও বাহুল্য নেই। হাতে সামান্য কতকগুলি চুড়ি, মাথায় সিঁথিটি ঈষৎ হেলানো, চুলগুলি কাণের ওপর এসে পড়েছে ; পরণে সাধারণ একখানি সাড়ি – অথচ পরবার ভঙ্গীটি কি সুন্দর ! কপালে সিঁন্দুরের টিপ্‌— পায়ে আলতা। সব জড়িয়ে মানুষটির চারিদিকে অপূর্ব্ব একটি সংযত শ্রী ! কোথাও এতটুকু উচ্ছ্বাস নেই, অথচ ইনি অত্যন্ত ধনীর মেয়ে ছিলেন। ইন্দু ছবিটিকে বারবার প্রণাম করলে, তারপর দামি অলঙ্কার সব গা থেকে খুলে সেও ঠিক সতুর মায়ের মতোই সাজলো।

ইন্দু কাণ পেতে আছে, কখন হর্ণ বাজবে, মোটর ঐ বুঝি এলো।...প্রতিটি মুহূর্ত্ত তার কাছে ভারি সুদীর্ঘ মনে হচ্ছে।

তারপর সত্যিই এক সময় মোটর আওয়াজ করে বাড়ীর সামনে দাঁড়ালো। এইবার খোকন উঠছে সিড়ি দিয়ে, তার ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি কাণে আস্‌ছে। বিনয় জোরে কথা কইছে—মা কোথায় গো, দিদি · সতু এসেছে মা···এসো অমল, বোস ভাই,গাড়ী তা'হলে এখন ফিরে যাক্‌, কেমন ?...

অমল সতুর ছোট মামা, বছর দশ বারো বয়স। ইন্দুর বুক কাঁপছে, এইবার ছেলেকে সে দেখবে ! কিন্তু ওরা অত দেরী করছে কেন ? ইন্দু অধীর হয়ে সিঁড়িতে নেমে গেল। বিনয়ের হাত থেকে সতুকে ছিনিয়ে নিয়ে একেবারে নিজের ঘরে চলে গেলো। সতুর প্রথমটা বিস্ময় লাগলো। বিনয় বললে—বাবা রে বাবা, এদের আর স্বর সয় না।

শাশুড়ী ননদ এসে বললে —কইরে বিনু, সতু কোথায় গেল ?

—বৌ তোমাদের আগেই তা'কে দখল করেছে মা। —বিনয় হেসে বললে।

জ্ঞানদা বললে—ও বাবা ! তাই নাকি। ঠাকুরমা পিসিমার সঙ্গে দেখা নেই, একেবারে সৎমার কোলে চড়ে বসেছে ?

সকলে ঘরে এসে দেখলো সতু মায়ের সঙ্গে খেলা সুরু করে দিয়েছে। খোকার চারিদিকে নানাবিধ খেলনা ছড়ানো। শ্বশ্রূ বিস্মিত হ'য়ে বললেন—ওমা, এত খেলা পেলে কোথায় গো বৌমা ?

খোকা লাফাতে লাফাতে বল্‌লে—ঠাকু'মা, দেখো, মা ডিল্লী থেকে কেমন আমার জন্যে কতো সব জিনিষ এনেছে—গাড়ী-ঘোড়া মোটর-বাঘ কতো কি।

ইন্দু হেসে বললে—খোকা মা এসেই প্রথমে আমাকে জিজ্ঞেস করছিলো—হাঁা মা, তুমি বুঝি এতদিন ডিল্লীতে হাওয়া খেতে গিয়েছিলে ? আমার জন্যে কি এনেছ দেখি ? খেলনা পেয়ে

বললে—মা, তোমার আর অসুখ করবে না তো?

শাশুড়ী বুঝলেন, তাঁর চোখে জল এল। ব্যাপারটা এই। সতুর মা মারা যাবার আগে অনেকদিন দিল্লী সিমলেতে হাওয়া খেয়েছিলো। তারপর যখন সে মারা গেলো খোকাকে বোঝান হোল যে, তা'র মা আবার দিল্লীতে গেছে—সেরে গেলেই আবার আসবে। সেই থেকে খোকা তার মায়ের প্রতীক্ষা করছে। আজ হঠাৎ ইন্দুকে দেখে তাকেই সে মা ব'লে চিনলে। খোকা যাতে তাকে মা ব'লে চেনে সেদিকে ইন্দুর যথেষ্ট লক্ষ্য ছিল। সেদিনকার তার বেশের ভঙ্গীটি সতুর মায়ের মতোই।

সতু বিকেলে চ'লে যাবে, এ যেন ইন্দুর অসহ্য। সে স্বামীকে বললে—দেখ, অন্ততঃ দুটোদিন সতুকে রাখতে বলো।

বিনয় বললে—তারা রাজি হবে না ইন্দু, এই কতো কষ্টে একবার এনেছি।

—কেন কি হবে দু'দিন থাকলে?

—কি হবে? চটলে কিন্তু খোকার খারাপ হবে ইন্দু, সৎমার কাছে ওঁরা ওকে রাখবেন না।······

ইন্দুর চোখে জল এলো, বললে—সৎমা? আচ্ছা, সত্যি তুমি কি বিশ্বাস কর, আমার কাছে থাকলে খোকার খারাপ হবে?

—তুমি কিছু বোঝ না, আমার বিশ্বাসে কি আসে যায়?

তা' সত্যি! ইন্দু বিমাতা, কিন্তু বিমাতারাও তো মা হন, তবু তারা ভালবাসতে পারেন না কেন? আর সতুর মতো ছেলেকেও কি কোন বিমাতা অযত্ন করতে পারে? ইন্দু বললে—দেখ, সতু কিন্তু আমাকে মা ব'লেই চিনেছে।

—সেতো ভাল কথা, কিন্তু অপরে তা' বুঝবে না।

সতু চ'লে যাবে বিকেলে। ইন্দু তাকে সর্ব্বক্ষণ বুকে করে রেখেছে। দুপুরে ঘর বন্ধ ক'রে তার সঙ্গে পুতুল খেলেছে—তাকে রাজপুত্রের গল্প বলেছে, শেষে তার মুখে অজস্র চুমো দিয়ে কেঁদে ফেলেছে। সতু মায়ের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেছে।······

সতুকে নিয়ে যাবার জন্যে যখন মোটর এলো, ইন্দু তাকে বুকে নিয়ে কেঁদে বললে—হ্যাঁ বাবা, সত্যিই কি মা'কে ছেড়ে চ'লে যাবি সতু?

সতু বিস্মিত হোল—চ'লে যাব? না মা, আমি যাব না তো কোথাও? মাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

ঠাকুরমা পিসিমার তো গালে হাত! এঁ্যা, বৌয়ের কাণ্ড কি! এ মায়ার কান্না, মিছে সোহাগ না দেখালে চলতো না কি? মামারা রাজা, তাদের ছেড়ে সতু থাকবে সৎমার কাছে?

কিন্তু সতু মার কোল থেকে নামলো না। তার ছোটমামা অমল ফিরে গেলো। ঠাকুরমা বলে দিলেন—আজ থাক্, কাল আমরা ভুলিয়ে-ভালিয়ে পাঠিয়ে দেব।

সে রাত্রে কথা উঠলো সতু শোবে কোথায়? ইন্দু বিস্মিত হোল—কেন আমার কাছে? ছেলে আবার কার কাছে শোবে?

বিনয় হেসে বললে—হ্যাঁ, তা'হলেই হয়েছে, একেতো ঐটুকু বিছানা, তারপর রাতে যদি জেগে বায়না ধরেতো ঘুমটা মাটি হবে আর কি! তার চেয়ে সতু মার কাছে শুক।

—না তা' হবেনা আমরা মায়ে-পোয়ে মেজেতে শোব 'খন, তুমি একলা খাটে শুয়ো—ঘুমের ব্যাঘাত হবে না।

শাশুড়ীও এসে বললেন—সতু আমার কাছেই শোবে বৌমা। কিন্তু সতু জিদ ধরেছে মার কাছেই শোবে, সুতরাং রাতে যখন সে ইন্দুর ঘরেই ঘুমিয়ে পড়লো তখন জানদা আস্তে আস্তে তাকে তুলে

মায়ের বিছানায় দিয়ে এল—কারণ জেগে থাক্‌লে সতুকে তোলে কার সাধ্যি।

ইন্দুর চোখে জল এল—কেন এরা সতুকে তা'র কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়? ভালবাস্‌তে চাইলে কেন তা'রা তাকে ভালবাসতে দেবে না?

সে রাত্রে ইন্দুর চোখে ঘুম নেই। তার খালি মনে হচ্ছে, ঐ বুঝি খোকা উঠে ও ঘরে কাঁদ্‌ছে—মাকে বুঝি সে খুঁজছে। একবার সে খোকার কান্না স্পষ্ট শুন্‌তে পেলে. স্বামীকে জাগিয়ে বল্‌লে – ওগো, খোকা যেন কাঁদ্‌ছে ওঘরে, নিয়ে আসিগে যাই, কেমন?

বিনয় বিরক্ত হোল—বাবা রে বাবা, খোকা খোকা ক'রে তুমি পাগল হ'লে দেখছি। কই, কেউতো কাঁদ্‌ছে না, আর যদিই বা কাঁদে মাকি তাকে ভোলাতে জানেন না?

—তবু একবার দেখে আসিগে যাই।

বাইরে বেরিয়ে শশুর ঘরের দ্বারে ইন্দু কাণ পাতলে কিন্তু কোন সাড়াশব্দ নেই। তবে বোধ করি তারই ভুল হয়েছে। ইন্দু ঘরে ফিরে এলো। ভোরের দিকে শাশুড়ীর ডাকে ইন্দুর ঘুম ভেঙে গেলো—বিনু, শুন্‌ছিস্‌··ও বৌমা, শুনছো গা, একবার ওঠো তো।

দরজা খুল্‌তে শাশুড়ী সতুকে মাটিতে বসিয়ে দিয়ে বিরক্ত হ'য়ে বললেন—নাও বাপু তোমার ছেলেকে নাও, বাবা রে বাবা, রাত একটা থেকে জেগে সেই যে বায়না ধরেছে, মার কাছে যাব—ঘুমোয় কার সাধ্যি!

ইন্দু খোকাকে কোলে নিয়ে আবেগে চুমু খেলে, খোকা তা'হ'লে সত্যিই তার জন্যে কেঁদে ছিল?

পরের দিন ইন্দুকে বীণাদের বাড়ীতে সরিয়ে দেওয়া হোল এবং খোকাকে অনেক ভুলিয়ে, বেড়াতে যাবার নাম ক'রে মামার বাড়ীতে রেখে আসা হোল। কিন্তু পরদিনই তার বড় মামা সতুকে নিয়ে এসে হাজির।

বল্‌লেন--সতু কিছুতেই তার নতুন মাকে ছেড়ে থাকবে না।

বড়মামা সতুকে রেখে চ'লে গেলেন। বিনয় গম্ভীরমুখে বল্‌লে—এতো ঝাওটো করবার কি দরকার ছিলো তাতো বুঝি না, মিছিমিছি যতো ঝঞ্ঝাট। ওঁরা বড়লোক, ওদের মতো যত্নে সতুকে কি আমরা রাখতে পারব নতুন বৌ?

ইন্দু বল্‌লে—ছিঃ ছিঃ ওকথা বোল না, বাপ মা হয়ে আমাদের কাছে খোকা যত্নে থাক্‌বে না? কি যে বল তুমি!

* * *

সেই থেকে সতু ইন্দুর নয়নের মণি হয়ে রইলো। নাইতে খেতে শুতে সতুকে সে কাছ ছাড়া করে না। সতু মার সঙ্গেই খেলে, মার সঙ্গেই বেড়ায়। ইন্দুর খালি ভয় ঐ বুঝি সতুকে কে মারলে। কয়েক মিনিট সতুকে না দেখ্‌লে ইন্দু ভাবে, ঐ বুঝি খোকা পোড়ে গিয়ে মাথা কেটেছে। এমন কি সেই ননদের ছেলেটির সঙ্গেও সতুকে ইন্দু খেল্‌তে দেয় না।

জ্ঞানদা বল্‌লে—দেখলে মা বৌএর রকম, একে কি তুমি মায়া বল। 'ঠাকু'মা-পিসি-মামারা সব হোল পর আর সৎমা হোল আপনার। এ ভাল গতিক নয় মা, বলে রাখ্‌ছি তা! দেখো, সতুর না শেষে কিছু একটা ভালমন্দ হয়। কথায় বলে—সৎমার মায়া, মরণের ছায়া।

কথা শুনে ইন্দুর সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সতুকে নিয়ে তার ভয়ানক ভাবনা—যতোই হোক্‌ এযে তার পেটের ছেলে নয়। সতু যখন দূরে ছিলো, তাকে পাবার আশায় সে ছিলো মশগুল, এখন তাকে সম্পূর্ণরূপে কাছে পেয়ে কেবলই তার গা ছম্‌ছম্‌ করে।

সেদিন সন্ধ্যায় সতুর গায়ে হাত দিয়ে ইন্দুর মুখ শুকিয়ে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো। বিনয় আফিস থেকে ফিরতে সে শুকমুখে বল্‌লে—

দেখতো গো, খোকার যেন গাটা গরম গরম ঠেকছে।

ছেলের গায়ে হাত দিয়ে বিনয় বললে—নানা ও কিছু নয়। বর্ষা নেমেছে, বোধ হয় একটু সর্দ্দির ভাব ভাই।

কিন্তু ইন্দুর তাতে উদ্বেগ কাটলো না। রাতে খালি তার ঘুম ভেঙেছে আর সে খোকার উত্তাপ পরীক্ষা করেছে—গা যেন তার আরো গরম। সকালের দিকে খোকা ছটফট করতে লাগলো। যখন সে চোখ মেলে চাইলো. চোখ তার জবাফুল। সতু উঠতে পারলে না, কথা বলতেও তার কষ্ট হচ্ছে। তবু সে আস্তে আস্তে বললে—মা জল খাবো। আমার ঘোড়াটা কোথায়?

বিনয়ের ঘুম সহজে ভাঙে না, ডাকলেও সে আবার পাশ ফিরে শোয়। ইন্দু শাশুড়ীর কাছে ছুটে গেলো, হাঁফাতে হাঁফাতে বললে—মা, খোকার বড় জ্বর হয়েছে. একবার এসে দেখুন না, আবার সে জল খেতে চাইছে।

শ্বশ্রূ এসে দেখে বললেন—হ্যাঁগো, বড় জ্বর দেখছি যে, বেশ করে চাপাচুপি দাও মা, জল খেতে দিও না।'

ননদ এসে বগলে—তাইতো বৌ, এমনি বাদলার দিনে, কাল কেন চানটা করালে···

ইন্দু শুকনোমুখে বগলে—ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে ক'দিন তো চান করতে দিই নি, কিন্তু কাল ভয়ানক বায়না ধরলো তাই··!

—তবু একটু বুঝে-সুঝে করাতে হয় বৌ; এখন দেখ ভগবানের কি মনে আছে।

জানলার কথা শুনলে হাত পা গুটিয়ে যায় সে শুনতে পেলে ননদ শাশুড়ীকে বলছে—দেখলে তো মা বৌয়ের আক্কেল। এই বাদলায় ছেলেটাকে নাইয়ে জ্বর করালে, এখন ভোগ তোমরা। নিজের পেটের ছেলে তো নয়, ওসব লোকদেখানি মা, আমরা কি আর বুঝি নে।

ইন্দুর মনে হোল সে বুঝি জ্ঞান হারাবে, অতি কষ্টে সে নিজেকে সামলালে। জ্বরে খোকা হত চৈতন্য, ভুল বকছে—মা আমাক ঘোড়াটা দাও না, তুমি কিন্তু আমাকে ছেড়ে আর ডিন্নী যেতে পাবে না—আমি মামার বাড়ী যাব না···

ইন্দু ছেলেকে কোলে নিয়ে পাথরের মতো নিষ্পলক দৃষ্টিতে বসে রয়েছে। অনেক কাঁদাকাটা করে পায়ে ধরে স্বামীকে ডাক্তার আনতে পাঠিয়েছে এবং সতুর মামার বাড়ীতে খবর দিয়েছে। কিন্তু ডাক্তার এখনো আসেন নি. সতুর মামাদেরও দেখা নেই! তারা বিরক্ত হয়ে যদি না আসে তবে ইন্দু কি করবে? ইন্দু আর ভাবতে পারলে না, ভগবান রক্ষা করো—এ যে তার নিজের ছেলে নয়।

বিনয়ের আফিস কামাই করিলে চলে না—আফিসের ফেরতা ডাক্তার নিয়ে এল। ডাক্তার দেখে বললেন—জ্বর একটু বেশীই বটে, বেশ সাবধানে রাখতে হবে—নিউমোনিয়াতে দাঁড়াতে পারে।

সতুর মামারা কিন্তু এল না! ইন্দুর চোখে সারারাত ঘুম নেই। ছেলের দিকে চেয়ে সে ঠায় বসে, দেখলে মনে হয় তার কোন দিকে খেয়াল নেই, নানাহারের কথা সে ভুলেই গেছে।

জানলা আড়ালে বগলে—বৌ আমাদের কতো মায়াই জানেন। যেদিন থেকে ও সতুকে ছুঁয়েছে সেদিন থেকেই জানি সতুর কিছুতেই ভাল হতে পারে না! মা নয়তো—ডাইনি!

ইন্দুর কিন্তু সে সব কথায় কান দেবার অবসর নেই। সে খালি ঈশ্বরকে স্মরণ করছে। ডাক্তার মাঝে মাঝে দেখে যান, কিন্তু সতুর অবস্থা ক্রমশঃই মন্দের দিকে যাচ্ছে। আজ পাঁচদিন একই ভাবে কেটে গেলো। ইন্দু স্বামীর কাছে কেঁদে পড়লো—ওগো, খোকার মামাদের যেমন করে পার নিয়ে এস, ওঁরা বড়মানুষ ভাল চিকিৎসা করবেন!

বিনয় শালাদের কাছে এবার নিজে গেলো।

ত'ার শাশুড়ী বল্লেন—হ্যাঁ আমরা যেতে পারি, কিন্তু তোমার নতুন বৌ ও বাড়ীতে থাকলে হবে না তাকে বাপের বাড়ী— পাঠিয়ে দাও। সৎমার দোষেই এসব হচ্ছে, এ আমরা জানি।

বিনয় বললো—তাই হবে, সতুকে আপনারা বাঁচান।

বাড়ীতে এসে বিনয় ইন্দুকে সব কথা খুলে বললে। ইন্দুর মুখ শুকিয়ে গেল, কিন্তু মুখে বল্লে—বেশ তাই হোক! ভগবান, খোকাকে আমার বাঁচাও, আমি দূরেই থাকবো।

ইন্দু বাপের বাড়ী চলে গেল। এমন কি আসবার সময় সে একবার সতুকে দেখতেও চাইলে না, কিন্তু তার মুখের চেহারা দেখে বিনয়েরও চোখে জল এসেছিল। সতুর মামা, দিদিমা এসে পড়লেন। তারপর যমে মানুষে টানাটানি। মানুষেরই বুঝি হার হয়। ডাক্তারে ডাক্তারে বাড়ী ছেয়ে গেলো। আজকের রাত যদি কাটে, তবেই···।

কিন্তু ভগবান মুখ তুলে চাইলেন! সতু সে যাত্রা বেঁচে গেলো। জ্ঞানদা বল্লে—ভাগ্যিস সৎমা কাছে ছিল না. নইলে···।

বিনয় ইন্দুকে এই আরোগ্য সংবাদ লিখে দিলে। কথা এই যে, সতু একটু জোর পেলেই মামারা তাকে নিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে নতুন মাকে সে যেন না দেখে। কাজেই ইন্দুকে আনা হ'ল না।

সতু অবশ্য একটু জ্ঞান হতেই মাকে খুঁজতে লাগলো। তা'কে জানিয়ে দেওয়া হ'ল যে, তার মা আবার দিল্লী চলে গেছে।

সতু অবাক হয়ে বগলে—মা আমাকে না নিয়ে দিল্লী চলে গেল। প্রথমে সে কাঁদলো, বায়নায় সকলে অস্থির! কিন্তু যখন সে দেখলে, কাঁদলেও মা আসে না, তখন মার প্রতি রাগে দুঃখে অভিমানে সে ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো।

তাই একটু জোর পেতে তার মামারা যখন তাকে নিয়ে এলো, তখন সতু আপত্তি করলে না। ভাবলে, মা যখন ফিরে আসবে, তখন তাকে না দেখতে পেয়ে খুব জব্দ হবে। মা'র সঙ্গে দেখা হলে সে আর কিছুতেই কথা কইবে না। ভাবতে ভাবতে সতুর চোখে আবার জল দেখা দিল।

সতু চলে যাবার পর বিনয় শ্বশুরবাড়ী গেল ইন্দুকে আনতে! গাড়ীতে আসবার সময় ইন্দু বল্লে—সেই কোন জন্মে লিখেছিলে খোকা ভাল হয়ে গেছে, তারপরে বুঝি একটু লিখতে নেই? আমার যা করে দিনগুলো কেটেছে!

বিনয় হেসে বললে—রাগ করো না, নতুন-বৌ, কতদিন ভেবেছি তোমাকে দেখে যাব, কিন্তু শাশুড়ী ছিলেন কিনা, কি করেই বা আসি।

ইন্দু সলজ্জমুখে বল্লে—যাঃ, আমি বুঝি তা'ই বলছি! এতদিন পরে নিয়ে যাবার কথা যে মনে পড়লো? খোকা বুঝি আমার জন্ত খুব কাঁদছে? হ্যাঁ গো, খোকা এখন বেশ হাঁটতে পারে, পায়ে বেশ জোর পেয়েছে তো? ভাখো, খোকাকে এবার তার মামাদের কাছেই পাঠিয়ে দিও। ওঁরা সত্যিই ওকে খুব ভালবাসেন। হাজার হোক আমি তো সৎমা। কি জানি, হয়ত সত্যিই অমঙ্গল হয় কিছু।

বিনয় গম্ভীরস্বরে বললে—খোকাকে ওরা আজ নিয়ে গেছেন ইন্দু। যাক গে, দুঃখু করো না—ওরাই তো ওকে বাঁচিয়েছেন!

ইন্দু চমকে উঠে বল্লে—সতু চলে গেছে? আমাকে একবার দেখতেও চাইলো না?··· সত্যি?···

বিনয় স্ত্রীকে কাছে টেনে বগলে—দুঃখু করো না নতুন বৌ। এখন একটু কষ্ট হবে বটে, কিন্তু তোমার নিজের কোলে যখন দু'-একটি আসবে তখন আর কোন কষ্ট থাকবে না। তোমারই বা অতো ঝঞ্ঝাটের দরকার কি? তার চেয়ে খোকা

যেখানে ভাল থাকে সেইখানেই থাকুক—কেমন ?

স্বামীর আলিঙ্গনের মধ্যে ইন্দু কাঠ হয়ে বসে রইলো। হয়তো বিনয়ের শেষের কথাগুলি তার কাণে যায় নি, কেন না তার মুখের চেহারার কোন পরিবর্ত্তন হ'ল না। ঠোঁটের কোণে একটু লজ্জার হাসিও ফুটে উঠল না।

তেমনি হতাশ সুরে ইন্দু বল্লে—আমি যে খোকার জন্যে অনেক জিনিষ তৈরী করেছি। পশমের টুপি, মোজা, কাপড়ের হাতী, কুকুর,... সে নেবে না ?

বিনয় হেসে বললে—সে সব থাক না, পরে তোমারই কাজে লাগবে 'খন।

এ কথাগুলোও ইন্দুর কাণে গেল না। সে বাইরের দিকে উদাসভাবে চেয়ে রইলো—কিন্তু চোখের জলে ক্রমশঃ সব কিছু ঝাপ্‌সা হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো।



আধুনিক মেঘদূত

শ্রী হরিপদ গুহ

আদ্য

কি একটা ঘটনা লইয়া পূর্ব্বদিন স্বামী-স্ত্রীতে খুব একচোট কলহ হইয়া গিয়াছে; দু'জনেরই বাক্যালাপ একেবারে বন্ধ।

পরদিন সকালে সহসা নীলমণির শ্বশুর মহাশয় বিনোদবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তিনি বলিলেন—"মীরাট থেকে মেজ জামাই সর্ত্ত্রে এসেছে; তোমার শাশুড়ী তাই তোমাদের সব নিতে পাঠালেন। বিয়ের পর তো তার সঙ্গে তোমাদের আর দেখা হয় নি।"

নীলমণি তাহার গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর করিয়া বলিল—"আমার যাওয়া এখন অসম্ভব; অনেক কাজ রয়েছে। ওদের নিয়ে যান।"

জামাতার মেজাজ বিনোদবাবুর খুব ভালরূপই জানা ছিল; কাজেই তিনি আর কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া কন্যা অঞ্জলিকে ডাকিয়া বলিলেন—"তবে তুই তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নে মা।"

অঞ্জলির রাগ তখনও কমে নাই; স্বামীর উপর তাহার মনটা তখনও বিষাইয়া ছিল, সুতরাং এই অযাচিত মাতৃ-আহ্বানে তাহার অন্তরটা পুলকে ভরিয়া গেল। সে খুব তাড়াতাড়ি সমস্ত গোছগাছ করিয়া প্রস্তুত হইয়া লইল।

সুট্‌কেসের মধ্যে কাপড়-জামাগুলি রাখিতে রাখিতে আড়চোখে সে এক একবার নীলমণির দিকে চাহিয়া মনে মনে হাসিতেছিল; কিন্তু মুখ ফুটিয়া তাহার সহিত একটাও কথা কহিল না।

ইহাতে নীলমণিও খুব চটিতেছিল। যাইবার সময়ও যে স্ত্রী এমনই করিয়া গম্ভীরভাবে থাকিবে, একটাও কথা না বলিয়া যাইবে, ইহা নিতান্তই অসহ্য। অথচ উপায়ই বা কি? বিদায়কালে আবার বিবাদ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। এক-একবার তাহার ইচ্ছা হইতেছিল যে, পরাভব স্বীকার করিয়া সাধিয়া-কাঁদিয়া সে নিজেই তাহার মানভঞ্জন করে; কিন্তু পরক্ষণেই পূর্ব্বদিনের সমস্ত ঘটনাটা স্মরণ হওয়ায়, সামান্য একটা রমণীর এত তেজ দেখিয়া তাহার অন্তরের পুরুষ সিংহটা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে গম্ভীর-ভাবে বৈঠকখানার ঘরে চলিয়া গেল।

ইহাতে কিছুক্ষণের জন্য অঞ্জলি একটু দমিয়া গেল। একটু পরেই কিন্তু সে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে তাহার স্বামীকে খুব ভালরূপই চিনিত; কাজেই ইহাতে সে একটুও ভয় পাইল না।

যাইবার সময় অঞ্জলি বামুনঠাকুর ও পুরাতন ভৃত্য নন্দকে ডাকিয়া বারবার বলিয়া গেল—বাবুর প্রতি যেন তাহারা একটু দৃষ্টি রাখে, তাঁহার যেন কোন অসুবিধা না হয়। যে ভোলা মন তাঁর, জোর করিয়া ডাকিয়া খাইতে না দিলে হয় তো খাওয়ার কথা সে ভুলিয়াই যাইবে। পইপই করিয়া সে তাহাদের এই বিষয়ে সাবধান করিয়া মোটরে গিয়া উঠিল।

সুবিধামত নীলমণিকে যাইবার জন্য বিনোদ বাবু আর একবার বিশেষভাবে তাহাকে অনুরোধ করিয়া গেলেন।

ড্রাইভার ষ্টার্ট দিয়া হর্ণ বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

যতদূর দেখা যায় নীলমণি একদৃষ্টিতে গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল; পরিশেষে মোটরখানি অদৃশ্য হইয়া গেলে সে একটা বুকফাটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ

করিয়া কতকগুলি জরুরী কাগজ-পত্রে মনোনিবেশ করিতে বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল।

মধ্য

মাসটা শ্রাবণ কি ভাদ্র তাহা ঠিক্ স্মরণ নাই; তবে 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবস' যে নহে, একথা জোর করিয়া বলিতে পারি। কয়দিন হইতেই কাজল-কাল-মেঘে সমস্ত আকাশখানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল এবং অবিশ্রান্তভাবে ঝম্‌ঝম্ শব্দে বর্ষণ হইতেছিল। মাতাল-বাতাস বিরহীর শূন্য হৃদয়কে ব্যাথাতুর করিয়া শন্‌শন্ শব্দে রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিতেছিল।

নীলমণির মনের ভিতরটা কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় টন্‌টন্ করিতেছিল। এ কয়দিন তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না;—সমস্ত হৃদয়টাই যেন তাহার শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছিল।

বিবাহের পর আরও কতবার তো অঞ্জলি তাহাকে ছাড়িয়া পিত্রালয়ে গিয়াছে, কিন্তু মনের এমন বিকার অবস্থা তো তাহার আর কখনও হয় নাই।

কোথায় হাওড়া, আর কোথায় সে মাণিকতলা? এক-একবার তাহার ইচ্ছা হইতেছিল যে, ছুটিয়া গিয়া সে তাহার প্রিয়তমাকে নিবিড়ভাবে বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া ফেলে। পরক্ষণেই কিন্তু সে কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিল। এখন একাকী উপযাচক হইয়া শ্বশুর-ভবনে যাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না এবং কেমন লজ্জা করিতেছিল।

সেদিন শনিবার। শেষ রাত্রি হইতে বৃষ্টি নামিয়াছিল। প্রথম রাত্রিতে অত্যন্ত গরম পড়িয়াছিল বলিয়া ইলেক্‌ট্রিক্ ফ্যানটা খুলিয়া দিয়া নীলমণি সঙ্গীহীন গৃহে একাকী নিদ্রা যাইতেছিল। কখন বৃষ্টি নামিয়াছিল, তাহা সে জানিতে পারে নাই। অত্যন্ত শীত বোধ হওয়াতে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল;—চক্ষু বুজিয়াই সে উপলব্ধি করিল, বাহিরে ঝম্‌ঝম্ শব্দে বৃষ্টি পড়িতেছে—আর মেঝের উপর বন্‌বন্ করিয়া পাখা ঘুরিতেছে। উঠি-উঠি করিয়াও সে উঠিতে পারিতেছিল না। অবশেষে যখন দেখা গেল যে, শীত ক্রমেই বাড়িতেছে এবং পুনরায় ঘুম হওয়ার আশাও নাই, তখন কাজে-কাজেই তাহাকে উঠিয়া সুইচ্‌টা বন্ধ করিয়া দিতে হইল।

তখন ভোর হইয়া গিয়াছে। নন্দকে ডাকিয়া চা করিতে বলিয়া নীলমণি হাত-মুখ ধুইতে গেল।

বৃষ্টির বিরাম নাই। সারা আকাশ জুড়িয়া ঘন মেঘ করিয়া আছে। দুই-একদিনের মধ্যে যে বৃষ্টি থামিবে, এমন মনে হয় না।

তপ্ত চা পান করিয়া নীলমণির শরীরের অবসাদ অনেকটা দূর হইয়া গেল। সে মনে মনে স্থির করিল,—সেদিন আর কর্ম্মস্থলে বাহির হইবে না; ঘরে বসিয়াই সে বৃষ্টির বৈচিত্র্যলীলা ও সমস্ত মাধুর্য্যটুকু উপভোগ করিবে।

ছেলেবেলা হইতেই নীলমণির একটু-আধটু কবিতা লেখার সখ ছিল; আজ এই বর্ষার দিনে সেই রোগটা তাহাকে একটু বেশী করিয়াই পাইয়া বসিল। সে একখানি খাতা টানিয়া লইয়া আকাশ পাতাল ভাবিয়া কবিতার মিল খুঁজিতে লাগিল। মাথায় তাহার ভাব গিজ্‌গিজ্ করিতেছে, অথচ সরলভাবে কিছুতেই তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। গদ্যে হইলে যাহা হউক এক প্রকার লিখিতে পারিত, কিন্তু এ কি বিড়ম্বনা!

অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া সে লিখিল:—

এসো গো প্রিয়া এসো আজি,
নয় কো হেথা বন্ধ দ্বার;—
উদাস প্রাণে বসে আছি
ঘরখানি যে অন্ধকার।
ময়ূর আজিকে উঠিছে ডাকি,
কেমনে এখানে একেলা থাকি?

কদম-কেয়ার পরাগ মাখি
বায়ু বিলায় গন্ধ তার।
এসো গো প্রিয়া এস আজি,
নয় কো হেথা বন্ধ দ্বার!

তাহার কলম আর অগ্রসর হইল না। এখানেই তাহার কবিতার 'ইতি' করিতে হইল। খাতাটা এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া সে পিয়ানোটার কাছে গিয়া বসিয়া একটা গৎ বাজাইতে লাগিল; কিন্তু তাহাও শেষ করিবার ধৈর্য্য তাহার রহিল না, বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। চঞ্চল চিত্তে কোন কাজই হয় না; তাহার এই অস্থির মন লইয়া সে কি করিবে?

ধীরে ধীরে উঠিয়া পাশ বালিসটাকে টানিয়া লইয়া কিছুক্ষণ সে শয্যার উপর পড়িয়া রহিল।

নন্দ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"যে বাদলা নেমেছে, আজ কি খাবেন বাবু?"

নীলমণি একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল—"তাই তো নন্দ, কি খাই বল তো? ইলিস মাছ ভাজা আর খিচুড়ী হলে মন্দ হয় না। যা হয় একটা বুঝে-সুঝে তুমি কর।"

নন্দ সহাস্যবদনে তখনই ছুটিল ইলিসমাছ আনিতে।

অস্ত

মধ্যাহ্ণ-ভোজনান্তে নীলমণি আলমারী খুলিয়া কতকগুলি গদ্য-পদ্য পুস্তক ও মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়া পাঠে মন দিল, কিন্তু সে কোন খানই ধৈর্য্য ধরিয়া শেষ পর্য্যন্ত পড়িতে পারিল না। দুই-চারপাতা উল্টাইয়াই বইগুলি দূরে ফেলিয়া রাখিতেছিল। বিরক্ত হইয়া সে মনে মনে বলিল—না, আজ আর অন্য কিছু নয়, বর্ষার কাব্য 'মেঘদূত'খানা শেষ করিতে হইবে। সঙ্গে-সঙ্গেই সে আলমারী হইতে 'মেঘদূত' বাহির করিয়া পূবদিকের জানালার কাছে ইজিচেয়ারে বসিয়া সেখানি একমনে পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। পূবের হাওয়া মধ্যে মধ্যে বিন্দু বিন্দু জলকণা উড়াইয়া আনিয়া তাহার চোখে-মুখে ফেলিতেছিল; এই সিক্ততা আজ তাহার কাছে খুবই উপভোগ্য হইতেছিল।

হঠাৎ একটা স্থানে আসিয়া সে থামিয়া গেল। ওই যায়গাটা সে আবার পড়িল—

"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষ প্রণয়িনিজনে কিং পুনর্দূরসংস্থে।"

অর্থাৎ কি না মেঘলা দিনে প্রণয়িণী কণ্ঠলগ্ন হইয়া থাকিলেও সুখীলোকের মন উদাসী হইয়া যায়, দূরে থাকিলে তো কথাই নাই। এই স্থানটা পড়িয়া নীলমণির বিরহী-হৃদয় আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে বইটা বন্ধ করিয়া বলিয়া উঠিল—ভারি তো মজা! আমি এখানে একা একা পচে মরব, আর তিনি সেখানে বেশ আরামে গল্পগুজব করে খুব স্ফূর্ত্তিতে কাটাবেন! সেটী হচ্ছে না, তোমাকে আজ এখানে আসতেই হবে প্রিয়া! এমন মধুর বাদলের দিনটা কিছুতেই ব্যর্থ হ'তে দেব না!

যক্ষ ছিল সেই প্রাচীন যুগের লোক; তাই সে মেঘকে দূত করিয়া ধীরে-সুস্থে প্রিয়তমার কাছে নিজের সংবাদ পাঠাইয়াছিল। এখন এ বৈজ্ঞানিক যুগে তো আর তাহা হয় না। অতএব এই নবীন বিরহী 'টেলিফোন'কে দূতী করিয়া প্রিয়তমার কাছে খবর পাঠাইবার জন্য একেবারে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। আইডিয়াটা মাথায় আসিবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে উঠিয়া গিয়া রিসিভারটী তুলিয়া লইয়া সেণ্ট্রালকে মাণিকতলার একটা বাড়ীর নম্বর বলিয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরেই উত্তর আসিল—"হ্যালো, কে আপনি? কাকে চান?"

গলার আওয়াজ শুনিয়া নীলমণি অনেকটা অনুমান করিয়া লইয়া বলিল—"কে, অর্চ্চনা? আমি নীলমণি। তোমরা সব কেমন আছ?"

অর্চ্চনা নীলমণির ছোটশালী। তাহার অনুমান মিথ্যা হয় নাই। অর্চ্চনাই ফোন ধরিয়াছিল।

সে জবাব দিল—"কেমন আবার থাকব? ভালই আছি। কি দরকার শীগ্‌গির বলুন। আমরা আবার এখুনি মেজদাদাবাবুর সঙ্গে 'চিত্রা'য় যাব।"

নীলমণি মনে মনে বলিল—হায় অবোধ বালিকা, তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে যে, আমার কি প্রয়োজন! তারপর তাহাকে উত্তর দিল—"তোমার দিদিকে একেবার ডেকে দাও তো, বড় দরকার।"

একটু পরেই উত্তর আসিল—"কে?"

স্বর শুনিয়াই নীলমণির মন খুসীতে ভরিয়া উঠিল। সে সহাস্য বদনে উত্তর দিল—"তোমার যম্!"

জবাব আসিল—"আমি রোহিণী নই গো, অঞ্জলি! তা' হঠাৎ আমাকে যম-মশায়ের আবার কি প্রয়োজন হলো?"

নীলমণি বলিল—"এই দারুণ বৃষ্টির দিনে শূন্যঘরে একা আমি আর কিছুতেই থাক্‌তে পারব না। এ ক'দিনে একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি! ট, আজই কিন্তু চলে এসো! আজ রাত সাতটার মধ্যেও যদি তুমি না আসো, তবে এমন একটা কিছু করে বস্‌ব যে, পরে তোমাকে এর জন্য অনুতাপ কর্‌তে হবে!"

অঞ্জলি বলিল—"বারে, অত কষ্ট করে তখন তোমায় কে থাকতে বলেছিল? তুমি নিজেই তো এলে না! আজ না হয়, তুমিই এখানে চলে এসো না কেন? আমার যাওয়া আজ অসম্ভব!"

নীলমণি একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—"না, আমি তা পার্‌ব না; আমার যেতে বড্ড লজ্জা করে। তারা সব হয় তো ঠাট্টা ক'রে বল্‌বে—দু'দিন আর তর সইল না, পেছন পেছন এসেছে! তুমি আজই কিন্তু চলে এসো।"

অঞ্জলি বলিল—"বাঃ, বেশ তো তুমি! কাল বাদে পরশু সতীন্দ্র আরতিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে, আর আজ আমি কেমন ক'রে যাই বল তো? লক্ষ্মীটি, রাগ করো না। আর দু'দিন একটু কষ্ট করে থাকো। মঙ্গলবার দিন সকালেই আমি চলে আস্‌ব। আজ এলে, এঁরা সব কি মনে কর্‌বে বল তো।"

নীলমণি একেবারে দমিয়া গেল রাগে তাহার সমস্ত শরীর রি-রি ক'রিতে লাগিল। সে আর কোন উত্তর না দিয়া কানেকসন কাটিয়া দিল।

অঞ্জলির প্রতি তাহার দারুণ অভিমান আসিল। সে মনে মনে বলিল—উঃ, কি নিষ্ঠুর এই রমণীজাতি! ইহাদের কি একটু মায়া-দয়াও নাই! অন্তর-যুদ্ধে সে ক্ষত-বিক্ষত হইতেছিল

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বাহিরের টব হইতে হেনার তীব্র গন্ধে সমস্ত ঘরখানি ভরিয়া উঠিয়াছিল। নীলমণি জানালার পাশে বসিয়া অর্গেন বাজাইয়া গাহিতেছিল—

"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর—"

সহসা নীচে হর্ণের শব্দ শোনা গেল। নীলমণির সে হুঁস্ ছিল না, সে ক্রমেই পর্দা চড়াইয়া দিতেছিল।

একটু পরেই সেই ঘরে প্রবেশ করিল ব্রজেন্দ্রনাথ। ব্রজেন্দ্রনাথ নীলমণির বিশিষ্ট বন্ধু; মেডিক্যাল কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। সে সোল্লাসে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"আহা, বাছারে! বড় দুঃখু তো তোমার! এমন বাদলার দিনে শূন্য ঘরে বসে একাকী বিরহ-রাগিণী সাধ্‌ছ! তোর এমন দশা কি করে হলো রে? বউ কই? আমি যে বড় আশা করে এসেছি রে, তোর বউয়ের হাতের খিচুড়ী খাবো! হায় হায়, একি হলো রে?" তারপরই সে একটু সুর করিয়া বলিয়া উঠিল—

"কেন বঞ্চিত হব ভোজনে?
আমি, কত আশা করে,

নিজ বাসা ছেড়ে
আসিয়াছি খেতে এখানে।"

নীলমণি তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—"কি যে ইয়ারকি করিস্, ভাল লাগে না। একে মরি নিজের দুঃখে, তার ওপর তোর এ ন্যাকামী একেবারেই অসহ্য!" তারপর সে তাহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিল।

সব শুনিয়া একটু ভাবিয়া লইয়া ব্রজেন বলিল—"সত্যি, তোর বউয়ের এ ভারী অন্যায়। তোকে একা ফেলে কিছুতেই তার সেখানে থাকা উচিৎ হয় নি! বিশেষতঃ, তুই যখন আজ তাকে অত করে আসতে বলেছিস।" একটু নীরবতার পর আবার সে বলিতে আরম্ভ করিল—"বুঝ্‌লি নীলু, এ তো আর যে সে মাথা নয়, ঝাঁ করে বুদ্ধি খুলে গেছে। দেখ্, কেমন এক মজা করি! তোর বউকে আজ এখানে আসতেই হবে!"

নীলমণি সকৃতজ্ঞ-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

আলনায় একখানা পরিষ্কার চাদর ঝুলিতেছিল। ব্রজেন সেখানি টানিয়া লইয়া চক্ষের নিমিষে দুই টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তারপর ঐ চাদরের পটি দিয়া পরিপাটিরূপে নীলমণির মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিল।

নীলমণির মুখ দিয়া একটাও কথা বাহির হইল না। সে কাতর-দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ব্রজেন তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া বলিল—"তুই শুধু চুপ করে শুয়ে থাক; কোন কথা বলিস্ নি। আর যা কর্‌তে হয়, সব আমি করছি।" তারপর সে নীলমণির নিকট হইতে ফোন-নম্বর জানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে গিয়া ফোন করিল।

একটু পরেই উত্তর আসিল—"হ্যালো, কে আপনি; কাকে চান?"

ব্রজেন জবাব দিল—"আমি ডাক্তার রায়। হাওড়া থেকে বল্‌ছি। বিনোদবাবুকে চাই।"

উত্তর আসিল—"বলুন,—আমিই বিনোদবাবু, কি দরকার আপনার?"

ব্রজেন বলিল—"আপনার জামাতা নীলমণি-বাবু সংজ্ঞা পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে আঘাত পেয়েছেন, মাথা ফেটে গেছে; ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছে। ভয়ের কোন আশঙ্কা নেই, তবে কেস্ যদি অন্য দিকে টার্ন করে তবে কি হবে বলা যায় না। তাঁর সেবার বিশেষ প্রয়োজন; তাঁর স্ত্রীকে এখনই একবার পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়।" খুব গম্ভীরস্বরেই সে এই কথা কয়টী বলিল।

বিনোদবাবু যখন বাড়ীর ভিতর গিয়া এই বিপদের কথা বলিলেন,—তখন সকলেই মনোযোগের সহিত তাহা শুনিতেছিল; আকস্মিক এই বিপদে সকলেই একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। অঞ্জলি তো একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল।

বিনোদবাবু কহিলেন—"আর দেরী করলে চলবে না। এখনই চলো তোমাকে দিয়ে আসি।"

অঞ্জলির মাতা অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন—"বাছার আমার এখন খাওয়া হয় নি, একটু জল খেয়ে নিক্।"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি একখানি রেকাবিতে কয়েকটি মিষ্টি দিয়া তাহা কন্যার হাতে তুলিয়া দিলেন।

অঞ্জলি হাত পাতিয়া লইল সত্য, কিন্তু একটাও মুখে দিতে পারিল না। যেমন তেমনই পড়িয়া রহিল, সে হাত ধুইয়া উঠিয়া পড়িল।...

যত দেব-দেবী আছে, সমস্ত পথ সে তাঁহাদের নিকট একমনে স্বামীর মঙ্গল কামনাই করিয়া আসিয়াছে।

হর্ণের শব্দ শুনিয়াই ব্রজেন নীচে নামিয়া গিয়া বলিল—"এই মাত্র ডাক্তার রায় চলে গেলেন। ভয়ের কোন কারণ নেই; এখন একটু ঘুমিয়েছে।

উপরে উঠিয়া বিনোদবাবু দেখিলেন—

নীলমণি অকাতরে ঘুমাইতেছে ;—তাহার ব্যাণ্ডেজটার স্থানে স্থানে তখনো তাজা রক্ত লাগিয়া রহিয়াছে।

তিনি একখানি চেয়ারে বসিয়া মেয়েকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তুই অত ব্যস্ত হোস্ নি। আর কোন ভয় নেই ম। ছ'তিন-দিনের মধ্যেই ঘা শুকিয়ে যাবে ; আচ্ছা, আজ তবে উঠি, কাল আবার আস্‌ব'খন।" বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রজেন ও উঠিয়া বলিল—"আচ্ছা, আমিও তবে উঠি ; কাল বিকেল নাগাদ একবার এসে দেখে যাব কেমন থাকে।"

তাহারা চলিয়া যাইবার একটু পরেই ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে নয়টা বাজিয়া গেল। অঞ্জলি নীলমণির শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে ছিল। তাহার চক্ষু ছু'টি অশ্রুভারে টলমল করিতেছিল।

সহসা চোখ মেলিয়া নীলমণি বলিল—"উঃ, বুক জলে যায়, একটু জল!"

অঞ্জলি কুঁজা হইতে জল আনিয়া তাহার মুখে ঢালিয়া দিল।

একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া নীলমণি বলিল—"আঃ, বাঁচলাম! তুমি কতক্ষণ এসেছ অঞ্জু?"

অঞ্জলি বলিল—"এই কিছুক্ষণ এসেছি। তুমি এখন কেমন আছ? যন্ত্রণাটা কি এখনও খুব বেশী হচ্ছে?"

নীলমণি জবাব দিল "না, এখন আর কোন কষ্টই নেই আমার।" তারপরই সে সুর করিয়া বলিয়া উঠিল—

মরি যদি আজ রাতে,
প্রিয়ার শীতল হাতে,
পরশ লভিয়া!—

অঞ্জলি বাধা দিয়া বলিল—"যাও, তুমি ভারি ইয়ে! আমার ভাল লাগে না ; তোমার ছু'টি পায়ে পড়ি, তুমি চুপ কর।"

নন্দ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এখন খাবার দিয়ে যাবে বাবু?"

নীলমণি বলিল—"আচ্ছা, আন্‌তে বল।"

অঞ্জলি তাহাকে খাওয়াইয়া দিয়া কি-একটা কারণে নীচে আসিয়াছিল। নন্দকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যারে, কখন এ কাণ্ড হলো? কি করে পড়্‌ল?"

নন্দ একেবারে গাছ হইতে পড়িল। সে বলিল—"কার কথা বল্‌ছ? কে পড়্‌ল?"

অঞ্জলি একেবারে অবাক হইয়া গেল। তাহার মনের ভিতর কেমন একটা খট্‌কা লাগিয়া গেল। সে ভাবিল—এ কি ব্যাপার! বাড়ীতে যদি এত কাণ্ডই হলো, ওরা কি তার কিছুই টের পেলে না!···

শয্যায় বসিয়া তাহার গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করিল—"মাথার যন্ত্রণাটা কি এখনও আছে?"

নীলমণি বলিল—"না গো না, আমার মাথার কিছু হয় নি, যত ব্যথা সব এই বুকে! সঙ্গে সঙ্গে সে তাহাকে নিবিড়ভাবে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া চুম্বনে চুম্বনে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

অঞ্জলি কোন বাধা দিল না। নিজেকে একেবারে নিঃস্ব করিয়া বিলাইয়া দিল বটে, কিন্তু স্বামীর এই অদ্ভুত কাণ্ডে সে একেবারে অবাক্ হইয়া গেল।

* * *

স্নিগ্ধ-সুশীতল রাত্রির অপূর্ব্ব মায়া দুইজনের মিলন-উৎসুক চোখে নিদ্রার প্রলেপ বুলাইয়া দিল। বৃষ্টি থামিয়া গেলেও বাতাসের প্রলাপ তখনো থামে নাই। নারিকেল গাছের শাখায় শাখায় তখনো শব্দ হইতেছিল—শন্ শন্ শন্।

বুকের বোঝা

শ্রী অপূর্ব্বমণি দত্ত

পরিণত বয়সে রামী যখন হঠাৎ একদিন ছিদামের সঙ্গে কণ্ঠীবদল করিল, তখন পাড়ার লোক বড় কম বিস্মিত হইল না।

ছিদাম কিছুদিন পূর্ব্বেও গ্রামের ব্রাঞ্চ পোষ্ট-অফিসে পিওনের কাজ করিত, এক তাড়া চিঠি লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া অপরাহ্নের বেলাশেষে ক্লান্তদেহে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া যখন নিজের জন্য রন্ধনের উদ্যোগ করিত, তখন তাহার কান্না আসিত। জীবনের অপরাহ্নে আসিয়া শরীরের উপর এতখানি অত্যাচার কি সয়!

অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রায়ই জ্বর হয়, কাজ কামাই হয়, লোকের চিঠিপত্র বিলি করিতেও গোলমাল হয়। উপরওয়ালাদের কাছে এ সম্বন্ধে রিপোর্ট যাইতে দেরী হইল না। ক্ষুদ্র ব্রাঞ্চ পোষ্টঅফিস, এই একটীমাত্র পিওন লইয়াই কাজ চালাইতে হয়, তাহার ক্রমাগত অসুখ এবং কর্ত্তব্যে অবহেলা কর্ত্তৃপক্ষ সহ্য করিবার কোন কারণ পাইলেন না। ফলে চাকরিটী গেল।

ছিদামের একটী ছেলে ছিল, তাহার নাম ভজহরি। যুবাপুরুষ, বয়স বিশ-বাইশের কম হইবে না, কিন্তু পিতা সাংসারিক অসাচ্ছন্দ্যের কথা বহুবার বুঝাইয়াও তাহাকে কোন কাজে লিপ্ত করাইতে পারে নাই। গ্রামের মধ্যে তিনু স্যাকরার চণ্ডীমণ্ডপে একটা আড্ডা বসিত, সেইখানে তাস ও পাশা খেলিয়া, গাঁজার আদ্য-শ্রাদ্ধ করিয়া তিন-চারদিন অন্তর কখন কখনও সে বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইত এবং পিতাকে দু'-চারটী নীতিকথা শুনাইয়া আবার চলিয়া যাইত।

দিনগুলি যখন এইভাবে দুঃখ, কষ্ট ও দুর্ভাবনার মধ্য দিয়া কাটিতেছিল, সেই সময়ে হঠাৎ একদিন রামীর সঙ্গে ছিদামের কণ্ঠীবদল হইয়া গেল। এই ব্যাপারটা যে কি করিয়া সংগঠিত হইল, তাহা লইয়া গ্রামের লোক অনেক আলোচনা করিল, কিন্তু মীমাংসা কিছুই করিতে পারিল না। কেহ কেহ ছিদামের অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিল, কেহ রামীর বুদ্ধিবৃত্তির নিন্দা করিল। ভজহরি আসিয়া দিন দুই খুব চেঁচামেচি করিয়া চলিয়া গেল।

রামীরও পূর্ব্বপক্ষের একটী মেয়ে ছিল, তাহার ভাল নাম কৃষ্ণমঞ্জরী না ঐ রকমের একটা কিছু, কিন্তু শ্যামী বলিয়াই সকলে তাহাকে ডাকিত। সে মায়ের এই ব্যাপারে দিনকয়েক খুব কাঁদাকাটা করিল, তারপর একদিন ঝগড়া করিয়া কোথায় তাহার এক মাসীর বাড়ী ছিল, সেখানে চলিয়া গেল।

কিছুদিন কাটিল মন্দ নয়। পাড়ার কয়েকটী গৃহস্থবাড়ীতে রামী বাসন মাজিত, তাহাতে যে কয়েকটী টাকা পাইত, তাহাতে দুঃখে-কষ্টে একপ্রকার চলিয়া যাইত। কিন্তু হঠাৎ যেদিন কু-গ্রহের মত ভজহরি আসিয়া পড়িত, সেদিন সে আর সহ্য করিতে পারিত না। ছিদাম না হয় বুড়োমানুষ, শরীর পঙ্গু, খাটিবার সামর্থ্য নাই,—কিন্তু তুই হতভাগা, জোয়ান মদ্দ লোকটা, তুই কি বিবেচনায় নিকর্ম্মার মত এই দুঃখের রোজগারের অন্ন নিশ্চিন্তমনে ধ্বংস করিস।

কিন্তু ভজহরি নির্ব্বিকার! হোহো করিয়া

হাসে এবং রামীর এই নূতন কর্ত্তৃত্বের উপরে কটাক্ষ করিয়া দু'-চারটা কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া যায়।

গায়ের জ্বালায় রামী বলিয়া উঠে, "আর তো পারি না, এ জ্বালা তো আর সহ্য হয় না, মরণ হয় তো বাঁচি!"

দুই

মায়ের উপর রাগ করিয়া শ্যামী মাসীর বাড়ী গিয়াছিল, কিন্তু মাসী দেখিলেন যে, পনের-ষোল বৎসরের এই মেয়েটীকে চিরদিন সংসারে রাখিবার মত সংস্থান তাহার নাই। তাহার ফলে একদিন মাসীর সহিত শ্যামীর বচসা হইল এবং তাহার পরের দিনই সে মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিল।

তিনু ন্যাকরার চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডাটী এই সময়ে হঠাৎ একদিন স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া ছিদামের বাহিরের দাওয়ায় আসিয়া অধিষ্ঠিত হইল। রামীর সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্ব লিল, ভজহরিকে আবার অনেকগুলি কটুকথা শোনাইল, কিন্তু হাড়ের পাশা দিনের পর দিন সমান উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিল এবং গাঁজার গন্ধে বাহিরের দাওয়া ভরপুর হইয়া উঠিবার পক্ষে কোন ব্যতিক্রম হইল না।

ভজহরিকে যখন শাসনের গণ্ডীর মধ্যে আনিতে পারা গেল না, তখন ক্রোধের তীব্রতার প্রয়োগ হইল শ্যামীর উপর। রামী বলিল, "বাড়ী থেকে এক পা বেরুবি যদি, ঝেঁটিয়ে একেবারে বিষ ঝেড়ে দেব। থাকতে পারলি নি মাসীর বাড়ী! বড় যে তেজ ক'রে গিয়েছিলি!"

কিন্তু এ ভৎ'সনায় যে শ্যামীর মনে কিছুমাত্র অনুতাপের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা বোঝা গেল না। সে সমান জোরেই উত্তর দিল, "লজ্জা করে না বলতে? বুড়োবয়সে কণ্ঠীবদল করে আবার মুখ নেড়ে কথা!—"

রামীও উত্তর দেয়, শ্যামীও চুপ করিয়া থাকে না—কাজেই একটা তুমুল ব্যাপারের সৃষ্টি হয়; আবার আপোষে মিটিয়াও যায়। যেদিন সকালে এইরূপ ঝগড়া হয়, সেইদিনই আবার সন্ধ্যার সময় দেখা যায় যে, শ্যামী তরকারী কুটিতেছে, এবং রামী রন্ধনশালার অন্য কি একটা কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত রহিয়াছে।

কিন্তু মনের অশান্তি কাহারও যায় না—রামীরও না, শ্যামীরও না। ওদিকেও সেইরূপ—ছিদামও যেমন প্রতিকথায় খিটখিট করে, ভজহরির প্রত্যুত্তরগুলার প্রতিকথাতে তেমনই যেন আগুনের ঝাঁজ।

তিন

কষ্টেসৃষ্টে দিনগুলি একরকম কাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু এক বিপত্তি ঘটিল। রামী গ্রামের কয়েক বাড়ীতে কার্য্য করিত, তাহার মধ্যে দুই বাড়ীর কাজ গেল। আবার দিন চলা বড়ই দুষ্কর হইয়া উঠিল।

ভজহরিকে এই সময়ে অনেক ভৎ'সনার পরে ছিদাম গঞ্জের বাজারে পাঠাইল, মহাজনের দোকানে মাল ওজন করিবে, মাসে খোরাকী বাদে সাত টাকা পাইবে। এই সাত টাকার মধ্যে যদি পাঁচটা টাকাও ভজহরি পিতার হাতে দেয়, তবুও অনেকটা কষ্টের লাঘব হইবে।

ভজহরিকে পাঠাইয়া ছিদাম তিন-চারদিন ভবিষ্যতের সম্বন্ধে একটু উজ্জ্বল কল্পনা করিতেছিল, এমন সময়ে ভজহরি ফিরিয়া আসিল। অত পরিশ্রমের কাজ সে পারিয়া উঠিবে না।

দিনগুলি যখন ঝড়ো হাওয়ার মত বড়ই এলোমেলোভাবে চলিতেছিল, তখন হঠাৎ একদিন ছিদাম কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিয়া রামীকে বলিল, "একটা কাজ করা যায় তো দুঃখু ঘোচে।"

রামী সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

কথাটা বলিতে ছিদাম প্রথমে একটু ইতঃস্ততঃ করিল। পাশের গ্রামের পীতাম্বর বৈরাগীর

অবস্থা বেশ ভালই। চাষ-বাস, জমী-জমা, তা' ছাড়া তেজারতিও আছে। বয়স পঞ্চাশের উপর হইয়াছে বটে, কিন্তু শরীর এখনও খুব সবল। সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির যা' হোক একটা বন্দোবস্ত করিয়া বৃন্দাবনে যাইবেন, একথা লোকে দশবৎসর যাবৎ শুনিয়া আসিতেছে। পীতাম্বর ইদানীং ছিদামের নিকট বড় বেশী রকমের আনাগোনা করিতেছিল। তিনু স্যাকরার আড্ডার ছেলেরাও ইহা লইয়া নানরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে ছাড়ে নাই। কিন্তু পীতাম্বরের এই ঘনিষ্ঠতার প্রকৃত কারণ কি, তাহা কেহই অনুমান করিতে পারে নাই।

অনেক ভূমিকার পর ছিদাম বলিল,"পীতাম্বর, শ্যামীর জন্যে বড় ঝুঁকেছে। দু'শো টাকা নগদ দিতে চায়। প্রথমে বলেছিল একশো, তারপর এখন দু'শোয় রাজি হয়েছে। চেষ্টা করলে তিনশো না হোক, আড়াইশো টাকা তার কাছ থেকে নিশ্চয় আদায় করা যায়। সেই টাকাটাতে যদি গঞ্জের বাজারে ভজাকে একখানা মনিহারী দোকান ক'রে দেওয়া যায়, তা' হ'লে—"

রামী আগুনের ফুলকির মত ছিটকাইয়া উঠিল! "কি! টাকার জন্যে আমার শ্যামীকে এক বাহাত্তুরে বুড়োর হাতে দিবে, সেই টাকায় তোমার ভজার দোকান ক'রে দেওয়া হবে! আমার পেটের মেয়েটার সর্ব্বনাশ ক'রে সেই টাকায় রাজত্ব করবে ভজা! ওই গাঁজাখোর, হাড়হাবাতে ভজা! ফের যদি ও কথা মুখ দিয়ে—"

রামীর মূর্ত্তি দেখিয়া ছিদাম প্রমাদ গণিল। কলিকাটায় ফুঁ দিতে দিতে বলিল, "কিন্তু দুঃখু ঘুচে যেত।"

দাঁত মুখ খিঁচাইয়া রামী বলিল, "দুঃখু ঘুচে যেত! রোজগার করবার ক্ষ্যামতা নেই, অমন ছেলেকে চা বাগানে বিক্রী করতে পার না! তা হ'লেও তো অনেক টাকা হবে।"

কলিকা ফেলিয়া ছিদাম গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "কি হারামজাদী! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! জানিস—"

রামীও কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হইল না। সেও চীৎকার করিয়া বলিল, "জানি বৈকি! লোকের বাড়ী গতর খাটিয়ে টাকা এনে আমি মেয়েমানুষ সংসার চালাবো, আর বাপ-বেটায় দু'জনে বসে কাঁড়ি গিলবেন। গলায় দড়ি জোটে না!"

ছিদামও প্রাণপণে চীৎকার করিয়া বলিল, "দড়ি জোটাচ্ছি, দাঁড়া। এই দিব্যি করছি আজ, ওই মেয়েকে যদি পীতেম বৈরাগীর হাতে না দিই, তা হ'লে—"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রামীও ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, ছিদামও প্রত্যুত্তর দিতে ছাড়িল না। সেদিনকার সন্ধ্যাটা এই ভাবেই কাটিল। রামী কাজে গেল না। ক্রোধে এবং উত্তেজনায় ছিদামের জ্বর আসিল এবং ভজহরি নিয়মিত সময়ে আহার করিতে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া আস্তে আস্তে বাহিরের দিকে চলিয়া গেল।

চার

প্রায় একমাস কাটিয়া গিয়াছে। গ্রামের পালবাবুদের কন্যার শ্বশুরবাড়ী পাঁচক্রোশ দূরে, সেখানে দোলযাত্রার তত্ত্ব লইয়া রামী গিয়াছিল।

তিনদিন পরে এই দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া সে যখন বাড়ী ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বকশিসের যে টাকাটা পাইয়াছিল, সেটা আঁচলে বেশ করিয়া বাঁধা, মিষ্টান্নও যাহা পাইয়াছিল, তাহাও সে নিজে খায় নাই, কাপড়ে বাঁধিয়া আনিয়াছে।

ক্ষুদ্র উঠানটী পার হইয়া ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া দেখিল, সন্ধ্যা-প্রদীপ তখনও জ্বলে নাই। রাগে তাহার পিত্তশুদ্ধ জ্বলিয়া গেল। তুলসী-তলাতেও একটা প্রদীপ দেওয়া হয় নাই। তিনটী দিন সে বাড়ীতে নাই, ইহারই মধ্যে

এতখানি নিয়মের ব্যতিক্রম! আর তো সহ্য হয় না! ডাকিল, "শ্যামী!"

কিন্তু শ্যামীর উত্তর পাওয়া গেল না।

ঘরের দ্বারে শিকল দেওয়া ছিল, রামী তাহা খুলিয়া ঘরে ঢুকিল। দেশলাইটা যেখানে থাকিত, সেখানে হাতড়াইয়া দেখিল—তাহা যথ স্থানে নাই। সেখানে বোধ হয় বঁটিখানা ছিল, অন্ধকারে দেখিবার উপায় ছিল না, তাহাতে হাত লাগিয়া আঙুলটা একটু কাটিয়া গেল।

রামীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। এই এতখানি পথ হাঁটিয়া, এত মেহন্নত করিয়া, এ সব কি আর সহ্য হয়? চীৎকার করিয়া আবার ডাকিল, "ওলো শ্যামী!"

এবারেও কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

আরও বিরক্তির সহিত আর একবার ডাকিল, কিন্তু কোথায় শ্যামী?

ছিদামকে উদ্দেশ করিয়া সে বলিল, "ওই, ওগো, বলি সব কাণে কালা হয়েছ না কি?"

কিন্তু ছিদামও যে নিকটে কোথাও আছে, তাহা বোধ হইল না। রামীর মাথা ঘুরিতে লাগিল। কিছুদিন পূর্ব্বেকার সেই কথা—ছিদামের সেই শপথ—পীতাম্বর বৈরাগী—সব এক নিমেষে চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। তবে কি তাহার এই কয়দিনের অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া ছিদাম তাহার হীন প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়াছে?

রামীর শিরায় শিরায় ফুটন্ত রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। কপাল দিয়া দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল।

আরও একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিল, "শ্যামী রে!"

ঘরের বাহিরের দাওয়ায় এইবার যেন অট্টহাস্য শোনা গেল। ছিদাম মেয়ের স্বরে বলিয়া উঠিল, "শ্যামী রে! কেমন হয়েছে! বড় যে সেদিন মুখ নেড়ে—বেশ হয়েছে—শ্যামী! শ্যামী রে!—আবার ডাকা হচ্ছে।"

এ্যা! তবে তাহার অনুমান মিথ্যা নয়! রামীর মাথাটা ঘুরিতে লাগিল, চক্ষু দুইটা যেন অস্বাভাবিক রকম জ্বালা করিয়া উঠিল। আঙুলের আঘাত স্থানটাও যেন রিরি করিয়া জ্বলিতে লাগিল। চক্ষের নিমেষে বঁটিখানা সে তুলিয়া লইল। পরমুহূর্ত্তেই ছিদামের একটা ভয়ানক তীব্র চীৎকার শোনা গেল। তাহার দেহটা ধড়ফড় করিয়া সারা দাওয়াটা যেন মথিত করিয়া ফেলিল, তারপরেই সব নিস্তব্ধ।

ভজহরি বোধ হয় ছিদামের মরণ চীৎকার শুনিয়াই তাড়াতাড়ি আসিয়াছিল। রামী ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, ভজহরি তাহার হাত ধরিল।

রামীর চক্ষু পড়িল সম্মুখেই ছিদামের প্রাণহীন দেহটার উপর—দাওয়ার চারিদিকে রক্তের ঢেউ খেলিতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে হঠাৎ বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে, আমার এ কি সর্ব্বনাশ হোল রে"

তাহার চীৎকারে বাড়ীতে অনেক লোক আসিয়া পড়িল। ছিদামের রক্তাক্ত মৃতদেহ তখনও তেমনিভাবে মাটিতে লুটাইতেছে, বঁটিখানা তখনও সেইখানে পড়িয়া আছে। রামী মাটিতে পড়িয়া চীৎকার করিতেছে এবং ভজহরি তখনও তাহার হাত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া আছে।

ব্যাপারখানা কি কাহারও জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হইল না। সাত-আটজনে মিলিয়া ভজহরিকে বাঁধিয়া ফেলিল। সে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল,—গলা শুকাইয়া উঠিয়াছিল,—একবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আমি নই।"

কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করিবার কাহারও অবসর অথবা প্রয়োজন ছিল না।

পাঁচ

এই দুর্ঘটনার পরে শূন্য গৃহে থাকা সম্ভব নয় বলিয়া প্রতিবেশীরা রামীর উপর একটু বেশী করিয়াই সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল। একজন রামীকে নিজের বাড়ীতেই আনিয়া রাখিল।

কিন্তু রামীর মধ্যে একটা মস্ত পরিবর্তন দেখা গেল। সে আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিতেও যেন ইচ্ছা করে না, আপন-মনে কি বকে, তাহারও অর্থবোধ করা সব সময়ে সহজ নয়। লোকে ভাবিল, স্বামী ও কন্যার শোকে রামী বুঝি এইবার সত্যসত্যই পাগল হইল।

পাড়ার নিধু বৈষ্ণবী তীর্থযাত্রীর দল লইয়া নানা তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রায় মাস ছয়েকের অনুপস্থিতির পরে সে গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া এই দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া রামীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। সহানুভূতির অনেক কথা এবং নিজের ভ্রমণ-কাহিনীর অনেক অংশ বিবৃত করিয়া বলিল, "গিয়েছিলাম মা, গঙ্গার ওপারে আমার বোনের বাড়ী। ওমা! সেখানে দেখি তোমার স্বামী। আমাকে দেখেই তো একমুখ ঘোমটা টেনে দিলে। আমি তো হেসে বাঁচি নে।"

রামীর সর্ব্বদেহে যেন তড়িৎ খেলিয়া গেল। বিস্মিত হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "গঙ্গার ওপারে?"

"হাঁ মা, ওপারেই তো। ওই যে তিনে স্যাকরার ওখানে আসতো টেরিকাটা সেই ছোঁড়াটা, বিড়ি খেত, মধুর না কি তার নামটা—"

যেন বিহ্বলের মত রামী বলিয়া উঠিল, "এঁ্যা! তা' হ'লে পিতেম বৈরাগী—"

নিধু বলিল, "কোন পিতেম বৈরাগী! আমাদের ও গাঁয়ের পিতেম? আহা! তার কথা শোনো নি বুঝি? আর কোথা থেকে শুনবে মা? তুমি এই শোকতাপা মানুষ, পিতেমের তো আজ ক'দিন থেকে খুব বাড়াবাড়ি ব্যামো, জেলা থেকে নাকি সেদিন ডাক্তার এসেছিলো, মাঝে নাকি একদিন নাড়ি ছিল না। বুড়ো বোধ হয় এবার আর "

পরদিন প্রাতে আর রামীকে গ্রামে দেখিতে পাওয়া গেল না। লোকে এদিক ওদিক একটু খুঁজিল, তাহার পর স্থির করিল যে, স্বামী ও কন্যার শোকে রামী বোধ হয় জলে ডুবিয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে আত্মহত্যা করিয়াছে।

ছয়

নিজের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য উকীল বা মোক্তার দিবার সঙ্গতি তজবরির ছিল না। সে নিজেই আদালতে বলিল যে, সে নির্দোষ। কিছুই জানে না।

কিন্তু রক্তমাখা হাতে যে তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িয়াছে, তাহার এ উক্তি বিশ্বাস করিবার কোন সঙ্গত কারণই আদালত দেখিতে পাইলেন না। মোকর্দ্দমা সেসনে গেল। ফাঁসিটা কোন উপায়ে বন্ধ হইল বটে, কিন্তু বিচারে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের হুকুম হইল।

মোকর্দ্দমা যখন জেলার সেসনে চলিতেছিল, তখন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারীর সম্মুখে একটী স্ত্রীলোক আসিয়া বড়ই ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, হাকিম কোথায় বসে গা?"

লোকটী আদালত গৃহ দেখাইয়া দিল। স্ত্রীলোকটী ছুটিয়া গিয়া দরজার নিকট হইতেই চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো হাকিম সাহেব, ছিদেম বষ্টমকে তজা মারে নি গো, আমি মেরেছি।"

বাঙ্গালী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট একজন মোক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ও?"

"বোধ হয় পাগলী। কে গা তুমি?"

"আমি তজার মা গো, আমি তজার মা।"

ডেপুটী হাসিয়া বলিলেন, "নিঃসন্দেহ পাগলী। কনেষ্টবলকে ইঙ্গিত করিলেন। সে ধাক্কা দিয়া রামীকে আদালত-গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিল।

রামীকে কেহ আর ও অঞ্চলে দেখিতে পায় নাই। কেহ বলিত, সে এখন বৃন্দাবনে আছে, কেহ বা বলিত নবদ্বীপে।

ভস্ম-তিলক

শ্রী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

এক

হরিহর যখন বাড়ীতে ফিরিল, তখন তাহার মুখখানা অন্ধকার। সেই অন্ধকারপূর্ণ মুখের পানে চাহিয়াই সরলা ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল; তথাপি জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল, ওঁরা কি বললেন?"

হরিহর তীব্রকণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল, "হচ্ছে, হচ্ছে, সবই শুনতে পাবে এখন, শোনা পালিয়ে যাচ্ছে না।"

স্বামীর তীব্র কথা শুনিয়া সরলা পিছাইয়া গেল, আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না। হরিহর এক ছিলিম তামাক সাজিয়া লইয়া খেলো হুঁকার উপর কলিকা বসাইয়া ধূমপান করিতে বসিল।

"ওহে হরিহর, ব্যাপার কি হ'ল—"

বিপিন পথ দিয়া যাইতে যাইতে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

হরিহর বিমর্ষমুখে বলিল, "আর কি হবে, যা' হবার তাই হ'ল। ও তো জানা কথাই দাদা, ওর আর কি হ'ল, না হ'ল জিজ্ঞাসা করাই মিথ্যে।"

বিপিন একটু ভাবিয়া বলিল, "যাই বল, কথাটা আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না। এ কি বিশ্বাস করার কথা হে? লোকে কি না বলে—কি না করে—আর তাই নিয়ে সমাজের ছোট-বড় সবাই অমনি মাথা ঘামাবে, কথাটা নিয়ে সমাজ-পতি জমিদার পর্য্যন্ত নিজের মন্তব্য প্রকাশ করবেন—বাংলার পাড়াগাঁগুলা সত্যই বড্ড বিশ্রী।"

হরিহর বিমর্ষমুখে বলিল, "সে তো আমিও বলছি দাদা। তবে পরের ঘরে এ রকম ব্যাপার ঘটলে যে বলতুম না, এ কথা ঠিক; নিজের ঘর বলেই বলি। হতো পরের ঘর, - দেখতে আমিও অনেক কিছু উপদেশ দিতে পারতুম।"

হুঁকার উপরে কলিকার আগুন নিভিয়া আসিয়াছিল, হরিহর কলিকা নামাইয়া ফুঁ দিতে দিতে বলিল, "উঠে এসো দাদা, তামাক খেয়ে যাও।"

বিপিন বলিল, "ওদিকে কাজ আছে, বরং সন্ধ্যের দিকে আসব এখন।"

সে চলিয়া গেল।

হরিহর নিস্তব্ধে বসিয়া তামাক খাইতে লাগিল। কলিকাটী নিঃশেষে পুড়াইয়া হুঁকাটী দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া রাখিয়া সে উঠিল।

সরলা স্বামীর প্রত্যাশায় ছিল। হরিহর স্নানান্তে বাড়ী ফিরিয়া আহারে বসিল।

ভাত বাড়িয়া দিয়া সরলা নিকটেই বসিল, দু'-চার গ্রাস খাওয়া হইলে সে রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারটা কি হ'ল—জমিদারবাবু কি বললেন?"

বিকৃতমুখে হরিহর বলিল, "তাঁর স্পষ্ট এক কথা—লোকে তাঁর কাছে যা বলেছে, তিনি তাই শুনেছেন। তিনি বলছেন, 'ও রকম মেয়েকে ঘরে রাখতে পারবে না, হয় ওকে বিদায় ক'রে দাও, নয় ওকে নিয়ে দেশ ত্যাগ করে আর কোথাও চলে যাও'।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সরলা মুখ ফিরাইয়া একটু পরে বলিল, "কিন্তু ও তো একলাই দোষী নয়—"

গর্জ্জিয়া উঠিয়া হরিহর বলিল, "দোষী নয়?

ও ছাড়া আর কেউ দোষী নয় সরলা—ও যে মেয়ে, যত দোষ ওর ঘাড়ে পড়বেই! মেয়েদের যেখানে এতটুকুতেই দোষ হয়, সেখানে এতবড় অপরাধ করে দোষী নয় বললেই কথাটা উড়ে যাবে?"

গৃহমধ্যে অপরাধিনী কমলা উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল। বাহিরের সব কথাই তাহার কাণে আসিতেছিল, লজ্জায়-ঘৃণায় তাহার আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা হইতেছিল।

দোষ কি তাহার একার—দোষ কি আর কাহারও নাই? কবে সে বিধবা হইয়াছে, তাহা সে জানে না—সপ্তদশ বৎসরে নূতন করিয়া কিরূপে সে নিজেকে বিধবা বলিয়া ধারণা করিয়া লবে?—দাদা বা বউদি' কেহই এতদিন তাহার মনে এ ধারণা তো দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দেন নাই। স্বজাতীয় জমিদার-পুত্র সোমেশ্বর তাহাকে প্রলোভিত করিয়াছিল; সে জোর করিয়া জানাইয়াছিল, সে এই বালবিধবাকে বিবাহ করিবে। তখন দাদা মুখে কিছু না বলিলেও অন্তরে নিশ্চয়ই খুসি হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই, নচেৎ তিনি তখনই সোমেশ্বরের আসা-যাওয়া বন্ধ করিয়া দিতেন।

ব্যাপারটা অনেক দূরই গড়াইয়াছে, আজ দেশে মুখ দেখানোর যো নাই, সোমেশ্বর ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝিয়া পলাইয়াছে, কলঙ্ক কালী গায়ে মাখিতে আছে,—এই মেয়েটী, তাহার দাদা ও বউদি'।

জমিদার মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি পুত্রের কথা জানিলেও তাহার নাম চাপা দিতে চান। একা এই মেয়েটিকে গ্রামের বুক হইতে সরাইতে পারিলে গোল মিটিয়া যাইবে, সেইজন্য তিনি হরিহরকে উৎপীড়ন করিতেছিলেন।

দুই

চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া জমিদার-মহাশয় বলিলেন, "তুমি বোনকে এখান হতে সরাবে কি না আমি শুধু তাই শুনতে চাই হরিহর?"

হরিহর দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "ওকে আমি কোথায় দেব বলুন দেখি, কে ওকে দেখবে? সে এখন একা নয়, তার গর্ভে সন্তান রয়েছে, আপনারই পৌত্র বা পৌত্রী—"

হঠাৎ গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বলিলেন, "চুপ—মুখ সামলে কথা বলো হরিহর—"

হরিহর বলিল, "আমি কিছুই বলতে চাই নে, আপনি নিজেই কথা তুলছেন। আমি শুধু বলতে চাই, এ রকম অবস্থায় আমি ওকে কোথায় দেব; সে যে পথে পথে বেড়াবে, আর লোকের কাছে আপনাদের নাম করবে, তাতে কি আপনাদের মাথা নীচু হয়ে পড়বে না?"

ব্রজেন্দ্রনাথ মাথা নত করিলেন। খানিক পরে বলিলেন, "যাতে পথে পথে না বেড়াতে পারে, তার ব্যবস্থা আমি করব, সে জন্য তোমার ভাবতে হবে না। আমি চাই ওকে আমি এখন এখানে থাকতে দেব না; বছরখানেক বাদে আবার সে তোমার কাছে এসে থাকতে পারবে।"

সোমেশ্বরের বিবাহ আগামী অগ্রহায়ণ মাসে হইবে, এ কথাটা গ্রামের সকলেই জানে।

অসচ্চরিত্রতার এবং হৃদয়হীনতার এত বড় একটা নিদর্শন সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিতে কন্যাপক্ষ যে এমন জামাতা গ্রহণ করিবেন না ইহা জানিত সত্য, এবং সেই জন্যই যে ব্রজেন্দ্রনাথ এই মেয়েটীকে সরাইতে চান, ইহাও হরিহরের অজ্ঞাত ছিল না।

কিন্তু উপায় নাই। জমীদারের কথা লঙ্ঘন করিবার সাহস কই?—কেন না, পৈত্রিক ভিটা জমিজমা সবই জমীদারের দখলে রহিয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া নিস্তার নাই। কালী মণ্ডল ভিটাচ্যুত হইয়াছে, আজ তাহাকে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়। যদিও মানুষ মনকে প্রবোধ দেয়

ভগবান বলার নহেন, গরীবের তথাপি কার্য্যতঃ তাহা ঘটিতে দেখা যায় না।

গ্রামের মধ্যে কমলার মুখ দেখাইবার উপায় ছিল না। জমিদার-মহাশয় তাহার ভার লইতেছেন জানিয়া সে একটু হাসিল মাত্র।

বউদি' মুখভার করিয়া বলিল, "ঝাঁটা মার, পোড়ার মুখে হাসি যে এল কিসের জন্যে তা জানিনে। কপালে যে আরও কি আছে কে জানে, আগে যদি জানতুম—"

বাস্তবিকই সরলা আগে বুঝিতে পারে নাই, ব্যাপারটা এতখানি গড়াইবে। সোমেশ্বর জোর করিয়া জানাইয়াছিল, সে কমলাকে বিবাহ করিবেই; হোক সে বিধবা, তাহাতে কিছু আসে যায় না। তাহার এক মামা বিধবা-বিবাহ করিয়াছেন; তাঁহাকে কেহই সমাজচ্যুত করে নাই। সেও বিধবা-বিবাহ করিবে।

হরিহর এখানে উপস্থিত থাকিলে হয় তো এতখানি ঘটিতে পারিত না। মাস দুইয়ের জন্য সে তীর্থপর্যটনে গিয়াছিল। কাশী, পুরী, গয়া প্রভৃতি বেড়াইয়া পিতৃপুরুষের পিণ্ড দিয়া উদ্ধার করিয়া বাড়ী আসিয়া সে শুনিল, যে পিতৃপুরুষকে সে স্বর্গদ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়াছে, তাহার ভগিনী তাঁহাদেরই নরকে টানিয়া আনিয়া ফেলিয়াছে

ইহার পর সোমেশ্বরকে ধরিয়া একদিন যখন সে তাহার ভগিনীর একটা কোন উপায় স্থির করিতে বলিল, তখন সোমেশ্বর জানাইল, সেজন্য কোনও ভাবনা নাই, সে কমলাকে বিবাহ করিবে।

সরল প্রকৃতি হরিহর বুঝিতে পারে নাই, সোমেশ্বর তাহাকেও প্রতারণা করিয়াছে। বুঝিতে পারিল সেই দিন, যেদিন ভগিনীর কলঙ্কে দেশ ভরিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সোমেশ্বরও অদৃশ্য হইল।

আজ জমীদারের প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ছাড়া তাহার আর উপায় ছিল না। সাত মাস অন্তঃসত্ত্বা ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া জমীদারের লোকের সহিত একদিন সে কলিকাতায় যাত্রা করিল এবং একটী খোলার ঘরে তাহাকে রাখিয়া পরদিন সে ফিরিয়া আসিল।

তিন

সুন্দর এতটুকু একটী মেয়ে—যেন নিকষ কালো অন্ধকারে জ্যোৎস্নার শুভ্ররেখা! যতটুকু স্থানে পড়িয়াছে, ততটুকু শুভ্র উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

সে খেলা করে, মা অপলক-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। সে যখন কাঁদে, তখন মেয়েটীকে তুলিয়া লইয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরে!

দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নাই, বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক নাই। দাদা সেই রাখিয়া গিয়াছে, আর কোন দিন আসে নাই, একটা খোঁজও লয় নাই।

কমলা তবু সুখী, মেয়েটীকে লইয়া সে জীবন কাটাইয়া দিবে। সে আর দেশে যাইবে না, কাহাকেও আত্মীয় বলিয়া কলঙ্কিত করিবে না।

মেয়ের মুখের পানে তাকাইয়া সে জগৎ-সংসার ভুলিয়া যায়—মনে মনে কল্পনার জাল বোনে! পথ দিয়া মেয়েরা স্কুল যায়, সে ভাবিয়াছে, তাহার খুকু একটু বড় হইলে সেও তাহাকে স্কুলে দিবে; নিজে কাহারও বাড়ী দাসী-বৃত্তি করিয়া তাহার পড়ার খরচ চালাইবে। তাহার খুকুর সমাজ নাই বা রহিল, লেখাপড়া শিখিয়া সে মানুষ হইবে তো।

দিনের পর দিন যাইতেছিল, এইরূপে তিনটী মাস কাটিয়া গেল।

মেয়েটী বেশ হাসে, বড় বড় দু'টি চোখ মেলিয়া মায়ের পানে তাকায়। কমলা বিহ্বল-নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া থাকে।

হঠাৎ একদিন জমীদারের দেওয়ান গোবিন্দ চৌধুরীর আগমনে সে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল

যে দিনের কথা সে ভুলিয়া গিয়াছিল, সেই দিনের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। সে নির্নিমেষে শুধু তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিল।

গোবিন্দ চৌধুরী জানাইলেন, হরিহরের বড় অসুখ—কমলাকে সে একবার দেখিতে চায়, সেই জন্য তিনি তাহাকে লইতে আসিয়াছেন।

হরিহরের অসুখ শুনিয়া কমলা চঞ্চল হইয়া উঠিল। দাদার স্নেহ-ভালবাসার কথা মনে হইল; উৎসুক কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি দেশে গেলে কেউ কিছু বলবে না তো?"

একটু হাসিয়া গোবিন্দ চৌধুরী বলিলেন, "সে সব কথা সবাই এ কয়মাসে ভুলে গেছে, আর কেউ কোন কথা বলবে না। তার বাঁচার আশা নেই—ডাক্তারেরা জবাব দিয়ে গেছেন—এ সময় না গেলে আর দেখা হবে না। আমি এখানেই আসছিলুম, সে আমায় বলে দিলে, যদি এ সময়ে তোমার দেখা করার ইচ্ছা থাকে, তবে একবার চল।"

কমলা কাঁদিয়া ভাসাইল; তখনই সে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। খুকীর ঝিনুক, বাটী, দু'টী জামা গুছাইয়া লইয়া বলিল, "আমি এখনই যাব, চলুন।"

যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গোবিন্দ চৌধুরী বলিলেন, "খুকীকে নিয়ে কোথায় যাবে? দেশের কেউ কি জানে যে, সত্যই তোমার সন্তান হয়েছে। হরিহর আর আমরা রাষ্ট্র করেছি, তুমি তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে কাশী চলে গেছ। এখন মেয়ে নিয়ে গেলে লোকে কি বলবে বল দেখি?"

কমলা দমিয়া গেল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তবে কি করে যাব জ্যাঠামশাই?"

গোবিন্দ চৌধুরী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "এক কাজ কর, ওকে বাড়ীওয়ালীর কাছে রেখে চল। হয় আজ রাত্রে, নয় কাল সকালেই তো তুমি ফিরছো; একটা দিন রাত সে ওকে রাখতে পারবে।"

কমলা যেন অকূলে কূল পাইল। দাদার এই ব্যারামের সংবাদে সে বাস্তবিকই অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, একবার দেখিবার জন্য অস্থির হইয়াছিল, কিন্তু মেয়েটীকে লইয়া সেখানে যাইয়া দাঁড়াইতে তাহার যেন মাথা নুইয়া পড়িতেছিল।

গোবিন্দ চৌধুরীর প্রস্তাবে অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিয়া সে বলিল, "কিন্তু ও কি খুকুকে রাখবে?"

গোবিন্দ চৌধুরী বলিলেন, "কিছু পাওয়ার লোভ থাকলে নিশ্চয়ই রাখবে। আমি ওকে কিছু না হয় দিচ্ছি।"

বাড়ীওয়ালী এক কথায় রাজী হইয়া মেয়েকে লইল। কমলা হৃষ্টমনে দাদাকে দেখিতে যাত্রা করিল; বলিয়া গেল, হয় সন্ধ্যার ট্রেণে, নয় কাল সকালে সে ফিরিবেই।

সরলা অনভিজ্ঞা তরুণীর মনে এতটুকু সন্দেহ হইল না; সে একবারও ভাবিল না, গোবিন্দ চৌধুরীর এই নিঃস্বার্থপরায়ণতার কারণ কি, তাহার পিছনে কি উদ্দেশ্য রহিয়াছে?

চার

পথে কমলার প্রাণটা মেয়ের জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছিল; দেশ, লোকজন কিছুই তাহার ভাল লাগিতেছিল না। কোনক্রমে সে ষ্টেশনে আসিল বটে, কিন্তু হঠাৎ তাহার মতের পরিবর্তন হইল—সে কিছুতেই দেশে যাইতে সম্মত হইল না। একাই জোর করিয়া বাসায় ফিরিয়া চলিল।

খুকু হয় তো এতক্ষণ কাঁদিতেছে, মায়ের মত কে তাহাকে যত্ন করিবে? হয় তো বামা বিরক্ত হইয়া আছে, সে গেলেই তাহাকে খুব গোটাকতক কথা শুনাইয়া দিবে।

খোলার ঘরের অধিবাসিনীরা সকলেই নিজের

নিজের কার্য্যে ব্যস্ত, ইহার মধ্যে বামা কই, তাহার খুকু কই, বুকটা কেন শতধা হইয়া যায়!

কমলা একজনকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাড়ী-ওয়ালী কোথায় দিদি,—আমার খুকী—?"

সে উত্তর দিল—"ন্যাকাম!—তাকে মেয়ে দিয়ে গেছ, আবার এখন জিজ্ঞাসা করছ মেয়ে কোথায়? সে তো তোমার যাওয়ার পরেই মেয়ে নিয়ে চলে গেছে।"

কমলা কিছুই বুঝিতে পারিল না; কেবল বুঝিল, বামা খুকুকে লইয়া তাহার যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই গৃহত্যাগ করিয়াছে।

ভাড়াটিয়াদের মধ্যে অবস্থা কাহারও সচ্ছল ছিল না। পুরুষেরা বাহিরে কাজ করিতে যায়, মেয়েরা ঘরে বসিয়া ঠোঙা তৈয়ারী করে, সুতা কাটে, কোনরকমে কষ্টেসৃষ্টে সকলেই দিন কাটায়।

কমলাকে কেহই সুচক্ষে দেখিতে পারে নাই। তাহার পূর্ব্ব জীবনের ইতিহাস সকলেই কতকটা জানিয়া ফেলিয়াছিল। কেহ কেহ স্পষ্ট বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িত না।

কমলা খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর শ্লথপদে নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। কিন্তু খুকু, তাহার খুকু কই? ঘর যে শূন্য! হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া সে ধরাতলে লুটাইয়া পড়িল—"খুকু, আমার খুকুমণি!—"

এতক্ষণে তাহার মনে হইল এ সবই জমীদার-মহাশয়ের কারসাজি! যদি কোনদিন সে কন্যাকে লইয়া কোর্টে দাঁড়ায়, পাছে তাহার কন্যার ভরণপোষণের ভার লইতে হয়, পুত্রের মাথার উপর নূতন করিয়া কলঙ্কের বোঝা অর্পিত হয়, সেই জন্য তিনিই তাহার দাদার অসুখের অজুহাতে গোবিন্দ চৌধুরীকে পাঠাইয়াছিলেন, এবং বামাকেও টাকা দিয়া খুকুকে সরাইয়াছেন।

সে কি এতক্ষণ বাঁচিয়া আছে? হয় তো খুকুকে তাহারা হত্যা করিবে—এতক্ষণ হয় তো হত্যা করিয়াছে!

উন্মাদিনীর ন্যায় সে ছুটিয়া চলিল। সদর দরজা দিয়া বাহির হইতেই সম্মুখে পড়িল বামা। সে রিক্তহস্তে সবে মাত্র ফিরিতেছে।

উন্মাদিনী মাতা তাহার পায়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িল, "আমার খুকু? তাকে কোথায় রেখে এলে গো! আমি যে তাকে তোমার কাছে রেখে গেলুম, তুমি তাকে কি করলে?"

বামার নিকট এমন দৃশ্য নূতন নহে—তাহার জীবনে মায়ের বুক হইতে সন্তান ছিনাইয়া লওয়া ব্যাপার আরও কয়েকবার ঘটিয়াছিল; সেই জন্য সে এ দৃশ্যে বিচলিত হইল না।

সে বলিল, "আমার দোষ কি গা? বাপ নিজে এসে মেয়ে নিয়ে গেছে। বোঝাপড়া কর গিয়ে তার সঙ্গে—আমার সঙ্গে কি?"

"মেয়ের বাপ!—"

চমকাইয়া উঠিয়া কমলা তাহার পানে খানিক তাকাইয়া রহিল; তারপর ধড়ফড় করিয়া উঠি পড়িল।

মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে ব্রজেন্দ্রনাথের সুরম্য ত্রিতল অট্টালিকা সে চিনিত। ব্রজেন্দ্রনাথ সে সময় গ্রামে ছিলেন, সোমেশ্বর এখানে ছিল।

বৈঠকখানায় কয়েকজন বন্ধুও ছিল। স্বদেশী হ্যাঙ্গামা, পুলিশের অত্যাচার লইয়া তর্ক-বিতর্ক চলিতেছিল। হঠাৎ একটী নারীমূর্ত্তির আবির্ভাবে সকলেই চুপ করিয়া গেল। ত্রস্ত সোমেশ্বর চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল; তাহার মুখ তখন শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

তাহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া আর্ত্ত-কণ্ঠে কাঁদিয়া কমলা বলিল, "ওগো, আমি তো তোমার কাছে কিছু চাই নি, তোমার নামে একটা কথা বলি নি, তবে আমার বুক করতে আমার খুকীকে কেন অমন করে চুরি করে নিয়ে এলে? তোমার পায়ে পড়ি—তাকে কোথায় রেখেছ বল, তাকে আমার দাও!"

বন্ধুবর্গ আশ্চর্য্য হইয়া একবার আগন্তুকী

মায়ের দিকে, একবার বিবর্ণ মুখ সোমেশ্বরের দিকে চাহিতেছিল। সোমেশ্বর প্রথমটায় ভয় পাইলেও সে ধাক্কা সামলাইয়া লইল—প্রচণ্ড একটা তাড়া দিয়া বলিল, "আ মর! কোথাকার কে পাগলী, কখনও দেখি নি, চিনি নি, সে এখানে এল কি করে? দ্বারোয়ান বেটা কি ঘুমোচ্ছে, এটাকে এখানে ঢুকতে দিলে কেন?"

দ্বারোয়ান দরজা পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া আসিয়াছিল; সে জানাইল, তাহার হাত ছাড়াইয়া পাগলী পলাইয়া আসিয়াছে।

ধমকের সুরে সোমেশ্বর বলিল, "খুব জোয়ান তুমি। যাও, এটাকে টেনে বাইরে নিয়ে ফেল। ওরে পাগলী, আমি তোর মেয়েছেলে জানি না। সোজা পথ দেখ্ গে যা, নইলে মার খেয়ে মরবি।"

আড়ষ্টভাবে কমলা পড়িয়াছিল। দ্বারোয়ান তাহার হাত ধরিয়া টানিতেই সে "মাগো!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

তাহার আর্ত্তনাদ কে শোনে? দ্বারোয়ান প্রভুর আদেশে তাহাকে টানিতে টানিতে বাড়ীর বাহিরে লইয়া গিয়া ফেলিল।

নির্জ্জীবের মত কমলা পড়িয়া রহিল।

পাঁচ

তারপর একে একে কুড়িটা বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

মীরপুর গ্রামে একটী খৃষ্টান উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। সেখানকার কার্য্যভার একটী এ দেশীয় মহিলার উপর ন্যস্ত। গ্রামের লোক কেহ কেহ সন্দেহ করে,—সেই মেয়েটাই হরিহরের বিধবা ভগিনী কমলা। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কেহ কোনদিন সে কথা বলিতে সাহস করে না।

মেয়েটী সত্যই কমলা। জগতে যখন কেহই তাহাকে আশ্রয় দিল না, কন্যার শোকে সে যখন আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল, তখন জনৈক খৃষ্টধর্ম-প্রচারিকা মিস্ লুইস তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, তাহাকে একটী কন্যার পরিবর্ত্তে অনেক কয়টী শিশুসন্তান প্রতিপালনের ভার দিয়াছিলেন।

দীর্ঘ কুড়ি বৎসর পরে সে স্বেচ্ছায় মীরপুরে আসিয়াছে। এখানে আসিয়া সে অনেক পরিবর্ত্তন দেখিয়াছে।

বৃদ্ধ জমীদার মারা গিয়াছেন; সোমেশ্বর এখন জমীদার। উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে সে ভাসিতেছে। হরিহর অনেক দিন আগে মারা গিয়াছে; বউদি' পিত্রালয়বাসিনী হইয়াছে।

ঘড়ির কাঁটার মতই কমলা নিজের কাজ করিয়া যাইত। সে খ্রীষ্টান হইলেও হিন্দুদের যথাসাধ্য উপকার করিত; এই জন্য অল্প দিনের মধ্যেই সে এখানে সকলের স্নেহ, প্রীতি ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল। গ্রামের ছোট-বড় সকলেই তাহাকে সিস্টার বলিয়া ডাকিত।

যে সোমেশ্বর একদিন তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, আজ সেও তাহাকে চিনিতে পারে নাই। মাত্র সাঁইত্রিশ বৎসরেই কমলার মাথার চুলগুলি তুষার ধবল হইয়া গিয়াছিল। সে সমস্ত চুল কাটিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার চোখে নীল রঙের চশমা। স্বেচ্ছায় সে চেষ্টা করিয়া নিজেকে অনেক বেশী পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছিল।

সেদিন জমীদারের বাড়ীতে বিরাট ব্যাপার। জমীদার-পুত্রের অন্নপ্রাশন। গ্রামের সকলেরই নিমন্ত্রণ, সিস্টারও বাদ যান নাই।

কলিকাতার বিখ্যাত বাইজী আসিয়া আসিয়াছে। আজ তাহার নৃত্যগীত হইবে।

সন্ধ্যার পর বাইজীর নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। সিস্টার জমীদার-গৃহিণী সোমেশ্বরের স্ত্রীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "এসেছেন যখন, আর একটু থাকুন; দুই-একখানা গান শুনে তারপর যাবেন।

আমি লোক সঙ্গে দিয়ে আপনাকে পাঠিয়ে দেব।"

মেয়েদের জন্ত বারাণ্ডায় চিক্ ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল; সেখানে সিস্টারের জন্ত চেয়ার দেওয়া হইয়াছিল।

আসরে একটী বৃদ্ধা বসিয়াছিল; তাহার মুখখানা দেখিয়া পরিচিত মনে হইল। সিস্টার ভাবিতে লাগিলেন, তাহাকে কোথায় দেখিয়াছেন!

বামা নয়? হাঁ, সেই তো। তাহার ললাটের দক্ষিণ পার্শে জড়ুল চিহ্নটী পর্য্যন্ত আজও আছে। বামা এই বাইজীর সঙ্গে কেন, বাইজী বামার কে? তিনি যতদূর জানেন, তাহাতে মনে হয়, বামার তো কেহই নাই।

অনেক কালের হারাণ ছোট একখানি মুখ চকিতে সিস্টারের মনে জাগিয়া উঠিল। মেয়েটী তাঁহার সেই হারানিধি নহে তো? অসম্ভব তো নয়! হয় তো বামা নিজেই মেয়েটাকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়া নৃত্য-গীত শিক্ষা দিয়া এখন নর্ত্তকীরূপে বাহির করিয়াছে।

বিদায় লইয়া সিসটার বাড়ী গেলেন; তখন তাঁহার মনে কেবল সেই এক চিন্তাই জাগিতেছিল। পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙ্গিতেই তিনি তাঁহার আর্দ্দালীকে বাইজীর বাসা হইতে বামাকে ডাকিয়া আনিতে পাঠাইলেন, ও নিজে চশমা খুলিয়া ফেলিলেন।

সিস্টার কেন ডাকিতেছেন বুঝিতে না পারিয়াও বামা আসিল।

সিসটার তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। বামা আশ্চর্য্যভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

একটু হাসিয়া সিসটার বলিলেন, "আমায় চিন্তে পারছ না? কিন্তু আমি তোমায় দেখেই চিনেছি—তোমার নাম বামা নয় কি?…নন্দরের বাড়ীতে থাকতে?

বামা রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "হাঁ, আমিও তোমায় চিনেছি, তুমি কমলা নও?"

সিস্টার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কিন্তু কেন তোমায় ডেকেছি তা বুঝতে পারছ? আজ বহুকাল পরে তোমায় আবার জিজ্ঞাসা করছি, আমার সেই কচি মেয়েটাকে কোথায় নিয়ে গেছলে, কার কাছে রেখে এসেছিলে? আজ তো বলতে বাধা নেই বামা, আমি তোমাদের সমাজের বাইরে চলে এসেছি। এখন বলো—"

মর্ম্মপীড়িতা বামা বাধা দিয়া বলিল, "না, আজ তোমায় বলব কমলা। তোমার মেয়েকে নিয়ে গিয়ে আমি এতটুকু শান্তি পাই নি। শেষে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তোমার মেয়ের কাছেই দাসীর কাজ করছি। আমি এই জমীদারবাবুর বাপের কাছে অনেক টাকা পেয়ে তোমার মেয়ে নিয়ে গেছলুম। তখন এর বিয়ের সব ঠিক; পাছে তুমি মেয়ে নিয়ে আদালতে দাঁড়াও সেই জন্তে তিনি হুকুম দিয়েছিলেন, মেয়েটাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে গঙ্গার জলে যেন ভাসিয়ে দেওয়া হয়।"

রুদ্ধশ্বাসে সিস্টার বলিলেন, "তুমি তাই করেছিলে?"

বামা বলিল, "না, তা' পারলুম না। সেই জন্তে তাকে এক বাইজীর কাছে মাত্র কুড়ি টাকায় বিক্রী করে দিই।"

সিস্টার ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "সে আজও বেঁচে আছে?"

বামা বলিল, "আছে; মণিয়া বাইজীই তোমার মেয়ে কমলা।"

সিসটার ত্বরিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তখনই কি ভাবিয়া বসিয়া পড়িলেন। আর্ত্তকণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু সে যে বাইজী বামা, সে যে তার ইহ-পরকাল সবই নষ্ট করেছে! আমি তাকে ফিরে পেয়ে

চাইলে সে কি ওই বিলাসিতার মধ্যে থেকে এই দরিদ্রা মায়ের কাছে ফিরে আস্তে চাইবে ?"

বামা একটু হাসিল ; বলিল, "আমার এটুকু বিশ্বাস কর, তোমার মেয়ে বাইজী হলেও আমি তাকে কলঙ্কিনী হতে দিই নি। সে শুধু বাইজীর ব্যবসাই শেখে নি,তাকে লেখাপড়াও শিখিয়েছি। তার মায়ের কথা সে সব জানে। পেটের দায়ে বাইজীর ব্যবসা নিলেও তোমার মেয়ে আজও নিষ্কলঙ্ক কুমারী জীবন ভোগ করছে। সোমেশ্বর তার বাপ, তা সে জানে; আর সেই কথা আজকের আসরে ব্যক্ত করবে বলেই আমার নিষেধ না শুনে এখানে এসেছে!"

উন্মাদিনী মা দুই হাতে বামার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

তারপর মাতা ও কন্যার মিলন।

* * *

তিনমাসের খুকু আজ বিংশবর্ষীয়া যুবতী। সৌন্দর্য্য তাহার দেহে ধরে না! মুগ্ধা জননী কন্যাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া নিঃশব্দে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কন্যার অশ্রু ধারার সহিত মায়ের অশ্রুধারা মিলিয়া গেল।

রুদ্ধকণ্ঠে কন্যা বলিল, "আমি তোমার কাছেই থাকব মা, আমায় তোমার কাছে রাখবে তো?"

মা বলিলেন, "আমার কাছেই তো থাকবি মা; আমি আর তোকে কোথাও যেতে দেব না।"

কন্যা বলিল, "কিন্তু আজ আমি সকলের কাছে প্রকাশ ক'রে দেব,—আমি জমীদারের মেয়ে, তুমি আমার মা!"

মা মাথা নাড়িলেন, "না মা, সে যাই করুক, আমরা যেন সব সয়ে যেতে পারি। বিচার তুমি আমি করবার কে মা? বিচার যিনি করবেন,তিনি সব দেখছেন—এ সব ব্যাপার তাঁর খাতায় তোলা থাকছে!"

কন্যা নীরবে কেবল মায়ের পানে তাকাইয়া রহিল।



সাল্‌ফোধ্বজ

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী

১

কাল কুমার বাহাদুরের সান্ধ্য-মজলিস জমে নাই। মনোমোহনবাবুর মেয়ের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে সমস্ত সভ্যগণেরই নিমন্ত্রণ ছিল; শুধু সত্য উপস্থিত হইতে পারে নাই,—সে অন্যান্য বন্ধুদের পাল্লায় পড়িয়া কি একটা বিশুদ্ধ হিন্দু হোটেলে নিষিদ্ধ পক্ষীর সুসিদ্ধ মাংস খাইতে গিয়াছিল। আজ সংবাদ পাওয়া গেল, তাহার পয়হজম হইয়াছে।

সন্ধ্যা হইতেই সকল সভ্য মজলিসে আসিয়া হাজির হইল। ফণী সত্যকে ধরিয়া আনিল। কুমার-বাহাদুর প্রশ্ন করিলেন—"কি হে সত্য,—ওষুধ-টষুধ কিছু খেয়েছ তো?"

সত্য চি চি আওয়াজে জবাব দিল "না, তেমন কিছু খাই নাই; মনে করিতেছি কাল সকালেই কবিরাজ অজিম সেনের কাছে একবার যাইব।"

নলিনী বলিল—"পেটের অসুখে হোমিও-প্যাথিই ভাল; কবিরাজ-টবিরাজ ছাড়। ডাই-রিয়া থেকেই কলেরা। এখন যদি ভাল একজন হোমিওপ্যাথকে না দেখাও,—তাহা হইলে কলেরা হইতে পারে এবং ক্রমে তাহা ক্রনিকে দাঁড়াইতে পারে।"

মুকুল একটু বিকশিত হইয়া বলিল—"হাঁ, কলেরা, হার্টফেল এসব ক্রনিকে দাঁড়াইলেই বিপদ। চল না, একবার প্রশান্ত উকিলের বাড়ী যাওয়া যাক্।"

কুমার-বাহাদুর বলিলেন—"তিনি আবার কে মুকুল?"

"প্রশান্তকুমার শীল, বি-এল। মস্ত বড় হোমিওপ্যাথ। প্রথমে তিনি উটকামণ্ডে টোটকা ব্যবসা করিতেন—এখন তিনি হোমিওপ্যাথিতে সিদ্ধহস্ত।"

নলিনী।—"প্রশান্ত উকিল তো বি-এল পাশ করিয়া কিছু দিন আদালতে ঘুরিয়া ছিলেন, কিন্তু স্থানটি অসুবিধার দেখিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। ওকালতিতে কিছু হইল না দেখিয়া আবার হোমিওপ্যাথি ধরিলেন বুঝি—এইবার হানিম্যান বেচারা মারা যাইবে!"

মুকুল একটু গরম হইয়া বলিল—"যাহা জান না, তাহা লইয়া কথা কাটাকাটি কর কেন? হানি-ম্যান্ বলিয়া কি কেহ ছিলেন? ও একটা রূপক মাত্র। আমেরিক্যানরা বলে—ফানিম্যান্ থেকে হানিম্যান্ হইয়াছে—যেমন ডাক তার থেকে ডাক্তার, পাটলিপুত্র থেকে পাটনা। হোমিও-প্যাথি চিকিৎসাই এইরূপ যে, কোন কষ্ট নাই—হাসিতে হাসিতে রোগের উপশম হয়। সেই জন্য পূর্ব্বে হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে ফানিম্যান্ বলিত,—ক্রমে তাহা হানিম্যান্ হইয়াছে। আবার প্রশান্তবাবু বলেন, যে তাহা হইবে কেন?—হানিম্যান না হইলে হোমিও ডাক্তার হওয়া যায় না। তাঁহার মতে হানিম্যান্ অর্থ, যাহারা ম্যান অর্থাৎ মানুষকে হানি করে—যেমন উকিল। ভাল জেরা করিতে না পারিলে হোমিও ডাক্তার হওয়া বিড়ম্বনা। আমার মনে হয়, প্রশান্তবাবুর কথাই ঠিক।"

ফণী।—"হানিম্যানের বাড়ী ছিল আমেরি-কায়। আমেরিক্যানরা যাহা বলে, তাহাই ঠিক্ বলিয়া মনে হয়।"

মুকুল বলিল—"প্রদীপের নীচেই বেশী অন্ধ-কার। স্থানীয় লোক কিছুই জানে না; প্রমাণ

দেখ, ১৯এ আগষ্টের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' খবর দিল, 'সুভাষ বসু ৪৬-৩৩ ভোটে কলিকাতা করপোরেশনের 'অল্ডারম্যান' মনোনীত হইয়াছেন —তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রিন্স গোলাম হোসেন ৩৩ ভোট পাইয়াছিলেন। আগামী ২২এ আগষ্ট 'মেয়র' নির্ব্বাচিত হইবেন।' কিন্তু 'দৈনিক আশা' ২১এ তারিখে সংবাদ দিল যে, 'সুভাষবাবু প্রিন্স গোলাম হোসেনকে ৪৬-৩৩ ভোটে পরাজিত করিয়া কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র হইয়াছেন।' উপরন্তু সুভাষবাবুর একখানা ছবিও ছাপাইল। দৈনিক আশা গয়াম হইতে প্রকাশিত হয়। তাহা হইলেই দেখ, অত দূরে থাকিয়াও দৈনিক আশা মেয়র নির্ব্বাচনের সভা হইবার পূর্ব্বেই খবর দিয়াছে। এই খবরই অমৃতবাজার দুই দিন পরে অর্থাৎ ২৩এ তারিখে দিল। প্রদীপের নীচেই বেশী অন্ধকার একথা না মানিয়া উপায় নাই।"

ফণী—"সে যাহাই হউক, একবার প্রশান্ত উকিলের বাড়ী চল না কেন?"

কুমার-বাহাদুর বলিলেন—"সেই-ই ভাল।"

নলিনী বলিল—"মন্দ কি।"

অবশেষে প্রশান্ত উকিলের বাড়ী যাওয়াই স্থির হইল।

* * * *

প্রশান্তকুমার শীল, বি-এল মস্ত বড় হোমিও-প্যাথ। পরিধানে থ্রি, কোয়ার্টার প্যাণ্ট, পায়ে সবুজ মোজা এবং সাদা জুতা, গায়ে কালো কোট। দুইটি আলমারী, তিনখানা ডাক্তারী বই, চারখানা আইন পুস্তক, একটি থার্ম্মোমিটার, একটি ষ্টেথোস্কোপ ইত্যাদিই তাঁহার ব্যবসার উপকরণ। গত তিন মাস হইতে ইনি গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন—সালকার থার্টিকে অনুপানভেদে সর্ব্বরোগের ব্রহ্মাস্ত্র করা যায় কিনা—এই জটিল বিষয়ে তিনি গত তিন মাস মাথা ঘামাইয়াছেন। সম্প্রতি সালকায়ের সহিত মকরধ্বজ মিশাইয়া 'সালকোথ্বজ' বাহির করিয়াছেন এবং পেটেণ্ট লইবার চেষ্টায় আছেন। প্রশান্তবাবু ঔষধের শিশি দেখিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করেন—সুতরাং, কোন ঔষধ ফুরাইয়া যাইবে, আর কোন ঔষধ শিশি ভর্ত্তি রহিবে, এরূপ অনাচার হইবার উপায় নাই। যে ঔষধ বেশী থাকিবে, সেই ঔষধই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তাই তাঁহার মূলধন অনর্থক আটকাইয়া থাকে না।"

আজ প্রশান্তবাবু অশান্ত হৃদয়ে আরশুলার পিছনে ছুটাছুটি করিতেছিলেন—উদ্দেশ্য আরশুলা ধরিয়া সর্ব্বপ্রকার ঔষধ খাওয়াইবেন এবং যে ঔষধ খাইয়া তাহারা আরশুলা-লীলা সংবরণ করিবে, —সেই ঔষধ "এণ্টি আরশোলা" নামে পেটেণ্ট লইবেন। সমস্ত আয়োজনই হইয়া গিয়াছে—শুধু ঔষধটিই পাওয়া যাইতেছে না। যাহাও পাওয়া গিয়াছে, তাহাও আরশুলারা খাইতে চাহে না। আজ উকিল-মহাশয় চটিয়া গিয়াছেন; প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,—আজ যাহা হউক একটা হেস্ত-নেস্ত করিবেনই। এমন সময় প্রবেশ করিলেন কুমার-বাহাদুরের দল।

উকিল-মহাশয় আরশুলার দিকে ভ্রূকুটি করিয়া চেয়ারে বসিলেন এবং বলিলেন—"বসুন।"

ঘরে চারিখানি লোহার রেগুলেশন চেয়ার ছিল—বসিলে নড়িলেই পতন। কুমার-বাহাদুর স্বীয় ভুঁড়ি যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া বসিয়া পড়িলেন। অন্যান্য সকলেও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল।

প্রশান্তবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনাদের কি চাই?"

নলিনী বলিল—"ওষুধ।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"আপনারা সকলেই কি রোগী?"

নলিনী—"আজ্ঞা না; ইনিই আপনার রোগী" বলিয়া সত্যকে দেখাইল।

ডাক্তারবাবু সত্যর দিকে চাহিয়া ঠিক সম্মুখের

চারিটি দাঁত তিনবার বাহির এবং বন্ধ করিলেন—এ কার্য্যটি ইনি প্রায়ই করিয়া থাকেন। উক্ত অনুষ্ঠানের পর বলিলেন—"দেখুন, হোমিওপ্যাথিতে শুধু লক্ষণের উপর নির্ভর করিতে হয়। সেই জন্য আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহারই উত্তর দিবেন—বেশী বলিয়া সময় নষ্ট করিবেন না কিংবা কিছু গোপন করিয়া রোগের মূলোচ্ছেদে বিঘ্ন ঘটাইবেন না।"

অতঃপর ডাক্তারবাবু জেরা আরম্ভ করিলেন—"আপনার কি হইয়াছে?"

সত্য—"পেটের অসুখ।"

ডাক্তার—"আপনার স্ত্রী মাথায় কি তেল মাখেন?"

সত্য—"কাম্বার আইডিন।"

ডাক্তার—"ইহা কি ঠিক নয় যে, আপনার স্ত্রী আপনার খাওয়ার সময় পাশে বসিয়া হাওয়া করেন?"

সত্য—"হাঁ।"

ডাক্তার—"কবে আপনার পেটের অসুখ হইয়াছে?"

সত্য—"আজ সকাল হইতে।"

ডাক্তার—"আপনার স্ত্রী কি খুব সাবান মাখেন?"

সত্য—"প্রতিদিন নয়।"

ডাক্তার—"কাল আপনার স্ত্রী মাথায় সাবান দিয়াছিলেন, তারপর আর তেল ব্যবহার করেন নাই—ইহা কি অস্বীকার করিতে পারেন?"

সত্য—"স্মরণ নাই।"

ডাক্তার—"আমি যদি বলি যে, তিনি সাবান মাখিয়াছিলেন, তাহা হইলে কি আপনি জোরের সহিত অস্বীকার করিতে পারেন?"

সত্য—"না।"

ডাক্তার—"পূর্ব্বে কখনও কি আপনার পেটের অসুখ হইয়াছে?"

সত্য—"মনে নাই।"

ডাক্তার—"আপনি কত রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে থাকেন?"

সত্য—"দশটা এগারটা।"

ডাক্তার—"কাল কত রাত্রে ফিরিয়াছিলেন?"

সত্য—"এগারটা।"

ডাক্তার—"ইহা কি ঠিক নয় যে, আপনি রাত্রে আহারান্তে বেড়াইতে বাহির হন?"

সত্য—"না।"

ডাক্তার—"আপনার বয়স কত?"

সত্য—"ত্রিশ বৎসর।"

ডাক্তার—"আপনার ছেলে-পিলে হইয়াছে?"

সত্য—"একটি ছেলে এবং তাহার পিলে হইয়াছে।"

ডাক্তার—"আপনার পিতা কি কলেরায় মারা গিয়াছেন?"

সত্য—"না।"

কুমার-বাহাদুর আর চুপ করিয়া থাকিতে থাকিতে পারিলেন না; বলিলেন—"এসব প্রশ্ন কেন করিতেছেন?"

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"আর একটু ধৈর্য্য ধরুন। আমার প্রত্যেকটী প্রশ্ন অত্যন্ত দরকারী—পরে আপনাদের বুঝাইয়া দিব।"

মুকুল কুমার-বাহাদুরকে বলিল—"দেখুন, এরূপ জ্ঞানী ডাক্তার সচরাচর দেখা যায় না—আপনারা একবার পরীক্ষা করুন।" পরে ডাক্তারবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল—"ডাক্তারবাবু, আর কত দেরী হইবে?"

ডাক্তারবাবু মুকুলের প্রশংসায় আবার তিন বার চারিটি দাঁত বাহির এবং বন্ধ করিয়া বলিলেন—"আর পাঁচ মিনিট, শীঘ্রই সারিয়া দিতেছি।"

সত্য প্রায় কাঁদিবার উপক্রম করিতেছিল। এখন রুমালে ভাল করিয়া মুখ-চোখ মুছিয়া ভাবিতে লাগিল,—স্ত্রীর বয়স জিজ্ঞাসা না করিলে বাঁচি।

ডাক্তারবাবু পুনরায় জেরা আরম্ভ করিলেন — "আপনি কি কখনও সিমলায় গিয়াছেন ?"

সত্য—"না।"

ডাক্তার—"আপনার স্ত্রী কখনও কি যান নাই ?"

সত্য—"না।"

ডাক্তার—"আপনার ছেলের বয়স কত ?"

সত্য—"পাঁচ বৎসর।"

ডাক্তার—"সে কি আপনার সঙ্গে খায় না ?"

সত্য—"না।"

"আচ্ছা বসুন—ইহাতেই হইবে" বলিয়া ডাক্তারবাবু সালফোৱাজ বাহির করিলেন এবং বলিলেন—"এই ঔষধটি লইয়া যান—ইহার এক ফোঁটার সহিত নিরানব্বই ফোঁটা গঁদ, এবং এক আউন্স ক্যান্থার আইডিন উত্তমরূপে মিশাইয়া আপনার স্ত্রীর মাথায় মালিশ করিবেন। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আপনার কোনদিনই পেটের অসুখ হইবে না।"

ডাক্তারবাবু কুমার-বাহাদুরের দিকে তাকাইয়া পুনরায় চারটি দাঁত বাহির এবং বন্ধ করিয়া বলিলেন—"হয় ত' এসব প্রশ্নে আপনারা আশ্চর্য্য হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। প্রথমে দেখিতে হইবে,—রোগ কেন হইল, তারপর দেখিতে হইবে,—রোগ হইলই বা কেন, তারপর দেখিতে হইবে,—রোগই বা হইল কেন ? এ সব প্রশ্নের সু-তদন্ত করা নিতান্ত প্রয়োজন।"

মুকুল ডাক্তারবাবুর বিরাটত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রায় সংজ্ঞাহীন হইতেছিল—কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ঠোঁট নড়িল মাত্র—কথা বাহির হইল না।

ডাক্তারবাবু বলিতে লাগিলেন—"আমি জেরা করিয়া যাহা জানিতে পারিলাম তাহা এই যে, সত্যবাবুর এই রোগ পৈতৃক নয় ; তিনি তাঁহার ছেলের সহিত আহার করেন না ; কাজেই ছেলের অপরিষ্কার হাতও ইহার কারণ নহে ; তিনি বা তাঁহার স্ত্রী সিমলায় যান নাই—সুতরাং পশমী দ্রব্য থাকিবার কথা নহে—তাই তাতের সহিত পশমও আহার করেন নাই। তাঁহার পেটের অসুখ প্রায়ই হয় না ; এ হেন ক্ষেত্রে কি কারণ হইতে পারে, তাহা কি আপনারা বলিতে পারেন ?"

নলিনী বলিল "মাংস—"

ডাক্তারবাবু ধমক দিয়া বলিলেন—"তাহা হইলে কিছুই বোঝেন নাই আপনারা।"

নিবারণ, নলিনী, মুকুল সবিনয়ে জানাইল যে, এ বিষয় তাহারা কিছুই বোঝে নাই। ডাক্তারবাবু বলিতে লাগিলেন—"সত্যবাবুর স্ত্রী ক্যান্থার আইডিন ব্যবহার করেন কেন ? নিশ্চয়ই তাঁহার চুল উঠিয়া যাইতেছে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তিনি সত্যবাবুর খাওয়ার সময় পাশে বসিয়া হাওয়া করেন, তিনি সাবান বেশী ব্যবহার করেন, সত্যবাবু শুইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ অধিক রাত্রে আহার করেন। ইহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অসুখের পূর্ব্ব রাত্রিতে সত্যবাবু যখন খাইতে বসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার স্ত্রী সাবান দেওয়ার দরুণ ফাঁপা চুল লইয়া পাশে বসিয়া হাওয়া করিতেছিলেন—সেই সময় একগাছি চুল অলক্ষ্যে সত্যবাবুর উদরে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহারই ফল এই পেটের অসুখ। এখন প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দেখুন,—প্রথম, রোগ কেন হইল ?—উত্তর চুল দ্বিতীয়, রোগ হইলই বা কেন ?—উত্তর চুল। তৃতীয়, রোগই বা হইল কেন ?—ঐ চুল। তাই চুলের মূল দৃঢ় করিতে সালফোৱাজ গঁদসহ ব্যবস্থা করিয়াছি।"

কুমার-বাহাদুর বলিলেন—"রাত্রি অনেক হইয়াছে, এখন তবে উঠি। অনেক জ্ঞান লাভ করা গেল—আজ কি আনন্দের দিন ! আচ্ছা, নমস্কার।"

ডাক্তারবাবু প্রতিনমস্কার করিয়া তাঁহার দাঁত তিনবার বাহির এবং দুইবার বন্ধ করিলেন।

আলেয়া

শ্রী সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বি এস্-সি

সুরেশ ছেলেটী ছিল, লাজুকের সেরা।

বেনেটোলার মেসের তিন নম্বর ঘরে এসে সে যখন উঠ্‌ল, তখন অসীমকেই তাকে আহ্বান করে নিতে হ'ল। বয়সে সে তার চাইতে ঢের বড় আর সম্পর্কে দূর হলেও বড় বটে, কাজেই তাদের বাড়ীর তরফ থেকে তা'ক তারা মাতব্বর ঠিক করে, নূতন কলেজে ভর্ত্তি হওয়া এই সুন্দর ছেলেটীর আশু অভিভাবকত্ব এক রকম ছেড়েই দিয়েছিলেন।

অসীম বল্লে, পিসিমা কেমন আছেন?

"ভাল" এত মৃদুস্বরে ছেলেটী উত্তর দিল যে, আর দুই হাত দূরে বস্‌লে সে কথা বুঝবার মত শক্তি কারো হ'তো না।

অসীম বলে চল্‌ল, মেসের খাওয়া—সময় মত না হলে ঠাণ্ডা ভাত পাবে—এই আমি বসছি—তুমি কাপড়-চোপড় খুলে সব গু'ছয়ে নাও—কোথায় কি রাখবে পরে বলে দেব। এত আর বাড়ী নয়, সব বিষয়ে এখানে স্বাবলম্বী হতে হবে।

এবার ততোধিক মৃদুকণ্ঠে সুরেশ উত্তর করল, আজ্ঞে বাক্সটার চাবি হারিয়ে ফেলেছি!

ওঃ ছাই, ছেলেটী শুধু লাজুক নয়, অসাবধানও!

অসীম বল্লে, তা আগে বলো নি কেন—একটা চাবিওয়ালা ডেকে ঠিক করে নেওয়া যেত!

ছেলেটী সে কথায় বেশ একটু উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল—সে হয়তো ভেবেছিল, এ আর সারাই হয় না।

যাক্, তাকে কোনমতে গুছিয়ে দিয়ে, কলতলায় স্নান করবার উপদেশ দিয়ে অসীম নিজের ঘরে চলে গেল। আসবার সময় বলে গেল, ঠিক হ'য়ে থাক, আমি স্নান করে এসেই তোমাকে খাবার ঘরে নিয়ে যাব। একা যে খাবার ঘরে গিয়ে সে খেতে পারবে না—খেলেও তার পেট ভরবে না এ কথাটা তার ভাব দেখে বোঝবার কোন কষ্ট হয় নি অসীমের।

আধঘণ্টা পরে স্নান সেরে চুল ফিরিয়ে এসে অসীম দেখে, সুরেশের ঘরের দরোজাটা বন্ধ।

কড়া নেড়ে সে বল্লে, কি হে হ'লো?

কোনও উত্তর এল না। ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? সারা রাস্তার ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়া অসম্ভব নয়।

আরো জোরে কড়া নেড়ে হেঁকে সে বল্লে, ওহে খাবে না?

কোনও সাড়া নেই—ভাল রে ভাল—এমন ছেলে তো আর দেখি নি!

প্রায় চার মিনিট অনর্গল কড়া নেড়ে আর হেঁকে ডেকে দরজাটা খোলান হ'ল। সুরেশ ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তার পরণে একখানা রেশমী কাপড়—খালি গা, লম্বা পৈতা ঝুলছে।

অসীম বল্লে, কি হে, খাবে না—কি করছিলে?

উত্তর এল, আজ্ঞে সন্ধ্যেটা সেরে নিচ্ছিলাম।

আাঃ, বলে কি! কল্‌কাতা সহরে সন্ধ্যে করে মেসে থাকা!—

অসীম চেয়ে দেখলে, ঘরে কোশাকুশি ছড়ানো, একখানা আসন পাতা—সুরেশের মুখে একটা গাম্ভীর্য্যের ভাব।

গম্ভীরভাবেই অসীম বল্লে, সন্ধ্যা তো কর্‌লে, তা' গঙ্গাজল পেলে কোথা?

জল আর কোথায় পাব?—এমনি আজ সারতে হ'লো - তা অসীম-দা' গঙ্গা কত দূরে?

তবেই সেরেছে!—এ যে খাঁটী জঙ্গলী—ব্রেক্ কর্‌তে অনেক দিনের দরকার। একটু উষ্মা মিশিয়েই অসীম বল্লে, অত হাঙ্গাম কি পোষাবে? —বিদেশে এ সব চলে না।

ছেলেটী চুপ করে গেল। মুখখানি দেখে মনে হ'ল যেন একটু দমে গেছে। দেখে অসীমের একটু কষ্ট হ'ল, সে বল্লে, হাঁ সুরেশ, গঙ্গা তো দূরে—অনেক দূরে, গঙ্গাজল এনে কি আর কলেজে যেতে পারবে?

সে বল্‌লে, কেন, খুব সকালে উঠে যদি যাই, তবে?

অসীম জান্‌ত, পাশের বাড়ীর কবরেজ কালী গুপ্ত নিত্য ভোরে বম্‌বম্ করে রাস্তা কাঁপিয়ে স্নানে যায়, আবার তারা ঘুম থেকে উঠবার আগেই এসে পড়ে। তাই বল্লে, হাঁ, তা হয় বৈকি—তবে খুব সকালে উঠ্‌তে হবে তাতে।

সুরেশ বল্লে, তাতে আর কি, সে অভ্যাস আমার যথেষ্ট আছে।

খেতে বসেই সুরেশ বলে উঠ্‌ল, তা অসীম-দা', এখানে তো খাওয়া হ'তে পারে না।

একেই তখন অসীমের দারুণ ক্ষুধা, তারপর অনেক কাজও আছে, সুরে অনেকটা বিষ মিশিয়ে সে বল্লে, কেন?

এই যে দেখুন না এঁটো এরা পাড়ে না, জায়গাটা একটা বিশ্রী নোংরা, ন্যাকড়া দিয়ে পুঁছে নিলে মাত্র।

আচ্ছা ছেলে বাবু, এত সব ভাবতে গেলে কি আর মেসে থাকা চলে!

তাবার কোনও উত্তর না দিয়ে সুরেশ আসনে বসে পড়্‌ল—তবে তার মুখ দেখে মনে হ'লো, যে কোন মুহূর্ত্তে এই অনিচ্ছায় গেলা জিনিষগুলি মুখ দিয়েই অকস্মাৎ ফেরৎ আস্‌তে পারে।

ক্ষুধার সময় খানিকটা পেটে যেতেই অসীমের মেজাজ পড়ে এল—তাই একটু প্রলেপ দিতে সে বল্লে, যদি বল, তবে তোমার ঘরেই এরা ভাত দিয়ে আস্‌বে। এখানে আর খেতে হবে না।

ছেলেটী একটু কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে অসীমের দিকে চাইলে! তার ভাষা বুঝ্‌তে অসীমের দেরী হ'ল না, সে বল্লে, কাল থেকে সে বন্দোবস্ত ক'রে দেব।

নিত্য ভোরে উঠে কেমন ক'রে সে গঙ্গাজল এনে সন্ধ্যে ক'রে কলেজে যেতো, তা' সকলেরই বুদ্ধির অগম্য ছিল। মেসের ছেলেরা তার নূতন নামকরণ কর্‌লে সন্ন্যাসী ঠাকুর। আবার তার ঘরের কপাটে, যেখানটায় তার নাম লেখা কার্ড ছিল, তার নীচে কে লিখে রেখে দিলে, —'কলিযুগের প্রহ্লাদ।' অথচ এ নিয়ে ছেলেটী কোনদিন কোন উচ্চবাচ্য করে নি। এই নির্ব্বিকার ভাবটাই অসীমকে সব চেয়ে মোহিত করে তুলেছিল।

অসীম-দা'।

কি বল্‌ছ?

আজ ট্রামে ফির্‌তে একগোছা নোট পেয়েছি, এগুলো কি করি বলুন তো?

অসীম রুদ্ধ নিশ্বাসে বল্লে, কৈ, দেখি?

গুণে দেখা গেল দশ টাকার নোট পঞ্চাশখানা। অসীম তো অবাক্!—বল্লে, তা' নোটীশ দিয়ে দাও, যার টাকা নিয়ে যাবে এসে।

নোটীশ দেওয়া হ'ল। টাকা নিয়ে গেলেন এক বুড়ো ব্রাহ্মণ। সেদিন যা' তাঁর আশীর্ব্বাদ! সুরেশকে বুকে চেপে ধরে চোখের জলে তার মাথাটা ভাসিয়ে দিলেন।—যাবার সময় হাতে ধরে তাকে নিমন্ত্রণ করে গেলেন।

সুরেশ বল্লে, অসীম-দা' যাব?

অসীম বল্লে, যেতেই হবে—নইলে বুড়ো-মানুষ কষ্ট পাবেন।

দুই

বুড়ো রামতারণ চক্রবর্ত্তী নারিকেলডাঙ্গায় একখানা দোতালার উপরতলাটা ভাড়া নিয়ে বাস করতেন। পরিবারের মধ্যে তিনি, তার নাতনী আর একটি নাতি। রামতারণবাবুর ছেলে পাটনায় কাজ করেন। নূতন চাকরী, পরিবার নিয়ে যেতে পারেন নি। রামতারণবাবু বিপত্নীক—পুত্রবধূ বাপের বাড়ী,—নাতি-নাতনী দুয়ের ঘরের তাঁর গলগ্রহ।

গলগ্রহ বিশেষ করে নাতনীটী। বয়স ষোল হ'য়ে গেছে, কিন্তু আবশ্যকমত রজতচক্রের অভাবে বিবাহের দেরী হচ্ছে। সুন্দরী না হ'লেও মেয়েটি কুৎসিত নয়—যৌবন-বসন্তে ফুলরাণী, তা' সে যে ফুলই হোক্।—ছেলেটী স্কুলে পড়্‌বার মত বয়স; তবে এখন স্কুলে দেওয়া হয় নি। ইচ্ছা, একেবারে পাটনা গিয়ে ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া হ'বে।

সুরেশ যখন এক পা ধুলো নিয়ে নারিকেলডাঙ্গা পৌঁছল, তখন রামতারণবাবু রাস্তায় দাঁড়িয়ে খেলো হুঁকো হাতে তারই অপেক্ষা কর্‌ছিলেন সুরেশকে দেখে বল্লেন, এই যে, আসুন আসুন, আপনার অপেক্ষায়ই বসে আছি।

রাস্তা দেখিয়ে রামতারণবাবু সুরেশকে উপরে নিয়ে গিয়ে ডাক্‌লেন, কমল, ও কমল, শুনে যা'।

বছর দশেকের একটি ছেলে এসে রামতারণবাবুর কোল ঘেঁসে দাঁড়াল। বুড়ো বল্লেন, কমল, এই সুরেশবাবু।

কমল ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে সুরেশের মুখের দিকে চেয়ে রইল—সুরেশের তাকে বড় ভাল লাগ্‌ল, বল্লে, খোকা, এসো তো।

খোকা কাছে এসে জড়িয়ে ধরে বল্লে, তুমি কে গা?—

দুই-চারিমিনিটের মধ্যে খোকার সঙ্গে সুরেশের দিব্য ভাব জমে গেল—রামতারণবাবু বল্লেন, বুঝ্‌লে সুরেশবাবু, সেদিন সেভিংস ব্যাঙ্ক থেকে নিজের শেষ সম্বল টাকাটা হারিয়ে মুখ চূণ ক'রে বাসায় এসে তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়্‌লাম। প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম আর কি। 'অমি' কিন্তু শক্ত মেয়ে, সে বল্লে কি জানো, দাদু, সত্যের টাকা ও কি হারাবার? কালীঘাটে মাকে ডালা দাও, জাগ্রত দেবতা একটা বিহিত হবেই।

ঠ্যালায় পড়ে ভক্তি বেড়ে গেল—গেলাম কালী বাড়ী। পুজো দিয়ে, প্রসাদ নিয়ে আস্‌ছি, একখানা কাগজ ঢাকা দিয়ে; আনমনে কর্ত্তে কি ভাবছি, এও কি হয়, আজকালকার দিনে পাঁচশো টাকা নগদ কুড়িয়ে পেয়ে কি কেউ ফিরিয়ে দেয়?—ও মা, প্রসাদ-ঢাকা কাগজখানার দিকে চোখ পড়্‌তেই দেখ্‌লাম,—তোমার বিজ্ঞাপন। আর যাবে কোথা, ছুট্ ছুট্! জাগ্রত কালী হে, বুঝ্‌লে, জাগ্রত কালী! এই বলে দুই হাত তুলে গভীর ভক্তিভরে বৃদ্ধ নমস্কার কর্‌লেন।

খাবার সময় যে পরিবেশন কর্‌লে সে অমি। রামতারণবাবু বল্লেন, এই অমিয়া, আমার নাতনী—তা বুঝ্‌লে সুরেশবাবু, টাকার জন্য এখনো বিয়ে দিতে পারি নি।

সুরেশ মুখ তুলে চেয়ে চোখ নামিয়ে ফেল্‌লে। দেখ্‌লে,—মেয়েটী বালিকা নয়, তার উপরের ধাপের!

সুরেশ একটু আনমনা হ'য়ে পড়্‌ল।

রামতারণবাবু বল্লেন, সুরেশবাবু খাচ্ছেন না যে! মাছ ভাজা পড়ে রইল—ও কি ভাত যে উঠ্‌ছেই না—এ তো ছেলেবয়েস, ওই বয়সে আমরা যা খেয়েছি···

সুরেশ বল্লে, খুব খাচ্ছি—

আর খাওয়া, একে কি খাওয়া বলে, আমাদের সময়ে আমরা প্রায় আস্ত পাঁটাই খেয়ে ফেলেছি। এখন বল্লে, বল্‌বে রাক্ষস। হাঁ, তা' খাওয়াও যেমন ছিল, লোকের জোরও তেমন ছিল—আর এখন—

সুরেশের জীবনে এমনভাবে অপরিচিত অনাত্মীয় নারী-দর্শন এই প্রথম। মনে হ'ল,—আর একবার ভাল ক'রে দেখে নিই—লজ্জায় তার সারা অঙ্গ কেঁপে উঠ্‌ল—ছিঃ!

কোনরকমে আহার শেষ ক'রে, বিশেষ কাজের অছিলায় সে বেরিয়ে পড়্‌ল। যেতে যেতে পথের মাঝে যার সাথে একেবারে মুখোমুখি হ'য়ে গেল,—সে অমিয়া! কলতলায় স্নান সেরে সে উপরে আস্‌ছিল, যৌবনের সমস্ত লাবণ্য যেন এই সদ্যস্নাতা তরুণীর দেহের প্রতি স্থানে উপ্‌ছে পড়্‌ছে!

সুরেশ থম্‌কে দাঁড়িয়ে চেয়েই একেবারে দৌড়ে রাস্তায় এসে পড়্‌ল—তখন উপর থেকে রামতারণবাবু বল্‌ছিলেন আর একদিন এসো কিন্তু; দেখো, ভুল হয় না যেন।—সুরেশ তখন প্রায় গলির মোড়ে।

তিন

সুরেশ বাসায় এসে পৌঁছে, ক্ষণিক মনের চাঞ্চল্যের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে গীতা বের ক'রে পড়্‌তে বস্‌ল।

বিকালবেলা সে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তখন তার মন অনেকটা শান্ত হয়েছে।

তবু কোনও কিছু আর ভাল লাগছিল না—এ জনস্রোত তাকে বিষিয়ে তুল্‌ছিল। সে ময়দানের দিকে পা চালিয়ে দিলে।

চৌরঙ্গীর সাম্‌নে এসে পড়্‌তে তার হাতে যে বিজ্ঞাপনখানা এসে পড়্‌ল, সেটা একটা বায়স্কোপের। লেখা, প্রসিদ্ধ অভিনেতা 'কিন্তোনা'র অভিনয়কল্পে 'লষ্ট লভ্‌।'

আনমনে কি ভাবতে ভাবতে সে বায়স্কোপের একখানা টিকিট কিনে ভিতরে ঢুকে পড়্‌ল—এই তার কলিকাতা জীবনের প্রথম বায়স্কোপ দেখা।

কিন্তু বেশীক্ষণ বস্‌তে পার্‌লে না, সেখানেও সেই নারী! সুরেশ আসন ছেড়ে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এল বটে, কিন্তু মনে জাগ্‌তে লাগ্‌ল—শ্বেত-রমণীর বক্ষ দোলা, চক্ষের চাহনি, আর যৌবনের তরঙ্গ-ভঙ্গ—আর চোখে ভাস্‌তে লাগ্‌ল,—শ্বেত-জগতের প্রণয়-ব্যাপারে চুম্বন প্রাচুর্য্যের মোহ-স্মৃতি!

ভাব্‌তে ভাব্‌তে দেখ্‌ল, সে লীলা-চঞ্চল ইংরাজ রমণীর বদলে, অমিয়ার মুখখানাই যেন বেশী মানায়, ভাব্‌তে একটু ভাল লাগে! ভাবা,—শুধু ভাবা—তাতে আর ক্ষতি কি?

বাসায় আস্‌তেই অসীমের সঙ্গে দেখা—সুরেশ যেন একটু থতমত খেয়ে গেল।

অসীম বল্লে, কি হে, এত দেরী যে?

আম্‌তা আম্‌তা করে সে যা' বল্লে তার মর্ম্ম, তার বন্ধুর বাসায় এতক্ষণ অঙ্ক কষ্‌ছিল—এত রাত্রি হ'য়ে গেছে, সে খেয়াল হয় নি।

জীবনে এই বুঝি তার মিথ্যা বলার প্রথম প্রচেষ্টা।

চার

সারারাত্রি জাগার পর সুরেশ ঘুম ভেঙ্গে দেখ্‌লে বেলা আটটা হয়ে গেছে! আলোর দিকে চাইতেই তার সারারাত্রির সেই বিশ্রী চিন্তা শতরূপে এসে মনে হ'ল—সে ধিক্কারে আপনাকে ব্যথিত করে তুলল। সারা রাত্রিতে এমন একটা তাণ্ডব-লীলা তার উপর দিয়ে হয়ে গেছে যে, তার এই বিশ বছরের জীবনে তেমন আর হয় নাই—সে চোখ বুজে মনে মনে লজ্জায়, ঘৃণায় নিজের মুণ্ডপাত করতে লাগ্‌ল।

গঙ্গা থেকে জল এনে সন্ধ্যা আজ আর তার হলো না।

কোনও মতে দশটায় উঠে স্নান সেরে খেয়ে নিয়ে কলেজে গেল—কিন্তু মনটা কোনমতেই তার পুরাতন স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পার্‌ল না—বাসায় এসে গীতা নিয়ে বস্‌ল—কিন্তু আজ আর মন লাগ্‌ল না।

হঠাৎ দুষ্ট শনিগ্রহের মত রামতারণবাবু এসে হাজির হলেন—সঙ্গে কমল।

সুরেশের ঘরে ঢুকে, বসেই বল্লেন, বেশ সুরেশ, কাল তাড়াতাড়ি চ'লে এলে—সবাইকে যে ভাবিয়ে তুলেছিলে, কি হ'ল অসুখ নাকি? অমি বল্লে, দাদু, বোধ হয় ওঁর অসুখই করেছে—তাই ত ছুটে এলুম, বলেই বৃদ্ধ সুরেশের মুখের দিকে চেয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে বল্লেন, কিহে মুখখানা শুকিয়ে গেছে যে! অসুখ নিশ্চয়।

অমির কথায় সুরেশের মনে অনেক কথা এসে গেল—সে একটু অন্যমনা হ'য়ে পড়্ল—মুখখানা শুকিয়ে উঠ্‌ল।

মুখে বল্লে, আজ্ঞে না ক'দিন পড়ার চাপ পড়েছে—তাই।…

খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বৃদ্ধ বল্লেন, তাই তো সুরেশ, বেলা হ'য়ে গেল—আজ আসি। আমাদের তো পাটনা যাবার দিন প্রায় এসে গেল—যদি পারো কাল একবার যেয়ো

সুরেশ 'হাঁ'ও বল্লে না, 'না'ও বল্লে না। ঘাড় হেঁট করে রইল। তার ভিতরে তখন একটা তোলপাড় জেগেছে।

বৃদ্ধ তো চলে গেলেন—কিন্তু সুরেশের মনে যে অবস্থা রেখে গেলেন, সেটাকে কোনমতেই স্বাভাবিক বলা চলে না। সুরেশ ঘরের দরজা দিয়ে কত কি আকাশ-পাতাল ভাব্‌তে লাগ্‌ল—সেদিন আর কলেজে যাওয়া হল না।

সেদিন ছিল শনিবার।

বৈকালে বেড়াতে বার হ'য়ে সুরেশ আরো দমে গেল। নির্জ্জনতা তাকে আজ একেবারে বিষিয়ে তুলছিল—মনে হলো, কলিকাতার এই বৃহৎ জনস্রোতের মধ্যে সে কত একলা—ইচ্ছা হলো—এই বৃহৎ কোলাহলের মাঝে সে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়!

মনে অনেক কল্পনা ক'রে সুরেশ সন্ধ্যার কাছাকাছি নারিকেলডাঙ্গা উপস্থিত হ'ল। সোজা দোতালায় উঠে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক্‌লে, কমল, ও কমল?

কিন্তু দরজা খুলে যে বেরিয়ে এল, সে কমল নয়—সে অমিয়া! সুরেশের চোখ-মুখ লাল হ'য়ে গেল। সে থমমত খেয়ে, কোনও কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। অমিয়াও একটু বিস্মিত হয়েছিল! মৃদুকণ্ঠে বল্‌লে, দাঁড়িয়ে কেন, ভিতরে আসুন।

তরুণী কথা বলায় সুরেশের জড়সড় ভাবটা কতকটা কেটে গেল; বল্‌লে, রামবাবু কোথায়?

বেড়াতে গেছেন।

কমল?

সেও তার সঙ্গে গেছে!

সুরেশের মাথায় রক্ত উঠে গেল—কোন-মতে মাথাটা চেপে ধরে সে দৌড়ে নীচে নেমে এল—অমিয়া অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইল।

পাঁচ

কতকক্ষণ খুব জোরে জোরে পা ফেলে প্রায় আধমাইল খানেক এসে আর তার সে তেজ রইল না—সে শিয়ালদহ ষ্টেশনে বসে আগকের এই ব্যাপার বিশেষ ক'রে ভাবতে সুরু করে দিলে। আাঃ, কি অভদ্রই সে! এমনি ক'রে আসাটা যে তার পক্ষে কত অশোভন হয়েছে, তা' ভাবতেও মাথাটা লজ্জায় নত হ'য়ে এল।

অনেক রাত্রে সে বাসায় ফিরে এল। কিন্তু সারারাত তার ঘুম হ'লো না—কি অন্যায়ই সে করেছে!—আর অমিয়া, সে তাকে কি জানোয়ারই ভেবেছে—

সকালে উঠেই সুরেশ প্রতিজ্ঞা কর্‌লে, কাল ছুটির দিন, কাল সে রামবাবুর বাসায় যাবে—আর এমন ব্যবহার কর্‌বে,—যাতে অমিয়া ভাববে, সে ভদ্রলোক, ভদ্রব্যবহার জানে—সেদিন হয় তো কোনও কারণে তার মন ভাল ছিল না।

আজ দুম্‌দাম্ ক'রে সে সোজা উপরে উঠে গেল। বুকটা তার প্রবলবেগে নাড়া দিয়ে উঠ্‌ছিল—রক্তের জোর যে কত, সে বুঝতে পারলে।

উপরে উঠে কিন্তু তার সব সাহস উবে গেল। শব্দ পেয়ে অমিয়া বল্লে, এই যে আসুন।

সুরেশ আরও একটু সাহস সঞ্চয় ক'রে ঘরে গিয়ে বসে পড়্‌ল।

তারপর খানিকক্ষণ দম নিয়ে বল্লে, রামবাবু, কমল কোথা গেছে?

আজ তারা কালীবাড়ী গেছে—তা' এক্ষুণি আস্‌বে—বসুন চা খাবেন?'

সুরেশ আজ উঠ্‌ল না; বল্‌লে, গরমে চা বেশি পছন্দ করি না।

তারপর আবার চুপচাপ!

মিনিট দুই পরে অমিয়া বল্লে, আপনাদের দেশ কোথায়?

বর্দ্ধমান।

আপনি বুঝি বি-এ পড়েন?

না, বি-এস-সি।

আবার সব চুপচাপ্।

সুরেশ ঘেমে উঠ্‌ল। সারাটা গা তার থর থর করে কাঁপ্‌ছিল—চোখ তুলে সে চাইতেও পারছিল না। সন্ধ্যা হ'য়ে গেল—অন্ধকারে ঘর ভরে এল।

অমিয়া বল্লে, যাই বাতিটা নিয়ে আসি! বলে সে চলে গেল—খানিক পরে সে একটা বাতি নিয়ে এল। সন্ধ্যার অন্ধকারে তরুণীর যে দেহ-লাবণ্য ঢাকা পড়েছিল, এই প্রদীপের আলোকে তা' ঝলমল্ করে উঠল। সুরেশের মাথাটা গুলিয়ে এল—সমস্ত জগতটা যেন নেচে উঠ্‌ল—পৃথিবীর সমস্ত সুখ যেন এই তরুণীর মূর্ত্তি ধরে তার সাম্‌নে দেখা দিল—সে প্রাণপণে আপনাকে তুলে ধরে, অমিয়ার গা ঘেঁসেই দুপ্‌দাপ্ ক'রে নেমে গেল—তরুণীর স্পর্শে তার দেহে আর একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটে গেল—সে হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে রেল-লাইনের পাশে বসে পড়্‌ল!

আজ আর কিছু ভাববার সময় ছিল না—সে আজ কেঁদে ফেল্লে,—কি বর্ব্বর সে! কেমন ক'রে তার এ অসভ্যতা সে দূর করবে—সামান্য একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ করবার সাধ্যও তার নাই—ভদ্রব্যবহার করিবার মত তার ক্ষমতা নাই—এত অসহায়, এত দুর্ব্বল সে!

ফাঁকা জায়গায় শীতল বাতাসে তার তন্দ্রার মত এল। খানিক পরে একটা গাড়ীর ঘোর গর্জ্জনে জেগে উঠে ধীরে ধীরে বাসায় এসে উপস্থিত হ'ল।

সপ্তাহের আর কয়টা দিন সে অতিমাত্রায় ব্যস্তভাবে কাটাল। কিন্তু শনিবার সন্ধ্যায়, বেশটা আরো মনোরম ক'রে সোজাসুজি রামবাবুর বাসায় গিয়ে হাজির হলো।

দেখ্‌লে, রামবাবুদের সবাই গাড়ীতে উঠেছেন—মোট, বস্তা সব গাড়ীতে উঠেছে—রামবাবু তাকে দেখে বল্‌লেন, এই যে সুরেশবাবু, দুপুরে একখানা তার পেয়ে আজই চলে যেতে হচ্ছে—তা' এসেছ ভালই হয়েছে।

সুরেশের মুখ শুকিয়ে গেল—তা হ'লে অমিয়া চলে যাবে!

তার দিকে না চেয়েই রামবাবু বল্‌লেন, তা' এসো না সুরেশ, আমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে আস্‌বে।

শেষ দৃষ্টি সে অমিয়ার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে, না, আমার কাজ আছে। তারপর সহসা সে হনহন করে চল্‌তে সুরু কর্‌লে।

রামবাবু হেঁকে বল্‌লেন, যদি পাটনায় যাও···আর কোনও কথা শোনা গেল না—

গাড়ী চল্‌তে সুরু করেছে।

একটা বিরাট শূন্যতায় মন ভরে রাত্র বারোটার সময় সুরেশ বাসায় এসে বিছানায় দেহ এলিয়ে দিল।

মেসে প্রথম প্রবেশ দিনের স্মৃতিটাই যেন তাকে বেশী ক'রে ব্যঙ্গ করতে লাগ্‌ল।

নেপথ্য

পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর

শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দুই

গাড়ি এখনো প্ল্যাটফর্মে আসিয়া দাঁড়ায় নাই। আট নম্বর প্ল্যাটফর্মের বাহিরে জনতার থেকে একটু দূরে সুধা আর বীরেন চুপ করিয়া চারিদিকে চোখ ফেলিতেছে—তাহাদের নিজেদের মধ্যে আর যেন কোনো কথা নাই। মাঝখানে পরেশ আসিয়া না দাঁড়াইলে তাঁহারা বুঝি পরস্পরের পানে অপলক চোখে চাহিতে পারিবে না।

ড্রাইভার হাতে করিয়া একটা বড় স্যুট্‌কেস আনিয়া হাজির করিল। বীরেন আশ্চর্য্য হইয়া কহিল,—কি ওটা?

ড্রাইভার কহিল,—এটার মধ্যে আপনাদের জন্তে জামা-কাপড় আছে। গাড়িতেই ছিল।

—জামা-কাপড় এল কোত্থেকে?

—সারা কলেজ্ ষ্ট্রিট্ ঘুরে পরেশবাবু রাজ্যের জামা-কাপড় কিনেছেন। শাড়ি-সেমিজ ধুতি-চাদর—কত কি! আয়না চিরুনি ফিতে, পাঁচ সেল্-এর একটা টর্চ পর্য্যন্ত।

বীরেন সুধার পানে চাহিয়া কহিল,—পরেশ কি-সব ছেলেমানুষি করেছে দেখ।

সুধা বিস্ফারিত চোখে বিপুল জনস্রোতের কিনারা খুঁজিতেছিল। সব মিলিয়া চারিদিকে কেমন-যেন একটা ব্যস্ত বিশৃঙ্খলা চলিয়াছে; সবাই দিশেহারা! এত সব লোক কোথায় চলিয়াছে! ছোট ছোট কোলাহল রাশীকৃত হইয়া যেন একটা শ্রুতিকটু আর্ত্তনাদের মত কানে লাগে। সুধা এ কান্নার অর্থ বোঝে না।

অনেকক্ষণ পরে বীরেনের কথা শুনিয়া সে চম্‌কাইয়া উঠিল। কহিল,—কি?

স্যুটকেসের দিকে আঙুল দেখাইয়া বীরেন্ বলিল,—পরেশের কাণ্ড! সঙ্গে এম্‌নি ত' একটি জীবন্ত পুঁটুলি আছে-ই, তার ওপর আরেকটা শাকের আঁটি এনে জোগাড় করেছে। এখন কোনো রকমে পালাতে পার্‌লে বাঁচি, তা না, আবার লটবহর!

সুধা বলিয়া উঠিল: পালাবে, কিন্তু কাশীতে পৌঁছেই ত' তক্ষুনি কাপড় জামা ছাড়্‌তে হ'বে। তার একটা ব্যবস্থা না করে'ই ত' পালাচ্ছিলে। শেষকালে সেখানে গিয়ে কর্‌তে কি শুনি? কোথায় জামা-জুতো, কোথায় বা বিছানা-পত্র! তুমি এত বেশি হঠকারী হ'য়ে বিপদ বাধাবে দেখ্‌ছি।

বীরেন্ অলক্ষ্যে সুধার আরো কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া কহিল,—বিপদ আমার কেন জানি না ভারি ভাল লাগে। একবার ঝাঁপিয়ে পড়তে পার্‌লেই হ'ল, সাঁতার কেটে পার আমি পাবই। হাতের সাম্‌নে কোনো কাজ পেয়ে তাকে ফেলে রেখে-রেখে দুশ্চিন্তার বোলা বা ঘোরালো করে' তুল্‌বো আমার অত সময় নেই, সুধা। হঠকারী আমি নিশ্চয়ই, কিন্তু হট্‌বো না। বীরেন হাত দিয়া দৃঢ়তাসূচক একটা ভঙ্গি করিল।

মৃদু ভীতস্বরে সুধা কহিল,—কাশীতে বাড়ি ঠিক আছে?

বীরেন মুখভঙ্গি করিয়া কহিল,—অত পাঁজি-পুঁথি দেখে চল্‌বার আমার অভ্যেস নেই। বাড়ির

ভাবনা তোমাকে করতে হবে না, কাশীতে বিস্তর হোটেল আছে।

সুধা আঁৎকাইয়া উঠিল : হোটেল কি গো? সেখেনে ভদ্রলোকে থাকে নাকি?

এমন অর্ব্বাচীনের মত কথার যে কি উত্তর দিবে বীরেন ভাবিয়া পাইল না। ততক্ষণে ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঢুকিবার ফটকের সামনে একটা তুমুল ঠেলাঠেলি লাগিয়া গেল। সুধা এক পা পিছাইয়া কহিল, আমি পাঁচজন ব্যাটাছেলের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে লোক হাসাতে পারবো না। এ তোমার কেমন ব্যবস্থা?

বীরেন্ অস্থির হইয়া কহিল,—তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি! তোমাকে চিরকাল একটা হোটেলেই আট্‌কে রাখবো নাকি? পরে সস্তায় একটা বাড়ি নেব নিশ্চয়ই। কাশী না পৌঁছুতেই তোমার সে ভাবনা কেন?

পুরুষের একখানা ইণ্টার-ক্লাশ কাম্‌রায় দু' জনে উঠল। মন্দ ভিড় ছিল না। বেঞ্চির কোণে সঙ্কুচিত হইয়া সুধা বসিয়া আছে—ভয়ে পা তাহার ছম্‌ছম্ করিতেছিল। এতক্ষণে বাড়ীতে না জানি কী হট্টগোল লাগিয়া গেছে! মামাবাবু এখানে যদি পুলিশ লইয়া আসিয়া পড়েন! সে কি তাহা হইলে এতগুলি লোকের সামনে উঁচু গলায় স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিবে: যাব না। এই বীরেনকেই আমি বরণ করলাম। নিজের অগোচরে সুধা বারকতক গলা খাঁখ্‌রাইল। মামাবাবু কি করিয়া জানিবেন যে, তাহারা কাশী চলিয়াছে। পরেশবাবু নিশ্চয়ই সে সুযোগ আসিতে দিবেন না, গাড়ি-ছাড়ার সময় পর্য্যন্ত বাড়ির চৌকাঠ হইতে নড়িবেন না। কিন্তু কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার আগে তাঁহাকে আরেক বার না দেখিলে সুধার বড় আফশোষ থাকিবে। যিনি এত করিলেন, তাঁহাকে সামান্য একটু কৃতজ্ঞতার কথাও বলা হইল না। আবার কবে দেখা হয় কে জানে!

গাড়ি ছাড়িবার আর দেরি নাই, ছুটিতে ছুটিতে পরেশ আসিয়া হাজির। বীরেন প্ল্যাট্‌ফর্মে হাঁটিতেছিল, সহজেই তাহার দেখা মিলিল। দম নিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—স্যুট্‌কেসটা উঠেছে? সুধা কোথায়?

বীরেন্ কহিল,—ভেতরে।

পরেশ কহিল,—কেমন বুঝ্‌ছ? খুব নার্ভাস্ হয়ে পড়েছে?

—তা আর হবে না? বাঙালি মেয়ে, তায় নিতান্ত ছেলেমানুষ—কোনোদিন বাইরে বেরোয় নি।

পরেশ সায় দিয়া কহিল,—মুষ্‌ড়ে পড়াই স্বাভাবিক। তবু বাইরে বেরুবার জন্য যে ওর সাহস হ'ল সেইজন্য ওর তেজস্বিতাকে প্রশংসা করছি, বীরু। সমাজের দিক থেকে ও যত অন্যায়ই করুক, ব্যক্তিত্বসাধনের পক্ষে এর চেয়ে বড়ো কৃতিত্ব আর কি হ'তে পারে?

বীরেন হাসিয়া কহিল,—এটা প্ল্যাটফর্ম বটে, কিন্তু বক্তৃতার নয়, পরেশ।

পরেশ গম্ভীর হইয়া কহিল,—সত্য করে' যা অনুভব করে'ছ কথায় তা ব্যক্ত করতে গেলেই বক্তৃতার মত শোনায়! ও আমার ভারি দোষ। কিন্তু কি করি বল, না বলে' পারিও না থাক্‌তে। ডাক ত' সুধাকে। ওকে একটা উপহার দেব।

ভিতরে মুখ বাড়াইয়া হাতছানি দিয়া বীরেন সুধাকে ডাকিল : পরেশ এসেছে।

ভয় না আনন্দ সুধা প্রথমে ঠিক ঠাহর করিতে পারিল না। এমন একটা রোমাঞ্চময় অনুভূতির হয় ত' ভাষা নাই। যাহা কিছু অপ্রত্যাশিত, তাহারই অন্তরালে বোধ করি ক্ষুদ্র একটি আঘাত থাকে। সুধা ধড়ফড় করিয়া খোলা দরজা দিয়া নামিয়া পড়িল—পরেশ যেন তাহাকে বাড়িতে ফিরাইয়া নিতে আসিয়াছে। ফাঁকা জায়গায় আসিয়া সুধা হাঁপ ছাড়িল। বাঁচিয়াছে।

সত্যই, সামান্য এতটুকু সময়ের মধ্যে সুধা গরমে ও দুর্ভাবনায় একেবারে ঘামাইয়া উঠিয়াছে। বাড়ি ফিরিয়া গেলে তাহাকে এমন যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে যাহা মানুষে ভাবিতে পারে না, কিন্তু সেখানে হয় ত' এমন অস্বস্তিকর বিমূঢ়তা নাই। মুক্তির নামে এমন একটা জটিল গোলমেলে ব্যাপারের চেয়ে পিঠের উপর দুইটা লাথি খাওয়াও সোজা। সহজেই তাহার মীমাংসা হয়; নিঃশব্দে খানিকটা অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেই তাহার সমাধান মেলে। এমন পাকা বাঁধানো রাস্তা ফেলিয়া সে কেন গলি ঘুরিতে মরিতে চলিয়াছে।

সুধা মুখ ফুটিয়া কিছু বলিয়া বসিত হয় ত, কিন্তু তাহার আগেই পরেশ ব্রাহ্ম আচার্য্যের ঢঙে একটা আশীর্ব্বচন আওড়াইয়া সব মাটি করিয়া দিল। সামান্য আটপৌরে শাড়িখানিতে মেয়েটিকে এমন স্নিগ্ধ লাগিতেছে যে বলা যায় না। যেন শ্রাবণের স্তিমিত অশ্রুসিক্ত সন্ধ্যায় অনতিস্ফুট একটি ম্লান অপরাজিতা। এতদিন সহরে থাকিয়াও চোখে-মুখে এমন একটি অপ্রগল্ভ শ্যামল গ্রাম্যতা আছে যে সুধাকে বর্ষার আকাশের মতই পরেশের কাছে একটা দেখিবার জিনিসের মত মনে হইল। সুধা ঠিক বাঙালি মেয়ে—তেমনি একটা কুণ্ঠার কুয়াসা মাখিয়া নিজেকে এতটা মন্থর ও মধুর করিয়া তুলিয়াছে। ভুরুর উপর ছোট একটি কাটার দাগ চোখের দৃষ্টিকে অর্থবান করিয়াছে; সামান্য একটু খোঁড়াইয়া না চলিলে তাহার গতিলাবণ্য মলিন হইয়া পড়িত। এমন ছোট দু'খানি পা যে, মুঠির মধ্যে ভরিয়া লওয়া যায়!

পরেশ হঠাৎ তাহার পকেট হইতে একটা ছোরা বাহির করিয়া কহিল,—এই অস্ত্রটা তোমাকে উপহার দিচ্ছি, সুধা। এর মতই তোমার ভালবাসা তীক্ষ্ণ ও প্রবল হোক্। যে মহৎ পরীক্ষায় তুমি ঝাঁপ দিলে তাতে আত্মরক্ষার জন্যে খালি নিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়, অস্ত্র চাই। প্রয়োজন হ'লে প্রয়োগ কর্‌বার শক্তি পাও তোমাকে আমি এই আশীর্ব্বাদ করি।

পরেশের মুখে এই সব লম্বা-চওড়া কথা শুনিয়া ও ষ্টেশনের ইলেকট্রিক আলোতে ছোরাটাকে ঝিক্‌মিকাইতে দেখিয়া সুধার মনের কথা জিভের ডগায় আসিয়া শুকাইয়া গেল। মনের মত করিয়া একটি কথাও সে কহিতে পারিল না। ছোরা দেখিয়া তাহার বুদ্ধি আবার ঘুলাইয়া উঠিয়াছে। হাত পাতিয়া সে তাহা নিল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে হাত উহা বাড়াইয়া দিয়াছিল তাহা ধরিয়া এই বিরাট অন্ধকূপ হইতে বাড়ির মুখে বাহির হইতে পারিলেই সে বাঁচিত বোধ হয়। ছোরা সুধার সেমিজের তলায় খাপের মধ্যে রহিল সত্য, তবু তাহার ভয় যাইতেছে না। সে বলিয়া বসিল,—আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে।

পরেশ হাসিয়া কহিল,—আমি গিয়ে তোমাদের সকল আনন্দ পণ্ড করে'দি আর কি! তা ছাড়া আমার ছুটি কোথায়! আমি এখানেই আছি; দরকার হ'লে ঠিক আমার দেখা পাবে।

সুধা কহিল,—কবে দরকার হবে ঠিক বুঝ্‌ব কি করে'?

পরেশ কহিল,—দরকার যাতে না হোক তাই ত' ভালো। অকারণে পরের সাহায্য নেওয়ার গৌরব নেই। তুমি এই যে নিজের সত্যোপলব্ধির প্রেরণায় সমস্ত বন্ধনমুক্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলে পুরাণে তার মাত্র একটি উদাহরণ আছে—সে সাবিত্রী। সত্যবানের অকালমৃত্যু হবে জেনেও তার প্রেম ভ্রষ্ট হয় নি। মৃত স্বামীকে সে ফিরে পেয়েছিল এই তার সতীত্বতেজের বড় পরিচয় নয়, স্বামীকে ভালবেসে সে অকালবৈধব্যের ব্যর্থতা হাসিমুখে বহন করতে পারবে সে-প্রতিজ্ঞাই তার সত্যিকারের সতীত্ব। বীরেনের প্রেমের প্রতি

তোমাদের যেমনি প্রখর প্রতিভা হোক্। ওঠ, আর দেরি নেই, গার্ড এখুনি ফ্ল্যাগ নাড়বে।

দু'টি মুহূর্তের জন্য সুধা সামান্য একটু ইতস্তত করিল ও সেই ধূলিলিপ্ত প্ল্যাটফর্মের উপরেই পরেশের পায়ের কাছে উবু হইয়া প্রণাম করিয়া বসিল। পরেশ এমন চম্‌কাইয়া গেল যে পা দুইটা সরাইয়া নিতে পারিল না। এই প্রণাম সুধা যে হঠাৎ কেন করিল, তাহা ঠিক বীরেনের প্রতি তাহার ভালবাসার অবিনশ্বরতা প্রার্থনা করিয়াই বা কি না—বীরেনের অত-শত ভাবিবার সময় ছিল না। এই দৃশ্যটিতে তাহার সামান্য একটু ঈর্ষা হইল। সুধা তাহাকে প্রণামের চেয়েও বেশি দিয়াছে, কিন্তু চুম্বনের মাদকতার চেয়ে প্রণামের স্নিগ্ধতায় বেশি কবিত্ব! চুম্বনের নৈকট্যটা অত্যন্ত প্রখর, প্রকাশিত—প্রণামের অদূরবর্তী আত্মীয়তার মধ্যে সুমধুর অপরিচয়ের একটি সূক্ষ্ম অন্তরাল আছে, তাহা রহস্যঘন!

গাড়ি ছাড়িল গাড়ির সঙ্গে চলিতে চলিতে পরেশ বীরেনকে কহিল,—পৌঁছেই চিঠি লিখো। ছুটি নিয়ে আমি শিগ্‌গিরই যাব'খন। পরে সুধাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—আচ্ছা আসি, নমস্কার। কোনদিকে তোমার ভাবনা নেই, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

সুধা জানালা দিয়া ভাল করিয়া মুখ বাড়াইতেছিল, বীরেন তাহাকে প্রায় জোর করিয়াই বেঞ্চির উপর বসাইয়া দিল। এইবার সুধার ঠিক চোখে ঠেকিল যে তাহারা চলিয়াছে। পরিচিত আবাস পরিচিত আত্মীয়-বন্ধু সব পিছনে পড়িয়া রহিল। কোথায় চলিয়াছে! একবার কি ভাবিয়া বীরেনের মুখের পানে তাকাইল, অন্ধকারে তাহাতে একটা অক্ষরও পড়িতে পারিল না। হাঁ, ঐ ত' বীরেন—যে তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে, যাহার জন্য মরিতে সে দৃক্‌পাত করিবে না, সমস্ত অত্যাচার ও কলঙ্ক সেহ করিয়া বহন করিবে। তাহার আর ভয় কিসের? সে বীরেনকে আরো ঘেঁসিয়া বসিল। বীরেন অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছে, এমন সান্নিধ্যে একটুও চঞ্চল হইল না। কিসের ভয়? বুকের মধ্যে ছোরা আছে। বুকের মধ্যে অনায়াসে তা বসাইয়া দিতে পারবে। নিজের না পারুক, অন্যের। হাঁ; নিশ্চয়। ভয় কিসের?

তিন

কাশী! বীরেনের হাতের ঠেলায় সুধা জাগিয়া উঠিল। বাহিরের রৌদ্র ঘুমের কুয়াসাটুকু অপসৃত করিতে পারে নাই—ঘুমাইয়া-ঘুমাইয়া সে আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখিতেছিল। কাহারা যেন তাহাকে বাঁধিয়া নিয়া চলিয়াছে, কে যেন আসিয়া তাহার বন্ধন খুলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল: শিগ্‌গির পালাও,—যে দিকে চোখ যায়। সুধা ছুটিতে চায় অথচ ছুটিতে পারে না। ডাকাতের দল তাহার পিছু নিয়াছে। হাত বাড়াইয়া এখুনি ধরিয়া ফেলিবে। হঠাৎ বীরেন তাহার ঘুম ভাঙাইয়া তাহাকে রক্ষা করিল।

বীরেন কহিল, পরের ষ্টেশন বেনারস ক্যান্টনমেন্ট—আমরা সেখানে নাম্‌ব। সুধা ভীত হইয়া কহিল,—কেন, এই ত' কাশী!

—এখান থেকে সহর ঢের দূর, পরে নাম্‌লেই সুবিধে। তোমার খুব বুঝি খিদে পেয়েছে?

সুধা হাসিয়া কহিল,—তা কি আর পেয়েছে? ভালবাসার বদলে ভাত পেলে আমি এখন বেঁচে যেতাম। ষ্টেশন থেকে তোমার হোটেল কত দূর?

বীরেন ব্যস্ত হইয়া কহিল,—তার জন্য তুমি ভাব্‌ছ কেন? ষ্টেশনে নেমেই অনেক হোটেল-ওয়ালার সঙ্গে দেখা হবে। তখন কথাবার্তা ক'রে একটা ঠিক ক'রে নেব'খন।

চক্ষু বড় করিয়া সুধা কহিল,—বল কি? বিরানা জায়গায় মেয়ে-ছেলে নিয়ে একটা অচেনা

হোটেলে তুমি বাসা পাতবে? লোকে বলবে কি?

বীরেন কহিল,—তোমার কাছে এমন একটা অনিশ্চয়তা খুব মোহময় লাগে না? দু'দিন আগে কে ঠিক করে' রেখেছিল যে আমরা আঁচলের গিট্টু না বেঁধেও একসঙ্গে ভেসে পড়ব? অচেনা জায়গা বলেই ত' হোটেল আমাদের আশ্রয়। লোকে কি বলবে সে ভয় যদি তুমি এখনও রাখ তবে এই কাশীধামের সকল মাহাত্ম্যই নষ্ট হয়ে যাবে, সুধা। আমি যখন তোমার সঙ্গে আছি তখন তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমাকে বুঝি এখনো তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?

সুধা আশ্বস্ত হইল—বীরেনের মনে এই সন্দেহের অস্পষ্ট ছায়া পড়িয়াছে! বীরেন একটু সন্দিগ্ধ হইলে সুধার মনে জোর আসে! সে বীরেনের একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া গদ্গদ্স্বরে কহিল,—পাগল! তোমার মত ভগবানকেও আমি বিশ্বাস করি না। তোমার জন্য আমি সব ছাড়লাম,—সব!

—সে সব ছাড়তে বুঝি তোমার কষ্ট হচ্ছে?

—একটুও না। সে ঘরের মূল্যই বা কী ছিল? ছি! প্রথার দাসত্ব করতে হয় বলে' মেয়েমানুষকে পাথর হয়ে' থাকতে হ'বে এমন দৈন্য আমি তোমাকে পেয়ে সইবো কি করে'? সে-জন্য আমার কোনোকালে অনুতাপ হবে না। বলিয়া সুধা একটি নিশ্বাস ফেলিল।

ক্ষণকালের জন্য সুধার সৌম্য প্রশান্ত মুখের উপর এমন একটি শীতল বিষাদের ছায়া পড়িল যে উচ্চারিত কথার অন্তরালে কোথায় যেন একটি সংকেত উহ্য রহিয়াছে। দুইটি চোখের শুভ্রতায় একটা সলজ্জ কুণ্ঠা একটু কাঁপিয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। বীরেনের হাতের উপর জোরে আরেকটু চাপ দিয়া সুধা কহিল,—তোমার হাতে আমার জীবন ত' দিলাম-ই, তার চেয়েও অনেক বড়ো জিনিষ দিতে কার্পণ্য করলাম না। আমি মান-সম্ভ্রম জাতি-কুল কিছুই বড়ো করে দেখি নি। কিন্তু জীবনে হয় ত' আমিও নূতনতর সম্ভাবনার প্রত্যাশা করতাম। আমি স্বচ্ছন্দে আজ সমস্ত প্রত্যাশা তোমার হাতে তুলে দিলাম।

এমন পরিপূর্ণ সমর্পণের আভাস পাইয়া বীরেন আশ্বস্ত হইল। কহিল,—তোমার জন্য আমারো স্বার্থত্যাগের পরিমাণটা বিচার করে' দেখো। বাপ-মার আমি বড়ো ছেলে, আমাকে দিয়ে বাবা অর্দ্ধেক রাজত্বলাভের স্বপ্ন দেখেন; এ-খবর পেলে তিনি কতদূর আহত হবেন তা আমি ভাবতেও পারি না। মা পাগল হয়ে যাবেন হয় ত'। তবু এ-ছাড়া উপায় ছিল না, সুধা। জীবনে বৃহত্তর উপলব্ধির সুযোগ সহজে আসে না, কঠিন সঙ্কটের মধ্যে তাকে অধিকার না করতে পারলে জীবনের আদর্শ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আসে। সেইখানেই আমাদের অপঘাত মৃত্যু ঘটে। সেই অপঘাত মৃত্যু থেকে আমরা পরস্পরকে উদ্ধার করব। কি বল? এই যে—এইবার নামতে হবে।

ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও কোনো হোটেলওয়ালার দেখা মিলিল না। বীরেন কহিল,—একটা টাঙা করে' দশাশ্বমেধ-ঘাটের দিকে গেলেই হোটেল একটা মিলে যাবে। সেখানে গিয়ে একদিন থেকে পরের সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলব।

ওভার-ব্রিজ এর উপরে উঠিয়াছে এমন সময় একটি ভদ্রলোক আসিয়া উহাদের সম্বোধন করিল: আপনারা হোটেল নেবেন? বাঙালি হোটেল, মশাই। বিশেশ্বরের মন্দিরের কাছেই—ত্রিপুরা-ভৈরবী। ও-সব মেড়োর হোটেলে যাবেন না, মশাই। আমাদের ওখানে দোতলায় দিব্যি ঘর পাবেন। ফি রোজ ঘর ভাড়া মাত্র পাঁচ সিকে। চলুন। হোটেলের পাকামুক্ত

বলিয়া একটা ছাপা কার্ড প্রসারিত করিয়া ধরিল।

সব বৃত্তান্ত শুনিয়া বীরেনের পছন্দই হইল হয় ত'। বলিল,—জল পাব ত', মশাই। রাত্রে আমরা কিন্তু লুচি খাই।

—সব হবে মশাই। যখন যা চাইবেন তখুনি তাই মিল্‌বে। বাঙালি হ'য়ে আমাদের নূতন কারবার যদি আপনারা না দেখেন ত' কোথায় যাই ?

ভদ্রলোকটি বেশ অমায়িক। স্বদেশীর জন্য জেল খাটিয়া আসিয়া আর কোনো চাকরি মিলে নাই বলিয়া এই হোটেল ফাঁদিয়াছেন। দেখিতে যেমনি কৃশ তেমনি ঢ্যাঙা। পাঞ্জাবির ঝুল হাঁটুর কাছে আসিয়া নামিয়াছে। মাথার পেছন ও ধার দুইটা ক্ষুর দিয়া চাঁছিয়া একেবারে চামড়া বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। পান খুব বেশি খায় বলিয়া কথার মধ্যে একটা জড়তা আছে, তাহাতেই কথাগুলি খুব পরিষ্কার হইয়া উঠে না। হোটেলের স্বত্বাধিকারী সে নিজেই। নাম হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

লোকটাকে দেখিয়া সুধা প্রসন্ন হইল না; তবু দু'-একদিনের জন্য সহজেই আশ্রয় পাইয়া তাহার সম্বন্ধে এত খুঁটিনাটি বাছবিচারের কোনো মানে হয় না। হেমন্তবাবুকে অনুসরণ করিয়া উহারা টাঙায় উঠিল।

গলির মধ্যে হোটেল। বাড়িটা পুরোনো, নড়বড়ে। নীচের উঠানটায় রাজ্যের ময়লা জড়ো করা হইয়াছে। তাহারই স্তূপ ডিঙাইয়া হেমন্তবাবু বীরেন ও সুধাকে উপরে লইয়া আসিল। হোটেলের মাঝে হঠাৎ একটি ব্রীড়াবনতমুখী মেয়েকে দেখিয়া অন্যান্য অতিথিরা সব চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, অগোচরে পরস্পরের মধ্যে গোটা কতক চাউনির খেলায় চলিয়া গেল। একজন হাতের তালুটা উল্টাইয়া কহিল,—কলিকালের কেলি!

আরেক জন সায় দিল: আছে বেটা বিশ্বনাথ, কাশীতে কেউ আর কারু তোয়াক্কা রাখে না। গঙ্গার জলে কলঙ্ক মোছে!

উপরে আসিয়া দেখিল ঘরটা ছোট, দক্ষিণে দুইটি জানালা আছে। মন্দ না, দুই জনের চলিয়া যাইবে যা হোক। দু'-একদিন বৈ ত' নয়। তবে আরেকটা ছোট তক্তপোষ ফেলিতে হইবে। হেমন্ত আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল,—উনি ত' আপনার স্ত্রী, না ?

বীরেন কহিল,—হ্যাঁ। তবু দু'খানি চৌকী চাই।

—আচ্ছা আচ্ছা, সে আবার এমন-কি কথা ? আপনারা বিশ্রাম করুন, ওপরে চাকর পাঠিয়ে দিচ্ছি।

হেমন্ত নীচে নামিলে সবাই তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিল: কি ব্যাপার হে ম্যানেজার ?

ম্যানেজার বলিল,—এমন আবার কি! ও ত হামেসাই হচ্ছে। তবে মেয়েটাকে মনে হ'ল নেহাৎ কচি,—ভদ্রলোকেরো সবে হাতে-খড়ি। মাথায় সিঁদুর নেই তবু বলা হ'ল কিনা ইস্ত্রী। অমন ইস্ত্রী আমরা ঢের দেখেছি। কি বল হে নটবর ?

নটবর হোটেলের বাজার করে। ঠিক চাকর নয়। হিসাব রাখে, তদারক করে, বিকালের চা বানায়। সে দাঁত বাহির করিয়া বলিল,—তা আর বল্‌তে। কিন্তু এখেনে ওদের নিয়ে একটা কেলেঙ্কারী যেন না হয়। ওদের সাম্‌লে দিতে হবে ম্যানেজার। শেষকালে পুলিশের হাঙ্গামায় পড়্‌লে হোটেল কে হোটেল-ই লোপাট হয়ে যাবে।

ম্যানেজার তবু রসিকতা করিতে ছাড়িল না: ওপরে আবার দু'খান খাট চাই বাবুদের—ঘর কিন্তু একটা। দরজায় খিল পড়্‌লে এক খাটে আর এমন-কি অকুলান্ হবে। ইস্ত্রী যখন!

বলিয়া লোকটা বিকটস্বরে হাসিয়া উঠিল : যাও হে নটবর,বাজারটা ঘুরে এস। এই রহিল ফর্দ।

দক্ষিণের জানলা দুটো খুলিয়া দিলে বহু দূর পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত হইবে ভাবিয়া সুধা জানালা খুলিল। কিন্তু উদ্ধতশাসন প্রহরীর মত একটা বিপুলকায় প্রাচীর সঙ্কীর্ণ গলির ওপারে বাধা বিস্তার করিয়া আছে। এ ধারণাতে কাহাদের বাসা —একটা তারের বেড়া দেওয়া জানালার মধ্য দিয়া লোকজনের যেটুকু আভাস পাওয়া গেল তাহাতে মনে হইল বাঙালিরই। সুধার ভয় করিতে লাগিল, কে জানে যদি উহারা তাহাদের ধরাইয়া দেয়। লোকজনের সঙ্গে বন্ধুতা করিবার পথ উহার নাই ; বীরেনের লিপ্‌লিপির একটা ছিদ্রে হইলেই হইল। বাড়ির শাসন একটু শিথিল হইলেই উহারা আবার কলিকাতার কিম্বা বাহিরে —বীরেনের পশ্চাদ্বর্তিনী সুধা, সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু — সর্বাঙ্গে ব্রীড়ার রক্তিম সুষমা। বীরেন তাহার সম্মুখে থাকিলেই চিরকালের জন্য তাহার মুখরক্ষা হইবে। পৃথিবীতে আর কিছুই তাহার চাহিবার নাই।

বীরেন কহিল —জানলা বন্ধ করলে কেন ?

সুধা কহিল,—বড্ড রোদ এসে পড়ছে। তখন ত' সাত তাড়াতাড়ি ছুটে পালিয়ে এলে, একটা বিছানাও সঙ্গে আনো নি। এখন কি শোবে তক্তপোষের ওপর ?

বীরেন কহিল,—পকেটে পয়সা থাকলে বিছানা পিছিয়ে থাকে না। তা ছাড়া বিশেষ বাবুগিরি ক'রে পয়সা উড়বার সময় এখনো আসে নি। পরেশের টাকা না আসা পর্যন্ত একটু কষ্ট হয় ত' হবে।

সুধা বিরক্ত হইয়া কহিল,—তার জন্যে খালি তক্তপোষে কাঠের ওপরই শোবে নাকি ? যদি না-ই বা হ'ল একটা কাঁথা ও বালিশ ত' অন্তত চাই।

হয় ত' চাই, কিন্তু যে-মেয়ে ভালবাসিয়া ঘর ছাড়িয়াছে তাহার মুখে অন্তত আজিকার জন্য এমন একটা রূঢ় সত্যকথা না শুনিলেই হয় ত' বীরেন খুসি হইত। প্রেম অর্থই যে তপস্যা, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা এ সম্বন্ধে সুধা এখনো সচেতন হয় নাই দেখিয়া তাহার ভালবাসা যে নিবিড় নয় এমন একটা সন্দেহও বীরেনের মনে ঘনাইয়া উঠিল। তবু স্বর নরম করিয়াই কহিল,—কিন্তু সত্যি যদি কাঁথাও আমাদের কপালে না জোটে তা হ'লে আমাকে তুমি ত্যাগ করবে নাকি, সুধা ?

সুধা স্যুটকেসটা খুলিতে খুলিতে কহিল,— তোমাকে ত্যাগ ক'রে আর কোন্ চুলোয় যাব শুনি ? একবার হাত যখন ধরেছি তখন তোমার নাগাল পাই বা না পাই সে হাত আমার আঁকড়েই থাকতে হবে। কিন্তু পথের যারা ভিখিরি তাদেরো শোবার জন্য একটা বালিশ থাকে।

বীরেন স্বচ্ছ স্বাভাবিক স্নেহে হাসিয়া কহিল, —কিন্তু প্রেমের যারা ভিখিরি তাদের কিছু না থাকলেও কিছু এসে যায় না। ভাবছ কেন, আমার অঙ্ক তোমার উপাধান হবে ; আমার আদর হবে তোমার সুখশয্যা।

সুধা ঝট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও তৎক্ষণাৎ তক্তপোষের একটা প্রান্ত শূন্যে তুলিয়া পুনরায় সশব্দে মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া কহিল,—দেখ দেখ, ছারপোকার কেমন মিছিল চলেছে। এই তোমার সুখশয্যা ? যাই বল, বিনি-বিছানায় আমি শুতে পারবো না কক্‌খনো।

বহু বৎসরের মৌরসি স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হতভাগ্য ছারপোকাকুল মেঝের উপর কিল্‌বিল্ করিতে লাগিল। তবু, চোখের সম্মুখে তাহা দেখিয়াও সুধার এই নিষ্ঠুর মন্তব্যটা বীরেনের সহ্য হইল না। বিরক্ত হইয়া কহি —আচ্ছা আচ্ছ

হবে, সোনার খাটে শুয়ে রূপোর খাটে পা রাখবার ব্যবস্থা আমি করছি। মামা-বাড়িতে কিসে শুতে ? কাতীর হাওদায় ?

সুধা কোনই উত্তর দিল না। নিঃশব্দে সুটকেসের ডালাটা খুলিয়া বোঝাই-করা রাজ্যের জিনিসপত্র লইয়া হাঁপাইয়া উঠিল। তাহার চোখের সামনে এই ছোট বাক্সটা যেন কুবেরের ভাণ্ডার খুলিয়া ধরিয়াছে। সব জিনিসের নামও সে জানে না। একটা ধূপদানি পর্যন্ত আছে। চন্দনকাঠের তৈরি। তাহার নীচে ছোট একটু কাগজের টুকরা আঠা দিয়া আটকানো। তাহাতে একটুখানি লেখা : ঘুমাইয়া পড়িলে শিয়রে ধূপকাঠি জ্বালাইয়া রাখিয়ো। স্মৃতির মত ধীরে ধীরে ইহার সুগন্ধ অস্পষ্ট হইয়া আসিবে।

বীরেন ধমক দিয়া কহিল,—স্নান করতে হবে না ? ভোর হয়েছে মুখও ত' ধোও নি এখনো। সমস্ত দিন এগুলিই ঘাঁটবে নাকি ?

—ঘাঁটলে কী এমন গঙ্গাধ উল্টোবে ? আজ ত' আমি ছাড়া পেয়েছি, দুপুর হ'তে না হ'তেই স্নান করতে হবে এমন-সব ধরাবাঁধা নিয়ম আর আমার ওপর খাটবে না। দাঁড়াও, দেখছ কী সুন্দর ব্লাউজের এই ছিটটা। কাশ্মীরি শাড়ির আঁচলটা দেখেছ ? কত রকম বিলিতি সো-ই যে বেরিয়েছে। চামড়ার একটু ঘসতে না ঘসতেই মিলিয়ে যায়। এস না, তোমার মুখে একটু মাখিয়ে দি। তোমার চামড়ার অবস্থা শিগগির মেলাবে না। গণ্ডারের চামড়া।

শোবার ক্ষ রসিকতা করিবার সময় হয় ত' এখনো আসে নাই। বীরেন তাহার পূজারী মাত্র অধিকারী নয়। তাই সেও ঠাট্টা করিল, এবং সেই ঠাট্টার ঝাঁজ সুধা সহজে হজম করিতে পারিল না : আর তোমার বুঝি শুয়োরের চামড়া। নিজের রূপের ছিরি নিজে ত' আর টাওয়াও না, তাই খোঁড়া পা নিয়ে পাহাড় ডিঙাতে চাও। কিন্তু হোটেলের চাকরগুলো ত' তোমার কথায় উঠবে বসবে না, অতগুলো চাকর রাখবার মুরোদও তোমার হয় নি। ও সব ছাইপাঁশ রেখে স্নান কর গে। বাসিমুখ আর বার করো' না। ওঠ, আমাকে আবার বেরতে হ'বে।

—বেরোও না। কে তোমাকে ধ'রে রাখছে ? সুধাও বেঁকাইয়া উঠিতে জানে : যাব না চান্ করতে। কি করবে তুমি ?

বীরেন দেখিল গতিক সুবিধার নয়। কথায় পিঠে কথা বলিতে গিয়া এমন জায়গায় সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে আরেক পা অগ্রসর হইতে গেলেই তাহাকে মহাশূন্যে পদস্খলন করিতে হইবে। সে নিজেকে সামলাইয়া লইল। তাড়াতাড়ি সুধার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া তাহার খোঁপায় হাত দিয়া একরাশ চুল পিঠের উপর ভাঙিয়া ফেলিল। কহিল,—রাগ করো না, সুধা। বাঃ, কী সুন্দর এই শাড়ির পাড়টা ! এই রঙটা তো তোমাকে ভারি মানাবে ! এই বুঝি সেই টর্চটা। দেখি। হঠাৎ উঠিয়া বীরেন দরজাটা বন্ধ করিয়া দিতেই ঘর অন্ধকার হইয়া গেল। তাহার পর টর্চ টিপিয়া এক ঝলক ধাঁধানো আলো সুধার মুখের উপর ফেলিয়া কহিল,—বাঃ, কী সুন্দর তোমাকে দেখতে !

টর্চ হইতে আঙুলটা সরাইয়া নিতেই ঘর আবার পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারে ভরিয়া উঠিল। সুধার স্বর শোনা গেল : ছাড়, ছাড়, কি যে তুমি বাঁদর হয়েছে ! দিনকে রাত করে' ছাড়বে।

বীরেন হিসাব করিয়া দেখিল গণ্ডার হইতে বাঁদর অধিকতর ভদ্র সম্বোধন। তা না হইলে কত কাল আগেই ডারউইন-এর বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা আনা যাইত। সুধাকে ছাড়িয়া দিয়া সে দরজাটা খুলিয়া দিল।

সুধা বলিল,—কলে জল পাব এখন ? কাশীতে কলের জল কখন বন্ধ হয় ? তাত এখনেই দিয়ে

যাবে ত'? কাপড় শুকোব কোথায়? খেয়ে-দেয়েই কিন্তু বেড়াতে বেরুব। আরেকটা বাড়ি ঠিক করবে না? এ-ঘরে ভদ্রলোক টিকতে পারে না। বেছে-বেছে কি হোটেলেই যে আন্‌লে। ম্যানেজারটি যেন একটা বক। আর তুমি একটি অজবুক। পরেশবাবুর কাছ থেকে আবার টাকা চাওয়া কেন? বিছানা না হয় নাই হবে। পারতপক্ষে পরের কাছে সাহায্য নিতে নেই। শোন নি পরেশবাবুর উপদেশ?

বীরেন্ কহিল,—শুনেছি। তোমার মাথা ঘামাতে হ'বে না, বুঝ্‌লে?

—না ঘামাতে কি আর হ'বে? আমি বুঝি তোমার কেউ নই?

বীরেন তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল,—তুমি আমার সব।

ক্রমশঃ

